# ভারতী

## সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

( ১৩২৬ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র )

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ ]     ভারতী কার্য্যালয়,     [ বার্ষিক মূল্য ৩।৵০

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২৬ সালের

# ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

( কার্ত্তিক—চৈত্র )

# চিত্র সূচী

# ভারতী

## সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(১৩২৬ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ ] ভারতী কার্য্যালয়, [ বার্ষিক মূল্য ৩।৵০
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২৬ সালের

# ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

( কার্ত্তিক—চৈত্র )

# চিত্র সূচী



কবরের আলো

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।

শ্রীযুক্ত রামেশ্বরপ্রসাদ অঙ্কিত

# ভারতী

৪৩শ বর্ষ ] কার্ত্তিক, ১৩২৬ [ ৭ম সংখ্যা

## বেদের মূল বহুদেববাদ না একেশ্বরবাদ ?

বেদ, ইন্দ্র, যম, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের স্তুতিতে পরিপূর্ণ। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা বেদের এই বহুদেবসংখ্যা হইতেই পরিকল্পিত হইয়াছে। সুতরাং বেদের মূল যে বহু-দেববাদ, তাহা একরূপ স্বীকার্য্য বলিয়াই ধরিয়া লইতে হয়! এরূপ অবস্থায় "বেদের মূল বহু-দেববাদ না একেশ্বরবাদ ?" এই প্রশ্ন কি করিয়া উঠিতে পারে ? কিন্তু এই প্রশ্নটি একজন খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক তুলিয়াছেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি প্রশ্নটীর শেষপক্ষকেই সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন করিয়াছেন। এই খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকের নাম Maurice Phillips। তিনি বেদসম্বন্ধে একখানা সুন্দর গ্রন্থই প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার নাম "Teaching of the Vedas" —"বেদের শিক্ষা"। আমরা প্রথমতঃ খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকের উল্লিখিত গ্রন্থ হইতে বেদের মূল দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে তদীয় কৌতুকাবহ আলোচনাটীই এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"Is it not philosophically true that polytheism pre-supposes monotheism ? Is it true as many seem to suppose that polytheism is older than monotheism ? Is it not likely that the simple belief is older than the more complex ? Can the concept many precede the concept one ? Is not plurality the aggregate of units ? What is the development of thought as seen in children ? Is it not from one to two, from the singular to the plusal, from the simple to the complex, from unity to diversity and then by generalisation into abstract unity ? It is obvious, therefore that knowledge of the divine attributes and functions possessed by the Vedic Aryans was

neither the product of Intuition or Experience but a "Survival," the result of a "Primitive Revelation." "The Teaching of the Vedas", pp. 108-9.

"ইহা কি দার্শনিকভাবে সত্য নহে যে, বহু-দেব-বাদের মধ্যেই একেশ্বরবাদের পূর্ব্বানুমান নিহিত রহিয়াছে? অনেকে যে মনে করেন, বহুদেববাদ একেশ্বরবাদ অপেক্ষা প্রাচীন, তাহা কি সত্য? ইহা কি অধিক সম্ভবপর নহে যে সরল বিশ্বাসই অধিকতর জটিল বিশ্বাস অপেক্ষা অধিক পুরাতন? বহুর ধারণা কি একের ধারণার পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে? বহুত্ব কি একত্বেরই সমষ্টিভূত নহে? শিশুদিগের মধ্যে চিন্তার বিকাশ কিরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে? ইহা কি এক হইতে দুইএ, এক সংখ্যা হইতে বহু সংখ্যায়, সরল হইতে জটিলে, একত্ব হইতে বৈচিত্র্যে এবং তৎপর সামান্য জ্ঞান হইতে নিরবচ্ছিন্ন একত্বে বিকাশ নহে? অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে, ঐশ্বরিকগুণ ও কার্য্য-সম্বন্ধে বৈদিক আর্য্যগণের ধারণা সহজাত সংস্কার বা অভিজ্ঞতার ফল নহে; পরন্তু ইহা আদিম প্রত্যাদেশেরই ফলরূপে বিকাশের বর্ত্তমান জীবন্ত নিদর্শন।"

মিশনরী-বর কেবল যে যুক্তিদ্বারা এই-রূপে বেদের মূল একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা নহে, পরন্তু তিনি স্বকীয় সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনজন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতের মতই উদ্ধৃত করিয়া-ছেন। আমরা নিম্নে ঐ তিনটী মন্তব্যও প্রদান করিতেছি:—

"Professor H. H. Wilson says, "There can be no doubt that the fundamental doctrine of the Vedas is monotheism." And Professor MaxMuller, in "History of Ancient Sanskrit Literature," says, "There is a monotheism that precedes the Polytheism of the Veda. The idea of God, though never entirely lost, has been clouded over by error. The names given to God had been changed to gods, and their real meaning had faded away from the memory of men." M. Adolphe Pictet, in the second Volume of his great work. Les Origines Indo-Europennes gives, it as his opinion that the religion of the undivided Aryans was a "monotheism more or less vaguely defined." And both Pictet and Muller maintain that traces of the primitive monotheism are visible in the Védas; that the remembrance of a God one and infinite breaks through the mist of an idolatrous phraseology like the blue sky that is hidden by a passing cloud." The Teaching of the Vedas pp. 107-8.

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের বহুদেববাদ কল্পনার মধ্যে এইরূপ একেশ্বর ধারণায় অন্তর্নিবেশ লক্ষ্য করিয়া বেদের বহুদেববাদের জন্য একটি নূতন নাম কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহাকে তাঁহারা Ketheno-theism বা Henotheism এই নূতন নাম প্রদান করিয়াছেন। এই নামের অর্থ যে কি, তাহা ইহার নিম্নোদ্ধৃত ব্যাখ্যা হইতেই স্পষ্টীকৃত হইবে!—

"There is another tendency which runs through the entire Rig-Veda and which at first sight, looks like a reaching out towards monotheism. It assumes two forms. The first, which we have repeated occasions to notice, is that of extolling the particular deity invoked at the time above all the others and a scribing to it the same actions and functions which in other hymns, are named as especially belonging to this or that god. This is the stage which will retain the name improvised for it by Max Muller: Henotheism or Kethenotheism; ie the worship, not of one God only, but of one God at a time." Vedic India by Z. A. Ragozin p. 430.

ইহার মর্ম্ম এই "Henotheisn" এক দেবতার মাত্র উপাসনা নহে, কিন্তু একসময়ে একই দেবতার উপাসনা। যে কোন দেবতা যখনই উপাসিত হইয়াছেন, তখনই তিনি অপর সকল দেবতার উপর প্রধানরূপে উপাসিত হইয়াছেন এবং বেদের অন্যত্র-উক্ত ভিন্ন ভিন্ন দেবতার বিশেষ বিশেষ কার্য্য ও বিধিসকল তৎকালের জন্য তাঁহাতেই আরোপ করা হইয়াছে। ইহা একেশ্বরবাদ-পরিগ্রহের দিকেই উন্মুখতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়।"

ফলতঃ বেদে দেবতাদিগের যে স্তুতি পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে, একেশ্বরের ধারণা যে তাহাতে অনুস্যূত রহিয়াছে তাহা করিতে হয় না। আমরা এস্থলে কয়েকটি স্তোত্র উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রদর্শন করিব:—

বরুণ বেদের একজন অতি প্রাচীন দেবতা, তাঁহার মহিমা বেদে এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে:—

অবুধ্নে রাজা বরুণোবনস্যোর্দ্ধং স্তূপং দদতে পূতদক্ষঃ।
নিচীনাঃ স্থুরুপরি বুধ্ন এষা মস্মে অন্তর্নিহিতাঃ

কেতবঃস্যুঃ ॥ ৭

উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্য্যায় পন্থা মন্বেত বাউ।
অপদে পাদা প্রতিধাতবেহ করু তাপবক্তা

হৃদয়াবিধশ্চিৎ ॥ ৮

"বিশুদ্ধবল রাজা বরুণ মূলরহিত অন্তরীক্ষে থাকিয়া বননীয় তেজঃপুঞ্জ ঊর্দ্ধে ধারণ করেন, সে রশ্মিপুঞ্জ অধোমুখ কিন্তু তাহাদিগের মূল ঊর্দ্ধে, তদ্দ্বারা যেন আমাদিগের মধ্যে প্রাণ নিহিত থাকে।

রাজা বরুণ সূর্য্যের ক্রমান্বয়ে গমনার্থ পথ বিস্তীর্ণ করিয়াছেন; পদরহিত (অন্তরীক্ষে) সূর্য্যের পদবিক্ষেপের জন্য পথ করিয়াছেন; তিনি আমার হৃদয়-বিদ্ধ-কারী শত্রুকে তিরস্কার করুন।"

উদ্ধৃত বর্ণনায় বরুণ যে জ্যোতিঃস্বরূপ ও আমাদের প্রাণ-তত্ত্বের মূলাধাররূপে চৈতন্যস্বরূপ তাহা যেমন আমরা জানিতে পারিতেছি, তেমনই তিনি যে বিশ্বব্যবস্থার বিধাতা তাহাও জানিতে পারিতেছি।

বরুণের ন্যায় সোমও বেদের প্রাচীনতম দেবতা। এই সোম সম্বন্ধে বেদের একটী স্তোত্র এইরূপ:—

"তবেমাঃ প্রজা দিব্যস্য রেতসস্বং বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজাসি।
অথেদং বিশ্বং পবমান তে বশে ত্বমিন্দো প্রথমো

"হে সোম! এই তাবৎ প্রাণী তোমার স্বর্গীয় রেতঃ হইতে উৎপন্ন। তুমি সমস্ত বিশ্ব-ভুবনের প্রভু। হে ক্ষরণশীল সোম! এই নিখিল জগৎ তোমার আজ্ঞাধীন। হে সোম! তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতার অধিকারী।"

অন্যত্র সোমকে "জনিতা রোদস্যোঃ" (৯।৯০।১) "দ্যুলোক ও ভূলোকের সৃষ্টি-কর্ত্তা", "লোককৃৎ" (৯।৮৬।২১) "লোককর্ত্তা," "বিশ্বস্যে শানওজসা (৯।১০১।৫) ইনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, নিজ তেজে প্রভুত্ব করেন; "নৃচক্ষাঃ" (৮।৪৮।১৫) "সর্ব্বদর্শী" বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। এই সমস্ত হইতে সোমের সের্ব্বকর্ত্তৃত্ব সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ঈশ্বর-গুণ সকল বিশেষরূপেই উপলব্ধি করা যায়।

অগ্নি বেদের অন্যতম প্রধান দেবতা। অগ্নির সম্বন্ধে বেদের প্রথমেই এইরূপ একটী ঋক্ আছে:—

ইহত্বষ্টারমগ্রিয়ং বিশ্বরূপমুপহ্বয়ে।
অস্মাকমস্তু কেবলঃ॥ ১০
ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৩ সূক্ত।

এস্থলে অগ্নি যে বিশ্বেরই আদি ও সমস্ত বিশ্বেরই স্বরূপ, তাহা অতীব স্পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে। অগ্নির ত্বষ্টা নামের দ্বারা তিনি যে সমস্ত বিশ্বের নির্ম্মাতা বা সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহাও প্রকাশ পাইতেছে। বেদে অগ্নির এক নাম "জাতবেদা" (৬।১৫।১৩) পাওয়া যায়। জাতবেদার অর্থ—যিনি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের বিষয় অবগত আছেন, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ।

এইরূপে বেদের প্রাচীনতম দেবগণেই যখন ঈশ্বরের প্রধানগুণ সকলই আরোপিত দেখা যায়, তখন একেশ্বরবাদকে মূল করিয়াই তাহা আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

বেদের প্রথম দেবকল্পনায় যে একেশ্বরের ধারণা অস্ফুটভাবে অন্তর্নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়, সেই দেবকল্পনার শেষ পরিপূর্ণতায় সেই একেশ্বর-ধারণাই পরিস্ফুট আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা কয়েকটী ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রদর্শন করিতেছি:—

"মিত্রোঅগ্নির্ভবতি যৎসমিদ্ধো হোতা বরুণো জাতবেদাঃ
ঋগ্বেদ ৩য় মণ্ডল ৫ম সূক্ত।

"অগ্নি যখন সমিদ্ধ হয়েন, তখন মিত্র হয়েন। সেই মিত্রই হোতা এবং সর্ব্বভূতজ্ঞ বরুণ॥"

"ত্বংবরুণ উত মিত্রো অগ্নে ত্বাং বর্দ্ধন্তি বসিষ্ঠাঃ।" ৩
ঋগ্বেদ ৭ম মণ্ডল ১২ সূক্ত

"হে অগ্নি! তুমি বরুণ, তুমি মিত্র, বসিষ্ঠগণ তোমাকে স্তুতিদ্বারা বর্দ্ধিত করেন।"

"ত্রিভিষ্টং দেব সবিতর্বর্ষিষ্ঠৈঃ সোমধামভিঃ। অগ্নে দক্ষৈঃপুনীহিনঃ॥" ঋগ্বেদ ৯ম মণ্ডল ৬৭ সূক্ত।

"হে সোম! তুমিই সবিতা, তুমিই অগ্নি। তোমার এই তিন বিপুল ও কার্য্যক্ষমমূর্ত্তি, এই তিন মূর্ত্তিদ্বারা আমাদিগকে পবিত্র কর।"

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার মধ্যে অভেদভাব দর্শন করিতেই ঋষিগণ যে, এক মূলদেবের পরিষ্কার ধারণায় উপনীত হইয়াছিলেন নিম্নোদ্ধৃত ঋক্ দুইটী পাঠ করিলে, তাহা সুন্দররূপেই উপলব্ধি হইবে:—

"যোদেবেষধিদেব এক আসীৎ॥" ৮ ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১২১ সূক্ত।

"যিনি দেবতাদিগের উপর অদ্বিতীয় দেবতা হইলেন।" রমেশবাবুর অনুবাদ।

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণোগরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥" ৪৬

"এই আদিত্যকে মেধাবিগণ, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া থাকে। ইনি স্বর্গীয় পক্ষবিশিষ্ট ও সুন্দর গমনশীল, ইনি এক হইলেও ইঁহাকে বহু বলিয়া বর্ণনা করে, ইহাকে অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা বলে।"

এই এক মূলদেবই যে ঈশ্বরগুণবিশিষ্ট ও বেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও স্পষ্টাক্ষরেই নির্দ্দেশিত হইয়াছে :—

"যোনঃ পিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা
যন্ত্যন্যা॥" ৩ ঋগেদ ১০ম মণ্ডল ৮২ সূক্ত।

"যিনি আমাদিগের অন্নদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সকল ধর্ম্ম অবগত আছেন, যিনি একমাত্র, অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করেন, অন্যতাবৎ ভুবনের লোকে তাঁহার বিষয়ে জিজ্ঞাসাযুক্ত হয়॥"

এই মূল দেবতাই যে বেদের সর্ব্বদেবতার স্বরূপরূপে একেশ্বরতত্ত্ব, তাহাও অতীব সরল ভাবে বেদে বর্ণিত হইয়াছে :—

"একএব অগ্নির্ব্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্য্যোবিশ্বমনুপ্রভূতঃ।
একৈবোষাঃ সর্ব্বমিদং বিভাত্যেকং বৈ ইদং বি বভূব
সর্ব্বম্॥" ২ ঋগেদ ৮ম মণ্ডল ৫৮ সূক্ত।

"এক অগ্নি বহুপ্রকারে সমিদ্ধ হইয়াছেন, এক সূর্য্য সমস্ত বিশ্বেঅনুপ্রভূত ( অন্তর্ভূক্ত ) হইয়াছেন, এক ঊষা এই সমস্তকে প্রকাশিত করিতেছেন। এইপ্রকারে একই সর্ব্ব প্রকারে হইয়াছেন॥"

বলাবাহুল্য যে এই স্তুতিটীর অগ্নিই দেবতা, সূর্য্য ও ঊষা অগ্নিরই রূপবিশেষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকারে অগ্নিতেই যে বৈদিক ঋষিগণ চরম অদ্বৈত ঈশ্বরতত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই আমরা দেখিতে পাইলাম, ইহাই উপনিষদের "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই সারতত্ত্ব হইয়াছে। এইরূপে বেদের দেববাদ বহু দেববাদ হইলেও তাহা যে কেবল একেশ্বরের ধারণা নহে, পরন্তু অদ্বৈততত্ত্বের ধারণামূলক একেশ্বরবাদ তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

# মানসী

হের বহুদূরে নীলগিরি-শ্রেণী ওই বুঝি যায় দেখা,
ওইখানে সখি, রহিব বিজনে আমরা দুজনে একা!
স্নিগ্ধ-শীতল অতি-নির্ম্মল ঝরণার এক পাশে
দোঁহার লাগিয়া বাঁধিব কুটীর লতা-পাতা ফুল-ঘাসে,
সে বন-ভবনে কেহ রহিবে না, তুমি আর আমি, রাণি,
আর রবে সাথে চির-সাথী এই পুরাতন বাঁশীখানি।

এর বেশী কিছু না জুটিলে সেথা, ক্ষতি মানিবে না মনে,
তুমি যদি প্রিয়ে রও মোর পাশে, দুঃখেরে কেবা গণে!
তোমারি পুণ্যে এ জীবনে মোর অভাব কিছু না রবে,
তোমারি পরম পরশে আমার এ দেহ অমর হবে!

পূর্ব্ব আকাশে আসিবে নিত্য তরুণ বিমল ঊষা,
প্রেয়সি, তোমায় পরাইতে শিরে স্বর্ণকিরীটভূষা!
প্রসন্ন মনে বন্দনা তব গাহিবে অযুত পাখী
তব পূজা-তরে শিউলির ফুল ঝরিবে গো থাকি থাকি,
প্রভাত-পবন খোলা বাতায়নে প্রবেশ করিবে ঘরে,
উড়াবে তোমার শিথিল অলক অতুল সোহাগ-ভরে,
ঘিরিয়া মোদের রবে নিশিদিন শ্যামল শৈলমালা,
বন-তুলসীর মদির গন্ধে কুটীর হইবে আলা,
শিলাসনে বসি হেরিব সমুখে ধূ-ধূ ধান-ক্ষেত রাজে,
ভুলে যাবে মন, ডুবিবে নয়ন অগাধ নীলিমা-মাঝে,
কাননের পাখী খেলিয়া বেড়াবে মোদের আঙিনাতলে,
অকারণে হায় নয়ন দোঁহার ভরিয়া আসিবে জলে।

গৃহের লক্ষ্মি, রবে গৃহ-কাজে আমি যাবো দূর মাঠে,
পথে যেতে যেতে ভাবিব ক্যেমনে দিবস তোমার কাটে!
কাজে নিমগন রহিব কখন আপনি ভরিবে প্রাণ,
আপনার মনে অতি সযতনে গাঁথিব তোমারি গান।
দিগন্তব্যাপী শ্যামল নধর নবীন ধানের ক্ষেতে
উতলা পবন পাগল-সমান উঠিবে কেবলি মেতে!
ধানেরি মতন লাবণ্যভরে দেহ-মন দুলে সারা,
জানিব না কিছু, হৃদয় কখন্ হ'ল যে কোথায় হারা!
গুণ্ঠন-ঢাকা সন্ধ্যা আসিবে শান্ত বধূর সম,
শ্রান্ত চরণে উৎসুক মনে ফিরিব কুটীরে মম।
জনহীন পথ ছুটেছে উধাও, কে জানে কাহার টানে,

রাত্রি তখন কালো কেশপাশ এলায়ে দিয়েছে খুলে,
আলোক-গন্ধি তারকার ফুল পরেছে নিবিড় চুলে!
সব গৃহকাজ করি সমাপন মঙ্গল-দীপ জ্বালি,
বন-ফুলে তুমি গাঁথিছ মালিকা অঙ্গুলি-সুধা ঢালি।
বিধুর বিভোল দাঁড়াবো কেবল রুদ্ধ কুটীর-দ্বারে,
প্রাণের কথাটী কাঁদিয়া বাজিবে কঙ্কন-ঝঙ্কারে,
ব্যগ্র চরণে খুলিয়া দুয়ার দাঁড়াবে সমুখে আসি,
মিলন-আশায় কাজল নয়ন হাসিবে সলাজ-হাসি!
সেইক্ষণে প্রিয়ে, দুটী আঁখি দিয়ে ভুলায়ে শ্রান্তজনে
বসায়ো নিভৃতে কুন্তল-ঘেরা তোমার সিংহাসনে!
মিলন-পীড়নে অঙ্গে অঙ্গে জাগিবে পুলক-ব্যথা
কেহ জানিবে না, কেহ দেখিবে না সেই সুখ-আকুলতা!

নীরব নিশীথে বসিব দুজনে বিকচ তরুর মূলে
সুকোমল ফুল-শয্যারচনা হবে ঝ'রে-পড়া ফুলে!
পাশে বসি তুমি পিয়াসী বাঁশিরে পিয়াবে অধর-সুধা,
চুম্বন-ভিখারী বাঁশিটীর তায় মিটিবে কি কভু ক্ষুধা!
কণ্ঠে তোমার আগ্রহ-ভরে বাহুখানি সঁপি' দিব
মুখখানি তব ব্যাকুল বক্ষে লালসে কাড়িয়া নিব,
যে ক'টি গীতিকা গেঁথেছিনু আমি নব-অনুরাগ দিয়ে,
সেই কটি গান বড় ভালবেসে শোনাব তোমায় প্রিয়ে!
সুদূর আকাশে তারায় তারায় পড়ে যাবে কানাকানি,
ফুলে ফুলে আর পাতায় পাতায় সুমধুর জানাজানি,
হেনকালে দূরে শৈল-শিখরে উকি দিবে বাঁকা চাঁদ,
হাসিটি তোমার করিবারে চুরি পাতিবে সোনার ফাঁদ!

কণ্ঠের মালা খুলিয়া কখন্ না জানি স্বপন-সুখে
কল্যাণ-করে দিবে মোর গলে হাসি-উন্মীল মুখে,—
এ তনু ভরিয়া শিরা-উপশিরা গাহিবে গো জয়-গান,
না ধরে হরষ সে যে গো সরস প্রিয়ার হাতের দান!
মিলন-আবেশে নিমেষ ফেলিতে মিলাবে দীর্ঘরাতি,
নব-জাগরণে আকাশের কোণে ভাতিবে অরুণ-ভাতি!

এমনি করিয়া কাটে যদি দিন, জীবন কাটিয়া যায়,
দীন ভক্তের মুগ্ধ হৃদয় আর কিছু নাহি চায়!
নির্জ্জন ওই কাননের কোলে তোমারে দেবতা করি,
হে প্রেয়সি মোর, পূজিব তোমায় আকুল জীবন ভরি!

শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়।

---

# ক্রমবিকাশের মুলতত্ত্ব ও ভারতের ইতিহাস

পূর্ব্ব প্রবন্ধে, ক্রমবিকাশের যে সকল মুলতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে ভারতের ইতিহাসে প্রয়োগ করা যাক্।

অন্যান্য রাষ্ট্রের ইতিহাসের ন্যায় ভারতের ইতিহাসেও গোড়ায় দেখা যায় কতকগুলি ক্ষুদ্র লোকসঙ্ঘ স্ব-তন্ত্র ও জগতের সহিত প্রায় সম্বন্ধ-বিবর্জ্জিত। অবশ্য, যখন কোলারীয়, মোগল ও দ্রাবীড় জাতিরা ভারত আক্রমণ করে তখনই ঐ সকল জাতি বিভিন্ন সভ্যতার ছাঁচে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এবং উহাদের অভিযানও অবিরাম চলিয়াছিল। তাহার পর, যে সকল শাখা-জাতি, যে সকল গোত্র ভারতময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের নিজ নিজ রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্যাদি ও নব-জাত শিল্প-সামগ্রী পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করা আবশ্যক হইল। তথাপি আমরা বলিতে পারি যে, প্রাথমিক যুগটাই স্বাধীন স্থানীয় সভ্যতার যুগ, এবং ক্ষীণ পরিবর্ত্তনশীলতার ফলে বিলম্বিত ক্রম-বিকাশই এই প্রকার সভ্যতার স্বরূপ-লক্ষণ।

সেই যুগটি দ্বিতীয় যুগ যে সময়ে একটি মুলজাতি এবং তাহার পর একটি ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠে। ভারতের বিভিন্ন জাতি স্বকীয় বিশেষ-বিশেষ গুণ বজায় রাখিয়াছিল; তাহা একেবারে কখনই লোপ পায় নাই, কিন্তু তাহারা সকলের মধ্যে থাকিয়া আপনাদিগকে তৎকালীন অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সকল মূল জাতি গোড়ায় যে মধ্য-এসিয়া হইতে সমুৎপন্ন, সেই মধ্য-এসিয়া হইতে খাস হিন্দুস্থান, জল-বায়ু জীব-জন্তু গাছপালা সকল বিষয়েই ভিন্ন ছিল। পরে ঐ ভারত-আক্রমণকারীরা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অশন বসন ও নিবাসের রীতি পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল। দেশের মাটি ও রীতিনীতির প্রভাবে তাহাদের স্বভাব-চরিত্রেরও কিছু কিছু বদল হইল। তাহার দৃষ্টান্ত—আর্য্যেরা মধ্য-এসিয়ায়, দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, শিকারী মাংসাশী, সুরাপায়ী, সৈনিক, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ছিল। বলিষ্ঠেরাই আবহাওয়ার কঠোরতা সহ্য করিতে পারিত। ভারতে, ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। যে-কেহ অধিক পরিমাণে সুরাপান করিত কিংবা আহার করিত এবং প্রচণ্ড ব্যায়াম-চর্চ্চায় আমোদ পাইত, তাহারা দেশের উত্তাপে ধরাশায়ী

হইতে লাগিল। যাহারা দুর্ব্বল, যাহারা সাবধানী তাহারা দেশের জলবায়ুর সহিত বনিবনাও করিয়া চলিতে লাগিল।

নূতন দৈহিক গুণের সঙ্গে সঙ্গে, নূতন নৈতিক গুণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত শীর্ণ ও কোমল দেহের মধ্যে, অপেক্ষাকৃত কোমল আত্মা অবস্থিতি করে। নিষ্ক্রিয় ও শান্ত ধরণের অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে যে চরিত্র উৎপন্ন হয়, তাহা তেমন রুদ্রভীষণ নহে। তাই শীঘ্রই নমনীয়তা ও চতুরতা তাহার স্থান অধিকার করিল। সংগ্রামে ও শ্রমে যে জাতি অভ্যস্ত ছিল তাহাদের মধ্যে হঠাৎ আলস্য ও বিরাট্ ধরণের অলৌকিক দৃশ্য-দর্শী উদ্ভট্ কল্পনা আসিয়া আবির্ভূত হইল।

একটা সাধারণ নির্ব্বাচন-প্রকরণ দ্বারা ভারতীয় জাতিদিগের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, সেই পরিবর্ত্তনে উহাদের সম্মিলন সম্ভব হইয়াছিল। গঙ্গার উপত্যকা প্রদেশে, শীঘ্রই জাতির একটা সাধারণ ছাঁচ আবির্ভূত হইল—সেই ছাঁচের জাতিই হিন্দুজাতি।

তথাপি, মানবজাতিমূলক উপাদানগুলি এরূপ বিসদৃশ ছিল যে, সেই সমস্ত উপাদান কখনই মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায় নাই। এই উপাদানগুলি প্রথমে পাশাপাশি অবস্থিত ছিল,—তারপর তাহার মধ্য হইতে একটি শ্রেণী-পরম্পরা বা শ্রেণীর সোপান গড়িয়া উঠিল। শীর্ষদেশে,—একদিকে রাজায় পরিণত প্রধানেরা, অপরদিকে পুরোহিত বা ব্রাহ্মণগণ। অধোদেশে—বিভিন্ন ব্যবসায়ের বিভিন্ন দলবদ্ধ সমাজ, স্থাবর বা যাযাবর শাখাজাতিগণ, গ্রামসমূহ, আর্য্য ও দ্রাবিড়ীয়দিগের গোত্রবৃন্দ—বিভিন্ন ব্যবসায়ের পদগৌরব-অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ। সবশুদ্ধ ধরিতে গেলে এই পদ্ধতিটি অতীব জটিল ও খুব সাদাসিধা। অতীব জটিল,—কেননা, সমস্ত লোকসঙ্ঘ ছোট ছোট স্বাধীন জাতিতে—এমন কি বৈরী জাতিতে বিভক্ত। খুব সাদাসিধা,—কেননা অন্যদেশের লোকের মধ্যে যেরূপ বিচিত্র ধরণের সমাজ-গঠন আছে—সেই জায়গায় ভারতে শুধু একটিমাত্র সামাজিক গঠন দেখিতে পাওয়া যায়ঃ যথা, অন্যদেশে—'ষ্টেট্', 'চর্চ্চ্', সামাজিক শ্রেণী, শাসনকার্য্য-নির্ব্বাহ, 'মেজিষ্ট্রেট,' 'পুলিস', 'ব্যবসায়-সঙ্ঘ', ভবিষ্যসংস্থান ও ঋণদানের প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। ভারতে এই সকল ব্যবস্থা যে একেবারেই ছিলনা তাহা নহে। পরন্তু উহা ক্ষণিক ধরণের একটা গৌণস্থান অধিকার করিত এবং উহার অধিকাংশই বৈদেশিক প্রভাবাধীনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্ম বর্ণভেদ-প্রথার সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে এবং এই বর্ণ-ভেদ প্রথার দরুণ ভারতে কোন একটা পৃথক রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতি কখনই হয় নাই।

যখন বর্ণভেদ-প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হইতেই ভারতের একটা সভ্যতা ছিল। ভারত শুধু একটা ভৌগোলিক শব্দে পর্য্যবসিত ছিল না, পরন্তু উহার একটা রাষ্ট্রনৈতিক অর্থ ছিল। বিভিন্ন উপজাতির বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের বৈরিতা সত্ত্বেও, সমগ্র ভারতে একই রকমের ধর্ম্মতত্ত্ব ছিল,

একই রকমের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গঠন-ব্যবস্থা ছিল। এই সকল ধর্ম্মতত্ত্ব, এই প্রকার সামাজিক গঠনপদ্ধতি ভারতেরই নিজস্ব—অন্য কোন দেশে উহার সমান কিছুই ছিল না।

সেই একই সময়ে অচলিষ্ণু স্থাবর জীবন-যাত্রা-প্রণালী শ্রম-বিভাগ আনয়ন করিল। প্রত্যেক জাতের এক-একটা বিশেষ ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইল। এই কৌলিক ব্যবসায়ের সহিত যাহাদের চরিত্র ও বুদ্ধি বেশ খাপ খাইয়াছিল, তাহাদেরই শ্রীবৃদ্ধি হইল। অন্য লোক এই জাত হইতে বহিষ্কৃত হইল, এবং দৈন্যদশায় পড়িয়া প্রাণ হারাইল। পিতামাতার দ্বারা বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হইয়া উক্ত ভাগ্যবান লোকদিগের সন্তান, স্বকীয় চির-অভ্যস্ত নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিল; একটা বিশেষ রকমের শিক্ষা উহাদিগকে একটা বিশেষ রকমের মানসিক শক্তি প্রদান করিল। পুরুষ-পরম্পরায় ব্রাহ্মণ অধিকতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অধিকতর ক্ষত্রিয়, কারু অধিকতর কারু এবং কৃষক অধিকতর কৃষক হইয়া উঠিল।

এই প্রকার সামাজিক গঠনের পরিণাম প্রথমে বিশেষ-করিয়া ধর্ম্মে প্রকটিত হইয়াছিল। আর্য্যদিগের ধর্ম্মপদ্ধতি পারিবারিক ও লৌকিক ধরণের ছিল। পরিবারের মধ্যে পিতা ব্যতীত অন্য কোন পুরোহিত ছিল না, এবং সকল পিতাই পৌরোহিত্য করিত। ইহার বিপরীতে, বর্ণভেদ-প্রথা হইতে, নিছক্ পুরোহিত-পদ্ধতি, গুহ্যতন্ত্রের ধর্ম্মমত উৎপন্ন হইল। পক্ষান্তরে নবযৌবন-সুলভ নববলে বলীয়ান আদিম আর্য্যগণের ধর্ম্ম সাদাসিধা ও জোরালো ধরণের ছিল: আর্য্যদিগের দেবতারা সুরামত্ত, যোদ্ধা, কিন্তু পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য-সমন্বিত প্রসন্নপ্রকৃতি, সাহসী, বন্ধুবৎসল, ও ভক্তের সহায় ছিলেন। ঐ ধর্ম্ম, শিশুর মতো সরল: অমর ও নরগণ সমকক্ষের মতো, প্রায় বন্ধুর মতো, পরস্পরের উপকার সাধনে নিরত। মানুষ শস্য বপন করিতেছে, দেবতারা উহা অঙ্কুরিত করিতেছেন। দেবতাদিগেরও কি ময়দা চাউলের প্রয়োজন ছিল না? যজ্ঞের বলি না খাইলে দেবতাদের বলবীর্য্য ও প্রফুল্লতা কোথায় থাকিত? নির্ব্বাচনের ফলে ব্রাহ্মণেরা যখন একটা সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণিক মানসিক প্রকৃতি লাভ করিলে তখন আর্য্য দেবতারা উঁহাদের নিকট নিতান্ত বৈষয়িক ধরণের ও নিতান্ত মানুষের মতো মনে হইল। উহারা যজ্ঞকে দেবতাপদে বরণ করিল; দেবতারা যজ্ঞের বলির দ্বারা পুষ্টিলাভ করিতে লাগিলেন; ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্যা সিদ্ধান্ত করিলেন, অভাবই জগতের মূল কারণ, এমন-কি জগতের স্বরূপ; পৌরোহিতিক মন্ত্রে যে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা আছে, দেবতারা সেই ব্রহ্মের বাহ্য বিকাশমাত্র, এমন কি অলীক অবভাস মাত্র। এবং ঐ একই পরিণাম ভারতের দর্শনে ও সাহিত্যেও প্রকটিত হইয়াছিল; কেবল ব্রাহ্মণ এবং কতকগুলি রাজ-বংশের লোক ছাড়া দর্শন ও সাহিত্য-চর্চ্চায় কাহারও অধিকার ছিল না! দর্শন ও সাহিত্যের লোক-সাধারণ লক্ষণ একেবারেই বিনষ্ট হইয়াছিল। চতুষ্পাঠীতে একটা বিশেষ ধরণের চিন্তা করিবার

পদ্ধতি ও বাক্য-রচনা-রীতির শিক্ষা দেওয়া হইত; যাহারা ভিন্নরূপে চিন্তা করিত, তাহারা পাষণ্ড এবং যাহারা ভিন্নরূপে বাক্য রচনা করিত, তাহারা মূর্খ ও নির্গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত। সকলেই কতকগুলি বিশেষ গুণ অর্জ্জন করিবার জন্য প্রযত্ন করিতে লাগিল, ঐ গুণগুলি ক্রমশ পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট পরে অতিবর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে অবনতিগ্রস্ত হইল।

এইরূপে, প্রাচীন যুগের শেষ শতাব্দিগুলির মধ্যে ভারতের উত্তর প্রদেশে একটি ভারতীয় জাতি এবং সমস্ত ভারতে একটি ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# বিসর্জ্জনী

মিশ্র ভীমপলশ্রী—একতালা

হায়, দেখিতে দেখিতে নিমেষে চকিতে
সুখের তিন দিন গেল গো—গেল চলে।
সব আনন্দ আজি নিরানন্দময়,
বিসর্জ্জন আঁখিজলে;
আমার উমাধনে বিদায় দিয়ে, কেমনে বাঁধি হিয়ে
থাকি কি নিয়ে, হায়রে, হিম অচলে॥

আয়্ মা আমার তেম্‌নি কোরে, গলা ধরে
বস্‌রে এসে হেসে মার কোলে;—
মা মাঁ বলি প্রাণ্ জুড়িয়ে ডাক্ তেমনি মধুর বোলে।
সে রাগিণী ধারে গলাবে তুষারে,
ভরে যাবে ক্ষুধা; সম্বল সুধা
সঞ্চিত রবে চিত-অতলে॥

রচনা ও সুর—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

স্বরলিপি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলি।

# স্বরলিপি

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ০ | | | ১ | | | |
| গা | -মা- | পা | II | মা | জ্ঞা | রা। | সা | সা | সা। |
| হায়্ | ০ | ০ | | দে | খি | তে | দে | খি | তে |

\+ ২ ৩ ০
I ন্‌সা রজ্ঞা ঋা। সা সা রসণ্‌া। ণা্‌ সা গা।
নি০ মে০ যে চ কি তে০ সু খে র

১ + ২ ১
। গা গা গা I মা গা মা। পা -া পমা। -গা গা মা।
তি ন দি ন্‌ গে ল গো ০ ০০ ০ গে ল

\+ ৩
I পা পা -মজ্ঞা। -া জ্ঞমা -পা II
চ লে ০০ ০ হায়্‌ ০

০ ১ +
II { মা পা মা। জ্ঞা জ্ঞা মা I পা না না।
সব আ ন ন্দ আ জি নি রা ন

৩ ০ ১ +
। র্সা র্সা র্সা। না না র্সা। র্সা র্রজ্ঞা র্মজ্ঞা I -র্রর্সা র্রর্সা -র্সা।
ন্দ ম য় বি স র্জ্জ ন আঁ০ ০০ ০০ খি০ ০

৩ ৩ ০ ১
। ( না র্সা -া ) । না র্সা ননা। { র্সা র্সা -া। র্সা র্সা -া।
জ লে ০ জ লে আমার্‌ উ মা ০ ধ নে ০

\+ ৩ ০ ১
I র্সা র্সা -া। র্সা র্সা -া। ণা র্স্ণা ণা। -া ধা ধা।
বি দায়্‌ ০ দি য়ে ০ কে ম নে। ০ বাঁ ধি

\+ ৩ ০ ১
। পা পা -ধা। -া -া -া } । ণা র্সা ণর্সা। -র্রা -র্সা ণা।
হি য়ে ০ ০ ০ ০ থা কি কি০ ০ ০ নি

\+ ৩ ০ ১
। ণধা পা -া। মধা -পা গমপধা। পমগা গা গা। মা পা পা।
য়ে০ ০ ০ হায়্‌ ০ রে০০০ ০০০ হি ম অ চ লে

\+ ৩
। মজ্ঞা -া -া। -া জ্ঞমা -পা II
০০ ০ ০ ০ হায়্‌ ০

০ ১ +
II সা -া সা । সা ণা -া I সরা -জ্ঞা জ্ঞা ।
আয়্ ০ মা আ মার্ ০ তেম্ ০ নি

৩ ০ ১ +
। রা জ্ঞা -া । রা মজ্ঞা -া । রা সা -া । রা -া জ্ঞা ।
কো রে ০ গ লা০ ০ ধ রে ০ বস্ ০ রে

৩ ০ ১ +
। মা পা -া । মা জ্ঞা -া । সরা -জ্ঞা রা । সা -া -া ।
এ সে ০ হে—সে ০ মার্ ০ কো লে ০ ০

৩ ০ ১ +
। -া -া -া । পা -া মা । -জ্ঞা জ্ঞা মা । পা -না না ।
০ ০ ০ মা ০ মা ০ ব লি প্রা ০ ণ্

৩ ০ ১
। না র্সা র্সা । না -া না । র্সা নর্সা র্রজ্ঞা ।
জু ড়ি য়ে ডাক্ ০ তে ম নি০ ০০

+ ৩ ০ ১
। র্রা র্সা -া । নধা -া ণা । র্সা -া -া । -া -া -া ।
ম ধু— ০ র০ ০ বো লে ০ ০ ০ ০ ০

+ ৩ ০ ১
। না না না । র্সা র্সা র্সা । ণা -া ধা । পা পা ধা ।
ভ রে যা বে ক্ষু ধা স ০ স্ব ল সু ধা

+ ৩ ০ ১
। ণা -সা ণা । ধা পা মা । জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । মা পা -া ।
স ০ ঞ্চি ত র বে চি ত্ত অ ত লে ০

+ ৩
। মজ্ঞা -া -া । -া জ্ঞমা -পা II II
০০ ০ ০ ০ হায়্ ০

# বার্ত্তা

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "সম্ভবামি যুগে যুগে"; কিন্তু বলিয়াছেন, দুষ্কৃতদিগের বিনাশের জন্য ও সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য।

এই কথাটি আমরা ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব।

যে মানব-চরিত্র লইয়া ইতিহাস, তাহা বিশেষভাবে দেখিলে দেখিতে পাই যে, তাহা দুইটি জিনিষের উপর নির্ভর করিতেছে—ভাব ও তাহার অনুভূতির জন্য স্নায়ু-সমষ্টি (nerves)। এই ভাবের অবস্থান্তর-অনুসারেই স্নায়ুসমষ্টির জীবন-মরণ; এবং উপরোক্ত স্নায়ু-সমষ্টির অবস্থানুসারে ভাবের উপলব্ধি, অনুপলব্ধি, এবং ভাবোপলব্ধি দ্বারাই স্নায়ু-সমষ্টির জীবন, এবং তাহার অভাবেই তাহার মৃত্যু।

যদি কোনও উপায়ে স্নায়ুসমষ্টির উৎকর্ষ-সাধন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহার উৎকৃষ্টতর ভাবের উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং তাহাতে জীবনেরও উৎকর্ষ সাধন হইবে! ঐরূপে স্নায়ুসমষ্টির অপকর্ষ হইলে সমস্ত ভাব-রাজ্যের মধ্যে তাহারা অপকৃষ্ট ভাবমাত্র গ্রহণ করিতে পারিবে এবং ঐ সমস্ত অপকৃষ্ট ভাব গ্রহণ, সৃষ্টি ও পুষ্টি দ্বারা জীবনের অধোগতি সাধন করিবে।

আবার, উৎকৃষ্ট ভাব-সংযোগে স্নায়ুসমষ্টির উন্নতি, যেমন অপকৃষ্টভাব সংযোগে তাহাদিগের অবনতি।

এইরূপে দেখিতেছি, ভাব ও স্নায়ুসমষ্টি কিরূপে ও কতদূর অন্যোন্যমুখাপেক্ষী। যেন বীজাঙ্কুর ন্যায়। আমাদের দেশে জাতিভেদের ও ইয়োরোপে Nitzscheর Superman Theory ও Galtonএর Eugenics Theoryর ভিত্তিতে এই ভাব বর্ত্তমান!

ভাব ও স্নায়ুসমষ্টির দ্বারা শুধু যে মানব-চরিত্র গঠিত, তাহা নহে, তাহাদেরই উপর মানবের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

এই সত্যের উপলব্ধি করিয়াই প্রাচীন ইহুদি ঋষি ডিউটরনমি পুস্তকে মহাত্মা যীশু বলিয়াছেন:—Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. এই সত্যই কর্ম্মবীর নেপোলিয়নের মনে আর একরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল—Imagination rules the world. ইহাই আমরা ক্রমে দেখিব।

* * *

এই ভাব জিনিষটা কি?

আপাততঃ আমরা বলিব যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা-নিচয়ের সম্বন্ধে ও সম্পর্কে আমাদের অভিমতকেই আমরা ভাব বলি। আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটি স্ফুটতর হইবে।

প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে ইহ-সংসারে মানব-অভিজ্ঞতার মধ্যে যাহা কিছু দেখি, সে সমস্তই আপেক্ষিক, সমস্তই পারিপার্শ্বিক অবস্থা-নিচয়ের বশবর্ত্তী। পারিপার্শ্বিক অবস্থাই সকলকে তাহার বিশেষ গঠন দেয়।

আমরা ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হিন্দুদর্শনের দুই-একটী কথার মধ্যে দেখিতে পাই—যথা, ঘটাকাশ, পটাকাশ। মহাকাশ পারি-

পার্শ্বিক অবস্থার ঊর্দ্ধে। কিন্তু তন্নিম্নস্থ সমস্ত প্রকার আকাশই পারিপার্শ্বিক অবস্থার একান্ত বশবর্ত্তী। একপ্রকার ঘটের মধ্যস্থিত আকাশ অন্যপ্রকার ঘটের মধ্যস্থিত আকাশ হইতে ভিন্ন। ঘটের নাশে ঘটাকাশের নাশ, ইত্যাদি। ঘটের অস্তিত্ব, অবস্থান, আকার, প্রকারের উপর ঘটাকাশের অস্তিত্ব, অবস্থান, আকার-প্রকার একান্ত নির্ভর করিতেছে। বস্তুতঃ সত্ব এক হইলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভেদেই রূপের প্রভেদ হয়, এবং রূপের প্রভেদ অবলম্বন করিয়াই নামের প্রভেদ।

আবার দেখি যে পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয় নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল। অধিকক্ষণ ধরিয়া তাহারা এক বা এক অবস্থায় থাকে না। তজ্জন্য তাহাদের উপর যাহা-কিছু নির্ভর করে, তাহারাও তাহাদের সহিত তাহাদেরই অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই সত্য আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে। পর-পরবর্ত্তী কোন দুই ক্ষণ ধরিয়া কোন জিনিষ এক থাকেনা। এই এক দিক দিয়া দেখিলে "সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং" এই বৌদ্ধভাবনার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে।

সৃষ্টিপ্রবাহ যেন অনাদি অনন্ত এক নদীর মত অনন্তকাল ধরিয়া বহিয়া চলিয়াছে। তাহার বক্ষে বুদ্বুদ, ফেন, ঘুর্ণী, তরঙ্গ—সব নদীগর্ভের আকার, তট, বায়ু ইত্যাদি দ্বারা জনিত হইতেছে। জল এক হইলেও তাহাতে এইরূপ কতপ্রকার বিভিন্নরূপের অভিব্যক্তি হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন শক্তির সমবায়ে কত-প্রকার রূপের আবির্ভাব।

এই কথায় মানব-সমাজের সম্বন্ধে আর

তরঙ্গাদি স্বতঃই হয় না, তাহারা হেতুবিহীন নহে; তাহাদের হেতু হইতেছে নদীগর্ভের বিষমতা, তট, বায়ু প্রভৃতি এবং ইহাদের প্রত্যেকের সহিত জলের ঘাতপ্রতিঘাত, সংঘর্ষ, বিরোধ, বিদ্রোহ।

মানব-সমাজেও ঠিক এই সত্য দেখিতে পাই। মানব-সমাজের এইরূপ ঘাতপ্রতি-ঘাতেই ঘটনাবলীর উদ্ভব হয়। এমন কি আমরা সাধারণতঃ যে "মতামত" বলিয়া থাকি, তাহাতেও এই বিরোধের মূর্ত্তিই দেখিতেছি!

সত্য সত্যই আমরা জীবনী-শক্তির অভাবের দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলে বলিয়া থাকি, গড্ডলিকাপ্রবাহ বা শৃগালের রব—অর্থাৎ যে স্থানে কোনরূপ চিন্তা বা বিচার না করিয়া কোনও মতের অনুমোদন বা কার্য্য করা হয়। জীবনী শক্তির অস্তিত্ব ও প্রভাব প্রকট হয় বিরোধে। বিরোধ দেখিলেই বুঝিব সেখানে জীবনী-শক্তি আছে।

তাহা হইলে কি ইহার বিপরীত কথাটিও সত্য যে জীবনের শক্তি থাকিলেই বিরোধ অবশ্যম্ভাবী? নিশ্চয়ই। "বিরোধ" অর্থে মতের প্রভেদ। তাহা অল্পবিস্তর হইতে একান্ত প্রভেদ পর্য্যন্ত হইতে পারে। প্রভেদ ভিন্ন সংসার যে হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। এমন কোন দুইটী দ্রব্য বা লোক বা পশু নাই যাহারা গঠনে এক। এমন দুইটী লোক নাই, যাহাদের কোনও বিষয়ে মত ঠিক এক! প্রভেদ, বিচিত্রতা ভিন্ন সংসার হইতে পারে না।

এই স্থানে সমাজের গতি সম্বন্ধে একটী হেত্বাভাসের কথা বলা ভাল। অনেকে

সমবায়ে। তাহা ঠিক নহে। সমাজ গাড়ীর মত নহে, যে দুইটী ঘোড়ার শক্তি ঠিক একদিকেই নিয়োজিত হইয়া গাড়ীটিকে একদিকে লইয়া যাইবে! সমাজের গতি একমুখী শক্তি-সমূহের সমবায়ে নহে—তাহা বিভিন্ন শক্তির resultant of forces, সে শক্তিগুলি মোটমাট একদিকে বটে। সমাজের এইরূপ লক্ষ্যাভিমুখে আকর্ষণ সত্যসত্যই বিকর্ষণের ফল।

কিছুকাল এইরূপ চলে। সমাজের গতি সকল শক্তিগুলি দ্বারাই নিয়মিত হয়। কিন্তু ক্রমে এই সমস্ত শক্তি সঙ্ঘে সঙ্ঘে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এবং তখন দেখা যায় এক সঙ্ঘের সহিত অপর সঙ্ঘের প্রভেদ বা বিরোধ বাড়িয়া চলিয়াছে। তখন উভয় সঙ্ঘের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তখন সেই বিরোধের ফলে হয় পুরাতন পন্থা, বা প্রথা বা মতে সমাজ দৃঢ়তররূপে নিবদ্ধ হইতে পারে, বা তাহা অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, বা সে সমস্ত পরিত্যাগ করিতে পারে, কিম্বা হয়ত কোন পুরাতন পন্থাদির পুনরুদ্ভাবন করিয়া, তাহারই অনুযায়ী আপনার কায়া ও তন্ত্র গঠন করিয়া লইতে পারে।

কিন্তু ইহার অর্থ নহে যে সমস্ত পুরাতনকে পরিবর্জ্জন করিয়া একেবারে আমূল নূতন করা হয়। যে কোনও ক্ষণেই আমরা সমাজকে দেখি না কেন, তাহা আদি কাল হইতে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত সময়ের পুঞ্জীভূত ফল। তাহাকে একেবারে ত্যাগ করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না! তাহাকেই অবলম্বন করিয়া পরিবর্জ্জন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধিত হয়! বর্জ্জনীয়, অনিষ্টকর পদার্থের পরিবর্জ্জন ও প্রয়োজনীয় পদার্থের গ্রহণ ও স্বশরীরের সহিত একীকরণ লইয়াই সমাজ-শরীর জীবিত থাকে—Biologyতে যেরূপ Anabolism ও Katabolism দেখিতে পাই। আকর্ষণ বিকর্ষণ, জন্ম, মৃত্যু, গড়া, ভাঙ্গা এই দুইয়ের খেলা চলিতেছে।

দেখিলাম যে এই প্রক্রিয়ার একদিক বর্জ্জন, অপর দিক গ্রহণ। এই বর্জ্জন দ্বারাই আবর্জ্জনা দুর হইয়া সমাজশরীর শুদ্ধ ও সুস্থ হয়। এই শুদ্ধতা ও স্বাস্থ্য গতিশীল সমাজের পক্ষেই সম্ভব; যে সমাজ একান্ত স্থিতিশীল তাহার পক্ষে নহে। এই সত্যই দেখিতে পাই, শঙ্করাচার্য্যের উপনিষৎ ভাষ্যে—"ন হ্যচলতঃ শুদ্ধিরস্তি। দোষনিরসনং চলতো হি দৃষ্টং ন স্থিরস্য।" কিন্তু আবার দেখিতেছি যে এই গতি-শীলতার মধ্যে স্থিতিশীলতা বর্ত্তমান।

এই গতিশীলতার মাত্রা আছে। ক্রম-বিকাশের নিয়ম এই যে সমস্ত গতিই এত অল্প মাত্রায় হয় যে, মানবের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। পর-পরবর্ত্তী দুই ক্ষণ লইলে বিশেষ কোন গতি বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু দুই ক্ষণের মধ্যে কিছু ব্যবধান থাকিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

ইহাই হইল ক্রমবিকাশের সাধারণ নিয়ম। কিন্তু সময়ে সময়ে এরূপ দেখা যায় যে কোনও কারণে কিছুকাল ধরিয়া আবর্জ্জনা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন হইল না, ক্রমে জমিতে লাগিল। সমাজের গতি ও শ্বাস-রোধের উপক্রম হইল। হঠাৎ হয় ত

এক রূঢ় উদ্যম আসিয়া সমাজ-শরীরকে সঞ্জীবিত করিয়া তীব্রবেগে দূরে সেই বহুকালসঞ্চিত আবর্জ্জনারাশিকে নিক্ষেপ করিয়া শুদ্ধ হইয়া আবার স্বীয় লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইল।

এই বেগে সমাজ-শরীর ক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। বহুকাল-সঞ্চিত বহুজন-পূজিত অনেক সংস্কারাদি রূঢ়ভাবে স্থান-চ্যুত হয়, এবং এই ক্ষোভ শুধু যে পার্শ্ববর্ত্তী সমাজসমূহকে প্রভাবিত করে, তাহা নহে। এমন কি ইহার তরঙ্গ ও কম্পন সমস্ত পৃথিবীতে পরবর্ত্তী শতাব্দী বা ততোধিক সময় ধরিয়া প্রভাবিত করিয়া, চিরকালের জন্য মানব-সভ্যতার উপর আপন মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া দিতে পারে। এই বেগ তীব্র ও বহু-সংস্কার-দ্রব্যাদি-বিনাশকারী বলিয়া মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং "বিদ্রোহ", "বিপ্লব" "অস্বাভাবিক" "অনৈসর্গিক" প্রভৃতি ভয়োৎপাদক আখ্যাও লাভ করে।

কিন্তু সংসারে প্রকৃতপক্ষে "অনৈসর্গিক" বা "অস্বাভাবিক" বলিয়া কিছুই নাই, যাহা নিসর্গ-শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে হইতে পারে। পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের তীক্ষ্ণ রশ্মি,জলবাহী কৃষ্ণমেঘ,উপকারী ওষধি, বিষ-লতা, মলয় পবন, গ্রীষ্মের উত্তপ্ত নিশ্বাস সমস্তই নৈসর্গিক, সমস্তই স্বাভাবিক। পিতৃভক্ত পুত্র ও পিতৃহন্তা পাষণ্ড, বীর ও কাপুরুষ, ভাল ও মন্দ উভয়েই স্বাভাবিক। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, একের পক্ষে একপ্রকার নৈসর্গিক শক্তি কার্য্য করিয়াছে, অপরের পক্ষে অপর প্রকার। [illegible] অনেক সময় নামকরণও যতটা

আমাদের মানসিক ভাবের উপর নির্ভর করে, ততটা তাহাদের বস্তুতার উপর নহে। যেমন আমাদের বুদ্ধি, হৃদয়, নীতিজ্ঞান বা স্বার্থের উপর যদি কেহ বা কোন বস্তু বা ঘটনা রূঢ়ভাবে আঘাত করে, তাহা হইলে আমরা তাহাকে "মন্দ" বলি। ইহাও দেখা যায় যে একই লোক বা বস্তু বা ঘটনাকে একই দেশে একই কালে একজন বলিতেছে ভাল, অপরজন বলিতেছে, মন্দ! বস্তুটি কিন্তু এক।

আর একটী হেত্বাভাসের কথা বলিব। সাধারণের বিশ্বাস যে বিদ্রোহ অস্বাভাবিক ও ভীষণ। বস্তুতঃ বিদ্রোহ অস্বাভাবিকও নহে, ভীষণও নহে। বিদ্রোহটা কি? সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে দেখিতে পাই একটী জিনিষ—জীবনের প্রচেষ্টা। এই জীবনের প্রচেষ্টা প্রতি-নিয়তই বিরুদ্ধ-শক্তির সহিত সংগ্রাম করিতেছে। এই সংগ্রামের শেষ নাই, সন্ধি নাই। এই সংগ্রাম প্রত্যহই মৃদুভাবে চলিতেছে। কিন্তু যখন উপরোক্ত কারণে এই বিদ্রোহ তীব্রভাবে প্রকট হয়, তখনই আমরা বিশেষভাবে দেখি! তখন আমরা বিরুদ্ধ শক্তির চাপে বিব্রত হইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়ি এবং তাহার ফলেই এক অমানুষিক উদ্যম করি। তাহার ফলও হয় আমাদের মুক্তি বা আমাদের বিনাশ। এই বিদ্রোহই জীবন-সংগ্রামের কঠোরতম অভিব্যক্তি।

বিদ্রোহ যে ভীষণ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সংসারে এমন কোন-কিছু নাই, যাহা একজন না একজনের কাছে বিরক্তিকর বা ভীষণ। সে হিসাবে, এ-স্থলে আবর্জ্জনারাশির নিকট বিদ্রোহ যে ভীষণ বলিয়া প্রতিভাত হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি!

এই বিদ্রোহের ফল, যে গতিরুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার মুক্তি। এই গতি অর্থে হয়ত জন্ম বা গঠন, কিম্বা বিনাশ বা মৃত্যু। কিন্তু যেরূপ পূর্ব্বে বলিয়াছি দুইই স্বাভাবিক। আমরা দেখি যে বিনাশ ভিন্ন গঠন হয় না। মৃত্যুর মধ্যেই জীবনের বীজ উপ্ত। বীজের মৃত্যু না হইলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। অঙ্কুরের মৃত্যু না হইলে বৃক্ষের উৎপত্তি হয় না। জন্মের জন্য মৃত্যু অত্যাবশ্যক। মৃত্যু অনিষ্টকর নহে। যে স্থলে বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থায় যাইতে পারিব, সে স্থলে মৃত্যুই অমৃত, মৃত্যুই শিব। এইজন্য আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সহিত রুদ্রও এক হইয়া আছেন।

কিন্তু কেহ হয় ত বলিবেন, এই গতির ফল সব সময়েই কি ঊর্দ্ধে? তাহা নহে। সময়ে সময়ে অধোগতিও দেখা যায়। কিন্তু ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম। কেহই অপরিচ্ছিন্ন ভাবে একদিকে যায় না। বেলাভূমি সমুদ্র-বীচির ন্যায় একবার অগ্রগতি, একবার পশ্চাদ্গতি। কিন্তু শেষ ফল দেখি সমুদ্র অল্পে অল্পে বেলাভূমিকে গ্রাস করিতেছে।

সমাজও ঐরূপ একবার ঊর্দ্ধগতি, একবার অধোগতি করিয়া শেষফলে ঊর্দ্ধগতিই লাভ করে।

আবার আর একদিক হইতে আমরা সমাজের এই গতির বিচার করিতে পারি—কথনও এই গতি ব্যক্তি ও তাহার স্বার্থের পুষ্টিসাধন করিয়া সমাজ ও তাহার স্বার্থকে খর্ব্ব করিয়া দেয়। কখনও বা সমাজের ও তাহার স্বার্থের জয়-ঘোষণা করিয়া ব্যক্তি ও তাহার স্বার্থকে সমাজেরই উন্নতির কার্য্যে নিয়োগ করে।

কিন্তু এই গতি যে প্রকারেরই হউক না কেন, কখনও একস্থলে স্থির হইয়া নাই, এক দিকে না একদিকে নিরন্তরই চলিতেছে। কিন্তু সাধারণতঃ ইহা মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কেবল যখন এই গতি বিশেষ প্রবল হইয়া ওঠে বা বাধা প্রাপ্ত হয়, তখনই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

এইরূপে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার কারণ সমাজ-জীবনে প্রত্যহই আসে না। কিছুকাল ধরিয়া সমাজের জীবন বেশ ধীরে-সুস্থেই চলিতে থাকে। সবই বেশ শান্তিতে, সামঞ্জস্যের সহিত চলে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; প্রতিদিনই সমাজ-শরীরে বর্জ্জনীয় বস্তুর উৎপত্তি হইতেছে। সে উৎপত্তি হইতেছে নূতন বস্তুর সৃষ্টির দ্বারা নহে; সমাজ-শরীরেই সে বস্তু পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান। পূর্ব্বে তাহার যখন সময় ছিল, তখন সে বস্তু সমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল, এবং অনেক প্রকারে সমাজের জীবনে উন্নতি ও শ্রীসাধন করিয়াছে। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনে তাহার যে শুধু উপকারিতা লোপ পাইয়াছে, তাহা নহে,—সে বস্তু এখন "অত্যাবশ্যক" হইতে "অতিবর্জ্জনীয়" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন তাহাকে সমাজ-শরীরে থাকিতে দিলে ক্রমে অবসাদ ও মৃত্যু আসিয়া সমাজকে আক্রমণ করিবে।

এইরূপ অতিবর্জ্জনীয় বস্তু সমাজ-শরীরে ক্রমে সঞ্চিত হইতে থাকে। তাহার কারণ কতকটা আলস্য, কতকটা বা শ্রেণী বা জাতি-বিশেষের স্বার্থ। কিন্তু আলস্যই হউক বা স্বার্থই হউক প্রকৃতি বা গণিত-শাস্ত্র কখনও কাহাকে

ভুলের বা দোষের জন্য ক্ষমা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। উক্তরূপে আবর্জ্জনা সঞ্চয়ের ফলে সমাজের জীবনের বেগ মন্দীভূত ও জীবনী-শক্তি হ্রাস হইয়া ক্রমে অরিষ্ট লক্ষণ দেখা দেয়।

এই বর্জ্জন করাটা কার্য্যে পরিণত হউক বা না হউক, এই সমস্ত অতিবর্জ্জনীয় বস্তুগুলির সমাজ-শরীরে অবস্থিতির জন্য একটা অস্বস্তি ও অস্বাস্থ্য প্রথমে অস্ফুটভাবে ও ক্রমে তীব্রতর ভাবে অনুভূত হয়। এই অনুভূতি-প্রসূত অভিব্যক্তিকে উপরোক্ত আলস্য, স্বার্থ প্রভৃতি কিছুকাল চাপিয়া রাখে। ক্রমে যখন এই অসন্তোষ তীব্রভাবে সমাজকে আলোড়ন করে, তখনই আমাদের দৃষ্টি, বিচার-শক্তি, স্বার্থ-চিন্তা প্রভৃতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়।

কিন্তু তখনও এই ভাব স্থির কোনও রূপ ধারণ করে না। একটা যেন অনির্দ্দিষ্ট বেদনা বা আকাঙ্খা মাত্র থাকে। ক্রমে এই ভাব ঘনীভূত হইয়া একটা শ্রেণী বা সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া কার্য্যকরী ভাবে ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করে। কিন্তু এই চেষ্টাও কিছুকাল ব্যর্থ হয়! ক্রমে এই ভাব আরও ঘনীভূত হইয়া উপর্য্যুপরি ব্যর্থতার তীব্র-তিক্ত রস-সংযোগে এক নূতন রূপ ধারণ করিয়া ব্যক্তি-বিশেষকে আশ্রয় করে, এবং যেন চুম্বকাকর্ষণে প্রথমে উপরোক্ত শ্রেণী ও ক্রমে সমস্ত সমাজই উক্ত ব্যক্তি-বিশেষের অধিনায়কত্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়।

তখন দেখিতে পাই যে এই ভাব উপরোক্ত ব্যক্তি-বিশেষে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু ইহারও কিছু বিশেষত্ব আছে।

প্রথমে যখন জনসাধারণের মনে উপরোক্ত অনির্দ্দিষ্ট বেদনার আভাস দেখা যায়, তখন দেখা যায় যে তাহা বিদ্রোহভাবপ্রসূত। যাহার বিরুদ্ধে এই ভাব জাগিয়াছে, তাহার বিনাশই ইহার উদ্দেশ্য। কারণ যে ঠিক কি, তাহাও বোধগম্য নহে, কেবল একটা অস্বস্তিই ইহার পরিজ্ঞাপক। কিন্তু যে ভাবের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বিনাশ, সে কখনও শুভফলপ্রদ হয় না।

এইজন্যই যতকাল এই বিদ্রোহ-প্রসূত বিনাশ-চেষ্টা মাত্র কার্য্য করে, তাহা ব্যর্থ হয় ও সমাজে গুরুতর আঘাত ও কষ্টমাত্র আনয়ন করে। কিন্তু এই বিপৎপাতেরও একটা শুভফল আছে, যেটা হইতেছে গৃহীত পন্থার ভ্রমদর্শন। ক্রমে ইহা উপলব্ধি হয় যে বিনাশ মাত্রে কিছু হয় না, গঠনও চাই। সমাজের কতক অংশ ক্রোধ লোভ মোহাদির বশবর্ত্তী হইয়া বিনাশমাত্রের জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। কিন্তু সমাজের অবশিষ্ট সকলেই—বিশেষতঃ দূরদর্শী ব্যক্তিগণ, গঠন ভিন্ন সমাজের কার্য্যের ও শক্তির সাফল্য দেখেন না। তাঁহারা দেখেন যে বিনাশ অত্যাবশ্যকীয় ও অতি-কর্ত্তব্য। বিনাশ দ্বারা কার্য্য আরম্ভ না করিলে শেষে কার্য্য ও সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ বিনাশকার্য্য তীব্রবেগে ও অনেক সময়েই নির্ম্মমভাবে করিতে হইবে। কিন্তু এই বিনাশকার্য্যের চরম উদ্দেশ্য গঠন। গঠন ভিন্ন বিনাশ সমাজের, মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে গুরুতর পাপ। ইহাতে অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল কখনও হইতে পারে না। পুরাতন অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, কিন্তু তাহার স্থলে নূতন ও সুদৃঢ় সৌধ নির্ম্মাণ করিবার জন্য।

আবার পুরাতন অট্টালিকা না ভাঙ্গিয়া ফেলিলে নূতন নির্ম্মাণ অসম্ভব।

যুগসন্ধিতে ভগবানের অবতার-স্বরূপ যে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, তিনিই এই বার্ত্তা বহন করিয়া আনেন। এই বার্ত্তার অর্দ্ধেক অর্থাৎ যাহা বিনাশযোগ্য, ধ্বংসোন্মুখ ক্রোধের সহিত তাহার বিনাশ—তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই সমাজে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। তিনি দেখেন যে বিনাশ অত্যাবশ্যকীয়, কিন্তু একা তাহা মৃত্যুর কারণ। তাহাকে প্রাণ দিতে হইলে, তাহাকে বস্তুতঃ পক্ষে প্রাণদ, শিবদ, সুন্দর করিতে হইলে এই সত্যের অপরার্দ্ধ আবশ্যক। তাহা হইতেছে প্রেমের সহিত গঠন। যাহা বিনাশযোগ্য তাহাকে ক্রোধের সহিত বিনাশ কর। এ ক্রোধ ভগবৎ-প্রেরিত। কিন্তু তাহার পরই বা তাহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমের সহিত ভবিষ্যতের জন্য গঠন কর। মানবের শান্তির নিমিত্ত, সুখের নিমিত্ত, উত্তরোত্তর উর্দ্ধে যাইবার নিমিত্ত। ইহাই অতীত ও ভবিষ্যৎ যুগের সন্ধিস্থলে সমাজের প্রতি ভগবানের অবতারের বার্ত্তা।

এই বার্ত্তাই সমাজের মধ্যে বিপ্লব আনিয়া সমাজের কায়া পরিবর্ত্তন করিয়া, আবার সমাজের মধ্যে নবজীবন সঞ্চারিত করিয়া দেয়। এই নূতন কায়া ও নবজীবনের তেজে সমাজ আবার আর এক যুগ কাটাইয়া দেয়। এই যুগের শেষে আবার উপরোক্তরূপে কায়া-পরিবর্ত্তন ঘটে। প্রতি যুগ-সন্ধিস্থলে ভগবানের এক এক অবতার আবির্ভূত হইয়া সেই সেই যুগোপযোগী বার্ত্তা প্রচার করিয়া সমাজের নবজীবন লাভের পন্থা প্রদর্শন করাইয়া দেন। সমাজ যখন নূতন উদ্যমে অবতারের অধিনায়কত্বে তাঁহার বার্ত্তা-প্রদর্শিত লক্ষ্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করে, তখনই আমারা সেই সামাজিক ক্ষোভকে বিপ্লব বলি।

এই বিপ্লবের পূর্ব্বার্দ্ধে যখন বিনাশকার্য্য চলে তখন দেখিতে পাই, কত স্বার্থে আঘাত লাগে, কত দৃঢ়নিবদ্ধ সংস্কার রূঢ়ভাবে আশ্রয়-স্থল হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, কত পুরাতন গঠন চূর্ণবিচূর্ণ হয়, কত উপাস্য মূর্ত্তি পীঠচ্যুত হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূলুণ্ঠিত হয়। তখন সর্ব্বত্রই ত্রাসের বিভীষিকা আবির্ভূত হইয়া যেন সমাজকে একবার ক্ষিপ্ত ও একবার অবসন্ন করিয়া ফেলে।

কিন্তু ইহারই পরে যখন গঠন-কার্য্য আরব্ধ হয়, তখন সমাজ-শরীরে ক্ষতগুলি আরাম হইয়া আসে। সর্ব্বত্র শান্তি দেখা দেয়। তখন সমাজে উর্দ্ধমুখী ভাবের আবির্ভাবে সর্ব্বত্রই একটা শুভ চিন্তা ও শুভচেষ্টা দেখা দেয়। তখন এই সমস্ত বিপ্লব একসঙ্গে দেখিলে বিনাশের আবশ্যকতা দেখিতে পাই। তখন গঠন দেখিয়া এই বিপ্লব যে চরমে সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত তাহা বুঝিতে পারি।

কিন্তু ইহা হইতেই আমরা বিনাশের আবশ্যকতা বুঝিতে পারি। বিনাশ গঠনের অগ্রদূত মাত্র। যদি বিনাশ না করিয়া কেহ গঠন করিতে চায়, তাহা হইলে নিষ্ফলতা এবং ভয়ানকতম বিনাশ সে যেন সাদরে আহ্বান করিয়া আনে। যেমন পূর্ব্বে বলিয়াছি যে পুরাতন জীর্ণ অট্টালিকা আছে, সেখানে যদি নূতন অট্টালিকা চাই, তাহা হইলে পূর্ব্বে পুরাতনের বিনাশ সাধন আবশ্যক। তাহার

পরে নূতনের গঠন। তাহা হইলে নূতনের পক্ষে সুদৃঢ় ও স্থায়ী হওয়া সম্ভব। তাহা না করিয়া যদি পুরাতনের জীর্ণ শীর্ণ স্কন্ধে নূতনের ভার চাপাইয়া দিই তাহা হইলে সে নূতন যতই যত্নের সহিত প্রস্তুত হউক না কেন, তাহা একেবারেই নিজের ও পুরাতনের অতিশোচনীয় পতনের কারণ হইবে। একমাত্র ঐ পূর্ব্বগামী বিনাশই পরবর্ত্তী ভয়ানকতর বিনাশের প্রতিরোধক।

এই সত্যের আভাস আমরা ঈশাবাস্তোপনিষদে পাই।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসংভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তম য উ সংভূত্যাং রতাঃ।
অন্যদেবাহুঃ সংভবাদন্যদাহুরসংভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥
সংভূতিং চ বিনাশং যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সংভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে॥

উপনিষদের শেষ-সিদ্ধান্ত—বিনাশের দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া অর্থাৎ মৃত্যু কর্ত্তৃক আমাদিগের অভিভূত হওয়া প্রতিরোধ করিয়া, গঠনের দ্বারা অমৃত ভোগ করি।

উপনিষৎ বলিতেছেন—যাহারা কেবল মাত্র বিনাশ প্রার্থনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই অন্ধ তমঃ লোকে প্রবেশ করে। কিন্তু তদপেক্ষাও গভীরতর তমঃ লোকে প্রবেশ করে তাহারা, যাহারা কেবলমাত্র গঠন চায়। কারণ, যেরূপ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পূর্ব্বে বিনাশ না করিয়া গঠন করিলে সে গঠন কেবলমাত্র মৃত্যুর কারণ হয়। ইহার কারণ—বিনাশের ফল এক, গঠনের ফল অন্য। যিনি বিনাশ ও গঠন এতদুভয়ের পার্থক্য, উদ্দেশ্য, প্রয়োগ, ফলাফল প্রভৃতি জানেন, তিনিই ইহাদিগকে যথোপযুক্তভাবে প্রয়োগ করিয়া বিনাশ দ্বারা মৃত্যুসম্ভাবনা রহিত করেন এবং তৎপরে গঠন দ্বারা অমর হয়েন। অর্থাৎ পূর্ব্বে বিনাশকার্য্য করিয়া পরে যে গঠন করেন, তাহা চিরস্থায়ী হয়।

আমাদের দেশের ধর্ম্মের ইতিহাস হইতে গুটিকতক দৃষ্টান্তের দ্বারা উপরিলিখিত তত্ত্বগুলি উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিব।

( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য )

শ্রীবিমলাচরণ দেব।

# পাপ।

পাপ কোথা নাই—গাহিয়াছে ঋষি, অমৃতের সন্তান,
গেয়েছিল—আলো বায়ু নদীজল তরুলতা মধুমান।
প্রেম দিয়ে হেথা শোধন-করা যে কামনার সোমরস,
সে রস বিরস হতে পারে কভু? হবে তা'র অপযশ!

সাগর যখন মন্থন করি' উঠিল অমৃত শশী,
দেব-দানবের ঈর্ষার জ্বালা তখনি উঠিল শ্বসি' ;
ছিল না যখন কোজাগর-শশী, ছিল না যখন সুধা,
ছিল না তখন রূপের পিপাসা, ছিল না তখন ক্ষুধা।

শশীপাশে রাহু, অমৃতে গরল—আদিম সে অভিশাপ—
তাই হ'তে শেষে লভিল জনম সুখ-পরিণাম পাপ ;
কলঙ্ক তবু করে কি আবিল শশধর-কররাশি ?
ওটুকু নয়ন-সলিল-বিহনে মধুর হ'ত কি হাসি ?

দানবের আশা বিফল করিতে দেবতা গড়িল ধরা,
লুকায়ে রাখিল অমৃত-ভাণ্ড, জীবনে আনিল জরা।
অজর হইতে চাহিল দানব, স্বরগে পাতিল থানা,
মানবের রূপে দেবতা ভরিল প্রেমের পেয়ালাখানা।

তবু সে ভুলিতে পারিল না আজো দানবের রোষ-ভয়,
ঈর্ষার জ্বালা এখনো দহিছে, ঘুচিল না সংশয় !
তবু চেয়ে থাকে স্বরগের পানে অমর-জীবন লাগি'
আপনারি মায়া মরণের ছায়া হেরিয়া সর্ব্বত্যাগী।

দানবের দল হাসে খল খল হেরি' তার পরাজয়,
যে প্রেম তাহারা ভুঞ্জিতে নারে, তারে তারা পাপ কয়,
যে মরণ তারা মরিতে জানে না, তাহারে গরল বলে,
জানে না গরল নীল হ'য়ে আছে মৃত্যুঞ্জিতের গলে।

কামনার মণি, বাসনার সোনা, আশার রতন-খনি—
জানে না জীবন কল্পলতিকা, ধরণী কি ধনে ধনী !
বেদনার মূলে বিকাইছে তাই নাম হ'ল তার পাপ !
এইটুকু দিতে তবুও কৃপণ, হায় এ কি অভিশাপ !

পাপ কারে বলে ? হৃদয়ে ফোটে যা' যৌবন-মধুমাসে ?
যার সৌরভে অবশ পরাণ কভু কাঁদে কভু হাসে ?
সাগরের মত আকুলি-ব্যাকুলি পূর্ণিমা-চাঁদ লাগি ?
যে তৃষা জুড়াতে চাহে এ হৃদয় পায়ে ধরি' কৃপা মাগি' ?

পাপের লাগিয়া ফুটিয়াছে হেন অতুল অবনীফুল ?
রসে রূপে আর সৌরভে যার চরাচর সমাকুল !
পরতে পরতে দলে দলে যার অমৃত-পরাগ-ভরা,
মধুহীন যারে করিবারে নারে শোক তাপ ব্যাধি জরা।

চিররোগী—সেও চাহে তার পানে, তৃষিত নয়ন দুটি ;
বুড়ারও অরদ অধরে মধুর হাসিটি উঠিছে ফুটি'।
হায় হায় করে চিরদুখী যেই, সেও কি ছেড়েছে আশা ?
বিমুখ হইয়া বসে' থাকে যেই—নাই তার ভালোবাসা।

পাপ কারে বলে ? সুখ-খুঁজে-ফেরা আঁধার কুটিল পথে ?
কে বলেছে তার ঘুচিবে না ঘোর, জাগিবে না কোনো মতে ?
আছে তারো শোভা, আঁধারের বিভা—সেও যে অমৃতরস—
দেবতাত্মার অগতি কোথায় ? সকলি তাহার বশ।

ত্যাগ নহে, ভোগ,—ভোগ তারি লাগি,' যেইজন বলীয়ান্,
নিঃশেষে ভরি' লইবারে পারে, এত বড় যার প্রাণ।
যে জন নিঃস্ব, পঞ্জর-তলে নাই যার প্রাণধন,
জীবনের এই উৎসবে তার হয় নি নিমন্ত্রণ।

কত যুগ কত জনম ধরিয়া কত হাহাকার করি'
ধরণী-মাতার স্তন সে আঁকড়ি' তুলিবে অধরে ধরি',
স্পন্দিত হবে স্তব্ধ হৃদয়, ক্রন্দন করি' শেষে
জুড়াবে জীবন, অজানা হরষে অবশে উঠিবে হেসে।

ভুল করিবারে পাবে অধিকার, পাপ সে জানিত যারে,
একটি মধুর চুম্বনে দিবে সারা প্রাণ একেবারে ;
শতবার করি' পুড়িয়া মরিবে বাসনা-বহ্নি-মুখে—
মরি' মরি' শেষে অমর হইবে প্রেমের স্বর্গ-সুখে।

পাপ কোথা নাই—গাহিয়াছে ঋষি, অমৃতের সন্তান,
গাহিয়াছে—আলো বায়ু নদীজল তরুলতা মধুমান !
প্রেম দিয়ে হেথা শোধন-করা যে যজ্ঞের সোমরস !
সে রস বিরস হ'তে পারে কভু—হ'তে পারে অপযশ !

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

# আলোর ফুল্‌কি

( ১ )

বনে বসন্তকাল এসেছে। চমৎকার দিনগুলি—আলো-ছায়ায়-নিবিড় বনের সবুজে ঢাকা পথে-পথে, আর নিস্তব্ধ রাতগুলি—রাঙা-ফুলে-ঢাকা অশোক-গাছের দোলনায়, কুঁকড়ো আর সোনালিয়া দুটিতে আনন্দে কাটাচ্ছেন। এমন সবুজ, এমন ঠাণ্ডা ছায়ায় ছায়াময় সে বন, যেন মনে হয় মায়ের কোলে এসেছি। সেইখানে কুঁকড়ো আস্তে-আস্তে সব কষ্ট ভুলতে লাগলেন। সকাল থেকে সন্ধ্যে তিনি বেড়িয়ে বেড়ান—একলাটি। চারিদিকে বড়-বড় দেবদারু আর ঝাউ,—এত পুরোনো যে তাদের বয়স কেউ জানে না। ডালে-ডালে সব সবুজ সেওলা জটার মতো ঝুলে পড়েছে; শিকড়গুলো তাদের পাথর আঁকড়ে কোন্ পাতালে যে নেমে গেছে তার ঠিক নেই! কোথাও ঝুর-ঝুর-করে পাতা ঝরছে, কোথাও ঝাউ-ফলগুলোয় মাটি একেবারে বিছিয়ে গেছে। একটা নালার ধারে ঝরণা ঝরছে, তারি এক-পাশে ব্যাঙেরা ছত্‌রি-বেঁধে হাট বসিয়েছে।

কত-রকমের পাখী গাছে-গাছে! কাঠবেরালি সব বাদাম-গাছের ডালে-ডালে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে; খরগোস ঘাসের মধ্যে লুকোচুরি আর কপাটি খেলছে। বনে এসেই খরগোসগুলোর সঙ্গে কুঁকড়োর ভাব হয়ে গেল; কিন্তু তারা ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে, সোনালিয়া সেটা সইতে পারেন না; সে একদিন কুঁকড়োর আড়ালে ডানার ঝাপ্‌টা দিয়ে তাদের ভয় দেখাতে ছাড়েন না।

একটা কাঠ-ঠোকরার সঙ্গে কুঁকড়োর খুব জমে গেল। অশোক-গাছটার পাশেই একটা কাঁঠাল-গাছে তার কোটর। দিনের মধ্যে দশবার সে কুঁকড়োর সঙ্গে গল্প করতে এসে হাজির হয়। সোনালিয়া কিন্তু এটা ভারি অপছন্দ করেন;—সময় নেই, অসময় নেই, এলেই হল? শেষে কাঠ-ঠোকরার সঙ্গে বন্দোবস্ত হল, আসবার আগে সে তিনবার ঠুক-ঠুক আওয়াজ দিয়ে তবে আসবে।

কিন্তু কাঠ-ঠোকরার গল্প শুনতে কুঁকড়ো সত্যি ভালোবাসেন;—সে যে কত-কালের সব পাখীদের কথা জানে, তার ঠিক নেই।

একদিন সন্ধ্যেবেলা কাঠ-ঠোকরা কুঁকড়োকে সন্ধ্যা-পাখীর গান শোনালে। সে অতি চমৎকার। দুটি টুনটুনি সুর ধরলে আর বনের সব পাখী তাদের গানে আস্তে-আস্তে যোগ দিলে। প্রথম-পাখীটি গাইলে—"ও আমাদের বন্ধু!" জুড়ি-টুনটুনিটি অমনি ধরলে—"ও অনাথের নাথ!" হাজার-হাজার পাখীর মিষ্টি সুর অমনি গাছে-গাছে সাড়া দিলে—"ওগো বন্ধু! ওগো বন্ধু!" তারপরে বন্দনা সুরু হল—

"নমস্কার, নমস্কার!—আকাশে নমস্কার, আলোতে নমস্কার, আভাতে নমস্কার, বাতাসে নমস্কার, রাতে নমস্কার, দিনে নমস্কার,—তোমাকে নমস্কার। তোমার দেওয়া চোখের আলো, তোমার দেওয়া মিষ্টি জল,

তোমার এই ঘন বন, তোমার এই মধু ফল, তোমার এই কাঁটার বেড়া, তোমার এই সবুজ ঘাস! মিষ্টি সুর এও তোমার, —তোমার এ নিঃশ্বাস! তোমার এই পাতার বাসা, তোমার এই ছোট পাখী। আমার এই ছোট সুরে তোমারেই আমি ডাকি!...ছোট বাসার ছোট পাখী—সন্ধ্যা হল তোমায় ডাকি, দিনের শেষে তোমায় ডাকি, —বন্ধু এসো, তোমায় ডাকি।"

এ-পাখী থেকে ও-পাখী, এ-গাছ থেকে ও-গাছ,—এমনি করে বনের শেষ পর্য্যন্ত 'বন্ধু এস' বলে সবাই ডাক দিয়ে গেয়ে উঠলো। কুঁকড়োও ডাক দিলেন—'বন্ধু, বন্ধু!'......তারপর একটি-একটি-করে সব ছোট পাখীরা পাতার আড়ালে ঘুমিয়ে পড়লো। দেখতে-দেখতে চাঁদের আলো বনের ফাঁক দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ঝরণার মতো নেমে এল—লতা-পাতার কিনারায়, পাথরের উপর, সেওলার গায়ে। কুঁকড়ো দেখলেন, একটুখানি মাকড়সার জালে হীরের মতো কি ঝলক্ দিচ্ছে! মনে হ'ল, বুঝি একটা জোনাক-পোকা জালে পড়েছে। কাছে গিয়ে দেখেন, বিষ্টির একটি ফোঁটায় চাঁদের আলো এসে লেগেছে। এমনি সব নূতন-নূতন কত-কি দেখতে-দেখতে সেই মহাবনে কুঁকড়োর দিন আর রাতগুলি আনন্দে কাটছে।

বনে ফিরে এসে কুঁকড়ো আবার তাঁর গান ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু কেবল সকালের গানটি ছাড়া সোনালি তাঁকে আর-একটি গানও গাইতে দেবেনা;—তাও আবার সকালটা যদি সোনালির গায়ের পালকের চেয়েও রঙিন আর জমকালো হয়ে দেখা দেয় তবেই! কুঁকড়ো সোনালিকে বলেন—"এই আলোতেই আমাদের সেদিনের মিলন, সেটা ভুলে চলবেনা সোনালি! আলোর জয় আমাকে দিতেই হবে সারাদিন।" সোনালি বলে—"তুমি আমার চেয়ে আলো-কে কেন ভালোবাসবে?"

ইতিমধ্যে একদিন চক্চকে-সবুজ এক সোনাল-পাখীর সঙ্গে সোনালির দেখা-শুনো হয়েছে, আর গহন-বনের একটা নির্জ্জন পথে দুটিতে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে—এটা কুঁকড়োর চোখ এড়ালো না। কিন্তু মনের দুঃখ মনেই রেখে কুঁকড়ো ভাবলেন—"আমি কি বলতে পারি, কেন তুমি সোনালকে বেশী পছন্দ করবে আমার চেয়ে সোনালি? আকাশ কি কোনোদিন তাতে-পোড়া পৃথিবীকে বলতে পারে—তুমি বিষ্টির ফোঁটাগুলিকে রোদের চেয়ে কেন ভালোবাসবে? না, মাটিই বলতে পারে আকাশকে—তুমি বিষ্টিকেই বরণ কর, আলো-কে চেওনা! সোনালিয়া, সে বনের দুলালী, অরণ্য তো তাকে আমার সঙ্গে বাইরে—দূরে—পাঠাতে পারবেনা; সে দূত পাঠিয়েছে ঘন বনের সবুজ সোনাল পাখীটি; ওরি সঙ্গে কোন্‌দিন চলে যাবে ঝরা ফুল ঝরা পাতার স্বপ্ন-বিছোনো গহন-বনের অন্দরের পথে সোনার আঁচলে ঝিলিক দিয়ে সোনার পাখী! আর আমি—" বলে কুঁকড়ো নিশ্বাস ফেল্লেন।—"কাঠ-ঠোকরা ঠিকই বলে—'যেখানে যার বাসা, সেইখানেই তার ভালোবাসা।' আমার সবই সেই পাহাড়তলীর আকাশের নীচে, আর সোনালির সবই এই বনের তলায় যেদিন দেখা দেবে, সেদিন তো কেউ কাউকে যেওনা বোলে রাখতে পারবোনা; কেবল

এইটুকুই সেদিন বলবার থাকবে—ভুলোনা বন্ধু, মনে রেখো।"

সে আর-একদিন; দুজনে অশোক-তলাটিতে দাঁড়িয়ে; সূর্য্য অস্ত গেছে; সন্ধ্যার পাখীদের গান বন্ধ হয়েছে; দু-একটা কাঠ-বেরাল তখনো পাতার মধ্যে উস্‌খুস্ করছে; খরগোসগুলো তাদের গড়ের বাইরে বসে একটু সন্ধ্যের বাতাসে জিরিয়ে নিচ্ছে; বন আস্তে-আস্তে নিঝুম হয়ে আসছে! রাত্রির অন্ধকারে গাছ-সব ক্রমে যেন মিলিয়ে গেল; সেই সময় ক্রমে-ক্রমে চাঁদের আলো ঘুমন্ত বনে এসে পড়লো। সে-রাতের মতো বিদায়-নেবার জন্যে সোনালি কুঁকড়োকে 'আসি'-বলতে গিয়েই দেখলে খরগোস-গুলো চোখ-প্যাট্‌-প্যাট্‌-করে তাদের দিকে দেখছে। অমনি এক ডানার ঝাপ্‌টায় সোনালি তাদের তাড়িয়ে দিয়ে বল্লে—"আসি তবে।" কুঁকড়ো বল্লেন—"দেখো, মনে রেখো।" সোনালি বিদায় নিয়ে অশোক-ফুলের গাছে তার মনো-মত ডালটির উপরে উড়ে-বসতে ফিরে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় পায়ে তার কি-একটা ঠেকলো। 'ইস্' বলে সোনালি সরে দাঁড়িয়ে দেখলে—কি, সে তা কিছু বুঝতে পারলে না। কুঁকড়ো কাছে এসে দেখে বল্লেন—"সর্ব্বনাশ, এ যে ফাঁদ পাতা রয়েছে! কে এখানে ফাঁদ পাত্‌লে?" টুক্ টুক্ টুক্—তিনবার আওয়াজ দিয়ে সবুজে-ফতুয়া লাল-টুপিটি মাথায় কাঠ-ঠোকরা কোটর থেকে বেরিয়ে বল্লেন—"ফাঁদটা বাঁচিয়ে চোলো, ঐ গোলাবাড়ির মানুষটিই ফাঁদ পেতেছে—সোনালিয়াকে ধরবে বোলে।" "আমাকে ধরা তার কর্ম্ম নয়!"— বলে সোনালি মাথা ঝাড়া দিলে। কাঠ-ঠোকরা বল্লে—"শুনলুম সে তোমাকে ধরে পোষ মানাবে!" কুঁকড়ো বল্লেন—"তিনি খুব ভালো লোক, যদি তুমি ধরা পড়তে, তবে তোমাকে তিনি কষ্ট দিতেন না, এটা আমি ঠিক বল্‌তে পারি।" সোনালি বল্লে—"কষ্ট না দিন, কিন্তু প্রাণ থাকতে সোনালি তাঁর পোষ মান্‌তো না, সেটাও ঠিক!"

ফাঁদ পাতা হলে বনের সবাই সবাইকে সাবধান না করে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে না, তাই খরগোস এসে বল্লে—"দেখো, খবরদার ওই কলটাতে যেন পা দিও না; ছুঁয়েছ কি—"

"বোকোনা তুমি! ফাঁদে যে আটকায় কেমন-করে তা আমি খুব জানি। এক কুকুর ছাড়া আর-কাউকে আমি ডরাইনে। ঘরে যাও ঠাণ্ডা লাগবে।"—বোলে সোনালি আস্তে ডানার ঝাপটা দিয়ে খরগোসকে বিদায় করে কুঁকড়োকে বল্লে—"আমি একবার গোলাবাড়ির দিকে যাচ্ছি।"

কুঁকড়ো ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন—"কেন? কেন? সেখানে কেন?" "ও-দিককার কুকুরগুলোকে একটু দৌড় করিয়ে আসি। এই এক-পা এখানে, এক-পা ওখানে, যাবো আর আসবো, দেরি হবে না।"

সোনালি চলে গেল, কুঁকড়ো অনেকক্ষণ সেদিকে চেয়ে থেকে, গাছের উপর কাঠ-ঠোকরাকে শুধালেন—"সোনালিকে দেখতে পাচ্ছ কি?" কাঠ-ঠোকরা উঁচু ডাল থেকে গলা-বাড়িয়ে দেখে বল্লে—"না, তিনি গেছেন।" কুঁকড়ো বল্লেন—"তুমি ভাই, একটু নজর রেখো তো—সে আসছে কিনা। আমি

একবার গোলাবাড়ির চড়াইটার সঙ্গে কথা কয়ে নিই।"

কাঠ-ঠোকরা আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠলো —"চড়াই না তোমার শত্রু?" কুঁকড়ো বল্লেন —"কিন্তু খবর দিতে আর তার মতো জুটি নেই। খবর যা চাও, তার কাছে পাবে।"

"চড়াই আসছেন নাকি?"—কাঠ-ঠোকরা শুধোলে।

কুঁকড়ো বল্লেন—"না। এই দেখনা তাকে ফোঁ করি। এই যে নীল ধুঁতরো-ফুলটা দেখছ, এর সঙ্গে মাটির মধ্যে দিয়ে তারের মতো সরু শিকড় দিয়ে গোলা-বাড়ির পুকুর ধারে শ্বেত ধুতরোফুলের যোগ আছে। ফুলের ভাষা বলে কবিতার বইয়ে পড়েছ তো? একেই বলে ফুলে-ফুলে কানাকানি।"

বনের মধ্যে যে এমন কল আছে কাঠ-ঠোকরা তা জানতনা। ফোঁ কেমন, দেখতে সে ব্যস্ত হল। কুঁকড়ো ফুলের মধ্যে মুখ দিয়ে ডাকলেন—"হ্যালো!" খানিক ঘর্‌-ঘর্‌ শব্দ হল।—"হ্যালো চড়াই। গোলাবাড়ি!" কাঠ-ঠোকরা বলে উঠলো—"কুঁকড়ো ভাই, তোমার তো সাহস কম নয়! বাসার একেবারে দরজায় দাঁড়িয়ে কথা-চালাচালি! সোনালি টের পেলে—

কুঁকড়ো বল্লেন—"সেখান থেকে যখন কথা আসবে তখন এই ফুলের মধ্যে যে মৌমাছিটা আছে, সে জেগে উঠবে আর—,,

বোঁ-ও-ও শব্দ হল। অমনি কুঁকড়ো ফুলে কান দিয়ে—"চড়াই নাকি?" বোলে খানিক আবার শুনে বল্লেন—"ওঃ তাই

কাঠ-ঠোকরা শুধোলে—"কি বল্‌ছে? কি?"

কুঁকড়ো বল্লেন—"হুকুড়ি-দশটা মুরগির বাচ্ছা ফুটেছে?" তারপর আবার একটু শুনে বল্লেন—"বল কি! তম্মার ভারি ব্যায়রাম!"

কি একটা গোল বাধলো। কুঁকড়ো বল্লেন—"রোসো, রোসো। কি? ভালো শোনা যাচ্ছে না হে! আঃ মশাগুলো জ্বালালে। চড়াই, আঃ, হাঁ হাঁ তারপর, জিম্মাকে নিয়ে তারা শিকারে বেরোবে। বল কি হে!" "জিম্মা গোলাবাড়ির একজন।"—কাঠ-ঠোকরাকে এই বোলে কুঁকড়ো আবার ফোঁ ধরলেন—"কি বল্লে? আমি চলে আসবার পর থেকে সব কাজে গোলমাল চলেছে? এ তো জানা কথা ··· এই সেদিন এসেছি এরি মধ্যে ... যেতে হবে ... তাইতো কি করা যায় হে ... যাবো নাকি? কি বল?" কাঠ-ঠোকরা চুপিচুপি বল্লে— "সোনালি আসছেন।" কিন্তু কুঁকড়ো তখন মন-দিয়ে কানে ফুলটা চেপে ধরেছেন, কাঠ-ঠোকরার কথা তাঁর কানেই গেল না। কথা চল্লো—"কি বল্লে? হাঁসগুলো সারারাত লাঙলটার তলায় ঘুমিয়েছে? বল কি!" কাঠ-ঠোকরা কুঁকড়োকে বলছে—"থাক্‌, দেখো, চুপ!" কিন্তু কিছু ফল হচ্ছে না। ওদিকে সোনালি এসে উপস্থিত। কাঠ-ঠোকরাকে ইসারায় চুপ করতে বোলে সোনালি কুঁকড়োর পিছনে লুকিয়ে দাঁড়ালো। ... ... ফোনে কুঁকড়ো বল্লেন—"বল কি, সব কজনেই? ওঃ ময়ূরটা তা হলে মাটি

কাঠ-ঠোকরা আবার মুখ বার করতেই সোনালি তার দিকে এমনি চোখ-রাঙিয়ে উঠলো যে সে তাড়াতাড়ি কোটরে যেমন সেঁধোবে, অমনি দরজায় মাথা ঠুকে ফেল্লে। কুঁকড়ো ফোনে বল্লেন—"মুরগীরা সব … … আঃ, ভালো আছে শুনে খুসি হলেম … … গান? ওঃ গান করি বই কি। হাঁ রোজ। কিন্তু এখান থেকে একটু দূরে … ঐ যে দিঘিটা আছে, তারি ধারে। হাঁ, নিত্যি-নিত্যি, ঠিক আগেরই মতো।"

রাগে সোনালি লাল হয়ে উঠলো,—তাকে লুকিয়ে গান গাওয়া হয়!—এত বারণ করলুম। …

কুঁকড়োর কথা চল্লো—"সোনালি গাইতে মানা করে, তাই লুকিয়ে আমি আলো আনছি আজকাল!" সোনালি এক-পা কুঁকড়োর দিকে এগিয়ে শুনলে, কুঁকড়ো বলছেন—"যখন সোনালির কালো চোখদুটি ঘুমে ঢলে পড়ে, যখন তার সোনার দেহটি আলিসে লুটিয়ে চমৎকার দেখতে হয়—" সোনালির মুখে এবার হাসি ফুটলো! "—সেই সময় আমি পা-টিপে-টিপে শিশিরের উপর দিয়ে দূরে গিয়ে, আলোর জন্যে যে ক'টি গান সব ক'টি গেয়ে, যেমনি দেখি অন্ধকার ফিকে হচ্ছে, অমনি আস্তে-আস্তে বাসায় ফিরি। … কি বলছ? শিশিরে পা ভিজে দেখে সে সন্দেহ করবে? তাই যদি হবে, তবে ডানার পালকগুলো আছে কি করতে? পা-দুটো মুছে নিতে কতক্ষণ? তারপর আস্তে-আস্তে অশোকের ডালে বসে যে-গান সে গাইতে মানা করে নি, সেইটে গেয়ে তার ঘুম ভাঙাই।"

সোনালি আর রাগ সামলাতে না পেরে ফোঁস্ করে উঠলো। কুঁকড়ো ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখেই চট্‌পট্ ফোনে বল্লেন—"নাঃ কিছু না, আর একদিন হবে এখন।"

সোনালি বল্লে—"আমাকে ঠকালে কেন?"

ফোন্‌টা শব্দ কল্লে—'ফুর্-র্।'

কুঁকড়ো বল্লেন—"আমি তোমাকে—"

ফুর্-র্—আবার ফুলের মধ্যে মাছিটা ডাকলে। কুঁকড়ো ফুলটার উপর ডানা চাপা দিলেন, কিন্তু সেটা ক্রমাগত ফুর্-র্-র্-র্-র্-র্ বলেই চল্লো!

সোনালি খুব রেগে বল্লেন—"কি নির্দ্দয় তুমি ঠগ! … কেন শুধোচ্ছ? তুমি মুরগিদের খবর নিতে এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলে না?—কে কোথায় ঘুমোয়, কে কি খায়, কার কটি ছানা হলো? গোলাবাড়ির বাইরেও যে ডালকুত্তটা তার পর্য্যন্ত খবর নেওয়া হচ্ছে। এও না হয় সইলুম, কিন্তু ভোরবেলায় ডানায় পা মুছে চুপি-চুপি … ওঃ বুঝেছি, তুমি একলা এই সোনার পাখীটাকেই ভালোবাসো, কেমন?"

কুঁকড়ো খানিক চুপ থেকে বল্লেন—"সোনালি! ভেবে দেখ, এই হৃদয়ের মধ্যে আলোটি যদি না দেখতে পেতে তবে কি এখানে আসতে তোমার ইচ্ছে হতো? হৃদয়ের মধ্যে কিছু না থাকার চেয়ে, আলো থাকা কি ভালো নয়? রঙিন আলো-দিয়ে-গড়া সোনালিয়া! আমি আলোকে ভালোবাসি, তাই তোমাকেও ভালোবাসতে পেরেছি, আলোর দিকে হৃদয় পেতে যদি প্রতিদিন না দাঁড়াতেম, তবে ভালোবাসার ফোয়ারা যে এতদিনে শুকিয়ে যেতো—সে কি জাননা?"

কুঁকড়োর কথায় সোনালির অভিমান বাড়লো বই কমলো না। সে ঝগড়া করতে লাগলো। কান্নাকাটি করে-করে পাড়া জাগিয়ে তোলবার জোগাড় করলে। কুঁকড়োও একটু যে চটেন নি তা নয়। শেষ সোনালি বল্‌লে—"আচ্ছা আমার যদি মান রাখতে চাও, তবে কাল সকালে একেবারে গাইবেনা বল।"

কুঁকড়ো বল্লেন—"একি কথা! সমস্ত পাহাড়তলিটা যে অন্ধকার হয়ে থাকবে!" সোনালি ঠোঁট-ফুলিয়ে বল্লে—"না হয় থাকলই। তোমারই বা কি, আমারই বা কি?" কুঁকড়ো ঘাড় নাড়লেন—"তা হ'তে পারে না। একদিন আলো বন্ধ! সব যে ধ্বংস হয়ে যাবে! আমাকে গাইতেই হবে।"

সোনালি বল্লে—"আচ্ছা, যদি প্রমাণ করে দিই, তুমি না থাকলেও সকাল হ'তে কিছু বাধলো না.—তখন?"

কুঁকড়ো একটু হেসে বল্লেন—"তখন সোনালি আমি সেখান থেকে তোমার সঙ্গে ঝগড়াও করতে আসেবনা, আর আলো হলো কি না-হলো সে খবরও জানতে খুব উৎসাহ করবনা। কেন না যে-দিন আমি-ছাড়া হয়ে আলো উঠবে, সেদিন আমি তো আর কুঁকড়ো নেই, আমি যে আলোর আলোয় গিয়ে মিশেছি!"

সোনালির চোখে জল ভরে উঠলে সে কেঁদে বল্লে—"একটি দিন আমার কথা রাখো।"

কুঁকড়ো ঘাড় নাড়লেন—"না হতে পারে না।"

সোনালি বল্লে—"ভুলেও কি একদিন আমার কথা রাখতে নেই গা।"

কুঁকড়ো বল্লেন—"ভুল হবার যোটি নেই! অমনি অন্ধকার বুকে চেপে বলে—ডাক্ আলো-কে।"

সোনালি বলে উঠলো—"অন্ধকার ওঁর বুকে চেপে ধরে?—সব বাজে কথা। বলনা বাপু, গান গাও—সবাই তোমার তারিফ করবে বোলে! গানের তো ওই ছিরি, এর জন্যে মিছে কথা কেন বাপু! তোমার গান শুনে তো বনের সবাই মোহিত হল! এখানকার বাবুই-পাখী, সেও তোমার চেয়ে গায় ভালো!"

কুঁকড়ো বল্লেন—"হতে পারে বাবুই গায় চমৎকার, কিন্তু সেইজন্যে অভিমানে আমি গাওয়া বন্ধ করব,- তেমন কুঁকড়ো আমায় ভাবলে না কি?" সোনালি রেগেই বলে চল্লো—"যেখানে নীচের বনে রোদের বেলা বসন্ত-বাউরীর গানটি মিনতি জানায়, আর উপরের বনে সা-বুলবুল গানের ফোয়ারা খুলে দেয়, সেই বনের মধ্যে কুঁকড়োর ডাক কেউ শুনতে চাইবে, এটা পাগল ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করতে পারে না।"

কুঁকড়ো কোনো কথা না কয়ে, তফাতে সরে দাঁড়ালেন। সোনালি তবু বল্লে—"শুনেছ কোনো দিন নিশুত রাতের স্বপন-পাখীর গান? "শুনিনি!"—বলে কুঁকড়ো অশোকের ডালে উঠে বসলেন। সোনালি নিজে-নিজেই বলে যেতে লাগলো—"স্বপন-পাখীর গান, সে এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার যে প্রথমবার শুনতে-শুনতে—" হঠাৎ সোনালির কি একটা বুদ্ধি মাথায় জোগালো; সে চুপ হয়ে ভাবতে লাগলো।

কুঁকড়ো শুধোলেন—"কি বলছিলে?"

সোনালি চেঁচিয়ে বল্লে—"নাঃ, কিছু নয়।" আর মনে-মনে হেসে বল্লে—"এইবার ঠিক হবে। উনি তো জানেননা যে স্বপন-পাখীর গান শুনতে-শুনতে রাত কখন্ যে ভোর হয়ে যায়, কেউ বুঝতে পারেনা!"

কুঁকড়ো গাছের উপর থেকে নেমে এসে সোনালিকে বল্লেন—"কি বলছিলে?"

"কিছু না!" বলে সোনালি মুখ-ফিরিয়ে দাঁড়ালো।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# নিদ্রাহীনের স্বপ্ন

নিশীথ নিঝুম—
দেড়টা বাজে,
চোখে নেই ঘুম,
চেষ্টা বাজে।
বিছানায় বালি,
নেই বাতাস,
ঝিঁ ঝিঁ ডাকে খালি
কাঁপে আকাশ।
পাখাটা কোথায়?—
কে যে নিলে!
মশাটা বেজায়
কামড়ে দিলে!
দুটো পান দাও,
আলোটা জ্বাল,
শুনতে না পাও?
ঘুমুলে? ভাল!

দূরে গির্জ্জের
ঘণ্টা শুনি,
স্বপ্নের জের—
স্বপ্ন বুনি,
আজকের রাতে
কিসের ভয়?
চুরি নিজে হাতে
মন্দ নয়!
এড়িয়ে সদর
খিড়কি দিয়ে
যাব সরাসর
সড়কি নিয়ে।

ঘড়িটা বেজায়
শব্দ করে;
পথে কে ও গায়
মিষ্টি স্বরে?
ঝেড়ে বালি-ধুলো
চাদর তুলে,
জানালাগুলো
দিলেম খুলে।
ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্
জোনাক পোকা!
জাগলে খানিক
দেখতো খোকা।
পাগড়ী মাথায়
পাহারাওলা
হাকচে হোথায়
বিকট গলা।

বাজলো ছুটো,
কাঁদলো ছেলে,
ওঠো গো ওঠো,—
শুন্‌তে পেলে ?

নিশীথ নিঝুম—
পৌনে তিন ;
( যার ) ফাঁসির হুকুম
কালকে দিন,
ঘণ্টার পরে
ঘণ্টা যায়
জেগে আছে ঘরে
জেল-খানায়।
অন্ধকারের
আঁধার তলে,
বক্ষে কী তার
আগুন জ্বলে !
ছাই-অবশেষ
তারই গলা,
টিপবে আইন
কাল সকালা।

কামারহাটির
কলের বাঁশী
ঘুম-ভাঙানির
একটি মাসী—
দিচ্ছে টুউ
কানের গোড়া,—
তাম্‌লী-বউ
রান্না চড়া।
ঝির্ ঝির্ ঝির্
ঠাণ্ডা হাওয়া,
ক্লান্ত শরীর
জুড়িয়ে-দেওয়া
বোলায় অলস
নয়ন-পাতে
ঘুমের পরশ
আল্‌তো হাতে !

মিথ্যে প্রয়াস
হবে না ঘুম
এপাশ ওপাশ
ওল্টালুম।
চোখ কর্ কর্
গা ঝিম্ ঝিম্,
ক্লান্ত কাতর
কী হিম্ সিম্ !
সুষ্‌মীর শাক—
ঘুমের পাতা
বল্‌ছে নিছক
মিথ্যে কথা।
ঘুমের দাওয়াই
ক্লোরেটোন
খাই কি না খাই—
কচ্ছে মন,
এলো রে ভাব্‌না
মাস-কাবার,
যার যা পাওনা
কাল দেবার !

উড়ে গেল পাখী
আকাশ দিয়ে,
মনে মনে আঁকি
কত যে কি এ!

ম্লান হয়ে এল
তারার আলো,
চাঁদ নিভে গেল
রাত পোহালো।
যদি আমার
বয়স হ'ত
ঘড়ির কাঁটার
ফেরার মত,
পেছিয়ে নিতেম
বছর বারো,
না হয় নিদেন
কমই আরো।

সুপ্তিবিহীন
সুখের রাতি,—
জ্বালিয়ে রঙীন
প্রেমের বাতি,
থাকতেম জেগে
জাগিয়ে রেখে,
ছুটতো শোণিত
তড়িৎবেগে,
ভরিয়ে দিতেম
আলোয় গানে,
সুর মেলাতেম
প্রাণে প্রাণে।
বিজলী চমক—
হা যৌবন!
চোখের পলক—
অদর্শন!

দিক-বধূ কেন

পরে ফিরে হেন
পাতলা সাড়ি?
নিশি-আভরণ
একটি দুটি
মুক্ত গগন
পড়ছে টুটি,—
চলেছে ওখানে
রাস্তা দিয়ে
গঙ্গাস্নানে
মায়ে ও ঝিয়ে।
চুপ্ চুপ্ চুপ্
আম-বাগানে
ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্
কে ধান ভানে।

আলো জ্বেলে ঐ
বিন্দে বুড়ী
চাল-ভাজা খৈ
ভাজচে মুড়ি।
ঝাঁট দেয় ঝুঁকে
ময়রা মাগী
তানপুরো বুকে
গায় বিরাগী।
বাজে প্রেয়সীর
চাবির রিং
সোণার চুড়ীর
ঝিনিক ঝিন্!
ফিরে নিয়ে পাশ
পাল্টা-ঘুম।
—ঠাণ্ডা বাতাস

খোকা জেগে উঠে
মায়ের পাশে,
দুধ খায় লুটে
খেলায় হাসে।

ও কাদের মেয়ে
গগন পরে
পা-দুটি ছড়িয়ে
আল্‌তা পরে ?
—রক্তকমল
চরণ ছুঁয়ে
জরির আঁচল
লোটায় ভুঁয়ে !

কে যায় অদূরে
—সেক্‌রা কালো।
মই-ঘাড়ে উড়ে
নেবায় আলো।
মোড়ের মাথায়
জলের কল,
কান-মলা যায়
অনর্গল।
মুকুজ্যেদের
নব্‌নে ছোঁড়া
একজামিনের
পড়ছে পড়া—
ভোর রাত্তির
চোখ রাঙিয়ে,
সরস্বতীর
ঘুম ভাঙিয়ে,—
কোন্ সাল আর
কোন্ তারিখে
ফরাসীর হার
"কর্ণাটকে।"
পাঁচ রকমের
পাখীর সুর,
কচ্চে মনের
ক্লান্তি দূর।
ভাঙলো রে ঘুম
জাগলো পাড়া,
লাগলো রে ধুম
চায়ের তাড়া,
নাচলো খোকন্
ধিনিক্ ধিন্,
বাজলো কাঁকন্
ঝিনিক্ ঝিন্।

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

---

# মাল্যাঙ্গুরি-বিনিময়

( ৩১ )

আজ-কাল বাঙ্গালী ধনী-গৃহে বিবাহ-ভোজ অপেক্ষা আশীর্ব্বাদ-ভোজে খাদ্যোপকরণের অধিক বাহুল্য দেখা যায়। কারণ স্বল্পতর অতিথির তুষ্টিসাধন পক্ষে বহ্বাড়ম্বর লঘু আয়াস-সাধ্য। এক্ষেত্রেও অন্তঃপুরিকাগণ শ্যামাচরণের নিষেধ সত্ত্বেও ভূরি-ভোজায়োজনের কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। রৌপ্য-থালের তিনদিকব্যাপী সুবিস্তৃত ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন পাত্রের সকল গুলে নাগাল পাওয়া

দীর্ঘহস্ত রাজার পক্ষেও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। দিদিমা কাছে বসিয়া দূরের বাটিগুলি তাঁহার হাতের নিকটে ধরিয়া দিতে দিতে সকল ব্যঞ্জনই একটু একটু চাকিবার জন্য মৃদুস্বরে অনুরোধ করিতেছিলেন। রাজা যেটি খাইয়া বিশেষ পরিতোষ প্রকাশ করিতেছিলেন সেটি যে হাসিরই প্রস্তুত, ইহাও অসঙ্কোচে রাজাকে জানাইয়া দিতেছিলেন; আর হাসি দিদিমার প্রতি ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াও রাজার প্রশংসা বেশ হাস্য মুখেই আত্মসাৎ করিতেছিল। এবাড়ীর এই দস্তুর, ভাল রান্নাগুলি মা দিদিমা দুজনেই হাসির নামে চালাইয়া অধিকতর পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

কথোপকথন সুখে বঞ্চিত হাসির মাতা দূরে বসিয়া মূক-বধিরের ন্যায় অতিথি দর্শন সুখেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছিলেন। রাজা দক্ষিণ হস্তে সদাসর্ব্বদা বহুমূল্য দুইটি হীরক-অঙ্গুরী ধারণ করিতেন। তিনি যখন এবাটি হইতে ওবাটিতে হস্ত-চালনা করিয়া ব্যঞ্জন গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন সেই অঙ্গুরী দুইটির জ্যোতি তারকাজ্যোতির ন্যায় ঝলমল করিয়া উঠিতেছিল।

গৃহিণী এক একবার রাজার মুখের দিকে, এক একবার তাঁহার হস্তের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে ভাবিতেছিলেন, "ঠিক যেন কোন ছদ্মবেশী রাজপুত্তুর! হাসির যদি এই রকম একটি বর হয়! ঠাকুরজামাই এঁকে কি গোপনে ক'নে দেখাতেই এনেছেন নাকি? তাই যেন হয় বিধাতাপুরুষ!

গৃহিণী যখন এইরূপ তপস্যা করিতেছিলেন, তখন হাসি কি করিতেছিল? সে নিবিষ্ট চিত্তে অতিথির আহার-সৌষ্ঠব দেখিতেছিল। কিরূপ ধীরে ধীরে স্বল্পমাত্রায় তিনি আহার্য্য মুখে গ্রহণ করিতেছেন! মুখে হাত উঠাইবার কি সুচারু ভঙ্গী। আহার্য্য মুখে লইবার পর ওষ্ঠাধর নিমীলিত হইয়া পড়িতেছে, চর্ব্বনে শব্দ নাই; হস্ত লেহনের বিকৃত দৃশ্য নাই! আহার-ক্রিয়ার মধ্যে এতটা সৌন্দর্য্য যে লুক্কায়িত আছে—ইতিপূর্ব্বে ইহা তাহার নজরে কখনো পড়ে নাই ত!

অন্ন-ব্যঞ্জন ত্যাগ করিয়া রাজা যখন মিষ্টান্নে হস্ত দান করিলেন তখন শ্যামাচরণ বলিলেন, "জানেন—রা—রা রায়মশায়, এ বাড়ীর মিষ্টি খেলে আর কখনও ভুলতে পারবেন না; চিরদিনই মুখে সে মিষ্টতা লেগে থাকবে।"

রাজা বলিলেন—"সেত উত্তম কথা। এত রকম মিষ্টান্ন রয়েছে এখানে, কোন্‌টি আগে নেব বলে দিন ত, আমি এ সম্বন্ধে বড়ই অজ্ঞ।"

শ্যামাচরণ বলিলেন—"আমিত খাচ্ছি সরভাজা।" দিদিমা অনুনয় করিয়া কহিলেন "সবই একটু করে চেকে দেখ বাছা,—নইলে আমাদের দুঃখ হবে।"

কৃষ্ণলাল বলিলেন—"মালাইভোগটা মা ওঁকে আগে দাও। তোমার এত মিষ্টান্ন কি একসঙ্গে লোকে খেতে পারে! পরে বরঞ্চ সঙ্গে ওঁদের কিছু দিও।"

রাজা কহিলেন—"হ্যাঁ, তাহলে বিদায় দক্ষিণাটাও বাকী থাকে না?" ইতিমধ্যে হাসি মালাইভোগের বাটিগুলি তিনজনের পাতের কাছে ধরিয়া দিল। শ্যামাচরণ খাইতে খাইতে বলিলেন, "বড়ই উপাদেয় হয়েছে—তুমি তৈরি করেছ বুঝি মা?"

হাসি একটু হাসিল, দিদিমা তাড়াতাড়ি বলিলেন—"হ্যাঁ হাসিই করেছে ওটা।"

এবার দিদিমা সত্য কথাই বলিলেন; এ জিনিষটা সম্পূর্ণ ভাবেই হাসির হাতের প্রস্তুত। কারণ ইহাতে রন্ধন-কার্য্য কিছুই ছিল না, মালাই, ক্ষীর, ছানা, রস প্রভৃতির সংযোগে ইহা একটা কেমিকেল উপাদান মাত্র। রাজা খাইয়া বলিলেন—"যিনি এঁর স্বগুণা নাম দিয়েছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই দিব্য দর্শক ছিলেন।"

এইরূপ বিনাড়ম্বর সহজ হাসি-গল্প আদর-আপ্যায়নে অতিথি এবং আতিথ্যসৎকার উভয়পক্ষই যথোচিত আনন্দ লাভ করিলেন। আহারের পর দিদিমা হাসিকে লইয়া বিদায় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে শ্যামাচরণ তাহাতে আপত্তি প্রকাশ করিলেন; কৃষ্ণলাল সেই আপত্তি গ্রাহ্য করিয়া মাতাকে টানিয়া আনিয়া বড় চৌকিখানার উপর বসাইয়া-দিলেন। হাসি পাশে বসিল।

শ্যামাচরণ তাঁহাদিগকে লইয়া বিদেশী পণ্য বয়কট সম্বন্ধে গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন; কৃষ্ণলালের সঙ্গে রাজা পুনরায় দেয়ালের চিত্র-লেখ্যগুলি দেখিতে লাগিলেন। বড় দরজার মাথার সূচিকার্য্য-রচিত ওঁ শব্দটি প্রথমেই কৃষ্ণলাল তাঁহাকে দেখাইলেন,—রাজার প্রশংসা শুনিতে পাইলে তিনি ইহার অর্থ ব্যাখ্যায় নিযুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে নিরাশ করিয়া অতিথি আর একখানি ছবি মনোনিবেশ সহকারে দেখিতে দেখিতে কহিলেন—"এই ছবিখানি বড় সুন্দর, কিন্তু ইহার পরিকল্পনা ঠিক বুঝতে পারছি নে।" কৃষ্ণলাল ডাকিলেন—"হাসি তোমার ছবিখানির অর্থ রায়মশায়কে বুঝিয়ে দাও ত মা।" হাসি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, কৃষ্ণলাল ওঁ শব্দের দিকেই চাহিয়া রহিলেন। রাজা কহিলেন,—"আপনি ত খুব সুন্দর ছবি আঁকেন? ছবিখানি ঠিক স্বপ্ন-দৃশ্যের মত দেখাচ্ছে।" হাসি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল "ঠিক ত ধরেছেন আপনি! সত্যই ওখানি আমার স্বপ্নচিত্র। আমি স্বপ্ন দেখেছিলুম—যেন ছোট্ট একখানি নৌকা ক'রে সমুদ্রে ভেসে চলেছি;—হঠাৎ সমুদ্রটা আকাশ হয়ে গেল, আর নৌকখানা আকাশ-পথে উড়ে চলতে লাগলো। চলেছি চলেছি, উড়ন্ত নৌকায় আকাশে ছুটে চলেছি আমি,—আর থামার সাধ্য নেই,—নামার সাধ্য নেই,—আকাশের তারাগুলো সব আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে;—আমার মাথা ঘুরে উঠলো, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল,—প্রাণ আকুলি ব্যাকুলি করতে লাগলো, হঠাৎ একখানা কাল মেঘের ভিতর থেকে কার বাঁশি বেজে উঠলো, আর আমার ঘুমও ভেঙ্গে গেল!"

রাজা স্বপ্ন-কথা নিবিষ্ট-চিত্তে শুনিতে লাগিলেন, হাসির কাহিনী শেষ হইলে—রাজা সহাস্যে কহিলেন—"স্বপ্নটি যেমন বিচিত্র তারা-জগতের মধ্যে স্বপ্ন-দেবীর এই মূর্ত্তিটিও সেইরূপ চমৎকার! আপনি বুঝি সেই সন্ধ্যায় কিন্নরহ্রদে বেড়াচ্ছিলেন?" হাসির মনে পড়িল পূর্ব্ব-অপরাহ্নের কথা, সে সলজ্জে কহিল—"ঠিক মনে পড়ছে না।" রাজা কহিলেন—"আপনার ছবিখানি দেখে আমার একটি গান মনে পড়ছে। ছবিটির সঙ্গে গানটির যে বিশেষ মিল আছে তা নয়,

কিন্তু ছবিখানি দেখছি আর সেই গানটি আমার মনে আসছে।"

হাসি অনুনয়ের স্বরে কহিল—"আপনি গাবেন সেই গানটি ?

এখন মধুর দৃষ্টিতে চাহিয়া তাঁহাকে হাসি এই অনুরোধ করিল যে সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া সহসা রাজা আত্মহারা হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বহুদিনের বিস্মৃত পুলক-শিহরণ উঠিল। রাজা কোন উত্তর করিবার পূর্ব্বেই শ্যামাচরণ কহিলেন, "রা-রা রায়বাহাদুর বেশ গাইতে পারেন ? ছেড়োনা মা ওঁকে, ধরে পড়।" আজ সহসা শ্যামাচরণ তোতলা হইয়া পড়িয়াছেন, রায়মহাশয়ের নামটা ক্রমাগতই তাঁহার মুখে বাধিয়া যাইতেছে। শ্যামাচরণ কাজের মানুষ এই কথা বলিতে বলিতে উঠিয়া দেয়ালের বড় তানপূরাটা খুলিয়া তক্তার উপর রাখিয়া দিলেন। হাসি আবার বলিল—"গান না আপনার মনের গানটি ?" রাজা কহিলেন—"আমারও কিন্তু অনুরোধ আছে, তারপর আপনাকেও কিন্তু গাইতে হবে!" এই সময় শ্যামাচরণ ওঁ শব্দের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া একবার বলিয়া উঠিলেন—"আপনি হাসিকে আপনি আপনি করছেন—বড় বেমানান শোনাচ্ছে, তুমিই বলবেন ওকে।"

রাজা এ কথার কোন উত্তর না করিয়া তক্তায় আসিয়া বসিয়া তানপুরাটা হাতে তুলিয়া লইলেন। কিছুক্ষণ তাহার কান টেপাটুপি করিয়া সুর মিলাইয়া লইয়া গান ধরিলেন।

কে আমারে বারেবারে করুণ সুরে
ডাকে সুদূরে ?
চিনেছিগো বাঁশিটি কার,
সুরে শুনি হাসিটি তার,
পারে যেতে বারেক শুধু দেখেছি বঁধুরে,
সেই বিদেশী বঁধুরে ;
ও যে স্মৃতির খেয়া বেয়ে চলে
স্বপ্ন-নদীর পুরে!

ওগো কেমন করে মিলবে তারে হায় ?
যেমন করে সন্ধ্যা-তারা,
পূব-গগনে দিশাহারা,
ভোরের বেলা অরুণ-ধারায়
মিলাইয়া যায়,
তেমনি করেই মিলবে তারে—
লুটবে পায়ে ঘুরে।
সে যে স্মৃতির খেয়া বেয়ে চলে
স্বপ্ন-নদীর পুরে।

মিলবে তারে কবে ওগো কখন ?
তখন ওগো তখন—
ফাগুন হাওয়া আগুণ হ'য়ে,
কাল-ব'শেখের দোলন ব'য়ে
চলবে যখন ঝড়ের আগে আগে,
ঘন ঘটা আঁধার মেঘে—
ইন্দ্রধনু চুপে চুপে,
প্রকাশ হয়ে মোহন রূপে
লুকিয়ে পড়বে যখন পুনঃ
নিবিড় অনুরাগে,—
তখন ওগো তখন,—
রুদ্রতালে বন্ধু তোমার নাচবে মধুরে—
বেজে উঠবে তুমি তাহার চরণ নূপুরে ;—
ও যে স্মৃতির খেয়া বেয়ে চলে

রাজা তালমান দিয়া চক্ষু বুজিয়া গানটি গায়িতে লাগিলেন, হাসি তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল। রাজা যখন থামিয়া পড়িলেন তখনও সেই গীততান তাহার কর্ণে বাজিতে লাগিল!

( ৩২ )

গৃহের কুহকবদ্ধ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শ্যামাচরণ প্রথমে কহিলেন – "এইবার তোমার পালা মা, অতিথি-সম্বর্দ্ধনা কর।" হাসি একেবারেই বাঁকিয়া বসিল, এত ভাল গানের পর আর কি সে গাইতে পারে! সে বলিয়া উঠিল—"আমি আজ মোটেই গাইতে পারব না। রাত্রে ঠাণ্ডা লেগে গলাটা একেবারেই ধরে গেছে।" কিন্তু দিদিমা, কৃষ্ণলাল, শ্যামাচরণ ইঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা হাসি গান গায়; গান শিখিয়া হাসি যদি গান শুনাইবার এমন অবসর ছাড়িবে তবে শিখিয়াই বা লাভ কি!

পিতা বলিয়া উঠিলেন—"গাও হাসি, বলছেন উনি গাও।" হাসি দিদিমার পাশেই আসিয়া বসিয়াছিল, তিনি অলক্ষ্যে তাহাকে বেশ একটু টিপ্‌নি দিয়া মৃদু স্বরে কহিলেন "গাইতে আরম্ভ করলেই গলা খুলবে, দেমাক রাখ্‌।" কিন্তু তথাপি হাসি চুপ করিয়া রহিল, তাঁহাদের আজ্ঞা পালনের কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। তখন অতিথি অনুনয় কণ্ঠে কহিলেন, "আপনি না গাইলে কিন্তু বড় দুঃখিত হব।" হাসির নত মুখ উন্নত হইল—সে তাঁহার দিকে চাহিল। রাজা আবার বলিলেন "নিশ্চয়ই আপনাকে গাইতে হবে, আমাদের এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করবেন আপনি?" এই দৃঢ়তাপূর্ণ অনুনয়-বাক্য রাজাদেশের ন্যায় তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল।

রাজা তক্তা হইতে উঠিয়া বলিলেন, "আপনি এই আসন গ্রহণ করুন। হাসি বলিল "ও তানপুরাটা ত আমার নয়, আমার ওস্তাদের। ছোট তানপুরাতেই আমি গাই।" রাজা নিজেই তখন দেয়াল হইতে ছোট তানপুরাটি খুলিয়া তক্তার এক ধারে রাখিলেন। হাসি বিনাবাক্যব্যয়ে ধীরে ধীরে তক্তার উপর আসিয়া বসিল,—বসিয়া অনবরত তানপুরাটার কাণ টিপিতে লাগিল। কিছুতেই যে আজ তাহা সুরে মিলিতে চায় না! রাজা হাসিয়া নিজেই তখন তানপুরাটার সুর বাঁধিয়া দিলেন। তখন সেটা তাহার হস্তে ক্রমাগত ম্যাও ম্যাও করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এ কি জ্বালা! কোন গানই ত মনে আসিতেছে না আজ! দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"বল না দিদিমা—কোন্‌টি গাব।" দিদিমা তাহার ধরণ ধারণ দেখিয়া মনে মনে জ্বলিতেছিলেন, কিন্তু সংযত ভাবেই কহিলেন "সেই আগমনীটা গাও?"

"কোন্ আগমনীটা? মনে পড়ছে না ত?"

শ্যামাচরণ হাসিয়া বলিলেন,

"তবে আগমনী থাক্, একটা বিসর্জ্জনী গাও।"

কোন বিসর্জ্জনী গীতও আজ তাহার মনে পড়িল না। কৃষ্ণলাল বলিলেন "একটি ব্রহ্মসঙ্গীত গাও তবে। 'প্রথম নাদ ওঁকার' গানটি জান ত?" হাসি ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল যে 'জানি না'।

রাজা বলিলেন, "আপনি কি কোন জাতীয় সঙ্গীত জানেন?" হাসি ইহার উত্তর না দিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল "আচ্ছা গাচ্ছি, আমার মনে পড়েছে একটা গান।"

বলিয়া গাহিতে আরম্ভ করিল,—

আমার বীণা তোমার হাতে
মধুর অতি সাজিছে
আমার বাণী তোমার
গানে মধুর কিবা বাজিছে—

দুই ছত্র গাইয়াই হাসি গান বন্ধ করিল; কথাও আর মনে পড়িল না, একেবারেই সুরটাও ভুলিয়া গেল। বিরস ভাবে লজ্জিত মুখে সে তানপুরা হইতে হাতটা সরাইয়া লইল। রাজা কৃপাপরবশ হইয়া বলিলেন, "থাক্, তবে আজ দেখ্‌ছি দেবী সরস্বতী আমাদের প্রতি বিমুখ।" বলিয়া রাজা গিলাকুঞ্চিত শুভ্র পিরাণের ক্ষুদ্র পকেট হইতে তাহার ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন "একি দশটা বেজে গেছে! আমাকে ত আজ রাত ১১টার ট্রেন ধরতে হবে। আর আপনারাও নিশ্চয়ই এখনো খাননি; সে কথা ভুলে গিয়ে আত্মসুখেই বিহ্বল হয়ে আছি।"

রাজা দিদিমার দিকে চাহিয়া এই কথা বলিলেন। দিদিমা শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, "সে কি কথা, বোসো বোসো, আমরা, দেরীতেই খাই।" রাজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "মাপ করবেন, উঠুন শ্যামাচরণ-বাবু, বড় দেরী হয়ে গেছে।"

তখন সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ পাশের টেবিলের দিকে দিদিমার দৃষ্টি পড়িল, এতক্ষণ ফুলের মালার কথাটা একেবারেই তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শ্যামাচরণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজকের দিনে যে বরের শ্বশুরকে মালা পরাতে হয়—দেনা হাসি মালা পরিয়ে"!

হাসি এক গাছি গ'ড়ে মালা উঠাইয়া শ্যামাচরণের দিকে অগ্রসর হইবামাত্র তিনি এক পা দূরে সরিয়া গিয়া কহিলেন, "মোটে ত তোমার পুঁজি দেখ্‌ছি ঐ এক গাছি মালা, আমি ত ঘরের লোক, অতিথিকে ত সর্ব্বাগ্রে সম্মানিত করা উচিত, ওঁকেই দাও মালাগাছি।"

হাসি কিংকর্ত্তব্য ভাবে মালা হস্তে তাঁহার দিকে দৃষ্টি পাত করিল। রাজা নিঃসঙ্কোচে বেশ সহজ ভাবেই স্বয়ং অগ্রসর হইয়া আসিয়া কণ্ঠ বাড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "তোমার হাতে ভ্রাতৃবরণ মাল্য সাদরে গ্রহণ করি। পরিবর্ত্তে কি আর দিব তোমায়, আর কিছুই ত সঙ্গে নাই—এই আংটিটি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ রূপে গ্রহণ কর।"

রাজা আংটি খুলিয়া তাহাকে পরাইয়া-দিলেন। শ্যামাচরণ তাহা দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিলেন। রাজাকে এখানে আনিবার উদ্দেশ্য তাঁহার নিষ্ফল হয় নাই! কৃষ্ণলাল সহসা ওঁ শব্দ ছাড়িয়া এদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, বরকন্যার ন্যায় উভয়কে মাল্যাঙ্গুরি বিনিময় করিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন—এ ঘটনা তাঁহার মনঃপুত হইল কি না বুঝা গেল না। দিদিমাও হাসিবেন বা কাঁদিবেন, বুঝিতে না পারিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। দ্বারান্তরালে দাঁড়াইয়া গৃহিণীই কেবল আনন্দ-চিত্তে ভগবানকে স্মরণ করিলেন। মাতার ন্যায় দিব্যদর্শক সংসারে কে আছে।

রাজা যখন বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন, দালান শূন্য হইয়া পড়িল—তখন দিদিমার মুখ ফুটিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন—

"অজানা অচেনা কার গলায় মালা দিলিলো রূপসি নাতনি! তোর রাজা এল নাকি?"

আজ আর হাসির হাসি-ঠাট্টা ভাল লাগিল না—গম্ভীর মুখে বলিল—"দিদিমার সব তাতে ঠাট্টা!"

এই সময় গৃহিনী দালানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আর শচীনও বায়স্কোপ রঙ্গালয়ের রঙ্গ দর্শনান্তে এখানে আসিয়া হাজির হইল। দিদিমা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তোর সঙ্গে ওদের দেখা হোল?"

"হ্যাঁ দেখলুম, তাঁরা গাড়ীতে উঠছেন।"

"কে উনি জানিস্?"

শচীন বুঝিল—কাহার সম্বন্ধে এ প্রশ্ন,—আশ্চর্য্য হইয়া বলিল; "জাননা নাকি? রাজা যে?"

শচীন প্রসাদপুরে গিয়াছিল তাহা পাঠক জানেন। দিদিমা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "রাজা! কোথাকার রাজা রে?"

উত্তর হইল—"প্রসাদপুরের।"

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

---

# দু-জনার এক-জন

[ E. W. Wilcoxএর One of us two কবিতার অনুবাদ ]

আসিবে সেদিন যবে একজন পড়ে রবে,
আমাদের দুজনার অন্য যাবে চলে;
যে রহিবে খুঁজিবে সে নিশিদিন নির্নিমেষে
কোথা সে মুরতি যাহা গাঁথা হৃদিতলে।
উষার গোলাপী হাসি কোথায় যাইবে ভাসি,
মধ্যাহ্নে আলোক-ভাতি রবেনা উজ্জ্বল;
সন্ধ্যায় শান্তির মুর্ত্তি আর না পাইবে স্ফূর্ত্তি,
নিশীথ-আঁধারে যেন করিবে পাগল।
কোথা সে কণ্ঠের স্বর সংসারের দুখ-হর,
শুনিতে শ্রবণ হবে আর্ত্ত পিপাসায়;
কোথা সে চরণ দুটি নীরবে উঠিবে ফুটি,
বৃথায় খুঁজিবে আঁখি মাথা করুণায়।
দুজনার একজন শ্রান্তপদে বিচরণ
একাকী করিবে যবে সজল নয়ন,
স্মৃতির বিদ্যুতে হাসি উঠিবে যা পরকাশি
বজ্রের জ্বালায় চিত্ত করিবে দহন।
আজি যে সুখের রাশি হৃদয়ে উঠিছে হাসি
প্রতি কথা প্রতি স্পর্শ পরাণ মাতায়,
তখন কোথায় পাবে কত দূর ভেসে যাবে
—বসন্ত-প্রভাত-স্বপ্ন শ্রাবণ-নিশায়!
জ্বালাভরা ভাঙাবুকে অবনত শোকে দুখে
যে গিয়াছে তার লিপি খুঁজিবে অপর,
পড়িতে প্রয়াস পাবে আঁখি-জলে ভেসে যাবে
কৃপণের নিধি-সম বুলাইবে কর।
প্রতিধ্বনি খুঁজি আনি লইবেক বুকে টানি
যা-কিছু স্মৃতির চিহ্ন গত-জীবনের,
প্রণয়-কিরীট-পরা সুখমাখা দুখ-হরা
আলোক-গরিমাপূর্ণ দূর দিবসের।
আমাদের একজন শ্রান্ত-দেহ ক্লান্ত-মন
ধরার সুন্দর মুখ দেখিবেনা আর;
যে আলোক যেবা সুখ এখন ভরিছে বুক
সে হবে কথার কথা নহে ফিরিবার।
তখন আসিবে দিন সুখ-হীন আলোহীন,
জীবন কাতর শুষ্ক কর্ত্তব্যের ভারে,
যে রহিবে দুজনার,— কি হবে তখন তার,
ওগো প্রভু, প্রভু মম, দয়া কর তারে।

শ্রীরামরতন চট্টোপাধ্যায়।

# মায়ে-ঝিয়ে

( গল্প )

সমস্ত দিন রুগ্না বৃদ্ধা দাসী গোপালের মার কাছে বসে, সন্ধ্যার সময় অনিলা যখন নিজের ঘরে ফিরে এল, তখন তার শরীরের বিশেষ কোনো গ্লানি ছিলনা; কিন্তু পরদিন সকালে ঘুম-থেকে উঠে, চলতে গিয়ে, কেমন টলে পড়ল—ভারি দুর্ব্বল; কিছু খেতেও পারলে না। সে মনে-মনে বল্লে—"আমার অসুখ হোল নাকি?" সমস্ত দিনটা কোনো-রকমে কেটে গেল, রাত্রে ভয়ানক জ্বর এল, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে মাথার অসহ্য যন্ত্রণা।

পাড়ার ডাক্তার এসে দেখে গেলেন, বল্লেন—"ও কিছু নয়, দু'-একদিনেই সেরে যাবে।"

দু-একদিন কেটে গেল, কিন্তু জ্বর ছাড়ল না। দিনে-দিনে সে কাহিল হয়ে পড়তে লাগল। ডাক্তার তখন বল্লেন—"গতিক খারাপ বোধ হচ্ছে।"

অনিলার বাপ-মা কেউ নেই; সে তার গরীব পিশেমশায়ের ঘরে মানুষ হচ্ছে। পিসিমা নেই; কোনো ছেলেপুলেও নেই; পিশে-মশায় নিজের মেয়ের মতো যত্নে অনিলাকে কাছে রেখেছেন। পৃথিবীতে এই তাঁর একমাত্র স্নেহের সম্পদ।

তিনি সওদাগরি আপিসে কাজ করেন; মেয়েটি সমস্ত-দিন একলাটি বাড়ীতে পড়ে থাকে। অনিলার অসুখের জন্যে পিশেমশায় ছুটির দরখাস্ত করেছিলেন; কিন্তু মঞ্জুর হয় নি। উত্তর হয়েছে—চিরদিনের ছুটি চাও ত দিতে পারি! কিন্তু এত-বড় একটা সওদাগরি দান গ্রহণ করা গরীব পিশেমশায়ের সাধ্য ছিল না।

তিনি সমস্ত দিন আপিসে বসে অনিলার জন্যে ছট্‌ফট্ করেন আর নিরুপায়ে থেকে-থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। কেবলই ভাবেন—বেচারা একলাটি রয়েছে, না-জানি কত কষ্ট পাচ্ছে! তার উপর, পুরোনো ঝি গোপালের মায়েরও অসুখ; সে যে দু-দণ্ড অনিলার কাছে বসবে, তারও উপায় নেই। এক-এক-বার মনে হয়, দেশে তাঁর দূর-সম্পর্কে যে বিধবা ভগিনী আছে, তাকে না হয় কিছু দিনের জন্য আনিয়ে রাখি; কিন্তু সে যে অনেক খরচ। অত টাকা কোথায়? বিশেষ ডাক্তারের ফি, ওষুধের দাম এখন সর্ব্বদাই হাতে মজুত রাখা নিতান্তই দরকার। কি করবেন উপায় না দেখে, পিশেমশায় দিন-দিন অস্থির হয়ে উঠছিলেন। অনিলা যদি অযত্নে মারা যায়, তবে তাঁর দুঃখ-রাখবার ঠাঁই থাকবে না। তাঁর জীবনের এই শেষ-সম্বলটিকে আঁকড়ে-রাখবার একটা ব্যাকুলতা তাঁকে পাগল করে তুলছিল।

ঠিক এইসময় একটা সুরাহা হ'ল। সেদিন সন্ধ্যেবেলা পিশেমশায় আপিস থেকে ফিরে দরজায় পা দিয়েছেন, এমন সময় একজন আধা-বয়সী মেয়েমানুষ মাথায় ঘোমটা টেনে বল্লে—"বাবু, আমায় ঝি রাখবেন?"

অচেনা লোককে বাড়ীতে রাখতে পিশে-মশায়ের সাহস হচ্ছিল না; তারপরে গোপালের মা এক ঝি আছে, তার অসুখ বলে তাকে ত তাড়াতে পারেন না; মাইনেও তার দিতে হবে,—এতকাল সে খেটেছে। এর উপর আর-একজন নতুন ঝি রাখিলে অর্থ-সঙ্কুলান হবে কি করে?—মহা ভাবনা হল!—বিশেষ এই অনিলার অসুখের সময়—যখন টাকার দরকার অষ্টপ্রহর।

পিশেমশায় হতভম্ব হয়ে ভাবচেন, এমন সময় নতুন ঝি বলে উঠল—আমায় দুটি-দুটি শুধু খেতে দেবেন বাবু, মাইনে-পত্তর কিছু চাই না।"

পিশেমশায়ের মন তখনো সন্দেহে দুলচে—অচেনা-লোক! তার পরে মাইনে না-চাইবার মানেই বা কি? এমন সময় নতুন ঝি সেই সন্ধ্যার অন্ধকারের উপর এমন একটি করুণ দীর্ঘশ্বাস ফেল্লে যে পিশেমশায়ের সমস্ত বুকখানা কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল; মনে হল—এ কোন্ নিরাশ্রয় হতভাগিনী অন্ধকারের মতো একরাশ হতাশা নিয়ে তাঁর কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে।—এ যেন জলে ডুবতে-ডুবতে তাঁর বাহুর একটু অবলম্বন কাতর-কণ্ঠে প্রার্থনা করছে!

ঝি বলে উঠল—"বাবু দয়া কর। আমার কেউ নেই।"

পিশেমশায় বল্লেন—"আচ্ছা এস বাড়ীর ভিতরে!"

* *
*

নতুন-ঝি বাড়ী ঢুকেই, রোগীর ঘর একেবারে দখল করে বসলে। অনিলার জ্বরতপ্ত মাথা কোলে নিয়ে, তাতে জল-পটি দিয়ে বাতাস করতে লাগল; তার শুষ্ক কণ্ঠে ঠাণ্ডা জল অল্পে-অল্পে ঢেলে দিতে লাগল। অনিলা বলে উঠল—"আঃ!"

একটা আরামে তার রুগ্ন শরীর যেন ঘুমিয়ে আসতে লাগল। ঝি ধীরে-ধীরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। অনিলার মুখ দেখে মনে হল, অনেক দিনের দুঃখের পর, আজ যেন সে শান্তি পেয়েছে। ঝি সেদিন সমস্ত রাত অনিলার শিয়র ছেড়ে উঠল না। পিশেমশায় তাই দেখে আজ ক'দিন পরে রাত্রে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারলেন।—এ ক' দিন তাঁর চোখে ঘুম ছিল না। রোগী যত ছট্‌ফট্‌ করেছে, তিনিও তত আকুল হয়ে ঘরময় ছুটে বেড়িয়েছেন। রোগীর যন্ত্রণা দেখে তাঁর শুধু কষ্টই হয়েছে—কোনো উপায় করতে পারেন নি।

সকালে উঠে অনিলার মনে হল, কে যেন পদ্মহস্ত বুলিয়ে তার রোগের সমস্ত গ্লানি মুছে নিচ্ছে। সে একবার একটুখানি চেয়েই আবার চোখ বুজে ফেল্লে,—পাছে চোখ চাইলে এই স্নিগ্ধ কোমল স্পর্শটি ভেঙে যায়। তার মনে হচ্ছিল, যেন কোন্ দেবী এসে অলক্ষ্যে তার রোগের বালাই হাত-দিয়ে তুলে নিচ্ছেন।

অনেকক্ষণ সে অসাড় হয়ে পড়ে রইল; তবুও সেই সর্ব্বদেহ-শীতল-করা হাত-বুলানো শেষ হল না। তখন তার সন্দেহ হল, এ কার অচেনা হাতের স্পর্শ?—এমন স্পর্শ জীবনে তো কখনো পাইনি! সে চুপ করে পড়ে অনেকক্ষণ ভাবতে লাগল—মনে-মনে হাতড়াতে লাগল, তবু কিছুতেই

ঠিক করতে পারলে না—সে স্পর্শ কার হ'তে পারে। একবার ক্ষণেকের জন্য মনে হল, খুব ছেলেবেলায় ঘুমবার আগে পিশিমার হাতের এমনি-একটি মিষ্টি পরশ রোজ রাত্রে যেন বুলিয়ে যেত। পিশিমা কি আবার ফিরে এলেন?—মনে করে অনিলা ধড়্‌মড়্‌ করে উঠে বসল। উঠেই দেখলে এক অচেনা মুখ! অনিলা অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে বল্লে—"তুমি কে গা?"

"শোও মা, কাহিল শরীর!"—বলেই দাসী তাকে ধরে শুইয়ে দিলে।

অনিলা আস্তে-আস্তে শুয়ে-পড়ে বল্লে—"কে তুমি বল?"

"আমি—আমি তোমার ··· ঝি!" বলেই সে অনিলার জন্যে জলের ঘটি আনতে তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে গেল।

ঝি অনিলার মুখহাত ধুইয়ে, কাপড়-ছাড়িয়ে, দুধ খাইয়ে আবার শুইয়ে দিলে। অনিলা কেবলই চেয়ে-চেয়ে তাকে দেখতে লাগল। ঠিক কৌতূহল নয়, কেমন-একটা আকর্ষণ যেন তার চোখের দৃষ্টিকে এই নতুন ঝিটির দিকে ক্রমাগতই টানছিল। অনেক্ষণ-ধরে তাকে দেখতে-দেখতে তার মাথা ঝিম্‌-ঝিম্‌ করে এল; সে তখন চোখ বুজে পড়ে রইল। ঝি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

ঝিকে দেখতে-দেখতে অনিলার কেবলই বোধ হতে লাগল—এই ঝিটি যেন কেমন-এক আশ্চর্য্য মানুষ! গোপালের মাও ঝি, কিন্তু তার সঙ্গে এর কিছুই মেলেনা। সে ছেলেবেলা থেকে তাকে কত আদর-যত্ন করেচে, অসুখ হলে কত সেবা করেচে কিন্তু এর যত্ন, সেবা, যেন আর-এক-রকমের; কোথায় যেন একটা ভারি তফাৎ আছে, যার জন্যে এর হাতের সেবাকে এত লোভনীয় করে তুলেচে। অথচ এ একেবারে নতুন-লোক—কস্মিনকালে একে চক্ষেও দেখিনি। এ কি আশ্চর্য্য! এই সমস্যাটা ক্রমেই অসুস্থ অনিলাকে বিব্রত করে তুলতে লাগল। তার উপর অনিলার মনের মধ্যে আর-একটা মুস্কিল বাধল এই যে, একে দেখে বোধ হয় যেন এর চেহারার উপরে কেমন-একটা কদর্য্যতা আছে, যার জন্যে মনকে বিমুখ করে, অথচ এর হাতের স্পর্শটি, এর গলার স্বরটি এমন সুন্দর, এমন মিষ্টি, যে মন মুগ্ধ করে, সকল জ্বালা জুড়িয়ে দেয়। তাকে দেখতে ইচ্ছে করেনা, অথচ তার হাতের সেবাটির জন্য মন লোলুপ হয়ে ওঠে; তাই চোখ-বুজে পড়ে-পড়ে অনিলা তার স্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে মেখে নেয়। আর সেই চোখ-বোজা-অন্ধকারের ভিতরে সেই স্পর্শ-থেকে একটি অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তি ফুটে উঠতে থাকে—যাঁকে দেখে শুধু আনন্দে নয়, ভক্তিতে অনিলার চিত্ত ভরে ওঠে। তাঁকে দু-হাতে জড়িয়ে, তাঁর কোল্‌টির মধ্যে মুখ-লুকোবার জন্যে অনিলার সমস্ত হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তার চোখ দিয়ে জল ঝরতে থাকে। নতুন-ঝি অমনি বলে ওঠে—"কাঁদচ কেন মা?" কি প্রাণ-জুড়ানো মিষ্টি সেই সুর!

স্বপ্নের ঐ দেবী-মূর্ত্তিকে দেখতে-দেখতে অনিলার মনে হত—ঐ তার মা, তার স্নেহময়ী জননী! যাকে সে ইহজীবনে কখনো দেখেনি, কোন ছেলেবেলায় পাষাণী মা তাকে কোল

থেকে ফেলে পালিয়ে গেছে, সে তা জানেও না। তবু সেই অজানা মায়ের শোকে তার বুক এখনো ফুলতে থাকে! তার সত্যকার মা কি ঐ স্বপ্নের মায়ের মতোই দেখতে ছিল? কে জানে? মা, মা!—বলে একটা কান্না তার মন থেকে কেঁদে উঠতে লাগল।

* *
*

অনিলা দিন-দিন সেরে উঠচে; কিন্তু তবু এখনো খুব দুর্ব্বল—বিছানা থেকে উঠতে পারে না। কেমন যেন ছেলেমানুষটি হয়ে গেছে। নতুন ঝি অষ্টপ্রহর তার কাছে-কাছে থেকে পরিচর্য্যা করে। যখন যা দরকার, তাকে বল্‌তে হয় না, মুখের কাছে জুগিয়ে রাখে। পিশেমশায় এখন শুধু এক-একবার উঁকি মেরে দেখে যান, তার বেশী কিছু করার দরকার আছে বলে খুঁজে পান না। তিনি আজকাল নিশ্চিন্ত মনে আপিস যেতে পারচেন, আপিসের কাজে এখন আর ভুল হয় না। সমস্ত দুপুর-বেলাটা শিয়রে বসে নতুন ঝি অনিলার সঙ্গে গল্প করে, বিকেল-বেলা তাকে নিয়ে খোলা ছাদে একটু বসে, সন্ধ্যে হতেই ঘরে এনে শুইয়ে দেয়, রাত্রি-বেলা তার মাথায় হাত-বুলিয়ে ঘুম পাড়ায়—কোথাও কোনো ত্রুটি ঘটতে দেয় না।

অনিলা একদিন জিজ্ঞাসা করলে—"ঝি, তুমি ত পর, তবু এমন আপনার লোকের মতো আমার এত সেবা কর কেন?"

ঝি একটু থতমত খেয়ে বল্লে—"আমি যে তোমার দাসী মা!"

"কিন্তু তুমি ত মাইনে পাওনা।"

"পাই বৈ কি বাছা!"

"ঐ যে পিশেমশায় বলেন, তুমি এক পয়সাও মাইনে নাও নি!"

"মাইনে কি বাছা, শুধু পয়সা দিয়েই হয়।"

"তবে আবার কি দিয়ে হয়?"

"তুমি ছেলেমানুষ, তুমি কি সব জান? —বড় হলে সব বুঝতে পারবে।"

"তবে পিশেমশায় বুঝতে পারেন না কেন? তিনি ত বড় হয়েছেন!"

"তিনি যে পুরুষমানুষ—তিনি কি আমা-দের মেয়েলি-হিসেব জানেন!"

"তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না, ঝি!"

"কি হবে মা বুঝে?—তুমি এখন ঘুমোও।" বলে দাসী ঘর-থেকে আলোটা সরিয়ে দিলে।

অনিলা খানিকক্ষণ অন্ধকারে চুপ-করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে—"দাসী, তোমার কে আছে?"

"কেউ নেই, মা!"

"কেউ নেই তোমার?"

"বালাই, ষাট্! আছে বৈ কি মা,—আমার এক মেয়ে আছে।"

"এই যে বল্লে কেউ নেই?"

"তাকে হারিয়ে ফেলেছি কি না, তাই ভুলে বলে ফেলেছিলুম।"

"কেমন-করে তাকে হারালে?"

"সে মা, অনেক কথা। বলতে গেলে রাত হয়ে যাবে। তুমি এখন ঘুমোও।" দাসী তার গায়ে হাত বুলোতে লাগল।

অনিলা বল্লে—"না, এখন ঘুমব না। তুমি তার কথা বল।"

দাসী বল্লে—কি আর বলব মা !"

"কেমন করে তোমার মেয়েকে হারালে ?"

"কেমন করে হারালুম ? হারিয়ে ফেল্লুম মা...মেলার ভিড়ে।"

"আর খুঁজে পেলেনা বুঝি !"

"না !"

"অনেক কাঁদলে ?"

"মন কাঁদে বৈ কি মা !"

অনিলার বুক থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

"তাকে আরো-ও খুঁজলে না কেন ?"

"খুঁজতে-খুঁজতেই ত এখানে এসে পড়লুম !"

"তবে তুমি আর এখানে থেকোনা—এখনই যাও। আমি ত ভালো হয়েছি !"

"তা বুঝি জাননা ?—আমি যে স্বপ্নে পেয়েছি আমার মেয়েকে আমি এইখানেই খুঁজে পাব ! তাই ত এইখানে পড়ে আছি। কত খুঁজে-খুঁজে কত পথ হেঁটে তবে এখানে এসেছি, তা জান ?"

"সত্যি ?"

"হ্যাঁ মা, সত্যি !"

"তাকে যখন হারাও, সে তখন কত বড়টি ?"

"খুব ছোট।"

"খুব ছোট ? তাহলে তার বোধ হয় তোমাকে মনে নেই।"

"কি করে থাকবে মা ? তার তখন জ্ঞান হয় নি।"

"আচ্ছা, এখন সে তোমার কথা মনে করে ?"

"তার বয়ে-গেছে মা, এ পোড়ার-মুখীকে মনে করতে !"

"না, না, দাসী, তুমি জাননা। সে রোজ রাত্রে শোবার সময় নিশ্চয় তোমার কথা ভাবে, তোমাকে দেখবার জন্যে লুকিয়ে-লুকিয়ে কাঁদে।"

"তুমি কেমন-করে জানলে মা ?"

"আমার যে ছেলেবেলা থেকে মা নেই, তাই জানি !"

"মায়ের কথা রোজ তোমার মনে হয় ?"

"হয় বৈকি—বড্ড মন-কেমন করে।"

টপ্ করে এককোঁটা চোখের জল অন্ধকারে অনিলার গালে এসে পড়ল।

অনিলা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"একি দাসী, কাঁদচ তুমি ?"

দাসী বল্লে—"না, ও আমার চোখের ব্যামো আছে, মধ্যে-মধ্যে জল পড়ে।"

অনিলা বল্লে—"আচ্ছা দাসী, এখন যদি তোমার মেয়েকে খুঁজে পাও, তাহলে খুব আহ্লাদ হবে, না ?"

"তা হবে বৈকি মা !"

"তোমার মেয়েরও খুব আহ্লাদ হবে, না ?"

"তা কি হবে ?"

"কেন ?"

"সে তো মা-বলে চিন্‌তে পারবে না আমায়।"

"চিন্‌তে নাই বা পারলে, তা বলে দেখে আহ্লাদ হবে না ?"

"তা কি হবে !"

"না দাসী, তুমি জাননা ! নিশ্চয় তারো খুব আহ্লাদ হবে।"

আবার আর-এক-ফোঁটা জল অনিলার গায়ে এসে পড়ল।

দাসী ধরা-গলায় বল্লে—"তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক মা!"

অনিলা খানিক চুপ-থেকে বল্লে—"আচ্ছা দাসী, তোমার মেয়েটি এখন কত বড় হয়েছে?"

"এই তোমার মতন।"

"আমার মতন?"

"হ্যাঁ, ঠিক তোমারই মতন।"

"তাহ'লে আমার মাও বোধ হয় তোমার মতন হবে, না?"

"তা হবে বৈ কি বাছা!—মাকে কি তোমার মনে পড়ে?"

"না।"

"একটুও না?"

"একটুও না। কিন্তু মা যদি এখন আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়, আমি তাঁকে ঠিক চিন্‌তে পারি!"

"চিনতে পার?"

"খুব পারি।"

"তাহলে তুমি তাকে নিয়ে কি কর?"

"তাকে দু-হাতে জড়িয়ে, চেপে রাখি—আর ছেড়ে দিই না।"

এবার এক-ফোঁটা নয়, ঝর-ঝর-করে চোখের জল অনিলার গায়ে ঝরে পড়ল।

অনিলা অন্ধকারে উঠে বসে খুঁজে-খুঁজে দাসীর হাত-ধরে বল্লে—"তুমি কাঁদচ কেন দাসী?"

"না মা, আর কাঁদব না।"—বলে দাসী আঁচল-দিয়ে চোখ মুছে নিলে। কিন্তু জল

এমনি-করে এক মা-হারা মেয়ে, আর-এক মেয়ে-হারা মা—এই দুজনের বুক-ভরা ব্যথায় রাত্রের অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠতে লাগল।

* *
*

কিছুদিন কেটে গেছে। অনিলা সুস্থ হয়ে উঠেচে। একদিন রাত্রে সে দাসীকে জিজ্ঞাসা করলে—"কৈ দাসী, তোমার মেয়েকে ত এখনো খুঁজে পেলে না! বোধ হয় তোমার স্বপ্ন মিথ্যা হল।"

দাসী বল্লে—"তাইত দেখচি মা!"

"তবে কি করবে?"

"কি করব, তা জানিনা।"—বলে সে একটা হতাশার দীর্ঘশ্বাস নিক্ষেপ করলে।

দাসীর সেবা তখনো অশ্রান্তভাবে চলেছে,—কামাই নেই। অনিলা যদিও এখন উঠে-হেঁটে বেড়াতে পারে, তবুও সে কচি-ছেলের মতো তাকে ধরে-ধরে নিয়ে বেড়ায়। অনিলাকে এখনো হাতে করে সে একটি কাজও করতে দেয় না। অনিলা অনেক সময় বাধা দেয়, সে শোনেনা। অনিলা আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে, এমন প্রাণের টান ওর এল কোথা থেকে? সে কিছুতেই তা বুঝতে পারে না। সে জানত, দাসীর অন্তরে যে বড় দাগাটি লেগে আছে, সেটি তার সেই হারানো-মেয়ে।—সে কিছুতেই তাকে ভুলতে পারচে না। তার এই দুঃখে অনিলারও ভিতরে-ভিতরে দুঃখু হত। কিন্তু সে কি করবে কিছুই ভেবে পেতনা। সে কি

পারে? কেমন-করে পারবে? পরের মা যদি তার মা হয়ে আসে, তা হলে তার কি মায়ের-দুঃখ দূর হয়? না। তাহলে দাসীর দুঃখও দূর হবে না। তবে সে তাকে ঠিক নিজের পেটের মেয়ের মতন যত্ন করে কেন? সে একদিন দাসীকে জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা, তুমি আমায় এমন মেয়ের মতন যত্ন কর কেন?"

দাসী বল্লে—"কেন করি, তা তোমায় কেমন করে বোঝাবো মা! আমার গুরু বলে দিয়েছেন, তোমার মতন মা-হারা মেয়েকে যত্ন করলে আমার হারানো-মেয়েকে একদিন ফিরে পেতে পারি।"

"তুমি তা বিশ্বাস কর?"

"বিশ্বাস না-করে যে আমার চলে না।"

"গুরু কি বলেছেন, কত দিনে পরে তোমার মেয়েকে ফিরে পাবে?"

"বলেছেন বৈ কি! তিনি বলেছেন, ঐ মা-হারা মেয়েকে যত্ন করতে-করতে সে যে দিন তোমাকে মায়ের মতন ভালোবাসবে, সেই দিন তোমার হারানো-মেয়ে ফিরে আসবে।"

"তাই বুঝি তুমি আমায় এত যত্ন কর?"

"হ্যাঁ মা, তাই।"

"তাহলে তুমি অন্য-কোনো মা-হারা মেয়ের কাছে যাও।"

"কেন, মা?"

আমি যে তোমায় কখনো মায়ের মতন ভালোবাসতে পারব না!"

"কেন পারবে না, মা?"

"কি করে পারব? তুমি যে আমার মা

"আমি যদি তোমার সেই হারানো-মা ফিরে আসতুম, তাহলে কি আমায় ভালোবাসতে?"

"না, না, তোমাকে আমি ভালোবাসতে পারতুম না।—কিছুতেই পারতুম না!"

"কেন পারতে না?"

"কেন পারতুম না? তোমাকে যে মন ভালোবাসতে চাইচে না।"

দাসী চুপ করে রইল।

অনিলা খানিকক্ষণ কি ভেবে বল্লে—"আচ্ছা দাসী, তুমি দেখতে কিছু খারাপ নও, কিন্তু তবু তোমাকে অমন বিশ্রী—নোংরা মনে হয় কেন? যার জন্যে তোমার দিকে চাইতে আমার সমস্ত মনটা কেমন ঘিন্‌ঘিন্‌ করে ওঠে! কেন এমন হয় বল ত?"

"আমি যে অনেক পাপ করেছি মা! সেই পাপের ময়লা আমার গায়ে লেপ্‌টে গেছে!"

"কি পাপ করেছ তুমি?"

"তোমার কাছে সে বলা যায় না, মা!"

"কিন্তু দাসী, তোমার হাতের ঐ স্নেহ-মাখা পরশ যখন অন্ধকার রাত্রে গায়ে এসে লাগে, তখন কি মনে হয় জান? মনে হয় আমার মা এসে যেন গায়ে হাত বুলোচ্চেন।"

দাসী ছল-ছল-চোখে অনিলার কাছে এগিয়ে গিয়ে বল্লে—"সত্যি মা, সত্যি?"

অনিলা বল্লে—হাঁ দাসী, সত্যি বটে। কিন্তু দিনের আলোয় আমার চোখে কি কুৎসিত তুমি,—কি বলব! তোমায় ছুঁতে আমার ঘৃণা হয়।"

"হা"-শব্দে দাসী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্লে।

অনিলা বলে যেতে লাগল—"কিন্তু তুমি আমায় বাঁচিয়েচ। অসুখের সময় তোমার [illegible]

দাসী চুপ করে রইল।

অনিলা বল্লে—"কিন্তু আমি ভাবি, জীবনে এমন যত্ন তো কারো কাছে কখনো পাইনি, তুমি পর হয়ে কোথা থেকে তা এনে দিলে!"

দাসী আর চুপ করে থাকতে পারলেনা; সে বলে উঠল—"কোথাও থেকে আন্‌তে হয়নি মা, সে আমার বুক-চুঁইয়ে আপনি ঝরে পড়েছে—তা কি তুমি টের পাওনি।"

"টের পেলেও বিশ্বাস করতে পারিনি!"

দাসী আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকলে।

... ... ... ...

"অনিলা, একবার কাছে সরে আয় মা!"

"কেন?"

"তোকে একবার বুকে জড়িয়ে নেব।"

"না, না, না। সে আমি পারব না!"

"আজ যদি তোর মা এসে ডাকে?"

"এখুনি তাহলে ছুটে যাই।"

"সে যদি আদর করে?"

"এখুনি তার গলা জড়িয়ে ধরি!"

"সে যদি তোর জন্য কাঁদে?"

"তা হলে আঁচল-দিয়ে চোখ-মুছিয়ে দিই।"

"তাহলে আয় মা, আমার কাছে আয়,—আমিই তোর মা।" বলে দাসী দুইহাত বাড়িয়ে কেঁদে উঠল।

অনিলা সভয়ে সরে গিয়ে চীৎকার করে উঠল—"মিথ্যে কথা!"

দাসী কাঁদতে-কাঁদতে বল্লে—"না মা, মিথ্যা নয়—এই হতভাগিনীই তোর মা!"

অনিলা বল্লে—"তুই সরে যা। পিশে-মহাশয় বলেচেন, আমায় মা অনেক-কাল মরে গেছে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক!—তোর মা অনেক কাল মরে গেছে বটে!"—বলে কান্নার উপর একটি বিকট ফুৎকার দিয়ে দাসী ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

শ্রীমাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

---

# শ্রীমূর্ত্তি-সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ

উড়িষ্যা-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত মনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় মাগুনিয়া দাস নামক একজন উড়িয়া কবির কবিতা হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে জগন্নাথ-ক্ষেত্রে বৌদ্ধোপাসনার জনশ্রুতি বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

পদটি এই—

দেখিলে সিংহাসনো পরে।
বিজয়ে বৌদ্ধ রূপরে॥
পদ অঙ্গুলী নাহি হাত।
শ্রীদারু বেশ জগন্নাথ॥

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথ-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ-রত বিশ্বকর্ম্মার নিষেধ-সত্ত্বেও রুদ্ধ মন্দির-দুয়ার খুলিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন, ইহা তাহারই বর্ণনা। অসময়ে দ্বার উন্মোচনের জন্য "জগবন্ধুর" মূর্ত্তি সমাপ্ত হইতে পারে নাই।

'দেউল তোলা' নামক উড়িয়া ভাষায় লিখিত অপর একখানি পুস্তকে বৌদ্ধ প্রবাদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উল্লেখ দেখা যায়:—

"এবে বৌদ্ধরূপে হরি নীলাচল পরে।
শ্রীমুখ দেখাই মুক্তি দেউছ সবারে॥

* * * *

দারুব্রহ্মরূপে মুহি এঠারে বসিবি।
বৌদ্ধরূপে নীলাচলে লীলা প্রকাশিবি॥

( জগন্নাথ দেবঙ্কর বরাই মূর্ত্তি ধারণে নাম চতুর্থ অধ্যায়—Nihara Press B. S. 1323. পৃঃ ৩৯ )

"কুশশয্যা করি রাজা সেঠারে শুইলে।
রাত্রি অর্দ্ধে জগন্নাথ স্বপ্নে দেখা দেলে॥
বোলন্তি রাজন তুহি ভালু কাঁহি পাঁই।
কলিযুগে বৌদ্ধরূপ ধরিবই মুহি॥
হস্ত নাহি বোলি যদি মনে কষ্ট তোর।
সুবর্ণর হাত রাজা করতু তিয়ার॥

( দেউল তোলা পঞ্চম অধ্যায়—পৃঃ ৫৭ )।

নিজ অবিমৃষ্যকারিতায় অনুতপ্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে জগবন্ধু কর্ত্তৃক সান্ত্বনা-দান-উপলক্ষে উড়িয়া কবি শিশুদাম দাস লিখিয়াছেন—

ঠাকুর বোইলে রাজা হইল কি বাই
কলিযুগে থিবুঁ আম্ভে বৌদ্ধরূপ হোই
তোহার উপায় রাজা এমন্ত করিবু
সুবর্ণর হাত গোড় মোর ভিয়াইবু

( দারুব্রহ্ম পৃঃ ২৯ )

শুধু উড়িয়া পুস্তকে নহে, হাতের লেখা পুরাতন বাঙ্গলা পুঁথিতেও জগন্নাথ ও বৌদ্ধ-অবতারের অভিন্নতা-সমর্থক উক্তি পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদ্ কার্য্যালয়ের অন্যতম কর্ম্মচারী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে নিম্নোদ্ধৃত দুইটি পদ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন—

নমো নমঃ বৌদ্ধ অবতার নীলাচলে।
পুনর্জ্জন্ম নহে জীবের যারেক হেরিলে॥

(কৃষ্ণদাস বিরচিত "নারদ সংবাদ" পুঁথি।)

কলিভবে অবতরি জগন্নাথ নাম ধরি
বৌদ্ধরূপ এ চান্দ বদন।
নীলাচলে করি বাস কৈল প্রভু পরকাশ
নিস্তারিতে কলিজীবগণ।

( হরি নারায়ণ দাস বিরচিত চণ্ডিকা মঙ্গল পুঁথি। )

উক্ত নারদ-সংবাদ পুঁথিখানি বাংলা ১০২৮ সালে লেখা। ইহার মালিক "নারায়ণ" পত্রের সম্পাদক প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়। দ্বিতীয় পুঁথিখানি ১২৪৯ সালে লিখিত; ইহা সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থশালায় রক্ষিত আছে।

উড়িয়া পুস্তক কয়খানির রচনা-কালনির্ণয় করিতে পারি নাই। 'দেউল তোলা' নিতান্ত আধুনিক বটে কিন্তু কবিকে ইংরাজী-শিক্ষিত বলিয়া সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখি না। হাণ্টার সাহেব, রামচন্দ্র-বিহার-রচয়িতা মাগুনিয়া পাটনায়েক অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। (Hunter's Orissa vol. II. P. 206 ) কিন্তু ক্ষেত্র-পুরাণ-রচয়িতা মাগুনিয়া দাস ও এই মাগুনিয়া পাটনায়েক যে অভিন্ন তাহা নিঃসন্দেহরূপে অবগত হইতে পারি নাই। শিশুদাম দাস অথবা মাগুনিয়া দাস, ইঁহারা কেহ যে দেশীয় বা বৈদেশিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণের জগন্নাথ মূর্ত্তি বিষয়ক বৌদ্ধ মতবাদের কথা জ্ঞাত ছিলেন, এরূপ মনে হয় না; তাহার উপর পুরাতন বাঙ্গলা পুঁথি দুইখানির প্রমাণ তো রহিয়াছেই। দেবীবরের সমসাময়িক আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক নুলো পঞ্চাননের "গোষ্ঠী কথা" গ্রন্থে লিখিত আছে—

"ইন্দ্রদ্যুম্ন বৌদ্ধ রাজা জগন্নাথে কীর্ত্তি।
সাম্যবাদী তবু বলায় ক্ষত্রিয় বৃত্তি॥" *

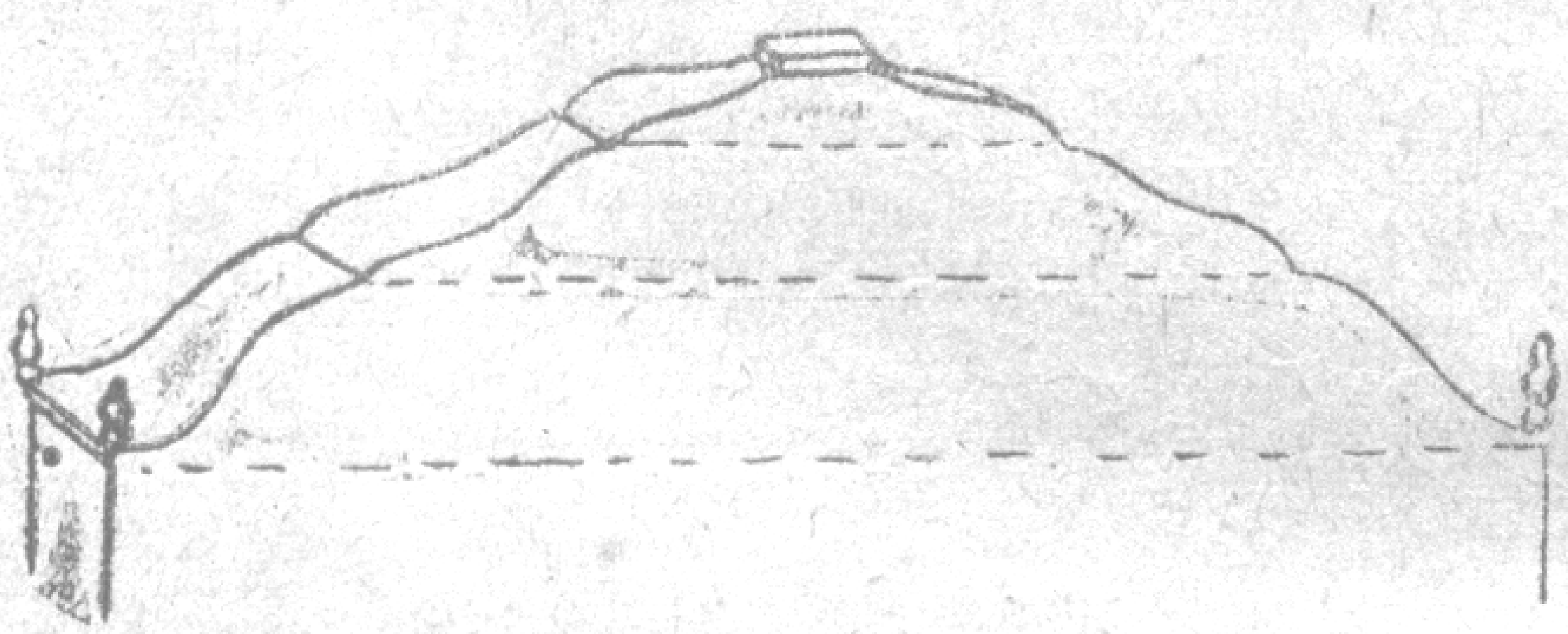
এই ইন্দ্রদ্যুম্ন পৌরাণিক ইন্দ্রদ্যুম্ন হইতে বিভিন্ন; সম্ভবতঃ ইনি পাল-বংশীয় রাজা ছিলেন। বেহারে মুসলমান-বাহিনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ হইয়া ইনি সপরিবারে জগন্নাথ ক্ষেত্রে পলায়ন করেন। বুকানান হ্যামিল্টনের মতে ইনিই রাজা প্রতাপরুদ্রের পূর্ব্বপুরুষ। (Eastern India. Vol II. pp. 23-24 quoted in J. B. O. R. S.) শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় অনুমান করেন, ইনি পাল-বংশীয় শেষ রাজা এবং সম্ভবতঃ দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে ১১৯৮ খৃঃ অব্দে ইনিই জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা বা পুনর্নির্ম্মাণ করেন (J. B. O. R. S. Vol V. pt. II p. 297)। ধর্ম্মপাল প্রভৃতি পালরাজগণ যে বৌদ্ধ ছিলেন এ কথা বাঙ্গালী পাঠকের অবিদিত নহে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "নারায়ণ" পত্রে (শ্রাবণ সংখ্যা ১৩২৬) তাঁহার ক্রমশঃ-প্রকাশ্য ঐতিহাসিক কথা-গ্রন্থে উৎকলের সহজিয়া বৌদ্ধ মতাবলম্বী রাজা ইন্দ্রভূতি এবং তাঁহার কন্যা, "অদ্বয়—সিদ্ধি" নামক গ্রন্থ-রচয়িত্রী, ভগবতী লক্ষ্মীঙ্করার উল্লেখ করিয়াছেন; সুতরাং উড়িষ্যায় বৌদ্ধ প্রবাদ যে বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূজ্যপাদ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুরী প্রবাসকালে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সদাশিব কাব্যকণ্ঠের সহিত পুরীতীর্থের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট রক্ষিত মাদলা পঞ্জীর (তাল পত্রে লিখিত শ্রীমন্দির বৃত্তান্তের) রাজ ভোগ নামক ঐতিহাসিক অংশের নকল হইতে প্রয়োজনীয় অনুবাদ করাইয়া লিখিয়া লইয়াছিলেন (আর্য্যাবর্ত্ত, শ্রাবণ ১৩১৮, পৃঃ ২৯১)। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও বলিয়াছেন যে মাদলা পঞ্জীতে লিখিত আছে, অশোকে দেব যখন সম্রাট ছিলেন, তখন বৌদ্ধ ভাবে জগন্নাথের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল; (২৯০ পৃঃ) সুতরাং এক সময়ে শ্রীমন্দিরে যে বৌদ্ধ প্রভাব বলবৎ ছিল, তাহা অস্বীকার করার কোন কারণ দেখি না। সার জে, জি, উড্রফ মহোদয় শ্রীমন্দিরের কোন পূর্ব্বতন অধ্যক্ষের নিকট অবগত হইয়া ছিলেন যে মন্দির-গাত্রে একস্থানে বুদ্ধ মূর্ত্তি ছিল; তাহা এক্ষণে ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। মাদলা পঞ্জীর ঐতিহাসিকতা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার না করিলেও ভাষা গ্রন্থাদিতে সংরক্ষিত পুরাতন প্রবাদ একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সমীচীন নহে। বৌদ্ধ প্রভাববাদিগণ শ্রীমূর্ত্তির উদ্ভব সম্বন্ধে কিন্তু যে দুইটি বিভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন, তাহার কোনটিই সেরূপ সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীযুক্ত মনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নিজ গ্রন্থে কর্ণেল সাইকস্ (Colonel Sykes) নামক যে লেখকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার মতে জগন্নাথদেবের "অপরূপ" (uncouth) মূর্ত্তি বৌদ্ধ চৈত্যেরই



বৌদ্ধ চৈত্য

সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। (M. Ganguly's Orissa p. 406) বৌদ্ধ চৈত্যের চিত্র ও জগন্নাথ মূর্ত্তির প্রতিকৃতি তুলনা করিলে এ ধারণা যে কাল্পনিক, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। বৌদ্ধযুগে হয় তো শ্রীমন্দিরে চৈত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু বৌদ্ধ চৈত্য মুখ ও হস্তাদি অবয়ব-বিশিষ্ট কোন মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত আর কোথাও মিলিয়াছে বলিয়া



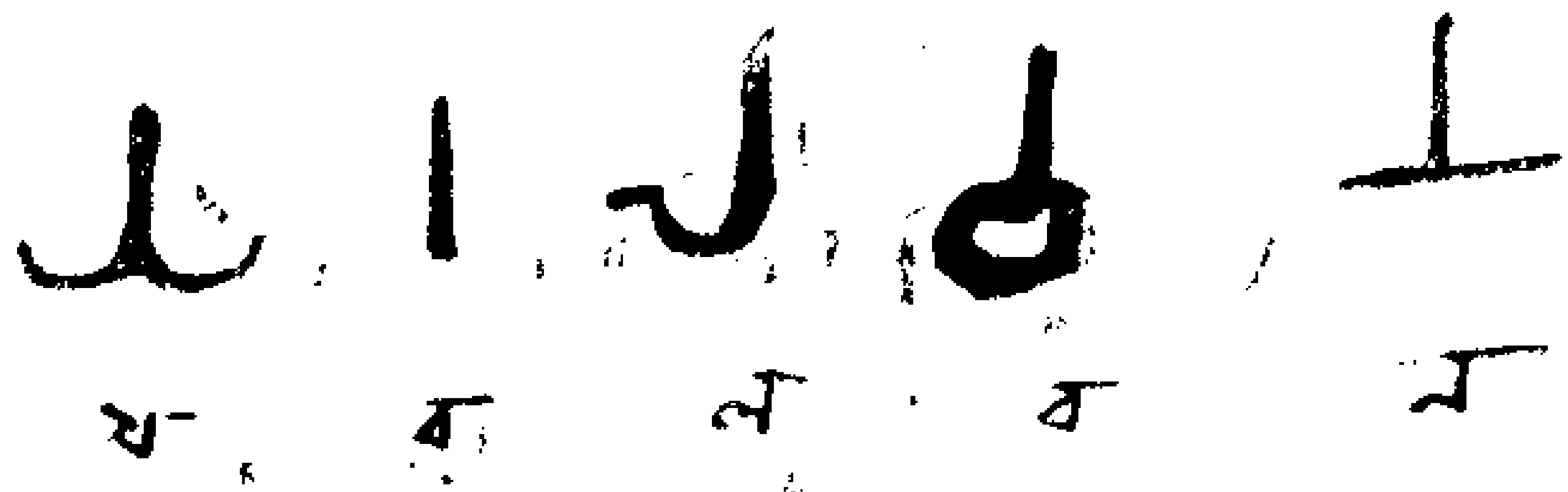
উড়িষ্যার মন্দির-মণ্ডপের ছাদ

মনে হয় না। এরূপভাবে উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করিলে মন্দির মণ্ডপের ছাদ হইতেও হয়তো নূতন তথ্য বাহির করা চলে। বৌদ্ধ প্রভাব বিনষ্ট হইলে যখন বিভিন্ন প্রকার পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত হইল, তখনও দুই একটী পূর্ব্বতন রীতির স্মৃতি বিলুপ্ত না হওয়ায় সেগুলি অদ্যাপি সংরক্ষিত হইয়াছে, এ অনুমান কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয় না। জগন্নাথের "নব কলেবর" গ্রহণ-কালে দারুদেহের মধ্যে কোনও "বীজ পদার্থ" বা "ব্রহ্ম পদার্থ" সংরক্ষিত হয়—এ কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। এ পদার্থটি যে কি তাহা কোন শিক্ষিত ব্যক্তির পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই এবং ঘটিবে কি না তাহাও সন্দেহ,—সুতরাং উহা তথাগতের অস্থি বা দেহাংশেষ (relic) কিম্বা শালগ্রাম শিলা মাত্র তাহা এক্ষণে নিঃসন্দেহে বলা সহজ নহে। পাণ্ডাগণের নিকট হইতে প্রকৃত

কথা যে প্রকাশিত হইবে সে সম্ভাবনাও বড় অল্প। বৌদ্ধগণ স্তূপাদিতে ও মূর্ত্তি মধ্যে যে এইরূপ অস্থি বা "শরীর" রক্ষা করিতেন, তাহা ই'চিং লিখিত প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়। শুনিতে পাই এ প্রথা অদ্যাপি নেপাল দেশে প্রচলিত। ইচিং ( I-tsing ) লিখিয়াছেন * যে লোকে যখন স্বর্ণ, রৌপ্য লৌহ প্রভৃতি ধাতু-নির্ম্মিত কিম্বা প্রস্তর, মৃত্তিকা এবং লাক্ষাসব ও ধূনা (lacquer) প্রভৃতি উপাদানে গঠিত মূর্ত্তি বা চৈত্য নির্ম্মাণ করে কিম্বা তুষার-ধবল বালুকা-স্তূপ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে, তখন তাহারা তন্মধ্যে দুই প্রকার "শরীর" রক্ষা করে—(১) মহাস্থবির বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের কোন অংশ,—(২) কিম্বা কার্য্য-কারণ শৃঙ্খল-জ্ঞাপক যে ধর্ম্ম হেতু প্রভবা প্রভৃতি 'গাথা' ( gatha of the chain of causation )। মনে হয় দারুমূর্ত্তির উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইলে জীর্ণতা-জনিত বিগ্রহ দেহের পরিবর্ত্তন-প্রথা অবশ্যম্ভাবী জানিয়া উহার আনুষ্ঠানিক পবিত্রতা অবিচ্ছেদে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এই বৌদ্ধপ্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকিবে। শিবদেবের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে যবন-রাজ রক্তবাহু পুরী আক্রমণ করায় জগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তি দক্ষিণ দেশে শোণপুরে স্থানান্তরিত ও মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করা হইয়াছিল। ( আর্য্যাবর্ত্ত ১৩১৮ পৃঃ ২৯২ ) স্বর্গীয় হাণ্টার সাহেব এই ঘটনাকে ঐতিহাসিক বৃত্তান্তে জগন্নাথদেবের প্রথম আবির্ভাব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পরও শ্রীমূর্ত্তিকে নাকি বার বার তিনবার চিল্কাহ্রদের ভিতর লুকাইয়া রাখিতে হইয়াছিল। (Hunter's Statistical Account, Puri, p. 42 ) এই সকল বিভিন্ন সময়ে কাষ্ঠময় দেবময়-মূর্ত্তির অল্পাধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হওয়া অসম্ভব নহে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, পূর্ব্বে জগন্নাথদেবের চারিটি হস্ত ছিল, পরে এইরূপ আকস্মিক দুর্যোগাদির ফলে মূর্ত্তি বিনষ্ট হওয়ায় এখন দুইটি ভুজ মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। উৎকলখণ্ডেও দেখিতে পাই, জগন্নাথ দেবের আদিমূর্ত্তি নীলমাধব "পীনায়ত স্কন্ধযুগ জানুদীর্ঘ চতুর্ভুজ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ( উ, খ, ১০ ২৫ )। কালাপাহাড় পাঠান-রাজত্ব-কালে উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া যে জগন্নাথ মূর্ত্তি দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল, সে প্রবাদ অদ্যাপিও প্রচলিত রহিয়াছে। এমনও শুনা যায়—সেই দগ্ধ মূর্ত্তির অবশিষ্ট অংশই নাকি এখন "ব্রহ্মপদার্থ" রূপে পরিচিত! একেই তো এই সকল পরস্পর-বিরোধী মতবাদের সামঞ্জস্য করা বড় সহজ নয়, তাহার উপর উহা যদি কতকাংশে জন-প্রবাদের উপর নির্ভর করে—তাহা হইলে ত কথাই নাই। বৌদ্ধত্ব বিষয়ক অপর মতবাদটি শুধু প্রাচীন আক্ষরিক রূপান্তরের উপর নির্ভর করিতেছে। সেই জন্য এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিচার অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া বোধ হয়। ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র নিজ গ্রন্থে ( Antiquities of Orissa vol II, p. 126 ) এই মত বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করিয়াছেন, নিম্নে তাহার ভাবানুবাদ প্রদত্ত হইল।

* A record of the Buddhist religion as practised in India and Malaya Archipelago by I. Tsing translated by Dr. J. Takakusu, p. 150.

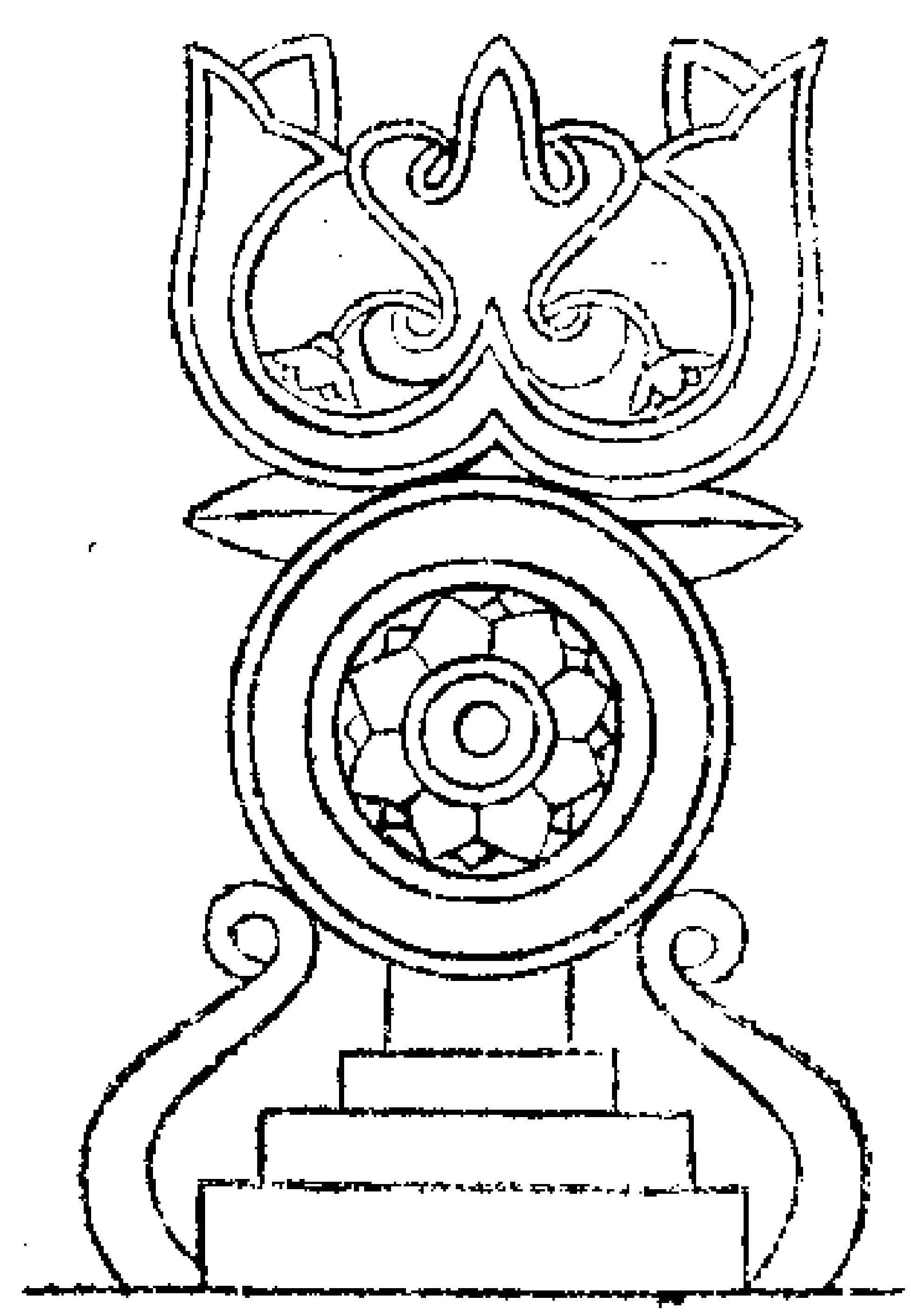
পঞ্চ "বীজ" বর্ণ।



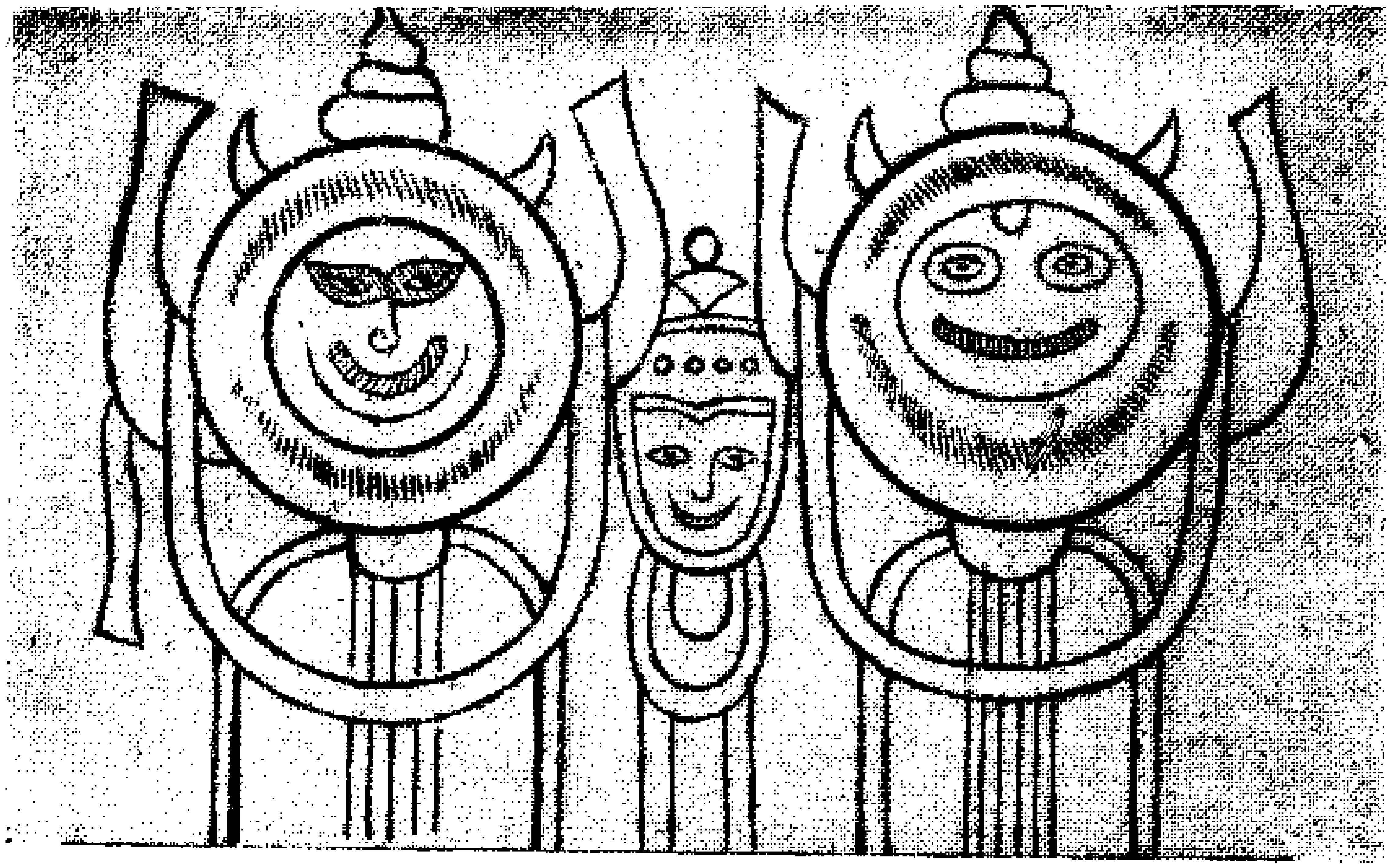



ত্রিগুণাকৃতি চিহ্ন

ব্রাহ্মী লিপির য, র, ল, ব, ন এই কয়টি বর্ণ বৌদ্ধ সাধকগণের নিকট যথাক্রমে মরুৎ, তেজ (অগ্নি), অপ (বারি), ক্ষিতি ও ব্যোম এই পঞ্চভূতের বীজ বলিয়া পরিচিত ছিল। জড় প্রকৃতির সাঙ্কেতিক চিহ্ন স্বরূপ এই পঞ্চাক্ষর সম্মিলিত হইয়া পরে ত্রিগুণাকৃতি ধারণ করে। জড় প্রকৃতির সহিত বুদ্ধের সম্মিলনে সঙ্ঘের উৎপত্তি এবং ধর্ম্ম বুদ্ধ ও সঙ্ঘ লইয়াই বৌদ্ধ ধর্ম্মের ত্রিত্ত্ববাদ (Trinity)। 'ধর্ম্মের' বিশিষ্ট নিদর্শন চক্রের সহিত এই ত্রিগুণাকৃতি চিহ্নটি সম্মিলিত হইয়া ক্রমশঃ ত্রিত্ত্ববাদের সঙ্কেতরূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। জড় প্রকৃতি ও বুদ্ধের সম্পর্ক বিষয়ে—বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ ছিল বলিয়া জানা যায়। জড়বাদীদিগের মতে জড় প্রকৃতির স্থান বুদ্ধ অপেক্ষা বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত আবার অন্য দলের মতে বুদ্ধ বা অন্তরাত্মা সর্ব্বদা জড় প্রকৃতির ঊর্দ্ধে বিরাজমান। এই মত-বৈলক্ষণ্য-হেতু প্রায়ই দেখা যায়—যে চক্র-চিহ্নটি ত্রিগুণ চিহ্নের কখনও উপরে কখনও বা নীচে রহিয়াছে। চিহ্নদ্বয়ের অবস্থান যেরূপই হউক না কেন, উভয়ে মিলিত হইলেই যে সঙ্ঘ দ্যোতনা করে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাঞ্চীর একটি তোরণ-



(বৌদ্ধ ত্রিত্ত্ববাদজ্ঞাপক সাঙ্কেতিক চিহ্ন



স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল বর্ণিত তথাকথিত 'ত্রিমূর্ত্তির' চিত্র

দ্বারের উপর চক্র ত্রিশুণচিহ্নের নিম্নে রহিয়াছে এরূপও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। একস্থানে এই রূপ তিনটি চিহ্ন এক শ্রেণীতে সাজানো। অপর একটি তোরণের উপর চিহ্নটি বেশ শিল্প-চাতুর্য্যের সহিত সন্নিবিষ্ট। ইহার রেখা গুলি সুবঙ্কিম, দেখিলেই বঙ্কীর কারুকার্য্যে দক্ষতা স্বতঃই প্রতীয়মান হয়। কিরূপ ক্রম বিবর্ত্তনে চক্র ও ত্রিশূল Disc-crescent symbol নব আকুতিযুক্ত মানবীয় মূর্ত্তিতে পরিণত হইল, তাহার ধারাবাহিক বিবরণ এ-যাবৎ পাওয়া যায় নাই। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন, জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরাম এক সারিতে সাজান এইরূপ তিনটি সঙ্ঘ-জ্ঞাপক চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে; মুখ চোখ আঁকিয়া উপরে একখান কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিলেই চক্র-ত্রিশুণ-সমবায়ে কল্পিত এই বৌদ্ধ চিহ্নত্রয় অনায়াসেই জগন্নাথ মন্দিরের ত্রিমূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত হইবে।

ত্রিমূর্ত্তি বিষয়ে অন্য এক প্রকার আক্ষরিক মত আজকাল হিন্দুদিগের মধ্যেও প্রচলিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজে যন্ত্রপূজা অপরিচিত নহে; এই হেতুবাদে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সদাশিব সার্ব্বভৌম মহাশয় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তিত্রয় প্রণবের অ, উ, ম, এই তিনটি অক্ষর-জ্ঞাপক চিহ্ন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এ মতটিকে কতকটা আধ্যাত্মিকও বলা যাইতে পারে। বৌদ্ধ-বাদীদিগের ন্যায় উহাতে শুধু আকৃতিগত সাদৃশ্যে জোর দেওয়া হয় নাই। এই প্রবন্ধে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বর্ণিত তথাকথিত 'ত্রিমূর্ত্তির' চিত্রের যে প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে তাহার সহিত আমাদের চিরপরিচিত জগন্নাথ মূর্ত্তির যথেষ্ট পার্থক্য উপলব্ধি হয়। এখন বিশেষজ্ঞেরাই বলিতেছেন যে উহাতে হাত, মুখ, চোখ প্রভৃতি যেন জোর করিয়া

যেন-তেন প্রকারেণ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জগন্নাথের হাত কতকটা সম্মুখ-ভাগে প্রসারিত—ওরূপ ভাবে মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে দেখা যায় না। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত কোণার্ক মন্দিরে মহিষ-মর্দ্দিনী মূর্ত্তি ও শিবলিঙ্গের সহিত একত্র-সন্নিহিত জগন্নাথের যে প্রস্তর-খোদিত চিত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও দেখা যায় যে, জগবন্ধুর করপল্লব-বিহীন হস্ত দুইটী সম্মুখ ভাগেই বিস্তারিত। * শুধু এক সুভদ্রা মূর্ত্তির মূলের আঙ্গুল যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। স্বর্গীয় ডাঃ রাজেন্দ্রলালের ব্যাখ্যায় যথেষ্ট কৌশল ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শিত হইলেও বর্ত্তমানকালে পণ্ডিত সমাজে উহা আর সেরূপ আদৃত নহে। সরকারী গেজেটিয়ার গ্রন্থেও উহা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

পুরীর মন্দিরে রক্তবর্ণ সুদর্শন চক্রের মূর্ত্তি যে জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরামের সহিত একত্রে রত্নবেদীর উপর স্থানে পাইয়াছে একথা হিন্দু তীর্থদর্শক মাত্রই বোধ হয় অবগত আছেন। মন্দিরের বাহিরেও সুদর্শনচক্র নামক ঋজু শিবলিঙ্গবৎ একখণ্ড প্রস্তর আছে। রাজা রাজেন্দ্রলালের মতে ইহা বৌদ্ধধর্ম্ম চক্রেরই প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি। বৌদ্ধ প্রভাব অস্বীকার না করিলেও সর্ব্বত্রই বৌদ্ধ-কীর্ত্তি পরিকল্পনা আমাদিগের নিকট সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এই প্রস্তরটি উচ্চে প্রায় আট গজ হইবে। রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন যে এই প্রস্তরখণ্ডের শিরোভাগেই ধর্ম্মচক্র স্থাপিত হইত। চক্র চিহ্ন কিন্তু বৌদ্ধ বা হিন্দুর নিজস্ব নহে জৈন গুহাদিতেও এরূপ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়! সাধারণ চক্র-চিহ্নের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম—সুদর্শন চক্রের পূজা যে কেবল জগন্নাথ মন্দিরেই হইয়া থাকে এরূপ নহে। দক্ষিণ ভারতেও সুদর্শন চক্র শ্রীবৈষ্ণব মন্দিরে 'চক্রপেরুমল' নামে পূজিত হইয়া থাকে, তবে শ্রীক্ষেত্রের বিশেষত্ব এই যে অপর মূর্ত্তিত্রয়ের ন্যায় ইহাও সমভাবে রত্নবেদীতে স্থান পাইয়াছে এবং ভগবানের অংশ-বিশেষ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশাস্ত্রী মহাশয় মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত তাঁহার "দক্ষিণ ভারতীয় দেব ও দেবীমূর্ত্তি পরিচয়" ( South Indian Images of Gods and Goddesses) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে শিল্পশাস্ত্রমতে সুদর্শনের ষোড়শ হস্ত, তিনটি নেত্র, উদ্দাতদন্ত, কেশ অগ্নিশিখাবৎ এবং বর্ণ অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল। তিনি বিভিন্ন হস্তে চক্র, ধনু, পরশু, তরবারি, তীর, ত্রিশূল, পাশ, অঙ্কুশ, পদ্ম, বজ্র, চর্ম্ম (ঢাল) হল, মুষল, মুদ্গর বর্শা প্রভৃতি ধারণ করিয়া থাকেন। নৃত্যের ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান সুদর্শনের সুসজ্জিত ধাতব মূর্ত্তি—একটি ধাতব hexagon বা ষট্ কোণের মধ্যেই স্থাপিত হইয়া থাকে। এই ষট্ কোণের গাত্রেও অগ্নিশিখাদির চিহ্ন দেখা যায়। চক্রাকার অগ্নিশিখার মধ্যে নৃত্য করিতে

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত পুরীতীর্থ গ্রন্থে স্নানমঞ্চে অবস্থিত জগন্নাথদেবের আলোকচিত্রের যে প্রতিরূপ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে মূর্ত্তির হস্তদ্বয় সম্মুখভাগেই অবস্থিত। অবশ্য বাহু দুইটি 'খাড়া'ভাবে উঁচু হইয়া রহিয়াছে, পট্টুয়ার অঙ্কিত এরূপ চিত্রও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়।

করিতে সুদর্শন যে শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন শিল্পীর এই পরিকল্পনা দৃষ্টি মাত্রেই বুঝিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। দক্ষিণ ভারতে চতুর্হস্ত ও অষ্টহস্ত বিশিষ্ট পেরুমল মূর্ত্তিও দেখা যায়। এ শ্রেণীর সকল মূর্ত্তির হস্তেই চক্রাস্ত্র থাকে। মান্দ্রাজ ও উৎকলে এখনও বেশ মেশামেশি ভাব রহিয়াছে, এবং ধর্ম্মোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠান ব্যাপারে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা গিয়া থাকে। পেরুমলের এত প্রকার বিভিন্ন মূর্ত্তির একটিও যে উড়িষ্যায় প্রচলিত হয় নাই ইহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য বলিয়া মনে হয়। পুরীধামের এই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সুদর্শনের সহিত পেরুমলের কোনও সাদৃশ্য দেখিতে পাই না। ইহাতে মনে হয় যে শ্রীমন্দিরে যে মূর্ত্তি সুদর্শন নামে পরিচিত, তাঁহার বোধ হয় আদৌ এ নাম ছিল না।

হিন্দুর বিশ্বাস, অপৌরুষেয় দারু হইতে নির্ম্মিত এই মূর্ত্তি-চতুষ্টয় ভগবান স্বয়ং প্রকাশিত করিয়াছিলেন, "এবন্তু মূর্ত্তয়স্তেন চতস্রো বৈ প্রকাশিতাঃ" (উৎকল খণ্ড ১৯ অধ্যায় ১৮)। স্নান-যাত্রার সময়েও সুদর্শন মূর্ত্তি অপর মূর্ত্তি-ত্রয়ের সহিত একত্র নীত হইয়া থাকে; সুতরাং এটিকে নেহাৎ আনুষঙ্গিক বলিয়া ছাঁটিয়া দেওয়া চলে না। অবন্তীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন যে ব্রহ্মার আদেশ-ক্রমে এস্থলে এই দারুময় মূর্ত্তিচতুষ্টয় প্রতিষ্ঠা করাইয়া পূজা করিবেন, এ ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখও উৎকল খণ্ডে দেখিতে পাই। "তদাদেশাদ্দারুময়ং প্রভো র্লক্ষচতুষ্টয়ং। পূজয়িষ্যতি ভক্ত্যা চ প্রতিষ্ঠাপ্য স্বয়ম্ভুবা" (ঐ, ঐ ৮, ৪৪)। তিনটির স্থানে যদি চারিটি আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে ত্রিত্ব-বাদের মর্য্যাদা আর পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকে না। অপর পক্ষ স্বভাবতঃই বলিবেন, ত্রিগুণ ও চক্র-চিহ্নের সমবায়ে যদি মূর্ত্তিত্রয় উদ্ভূত হইবে তাহা হইলে শুধু চক্রজ্ঞাপক অপর এইরূপ একটি মূর্ত্তি পরিকল্পনার কারণ কি? আর এক কথা হিন্দু পূজায় anthropomorphism বা মানবীয় রূপাদি আরোপের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। জনার্দ্দন বিষ্ণুর দুইপার্শ্বে যে দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বামন-বৎ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার একটী চক্র ও একটী গদার personified মূর্ত্তি। বিষ্ণুমূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে অপর যে দুইটি স্ত্রী-মূর্ত্তি থাকে তাহার একটি শ্রীদেবী ও অপরটি ভূদেবী। জগন্নাথ যে বিষ্ণুরই অন্যতম রূপ তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মী (শ্রীদেবী) ও ভূদেবীর দুইটি ক্ষুদ্র ধাতব মূর্ত্তি বেদীর উপর রক্ষিত হইয়া থাকে। অনুমান হয় ইহা পরবর্ত্তী কালে অনুষ্ঠিত। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় হেমাদ্রি ব্রত—খণ্ড ১ম অধ্যায় হইতে তদ্রচিত "বিষ্ণু মূর্ত্তির পরিচয়" গ্রন্থে (পৃঃ ১৯) যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দেখিতে পাই —"দক্ষিণে তু গদাদেবী তনুমধ্যা সুলোচনা" এবং "বামভাগগতশ্চক্র কার্য্যোলম্বোদর স্তথা, সর্ব্বাভরণসংযুক্তো বৃত্তবিস্ফারিতেক্ষণং" সুতরাং দেবতার সহিত চক্রের পূজা হিন্দু-ধর্ম্ম-বহির্ভূত ব্যাপার এ কথা কোনমতেই বলা চলেনা। জনার্দ্দন মূর্ত্তির পার্শ্বে চক্রের যেরূপ মানবীয় মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে এবং উহাতে যে প্রকার নরাকৃতি পরিগ্রহণ-ধারা (personification) অবলম্বিত হইয়াছে

তাহার সহিত দারুব্রহ্মের পার্শ্বস্থ সুদর্শন মূর্ত্তির এরূপ আকৃতি-গত পার্থক্যের কারণ কি তাহা অবশ্য অভিজ্ঞগণের বিবেচ্য। জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মের উপাসনা-পদ্ধতি যাঁহারা অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্বতন মানব সমাজের cult image গুলি যে সেরূপ সুসংস্কৃত ও কলাসম্পদযুক্ত ছিল না, তাহা বোধ হয় স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না। প্রচলিত মূর্ত্তি-পরিগ্রহণ-ধারা হইতে এই বিভিন্নতার ইহাই প্রকৃত কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। আর দারুময় মূর্ত্তি-চতুষ্টয় দেখিয়া মনে হয় যে পূর্ব্বে সম্ভবতঃ ইহা ভাগবত মতোক্ত বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের চতুর্ব্যূহের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল; বর্ত্তমানকালে ভ্রমবশে ভিন্নরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই ভাগবত ব্যূহের অস্তিত্ব যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল, তাহা সাহিত্যের প্রমাণ হইতেই অবগত হওয়া যায়। বলদেব ও বাসুদেবের একত্র উপাসনা বড়ই বিরল। এক পুরীতীর্থ ব্যতীত অপর কোথাও ইহার বড় নিদর্শন দেখা যায় না। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয় শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ দেব, বলরাম (সঙ্কর্ষণ) ও সুভদ্রার একত্র পূজা-পদ্ধতি, মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে জাতিভেদজনিত স্পর্শ-দোষ রাহিত্য এবং শবর-কুলোদ্ভব বলিয়া বিবেচিত 'দৈত্য'গণের পৌরোহিত্যে নিয়োগ প্রভৃতি খণ্ডপ্রমাণ উল্লেখ করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে সম্ভবত এ সকল অনুষ্ঠান সুপ্রাচীন "পাঞ্চরাত্র" নামক অবৈদিক আচারের সামান্য অবশেষ মাত্র। (R. Chandra's Indo-Aryan Races pp, কেহ কেহ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া থাকেন। চতুর্ব্যূহের সহিত সুভদ্রার সম্পর্ক নাই বটে, কিন্তু ব্যূহ-প্রণালীর উপাসনা-হেতু ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত পৌরাণিক অবতার-বাদের প্রচার সম্বন্ধে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিতেছিল বলিয়া (vide Indo-Aryan Races) উহা ক্রমশ এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। ভ্রাতা-ভগ্নীর পূজা অপেক্ষা দেবতা ও তাঁহার শক্তির একত্র-উপাসনা হিন্দু ধর্ম্মে অধিক প্রচলিত হইলেও পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন ধর্ম্মে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সুভদ্রা জগন্নাথের ভগিনী হইলেও তিনি শক্তি-স্বরূপা সর্ব্ব-চৈতন্যরূপিণী লক্ষ্মীদেবী বলিয়াই পরিচিতা। উৎকল খণ্ডে লিখিত আছে—

(শ্লোক ১৩—১৫, ও ১৭ আধ্যায়)

"একগর্ভপ্রসূতত্বাদ্ব্যবহারোঽথ লৌকিকঃ
ভগিনাবলদেবস্ত হেবা পৌরাণিকী কথা।

*  *  *  *

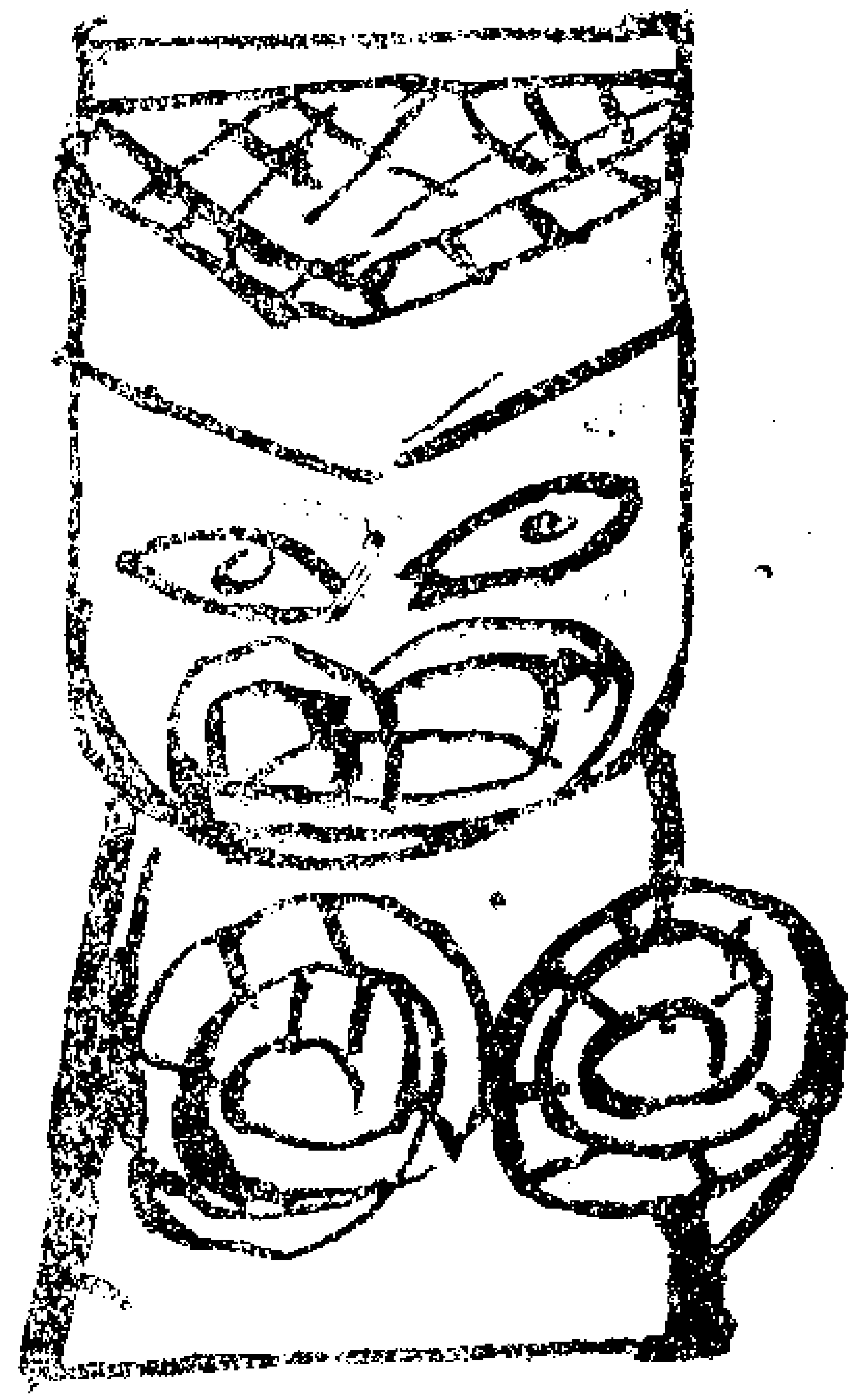
পুংনাম্না ভগবান বিষ্ণু স্ত্রীনাম্না কমলালয়া।

*  *  *  *

তস্য শক্তিস্বরূপেয়ং ভগিনী স্ত্রী প্রবর্ত্তিকা॥"

সুভদ্রা ও জগন্নাথ দেবের এই সম্বন্ধ মিশর দেশের Ra (রা) দেবতা ও Isis (আইসিস্) দেবীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অন্যত্র চন্দ্র, সূর্য্যের ভগিনী রূপে পূজিত হইতেন, এরূপ কথাও শুনা গিয়াছে। মূর্ত্তি তিনটি যদি শবর বা অপর কোনও জাতির গ্রাম্য দেবতার অনুকরণে নির্ম্মিত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্ম এ বিচিত্রতার জন্য দায়ী হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়

মধ্যে—যাঁহারা প্রথমে উৎকলে পদার্পণ করেন তাঁহারা প্রাচীন অধিবাসী শবর দলকে অনুগত করিবার অভিলাষে, তাহাদের স্থাপিত মূর্ত্তির অনুকরণে দারুমূর্ত্তির পূজাই প্রচলিত করিয়াছিলেন।" (আর্য্যাবর্ত্ত, শ্রাবণ ১৩১৮ পৃঃ ২৮৯)। দারুমূর্ত্তি (totem poles) যে বহু আদিম জাতির মধ্যে প্রচলিত তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অজ্ঞাত নহে। ১৯০১ সালের Royal Anthropological Institute নামক ইংলণ্ডীয় নৃ-তত্ত্ব-বিষয়ক সমিতির পত্রিকায় শ্রীযুক্ত এইচ লিং রথ (H. Ling Roth) নবজীলণ্ডবাসী মায়োরি জাতির টাটু ও মোকো (Tatu and Moko) নামক প্রবন্ধে প্রচলিত প্রথানুযায়ী কাষ্ঠে খোদিত একটি মায়োরি মুখের (Conventionalized Maori race) চিত্র দিয়াছেন। এই অসম্পূর্ণ ভাস্কর্য্যের একটি রেখা-চিত্র এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইল। শবর জাতি উড়িষ্যাদেশে অদ্যাপি বিদ্যমান। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় উড়িষ্যার শবরদিগের ভাষার সহিত মুণ্ডাগণের ভাষার সাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। (The Indo-Aryan Races p. 9) উড়িষ্যা-বাসী ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বি, এন, মিশ্র মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি—যে উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশে গঞ্জাম এজেন্সী ট্রাক্ট (Ganjam Agency Tract) বিভাগের অন্তর্গত বালিগুড়া মহকুমায়—"শৌরা" নামে অভিহিত শবর জাতি অদ্যাপি মুখ ও চক্ষু সংযুক্ত কাষ্ঠখণ্ড (wooden poles) পূজা করিয়া থাকে এবং এই সকল মূর্ত্তি ও প্রস্তর খণ্ডাদির সম্মুখে বলি প্রভৃতিও



মায়োরীদিগের (প্রচলিত প্রথানুযায়ী) কাষ্ঠখোদিত মুখ

প্রদত্ত হয়। দারুব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে "নীল মাধব" নামক রত্ন মূর্ত্তি বা প্রস্তর যে শবরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইত তাহা উৎকল খণ্ডে বর্ণিত আছে। শ্রীমন্দিরে "শোয়ার" দিগের অস্তিত্ব অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই, এখনও তাহারা জগন্নাথ দেবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। ইহারই যে "শবর" গণের বংশধর অনেকেই তাহা অনুমান করিয়া থাকেন অবশ্য করোটি মাপিয়া বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে ইহা আজিও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, "শোয়ার" শব্দ সূপকারের অপভ্রংশ; ইহা মানিয়া লইলেও মন্দিরের পুরোহিত 'দৈতা'গণের শবর বংশ হইতে উদ্ভব হওয়া সম্বন্ধে প্রবাদ যে কি করিয়া

উড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা তো ভাবিয়া পাই না। উৎকল খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে শবরপতি বিশ্বাবসু কর্ত্তৃক ইন্দ্রদ্যুম্নের পুরোহিত বিদ্যাপতির নীলমাধব-সন্নিধানে গমনের যে বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে বেশ বাস্তবতার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় ( উ, খ, ৮অ, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮ )। একজন মাত্র মনুষ্যের গমনযোগ্য সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় পথ তাহাও আবার প্রস্তর ও কণ্টকে আবৃত, নিকটেই শবরদীপক পল্লী শবর জাতির গৃহ-সমূহে বেষ্টিত ( উ, খ, ৭ম, ২৮, ২৯ )। এই একপদী পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা ছায়াসঙ্কুল মহৎ বটবৃক্ষের নিকট উপনীত হইলেন। বিদ্যাপতি শুনিলেন, সেই নিকুঞ্জের অভ্যন্তরেই সাক্ষাৎ জগন্নাথ বিরাজমান। শবরদিগের দেবতা যদি এইরূপ দুর্গম স্থানে বৃক্ষতলে না থাকিবেন তো থাকিবেন কোথায়?

ভারত-প্রদক্ষিণ গ্রন্থে ( পৃঃ ১৭, ১৮ ) শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় জগন্নাথ মূর্ত্তির অসম্পূর্ণতা প্রসঙ্গে দ্রাবিড় ও কর্ণাটী গ্রাম্য দেবতা মনরস্বামী ও তাঁহার মাতা পচুম্মা এবং বল, সেম, ধয়দ প্রভৃতি অনুচর পিশাচ-বর্গের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে গ্রাম্য-দেবতা প্রায়ই ভূতযোনি, এই কারণে বিকলাঙ্গ। ভাস্কর বিদ্যার আদিম অবস্থায় খোদিত অবয়ব বিকটাকার হওয়াই সম্ভব। বৈষ্ণবের যুগলোপাসনা প্রভাবে সুভদ্রা শক্তির স্থান অধিকার করিয়াছে ( Op. Cit. )। রক্ষিত মহাশয় এ প্রসঙ্গে পেরুদেশের টিটিকাকা জলাশয়ের সন্নিকটস্থ টিয়াণ্ডিয়ানেকোর—প্রস্তর-খোদিত নমস্তের সহিত জগন্নাথ মূর্ত্তির সাদৃশ্যের আভাস দিয়াছেন বটে, কিন্তু এই বিদেশী বিগ্রহের বা পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রাম্য দেবতাগুলির—কোন চিত্র প্রকাশ করেন নাই। এই চিত্রগুলি তুলনা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলে পাঠকের যে এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করার সুযোগ ঘটিত তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা টিয়াণ্ডিয়ানেকোর প্রতিরূপ চেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ভিন্ন দেশেও যে অসম্পূর্ণ আকৃতি বিশিষ্ট মূর্ত্তি না থাকিতে পারে, তাহা নহে। মধ্য-আমেরিকার পুরাতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত টমাস এ জয়েস্ বভেলিয়স্ অনুযায়ী অমেটেপেক্‌ইস্ নামক যে মৃণ্ময়মূর্ত্তির চিত্র দিয়াছেন, শিল্পশাস্ত্রে অভিজ্ঞ প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ও সমালোচক শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগ্রহে তাহার একখানি অবিকল নকল প্রকাশিত হইল। এ মূর্ত্তির হস্তদ্বয় অঙ্গুলিবিশিষ্ট হইলেও হ্রস্বতা নিবন্ধন একরূপ অসম্পূর্ণ বলিয়াই ধরিতে হয়। হয় মূর্ত্তিটি বীরাসনে উপবিষ্ট, না হয় উহা জানুহীনরূপেই পরিকল্পিত। মাথায় টুপির ন্যায় আবরণ ও শ্মশ্রু-গুম্ফ প্রভৃতির চিহ্ন দেখিয়া যদি কেহ ইহা কোন উপাসনা-রত মুসলমান সাধুর প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বসেন, তাহা হইলে পেরু দেশীয় টিয়াণ্ডিয়ানেকোর জগন্নাথের সহিত সাদৃশ্যের ন্যায় ইহাও কতকটা accidentalই বলিতে হইবে। বিদেশী মূর্ত্তির কথা ছাড়িয়া দিয়া অনার্য্য গ্রাম্য দেবতা হিন্দু দেব-দেবীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে কি না এ কথাও বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অবগত

হইয়াছি যে দক্ষিণ ভারতে সুর-সেনাপতি কার্ত্তিকেয় দ্বিপত্নীক-রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর নাম টেব্যানী বা দেবযানী ; আর দ্বিতীয়া পত্নী, বল্লীরময়ী, পূর্ব্বে গ্রাম্যদেবতা ছিলেন। দক্ষিণ ভারতীয় গ্রাম্য-দেবতা বিষয়ে অধিক আলোচনা না হইলে রক্ষিত মহাশয়ের মত সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হইবে না। কিছু-দিন পূর্ব্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার একটি বক্তৃতায় দাক্ষি-ণাত্যে গ্রাম্য দেবতার হিন্দু দেব-সমাজে প্রবেশ-লাভের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। জগন্নাথ প্রভুর ও অপর মূর্ত্তি কয়টি বিগ্রহের সৌন্দর্য্যহীনতার কথা উল্লেখ করিয়া জনৈক বিদেশী পণ্ডিত বলিয়াছেন যে উহা বৃক্ষকাণ্ডের অংশমাত্র—তাহাও আবার ভাল করিয়া পরিষ্কার করা বা কোঁদা নহে। ("Les idoles Jagannath a Puri sont de hideux fetiches de bois a peine degrossis". Civilization Indienm par M. Mazhiere, tome II. P. 187). List of Ancient monuments of Bengal গ্রন্থে জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তির যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহার আর অনুবাদ দিয়া ভক্ত



অমেটপেক্—ইস্
মধ্য-আমেরিকায় প্রাপ্ত মৃণ্ময় মূর্ত্তি।

দারুমূর্ত্তি চতুষ্টয় যে সুদৃশ্য নহে এবং আর্য্যগণের পরিচিত কোনও মূর্ত্তির সহিত সাদৃশ্য না থাকায় এগুলি অনাবৃত অবস্থায় দেখিলে ভক্তগণের যে ভক্তির হ্রাস হইতে পারে তাহা তাৎকালীন ব্রাহ্মণেরা যে না বুঝিয়াছিলেন এমন বোধ হয় না। উৎকল খণ্ডে দেখিতে পাই যে দারুরূপে এই প্রতিমাগুলি দর্শন করিলে পাপের কারণ হয় অতএব পট্ট ও নির্য্যাস দ্বারা যত্ন-

গোপন রাখা কর্ত্তব্য। "অমুদ্রাঙ্ক স্বরূপেণ দৃষ্টাতু পাপ হেতবঃ॥ গোপনীয়া প্রযত্নেন পট্ট নির্য্যাস বন্ধনৈঃ।" (উ, ম, অ ১৯, ২২—২৩)। উক্ত অধ্যায়েই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি নির্দ্দেশ দেখিতে পাই, 'হে রাজন! কদাপি ঐ মূর্ত্তি চতুষ্টয়কে আবরণমুক্ত করিয়া দর্শন করিবেন না। মনুষ্যেরাও এতদবস্থায় দর্শন করিলে মহা-ভয়গ্রস্ত হইবেন।' ("প্রেক্ষিতব্যা ত্বয়া রাজন্ কদাচিদণবারণা। মনুষ্যৈশ্চাপি রাজেন্দ্র দৃষ্টাঃ সুর্ভয় হেতবঃ॥) এই ঢাকাঢাকির ব্যাপার হইতে কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে মূর্ত্তি কয়টি ধার করিয়া চালানো; হিন্দুর আর্য্যধর্ম্মের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। স্বর্গীয় গোপীনাথ রাও মহাশয় তাঁহার মূর্ত্তি পরিচয় বিষয়ক গ্রন্থে Elements of Hindu Iconography জগন্নাথ দেবকে বিষ্ণুমূর্ত্তিরই মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তবে এ-প্রসঙ্গে বৌদ্ধ মতবাদের উল্লেখমাত্র করিয়া আর বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নাই। পূর্ব্বে উদ্ধৃত উৎকল খণ্ডের শ্লোক কয়টি, আর্য্যেতর শবরদিগের মূর্ত্তি যে হিন্দুদের মূর্ত্তিরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে, এই মতের কতদূর সমর্থন করিতেছে তাহার আলোচনা বাঞ্ছনীয়। এরূপ internal evidence বা আভ্যন্তরিক প্রমাণের মূল্য কতটুকু, পণ্ডিত সমাজ তাহা অবশ্যই বিবেচনা করিবেন। রাজা রাজেন্দ্র-লালের মতে বুদ্ধদেব খৃষ্টীয় ৪র্থ অব্দে নারায়ণের অবতাররূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

জগন্নাথ মূর্ত্তির সহিত শিবলিঙ্গের যে কোন সাদৃশ্য আছে এ কথা বোধ হয় কেহ বলিবেন না। সৌরোপসনার সহিত বৈষ্ণবোপাসনার বা বৈষ্ণবোপাসনার সহিত শৈবোপাসনার সমন্বয় ভারতের ধর্ম্মমতের ইতিহাসে কিছু নূতন কথা নহে। এক সময়ে এই সমন্বয়-চেষ্টার নিদর্শন স্বরূপ কখনও সৌর চিহ্ন-জ্ঞাপক শৈবলিঙ্গ কখনও বা একাধারে তিন ধর্ম্মের মিলন-জ্ঞাপক লিঙ্গমূর্ত্তি প্রভৃতি নির্ম্মিত হইত! ইহার কয়েকটি নমুনা কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। তাহা ছাড়া জগন্নাথ, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরে শাক্ত ও বৈষ্ণব দেবতার পূজা-পদ্ধতির সৌসাদৃশ্য অদ্যাপিও এই সমন্বয়-চেষ্টার সাক্ষ্য দিতেছে। বিদেশীর পক্ষে এ সমন্বয় অনেক সময় বুঝিয়া উঠা কঠিন; তাই দেখিতে পাই অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও 'নূতন কথা' বলিতে গিয়া গোল করিয়া বসেন। Z. D. M. G. পত্রিকায় জর্ম্মণ ভাষায় লিখিত একটি প্রবন্ধে ডাঃ ব্লক বলিয়াছেন যে, জগন্নাথ-উপাসনা শৈবোপাসনার সহিতই সংশ্লিষ্ট, লোকে এতাবৎ কাল যাহা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে সেই বৈষ্ণব উপাসনার সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। * দারু মূর্ত্তি শবরদিগের

* "der Kult Jagannath's mit der Religion der Saivas Verbunden, und nicht, wie heutzutage mit der Religion der Vais nava's" Z. D, M. C. Vol 64 P, 736.

জর্ম্মণ ভাষায় অনভিজ্ঞ লেখক ব্লক সাহেবের এই প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় অংশ তদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথকুমার ও অধ্যাপক মিত্র মহাশয়ের সাহায্যে অনুবাদ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র

নিকট হইতে গৃহীত হউক আর নাই হউক উহা যখন কালবশে বিষ্ণুমূর্ত্তি রূপেই পরিচিত হইয়াছে, তখন বৈষ্ণবোপাসনার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে এ কথা কি করিয়া বলিব? পণ্ডিতেরা যতই তর্ক করুন, ভক্তের নিকট জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি "কূটস্থ চৈতন্য" রূপেই বিরাজমান! বিশ্বাসী বৈষ্ণব নিজ দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যানুযায়ী দারু বিগ্রহের অর্থ করিয়া থাকেন। ডাঃ ব্লক নজির স্বরূপ কোণার্কে প্রাপ্ত জগন্নাথ ও শিবলিঙ্গের একত্র-খোদিত চিত্রবিশিষ্ট শিলা-খণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের চক্ষে উহা শুধু সমন্বয়-জ্ঞাপক বলিয়াই মনে হয়। ডাঃ ব্লকের এই প্রবন্ধেরই অন্যস্থানে জগন্নাথ স্থানীয় সৌর দেবতা হইতে উদ্ভূত এরূপ মন্তব্যও দেখিতে পাই। Jagannath scinemur-spung nacheine lokalen Form des sounen-gottes Ist সুতরাং লেখক এ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত কতদূর স্থির করিতে পারিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। কোণারক প্রস্তরে—জগন্নাথ ও মহিষ-মর্দ্দিনী একত্র সন্নিবেশিত; তাই ডাঃ ব্লক তাঁহার পুরাতত্ত্ব বিষয়ক রিপোর্টে বলিয়াছেন, পূর্ব্বে বোধ হয় শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের সহিত শিব ও শক্তির এইরূপ একত্র পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, বলরাম মূর্ত্তির উদ্ভব সম্ভবতঃ পরে হইয়া থাকিবে। বলা বাহুল্য ইহা লেখকের অনুমান মাত্র।

রক্তবর্ণ গ্রানাইট প্রস্তর-খোদিত এলোরা গুহায় জগন্নাথ নামে খ্যাত অপর একটি দেবমূর্ত্তির পরিচয় ফরাসী পণ্ডিত লাঁলোয়া (Langlois) তাঁহার Mounments de L'Hindoustan নামক গ্রন্থে দিয়াছেন * কিন্তু তাহার সহিত উড়িষ্যার জগন্নাথ-মূর্ত্তির কোন সাদৃশ্য নাই। এ জগন্নাথ উবু হইয়া (surses talons) বসিয়া আছেন। হস্তদ্বয় জানুর উপর বিন্যস্ত। পার্শ্বে জয়া ও বিজয়া নামে পরিচিতা দুইটি স্ত্রীমূর্ত্তি জগন্নাথের সিংহদ্বারে অবস্থিত জয় ও বিজয় নামক দ্বারপালদ্বয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রবেশ-দ্বারের নিকটে অপর যে দুইটি মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার একটির নাম শুদ্‌ ও অপরটির নাম বুদ্‌। লাঁলোয়া সাহেবের মতে সুদ্‌ (soudou dheneh) সুদুধেনে এবং বুদ্‌ বুদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ। এই দেববয়ের প্রকৃত পরিচয় যাহাই হউক, নাম শুনিয়া মনে হয় শুদ্‌রা শুধ্‌, শুদ্ধি এবং বুদ্‌ বা বুধ্‌ বুদ্ধি—এই সহজ অর্থেই জনসাধারণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের চলিত ভাষায় শুধ্‌ ও বুধ্‌ এই দুইটি শব্দ প্রায়ই একত্রে ব্যবহৃত হইতে শুনা যায়। শ্রীযুক্ত ফুসে (M. Foucher) বৌদ্ধ মূর্ত্তি-পরিচয় (L'Iconographic Bouddhique) গ্রন্থে যে 'সুধনকুমার' নামক মূর্ত্তির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিতও ইহার বিশেষ

* "Jagannatha assis sur ses talons et les mainus posees sur ses genoux, l'une sur l'autre occupe le fond de Sanctuaire…on voit deux statues debout, nommees Soud at Boud, corruption de Soudu Dhench at de Bouddheh"—Les mounments de L'Hindoustan, Tom. II.

কোন মিল দেখা যায় না। ইলোরার জগন্নাথ সভা এখন জৈন কীর্ত্তি বলিয়া পরিচিত, কারণ গুহা মধ্যে জৈনগণের উপাস্য দেবতা মহাবীর, পার্শ্বনাথ, শান্তিনাথ প্রভৃতি তীর্থঙ্করদিগের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। সুতরাং এ জগন্নাথ যে বৌদ্ধ দেবতা তাহা জোর করিয়া বলা চলে না। বৌদ্ধ গ্রন্থে যেরূপ "নমো জগন্নাথবুদ্ধায়" প্রভৃতি উক্তির কথা শুনা যায়, তেমনি আবার তন্ত্র গ্রন্থে "স পশ্যতি জগন্নাথং কমলোরুগতঃ হরিং" এরূপ পদও যে না মিলে তাহা নহে (অর্চ্চনা ১৬ পর্ব্ব, ৬৮ সংখ্যা পৃঃ ২০০) সুতরাং নামের সাদৃশ্য ধরিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। জগন্নাথ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ বিষয়ে যাহা অবগত হইয়াছি, তাহা এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইল। পণ্ডিতগণের আলোচনা-ফলে নূতন তথ্যাদি প্রকাশিত হইলে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যাইবে, এরূপ ভরসা হয়। ভক্তের অবশ্য এ সকল আলোচনায় বিশেষ কিছু আসিয়া যাইবে না। যাঁহার প্রকৃত ভক্তি আছে, তিনি দারুব্রহ্মের মূর্ত্তির উদ্ভব যে ধারামতেই হউক না কেন—অধ্যাত্ম তত্ত্বের বিবিধ রূপক অর্থে আপন উপাস্য দেবতাকে বুঝিয়া লইবেন। "The dust of the rose-petal is the only reward of the perfume-seller". মূর্ত্তিতত্ত্ব লইয়া যাহারা অনুশীলন করেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিবেন?

শ্রীগুরুদাস সরকার।

---

# রকমফের

## (ভামিনী-জীবনী, ৩ পরিচ্ছেদ)

ছোটগল্প

ভর্-সন্ধ্যা।—ভামিনীর বৈঠকখানায় তুমুল তর্ক চলিতেছে,—বিষয়, রূপবতীরা গুণবতী হন কিনা!

গঙ্গারাম হাতী-মহাশয় চক্ষু মুদিয়া হুঁকায় একটি সুখটান মারিয়া, হুস্-হুস্ করিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন, "আমার কথা যদি ধর বাপু, আমি তাহলে এককথায় সরল-ভাবে স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি যে, আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীটি গুণে যথার্থ ই লক্ষ্মীর মত—" তাঁর রূপের দিকটা নিবিড়তম অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।"

গঙ্গারাম একটুও না দমিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, সেইজন্যেই ত আমার পূজনীয় শ্বশুর-মশাই রীতিমত মাথা খাটিয়ে, মেয়ের নাম রেখেছিলেন কৃষ্ণকালী।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমার স্ত্রীর রূপ-সম্বন্ধে কিন্তু বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই—"

প্রতিশোধ-গ্রহণে বদ্ধপরিকর গঙ্গারাম

রিপোর্ট আমাদের কর্ণগত হয়েছে, সে-সব শুনতেও ভালো নয়, বলতেও ভালো নয়। অতএব সে কথা চেপে যাওয়াই ভালো।"

ভামিনী বলিলেন, "আমি কিন্তু নিজের স্ত্রী-সম্বন্ধে এ-রকম স্বাধীন মতপ্রকাশ করতে সম্মত নই। কারণ, আজ-পর্য্যন্ত এমন এক জন স্বামীও আমার চোখে পড়েন-নি, যিনি নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহের ছয় বছর পরে তিলোত্তমা বলে স্বীকার করেছেন। এক্ষেত্রে স্বামীদের মতামত প্রায়ই এক-তরফা হতে বাধ্য। তবে, আমি একবার এমন-একটি মেয়েকে দেখেছিলুম, যার রূপে-গুণে আজ-পর্য্যন্ত আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে আছি। অতঃপর আপনাদের আদেশ পেলে সেই মেয়েটির কথা এখানে বলতে পারি।"

এ প্রস্তাবে কাহারোই অমত হইল না। অতএব ভামিনী তাঁহার কাহিনী আরম্ভ করিলেন।

* *
*

"মাস-দুএকের ছুটি নিয়ে সেবার যখন পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিলুম, তখন আমার স্ত্রী দুর্গাকালী, যত-রকমের অস্থাবর সম্পত্তি বাড়ীতে থাকতে পারে সমস্তই সঙ্গে করে নিয়েছিলেন—মায় হাঁড়ি-কুড়ি ভাঁড়-কলসী জলচৌকি বিঁড়েটি পর্য্যন্ত। এত মালপত্তর নেবার হ্যাঙ্গামে, তিনি যে তাঁর গো-বেচারী স্বামীটিকেও আঁচলে বেঁধে নিতে ভুলে যান-নি, এইটেই কিন্তু সব-চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য!

রেলের 'পাশে'র দৌলতে, দ্বিতীয়শ্রেণীর কামরায় আমাদের যাত্রা স্থির হয়েছিল। সুতরাং দুর্গাকালীকে যখন আমার মত জানিয়ে বললুম, 'সেকেণ্ড ক্লাসে' এত পোঁটলা-পুটলী ছাইভস্ম নিয়ে উঠলে লোকে নিশ্চয়ই আমাদের প্রথমশ্রেণীর বাঙাল ঠাওরাবে,—দুর্গাকালী তখন প্রজ্বলিত হয়ে বললেন যে, "লোকেদের মুখে আগুন! বিদেশ-বিভুঁয়ে গিয়ে, শেষটা যখন মুস্কিলে পড়ব, লোকে কি তখন তাদের মাথা দিয়ে আমাদের মান বাঁচাতে আসবে?"

তাঁর এ যুক্তি অকাট্য! অতএব আমি আর-কোন উচ্চবাচ্য করতে ভরসা পেলুম না।

... ... ... ...

এ সময়টায় গাড়ীর কোন কামরাতেই যাত্রীর ভিড় বড় থাকে না—বিশেষ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে। দুর্গাকালীকে তাঁর মাল-পত্তর সমেত স্ত্রী-কামরায় ঠেলে-ঠুলে বোঝাই করে দিয়ে, আমি যখন আমার কামরায় এসে ঢুকলুম তখন দেখলুম, সে গাড়ীতে একটি মেম ছাড়া আর জনপ্রাণী নেই।

আমি হচ্ছি গিয়ে খাস কলকাতার ছেলে। সুতরাং এ-কথা আমি জোর করে বলতে পারি যে, মেম দেখে আমার অবাক হবার কথা নয়। কিন্তু গাড়ীর মধ্যে সেই একাকিনী বিদেশিনীকে দেখে, আমি যে সেদিন সুধু বেবাক অবাক হয়ে গেলুম তা নয়,—সেইসঙ্গে আমার চোখ আর মন সেই মেমটির দিকে অত্যন্ত বিহ্বলভাবে একাগ্র হয়ে রইল। একরকম চিত্রার্পিত চমৎকৃত অবস্থা আর কি!

আহা, অসীমা সুন্দরী সে! এখনো তার হাল্কা ছিপছিপে চেহারাটি, আমার চোখের সামনে যেন জীবন্ত ছবির মত জেগে আছে!

সত্যি বল্‌চি, নিতান্ত ভাগ্যবান না হ'লে তেমন রূপ চক্ষে পড়ে না। রং তার গোলাপ-পাতা নিংড়ানো, মাথার চুলগুলি তার সোনার-জলের ঢেউয়ের মত; খোঁপার বাঁধন থেকে ছাড়ান্‌ পেয়ে, কতকগুলো কুচো চুল কপালে-কপোলে ঘাড়ের উপরে এসে পড়ে সর্প-শিশুর মত এঁকে-বেঁকে আছে, আর ভাসা-ভাসা চোখদুটি তার বাতাসে দুলে-পড়া ছোট্ট দুটি টল্‌টলে নীলপদ্মের কোরকের মত।

বন্ধুগণ, আমার স্ত্রী যখন সৌভাগ্যক্রমে এক্ষেত্রে উপস্থিত নেই, তখন আমি ভরসা করে আপনাদের কাণের কাছে আমার একটি গোপনীয় মানসিক দুর্ব্বলতার কথা চুপিচুপি স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি। এ-কথাটা সুধু যে আমারি মনের কথা, তা নয়,—অধিকাংশ পুরুষেরই আঁতের কথা। সে কথাটি হচ্ছে এই :—রূপসীর রূপ দেখলে আমি একেবারে আহ্লাদে বিগলিত হয়ে যাই—দুনিয়ার কোন-কিছুরই তোয়াক্কা রাখি না! তখন সুধু আমার একটি কথাই, গানের মত মনের মাঝে বাজতে থাকে—

"তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,—
হোক্‌-গে এ বসুমতী যার খুসি তার!"

কি বলচেন থাকহরি-বাবু! 'মর‍্যালিষ্ট'রা আমার কথা শুনলে তাঁদের দ্বিতীয় রিপুকে প্রকাশ করবেন? করুন-গে, বড় বয়ে গেল! 'মর‍্যালিষ্ট'দের রাগটা কেমন, জানেন? এই, ঠাট্টা করে বিয়ের কথা তুল্‌লে বয়স্কা কুমারী মেয়েদের রাগ দেখেছেন ত? ঠিক তেমনি। আমাদের প্রাণের কথা মুখের কথার প্রতিবাদ করতে অসময়ে বাইরে বেরিয়ে আসে না বলে, সমাজ-ক্ষেত্রে অনেক হিপোক্রীট্‌ বেশ অম্লানবদনেই চরে বেড়াচ্ছে এবং করে খাচ্ছে।

যাক্‌ সে কথা। কি বল্‌ছিলুম—হ্যাঁ, একমেয়ে রেলপথে সেই রূপরাণী বিদেশিনীকে সঙ্গিনীরূপে লাভ করে, মনটা আমার যার-পর-নাই খুসি হয়ে উঠল।

খালি রূপবতী বললে ঠিক হবে না, কারণ সে যে কত-বড় গুণবতী, সেই পরিচয় দেবার জন্যেই আমি এই কাহিনীর অবতারণা করেছি। বল্‌তে কি, মেয়েদের মধ্যে যে তেমন গুণবতী মেয়ে থাক্‌তে পারে, আগে আমার মোটেই সে বিশ্বাস ছিল না।

* *
*

বিচিত্র কলরব করতে করতে ট্রেণ তখন উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটছে,—দু-পাশে পাহাড়ের পর পাহাড়, বনের পর বন, মাঠের পর মাঠ ক্রমাগত পিছনে ফেলে, এক-একখানি জ্যোৎস্নারঞ্জিত সমুজ্জ্বল স্বপ্ন-চিত্রের মত।

রাত অনেক। রেলে আমার ঘুম হয় না, মেয়েটিরও বোধহয় তাই। সে চুপটি করে ঠায় বসে আছে। আমিও নীরবে, মুখের সামনে একখানা কেতাব তুলে ধরে, মাঝে-মাঝে একটু-একটু পড়ছি এবং মাঝে-মাঝে সাম্‌নের সেই জীবন্ত কাব্যখানির উপরে তৃষিত নয়ন দুটোকে যতটা-পারি বুলিয়ে নিচ্ছি।

থেকে থেকে তার সঙ্গে যে চোখো-চোখি হয়ে যাচ্ছে না, তাও নয়। কিন্তু তার স্বপ্ন-চোখ দেখে কিছুমাত্র বোঝবার

যো নেই, যে,—আমার এই লোলুপ নয়নের রূপের ক্ষুধা দেখে সে বিরক্ত হচ্ছে কিনা!

কোন মহিলার দিকে বারংবার এমন হ্যাংলা-ক্যাংলার মত দৃষ্টিপাত করা নিশ্চয়ই ভদ্রতাসঙ্গত নয়। কিন্তু আমার দুষ্ট চোখ-দুটো সেদিন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল—মনের মানা কোনমতেই মান্‌তে রাজি হ'ল না।

হঠাৎ জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কি দেখে, মেমটি যেন কেমন অস্থির হয়ে উঠল। ভয়ে বিবর্ণ মুখে অস্ফুটস্বরে, আপন মনেই সে বললে, "আমার—আমার ভয় হচ্ছে—আমার বড় ভয় করচে!"

ব্যাপার কি? কাম্‌রা থেকে আমিও মুখ বাড়িয়ে দিলুম। দেখলুম, "গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনে"র একটা পাহাড়ে সুড়ঙ্গ বা 'টানেলে'র দিকে গাড়ী ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে। ওহো—বোঝা গেছে, এইজন্যেই মেমটি বোধহয় ভয় পেয়েছে! স্বাধীন বিলাতী মেয়ে হ'লে কি হয়—হাজার হোক্ স্ত্রীলোক ত!

আলাপ করবার এ-হেন সুযোগ আমি ছেড়ে দিলুম না। তাকে বল্‌লুম যে, গাড়ী রোজই এই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে যাওয়া-আসা করে, তার কোন ভয় নেই—ইত্যাদি।

সে কিন্তু আমার কথার কোনই জবাব দিলেনা—আমার পানে ফিরেও চাইলে না। বাইরের দিকে স্তম্ভিত দৃষ্টিপাত করে, পাথুরে মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হয়ে সে বসে রইল। আমার সান্ত্বনার কথাগুলো যেন অরণ্যে রোদনের মত নিতান্ত অসার্থক বলে বোধ হ'ল!

ইতিমধ্যে গাড়ী সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করল,—আর বাইরের চন্দ্রালোক যেন কোন অদৃশ্য মুখের এক ফুৎকারে নিবে গেল!...... সঙ্গে সঙ্গে মেমও আর্ত্তনাদ করে উঠল!

চারিদিক অন্ধকার—উপন্যাসে যাকে বলে সূচীভেদ্য অন্ধকার! দুপাশের পাহাড়ের গায়ে বাধা পেয়ে, সেই বদ্ধ স্থানের মধ্যে গাড়ীর লৌহচক্রের অবিশ্রাম শব্দ যেন দ্বিগুণ বেশী হয়ে কানের উপরে ক্রমাগত ঘা মার্‌তে লাগল।

......আচম্বিতে, সেই অন্ধকারে দুখানি আকুল বাহু ব্যাকুলভাবে আমার দুই স্কন্ধ বেষ্টন করে ধরলে! আমি বুঝতে পারলুম, সে হাত-দুখানি ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপচে আর কাঁপচে! এই অভাবিত স্পর্শে আমার হৃদয়-যন্ত্রটা যেন ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল—আমার ভিতরে যেন আমি বলে আর কোন-কিছু রইলুম না! অর্থাৎ আমি একেবারে রীতিমত স্তম্ভিত, আচ্ছন্ন, হতভম্ব!

* * *

—একটা তীব্র আলোক-তরঙ্গ এসে আমার চোখের উপরে আঘাত করলে। যেন একটা অসম্ভব স্বপ্ন থেকে ঝাকুনি খেয়ে জেগে উঠলুম। গাড়ী তখন সুড়ঙ্গের আঁধার জঠর ছেড়ে আবার বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

মেমটিও আমাকে ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়াল। তার মুখ তখন লজ্জায় লাল হয়ে উঠেচে।

......খানিকক্ষণ গেল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবচি, এই দৃশ্যটা দেখলে শ্রীমতী দুর্গাকালী কি মনে করতেন, এমনসময়ে সেই সুন্দরী বাধ' বাধ'

স্বরে থেমে থেমে আমাকে বল্‌লে, "আমার এই ব্যবহারের জন্যে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন ত? এতটা বেহায়াপনা করা আমার উচিত হয় নি,—কিন্তু সত্যি বল্‌চি, আমি বড় ভয় পেয়েছিলুম!"

মনে মনে বল্‌লুম,—রমণি, আল্‌তা মুছে শ্রীচরণে তুমি শিকারী-বুটই পর, আর কমল-কোমল কর-কমলে ঘোড়ার লাগামই ধর, আর মাথার চুল খাটো করেই ছাঁটো, আর পুরুষের সমান অধিকার লাভের জন্যে যতই 'প্রাণজল' বক্তৃতা বৃষ্টি কর,—তুমি কিন্তু এখনো যে-অবলা ঠিক সেই-অবলাই আছ, এখনো রাজপথে তুমি বিবর্জ্জিতা, এখনো অন্তঃপুরই তোমার নিরাপদ দুর্গ!

প্রকাশ্যে বল্‌লুম,—আমার কাছে তার ক্ষমা চাইবার কোনই দরকার নেই, ইত্যাদি।

* *
*

মাঝের একটা ষ্টেশনে নেমে, আমাকে হাসিমুখের আরো-দুটো মিষ্টি কথা বখ্‌সিস্ দিয়ে, মেমটি তাড়াতাড়ি চলে গেল।

শুনেছি মোগল-আমলে সুন্দরীর মুখের হাসি লাখটাকার দরে বিকিয়ে যেত। আজ কিন্তু বিনামূল্যে যে হাসিটুকু আমি উপহার পেলুম, আসলে তার মূল্য যে কত, মেমটি ষ্টেশন ছেড়ে চলে যেতে-না-যেতেই আমি তা বিলক্ষণ টের পেলুম।

—কারণ হঠাৎ আমার মনে হ'ল, আমার বুক-পকেটের ভার যেন অত্যন্ত অন্যায়রকম কমে গেছে! পর-মুহূর্ত্তেই আবিষ্কার কর্‌লুম, সুড়ঙ্গের মধ্যে অন্ধকারের মহাসুযোগে, আমার পকেট থেকে সোনার চেন-ঘড়ী আর নোটভরা মণিব্যাগটি আমার অজ্ঞাত-সারে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়েছে!—"

ভামিনী চুপ করিতেই গঙ্গারাম, সন্ন্যাসী-চরণ, বিরিঞ্চিমোহন ও থাকহরি প্রভৃতি সকলেই সমস্বরে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁঃ, বলেন কি!"

ভামিনী বলিলেন, "হ্যাঁ। সেইজন্যেই ত আপনাদের আগেই বলে দিয়েছিলুম, সেই সুন্দরীর রূপে-গুণে আজ-পর্য্যন্ত আমি আশ্চর্য্য হয়ে আছি।"

গঙ্গারাম বলিলেন, "ভামিনী-বাবু, কল্‌কাতার ছেলে হয়ে আপনি কিনা শেষটা একটা স্ত্রীলোকের রূপ দেখে ভুলে গেলেন! আরে ছিঃ!"

ভামিনী বলিলেন, "পুরুষকে ভোলাবার জন্যেই ভগবান রমণীর রমণীয় রূপ সৃষ্টি করেছেন। সে-ক্ষেত্রে আপনিও যে ভুলতেন না, তারও কোন প্রমাণ নেই। এবং ভবিষ্যতে পকেট-কাটার ভয় না-থাক্‌লে আমিও যে কেন ভুলব না, তারও কোন স্পষ্ট কারণ দেখতে পাচ্ছি না! কিন্তু শুনুন, আমার গল্পের এখনো একটু বাকি আছে।"

* *
*

"তখনো ট্রেণ ছেড়ে দেয় নি। যে-মুহূর্ত্তে আবিষ্কার করলুম আমার পকেট কাটা গেছে, সেই মুহূর্ত্তেই আমি চীৎকার করে উঠলুম। আমার তৎকালীন চীৎকারটা যে কতদূর গগনস্পর্শী, স্বাভাবিক ও ভয়ানক হয়েছিল, সেটা না-বল্‌লেও আপনারা বোধহয় আন্দাজ করে নিতে পারবেন।

বলাবাহুল্য, অবিলম্বে চারিদিকে গোলমাল

উঠল এবং তার ফলে সেই গুণবতী ইঙ্গ-বালাটি যথেষ্ট অনিচ্ছাসত্ত্বেও আত্মসমর্পণ কর্‌তে বাধ্য হলেন। এত-শীঘ্র যে তাঁর রূপমুগ্ধ এই নির্ব্বোধ কালা-আদমীটি আত্মসংবরণ করে আপনার দুর্ভাগ্যের ইতিহাসটা জেনে ফেলবে, সম্ভবত তিনি অতটা খেয়াল করতে পারেন নি।

ট্রেনের গার্ড যখন বজ্রমুষ্টিতে তার হাত ধরে, তাকে টান্‌তে টান্‌তে আমার সামনে এনে হাজির করলে,—তখন তাকে দেখাচ্ছিল, ঠিক ব্যাঘ্রকবলগত হতভাগ্য হরিণীর মত;—লজ্জায়-ঘৃণায় সে তখন আর মাথা তুল্‌তে পারছিল না।

গার্ডের হাতে আমার ঘড়ী, চেন আর মণিব্যাগটাও দেখতে পেলুম। বাঁ-হাতে সুন্দরীর কাঁধের কাছটা খুব-কষে চেপে ধরে, ডান-হাতে সেই পকেটকাটা মালগুলি আমার সাম্‌নে এগিয়ে দিয়ে, গার্ড জিজ্ঞাসা করলে, "বাবু, এইগুলোই ত আপনার জিনিষ?"

সুন্দরী এতক্ষণে আমার মুখের দিকে মুখ তুলে চাইলে—কী হতাশ, অসহায়, করুণ মিনতি-ভরা সে দৃষ্টি! সে চোখদুটি যেন গভীর অনুতাপে ক্ষমা চাইছে আর বলছে—'আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!'

গার্ড জিনিষগুলো আমার হাতে দিলে। একটু ইতস্তত করে আমি সুন্দরীর মুখের দিকে তাকালুম। সে তখন কাঁদছে। জিনিষগুলো আবার গার্ডের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আমি বল্‌লুম, "না, এগুলো আমার নয়!"

একবার আমার দিকে, আর-একবার সুন্দরীর দিকে সন্দিগ্ধ নেত্রে চেয়ে দেখে, গার্ডসাহেব বিস্ময়ে অবাক হয়ে রইল।...... তারপর মুখ টিপে একটুখানি হেসে, সুন্দরীর হাত ছেড়ে দিলে।

বন্ধুগণ, পাপড়ির মধ্যে দুষ্ট কীট থাকে বটে, কিন্তু সুন্দর কুসুমকে সেজন্যে পায়ে থেৎলানো আমার ধাতে সহ্য হয় না। রূপসীর রূপ দেখলে আমি একেবারে বিগলিত হয়ে যাই। কি বল্‌চেন? আমি একটি নিরেট বোকা? হ্যাঁ, আমার স্ত্রী দুর্গাকালীও বারংবার আমার উপরে ঠিক ঐ বিশেষণটিই প্রয়োগ করে থাকেন—যদিও এই গল্পটি আজ পর্য্যন্ত সাহস করে তাঁকে আমি শোনাই-নি।"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

---

# গল্প-সাহিত্যে শান্তাদেবী ও সীতাদেবী *

পূজার ছুটিতে শান্তাদেবী ও সীতাদেবীর অনেকগুলি বই পড়ে ফেলা গেল। ছুটিটা বেশ আনন্দেই কেটেছে।

এই দুই লেখিকার রচনা প্রবাসীতে অনেক পড়েছিলুম। পরিচয়টা আবার আরও ঘনিষ্ঠরূপ হয়ে গেল।

---

* ইঁহারা নিম্নলিখিত বইগুলি রচনা করেছেন—(১) হিন্দুস্থানী উপকথা—শান্তাদেবী ও সীতাদেবী। (২) উষসী—শান্তাদেবী। (৩) উদ্যানলতা—শান্তাদেবী ও সীতাদেবী। (৪) বজ্রমণি—সীতাদেবী। (৫) ছায়াবীথি—সীতাদেবী। (৬) সিঁথির সিঁদুর—শান্তাদেবী। (৭) হুক্কা হুয়া—শান্তাদেবী। (৮) আজব দেশ—সীতাদেবী।

এঁরা এর মধ্যেই অনেকগুলি বই লিখে ফেলেছেন, এবং বাঙ্গলা লেখাটা রীতিমত শ্রম করে শিখেছেন বলে মনে হয়। কারণ ইংরেজী হোতে এঁরা অনেকগুলি বই তর্জ্জমা কোরে হাত পাকিয়ে নিয়েছেন; হিন্দুস্থানী উপকথা, হুক্কা-হুয়া, *স্মৃতির সৌরভ—এই গুলি ইংরাজী বইএর* বাঙ্গলা অনুবাদ। এগুলি পড়ে কে বুঝবে যে অনুবাদ! গল্পগুলি কৌতুক ও রসে বোঝাই, অথচ হাল্কা ডিঙ্গীর মত চলে যাচ্ছে,—ছেলেরা এমন মজার জিনিস কমই পাবে। বইগুলি পড়তে সুরু করা, না যেন মটরে চেপে বসা, হুস্ হুস্ শব্দ করে একটানে নিয়ে চ'লে যাবে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, "হুক্কা হুয়া" গল্পের অনেক কথা আমরা বাঙ্গলা দেশে ছেলেবেলা হ'তে শুনে এসেছি। বিচার-সুবিধার জন্য বাঘটার পাথরের নীচে আবার গিয়ে পড়া, শেয়ালটার মরার ভাণ ক'রে পড়ে থাকা ও খরগোসের ছলনায় হাত-পা নাড়া, এই ভাবের কথা-গুলি ত আমরা খাঁটি বাঙ্গলা গল্প বলেই জানতুম। এগুলি যে নিগ্রোর দেশ থেকে কি করে আমদানী হোল, তা ভেবে পাই না। তবে গল্পের মধ্যে দেখা যাচ্ছে খরগোসই বুদ্ধিমান; বাঘ ভালুক শেয়াল—এদের সে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরুচ্ছে। শেয়াল-পণ্ডিতকে ত আমরা সেরা বুদ্ধিমান ব'লে জানতুম, কিন্তু নিগ্রোর দেশে তার পদের মর্য্যাদাটা বজায় থাকে নি, এইটুকু যা গরমিল। নিরেট গুরুর কথাটা ত ভারতবর্ষেরই উপকথা, সুতরাং গুরু ও শিষ্যদের বুদ্ধির খ্যাতি নানা আকারে আমাদের নানা প্রদেশে প্রচলিত আছে।

এই সকল মজার গল্প ছেড়ে দিয়ে আর একটু গাঢ়তর ও উচ্চ সাহিত্যিক রসের আলোচনা করা যাক।

এই আমার সাম্‌নেই পড়ে আছে—উদ্যানলতা। বইখানি উভয়ে একত্র হোয়ে লিখেছেন। বইখানির নামটি বড় চমৎকার হোয়েছে। বইয়ের নায়িকা হোচ্ছেন এখনকার উচ্চশিক্ষিতা একটি তরুণী। উদ্যান-লতা নাম দিয়ে লেখিকারা ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন, আমাদের আর-একটা ভাল জিনিস আছে যা' কবি কালিদাস প্রশংসা কোরে গেছেন—সে হচ্ছে বনলতা। এই বইখানি এবং এঁদের লেখা অন্য গল্পগুলি প'ড়ে একটা বিষয়ে বড় আনন্দ হোয়েছে; লেখিকারা সাবেকের পক্ষপাতী কি নূতনের দিকে ঝুঁকেছেন, তা বোঝা যায় না। শিবেশ্বর বাবুর বাড়ীতে ঠাকুর দেবতার ছবিগুলির অপমান দেখে এঁরা যেন একটু দুঃখিতই হোয়েছেন, এমন মনে হয়। ঠাকুরমার চুল বাঁধা থেকে সুরু ক'রে তেঁতুলের আচার তৈরি করা পর্য্যন্ত সব কাজের মধ্যেই যেন প্রাচীন গিন্নিপনার প্রতি একটা স্নেহ-মধুর আদর ফুটে উঠেছে, অবশ্য যেখানে একটু বেশী বাড়াবাড়ি হয়েছে, তার উপর একটু চাপা শ্লেষের ঝাঁজ আছে, কিন্তু এই লেখিকাদের প্রায় সমস্ত গল্পেই দেখ্‌তে পাচ্ছি,—নূতন ও সাবেকী জগতের যেটুকু ভাল তার দিকে অনুরাগ আছে, তাই বলে যেখানে দরকার সেখানে এঁরা কথা কইতে ছাড়েন নি; উদ্যান-লতার শেষদিকের পল্লী-চিত্রটা একেবারে বীভৎস —এবং শিবেশ্বর বাবুর প্রথমতঃ ঠাক-

উপর পাঠকমাত্রেই একটু বীতরাগ হোয়ে পড়বেন। এইটুকু আমার বড়ই অভিনব বোধ হচ্ছে, কারণ যে সব গল্প পড়ি, তার মধ্যে দুটো শ্রেণী বড় অতিরিক্ত মাত্রায় স্পষ্ট হোয়ে ওঠে, কোনটিতে বা বামুন-পণ্ডিতদের টিকি নিয়ে টানাটানি, এবং যা-কিছু সাবেকী তার উপরই আক্রোশের বাণ-বর্ষণ, না হয় কালী-ঝুল লেপে সাবেকী জিনিষটাকে বিশ্রী ক'রে দেখাবার উৎকট চেষ্টা! অপর দল হালী কায়দা-কানুনকে একেবারে কচু-কাটা কোরে আর্য্যামিকে বাড়িয়ে তুলে আস্ফালন কোচ্ছেন। আমি দেখছি, এই দুই লেখিকার সুশিক্ষায় ফল ফলেছে, প্রাচীন জগতের মন্দিরের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যের প্রতি এঁদের লুব্ধ দৃষ্টি আছে, এবং একালের আশা-উদ্যম সব নিয়ে তো এঁরা গড়ে উঠেছেন, তা' আর কে সন্দেহ করবে? আমরা শিবেশ্বরকে আদর্শ পিতা বলে বরণ করতে প্রস্তুত, অথচ ঠাকুরমার নিষ্ঠা ও স্নেহ কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পাচ্ছি না।

শিবেশ্বর মাতার আদর্শ পুত্র, যদিও মায়ের প্রত্যেক কথাকেই তিনি অগ্রাহ্য কোরে এসেছেন। মাকে যে গুণে ছেলে বেঁধে রাখে, সেই মাতৃ-স্নেহের অপর্য্যাপ্ত রস যে তাঁর ভিতরে আছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তিনি আদর্শ স্বামী, কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর একটিবারও স্ত্রীর কথা তোলেন নি, একবার মাত্র মেয়েকে আধ ছত্রে একটি কথা বলেছিলেন, তা' গুরুমন্ত্রের মত হৃদয়ের সাধনাকে ব্যক্ত করে দেখিয়েছিল। শিবেশ্বর আদর্শ পিতা, কারণ যার হাতে মেয়েকে দেবেন ঠিক কোরে এনেছিলেন, সে স্বাভাবিক ভাবে তাঁকে জয় করতে পারে কিনা, তিনি তারই অপেক্ষা কচ্ছিলেন এবং এ সম্বন্ধে নিজে কোন উপদেশ দিয়ে মুক্তিকে তিনি বিব্রত ক'রে তোলেন নি, এমন কি অপর যোগ্য ছেলেদের দাবীও তিনি অগ্রাহ্য কোরে নিজে কোন অভিসন্ধি দেখান নি। তিনি সম্পূর্ণভাবে মেয়েকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন—এই উদারতা আধুনিক শিক্ষার সেরা জিনিষ; প্রাচীনের যা-কিছু ভাল থাকুক না কেন, সাবেকী ধরণের পিতার নিকট পুত্র-কন্যার চরিত্রের এই স্বাধীন ভাবটি কিছুতেই প্রশ্রয় পেত না।

যখন ধীরেন এসে জুটল, তখন আমাদের সত্যিই ভয় হোয়েছিল, মুক্তি বুঝি দোটানে পড়ে আজকালকার কেতা-দুরস্ত মেয়ে হয়ে যান; অর্থাৎ কোন শস্তা একটা জিনিষ পেলে যেমন খরিদ্দারের ভিড় জমে যায়, তার হাল্কা হৃদয়টা পেয়ে বুঝি ছোকরার দল সেইরূপ একটা লোলুপতা দেখাবার সুবিধা কোরে নেবে। ধীরেন তা' না দেখিয়ে ছাড়ে নি! কিন্তু প্রকৃত নারী-হৃদয় কি এমনই হাল্কা জিনিষ যে টুস্কির ভর সয় না? একটা ডিঙ্গি নৌকাকে যে দিক্ দিয়ে দাঁড় ব'য়ে বা গুণ টেনে নিয়ে যাওয়া যায়, সেটা যেমন সেইদিকেই ঝুঁকে পড়ে, নারী-হৃদয় কি তেমনই সখের জিনিষ? আমার তা বোধ হয় না। যাঁরা এরূপ কোরে স্ত্রী-চরিত্র দেখান, আমার মনে হয় তাঁরা অবিচার করেন। এই যে মুক্তিকে নিয়ে ধীরেন সম্বন্ধে কতটা কাণ্ড হোয়ে গেল, তাতে তাঁকে কষে খাটী সোণা ব'লে প্রমাণ করা হোল মাত্র, তার পূজার আয়োজন ও

হৃদয়-দেবের তপস্যা আরো বেড়ে গেল। এর চাইতেও শক্ত পরীক্ষা হয়েছিল স্মৃতি-রক্ষা গল্পের উমার। তার মন ধীরে ধীরে বিশ্বনাথ দখল কোরে নিয়েছিলেন, কিন্তু যেদিন উদারচেতা যুবা তার চোখের সামনে সংসারের সুখের ছবিটি ধরলেন, সেইদিন সে ঘৃণায় মুখ ফিরাল; তার চন্দন-বাটা, ফুলের মালা গাঁথা ও পূজার আয়োজন কিছুই কমেনি, সে ঘরে গিয়ে দেখাল, বিশ্বনাথকে সে কি চক্ষে দেখেছে, অথচ বৈধব্যের কঠোর সংযম এতটুকুও শ্রীহীন হয় নি। পিতৃদায়, চোখের আলো, সুনন্দা—এ সকল গল্পের মধ্যেই—এই স্ত্রীচরিত্রের মহিমা দেখা যায়। ভোগের মধ্যে এ গৌরব নাই, ত্যাগের মধ্যে তা' আছে। আজকালকার লেখক-গণের অনেকে ভোগকে বড় কোরে দেখাচ্ছেন; যদি ভোগই বড় হয় তাতে পৃথিবী উঁচু হবে না; কিন্তু ত্যাগ মাটীতে পা' দিয়ে দিব্য-লোক ছুঁয়ে আছে; এই মহিলাদের হাতে সংযমের শ্রী কখনও কঠোরভাবে কখনও কোমলতার মধ্যে যেরূপ ফুটে উঠছে, তাতে যেন হাঁফ্ ছেড়ে বেঁচেছি; আমাদের মধ্যে যেটা পূজা করবার জিনিষ আছে, তা যাঁরা দেখাতে পারেন, তাঁরাই তো আমাদের গুরু।

কতকগুলি গল্প দুঃখান্ত—যেমন পৌষ-পার্ব্বণ, চোখের আলো, পিতৃদায় প্রভৃতি। আমার মনে হয় বিদেশী লেখকদের অনুকরণে শান্তা ও সীতা এই সব গল্পে দুঃখকে একটু বেশী বাড়িয়ে দেখেছেন; যে দুঃখ হৃদয়কে উচ্চ মন্ত্রে দীক্ষিত করে, সেই দুঃখকেই সাহিত্যিক কলার বরণ করে লওয়া উচিত। যে দুঃখ শুধু হৃদয়কে চষে ফেলে ছিঁড়ে নিয়ে যায় এবং নর-চিত্তের কোন মহিমাকে উজ্জ্বল কোরে দেখায় না,—সে দুঃখ নিয়ে নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন কি? এ দুঃখ কাকে উজ্জ্বল করে দেখালে? রাম-বনবাস বুঝি, পিতৃ-সত্য পালনের ত্যাগকে তা' সমুজ্জ্বল ক'রে দেখিয়েছে; জিন ভাল্‌জেনের চৌর্য্য ও কারা-বাসকেও বুঝি—সে ধাপটা পাড়ি দিয়ে সে একটা উচ্চ লোকে পৌছিয়েছে। কিন্তু অকারণে মানুষের মনকে ব্যথা দেওয়া ও শ্রোতা বা দর্শকের রুমাল দিয়ে চোখ মোছাই হচ্ছে যার সার্থকতা, এমন দুঃখকে বিদেশের অনুকরণে আমাদের সাহিত্যে আমদানী না করাই ভাল।

উদ্যানলতার গল্পটির রস প্রথম দিক্‌টায় যেরূপ জমেছিল, শেষদিকে সেই শ্রীটি যেন চলে গেল, কিন্তু গল্প পড়বার কৌতূহলটা বেড়ে চলল; সুতরাং এর আদি-ভাগটা কবিত্বময়, শেষটা হচ্ছে গল্প ভাগ; আমি গল্পের চাইতে কবিত্বের পক্ষপাতী, কারণ সাহিত্যিক মূল্য তার বেশী।

এই সব খুঁটি-নাটি দোষ আবিষ্কার কোরে একটা ভাল জিনিষকে খাটো করার চেষ্টা আমি করব না, যদিচ আমায় সমালোচকের একটা মস্ত বড় পদ তার জন্য না দেন, তাতে ক্ষতি নাই।

আমি এই লেখিকাদের বই পড়ে মুগ্ধ হোয়ে আপনাদের কাছে আমার কতকটা মোহ দিতে এসেছি। এই দুই লেখিকার যে কোন বই আপনারা পড়্‌বেন তাতেই আপনারা দেখবেন, এঁদের ভাষার উপর

কতটা দখল, সৌন্দর্য্যের প্রতি কতটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং ত্যাগ ও সংযমের আদর্শ কত বড়। এঁরা সাহিত্য-পথের নূতন যাত্রী, কিন্তু যে তীর্থ এঁরা দেখে চল্‌ছেন, তাতে পথ-ভুল এঁদের হবে না, নিশ্চয় বল্‌তে পারি। এঁরা গোড়াতেই বাঙ্গলা লেখার কায়দা এমন সুন্দর ভাবে দখল করে বসেছেন এবং মনকে এমনই বিশ্লেষণ কোরে দেখাতে শিখেছেন, যে আমি এঁদের বইগুলির বিশেষ পক্ষপাতী হোয়ে পড়েছি। আমার যদি কিছু ভবিষ্যৎ দেখ্‌বার শক্তি থাকে, তবে স্থির-বিশ্বাসে বল্‌তে পারি, এর পরে আমাদের সাহিত্য যে ছাঁচে গড়ে উঠবে, যে ভাষায় আত্ম-প্রকাশ করবে, তার শঙ্খধ্বনি কোরে এঁরা এগিয়ে চলেছেন, এঁরাই কিছুদিন পরে আমাদের কাণ্ডারী হবেন।

সীতা ও শান্তা, এ দুইজনের মধ্যে সাহিত্যিক গুণ-পনা বা বিশেষত্ব কার কি রকম,—তার বিচার কর্ত্তে পারলুম না; দুজনের রচনাই সময়ে সময়ে গভীর ও সময়ে সময়ে তরল, কখনও হাসিতে দীপ্ত, কখনও সংযত অশ্রুতে করুণ,—কখনও কৌতুকের কথায় লুটাপুটি, কখনও গাম্ভীর্য্যে শৈল-কঠিন। দুয়েরই আদর্শ এক, ভঙ্গী এক, দুজনের লেখা যে এমন হোতে পারে—তা জানতুম না, এ গঙ্গা-যমুনার মিশ্রণ নয়, এ যেন গঙ্গা ও মেঘ্‌না, দুই মিশে এক হয়ে গেছে। কোন কোন যমজ দুই ভাই-এর চেহারা ঠিক একরকম হয়, বাহিরের লোক তফাৎ বুঝতেই পারে না, আমাদের কাছে দুই লেখিকার লেখা সেই "ভ্রান্তি-বিলাসের" রহস্য সৃষ্টি করেছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

---

# কাজরী

২০

রাঁচি! রাঁচি!

সমস্ত ট্রেণটা কি কষ্টে এসেছি, তা আমিই জানি। সেই এলাহাবাদ যাবার কথা বার বার মনে পড়ছিল। সে কি সুখের যাত্রা! হাসি-গল্পে আমোদ-আহ্লাদে প্রাণ একেবারে ভরপূর হয়ে ছিল! হবে না কেন? বাবা, মা, তিনি, ভাই-বোনেরা—সবাই একসঙ্গে ছিলুম—মনের কোথাও কোন ফাঁক, কোন অভাব ছিল না ত! আর এই রাঁচি আসা! উঃ!

সেই গাড়ী-রিজার্ভ, সেই নতুন দেশের মোহ,—সব ত ঠিক আছে! কেবল এক জনের অভাবে সমস্ত যাত্রাটুকু কর্কশ, নীরস, বিশ্রী হয়ে উঠেছিল!

ভোরে পুরুলিয়ায় গাড়ীর বদ্‌লে যখন এদিক্‌কার ছোট গাড়ীতে এসে উঠলুম—তখন মনটা একেবারে যেন ভেঙ্গে নুয়ে পড়ল। গাড়ী-বদল, মানে, আর-একটা রেলোয়ে লাইন—ব্যবধান বেড়েই চলল,—শৃঙ্খল আরো ভারী, আরো জটিল হয়ে উঠল!

চা খাবার জন্যে বাবা মা ভারী জেদ ধরলে। আমি বল্‌লুম, খাব না। মা বললে,

"নে, গাড়ী থেমে আছে, এইবেলা খানকতক লুচি খেয়ে নে। এর পর গাড়ী চললে এত কয়লার গুঁড়ো আসতে থাকবে যে খাবার খেতে পারবি নে।" খেতে এতটুকু ইচ্ছা হচ্ছিল না। আবার বললুম, "না—" মা বললে, "ওরে, পৌঁছুতে বেলা ঢের হবে, এগারোটা বেজে যাবে, পিত্তি পড়বে যে—"

ভাবলুম, দূর ছাই—যতক্ষণ না মুখে কিছু দেব, ততক্ষণ ত শান্তি নেই, এমনি জেদ চল্‌তে থাক্‌বে, তার চেয়ে চুকিয়ে দি, যা-তা করে।

কিছু খেলুম—খেয়ে জানলার কপাটে গালটা কাৎ করে রেখে আকাশের পানে চেয়ে রইলুম। কুয়াশা কেটে যাচ্ছিল—আকাশে একটা ফিকে সবুজ রঙ ফুটে উঠেছিল,—গাড়ী থেকে মুখ যেটুকু বের করা যায়, বের করে চোখে যা দেখছিলুম, তাতে মনে হচ্ছিল, যেন আকাশের ঐ দিকে সবুজ রঙের মধ্যে ট্রেণ শুদ্ধ ঢুকে যাব। সামনে পথ কৈ? নেই ত।

প্লাটফর্ম্মে হরেক রকমের লোক। কাঁকর-ফেলা নীচু প্লাটফর্ম্মে বসে মাটীর ভাঁড়ে কেউ চা ঢেলে খাচ্ছে—কেউ-বা বড় বড় শালপাতার ঠোঙা হাতে পুরী-তরকারী খেতে বসে গেছে। পোষাকও হরেক রকমের। কারো ইংরাজী পোষাক, কারো মুসলমানী! বাঙ্গালী বাবুরা গায়ে ওয়েষ্টকোট কোট চাপিয়েছেন, কোটের গলা খোলা—গলায় কম্ফর্টার, পায়ে ফুল ষ্টকিং—ছম্‌কি-ছম্‌কি হয়ে কতবার অমনি গ্লাসে জল ভরে ট্রেণের কামরার ধারে ছুটে আসছেন,—কামরা থেকে চুড়ি-বালা-পরা সুন্দর হাতগুলি বের করে সুন্দরীরা গ্লাস নিচ্ছেন—তাঁদের হাতের পাশ দিয়ে কমলালেবু-রঙের শালের একটুখানি দোলন্ দেখা যাচ্ছে! কোন বাবু প্লাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে সিগারেট টান্‌ছেন—গায়ে প্রকাণ্ড আলষ্টার! এমনি নানান্ ঢংএর নানান্ রঙের পোষাক—পোষাকের মেলা যেন! রঙীন ঘাগরা পরে একদল বেহারী নাচওয়ালী একটা থার্ড ক্লাস কামরার সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল—এমনি গোল তুলেছিল তারা যে সকলের নজর পড়ল। তাদের একজনের নাকে প্রকাণ্ড নথ, চাকার মত! দেখে মা বল্‌লে, "মাগো, সাহসও কম নয়ত—অত-বড় নথ! ধরে যদি কেউ টানে, তাহলে নাক শুদ্ধ যাবে যে।" বুড়ী বললে, "আর যদি কোন হিন্দুস্থানীর কাঁধের লাঠিতে লেগে যায়, তাহলে ভারী মজা হয়, না?" বলে সে হো-হো করে হেসে উঠল।

সব কথাই আমার কাণে যাচ্ছিল। আমি তাতে যোগ দিই নি। কিছু ভাল লাগছিল না। মনটা ভারী উদাস হয়ে পড়েছিল। এমন সময় গাড়ী চলতে আরম্ভ হল।

কি ঘড়ঘড়ানি শব্দ, মাগো, কি ঝাঁকানি! লাইনের দুধারে দারুণ শুষ্কতা, কেমন একটা বিশ্রী রুক্ষভাব! মন-ভুলানো চোখ-জুড়ানো সে শ্যামল তৃণ-পুঞ্জের চিহ্নও মেলে না কোনখানে। শক্ত সিঁদুরে মাটী, কাঁকরে ভরা, কোথাও খুব চড়াই উঠে গেছে, কোথাও প্লেন, আবার কোথাও কি গভীর খাদ! আগাগোড়া দুধারে শুধু এমনি বেখাপ্পা গোছের অ-সমতল প্রান্তর ধূ ধূ করছে—তার কি শেষ আছে, না সীমা আছে! থেকে থেকে বাঙলা দেশের কথা মনে পড়ছিল! কোথায় সেই লাইনের ধারে

ছোট-খাটো ডোবাগুলি—তালগাছ-ফেলা ঘাটে বসে বৌ-ঝীরা সব বাসন মাজছে! কোথায় বা সেই তাদের ঘোমটার ফাঁক দিয়ে ডাগর চোখের কৌতূহল দৃষ্টি তুলে চলন্ত ট্রেনের পানে চেয়ে থাকা! কোথায় সেই কালো-কোলো চাষা-ভুষোদের ছোট ছোট স্যাংটা ছেলেগুলোর সরল প্রমোদ-নৃত্য! কিছু নেই। মাগো, এ কি কঠিনের রাজ্যে চলেছি আজ, উধাও হয়ে, শূন্য উদাস এই মন নিয়ে!

ট্রেণ এসে একটা ষ্টেশনে থামল—ছোট্ট ষ্টেশন, নামটা লক্ষ্য করিনি! ট্রেণ থামতেই বুকটা ছাঁত করে উঠল। দূরত্ব, দূরত্ব আরো-কত বেড়ে গেল! এ দূরত্ব ঠেলা কি সহজ? বুকে যেন কে পাথর চেপে ধরছিল। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছিল—মনে হচ্ছিল, দি লাফ এই ট্রেণ থেকে। দূরে, খুব দূরে, আরো দূরে তাঁকে ছেড়ে, আমি যেতে পারব না গো পারব না। মাথাটা কি-রকম দুলে উঠল। একবার মনে হল, এ কি, সত্যিই কি লাফ দেব না কি? মা আমার পাশেই বসেছিল—কি-একটা হাঁড়ি গুছিয়ে বেঁধে রাখছিল—আমি মার গায়ে ঢুলে পড়লুম। মা বললে, "গাড়ী ছাড়বার সময় একটু হুঁসিয়ার থাকিস্, নৈলে মাথা ঠুকে যাবে—" গাড়ী তখন ষ্টেশন ছাড়ছিল।

চলেছে ত চলেইছে গাড়ীটা। বিরাম নেই! শূন্য কর্কশ ধু-ধু প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে, সরু দুটি লাইন বেয়ে ছোট্ট গাড়ী চলেছে—গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্ করে। সে কি জানে, কতখানি ব্যবধান আমাদের মধ্যে সে গড়ে দিচ্ছে! মা বললে, "যাই বল বাবু, ভারী আস্তে যাচ্ছে গাড়ী।"

বাবা বললে, "চড়াইয়ে উঠচে যে—কতটা উঁচুতে উঠেছে, একবার জানলা দিয়ে একটু মুখ বাড়িয়ে পিছন-পানে চেয়ে দেখ না—"

মা বললে, "থাক্, যে কয়লার গুঁড়ো ছিট্‌কে আসছে—বাবাঃ, যেন কে ঝুড়ি থেকে কালো নুড়ি ছুড়ে-ছুড়ে মারছে!"

আমি গাড়ীতে নিজের জায়গাটিতে বসে চলেছি—দৃষ্টি রেখে ঐ সামনের পানে, কোন্ সীমাহীন সুদূরের দিকে! কাণে কথাগুলো ভেসে ভেসে আসছিল। হঠাৎ রৌদ্র-লাগা চিক্‌চিকে আলো-ভরা আকাশের এক কোণে ছায়ার মত কি একটা দেখা গেল। মেঘ না কি! সেই দিকেই চেয়ে রইলুম—ক্রমে ট্রেণটা চলতে চলতে চলতে চলতে অনেকখানি এগিয়ে এলে দেখলুম, না, ও মেঘ নয় ত—পাহাড়! কি ঘন জঙ্গলে ছেয়ে আছে। মনে হল, যেন ছবির মুনি-ঠাকুরটি প্রকাণ্ড গোঁফ-দাড়ি আর জটার ভারে জুজু সেজে ধ্যানে বসে আছেন। তারপর-থেকে মাঝে মাঝে অমনি পাহাড়ের শ্রেণী, মাঝে মাঝে আবার ফাঁক—সেই ফাঁকে আগেকার মত গেরুয়া রঙের কাঁকরে-ছাওয়া প্রান্তর! এমন্ এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো এলোমেলো ভাব প্রকৃতির ত আর কোথাও দেখিনি। এমনি দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলেছি, শেষে একটা ষ্টেশনে গাড়ী এসে দাঁড়াল। নাম দেখলুম, ঝাল্‌দা। ষ্টেশনটি একেবারে পাহাড়ের বুকে! যেন পাহাড়ের দুলালটি! এধারে-ওধারে চারিধারে পাহাড়, একেবারে ষ্টেশনের গায়ে-গায়ে,—চারিধার থেকে যেন ছোট ষ্টেশনটিকে আট্‌কে বেঁধে রেখেছে! প্লাটফর্ম্মে মোটা মোটা লাঠি আর বঁটি দা,

জাঁতি এমনি জিনিষ-পত্র নিয়ে ফিরিওয়ালারা হেঁকে ফিরছিল। বাবা বললে, "এখানকার বঁটি, জাঁতি, দা, এ-সবগুলো খুব ভাল; অনেকে কেনে।" মা বললে, "নাওনা গা, তবে দু'খানা জাঁতি কিনে।" বাবা বললে, "ষ্টেশনের এগুলো নেয় না, ভাল জিনিস সব ফরমাশ দিয়ে করাতে হয়।"

মা বললে, "দুখানা ফরমাশ দিয়ো তাহলে, মনে করে, বুঝলে ?"

লাইনের বাঁ ধারে ছোট-ছোট কোয়ার্টার্স। সেই বিরাট পাহাড় আর প্রান্তরের বুকে কতটুকু দেখাচ্ছিল,—যেন খেলার ঘর!

ঘণ্টা বাজল; গাড়ী চলতে লাগল। খানিকটা এগিয়ে এলে দেখি, সামনে দুই প্রকাণ্ড পাহাড় হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে, একেবারে সমস্ত পথ জুড়ে! যাব কোথা দিয়ে গো ? লাইনের গায়ে অল্প-জঙ্গলে-ভরা সেই দুই পাহাড় দেখে বুক কেঁপে উঠল। ধড়াস করে ঐ পাহাড় ওদের ঐ বিরাট বপু নিয়ে যদি গাড়ীর মাথার হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে— ? তাহলে এতগুলো হরেক দেশের হরেক রকমের যাত্রী-সমেত এই ট্রেণটা ধুলোর মত গুঁড়ো হয়ে যায়! তাহলে তখন কোথায় থাকি আমি আমার এই মনের মধ্যকার বেদনার পাহাড় নিয়ে! ভয়ে ভয়ে পাহাড়টার পানে চাইলুম। পাহাড়গুলোকে জীবন্ত বলে মনে হচ্ছিল। গা ছম্‌ছম্ করছিল।

ভাবলুম, আহা, ঐ পাহাড় যদি এই ট্রেণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ত বেশ হয়—মরে যাই আমি। এত-বড় দুর্ঘটনার কথা কালই অমনি খবরের কাগজে ছাপা হয়ে দেশ-বিদেশে রটে যায়,—তাঁর কাণেও গিয়ে পৌছোয়, এ খবরটুকু! তিনি সেই তপসীতে আরাম-কেদারায় বসে হিসেবের খাতা কোলে ফেলে টাকার স্বপ্ন দেখচেন, হঠাৎ কাগজ খুলতেই এই খবরটা জ্বল জ্বল্ করে চোখের সামনে ফুটে ওঠে অমনি— বেশ হয়, বেশ হয়, তা হলে! যেমন ঐ পয়সার জন্ম আমায় দূরে ফেলে রাখা, তেমনি হয়! আমিও অমনি ছায়ার মূর্ত্তি ধরে কাছে গিয়ে বলি—তোমার আপদ আমি সরে এসেছি—থাকো গো, সুখে থাকো তুমি তোমার ঐ টাকার পাহাড়ে বসে।

ভাবলুম, সত্যই যদি তাই হয় ?—তিনি কি কাঁদেন তাহলে, আমার জন্মে ?... একটু দুঃখ হয় বৈ কি! একটা পাখী পুষলেও ত মানুষের মায়া পড়ে—আর আমি,—হাজার হোক্, বিয়ে করে আমায় নিয়ে এসেছেন ত। একদিনের জন্মও কি তাঁকে সুখী করতে পারিনি ?...

তিনি ত নিজে কতদিন আমায় বুকে ধরে আদর করে বলেছেন,—অণি, আমার রাণী, আমার রাণী, আমার রাণী!

মনে পড়ল, একদিন সেই আমার অসুখ করেছিল—খুব জ্বর, গায়ে অসহ্য বেদনা। তিনি তাই নিয়ে কি অনাসৃষ্টি কাণ্ডই না বাধিয়ে তুলেছিলেন! বাড়ীর ডাক্তার নগেন বাবু ত দেখছিলেনই, তাতেও তিনি স্বস্তি পান্‌নি,—দুই বন্ধু-ডাক্তার সুশীলবাবু আর নরেন বাবুকে এনে হাজির। তারপর দিদি রাত্রে পাশে বসে সেবা করছিল—তাঁকে বলে-কয়ে শুতে পাঠানো হয়। রাত বারোটা-একটার সময় চোরের মত তিনি এসে খাটের

পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, দিদি থার্মমিটার নিয়ে আমার জ্বর দেখছিল—জ্বরটা তখন ছাড়ছিল—দিদি আলোতে দেখচে, এমন সময় হঠাৎ শোনা গেল, একটা ভগ্ন কণ্ঠস্বর, "কত বৌদি ?" দুজনেই আমরা চম্‌কে উঠেছিলুম। কে কথা কয় ? দিদি বললে, "তাই ভাল—অমনি করে কি চোরের মত এসে দাঁড়াতে হয় ? এমন ভয় হয়েছিল!" দিদি বললে, "জ্বর ছাড়চে—মোটে ৯৯।" তারপর দিদি তাঁকে শুতে যেতে বললে, তিনি নড়তে চান্ না, বললেন, "আমি যে অন্য ঘরে গিয়ে থাকতে পারচি না বৌদি, লক্ষ্মীটি ভাই, আমি এইখানেই থাকি।" দিদি বললে, "তুমি ঘুমোও না বাবু। পুরুষ মানুষ হচ্ছ,এ-সব সেবার কাজ তোমাদের নয়। মিছে এখানে থেকে কেন নিজেও ভড়কাবে, আমাদেরও ভড়কে দেবে! তার চেয়ে শোওগে।" তিনি বললেন, "অনুর এই অসুখ, ঘুম কি আমার আসে কখনো ? আমি এইখানেই থাকি, লক্ষ্মীটি—" আমি কত করে বললুম, "ওগো যাও, শোওগে যাও—" দিদি ঠাট্টা করলে, "আমার হাতে অনুকে রেখে বিশ্বাস হয় না, বুঝি ?" —তবু সেই এক সুর, করুণ মিনতিতে ভরা—"না, বৌদি, আমায় এখানে থাকতে দাও, বৌদি—আমি না হয় এইখানেই এক পাশে পড়ে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি—আমি অন্য ঘরে থাকতে পারবো না।"

সেই রাত্রিটা তিনজনে ওপুন কেমন গল্পে হাসিতে কাটিয়ে দিছলুম! লোকে বলে, রোগের সময় রাত্রি জাগলে রোগ বাড়ে, কিন্তু সে-রাত্রের সেই রোগ কোথায় যে পরদিন হাসি! দু'দিন পরে একদিন আমি বলেছিলুম—"যদি মরে যেতুম ?" শুনে তাঁর চোখ কি রকম ছলছলিয়ে এসেছিল—আহা!

আমি যেন চমকে উঠলুম, না, না, আমার মরা হবে না—ওগো পাহাড়, ওগো কঠিন শিলা-স্তূপ, তুমি থাকো, অমনি অটল ভাবে দাঁড়িয়েই থাকো,—আমি মরতে চাই না, মরতে পারবো না। এই বিরহ-বেদনা যতই ঘনিয়ে আসুক, তা সইবে, আমার প্রাণে সইবে, আমায় বেঁচে থাকতেই হবে!—না হলে—না হলে—তিনি যে পাগল হয়ে যাবেন!

প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠল—মনে হচ্ছিল, পাহাড়টা বুঝি সত্যিই এই ট্রেণের ঘাড়ে পড়ে গেছে, আর আমরা সব তারি তলায় পড়ে মরে গেছি! তারই ভীষণ ধাক্কায় নিশ্বাস আমার যেন বন্ধ হয়ে এসেছিল। তাড়াতাড়ি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে চোখ মেলে দেখি—ট্রেণ চলেছে—ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ শব্দ করে, কত 'ঘাট-বাট-মাঠ' আর প্রান্তর পেরিয়ে নিজের বিরাট গোঁ নিয়ে! আর দূরে-দূরে কাছে-কাছে ঐ পাহাড়—ছোট, বড়, মাঝারি—নানা আকারের! আর তারি ফাঁকে ফাঁকে ঐ সাদা সাদা খড়ির দাগের মত চিক্ চিক্ করছে দু'চারখানা সাদা বাড়ী—আর ঐ বন-বাদাড়, টালি-খোলার ছাদ—কত যে বৈচিত্র্য নিয়ে।...আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—স্বপ্ন দেখছিলুম এতক্ষণ!

বাবা বললে, "এইবার নামতে হবে রে—ঐ দেখ্, মোরাবাদি পাহাড়—ঐ যে-পাহাড়ের গায়ে সাদা বাড়ী চিক্‌চিক্ করছে, দেখছিস—?" সত্যি, বাঃ! ঠিক যেন বর্ষার

ভারী সুন্দর লাগল দেখতে! ঐ রাঁচি? ট্রেণ থেকে সমস্ত সহরের দৃশ্য এমন পরিষ্কার চোখে পড়ছিল—চমৎকার!

২১

ভালো লাগে না, ভালো লাগে না—এ-সব কিছুই যে ভালো লাগে না! এই পাহাড়, বন, ঝিলের দেশ, এই বিচিত্র সাজ-পরা মোটাসোটা সাঁওতালদের পথ-চলা, ঐ সরল অনাড়ম্বর মুক্ত ক্ষেত্র—না, না, কিছুই ভালো লাগে না গো!

সকালে সব কটি ভাই-বোনে মিলে বাবার সঙ্গে এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে—মাঠ পেরিয়ে কত দূর অবধি বেড়িয়ে আসি। লাল টকটকে সূর্য্যের আলো কুয়াশার পরদা ঠেলে ফেলে চারিদিক হাসিতে ঝলমলিয়ে দেয়—শিশিরে-ভেজা গাছপালা থেকে টুপ্ টুপ্ করে মুক্তোর ফল ঝরে পড়ে, সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য—দুপুরবেলা বাড়ীতে বসে কত হাসি-গল্পে বেলা পড়ে আসে, বিকেলে আবার সব বেড়াতে বেরুই—কোথায় সাকুলার রোড, হাজারিবাগ রোড, পুরুলিয়া রোড ঘুরে কোনদিন যাই ডুরাণ্ডা—কোনদিন বা রাঁচি পাহাড়, কোনদিন বা বরিয়াতু পাহাড়ের মাথায় চড়ে বসে থাকি—নীচে পড়ে থাকে বহুদূর জুড়ে প্রকাণ্ড জমি—খানা ডোবা, ঢিবি-ঢাবা পথ ঘর-বাড়ী নিয়ে! যেন ছবির মত দেখায়—উদাসীরও মন ভোলে, এমন দৃশ্য—কিন্তু আমার বুক এ সব দেখে এক মস্ত দুঃখে ঝন্‌ঝন্ করতে থাকে। হায় রে—"একটি মুখের একটু হাসিতে সকলি

সেই যে প্রবাসী না ভারতী কি কাগজে একখানি ছবি বেরিয়েছিল—অশোক-বনে সীতা। সীতাদেবী মলিন মুখে বসে আছেন, আর অশোক-কুঞ্জ একেবারে পাথরে-গড়া নির্জীব মূর্ত্তি ধরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তখন এ ছবির অর্থ বুঝিনি। আজ বুঝলুম। শিল্পীর খুব কারিগরী বটে! এই যে চরাচরের দৃশ্য, ঐ গাছ-পালা, হ্রদ-নদীর শ্যামল শোভা সমস্তই প্রাণহীন, নির্জীব, যেন পাথর দিয়েই কে তাদের মুড়ে রেখেছে—এদের মধ্যে এতটুকু প্রাণের স্পন্দন নেই—বাতাসে এরা দোলে না, সূর্য্যের কিরণে হাসে না, শুধু স্তম্ভিত হয়েই দাঁড়িয়ে আছে!

... ... ... ...

এইমাত্র তাঁর চিঠি পেলুম। দু'পাতা চিঠি। লিখেছেন, তপ্‌সীতে বাংলা তৈরি হচ্ছে। বাংলা হলেই আমায় নিয়ে যাবেন! তারপর আরো লিখেছেন, একটু গুছিয়ে দিয়ে তিনি পাঁচ-সাত দিনের জন্যে রাঁচিতে বেড়াতে আসতেও পারেন।

আহা, এমন দিন কি হবে! একবার এলে হয়! দেখি তখন, কেমন পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে ফেরেন! বেড়াবার এমন সব জায়গা দেখিয়ে দেব—কত পাহাড় মাঠ, তবে গে ঐ পাথরে-ভরা সুবর্ণ-রেখা নদী, তারপর আমি আছি! দুজনে কত বেড়াব। খালি বেড়াব, সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়। ঐ দূরে মাদলের আওয়াজ শোনা যায়,—মুণ্ডাদের পল্লী ঐ-সব জায়গা ঘুরে দেখে আসব!

জবাব লিখে ফেললুম—মস্ত জবাব। খুব লোভ দেখালুম। রাঁচিকে একেবারে

করলুম! এ ছবি দেখে তাঁর চটপট আসবার লোভ হবে, নিশ্চয়।

আঃ, এলে হয়, এলে হয়! তা হলে এই পাথরে-খোদা গাছপালা এক মুহূর্তে সুন্দর সজীব সলীল হয়ে উঠবে! এই শীতের দেশে নিমেষে অমনি বসন্ত জাগবে! তবেই না দেশের শোভা খুলবে!

চিঠিটা ডাকে দিয়ে আশা-পথ চেয়ে বসে আছি, দিন গুনছি—ওগো, কাজ নেই তোমার সেখানে থেকে তপসীর বাংলা তৈরি করিয়ে,—সে যখন হয় হবে'খন! তুমি এখন এসো, এখানে চলে এসো, আমি আর একদণ্ড থাকতে পারছি না, তোমায় ছেড়ে।

ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

---

# সমালোচনা

**মায়ে-পোয়ে।** শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পরিব্যক্ত। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয় হইতে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত এবং শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। এখানি উচ্ছ্বাসের সমষ্টি।

**হেমচন্দ্র।** শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, এম, এ, এফ, এস, এস, এফ, আর, ই এস বিরচিত। প্রথম খণ্ড। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মানসী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। হেমচন্দ্রের জীবনী ও কাব্যালোচনা—এ গ্রন্থে হেমচন্দ্রের বাল্যজীবন হইতে আরম্ভ করিয়া 'বৃত্রসংহার' রচনার কাল অবধি আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লেখক 'বঙ্গের প্রাচীন কবিগণের কথা' বলিয়া হেমচন্দ্রের পূর্ব্বে বঙ্গীয়কাব্য সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের অনুসন্ধিৎসা ও বিষয়-সমাবেশে বেশ দক্ষতা আছে। সংগৃহীত বিষয়ের কতটুকু ছাঁটিয়া কতটুকু প্রকাশ করা উচিত, সে বিচার-শক্তিরও পরিচয় পাই। ভাষা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর—জীবনীলেখকের এই কয়টি প্রধান গুণ থাকা প্রয়োজন। মন্মথ বাবুর তাহা আছে এবং গ্রন্থখানি সাধারণের পক্ষে তিনি উপভোগ্য ও সরস করিতে পারিয়াছেন। তবে ছোট-একটু ত্রুটি চোখে ঠেকিল—সেটি লেখকের উচ্ছ্বাস! মাঝে মাঝে "ধন্য সেই দেশ, ধন্য সেই জাতি" প্রভৃতি যে ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস তিনি প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন, সেটুকুর লোভ দ্বিতীয় সংস্করণে সম্বরণ করিতে দেখিলে সুখী হইব। জীবনীলেখক সাধারণকে দিবেন, যাঁহার জীবনী লিখিতেছেন, সেই মানুষটিকে পূর্ণভাবে। এরূপ উচ্ছ্বাসে রচনার রসভঙ্গ হয়। আশা করি, জীবনীকার এই ছোট কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিবেন। জীবনী-গ্রন্থ-রচনায় তাঁহার হাত আছে, তাই এ কথা পাড়িলাম, নচেৎ তুলিতাম না। গ্রন্থখানিতে হেমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্রের জননী, ভ্রাতৃগণ, ভগ্নী, পত্নী প্রভৃতির চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। বইখানির ছাপা কাগজ বাঁধাই ভাল হইয়াছে।

**ইব্রীয় ধর্ম্ম।** শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কর্তৃক বিবিধ গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। পাণিনি কার্য্যালয় এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা দেবকীনন্দন প্রেস ও নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। এই গ্রন্থে হিব্রুধর্ম্ম বা Judaism-এর ইতিহাস ও পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। পৃথিবীর নব্বই লক্ষ লোক এই ধর্ম্মের উপাসক। Old Testament-এ খৃষ্ট পূর্ব্ব ও যীশুখৃষ্টের স্বজাতি য়িহুদীদিগের

ধর্ম্ম(Judaism) এবং New Testament এ খৃষ্টোত্তর এবং যীশুখৃষ্টের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম (Christianity) বিবৃত হইয়াছে। নিউটেস্‌টামেণ্টের সহিত হিন্দু ধর্ম্মোপাসকদিগের কোন সংস্রব না রাখিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু ওল্ড টেস্‌টামেণ্টকে খৃষ্টানদিগের বাদ দিবার উপায় নাই। এই গ্রন্থে ইহুদীয় ধর্ম্ম গ্রন্থগুলির বিষয় বেশ ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হইয়াছে—গ্রন্থে ইহুদীয়দিগের ধর্ম্ম, সমাজ চরিত্রনীতি ব্যবহার রাষ্ট্রনীতি ও দর্শন প্রভৃতিরও বেশ একটি মনোজ্ঞ ছবি ফুটিয়াছে। লেখকের ভাষাটি ভালো,—এবং ধারাবাহিকতাটি তিনি বেশ বজায় রাখিয়াছেন। গ্রন্থের নাম শুনিয়া কেহ যেন ভড়কাইবেন না! ধর্ম্মালোচনায় যাঁহাদের রুচি নাই, তাঁহারা ইতিহাস-হিসাবে এ গ্রন্থ-পাঠে প্রচুর আনন্দ পাইবেন।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

গৃহ-শিক্ষা। শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত প্রণীত। মূল্য ১৷৹, প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী কলিকাতা ও চট্টগ্রাম। যে সকল মূল ধারণা ভিত্তিস্বরূপ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে জারমানগণ নিজ দেশে শিক্ষার সংস্কার করেন, তাহার মধ্যে একটা হচ্ছে, "If you want to put anything in the life of the nation, you must put it in the child first". ইংরেজেরা বলেন—An English boy is what an English home makes him. এ বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যেও মতভেদ আছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলেন—A home has got to be a particularly good home, to be better than a good Boarding School.

আমাদের মৌলিক ধারণা শিক্ষাদান—একজনের সঞ্চিত বিদ্যারাশি হইতে তাহার কতকটা দান। তদ্ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য আছে, গুরুগৃহে বাস আছে। আবার এক নূতন ভাব দেশমধ্যে দেখা দিয়াছে, তাহার নাম জাতীয়তার ভাব। তাহার ফলে জাতীয় শিক্ষা বলিয়া আর একটি নূতন অভাবের জ্ঞান আমাকে উপদেশ দিতেছেন। তাহার অন্যতম কারণ "দেশের ছেলেপুলে বসে আছে।" উপরে যাহা লিখিলাম সেগুলি একত্র করিলে মনে অনেক কথার উদয় হয়। একটা অপরিস্ফুট প্রশ্ন আমাদের মনে উদয় হইয়াছে। প্রশ্নটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার স্বরূপ স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে ও বুঝিয়া তদনুরূপ চেষ্টা করিতে এখনও আমাদের শক্তি হয় নাই। আমাদের মনে যে চঞ্চলতা দেখা দিয়াছে, তাহার অন্যতম লক্ষণ এই পুস্তকখানি, "গৃহ-শিক্ষা।" এ শ্রেণীর পুস্তক যত অধিক প্রকাশিত হয় ততই আনন্দের বিষয়, ততই মঙ্গলের বিষয়। পুস্তকখানি প্রধানতঃ চারটি বিষয় লইয়া লিখিত হইয়াছে—শিশুদিগের স্বাস্থ্য, তাহাদের নীতিশিক্ষা, জ্ঞান শিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষা। এ সকল বিষয় সম্বন্ধে এমন উপদেশ আছে যাহা সর্ব্ববাদী-সম্মত সকলের পক্ষে খাটে। গ্রন্থকার সে ভুল করেন নাই। এ শ্রেণীর পুস্তক লিখিতে অনেক দেহতত্ত্ব Physiology মনস্তত্ত্ব Psychology ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব moral science লিখিয়া বসেন। গ্রন্থকার তাহাও করেন নাই। বিষয়গুলি সরলভাবে ও সহজ ভাষায় আলোচিত হইয়াছে, কষ্ট করিয়া পড়িতে কি বুঝিতে হয় না। মা ও মেয়ে দুইটির স্বাতন্ত্র্যও রক্ষিত হইয়াছে। বোধ হয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেহের আণুবিজ্ঞানিক গঠন ও ক্রিয়ার অত বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া আর-আর অংশে আর একটু গল্প ও উদাহরণ থাকিলে গ্রন্থখানি অধিকতর সুখ-পাঠ্য হইত।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "গৃহশিক্ষা" বলিয়া জিনিস আমাদের দেশে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।" গৃহ-শিক্ষা যে নাই তাহা বলিলে কথাটা সত্য হইবে না। আমাদের যেমন গৃহ সেইরূপ শিক্ষা আছে। "গৃহ" যে সমাজের অংশ দেশের অংশ সকল গৃহগুলি যে পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত, সে সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার জ্ঞান এখনও জন্মে নাই। এ রোগের মূল অনেক নীচে।

লেপ্‌টেনান্ট কর্ণেল

ইউ এন মুখার্জি আই এম এস।

# সতেরো বছর

আমি তার সতেরো বছরের জানা।

কত আসা-যাওয়া, কত দেখাদেখি, কত বলাবলি ; তারি আশেপাশে কত স্বপ্ন, কত অনুমান, কত ইসারা ; তারি সঙ্গে সঙ্গে কখনো বা ভোরের ভাঙাঘুমে শুক-তারার আলো, কখনো বা আষাঢ়ের ভর-সন্ধ্যায় চামেলি ফুলের গন্ধ, কখনো বা বসন্তের শেষ প্রহরে ক্লান্ত নহবতের পিলু-বারোয়াঁ,—সতেরো বছর ধরে' এই সুর গাঁথা পড়েছিল তার মনে।

আর তারি সঙ্গে মিলিয়ে সে আমার নাম ধরে ডাক্‌ত।

ঐ নামে যে-মানুষ সাড়া দিত সে ত একা বিধাতার রচনা নয়। সে যে তারই সতেরো বছরের জানা দিয়ে গড়া ;—কখনো আদরে কখনো অনাদরে, কখনো কাজে কখনো অকাজে, কখনো সবার সাম্‌নে কখনো এক্‌লা আড়ালে, কেবল একটি লোকের মনে-মনে-জানা দিয়ে গড়া সেই মানুষ।

তার পরে যখন সে গেল তখন সেই তার সতেরো বছরের জানা মানুষটিও রইল না। তার কণ্ঠের যে-সুরে আমার নামটি ছিল সেও গেল আর সেই নামে যে সাড়া দিত সেও গেল ; বাঁশির সঙ্গে সঙ্গেই যেমন তার গান চলে যায় এক বন থেকে আরেক বনে।

তার পরে আরো সতেরো বছর যায়। কিন্তু এর দিনগুলি এর রাতগুলি সেই নামের সুতোয় আর ত গাঁথা পড়ে না,—এরা খসে পড়ে, ছড়িয়ে পড়ে।

তাই এরা রোজ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "আমরা থাক্‌ব কোথায় ? আমাদের ডেকে নিয়ে ঘিরে রাখ্‌বে কে ?"

আমি তার কোনো জবাব দিতে পারিনে, চুপ করে বসে থাকি আর ভাবি। আর ওরা বাতাসে উড়ে চলে যায়। বলে, "আমরা খুঁজতে বেরলেম।"

"কা'কে ?"

কা'কে সে এরা জানে না। তাই কখনো যায় এদিকে, কখনো যায় ওদিকে ; সন্ধ্যাবেলাকার খাপছাড়া মেঘের মত অন্ধকারে পাড়ি দেয়, আর দেখ্‌তে পাইনে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# কৃতঘ্ন শোক

ভোর বেলায় সে বিদায় নিলে।

আমার মন আমাকে বোঝাতে বস্‌ল, "সবই মায়া।"

আমি রাগ করে বল্‌লেম, "এইত টেবিলে শেলাইয়ের বাক্স, ছাতে ফুলগাছের টব, খাটের উপর নাম-লেখা হাতপাখাখানি— সবই ত সত্য।"

মন বল্‌লে, "তবু ভেবে দেখ—"

আমি বল্‌লেম, "থাম তুমি। ঐ দেখনা, গল্পের বইখানি, মাঝের পাতায় একটি চুলের কাঁটা, সবটা পড়া শেষ হয়নি; এও যদি মায়া হয়, সে এর চেয়েও বেশি মায়া হল কেন?"

মন চুপ করলে। বন্ধু এসে বল্‌লেন, "যা ভালো তা সত্য, তা কখনো যায় না; সমস্ত জগৎ তাকে রত্নের মত বুকের হারে গেঁথে রাখে।"

আমি রাগ করে বল্‌লেম, "কি করে' জান্‌লে? দেহ কি ভালো নয়? সে দেহ গেল কোন্‌খানে?"

ছোট ছেলে যেমন রাগ করে মাকে মারে তেমনি করেই বিশ্বে আমার যা-কিছু আশ্রয় সমস্তকেই মারতে লাগ্‌লেম। বল্‌লেম, "সংসার বিশ্বাসঘাতক।"

হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌লেম। মনে হল, কে বল্‌লে, "অকৃতজ্ঞ!"

জান্‌লার বাইরে দেখি ঝাউগাছের আড়ালে তৃতীয়ার চাঁদ উঠচে, যে গেচে যেন তারি হাসির লুকোচুরি। তারা-ছিটিয়ে-দেওয়া অন্ধকারের ভিতর থেকে একটি ভর্ৎসনা এল, "ধরা দিয়েছিলেম সেটাই কি ফাঁকি, আর আড়াল পড়েচে, এইটেকেই এত জোরে বিশ্বাস?"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---



কাজের শেষে

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী অঙ্কিত

# ভারতী

৪৩শ বর্ষ ]　　অগ্রহায়ণ, ১৩২৬　　[ ৮ম সংখ্যা

## ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে বিভিন্ন সভ্যতার প্রভাব ও পরিণাম

### সামুদ্রিক

য়ুরোপ ও এসিয়ার সমস্ত দেশেই জনসমাজ ভারতের ন্যায় একইভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইতে, ভৌতিক সভ্যতা ও নৈতিক সভ্যতার উন্নতি হইতে, বড় বড় রাজ্যের নিয়মতন্ত্রের উদ্ভব হয়; আবার এই বড় বড় রাজ্যগুলি একত্র-সংযুক্ত হইয়া অথবা, বড় বড় সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়া একতার দিকে উন্মুখ হয়। দিগ্‌বিজয়ের দ্বারা এই সকল সাম্রাজ্য পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। কতকগুলি সাম্রাজ্য তাহাদের সীমান্তদেশ উল্লঙ্ঘন করে। এইরূপে জীবনের কতকগুলি নূতন অবস্থা, অনেকগুলি ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার উদ্দীপক হইয়াছিল। তন্মধ্যে কতকগুলি চিরন্তন লক্ষণে রূপান্তরিত হয়। ক্রমে লোকেরা শান্তিপ্রিয় ও স্থিতিশীল হইল; বড় বড় সাম্রাজ্যের সংস্থাপন হইতে, দিগ্‌বিজয় ও বাণিজ্যের অভিরুচি পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। শান্তিপ্রিয় কৃষক, ও বাঁধা কাজে অভ্যস্ত কারিগরের পরিবর্ত্তে সৈনিক, নাবিক, কুঠীওয়ালা, সওদাগর, নূতন নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক অথবা পুরাতন ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনে সমুৎসুক এইরূপ শ্রমজীবী—এই সকল লোকের আবির্ভাব হইল। সুতরাং ভিন্নপ্রকার মানসিক গঠনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দৈহিক গুণও উৎপন্ন হইল। যে সকল জাতি এই নবভাব ও এই সকল গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিল, অপর জাতিদিগের ন্যায় পূর্ব্বযুগের সভ্যতার উপযোগী গুণ তাহাদের ছিল না। এই সকল নবীন জাতিরই প্রাধান্য হইল—

ইহারাই প্রথম স্থান অধিকার করিল। তা ছাড়া নূতন ধর্ম্মমত, নূতন দার্শনিক মত, নূতন সাহিত্য ও সমাজসম্বন্ধীয় মত আবির্ভূত হইল। এই সকল মত ততটা জাতীয় ভাবাপন্ন ছিল না—তাহার মধ্যে অনেকটা বিশ্বমানব-সুলভ উদার ভাব ছিল।

দুই দেশের লোক সংপ্রসারণ শক্তির প্রভূত পরিচয় দিয়াছিল। পারসীকেরা একটা কেন্দ্রীভূত এক-রাজতন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তাহাদের সাম্রাজ্যকে এসিয়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের ধর্ম্মের মধ্যে মনস্তত্ত্ব-বিদ্যার গভীর সূত্র-সমূহ ও নীতিশাস্ত্রের মহৎ তত্ত্ব সকল লিপিবদ্ধ ছিল। গ্রীকেরা আপনাদের মধ্যে সামরিক গুণ সকল ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে করিয়া তাহারা পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যাহাকে "Hellenism" বা গ্রীশীয়ধর্ম্ম বলে, সেই ধর্ম্মের মধ্যে বিশ্বমানব-গত সৌসাম্য ( Harmony ) ও আত্মমর্য্যাদার ( Dignity ) মতবাদ নিহিত ছিল। এই মতবাদের প্রভাব অনেক দেশের আচার-ব্যবহারকে এবং সকল দেশের শিল্প ও সাহিত্যকে উপরঞ্জিত করিয়াছিল। হিন্দু জাতির উপাদানগুলি বিচ্ছিন্নভাবাপন্ন ছিল এবং সাধারণ সভ্যতার মধ্যে তেমন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যাইতে পারে নাই। তথাপি হিন্দু জাতির প্রয়োজন-মত অবস্থার সহিত মিল করিয়া চলিবার প্রভূত শক্তি ছিল। পারসীকদিগের দ্বারা ও আলেকজাণ্ডার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক ভারতের বিভিন্ন জাতিকে এক সাম্রাজ্যের মধ্যে আনিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে গ্রীশের প্রভাব বশে ভারতে সকল প্রকার শিল্প ও সাহিত্যের পরিপুষ্টি হইয়াছিল; যথা:—বর্ণচিত্র, তক্ষণ শিল্প, মহাকাব্য, নাটক। পক্ষান্তরে ব্যাবিলন ও পারস্তের নিকট হইতে ভারত বড় ধরণের গৃহ-নির্ম্মাণ-রীতি গ্রহণ করিয়াছিল।*

ভারতের এই সকল নূতন প্রবণতা বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে আরও ভাল করিয়া পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য শুধু মতবাদের হিসাবে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রেরই যুক্তিসঙ্গত পরিসমাপ্তি; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের মৌলিকতা দার্শনিক সিদ্ধান্তের মধ্যে নহে, পরন্তু নৈতিক শিক্ষার মধ্যেই নিহিত। দেখা যায়, বৌদ্ধ নীতিতন্ত্র ব্রাহ্মণ্যিক নীতিতন্ত্রের বিরুদ্ধ। ব্রাহ্মণ্যিক নীতিতন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, বহু পুরাকাল হইতে অর্জ্জিত চরিত্রলক্ষণ, ঐতিহ্য-বুদ্ধি, বহুশতাব্দী ধরিয়া কোন এক বিশেষ নির্ব্বাচনপ্রণালীর দ্বারা দৃঢ়ীকৃত শ্রেণীভেদবুদ্ধি ও বর্ণভেদ প্রথা। পক্ষান্তরে দেখা যায়,—জীবনের নূতন অবস্থার সহিত হিন্দুচরিত্রকে খাপ খাওয়াইবার জন্যই যেন বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব। প্রথমতঃ দাক্ষিণাত্যের বিজয়-সাধন, দ্রাবিড়ীয়দিগের

* একদল য়ুরোপীয় লেখক আছেন, তাঁরা ভারতের কোন বিষয়েই মৌলিকতা স্বীকার করিতে চাহেন না। য়ুরোপের সভ্যতা গ্রীশের নিকট সর্ব্বতোভাবে ঋণী, পুরাতন গ্রীকেরাই য়ুরোপীয়দিগের গুরুস্থানীয়, সুতরাং তাঁহাদের এই অন্ধ গুরুভক্তি সত্যের বিরোধী হইলেও মার্জ্জনীয়।

প্রভাব, অশোক যে-রাষ্ট্রীয় একতার বাসনাকে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন সেই একতার বাসনা, এবং বর্ণভেদ-ঘটিত উৎপীড়নের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া—এই সমস্ত বৌদ্ধধর্ম্মের গোড়ার দিক্। এই গোড়ার দিক্টা ধরিলে—বৌদ্ধধর্ম্ম মঠ-সুলভ সাম্যনীতির ধর্ম্ম, সার্ব্বজনীন দয়ার ধর্ম্ম, একটি ভারতীয় ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তাহার পর, পারসীক ধর্ম্মের প্রভাব, "হেলেনিক" ধর্ম্মের প্রভাব, কংফুচু ধর্ম্মের প্রভাব, সম্ভবত হিব্রুধর্ম্মের প্রভাব (ভারতবর্ষীয় বণিক ও নাবিকেরা হিব্রুদিগের সহিত পরিচিত হইয়াছিল) পরিলক্ষিত হয়। পরিশেষে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব;—এই দ্বিতীয় দিক্টা ধরিলে, বৌদ্ধধর্ম্ম শুদ্ধাচরণের ধর্ম্ম, ভক্তির ধর্ম্ম, মৈত্রীর ধর্ম্ম, একটা এসিয়ার ধর্ম্ম, এবং এমন-কি প্রায় বিশ্বমানবীয় ধর্ম্ম বলিয়া উপলব্ধি হয়।

* * *

মিলিয়া মিশিয়া এক হইবার জন্য এই সকল দেশের লোকের প্রযত্ন কতকটা অকালপক্ব হইয়াছিল। পাঁচ শতাব্দী ধরিয়া রোমকেরা বর্ব্বরদিগের আক্রমণের বিরুদ্ধে য়ুরোপীয় সভ্যতাকে রক্ষা করে; কিন্তু এসিয়ায়, শক হূনদিগের অভিযানের ফলে, যে সকল জাতি কিয়ৎকালের জন্য নৈকট্য-সূত্রে বদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা আবার বিচ্ছিন্ন ও পৃথক্ হইয়া পড়িল। ভৌগোলিক সংস্থানের দরুণ যে ভারত একটা পৃথক জগৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অন্যান্য সভ্য সাম্রাজ্যের সহিত সেই ভারতের সমস্ত যোগাযোগ ও গতিবিধি প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

বিদেশীয় উপাদানসকল আত্মসাৎ করিয়া ব্রাহ্মণ্যিকধর্ম্ম যেমন একদিকে বৌদ্ধধর্ম্ম উৎপাদন করিয়াছিল, সেইরূপ দেশীয় উপাদান আত্মসাৎ করিয়া আবার হিন্দুধর্ম্মও উৎপাদন করিয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা, দেশের আদিম অধিবাসীদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য কিংবা বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য প্রয়াস পায় নাই। উহারা তাহাদিগের ভূতপ্রেত পূজায়, মূর্ত্তিপূজা ও অন্যান্য স্থূল ধরণের পূজায় কোন বাধা দেয় নাই। অশিক্ষিত হইলেও, দেশের এই আদিম অধিবাসীরা কালক্রমে একটু সভ্য হইয়া উঠিয়াছিল, উহাদের যে-ধর্ম্ম একটা বিশেষ ক্রমবিকাশ অনুসরণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছিল, সেই ধর্ম্মকে উহারা পরিশেষে ব্রাহ্মণদিগের স্কন্ধে চাপাইয়া দিল। প্রাকৃতিক ভূতযোনি ও বীরগণের প্রেতাত্মা দেবতায় পরিণত হইল; এই সকল দেবতার মধ্যে আবার পদমর্য্যাদা স্থাপিত হইল; উত্তরাঞ্চলে; উহাদের মধ্যে এক দেবতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বপ্রধান দেবতারূপে আবির্ভূত হইল। লোক-সাধারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া কৃষ্ণ এই চরিত্র-লক্ষণগুলি বজায় রাখিয়াছিলেন, যথা,—'বেপরোয়াভাব', চতুরতা, ভক্তবাৎসল্য, কিন্তু ভক্তনারীদের প্রতি সম্মানের অভাব; ক্রমবিকাশের আর এক অভিনব প্রণালী অনুসারে এই লোক-দেবতা, যোগীদের দেবতা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার লাম্পট্য-মূলক প্রেমলীলা ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার যোগরূপ রূপক বলিয়া বিবেচিত হইল।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের যুঝাযুঝি কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চলিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম পরাভূত হইল। বর্ব্বরদের অভিযানের ফলে

যখন ভারত বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, এবং একটা জাতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিল, তখন সেই বিশ্বমানবীয় ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম দেখিল, তাহার কাজ ফুরাইয়াছে। ভারত হইতে তাড়িত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম এসিয়ায় ছড়াইয়া পড়িল—ভারত হইতে অপসৃত হইবার পূর্ব্বে কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন রাখিয়া গিয়াছিল। অতএব দেখা যায়, হিন্দুধর্ম্ম বৈদেশিকের প্রভাব এড়াইতে পারে নাই।

ধর্ম্মের ক্রমবিকাশের ন্যায়, সমগ্র সভ্যতার ক্রমবিকাশ কতকগুলি একই প্রকার-ভেদের মধ্য দিয়া চলিয়াছিল।

বর্ণভেদ পদ্ধতি, বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারা বিকম্পিত-মূল এবং ভৌতিক সভ্যতার উন্নতিতে বিবর্দ্ধিতকায় হইয়া আবার শীঘ্রই আরও আঁটাআঁটি করিয়া আপনাকে বাঁধিল, আরও কড়াক্কড় হইয়া উঠিল। বিধিব্যবস্থা, রীতি-নীতি, সাহিত্য, শিল্পকলা সম্বন্ধেও এইরূপ হইল। সম্প্রসারণ যুগের পরে, দৃঢ়ীকরণের যুগ আসিল।

কিন্তু বহু শতাব্দীর পরে, একই প্রকার চরিত্রের নিত্য নির্ব্বাচনের ফলে ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্যের বিকাশ নিবারিত হইল। ক্রম-বিকাশের পথে পশ্চাদ্‌গতি উৎপন্ন হইল। কোন জাতির উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে বিদেশীয় উপাদান নিত্য আত্মসাৎ করা আবশ্যক হয়, এই সকল উপাদানের কার্য্য-ফলে ব্যক্তিগণ নূতন নূতন চরিত্র অথচ বিশ্ব-মানবের পক্ষে হিতজনক চরিত্র লইয়া আবির্ভূত হয়; তারপর, এই সকল চরিত্র ক্রমে কৌলিক হইয়া দাঁড়ায়। ইহার বিপরীতে, বর্ণভেদ-প্রথার উৎপীড়নে, একটা অতিরঞ্জিত প্রথাধর্ম্ম, সর্ব্বপ্রকার মৌলিকতার প্রতি বিদ্বেষ, কৃত্রিম সামাজিক নিয়ম ও অধঃপতন উৎপন্ন হইল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# বার্ত্তা

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

আমাদের দেশে বৈদিক ধর্ম্মের প্রকৃতির কথা অনেকেই জানেন। বৈদিক ধর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে প্রাকৃতিক শক্তি-সমূহের উপাসনা-ভিন্ন আর কিছুই নহে, যদিও ক্রমে এই প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা হইতেই এক "বিশ্বে দেব" কল্পিত হইয়া তাহা হইতেই আবার এক এবং অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের ভাব মানব-হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছে।

কিন্তু প্রথমে এই বৈদিক ধর্ম্ম প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। প্রথমে অতি সামান্য উপায়ে এই উপাসনা চলিত। ক্রমে আড়ম্বর ও জাতিভেদ আসিল। তাহা হইতেই বহুশাখ কর্ম্মকাণ্ডের আবির্ভাব হইল। ক্রমে এরূপ স্থলে যাহা হয়, তাহাই ঘটিল। উপাস্য দেবতা উপাসনার ঘটার মধ্যে যেন নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। উপাসনা ও

তাহার আড়ম্বরই যেন ধর্ম্মের মূলবস্তু বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল।

কিন্তু সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহাতে তৃপ্তি লাভ করিলেন না। বস্তুতন্ত্রতা ভিন্ন ভাবের কুজ্ঝাটিকা বা কতকগুলা ক্রিয়া-কাণ্ডের পদ্ধতি মানব-হৃদয়কে কিছুকাল আচ্ছন্ন রাখিতে পারে বটে, কিন্তু তৃপ্ত করিতে পারে না।

এই অতৃপ্তির ভাবেই সাংখ্যের উৎপত্তি। বেদে মুক্তির কথা আছে, কিসে মুক্তি হয় ইহাই সাংখ্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহাতে বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের বিরুদ্ধবাদ আছে।

এই সাংখ্যই বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের স্থায়ী কোন ফল নাই বলিয়া তাহার মৃত্যু ঘোষণা করিলেন। তাঁহার মতে সত্য পথ, "জ্ঞান"। "জ্ঞানান্মুক্তিঃ বিপর্য্যয়াদ্বন্ধঃ"। কিন্তু এই সাংখ্যও কিছুকাল কার্য্যকরীভাবে বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই; হিন্দু দর্শনের চরণ-মাত্ররূপে ছিল।

ক্রমে দেশে এই ভাব ঘনীভূত হইয়া শেষে ভগবান্ বুদ্ধদেবে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। তাঁহারই মুখে এই বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের বিরুদ্ধবাদ ভাষায় দৃঢ়তর ও বিস্তৃততরভাবে দেশের একপ্রান্ত হইতে আর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচারিত হইল। তাঁহারই চুম্বকাকর্ষণে একটী দল গঠিত হইল। তাহারা ক্রিয়া-কাণ্ডের উপর মানব-চিত্তের প্রাধান্য ঘোষণা করিল। বুদ্ধের বার্ত্তা—ক্রিয়া-কাণ্ডবহুল আড়ম্বর-পূর্ণ অর্থহীন বৈদিক ব্যাপারকে অপসৃত করিয়া দাও। মানবকে তাহার আপনার ও পারি-পার্শ্বিক অবস্থা উপলব্ধি করিতে দাও ও তাহাকে ভাবিতে দাও। তাহার দ্বারা তাহার হৃদয় সঞ্জীবিত হইয়া উঠুক! তাহা হইলেই আবার তাহার প্রাণ ও অনুভূতি ফিরিয়া আসিবে। তাহা হইলেই তাহার মুক্তি। এই জন্যই মৈত্রী ভাবনা, করুণা ভাবনা প্রভৃতির কথা।

বৌদ্ধদিগের এই ভাব বন্যার ন্যায় দেশকে প্লাবিত করিল। দেশবাসীগণ এই ভাবে মাতোয়ারা হইল। কত ধনীর সন্তান, কত বিদ্যাভিমানী ব্যক্তি, ধন-মানাদির গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া কাষায় গ্রহণ করিলেন ও দারিদ্র্যকে সাদরে বরণ করিয়া লইলেন। এইভাবই সকল বস্তুর নিয়ামক, এই ভাবই যেন খাদ্যপানীয়, সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সকলের স্থান অধিকার করিল। এই উদ্দাম ভাবস্রোতের মুখে বৈদিক ধর্ম্ম ভাসিয়া গেল।

যেমন সকল কর্ম্মেই হইয়া থাকে, এই বৌদ্ধধর্ম্মেও তীব্র ভাবের আতিশয্যে কতক-গুলি মহামনা অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যক্তির আবির্ভাব হইল। তাঁহারা এই ধর্ম্মকে যেন স্বীয় জীবন ও আদর্শ-প্রভাবে উত্তরোত্তর মহীয়ান্ করিয়া তুলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের জীবন লোকের আনন্দ ও পূজা আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহাদের মন্ত্রসাধন ও অধ্যবসায় তাঁহাদের অসামান্য শক্তির হেতুভূত হওয়ায় মানবের অনুকরণীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল।

কিন্তু এমন সুন্দর জিনিসেরও বিকৃতি আসিল। ক্রমে গুপ্তি তন্ত্র এবং তৎপ্রসূত অসামান্য শক্তিবাদ ও তাহা লাভের গুপ্ত উপায় প্রভৃতির আবির্ভাব হইল। যে তন্ত্র-শাস্ত্র প্রথমে চিত্তৈকাগ্রতার উপায় স্বরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল, এখন তাহার মধ্যে অবান্তর কত কথা, কত কলুষিত চিন্তা স্থান লাভ

করিল। কাজেই গুপ্তি ইহার জীবন বলিয়া বিবেচিত হইল।

কোনস্থলে গুপ্তিতন্ত্রের অত্যধিক প্রাচুর্ভাব হইলেই বুঝিতে হইবে যে, সেখানে ভিতরে গোলমালেরও আবির্ভাব হইয়াছে। এখানেও তা'ই। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম অধঃপতনের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল এবং আবর্জ্জনারাশি দিনে-দিনে সঞ্চিত হইয়া তাহাকে উত্তরোত্তর অন্তঃসার-শূন্য করিয়া ফেলিতে লাগিল।

ইহা হইতে আর এক কুফল ফলিল। উপাসনা ক্রমে প্রার্থনায় পরিণত হইল, এবং একরূপে না একরূপে স্বার্থ বা অন্য কোন অবাঞ্ছনীয় মনোবৃত্তি-প্রণোদিত বলিয়া স্তুতি ও চাটুবাদে পর্য্যবসিত হইল। ইহাতে মানব ক্রমে হীন-বৃত্তি হইয়া আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মশক্তি-বোধ হারাইল। ইহার চেয়ে মানবের মানসিক অধঃপতন আর কি আছে?

আমরা দেখিতেও পাই যে এই সময়ে ভারতীয় সমাজের আধ্যাত্মিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। চারিদিকে বিকৃত তন্ত্রশাস্ত্রের বীভৎস তাণ্ডব নৃত্য। যে বৌদ্ধধর্ম্ম এককালে বৈদিক অর্থহীন আড়ম্বর-পূর্ণ প্রাণশূন্য ক্রিয়া-কাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল, আজ সেই বৌদ্ধধর্ম্মই অন্যরূপধারী, কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে সেই প্রকারই, ক্রিয়া-কাণ্ডের আবেশে আবিষ্ট এবং প্রায় প্রাণ ও স্পন্দন-বিহীন।

এমন সময়ে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব। তাঁহারও বার্ত্তা প্রথমে বিনাশের—বৌদ্ধধর্ম্ম বিনাশ কর। তাহারই উপর তাঁহার অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা।

শঙ্করাচার্য্য গম্ভীরস্বরে আত্মবোধ উদ্‌বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। প্রত্যেকের মধ্যে ব্রহ্ম অবস্থিত; সেই ব্রহ্মের উপলব্ধি করিতে হইবে। আত্মশক্তির আবাহন আবশ্যক। তুমিই ব্রহ্ম, প্রার্থনা আবার কাহার কাছে? মুখাপেক্ষা করিবে কাহার? নির্ভর আপনা ব্যতীত কাহার উপর করিবে? নির্ম্মল হইবে। পবিত্র হইবে। "ঊর্দ্ধ পবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি।" তুমি ব্রহ্ম, তুমি নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব। বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃত অবস্থায় মানব যে হীনদশায় পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে তিনি এইরূপে তাহাকে ঊর্দ্ধে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন।

তাঁহার চেষ্টা সফল হইল। বিকৃত বৌদ্ধ ধর্ম্ম তাঁহার তীব্র প্রতিভা ও তীব্র বিশ্বাসের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না। সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় ক্রমে সে দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

আবার দেশে আত্ম-নির্ভরশীলতা আধিপত্য স্থাপন করিল। দেশে আবার স্বাধীন চিন্তা, উচ্চ আদর্শের নির্ম্মল জীবন দেখা দিল। দেশ আবার উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবে জাগিয়া উঠিল।

কিন্তু নৈসর্গিক নিয়মে ইহারও বিকার দেখা দিল। বিষয়-সম্পত্তি ও তদানুসঙ্গিক অবাঞ্ছনীয় চিন্তা প্রভৃতি এই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিল। আত্মনির্ভর-শীলতা ক্রমে আত্মম্ভরিতায় পরিণত হইয়া সমূহ অশুভের কারণ হইল।

ইহাতে দেখিতে পাই যে দুইটি, দৃশ্যতঃ-বিপরীত কিন্তু বস্তুতঃ-এক মনোবৃত্তির আবির্ভাব হইয়াছে। যখন আত্মম্ভরিতার প্রাচুর্ভাব হয়, তখন দেখিতে পাই যে তাহা আত্মনির্ভর-শীলতার ও আধ্যাত্মিক দার্ঢ্যের ভাণ করে। কিন্তু কঠোর পরীক্ষা উপস্থিত

হইলেই দেখি যে তাহার মিথ্যা আবরণ খসিয়া পড়ে এবং তখন দেখি সেই মিথ্যার বলের পশ্চাতে আছে দাস-সুলভ আশ্রয়-ভিক্ষা-প্রবৃত্তি। কাজে কাজেই দেখি, আধ্যাত্মিক জীবনে দার্ঢ্য ও একতার অভাব এবং গুরুতর দৌর্ব্বল্যের প্রাদুর্ভাব। ইহাতে সমস্ত জাতীয় জীবনটাই শক্তিশূন্য, প্রাণশূন্য হইয়া উঠে।

আমাদের দেশের যখন এই অবস্থা, তখনই মুসলমানের অভ্যুদয়। জাতীয় জীবন তখন এতই অন্তঃসারশূন্য যে তখন আমরা মুসলমানের নবীন উদ্যমকে কোনরূপ যোগ্য ও সক্ষম বাধা দিতে পারি নাই। তাই দেশে মুসলমান-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে বিশেষ কিছু আয়াসের প্রয়োজন হয় নাই।

এই সময় হইতে দেখিতে পাই যে বহুদেব-বাদী হীনবল তথাকথিত হিন্দুধর্ম্ম এবং নব উদ্যমে ও পবিত্রভাবে তেজীয়ান মুসলমান ধর্ম্ম পাশাপাশি চলিয়াছে। একে অপরের সহিত মিশেতেছে না। মেশা সম্ভবও নহে। বরং যাহাতে মুসলমানের সহিত মিশিতে না হয়, তাহার জন্য সেকালের হিন্দু যথাযথ বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি প্রণয়নে ব্যস্ত হইল; কিন্তু ক্রমে লোকের মনে ধারণা হইল যে মুসলমান আসিয়াছে বাহির হইতে বটে, কিন্তু সে এ দেশে বাস করিতে, এ-দেশের হইতে আসিয়াছে। কাজে কাজেই ভাব, আশা, আকাঙ্ক্ষার লেন-দেন না করিয়া থাকা চলিল না।

তখন দেখি কবীর, নানক প্রভৃতি মহা-পুরুষের আবির্ভাব। তাঁহারা দেখিলেন, কাফের-ঘৃণা ও হিন্দুর ম্লেচ্ছ-বিদ্বেষ মহা অশুভের কারণ। সেই কারণের বিনাশ তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইল। তাঁহারা সেই উদ্দেশ্যে ধর্ম্মের যে চিরন্তন সার্ব্বভৌম ভিত্তি তাহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তি ও ক্রমে জনসাধারণকে তাঁহাদের ভাবে অনুপ্রাণিত করিলেন। এইরূপে দ্বেষ-ভাব নষ্ট হইয়া সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠার সূচনা হইল। এই রূপ বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াই আকবর দীন ইলাহি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কিন্তু কালক্রমে গুরু নানকের উদার মতেরও রূপান্তর দেখা গিয়াছিল। অথচ সে রূপান্তর যে অহেতুক তাহা নহে। সে রূপান্তর সে সময়ের অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। প্রথমে শিখগণ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-রূপে শান্তভাবে ছিলেন। কিন্তু ক্রমে কতকগুলি গোঁড়া মুসলমানের অত্যাচারে আত্মরক্ষা ও তাহার উপায়-বিধানে কৃতসঙ্কল্প হইতে বাধ্য হন। তখন এই উদার মতের মধ্যে আবার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করে। সেই সমস্ত সাম্প্রদায়িকতা দেখিলে বেশ উপলব্ধি হয় যে সে-সকল মুসলমানদিগের প্রতি বিরুদ্ধভাব-প্রসূত,—যথা মুসলমানেরা চুল কাটে, অতএব শিখগণকে চুল লম্বা রাখিতে হইবে; মুসলমানেরা মদ্যপান করে না, অতএব শিখগণের মদ্যপানে নিষেধ নাই। মুসলমানেরা ধূমপান করে, অতএব শিখগণ ধূমপান করিবে না। শূকর-মাংস মুসলমানের নিষিদ্ধ খাদ্য, অতএব শিখগণকে শূকর-মাংস খাইতে হইবে, না খাইলেও দীক্ষার সময় মুখে অন্ততঃ একবার স্পর্শ করিতে হইবে ইত্যাদি।

কিন্তু যাহাকে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা বলিতেছি, তাহা যে শুধু নৈসর্গিক নিয়ম-বহির্ভূত নয়, তাহা নহে। তখনকার সমাজের

পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাৎকালিক শিখ সমাজের জীবন-রক্ষার জন্য এই তথাকথিত সংকীর্ণতার প্রয়োজন হইয়াছিল। রাজনীতিতে আমরা সাম, দান, দণ্ড ভেদের কথা পড়ি। সাম ও দানে কার্য্যসিদ্ধি না হইলে দণ্ড ও ভেদের প্রয়োগ আবশ্যক হয়। সমাজেও ঠিক তা'ই। শিখেরা প্রথমে সাম দান নীতি অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু প্রথমে তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেও পরে বলদৃপ্ত মুসলমানের অত্যাচারে এই শান্তনীতি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তখনই দণ্ড ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া শিখ-সমাজ যোদ্ধৃ-সমাজে পরিণত হইল।

এইরূপে বঙ্গেও চৈতন্যদেবের আবির্ভাব-কাল আলোচনা করিলে আমরা উপরিলিখিত ঐতিহাসিক তত্ত্বেরই সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারি। সে সময় বঙ্গের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনে একটা সঙ্কট সময় গিয়াছে। সাধারণ হিন্দুধর্ম্ম তখন অন্তঃসারশূন্য হইয়া রীতিমাত্রে পর্য্যবসিত। তাহার উপর তীব্র সমাজ-শাসন ও নবন্যায়ের "টিপ করিয়া তাল পড়া"র উৎপাত। অপরদিকে শাসক জাতি মুসলমান, ওরূপ সমাজ-বন্ধনের ঊর্দ্ধে, শাসকজাতি বলিয়া তাহার গৌরব, স্পর্দ্ধা ও ধনসম্পত্তি। ইহাতে সমাজে একটা বিকট উচ্ছৃঙ্খলতার আবির্ভাব হইল! লোকে দলে-দলে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া রাজার জাতি বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে লাগিল। যাহারা সমাজে রহিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই না সমাজের ভিতরে, না সমাজের বাহিরে, ত্রিশঙ্কুর মত রহিল। সমাজ উৎসন্ন

সমাজের এই সঙ্কট-সময়ে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। তিনি যে অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। তিনি তীব্র উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রভূত খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার অপেক্ষা হীনমতি ব্যক্তি এই ন্যায়েরই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া আমাদের দেশের ন্যায়াধ্যাপকগণের প্রকাণ্ড তালিকায় অগণ্য নামের মধ্যে একটী মাত্র হইয়া অমরত্ব লাভ করিত।

কিন্তু চৈতন্যদেব অন্যান্য মহাপুরুষ ও অবতারদিগের ন্যায়, বিশেষরূপে চিত্তবান্ ছিলেন। সমাজের অব্যক্ত আর্ত্তনাদ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তিনি চিত্তবান ছিলেন বলিয়াছি, বর্ত্তমান সময়োপযোগী অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা-নিচয় যথাযথ উপলব্ধি করিবার শক্তি থাকা এবং অতীত সময় ও আসন্ন ভবিষ্যতের পর্য্যালোচনা করিয়া কর্ত্তব্য নিরূপণ করিবার শক্তি থাকা, এই দুইয়ের সমষ্টিকে চিত্ত বলে। ইহাতে মানবের যে শুধু বিকারশূন্য ও স্থিরমস্তিষ্ক ( Brains ) হওয়া প্রয়োজন তাহা নহে, তাহার বিশেষ ভাবে অনুভূতি-শক্তি ( heart ) থাকা প্রয়োজন।

এস্থলে চৈতন্যদেব তাৎকালিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে হিন্দুধর্ম্ম প্রাণশূন্য পদ্ধতি-পিণ্ডে পরিণত। বুদ্ধি বিদ্যা ন্যায়ের তর্কে পর্য্যবসিত,—ধর্ম্মের যাহা কিছু, তাহা শ্রেণীবিশেষে আবদ্ধ। দেশের জনসাধারণের সে-ধর্ম্মে কোন অধিকার বা প্রবেশ নাই। কাজে-কাজেই ধর্ম্মে অনাস্থা

কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মে এখনও ভক্তি-প্রবণতা আছে। মুসলমানদিগের মধ্যে সাম্যভাব বর্ত্তমান। ধর্ম্মে সকলেরই সমান অধিকার। এই সমস্ত কারণে হিন্দুরা মুসলমান ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইতেছে। হিন্দুদিগের একমাত্র আশা তাহাদিগের হৃদয়কে সঞ্জীবিত করায়। এরূপ করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের হৃদয় বৈদ্যুতিক তরঙ্গে কম্পিত হইয়া অসাড়তা পরিত্যাগ করিয়া অনুভূতি-শক্তি পায়। তাহা হইলেই তাহারা সমস্ত বিষয় যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং হৃদয়ে হৃদয়ে আকৃষ্ট হইয়া এক নবভাবের সৃষ্টি করিবে।

এই জন্যই তাঁহার ভক্তি-ধর্ম্মের প্রচার। তাঁহার প্রচারে দেশে ভাবের বন্যা আসিল। পুরাতন সামাজিক বন্ধন কত শিথিল হইয়া খসিয়া গেল। জাতি-বন্ধন উঠিয়া যাইবার মত হইল। ধর্ম্ম শ্রেণী-বিশেষের সম্পত্তি না থাকিয়া জনসাধারণের সম্পত্তি হইল। ভক্তিতে সমস্ত ধর্ম্মের প্রাণসঞ্চয় ঘটিল। এইরূপে মুসলমান ধর্ম্মের দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের পরাজয় স্থগিত হইল। এই যুগসন্ধিতে এইরূপে চৈতন্যদেব হিন্দুধর্ম্মকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়েও আমরা ঠিক এইরূপ দেখিতে পাই। এই সময়েও ইংরাজের যশোগৌরবে দেশ ব্যাপ্ত। ইংরাজি শিক্ষাও অল্পে অল্পে দেশে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। মিশনারীগণ স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের ভক্তি ও নির্ভরবাদ স্বভাবতঃই এতদ্দেশীয় লোকের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। খৃষ্টান হইলে রাজার ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া লোকেও [illegible] গৌরব অনুভব করিত।

এদিকে কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল। কতকগুলি লোকাচার ও দেশাচার ও উপধর্ম্ম যেন ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছিল। যদিও জনসাধারণ এইরূপ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছিল, সেটা পিতৃপৈতামহিক বলিয়া যেন একটা অহেতুকভাবে। কিন্তু ইহা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে তৃপ্ত করিতে পারিত না এবং শিক্ষা ও চিন্তার প্রসারের সহিত এইরূপে তাৎকালিক হিন্দু-ধর্ম্মে অতৃপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

এমন সময়ে খৃষ্টীয় মিশনরীগণ খ্রীষ্টধর্ম্মের হৃদয়গ্রাহী ভক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা লইয়া প্রাণহীন হিন্দুধর্ম্মের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। দেশের শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদিগের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রবেশ করিতে লাগিল। এরূপ মনে হইল যে হয়ত কালে খ্রীষ্টধর্ম্মের স্রোতে হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের নাম পর্য্যন্ত ভাসিয়া যাইবে।

এমন সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। তাঁহার মত ধীমান্ ব্যক্তির মনে যে তাৎকালিক হিন্দুধর্ম্ম ও প্রচারিত খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভেদ এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম কর্ত্তৃক হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজের বিনাশের আকাঙ্ক্ষা বিশেষ ভাবে লাগিবে, তাহা বলা বাহুল্য। তিনি এই সঙ্কটে হিন্দুসমাজের উদ্ধারের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। হিন্দুধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিশেষ প্রণিধাণ করিয়া তিনি দেখিলেন যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম দেশাচারাদি ও পৌত্তলিকতা দ্বারা আবৃত হইয়া যেন অন্তর্ধান করিয়াছে। দেশাচার না থাকিলে মানব থাকিতে পারে না। যেখানে মানব ও মানবসমাজ বর্ত্তমান,

সেখানেই যেন অলক্ষ্যে দেশাচারের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই দেশাচার যদি প্রবল-প্রতাপান্বিত হইয়া উঠে, বা হেতু বা আবশ্যকতা দূরে রাখিয়া "দেশাচারের জন্যই দেশাচার" বা "শ্রেণী-বিশেষের স্বার্থের জন্য দেশাচার" এইরূপ নিয়মে রক্ষিত ও পুষ্ট হয়, তাহা হইলেই তাহার চাপে সমাজের প্রাণ বহির্গত হইবার আশঙ্কা ঘটে। ঐরূপ আমাদের জ্ঞানে যাহা-কিছু ভাব আমরা ব্যক্ত করি, তাহা নাম বা চিহ্নের দ্বারা ( Symbol ); কিন্তু যদি এই নাম বা চিহ্নকে আমরা এত বাড়াইয়া তুলি যে নাম বা চিহ্নই সব; নাম বা চিহ্ন যাহার প্রতিনিধি, সে যেন কেহই নহে, তাহা হইলে নাম বা চিহ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গিয়া ভাব-রাজ্যে ( এবং তাহা হইলে সর্ব্বত্রই ) এক অসারতা ও বিরাট অসত্যের সৃষ্টি হয়। ইহাকেই নিন্দা করিয়া পৌত্তলিকতা বলি। এই পৌত্তলিকতার চাপে ধর্ম্মের প্রাণ বাহির হইয়া যায়।

রাজা রামমোহন রায় ঐরূপ সতীদাহ প্রভৃতি দেশাচার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় বুদ্ধি ও লেখনী চালনা করিলেন।

এই বিনাশ-কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের সার তত্ত্ব নিষ্কাষন করিলেন এবং তাহা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। তখন খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত তুলনায় হিন্দুধর্ম্ম সত্য সত্যই উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রতিভাত হইল। দেশের প্রাচীন চিন্তা, গবেষণা, ধর্ম্মভাবের গৌরবে দেশের লোক গৌরব অনুভব করিল এবং খৃষ্টধর্ম্মের মোহ, প্রভাব ও বিজয়-অভিযান অনেকাংশে প্রতিরুদ্ধ হইল।

ইহার পর ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসার-বৃদ্ধি হইয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়ে ও অধিনায়কত্বে ব্রাহ্মসভা ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হওয়ায় তাহার কার্য্যকরী শক্তি বৃদ্ধি পাইল। এই সময়ে তাঁহার সহিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও কেশবচন্দ্র সেনের সংযোগে ব্রাহ্মসমাজের প্রভূত শক্তি ও শ্রী বৃদ্ধি হইল। এতদিন পর্য্যন্ত বেদ ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে নিষিদ্ধ বস্তু ছিল। এমন কি ব্রাহ্মসমাজেও প্রথম প্রথম বেদ-পাঠ হইত নিভৃতে, গোপনে, কতিপয় ব্রাহ্মণ মাত্রের সমক্ষে। ততক্ষণ ব্রাহ্মণেতর জাতির ব্যক্তিগণ অপর এক কক্ষে অপেক্ষা করিবেন। উক্তরূপে বেদপাঠ সাঙ্গ হইলে পর সকলে মিলিয়া এককক্ষে ভগবদুপাসনা হইত। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত উদার ধর্ম্মে এরূপ জাতি ও জাতির মধ্যে পার্থক্য-জ্ঞান অত্যন্ত বিসদৃশ,ইহাতে সন্দেহ নাই। এই কারণেই ইহা ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি তীব্রোৎসাহশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং উপরোক্ত রূপে বেদপাঠ প্রথা উঠিয়া যায়। ইহার পরে উত্তরোত্তর উন্নতিশীলতার ফলে ও তদানুষঙ্গিক মতভেদ ও মতবিরোধে ক্রমে নববিধান ও সাধারণ সমাজের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু এই সমস্ত উপরিলিখিত ঘটনার মধ্যে আমরা সাধারণতঃ যাহাকে ধর্ম্ম বলি, তাহারই প্রাধান্য দেখি। সমাজ বা সমাজে ধর্ম্ম ব্যতীত আর যাহা-কিছু আছে, তাহা যেন কতকটা অপ্রধানরূপে ইহার সহিত গ্রথিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম অর্থে ভগবান বা দেবতা-সম্পর্কীয় বস্তু বা নীতি নহে। ঐ সমস্ত

বস্তু ধর্ম্মের অংশ মাত্র। "ধর্ম্ম" অর্থে মানবের সমস্ত জীবন,—পারিবারিক, সামাজিক ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয়, নৈতিক, যুদ্ধসম্বন্ধীয়, সমস্তই। এই সমস্তের সমষ্টি লইয়াই পূর্ণ ধর্ম্ম। ইহাই মানব সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। এই পূর্ণ ধর্ম্মের হানি হইলেই সমাজে শিথিলতা আসে ও সমাজের মৃত্যু ঘটে। তখন সমাজের এক অংশ বা উদ্দেশ্যের অপর অংশের বা উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি বা সংযোগ বা অন্যোন্যাপেক্ষা থাকে না। অথচ আমরা দেখিতে পাই যে সহানুভূতি সংযোগ অন্যোন্যাপেক্ষা লইয়াই সমাজের জীবন।

সমাজের জীবন ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সমাজে ঐ সমস্ত বৃত্তির প্রয়োজন। সমাজ এরূপ ধরণে গ্রথিত যে তাহার এক অংশের শুভাশুভের উপর সমস্ত সমাজের শুভাশুভ নির্ভর করে। সমাজের কোন-এক শ্রেণীকে যদি আমরা উচ্চ করিতে চাই, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অপরাপর শ্রেণীকে যথাসম্ভব উপযুক্ত ভাবে উচ্চ করিতে হইবে। কোন অট্টালিকার প্রথম তলের গৃহগুলিকে যত উচ্চ করিব, দ্বিতলের গৃহগুলি কত উচ্চ হইবে, তাহার উপর নির্ভর করিবে। তদ্ব্যতীত সমাজের শক্তি সমবায়-শক্তি। সে শক্তি পরিমাপ করিলে দেখা যায় যে সমাজের কোন অংশ যদি দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে অপরাপর অংশ যতই দৃঢ় হউক না কেন, সমাজের সমবেত শক্তি সেই দুর্ব্বল অংশের শক্তি অপেক্ষা বেশী হইতে পারে না। শৃঙ্খলের শক্তি পরিমাপে আমরা প্রত্যহই এই সত্য উপলব্ধি করি।

আবার সমাজের জীবন ও শ্রী-বৃদ্ধি অনেকাংশে বাহির হইতে পুষ্টিগ্রহণ ও শক্তি-

আকর্ষণের উপর নির্ভর করে। দেখিতেও পাই যে-সমাজ প্রায়ই নূতন ভাব প্রভৃতি বাহির হইতে লইয়া আপনার করিয়া লইতে পারে, সেই সমাজই শক্তিতে, সামর্থ্যে মহীয়ান হইয়া উঠে। জীবনেও দেখি যে যতক্ষণ জীব জীবিত থাকে, ততক্ষণ সে বাহির হইতে কত রূপ বিভিন্ন খাদ্য-দ্রব্যাদি লইয়া রক্ত, মাংস মজ্জা, প্রভৃতি রূপে তাহাদিগকে পরিণত করিয়া একেবারে এত অভিন্নরূপে আপনার করিয়া লয় যে, তাহা ইন্দ্রজাল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই জীব যখন মরিয়া যায়, তখন যদি তাহার গাত্রে রক্ত-মাংসাদি বাঁধিয়া বা মুখাভ্যান্তরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে তাহা নিজস্ব করিয়া লইতে পারে না। সেইরূপ সমাজেও যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণ সে বাহির হইতে পরকে আকর্ষণ করিয়া লইতে সক্ষম হয়; এবং তাহার প্রাণ-বিলোপের সহিত তাহার এই শক্তি লুপ্ত হয়। তাহাতেই দেখি এই শক্তি-লোপ সমাজের প্রাণহীনতার নিদর্শন ও পরিচায়ক।

তদ্ব্যতীত ধর্ম্ম চর্চ্চা করিবে কে? যদি সমাজ ও তদন্তর্ভূত ব্যক্তিগণ উন্নত না হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মের উন্নত চিন্তা তাহারা দূরতম কল্পনার মধ্যেও আনিতে পারিবে না, চর্চ্চা ত দূরের কথা। কাজে কাজেই ধর্ম্মালোচনার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের উন্নতি ও শক্তি-বিধানের চেষ্টা আবশ্যক। সমাজ ও ধর্ম্মালোচনা এতটা অন্যোন্যাপেক্ষী।

আমার বোধ হয় শ্রীমৎ দয়ানন্দ স্বামী প্রতিষ্ঠিত আর্য্য সমাজ এই সত্যগুলি বেশ উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা যে শুধু

একেশ্বরবাদ মাত্র প্রচার করিয়া হিন্দুধর্ম্মের পুরাতন গৌরব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা নহে। তাঁহারা নিজদিগকে "আর্য্য" আখ্যা দিয়া গৌরব অনুভব করেন। তদ্ব্যতীত তাঁহারা পূর্ব্বকালের মত (যখন সমাজ জীবিত ছিল) বাহির হইতে নূতন রক্ত ও নূতন শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতেছেন। সমাজের হীন অংশগুলিকে উন্নত ও শক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, যাহাতে সমস্ত সমাজ উন্নত ও শক্ত হইতে পারে। তদ্ব্যতীত বিদ্যা শিক্ষা প্রসারও তাঁহাদের সাধু চেষ্টার মধ্যে অন্যতম। এইরূপে তাঁহারা সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করিয়া পূর্ণ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেখাইতেছেন। বঙ্গে ব্রাহ্মসমাজও ঐরূপ কার্য্য করিতেছেন।

শ্রীমৎ দয়ানন্দের বার্ত্তাতেও আমরা প্রথমে বিনাশ ও পরে গঠনের বার্ত্তা পাই। তাঁহার মতে প্রথমে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের বিনাশ আবশ্যক। এ সম্বন্ধে অবশ্য অনেকের মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু তিনি এই বিনাশের পর স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে সমাজের জীবন যুগ-হিসাবে ভাগ করা যায়। প্রত্যেক যুগের প্রথমে সমাজ বেশ পবিত্র তীব্র বেগে চলে। কিন্তু নদীতে যেমন চড়া পড়িয়া তাহার বেগ মন্দীভূত হয় এবং ক্রমে সে নদী মজিয়া যাইবার উপক্রম হয়, সেইরূপ সমাজেও আবর্জ্জনারাশি সঞ্চিত হইয়া সমাজের বেগ মন্দীভূত করিয়া ক্রমে তাহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। মৃত্যু যেন অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হয়। এই সময়ে সমাজে নৈসর্গিক নিয়মে ভগবানের অবতার আবির্ভূত হইয়া একই সঙ্গে বিনাশ ও গঠনের বার্ত্তা প্রচার করেন—আবর্জ্জনারাশি বিনাশ কর এবং সমাজের পুনর্গঠন কর। অবশ্য ইহার এই অর্থ নয় যে সমাজকে সব সময়েই আমূল বিনাশ করিয়া আবার ভিত্তি হইতে গঠন করিতে হইবে। সমাজে কখনও সংস্কার মাত্র আবশ্যক হয়, কখনও বা অল্পবিস্তর বিনাশ।

এইরূপে যথোপযুক্ত বিনাশ ও গঠনের আদেশই, প্রতি যুগ-সন্ধিতে সমাজের প্রতি ভগবানের অবতারের বার্ত্তা।

শ্রীবিমলাচরণ দেব।

---

# আলোর ফুল্‌কি

(৮)

ঘাসের মধ্যে থেকে ব্যাং আওয়াজ দিলে —"কর্ত্তা, ঘরে আছেন? কর্ত্তা!" সোনালি "ও মাগো ব্যাং!" বলে এক লাফে একটা গাছের কোটরে গিয়ে লুকোলো। ছ' ছ'টা কোলা-ব্যাং এসে উপস্থিত। তার মধ্যে সব-চেয়ে বড় ব্যাং এসে হাত-নেড়ে কুকড়োকে বল্লে—"বনে চিন্তাশীল যারা, তাঁদের হয়ে আমরা এসেছি ধন্যবাদ জানাতে গানের ওস্তাদ আপনাকে......ওর নাম কি, অনেক গানের আবিষ্কর্ত্তাকে—" আর-একজন থপ্ করে বল্লে—"জলের মতো সহজ

গানের......" অমনি তৃতীয় ব্যাং থপ্-থপ্ করে বল্লে—"যত সব ছোট গানের—"

অমনি অন্তে বল্লে—"মজার গানের।" পঞ্চম, ষষ্ঠ, তারাও থপ্-থপ্ ছপ্-ছপ্ করে এগিয়ে এসে বল্লে—"সব বড়-বড় গানের...... সব পবিত্র গানের!"

ব্যাঙেদের কুঁকড়োর মোটেই ভালো লাগছিলনা, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে তিনি তাদের বসতে বল্লেন। একটা মস্ত ব্যাঙের ছাতা টেবিলের মতো পাতা রয়েছে, তারি চারিদিকে সবাই বসলেন। সদালাপ চল্লো। ব্যাং বিনয় করে বল্লেন—তাঁরা কিছুই নয়—অতিহীন! কুঁকড়ো বল্লেন—"কিন্তু বড়-বড় চোখ দেখলেই বোঝা যায় তাঁরা খুবই বুদ্ধিজিভি।" কোলাব্যাং দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন—"আমরা বনের মধ্যে একছত্রী সবাই, মোরগদের মধ্যে একমাত্র কুঁকড়োকে একদিন ভোজ দিতে মনস্থ করেছি। আপনার গান পৃথিবীকে আলোকিত, পুলকিত, চমকিত, সচকিত করেছে!" এক ব্যাং বল্লে—"সত্য আপনার গান......" অন্য ব্যাং আকাশে চোখ তুলে বল্লে—"স্বর্গীয়।" "অথচ এই পৃথিবীরই!"—অন্য ব্যাং মাটিতে চোখ নামিয়ে বলে উঠলো। সোনাব্যাং বল্লে—"স্বপন-পাখীর গান, সে কি তুচ্ছ আপনার গানের কাছে!"

কুঁকড়ো বলে উঠলেন—"কি বল্লে? স্বপন-পাখীর গান···তুচ্ছ?...একি সত্যি? না তোমরা নিশ্চয় বাড়িয়ে বলছো!" কোলা-ব্যাং গম্ভীর স্বরে বল্লে—"স্বপন-পাখীর স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে, সত্যিকার গানে বনকে মাতিয়ে তুলে দেয়—এমন একজনের বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। একটু অদল-বদল না হলে আর পেরে ওঠা যাচ্ছে না।"

কুঁকড়ো দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন—"সে কাজটা যদি আমার দ্বারা সম্ভব হয়, তবে আমি রাজি আছি।" সব ব্যাং ডেকে উঠলো—একসঙ্গে কুঁকড়োর জয় দিয়ে—"কুঁক্-ড়ো! পাহাড়-তো-লীর্, কুঁক্-ড়ো—পা-হাড়-তো লীর্!"

সোনাব্যাং গলা ভারি করে বল্লে—"এইবার স্বপনের দফা রফা হোল!" কুঁকড়ো শুধোলেন—"দফা রফা কি রকম?" কিন্তু কে তাঁর কথা শোনে? গলা ফুলিয়ে গান ধরলে সব বেঙ-কটা কর্ত্তাল বাজিয়ে—

"মেঘ হাঁকে—গড় কর্, গড় কর্, গড় কর্!
বিষ্টি বলে—টুপ্‌টাপ্ চুপচাপ্ ঝুপঝাপ্!
শিল বলে—তড়-বড়, গড় কর্, গড় কর্!
বাদল ঝরে গড় করি—
জলে ভাসে মাঠ্, ঘাট্ আর বাট্,
এলো বাতাস এলোমেলো,
লাফ দিয়ে ঝড় এলো,
ঘাড় ধরে বলে গেলো—কর্ গড় কর্......"

কোলাব্যাং ধুয়ো ধরলেন—"কে তারে গড় করে? কে কারে গড় করে?" সোনাব্যাং চিত্তেন গাইলেন—"বাতাস তারে গড় করে, সবাই তারে গড় করে!" ফেরতা গাইলে সব বেঙ—"গড় কর্, গড় কর্! কর্ কর্ গড় কর্! গড় কর্, গড় কর্।" কুঁকড়ো ব্যাঙেদের শোধালেন—"স্বপন-পাখীর গান কেমন?"

ব্যাংরা বল্লে—"আমরা কেউ থাকি পাথর-চাপা, কেউ থাকি কুয়োর তলায়, আমাদের কানে কেমন করে সে গান আসবে? তবে স্বপন আমরা দেখি বটে—শীতের ক'মাস

চব্বিশ ঘণ্টাই। গেছো-ব্যাংকে শোধালে হয়, সে স্বপন আর পাখী দুই দেখেছে।”

কুঁকড়ো গেছো-ব্যাংকে শোধালেন স্বপন-পাখীর গানের কথা।

গেছো তার কট্‌কটে আওয়াজে পাখীর গানের নকল দেখিয়ে দিলে—“দম্ ফাট্, দম ফাট্! ছুয়ো ছুয়ো, ছুয়ো ছুয়ো……” নকলটা মোটেই আসলের মতো হল না, কিন্তু কুঁকড়ো ভাবলেন সত্যিই স্বপন-পাখী এমনিই গায়। তিনি ব্যাংদের বল্লেন—“আহা বেচারা পাখী যদি এই গান গেয়েই খুসি থাকে তো থাক্ না। তার উপর উৎপাত করে কি হবে? মশা মারতে কামান পাতবার কি দরকার?”

ব্যাংরা বল্লে—“না মশয়, আপনার গান যে-দিন শুনেছি, সেইদিনই বুঝেছি কি বিশ্রী স্বপন-পাখীটার গান! আপনার সুর শুনলে আমাদের যেন ডানা গজিয়ে উঠে উড়তে ইচ্ছে হয়। আর তার গান—ছোঃ।” বলে সব ব্যাংগুলো হাঁচতে লাগলো। তাঁর গান শুনে ব্যাংরা ডানা-গজিয়ে সব উড়ে চলেছে এ ছবিটা মনে করে কুঁকড়ো বেশ-একটু আমোদ পেলেন। ব্যাংরা তাঁর হাসি দেখে আরো জোরে ছাতা পিটতে লাগলো—“জয় কুঁকড়ো! জয় কুঁকড়ো!” বলে।

সোনালি বেরিয়ে এসে বল্লে—“এত গোল কিসের?” কুঁকড়ো বল্লেন—“ব্যাংরা আমায় ভোজের নিমন্ত্রণ করছে!” সোনালি অবাক হয়ে শুধোলে—“তুমি যাবে নাকি ওদের ভোজেতে?” কুঁকড়ো বল্লেন—“আপত্তি কি? এরা সবাই বুদ্ধি-জিভি। আমার গান এদের যদি ডানা-গজাবার কাজে লাগে, তবে কেন আমি এদের সে-সুখ থেকে বঞ্চিত রাখি! তোমার স্বপন-পাখীর গান তো সে কাজটা করতে পারলেনা, উল্‌টে বরং বেচারাদের দম ফাটিয়ে দেবারই জোগাড় করেছে। শোনোনা স্বপন-পাখী ওদের কি গানই শুনিয়েছে!”—কুঁকড়ো ব্যাঙেদের ইসারা করলেন, আর অমনি তারা সোনালিকে স্বপন-পাখীর গানের নকল দেখিয়ে দিলে—“দম্ ফাট্, দম্ ফাট্, ছুয়ো ছুয়ো ছুয়ো! দম্ ফাট্, ফাট্ দম্, ছুয়ো ছুয়ো।”

“শুনলে তো!” কুঁকড়ো সোনালিকে বল্লেন। ঠিক সেই সময় বনের শিয়রে নিশুত-রাতের আঁধার কাঁপিয়ে একটি সুর এসে পৌঁছল—“পিয়ো!” কুঁকড়ো সেই মিষ্টি সুর শুনে চমকে বল্লেন—“ও কে ডাকে?” কোলাব্যাং তাড়াতাড়ি বলে উঠলো “কেউ নয়, ওই সেই পাখীটা।”

এবার আবার সেই স্বপন-পাখীর মিষ্টি সুর কুঁকড়োর কানে এল—যেন একটি-একটি আলোর ফোঁটা—“পিয়ো, পিয়ো! পিয়ো!” কুঁকড়ো শুনতে লাগলেন। এ কি পাখীর ডাক? না এ স্বপ্নের বীণায় ঘা পড়ছে! সোনাব্যাং কি বলতে আসছিল, কুঁকড়ো তাদের এক ধমক দিয়ে সরিয়ে দিলেন। এইবার স্বপন-পাখী গান ধরলে—

“পিয়া!
আঁধার রাতের পিয়া, একলা রাতের পিয়া!
পিয়ো, ওগো পিয়ো! দিও, দেখা দিও!
আমায় দেখা দিও, একলা দেখা দিও।
আঁধার-করা ঘরে, জাগছি তোমার তরে,
অন্ধকারে পিয়ো, দিও—দেখা দিও!”

দেখতে-দেখতে চাঁদের আলো জলে-স্থলে এসে পড়লো। নীল আলোর সাজে সেজে

অন্ধকারের পিয়া যেন বনের আঁধার-করা বাসর-ঘরে এসে দাঁড়ালেন! স্বপন-পাখী আনন্দে গেয়ে উঠলো—"পিও, সুধা পিও, সুধা পিও পিও পিও!"

কুঁকড়ো বলে উঠলেন—"ছি ছি, ব্যাং-গুলোকে বিশ্বাস করে কি ভুলই করেছি! হায়, এ লজ্জা রাখবো কোথায়, ওগো স্বপন-পাখী!"

মধুর সুরে স্বপন-পাখীর উত্তর এলো—"দিনের পাখী তুমি নির্ভিক,সতেজ ডাক দাও; রাতের পাখী আমি আঁধারে ডাকি—ভয়ে-ভয়ে মিনতি করে। কিন্তু বন্ধু, তুমিও যাকে ডাক, আমিও তাকে ডাকি। ওরা যা বলে বলুক, তুমি আমি এক আলোরই দূত।"

কুঁকড়ো বনের শিয়রে চেয়ে বল্লেন—"গেয়ে চল, গেয়ে চল রাত্রির স্বপন!—আলোর দূত!"

আবার সুর উঠলো আকাশ ছাপিয়ে তারার মধ্যে গিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে। বনের সবাই চাঁদের আলোয় বেরিয়ে দাঁড়ালো সে সুর শুনে! গাছের তলায় আলো-ছায়া-বিছোনো, তারি উপরে হরিণ দাঁড়িয়ে শুনছে; কোটরের মধ্যে চাঁদের আলো পড়েছে, সেখান থেকে মুখ বাড়িয়ে বাচ্ছারা সব শুনছে; বনের পোকা-মাকড় পশু-পাখী সবার মনের কথা এক করে নিয়ে স্বপন-পাখী বনের শিয়রে গাইছে—জোনাকির ঝলকি, তারার প্রদীপ, চাঁদের আলোর মাঝে—নীল আকাশের চাঁদোয়ায় তলায়। ব্যাঙের বড়া সুর থেকে আরম্ভ করে ঝিঁঝির ঝিমে সুরটি পর্য্যন্ত সবই গান হয়ে এক-তালে বাজছে যেন এই স্বপন-পাখীর মিষ্টি গলায়। কুঁকড়ো অবাক হয়ে বলে উঠলেন—"এ যে জগৎ-জোড়া গান, এর তো জুড়ি নেই! স্বপন-পাখী কার কানে তুমি কি কথা বলে যাচ্ছ কে তা জানে?" অমনি কাঠবেড়ালী বল্লে—"আমি শুন্‌ছি 'ছুটি হল, খেলা কর'!" খরগোস বল্লে—"আমি শুনছি 'শিশিরে-ভেজা সবুজ মাঠে চল'!" বন-বেরাল্‌ বল্লে—"শুনছি 'চাঁদের আলো এলো'!" মাটি বল্লে—"বিষ্টির ফোঁটা পড়ছে যেন!" জোনাক বল্লে—"তারা আর তারা।" কুঁকড়ো তারার দিকে চেয়ে বল্লেন—"তোমরা কি শুনছ আকাশের তারা?" তারা সব উত্তর করলে—"আমরা নয়ন-তারার নয়ন-তারা!"

কাছে সোনালি-পাখী দাঁড়িয়েছিল, কুঁকড়ো তাকে শোধালেন—"আর তুমি কি শুনছ?" সে এক-মনে শুনছিল, কোনো কথা কইলে না, কেবল "ওঃ!" বলে নিঃশ্বাস ফেল্লে। কুঁকড়ো সোনালিকে বল্লেন—"যে যা ভালোবাসে স্বপন-পাখী তাকে সেই গানই শুনিয়ে যায়। আমি কি শুনলেম জানো?—"দিন এল, গান গাও। ভোর ভয়ি, ভোর ভয়ি......" সোনালি মুখ টিপে হেসে মনে-মনে বল্লে—"ভোরের বড় দেরী-নেই, তুমি না গাইলেও ভোর আজ আসে কিনা দেখাবো তোমায়।"

কুঁকড়ো একেবারে মোহিত হয়ে গান শুনছিলেন; ভোর হচ্ছে, কিন্তু সেটা আজ তাঁর খেয়ালই হলনা; তিনি বলে উঠলেন—"ওগো স্বপন-পাখী, তোমার এ-গানের পরে আর কোন্‌ লজ্জায় আমি গাইব?" স্বপন-পাখী বল্লে—"গান বন্ধ তো করতে পারনা তুমি!" কুঁকড়ো বল্লেন—"কিন্তু এর পরে সেই রগ্‌রগে আগুনের মতো রাঙা সুর

কি কারো গাইতে ইচ্ছে হয়!" স্বপন উত্তর দিলে—"আমার গান আমারি মনে হয় যে, সময়ে-সময়ে বড় বেশী নীল। আসল কথাটা কি জানো? যে-সুরের স্বপ্ন তোমারো মনে, আমারো মনে জাগছে, সেটিকে সুরে বসাতে তোমারো সাধ্য হল না, আমারো ক্ষমতায় কুলোলো না কোনোদিন। গানের পরে মন সে বলবেই—হলনা হলনা, তেমনটি হলনা, এ কিছুই হল না।"

কুঁকড়ো বল্লেন—"সুরের পরশে ঘুম আসবে, তাকেই বলি গান!" স্বপন বল্লে—"গানের ডাকে জেগে উঠলো, কাজে লাগলো—তন্দ্রা ছেড়ে, তাকেই বলি গান!"

কুঁকড়ো বল্লেন—"আমার গান কি কোনোদিন কারু চোখে এক ফোঁটা জল আনতে পারবে?"

স্বপন-পাখীর উত্তর হল—"আর আমার গান কি কোনোদিন কিছু জাগিয়ে তুলবে? বন্ধু, দুঃখু নেই গেয়ে চল, যেমন সুর পেয়েছি, ভালো হোক, মন্দ হোক, গেয়ে যাই যতক্ষণ—"

দুম্ করে বন্দুকের শব্দ হল। একটা আগুনের হল্‌কা বিদ্যুতের মতো বনের শিয়রে চম্‌কে উঠলো। একটি ছোট পাখী গাছের শিয়র থেকে কুঁকড়োর পায়ের কাছে ঝরা-পাতার মতো ঝরে পড়লো!

সোনালি চীৎকার করে উঠলো—"স্বপন-পাখী রে, স্বপন-পাখী!" কুঁকড়ো ঘাড় হেঁট করে বলে উঠলেন—"ওরে মানুষ কি নিষ্ঠুর! কি নির্দ্দয়!" স্বপন-পাখী তাঁর দিকে কালো চোখ মেলে একটিবার চেয়ে দেখলে, তারপর একবার তার ডানাদুটি কেঁপে উঠে স্থির হল। সকালের হাওয়া আগুনে-ঝলসানো রক্তমাখা একটি ছেঁড়া পালক আস্তে-আস্তে উড়িয়ে নিয়ে চল্লো—বনের পথে-পথে হুহু করে কেঁদে।

হঠাৎ ওদিকের ঝোপ-ঝাপগুলো মাড়িয়ে হোঁস্‌ফোঁস্ করে হাঁপাতে-হাঁপাতে জিম্মা হাজির। কুঁকড়ো তাকে দেখে বল্লেন—"জিম্মা, তুমি এখানে যে!, শিকার পৌঁছে দিতে না কি?"

জিম্মা ঘাড় হেঁট করে বল্লে—"এরা যে জোর করে আমায় শিকারে নিয়ে এল......"

কুঁকড়ো এতক্ষণ স্বপন-পাখীটিকে আড়াল করে আগলে ছিলেন, এবার সরে দাঁড়িয়ে বল্লেন—"চেয়ে দেখো কাকে তারা মেরেছে!"

জিম্মা ঘাড় নেড়ে বল্লে—"আহা, যে-গাছটি সুরে ভরা দেখবে, সেই গাছেই কি আগে গুলি চালাবে রাক্ষসগুলো! আমি আবার এদের হুকুম মানবো!"—বলে জিম্মা ঘুরে বসলো। তারপর, মাটির মধ্যে সব কারা চলা-ফেরা করতে লাগলো, আর দেখতে-দেখতে স্বপন-পাখীকে পৃথিবী যেন কোলের মধ্যে আস্তে-আস্তে টেনে নিতে লাগলেন।

দূরে শিকারীদের শিটি পড়লো। জিম্মা কুঁকড়োকে চটপট্ গোলাবাড়িতে ফিরে যেতে বলে দৌড়ে চলে গেল—শিকারীদের দিকে। এদিকে সোনালি কেবল দেখছিল কখন্ সকাল হয়! তার ভয় হচ্ছিল বুঝি কুঁকড়ো এইবার আকাশে চেয়ে দেখেন! কিন্তু কুঁকড়ো যেমন মাথা হেঁট করে স্বপন-পাখীর জন্যে কাঁদছিলেন, সেই ভাবেই রইলেন। সোনালি আস্তে-আস্তে তাঁর কাছে গিয়ে বল্লে—"এসো আমার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদো।" কুঁকড়ো

নিশ্বাস ফেলে সোনালির কাছে সরে গেলেন, সে ডানায় তাঁকে ঢেকে নিলে। তারপর সেই সোনার ডানার মধ্যে ঢেকে সোনালি কত ভালোবাসাই জানাতে লাগলো,—কত মিষ্টি কথা, কত মিনতি, কত ছল! আর ওদিকে সকাল হতে থাকলো, অন্ধকার ফিকে হয়ে এল, সব জিনিষ স্পষ্ট হতে থাকলো। কিন্তু তখনো সোনালি বলছে—"দেখছ আমি তোমায় কি ভালোবাসি!" তারপর হঠাৎ একসময় ডানা সরিয়ে নিয়ে সোনালি বলে উঠলো পালক ঝাড়া দিয়ে—"দেখেছ, কেমন সকাল এসেছে, তুমি না ডাকতেই!"

কুঁকড়ো চম্‌কে আকাশে চাইলেন। তারপর বুক-ফেটে তাঁর এমন সুর উঠলো যে তেমন কান্না কোনোদিন কেউ শোনেনি। তিনি যেন পাষাণের মতো স্থির হয়ে গেলেন; আর চোখের সামনে তাঁর সকালের আলো মেঘে আকাশে গাছে ছড়িয়ে পড়তে থাকলো! সোনালি নিষ্ঠুরের মতো বল্লে—"সেওলাগুলো রাঙা হয়ে উঠলো বলে!" "না, কখনো না!" বলে সেদিকে কুঁকড়ো ছুটে যাবেন—দেখতে-দেখতে পাথরের গায়ে সেওলার উপরে সকালের আভা পড়লো আর সেগুলো আগুনের মতো লাল হয়ে গেল! সোনালি বল্লে—"ঐ দেখ পূর্ব্বদিকে!" কুঁকড়ো "না!" বলে যেমন সেদিকে চাইলেন, অমনি সোনায় আকাশ ভরে উঠলো। "একি! একি!"—বলে কুঁকড়ো চোখ ঢাকলেন।

সোনালি বল্লে—"পূর্বদিক কারু হুকুম মানেনা, দেখলে তো?"

কুঁকড়ো ঘাড় হেঁট করে বল্লেন—"সত্যিই বলেছ। মন—সেও হুকুম মানে, কিন্তু পূবদিক—সে কারু নয়! আজ আমি বুঝেছি কেউ কারু নয়!"

এই সময় জিম্মা ছুটতে-ছুটতে এসে বল্লে—"গোলাবাড়িতে সবাই চাচ্ছে তোমাকে। পাহাড়তলী আর অন্ধকার করে রেখোনা।" কুঁকড়ো জিম্মাকে বল্লেন—"হায়, এখনো তারা আমাকে আলোর জন্যে চাচ্ছে?—আলো দেবো আমি, এ-কথা এখনো তারা বিশ্বাস করছে।" জিম্মা অবাক হয়ে রইল। কুঁকড়ো একি বলছেন! তার চোখে জল এলো। সোনালি এবার সব অভিমান ছেড়ে ছুটে কুঁকড়োর কাছে গিয়ে বল্লে—"আকাশ আর আলো দুটোই কি আমার এই বুকের ভালো-বাসার চেয়ে বড়? দেখ ওরা তো তোমায় চায় না, আর আমার বুক তোমায় চাচ্ছে।"

কুঁকড়ো ভাঙা-গলায় বল্লেন—"হাঁ, ঠিক!"

সোনালি বলে চল্লো—"আর অন্ধকার, সে কি আর অন্ধকার থাকে, যদি দুটি-প্রাণের ভালোবাসার আলো সেখানে—" কুঁকড়ো তাড়াতাড়ি "হাঁ" বলে সোনালির কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়ে সপ্তম-সুরে চড়িয়ে ডাক দিলেন—"আলোর ফুল!" সোনালি অবাক হয়ে বল্লে—"গাইলে যে!"

কুঁকড়ো বল্লেন—"এবার আমি নিজেকে নিজে ধমকে নিলেম। বারবার-তিনবার আমি যা ভালোবাসি, তা করতে ভুলেছি!" সোনালী শুধোলে—"কি ভালোবাসো শুনি?"

কুঁকড়ো গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"কাজ, আমার যা কাজ তাই।" বলে কুঁকড়ো জিম্মাকে বল্লেন—"চল, এগোও!" "গিয়ে করবে কি?" সোনালি শুধোলে। "আমার কাজ সোনালি!" "কিন্তু রাত্রি তো আর নেই!"

কুঁকড়ো বল্লেন—"আছে, সব সমস্ত চোখের পাতায়!"

সোনালি হেসে বল্লে—"আজ থেকে ঘুম-ভাঙানোই বুঝি ব্রত হল তোমার! কিন্তু যাই বল, সকাল তো হল তোমাকে ছেড়ে, তেমনি ঘুমও ভাঙবে তুমি না গেলেও।"

কুঁকড়ো বল্লেন—দিনের চেয়েও বড় আলোর হুকুমে আমায় চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সোনালি……"

সোনালি গাছের তলায় মরা স্বপন-পাখীটি দেখিয়ে বল্লে—"এও যেমন আর গাইবে না, তেমনি তোমার মনের সুরটি কোনো দিন আর ফিরে আসবে না!" ঠিক এইসময় সবাইকে অবাক করে দিয়ে বনের শিয়রে স্বপন-পাখী ডাক দিলে—"পিও, পিও!" ঠিক সেই গাছটির উপর থেকে যার তলায় রাতের স্বপন এখনো পড়ে আছে ধুলোয়। কুঁকড়ো উপরদিকে চেয়ে শুনলেন যেন আকাশ-বাণী হল—"শেষ নেই, শেষ নেই, বনের স্বপন অক্ষুর!"

কুঁকড়ো আনন্দে বলে উঠলেন—"অক্ষুর সুর, অশেষ স্বপন!" সোনালি বল্লে—"তোমার বিশ্বাস কি এখনো অটল থাকবে? দেখছ না সূর্য্য উঠেছেন!" কুঁকড়ো বল্লেন—"কাল যে গান গেয়েছি, তারি রেশ আকাশে এতক্ষণ বাজছিল সোনালি!"

এমন সময় পেঁচাগুলো চেঁচিয়ে গেল—"আজ কুঁকড়ো গায় নি, কি মজা!" "ঐ শোনো, সোনালি, পেঁচারা স্পষ্টই জানিয়ে গেল যে, আলো আজ দেওয়া হয়নি! তাই আনন্দ করছে তারা!"—বলে কুঁকড়ো সোনালির কাছে গিয়ে বল্লেন—"সকাল আমিই আনি। শুধু তাই নয়, বাদলে যখন পাহাড়-তলীতে দিন-রাত ঘন কুয়াশা চেপে এসেছে, দিন এল কিনা বোঝা যাচ্ছেনা, সেই-সব দিন আমার সাড়া সূর্য্যের জায়গাটি নিয়ে সবাইকে জানায়—"দিন এল, দিন এলরে, দিন এল!"

সোনালি কি বলতে যাচ্ছিল, কুঁকড়ো তাকে বল্লেন—"শোনো।" সোনালি দেখলে, কুঁকড়ো যেন কতদূরে চেয়ে রয়েছেন, চোখে তাঁর এক আশ্চর্য্য আলো খেলছে। কুঁকড়ো আস্তে-আস্তে বল্লেন—যেন মনে-মনে—"দূর সূর্য্যলোকের পাখী আমি! তাই না আমি ডাক দিলে নীল আকাশ ছেয়ে জ্বলে ওঠে সন্ধ্যার অন্ধকারে রাত্রির গভীরে আলোর ফুল্‌কি! আমার দেওয়া আলো কোনো দিন কি নিভতে পারে? না আমার গান বন্ধ হতে পারে? কতদিন গাচ্ছি, কতদিন যে গাইব তার কি ঠিকানা আছে? যুগ যুগ ধরে এমনই চলবে। আমার পর সে, তার পর সে গেয়ে চলবে—আমারি মতো অটল বিশ্বাসে। শেষে একদিন দেখা যাবে আকাশের নীল, তারায়-তারায় এমনি ভরে উঠছে যে রাত আর কোথাও নেই, সব দিন হয়ে গেছে—আলোয় আলোময়!" সোনালি অমনি শুধোলে—"কবে সেটা হবে শুনি?" "কোনো-এক শুভদিনে!"—বলে কুঁকড়ো চুপ করলেন।

সোনালি বল্লে—"আমাদের এই বনটিকে ভুলোনা যেন সেদিন।"

কুঁকড়ো বল্লেন—"কোনোদিন ভুলবোনা। এইখানেই জানলেম যে, এক স্বপন ভেঙে যায়, আর-এক স্বপন এসে দেখা দেয়,—স্বপনের সঙ্গে নিজেও ভেঙে পুড়া নয় কিন্তু

জেগে ওঠা—নতুন আলোয় নতুন আশা নিয়ে।" সোনালি বুঝলে কুঁকড়ো আর থাকেন না, সে হতাশ হয়ে অভিমানে বলে উঠলো—"যাও যাও, সেই খোপের মধ্যে রোজ সন্ধ্যেবেলা ঘুম দিও—নিজের অন্দর-মহলে মই বেয়ে উঠে!"

কুঁকড়ো উত্তর দিলেন—"ডানা খুলে উড়তে বনের পাখীরা শিখিয়েছে যে!"

"যাও সেই ঝুড়ির মধ্যে মুরগী-গিন্নি এতক্ষণ কাঁদছে।"

কুঁকড়ো বল্লেন—"মা আমায় দেখে কি খুসিই হবেন!"

জিম্মা বল্লে—"আর বলবেন, পুরোনো চাল ভাতে বেড়েছে রে!" বলে কুকুর ঠিক মুরগী-গিন্নির আওয়াজটা নকল কল্লে। কুঁকড়ো জিম্মাকে বল্লেন—"চল যাওয়া যাক্। আর কেন?"

সোনালি যেন সে-কথা শুনেও শুনলে না। সে দেখাতে চায় কুঁকড়ো গেলে তার একটুও কষ্ট হবে না। কিন্তু আপনা হতেই তার চোখদুটি জলে ভরে এলো। কুঁকড়ো তা দেখলেন, তাঁরও মন একটু উদাস হলো। শেষে কুঁকড়ো জিম্মাকে সোনালির কাছে দু-একদিন থাকতে বল্লেন। জিম্মা অনেক দুঃখু সয়েছে, সে সোনালিকে বোঝাবার জন্যে কিছুদিন বনে থাকাই স্থির করলে। কুঁকড়ো বিদায় নিয়ে এবার সত্যিই চল্লেন; সোনালী আর থাকতে পারলে না, ছুটে গিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে তাঁকে বল্লে—"আমাকেও সঙ্গে নাও।" কুঁকড়ো তার মুখে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বল্লেন—"আলোর ছোট বোন—বলে সোনালি সরে দাঁড়ালো। "তবে আসি।"—বলে কুঁকড়ো এগোলেন। সোনালি রেগে বল্লে—"আমি তোমার একটুও ভালোবাসিনে।" কুঁকড়ো তখন মাঝ-পথে ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লেন—"কিন্তু আমি তোমায় সত্যিই ভালোবাসি,—কেবল ভাবছি আমার দিনগুলির সঙ্গে যদি তুমি মিলতে পারতে!" বলতে-বলতে কুঁকড়ো বনের আড়ালে বেরিয়ে গেলেন। সোনালি রাগ-ভরে বলে উঠলো—"যেমন আমাকে ঠেলে গেলেন, তেমনি পড়েন পাখ্‌মারের পাল্লায় তো ডানা দুটি কেটে ছেড়ে দেয়!"

জিম্মা চুপটি করে বসে সোনালির রকম-সকম দেখছে, এমন সময় কাঠ্-ঠোকরা নিজের কোটর থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে বলে উঠলো—"পাখমারটা কুঁকড়োকে তাগ করছে যে! কি বিপদ!" পেঁচারা অমনি গাছের উপর থেকে ডুয়ো দিয়ে বল্লে—"বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, কুঁকড়োর এবারে কর্ম্ম কাবার!" খরগোসগুলো গড় থেকে ছুটে বেরিয়ে এল, একটা বাচ্ছা কান খাড়া করে দেখে বল্লে—"পাখমার বন্দুকটা মুচড়ে ভাংলে যে!" আর-একজন অমনি বলে উঠলো—"নারে, গুলি ভরচে, দেখছিস্ না?"

জিম্মার দিকে সোনালি, সোনালির দিকে জিম্মা অবাক হয়ে চেয়ে রইলো!

জিম্মা বল্লে—"ওরা কি কুঁকড়োর ওপরেও গুলি চালাবে?"

সোনালি বল্লে—"না।—সোনালির দেখা যদি পায়, তবে সেইদিকেই বন্দুক ওঠাবে।" বলে সোনালি চল্লো। জিম্মা পথ আগ্‌লে

"আমার যেটুকু করবার সেই কাজটুকু করতে।"—বলে বন্দুকের মুখে সোনালি উড়ে পড়তে চল্লো।

কাঠ্-ঠোকরা চেঁচিয়ে উঠলো—"ফাঁদ! ফাঁদ! ফাঁদটা বাঁচিয়ে সোনালি!" কিন্তু তার আগেই সোনালিকে দড়ির ফাঁদ নাগপাশের মতো জড়িয়ে ফেলেছে। "তারা তাঁকে প্রাণে মারবে!"—বলে সোনালি ধুলোর উপরে সোনার পাখা লুটিয়ে কাঁদতে লাগলো। তার সব অভিমান চুর হয়ে গিয়ে কান্নার সুরে মিনতি করতে লাগলো কেবলি সকালের কাছে—"হিমে সব ভিজিয়ে দাও, বারুদ না জ্বলুক, ভিজে ঘাসে শিকারীর পা পিছলে যাক অন্যদিকে! ওগো সকালের আলো, তুমি তোমার পাখীকে রক্ষে করো,—যে-পাখী আঁধার দূর করে, আকাশের বাণকে ফিরিয়ে দেয়—সবার উপর থেকে। ওগো স্বপন পাখী, তুমি গেয়ে ওঠো, ঢুলে পড়ুক দুরন্ত মানুষের চোখের পাতা, স্বপ্নের রাজ্যে সে ঘুমিয়ে থাক্—তার মৃত্যু-বাণের পাশাপাশি!"

স্বপন-পাখী গেয়ে উঠলো বন মাতিয়ে করুণ সুরে—"পিয়—পিয়, ও গোলাপের পিয়, ও আমাদের পিয়!" সোনালি দুখানি ডানা ধুলোর উপরে রেখে বল্লে—"আলো! তোমার পাখীকে বাঁচাও, তার সঙ্গে সেই গোলা-বাড়িতেই আমি চিরদিন থাকবো, আর কোনোদিন অভিমান করবোনা তার উপরে!" অমনি সোনালি দেখলে আলো হতে আরম্ভ হলো, চারিদিকে পাখীরা গেয়ে উঠলো, আকাশ ক্রমে নীল হতে থাকলো, বনের ঘুম আস্তে-আস্তে ভাংতে লাগলো।

সোনালি মাটিতে মাথা নুইয়ে বল্লে—"আলোর অপমান, আলোর দূতের অপমান আর আমি করবোনা। হে আলোর আলো, আমায় ক্ষমা করো, তাঁকে বাঁচাও!" দুম্ করে ওধারে বন্দুক ছুটলো—বনের সমস্তটা যেন রী-রী করে শিউরে উঠলো, তার পর কুঁকড়োর সাড়া এল—"আলোর ফুল্‌কি!"

"তাগ ফস্‌কেছে! গুলি ফস্‌কেছে!"—পেঁচাটা কেঁদে উঠলো। আর অমনি দিকে-দিকে পাখী সব "জয় জীব! জয় জীব!" বলে কুঁকড়োর জয় দিয়ে উঠলো। কোকিল উলু-উলু দিয়ে বলতে লাগল—"শুভদিন এল—শুভদিন!" দেখতে-দেখতে চারিদিক আলোময় হয়ে উঠলো! সেই সময় বনের মধ্যে পায়ের শব্দ উঠলো। সোনালি চোখ বুজে চুপ করে শুনতে লাগলো—পায়ের ধ্বনি আস্তে-আস্তে তালে-তালে পড়ছে—এক, দুই, তিন! কার ঠাণ্ডা হাতের যেন পরশ পেয়ে সোনালি চোখ খুলে দেখলে—পলাতকা কুঁকড়োকে বুকের কাছে ধরে কুঁকড়োর মনিব! সোনালি পালাবার চেষ্টাও করলেনা; কুঁকড়োর পাশে গেরেপ্তার হয়ে গোলা-বাড়িতে চল্লো। বসন্ত-বাউরী পাহাড়তলী মাতিয়ে সুর ধরলে—"কথা কও, বৌ কথা কও, কোথা যাও? বৌ, কোথা যাও? কথা কও, বৌ, কথা কও।"

সমাপ্ত।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# তুমি ও আমি

তুমি একদিন শুভদ শারদ প্রাতে
মালতী-শেফালি তুলে' দিলে মোর হাতে—
দু'মুঠি চাপিয়া বুকে
না দেখে হাসিনু সুখে,
—সে আলো চুমিল নিমীল-নয়ন-পাতে।

তুমি একদিন ফাগুন-দিনের শেষে
লালে-লাল হোরি খেলিলে আপনি হেসে;
আমি ধরিলাম ডালা
অশোক-চাঁপার মালা,
হৃদয়ে কি জানি পুষিনু সর্ব্বনেশে।

লুকাইলে সখা, দু'খানি আঁখির আড়ে,
তা' হেরি' আমার হিয়ার আরতি বাড়ে।
পিপাসা-পানীয়-তলে
কি গুঁড়া মিশালে ছলে—
পিয়ে পিয়ে তবু সে ঘোর নেশা কি ছাড়ে!

তুমি একদিন গভীর বরষা-রাতে
টুটাইলে ঘোর, বজ্র ঝঞ্ঝাবাতে;
বিষ্ণুচক্র সম—
প্রিয়া-দেহ নিরুপম
কাটি' উড়াইলে মৃত্যু-কুঠারাঘাতে।

আজ সখা, তুমি চির-তুহিনের দেশে
বসায়েছ মোরে জরতীলীলার বেশে।
তুষার-মরুর আলো
তা'ও যে লাগিছে ভালো—
আঁধারে তবুও 'অরোরা' উঠিছে হেসে!

তবু ভাবি সখা, একি এ তোমার রীতি!
ভাবি, কেন হেন চুরী-ছল নিতি-নিতি?
একবারে যদি বলে' ফেল'—'ভালবাসি'
আছে তায় হানি? ভেবে তাই আমি হাসি।
এমন পাগল কভু হেরি নাই ওরে!
এমন চপল হইলে কেমন করে'?
দাঁড়া'লে না কেন স্বরূপ-অরূপ-বেশে
একেবারে মোর প্রাণের দুয়ারে হেসে?
আবীরে ও ফুলে নারীর নয়নে চুলে'
কত খেলা তুমি খেলিলে ধরম ভুলে!
লাজে মরে' যাই তোমার চরিত স্মরি'—
লোভে পড়ে' ভালবাসিব তোমারে, হরি?
তুমি করে' দিলে মদের দারুণ নেশা,
তা' লাগি, ধরিলে আপনি শুঁড়ির পেশা!
রচিলে পেয়ালা কত না মশলাদার,
তার পর ভেঙ্গে করে' দিলে চুরমার!
তারপর যবে বিষের পিপাসা ঘোর
হুতাশে দহিল এ দেহ জনম-ভোর,
তখন গোপনে আঁধারের অভিসারে
বাঁধিলে আমারে তোমার বাহুর হারে,
সঁপিলে অধরে অমৃত-শিশির চুমা,
বুকেতে বাঁধিয়া কহিলে 'ঘুমা রে ঘুমা'।
তার পরে বুঝি জেগে র'বে সারারাত—
এ রূপ হেরিতে হবে না নিমেষপাত!
মরি মরি সখা, বলিহারি প্রেম তোর!
তবু হাসি আমি, হে শঠ কপট চোর!

তোমারে বাসিব ভাল, তাই বার বার
এত ব্যথা-দাগা-দেওয়া এত লুকাচুরী!
তোমারে যে বাসি ভালো, স্বভাব আমার!
প্রাণমূলে ফোটে সে যে অমৃত-বল্লরী!

তুমি স্থির নহ কভু, বার বার ফিরে
শুনিবারে চাহ আমি ভালবাসি কিনা,
বিশ্বাস শোধন কর মোর আঁখিনীরে,
তুমি ভালবাস ফিরে— আমি ত' চাহি না!

হায় সখা! সতী আমি, কোন্ ভ্রমবশে
তুলে' দিলে শিরে মোর কলঙ্ক-পশরা!
তাই যুগ-যুগ ধরি' কি মোহ-রভসে
রচিলে মায়ার সৃষ্টি—জন্ম, মৃত্যু, জরা!

আপনার প্রেম তুমি দিলে মোর বুকে,
আপনি হইলে নিঃস্ব ভিক্ষাসুখ লাগি,'
কাঞ্চনবরণী রাধা, তুমি কালামুখে
দ্বারে তার দাঁড়াইলে প্রেমকণা মাগি'!

সব প্রেম তারে দিয়ে শেষে অবিশ্বাস!
সে যে তোমা' করিয়াছে সর্ব্ব-সমর্পণ;
অগ্নি-পরীক্ষারও পরে তবু বনবাস—
বারে বারে তাই তার এ হেন দহন!

সৃষ্টি হ'তে এতকাল এই যে পীড়ন,
এত কালি, এত ধুলা, এত পাপ-তাপে
তবু কি মরেছি আমি? নবীন জীবন
জন্মে জন্মে লভিয়াছি প্রেমের প্রতাপে।

লোকে বলে, লীলা এই, আমি সে মানি না—
তোমার বুকের 'পরে রেখেছি এ মাথা,
চেয়েছি ঘুমন্ত মুখে, আমি কি জানি না
তোমার মনের মনে জাগে কোন্ ব্যথা?

তোমার নিশ্বাসে খসি' দ্যুলোক ভূলোক
মর্ম্মরিছে মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন!
অশ্রু, আর যবাঙ্কুর-পাণ্ডুর আলোক,
ব্যেপে' আছে দিক্-দেশ—অসীম বন্ধন!

আমারে সংহরি' লও আপনার মাঝে,
রেখো না পৃথক করে' বৃন্দাকুঞ্জবনে,
বিরহের ছল করি' নটবর-সাজে
ভুঞ্জিতে মিলন মধু—মজিলে স্বপনে!

একে-দুই কাজ নাই, দু'য়ে-এক ভালো,
তুমি-আমি বাঁধা র'ব নিত্য-আলিঙ্গনে,
নিবে যাক্ রাধিকার নয়নের আলো,
রাধার মরণ হোক্ তোমার জীবনে।

ঘুচে' যাক্ চিরতরে এ ভ্রান্তি-বিলাস,
মুক্ত হও, পূর্ণ হও, তৃপ্ত হও স্বামি!
আমি-প্রেম তুমি-প্রাণ—বারি ও পিয়াস
একপাত্রে রহে যেন, দ্বন্দ্ব যাক্ থামি'।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

# ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ

হুগলি বর্দ্ধিষ্ণু জেলা, অনেক মহাপুরুষের জন্মভূমি। মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায় এই জেলার লোক। এই জেলা হইতেই সর্ব্বপ্রথমে সংবাদপত্রের সৃষ্টি—এবং বাঙ্গলা অক্ষর মুদ্রাযন্ত্রে সজ্জিত হয়—প্রথমে এই জেলা হইতেই মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই জেলার এক বৈদ্য পরিবারে বাঙ্গলায় প্রচলিত একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ-প্রণেতার জন্ম। এতদ্ব্যতীত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ন্যায় পণ্ডিত, রসিক রায়ের ন্যায় কবি, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় চিন্তাশীল ব্যক্তি এই জেলায় জন্মলাভ করিয়া-নিভৃত সাধনায় যে ফল লাভ করিয়াছেন, সমস্ত বাঙ্গলা দেশ তাহাতে উপকৃত। সে কথা আজ বলিতে বসি নাই। এই প্রবন্ধে আজ দেখাইতে চাই যে, এই সকল বিশেষত্ব ব্যতীত এই জেলার আরও এমন একটি বিশেষত্ব আছে, যাহা অনন্যসাধারণ। তাহা কি ? সেই কথাটিই বলিতেছি।

আমরা সকলেই জানি যে, বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলাদেশকে যে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, তাহা ইংরাজরাজত্বের ফল। সুতরাং হুগলি জেলা বলিয়া কোন প্রাচীন বিভাগ পূর্ব্বে দেখিয়া পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব যে যে স্থান লইয়া হুগলি জেলা গঠিত তাহা পূর্ব্বে অন্য নামে পরিচিত ছিল, একথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। ভারতের ইতিহাস কিম্বদন্তী এবং পৌরাণিক গল্পমূলক। ইহার প্রাচীন ইতিহাস জানিবার অন্য উপায় নাই। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রাদি হইতে অতি সংক্ষেপে ইহার প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ মনে করেন, বঙ্গদেশ বহু দিবস অনার্য্যদেশ ছিল। এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণও দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ঐতেরেয় আরণ্যকে (২।১।১) সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে মনে হয়, তখনও উহা অনার্য্য নিবাস ছিল। ঐতেরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্র নামক বঙ্গের একটি বিভাগকে দস্যূনান্ ভূয়িষ্ঠাঃ বলা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, আর্য্যগণ বঙ্গবাসীকে তখন হয় নিকৃষ্টতর জীব বলিয়া ঘৃণার চক্ষে, না হয় ভিন্ন-সভ্যতামূলক বিদেশীয় ভাবাপন্ন জনপদ রূপে কল্পনা করিয়া আপনাদিগকে বঙ্গদেশ হইতে দূরে রাখিতে চাহিতেন। কারণ বোধায়নের ধর্ম্ম-সূত্রে স্পষ্টই লিখিত আছে, বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র প্রভৃতি দেশে বেড়াইতে আসিলে পুনস্তম বা সর্ব্বপৃষ্ঠা ইষ্টি করিতে হয়। মনু-সংহিতাতেও ঠিক এই ভাবের কথা দেখিতে পাওয়া যায়—অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধেষু চ তীর্থযাত্রা বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি।

পরে—কোন্ সূত্রে বলিতে পারিনা—এই অনার্য্য-নিবাস আর্য্য-নিবাসে পরিণত হইয়াছিল। সে সকল দেশে পদার্পণ করিলেই আর্য্যশুচি বিকারগ্রস্ত হইত, তাহাদিগের

মধ্যে একটি জনপদ আবার মহাভারতীয় যুগে "যজ্ঞীয় গিরিশোভিত" এবং "দ্বিজশোভিত" পুণ্যস্থান রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক F. E. Pergiter বলেন, রাজ্যবিস্তার ও আর্য্যসভ্যতার প্রসারের জন্য আর্য্যগণ বঙ্গদেশে পদার্পণ করেন। আবার বিশ্বকোষ-প্রণেতা বলেন বাঙ্গলার বনভূমি নিভৃত সাধনার উপযোগী দেখিয়া আর্য্যগণ বঙ্গদেশে পদার্পণ করেন। কোন্ মত সত্য, তাহার বিচার-ভার সুধীগণের উপর দিয়া আমি বলিতে চাই যে, যতদূর শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, রামায়নী যুগে বঙ্গদেশে আর্য্যসভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল এবং সেই সময়েই বঙ্গদেশ পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল এবং তাহাদিগের মধ্যে একটি বিভাগে আমাদিগের বর্ত্তমান হুগলি জেলা অবস্থিত। কারণ আমরা মহাভারত হইতে জানিতে পারি যে, ক্ষত্রিয়রাজ বলি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া, তিনি তাঁহার পত্নীকে দীর্ঘতমা ঋষির নিকট প্রেরণ করেন এবং ঐ রাণীর গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, ও সুহ্ম নামে পাঁচ পুত্রের জন্ম হয় এবং তাঁহারা স্ব স্ব নামে আপনাদিগের শাসিত জনপদের নামকরণ করিয়া বহুকাল বঙ্গদেশ শাসন করেন। এই অঙ্গবংশীয় নৃপতিগণের ৬ষ্ঠ পুরুষ দশরথ রোমপাদ রামচন্দ্রের পিতা দশরথের সমসাময়িক। সুতরাং এই ঘটনা "ত্রেতা" (?) যুগে ঘটিয়াছিল বলিতে হইবে। ইহার মধ্যে যেখানে ভাগিরথী উত্তর-বাহিনী হইয়াছে সেইখান হইতে হাবড়া জেলা পর্য্যন্ত অঙ্গদেশ। শক্তি-সঙ্গমতন্ত্রে যে সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, মোটামুটি ভাবে তাহাও এইরূপ। এতদ্ব্যতীত মিনহাজের তবকাৎ-ই-নাসিরি নামক আধুনিক গ্রন্থ পাঠ করিয়াও মনে হয়, বর্ত্তমান বীরভূম, বাঁকুড়া, সাঁওতাল পরগণা ও হুগলি জেলা লইয়া অঙ্গ গঠিত, কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে ইহাও আবার দেখা যায় যে, বঙ্গদেশে আর্য্য-নৃপতির শাসন কল্পনা করিলেও বঙ্গদেশে যে অনার্য্য প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা সন্দেহ করিবার কারণ নাই। উদাহরণ-স্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, আর্য্যগণ ভূয়ঃ ভূয়ঃ নিন্দা করিয়া আসিলেও এই দেশে আপনার স্বাতন্ত্র কখনই হারায় নাই। মৎস্য-পুরাণের মতে এই দেশে অন্তর্জাতি (Intermarriage) বিবাহ প্রভৃতি অনার্য্য প্রথা প্রচলিত ছিল। এই কারণেই কর্ণপর্ব্বে শল্য অঙ্গরাজের প্রতি ম্লেচ্ছ শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকিবেন। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে, বঙ্গদেশ আর্য্য-সংস্পর্শে আসিলেও আপনার স্বাতন্ত্র কখনও হারায় নাই। ইহাই অঙ্গ বা হুগলি জেলার সংক্ষিপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস। এবং ইহাই এই জেলার বিশেষ বিশেষত্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে তাবৎ সভ্য জনপদ আর্য্য-জনপদে পরিগণিত এবং আর্য্য সভ্যতায় মণ্ডিত, শুধু এই দেশে আর্য্যগণের আগমন কেবল যে পরবর্ত্তী যুগে ঘটিয়াছিল, তাহা নহে; কখনও আর্য্যসভ্যতা সম্যক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা, তাহা ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়। আবার এই অঙ্গদেশ আপনাকে বিশেষ ভাবে আর্য্য সভ্যতা হইতে এড়াইয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিলে প্রবন্ধ অকারণে দীর্ঘ হইয়া পড়িবে বলিয়া নিরত হইলাম।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, ইহাই যদি হুগলি জেলাবাসীর প্রাচীন ইতিহাস হয়, তাহা হইলে এই অনার্য্য দেশের আভিজাত্য কোথায়? ইহার উত্তর আমরা বহু প্রবন্ধে দিয়াছি এবং ইহার আলোচনার জন্য আমরা বার বার ঐতিহাসিকদিগকে আহ্বান করিয়াছি; কিন্তু দুঃখের বিষয় সে বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কেহই কর্ণপাত করেন নাই। এই ঐতিহাসিক সমস্যার সমাধান না হওয়ায়, আমরা এ ক্ষেত্রে তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে সাহসী হইলাম। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে, আর্য্য ও অনার্য্য নামক দুইটি জাতির সন্ধান পাওয়া যায়। স্কুলের ছাত্র হইতে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ-লেখক পর্য্যন্ত, অনার্য্য বলিতে সাঁওতাল কোল ভীল প্রভৃতি অতি অসভ্য জাতির পূর্ব্বপুরুষদিগকেই বুঝিয়া থাকেন। ইহারা পূর্ব্বের ন্যায় এখনও অর্দ্ধ-উলঙ্গ এবং বনে-জঙ্গলে বাস করে। ইহাই এখনকার ঐতিহাসিকদিগের মত। কিন্তু অনার্য্য জনপদের বর্ণনা এবং অনার্য্যজাতির যুদ্ধ-কৌশল প্রভৃতি পাঠ করিয়া একথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এইজন্য আমি সুবর্ণ দ্বীপের বর্ণনা আমার লিখিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিবার কালে বলিয়াছিলাম—"একদিকে বিলাসিতার উজ্জ্বল চিত্র, অপর দিকে সৌন্দর্য্যের বর্ণনার এমন অদ্ভুত সংমিশ্রণ কবির অমৃতময়ী লেখনী মুখে সম্ভব হইয়াছে যে, তাহা পাঠ করিতে করিতে মনে হয় কলিকাতা-নগরী দূরে থাক, লণ্ডন প্যারীও তাহার নিকট মলিন হইয়া পড়ে। মণি বিদ্রুম-বৈদূর্য্য-মুক্তা-বিরচিত তোরণ প্রাচীরাদির কথা ছাড়িয়া দিয়া দুর্গাদির বিষয় পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, লঙ্কা অনার্য্য প্রদেশ হইতে পারে; কিন্তু তাহা Canibal প্রদেশ হইতে পারে না।" বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিবার কালে ঠিক এই সন্দেহে মন আবার আকুল হইয়া উঠে। কারণ মহাভারতে যেমন আর্য্য ও অনার্য্য নামক দুইটি জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ সনাতন ও শাশ্বত ধর্ম্ম নামক দুইটি ধর্ম্মের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে আমরা দুই-একটি কথা পরে বলিতেছি। এক্ষণে এই দুইটি প্রচলিত ধর্ম্মের মধ্যে সনাতন ধর্ম্ম আর্য্যগণাশ্রিত এবং তাহা বেদবিহিত কর্ম্ম-কাণ্ডমূলক, আর এই শাশ্বত ধর্ম্ম উপনিষদের ধর্ম্ম, তাহা অনার্য্যদিগের মধ্যে প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের অভ্যুত্থান-কামী। কর্ণপর্ব্বে পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেবকে শাশ্বত ধর্ম্মাবলম্বী বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ সে সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশেই এই ধর্ম্ম শুধু যে প্রচলিত ছিল, তাহা নহে, অধিকন্তু ইহা রাজ-ধর্ম্ম (State religion) ছিল। কারণ পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব বাঙ্গলায় রাজচক্রবর্ত্তীরূপে রাজত্ব করিতেন। তিনি আর্য্য নৃপতিদিগের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং আর্য্য নৃপতিগণের আদর্শস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ তাঁহার এতই প্রবল ছিল যে, কৃষ্ণ-নিন্দা তাঁহার জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যরূপে পরিগণিত হইত। শৌর্য্য ও বীর্য্যে তিনি কোন আর্য্য নৃপতি অপেক্ষা হীন ছিলেন না। দ্বারকা আক্রমণ কালে তাঁহার অপূর্ব্ব বীরত্ব দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে কেমন করিয়া

বলিব, অনার্য্যগণ বর্ব্বর ধর্ম্মহীন অসভ্য জাতি? অনার্য্য গ্রন্থ বলিতে কোন-কিছু আছে বলিয়া ঐতিহাসিকগণ স্বীকার না করিলেও, আর্য্য-গ্রন্থের যেখানে অনার্য্যদিগের সহিত আর্য্য-সংঘর্ষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে অনার্য্য-প্রথা ভিন্নপথাবলম্বিনী বলিয়া তাহার নিন্দা আর্য্যগণ যথেষ্ট করিলেও অনার্য্যগণ যে তাঁহাদের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী, এ কথা তাঁহারা আভাসে স্বীকার করিয়াছেন। এইজন্যই আমার মনে হয়, আর্য্য-সভ্যতার সহিত অনার্য্য সভ্যতার অনৈক্য থাকায় আর্য্যগণ তাহার নিন্দা করিতেন, কিন্তু আমরা অনার্য্যগণকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকি, আর্য্যগণ তাঁহাদিগকে সে চক্ষে দেখিতেন কিনা সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ আছে। কারণ বহু অনার্য্য-নৃপতি ব্রাহ্মণবংশীয়; এইজন্য মনে হয় বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে যেরূপ ভারতীয় ও য়ুরোপীয় এই দুই সভ্যতা বিদ্যমান থাকিয়া উভয় জাতির মিলনপথে অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছে এবং যেমন একজাতি অপর জাতিকে আচার-গত পার্থক্যহেতু হীনচক্ষে দেখিয়া থাকে এবং যেমন উভয় সভ্যতার মূল প্রকৃতি ভিন্নরূপ, প্রাচীন ভারতেও সেইরূপ দুই সভ্যতা পাশা-পাশি বর্ত্তমান থাকায় উভয় সভ্যতাগত পার্থক্যহেতু উভয় সভ্যতাবলম্বী ব্যক্তিগণের মধ্যে নানা সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়া, ভারতীয় ইতিহাসের ধারাকে বিভিন্নপথে পরিচালিত করিয়া ভারত-ইতিহাসকে নানা ঘটনার সমাবেশে অভিনব করিয়া তুলিয়াছে। এই দুই সভ্যতার মূল-প্রকৃতি সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে পারা যায়, আর্য্য-সভ্যতা ধর্ম্মের উপর, নৈতিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং অনার্য্য সভ্যতা হয়ত অর্থবলদীপ্ত অহঙ্কারের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রক্ত চক্ষুর কঠোর দৃষ্টিতে জগৎকে শাসন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল।

এই স্থানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। ভারতে যে সময়ে কর্ম্মকাণ্ডের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার জন্য নানা স্থানে যজ্ঞবেদী নির্ম্মিত হইয়া সনাতন বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল, সেই সময়ে ব্রহ্মবিদ্যা নামে পরিচিত উপনিষদ-বর্ণিত তত্ত্বজ্ঞান বা শাশ্বত-ধর্ম্ম ভারতের রাজন্যগণ কর্ত্তৃক ধীরে ধীরে উদ্ভাবিত, প্রচারিত ও পরিশোধিত হইতেছিল। এই অভিনব ধর্ম্ম,—ওঁকার মন্ত্র ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে লাভ করেন। ইহারই ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব হয় এবং তাহাতেই আবার ব্রাহ্মণ্য প্রভাব খণ্ডিত ও রাজন্য-প্রভাব স্থাপিত হয়। এই উচ্চতত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ায় যেমন জনকের ন্যায় সংসারত্যাগী বিরাট চরিত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, সম্ভবতঃ সাধারণ লোকে তাহার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারায় ধর্ম্মস্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। উদাহরণ-স্বরূপ বলিতে পারা যায়, খৃষ্টান-ধর্ম্মের উচ্চতা এইরূপেই সাধারণ খ্রীষ্টানের মনের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে না পারায় য়ুরোপ মুখে খ্রীষ্টান হইলেও কার্য্যে খ্রীষ্টান নয়। ঠিক এই ভাবেই অনার্য্য ধর্ম্ম সাধারণের মনের উপর প্রভুত্ব লাভ করিতে পারে নাই, এবং সেইজন্য তাহা উপনিষদীয় ধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধধর্ম্মে এবং বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে তান্ত্রিকতায় পর্য্যবসিত হইয়া নানা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে এবং অবশেষে লোপ পাইয়াছে। আজ

যে সেই ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ সমাজের নিম্ন স্তরে পড়িয়া রহিয়াছে, এ অবস্থা তাহাদিগের স্বেচ্ছাকৃত নহে, ইহার জন্য আর্য্য-সমাজ বিশেষভাবে দায়ী। আর্য্যগণ অসীম চেষ্টার পরে তাহাদের সভ্যতা গ্রাস করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগকে স্নেহময় পিতার ন্যায়, আপনার ক্রোড়ে টানিয়া না লইয়া বাহিরের কার্য্যে সহস্র বৎসর ধরিয়া নিযুক্ত রাখিয়াছেন। সুতরাং বাহিরের রৌদ্র-কিরণে ও ঝঞ্ঝাপাতে শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় আজ তাহারা ঘৃণা ও করুণার পাত্র হইতে পারে, কিন্তু চিরদিন তাহাদের এ অবস্থা ছিল না। সুতরাং আজ আমরা বঙ্গদেশ অনার্য্য-নিবাস শুনিয়া যেরূপভাবে নাসিকা কুঞ্চিত করি, আর্য্যগণ ঠিক সেইভাবে বঙ্গদেশকে দেখিতেন কিনা, তাহা বিচারের বিষয়।

এই সব দিক বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে পারা যায় যে, বঙ্গদেশে যদিও কখন আর্য্য-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে হয় তাহা স্থান-বিশেষে সীমাবদ্ধ, না হয় তাহা সাময়িক—না-হয় আর্য্য-নৃপতিগণ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে দীর্ঘকালবাস-হেতু অনার্য্য-আচার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহার পক্ষপাতী ছিলেন! কারণ মহাভারতে যেমন বঙ্গদেশে আর্য্যসভতা বিস্তারের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ আবার বঙ্গ নৃপতিগণের প্রতি পুনঃ পুনঃ ম্লেচ্ছ-শব্দ প্রয়োগ দেখা যায়। যদি মহাভারতের ঐতিহাসিকতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে উক্ত তিনটি মতের মধ্যে কোন-একটি মত গ্রহণ না করিলে কখন এই সমস্তার সমাধান করা যায় না। এই জনপদে আর্য্য প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সন্দিহান হইতে হয়। সে কথা পরে বলা হইতেছে। সুতরাং এখানে আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম যে, বঙ্গদেশে আর্য্যশাসন কখন প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গদেশ সেই অতীত যুগে কখন অনার্য্য প্রথা পরিহার করে নাই।

আমাদের হুগলী জেলা এইরূপ অনার্য্য-নিবাস ছিল। ইহাই এ জেলার বিশেষত্ব। এ জেলা কোনদিন আর্য্য-সভ্যতার উৎকট সংস্পর্শে আসে নাই, আপনার স্বাতন্ত্র রক্ষা করিয়া চিরদিন চলিয়াছে। ইহাই ইহার গর্ব্ব। যদি ভারতে কোনদিন অনার্য্য-সভ্যতার ইতিহাস লিখিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এই জেলার ইতিহাস প্রধান স্থান অধিকার করিবে, ইহাই ইহার উপযোগিতা। ইহার ঐতিহাসিক উপকরণের সামগ্রী এখনকার নিম্নশ্রেণীর জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে! যদি ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিহাস লিখিতে হয়, তাহা হইলেও বাঙ্গলাদেশ অতি উচ্চস্থান অধিকার করিবে এবং হুগলী জেলাও পশ্চাৎপদ হইবেন না। কারণ জৈন তীর্থঙ্করদিগের মধ্যে একজন এই বর্দ্ধমান বিভাগের লোক। যে তন্ত্র বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পত্তি, তাহার প্রধান আড্ডা ছিল গৌড়ে এবং হুগলী জেলা একসময়ে সেই গৌড়ের একাংশ ছিল। একসময়ে চৈতন্যের মধুর প্রেমে বাঙ্গলা দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল, এবং সেই জেলাবাসী রূপ-সনাতন ও উদ্ধারণ প্রভৃতি মহাত্মাদের চেষ্টায় তাহা কিরূপ বিস্তার ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহা বৈষ্ণব

হইবে। এইজন্যই প্রথমে বলিয়াছি, এ জেলার আভিজাত্য নিতান্ত কম নহে। এক্ষণে ইহার সম্বন্ধে আর দুই-চারিটি কথার আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করা যাউক।

ধর্ম্মগত ও জাতিগত এবং আচারগত প্রভেদ বশতঃ একজাতি অপর জাতিকে চিরকালই বিদ্বেষের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছে এবং চির দিনই দেখিবে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতি এক জল-হাওয়ায় পুষ্ট, একই দেশে সহস্র বৎসর পাশাপাশি অবস্থান করিয়াছে। জগতের সভ্যতার ইতিহাস উভয় জাতির নিকটই তুল্যরূপে ঋণী। সভ্যতায়, অতীত ইতিহাস-গৌরবে এবং বীরত্বে একজাতি অপরের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু তথাপি উভয়ে উভয়ের প্রতি ম্লেচ্ছ, কাফের প্রভৃতি চোখা চোখা আভিধানিক বিদ্বেষ-জ্ঞাপক ভাষা প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। সুতরাং তখনকার সময়ে অনার্য্য শব্দের দ্বারা যদি আর্য্যগণ বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসী তথাকথিত অনার্য্যজাতির প্রতি বিদ্বেষ দেখাইয়া থাকেন, তবে আজ স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্ট আত্মবিস্মৃত ও দারুণ দুর্দ্দশা গ্রস্ত জাতিকে উলঙ্গ, অসভ্য বনবাসী জাতির বংশধর বলিয়া গায়ের জোরে প্রতিপন্ন করিলে ইতিহাসের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা হইবেনা।

কোন জাতিরই বর্ত্তমান অবস্থা তাহার অতীত অবস্থার পরিচায়ক নহে। সুতরাং আজ এই জাতির অধঃপতন লক্ষ্য করিয়া, তাহাদিগকে চিরদিন এইরূপ অবস্থাপন্ন মনে করা সঙ্গত হইবে না। এইখানে বলিয়া রাখি এই মত যাঁহারা শুধু মুরুব্বি-যাঁহারা শুধু গায়ের জোরে ইহার বিরুদ্ধে আপনাদিগের মত চালাইতে চান, আমি দূর হইতে সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া, যাঁহারা ঐতিহাসিক প্রমাণের পক্ষপাতী, এবং সত্য ইতিহাস রচনা ও প্রকাশ করিতে চান, শুধু তাঁহাদিগের প্রণিধানের জন্যই এতগুলি কথা বলিলাম।

ভারতের অন্য স্থানের ইতিহাসের সহিত হুগলী জেলার আর একটী বিশেষত্ব আছে। তাহা এই। ভারতের অন্য স্থানের ইতিহাস উচ্চশ্রেণীর জাতির ইতিহাস। হুগলী জেলার ইতিহাস নিম্নজাতির ইতিহাস। আজ আমরা যাহাদিগকে নবশাক বা নিম্ন জাতির লোক বলিয়া ঘৃণা করি, যদি তাহাদের বিষয় আলোচনা করিতে পশ্চাদপদ হই, তাহা হইলে ইতিহাসের অধিকাংশ ভাগই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। যাঁহারা রিজ্‌লী সাহেবের গ্রন্থপাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন, ভারতের আদিম অধিবাসী তাহারাই। আবার এই জাতির মধ্যে অনেক জাতি বহুশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলা শাসন করিয়াছে এবং বাঙ্গলার ভাগ্য-বিধাতা ছিল। খ্রীষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে বঙ্গদেশে সমতট ও ডবাক রাজ্য গঠিত হইবার পর, যে সময়ে সমুদ্রগুপ্তের আত্মীয়গণ বাঙ্গলার রাজা এবং বৈদিক-মিশ্রিত পৌরাণিক ধর্ম্ম-প্রচারে ব্রতী, সে সময়েও অঙ্গ তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ শাসনাধীন ছিল কিনা, সন্দেহের বিষয়। ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই অঙ্গরাজ্য রাঢ় বা রাঢ় নামে পরিচিত হইতে আরম্ভ করে। রাঢ় শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া

বিশ্বাস ইহা খাঁটি অনার্য্য শব্দ। বঙ্গদেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে এইরূপ অনেক দেশীয় শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। তাহারা অধিকাংশ স্থলেই জাতিবাচক। আমাদের বিশ্বাস রাট শব্দের অর্থ পাথুরিয়া জমি। এইরূপ প্রাকৃতিক অবস্থা নিরূপক শব্দের দ্বারা বহুস্থান বাঙ্গলায় পরিচিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বীরভূম শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার অর্থ জঙ্গলা ভূমি। সে যাহা হউক, এই রাঢ়দেশে বহু নিম্নজাতি রাজত্ব করিয়াছে—বর্দ্ধমান-বিভাগে ইছাই ঘোষ এবং বাঁকুড়ার রাজ-বংশ তাহার উদাহরণ। আমরা এইবার সেই প্রাচীন ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাভারতীয় যুগে অঙ্গ একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। তারকেশ্বর প্রভৃতি জনপদের নিকট দিয়া কৌশকী নামে নদী বোধ হয় সে সময়ে একটি বিশিষ্ট স্রোতস্বতী রূপে পরিচিত ছিল। কারণ এই নদীটির নাম মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডবগণ এই নদী দিয়া গঙ্গাসাগরে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ এই নদীর নামানুসারে কৌশীকি কাচ্ছ জনপদ বা বর্ত্তমান হুগলি জেলার নামকরণ হইয়াছিল। ইহার পর বৌদ্ধযুগের আবির্ভাব। এই সময় হইতেই প্রকৃত ভারত-ইতিহাসের সৃষ্টি। যাহা এতদিন আনুমানিক ছিল, এখন হইতে তাহা প্রমাণিত ইতিহাস রূপে গণ্য হইতে আরম্ভ হয়। এই পৌরাণিক যুগের শেষ ভাগে এবং বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে আমরা অঙ্গ দেশকে অশোকের রাজ্যভুক্ত হইতে দেখিতে ভারত আক্রমণ করেন, বৈদেশিক বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, সে সময়ে "গঙ্গরাইড়" বা গঙ্গানদীর উপকূলবর্ত্তি জনপদ-বাসী নামক একটি প্রবল জাতি বঙ্গদেশে বাস করিত; এই গঙ্গারাড় জাতি অঙ্গরাজ্য-বাসী কিনা তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। বহু পণ্ডিত মনে করেন, যে গঙ্গারাইড় গঙ্গারাঢ় শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। শব্দতত্ত্বের আলোচনায় সময় নষ্ট করিলে প্রবন্ধের আয়তন আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে পারে; সুতরাং সে বিষয়ে বিরত হওয়াই উচিত। তবে এই গঙ্গারাইড় রাজ্যের সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিতেছি। ম্যাকক্রিণ্ডেলের মেগাস্থিনাস্ গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে গঙ্গারাইড় রাজ্যের সহিত কলিঙ্গ-রাজ্য যুক্ত ছিল। ইহা অন্ধ্র রাজ্যের ন্যায় স্বাধীন এবং গঙ্গানদী ইহার পূর্ব্ব-সীমা ছিল। হুগলি জেলার পূর্ব্ব-সীমায় ভাগিরথী শান্তিপুরের নিকট আসিয়া হুগলী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। যদি এই ধারাকে গঙ্গা নদীর প্রধান ধারা বলিয়া ধরিবার পক্ষে কোন ঐতিহাসিক বাধা না থাকে, তাহা হইলে হুগলী জেলা যে এই গঙ্গারাইড় রাজ্যের একাংশ ছিল, এরূপ কল্পনা করিবার সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। এইজন্যই বোধ হয় ওমেলী সাহেব সপ্তগ্রামকে গঙ্গারাইড় জাতির কেন্দ্র বলিয়া আভাসে স্বীকার করিয়াছেন।

অশোকের অনুশাসনে রাঢ়, বঙ্গ বা গৌড়ের কোন উল্লেখ না থাকায়, বাঙ্গলার ইতিহাস-লেখক শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেন যে, সে সময়ে মগধরাজ্যের

অশোকের দ্বিতীয়সংখ্যক অনুশাসনে তাম্রলিপ্তের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই তাম্রলিপ্তকে অনেকে বর্ত্তমান তমলুক বলিয়া মনে করেন। এই শব্দটির অর্থ আলোচনা করিয়া শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন, "তমলুকের সংস্কৃত নাম তাম্রলিপ্ত। তাম্রলিপ্ত শব্দের অর্থ তামায় লেপা। কিন্তু তমলুকের নিকট কোথাও তামার খনি নাই। তমলুক হইতে যে তাম্র রপ্তানি হইত, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বহু সংস্কৃত গ্রন্থে উহার নাম দাম লিপ্তা। এক্ষণে কোন কোন পণ্ডিত প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, এই তাম্রলিপ্ত বা দাম্রলিপ্তা ও বাঙ্গলার তমলুক একার্থবোধক স্থান নহে। ইহা দামল বা দ্রাবিড় জাতির বাসভূমি বা মাদ্রাজ বিভাগের অন্তর্গত এক-নামধেয় একটি স্থান। এই মতের বিরুদ্ধে এবং তাম্রলিপ্ত যে বর্ত্তমান তমলুক ব্যতীত অন্যস্থান হইতে পারে না, তাহার প্রতিপাদক ঐতিহাসিক যুক্তি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিবার পক্ষে উদ্যোগী হওয়া প্রত্যেক শিক্ষিত হুগলী জেলাবাসীর কর্ত্তব্য। কারণ তাম্রলিপ্ত বাঙ্গলা হইতে বাহির হইয়া যাইলে, বাঙ্গলার অনেক গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে। এই তাম্রলিপ্ত একটি প্রধান বন্দর ছিল।

সে যাহা হউক, রাখালবাবুর এই যুক্তি অনুমোদনীয় হইলেও, ইহার সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে চাই, আমরা এই প্রকার এই বিংশ শতাব্দীতেও বসিয়া দেখিতেছি যে, নিখুঁত বিবরণ সংগ্রহ করা কত কষ্টকর। Statistical portionএর কথা না তুলিলেও চলে। গবর্মেণ্ট এই কার্য্যের জন্য উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া ও অজস্র অর্থব্যয় করিয়াও ডিস্‌ট্রিক্ট গেজেটিয়ার গুলিকে নির্ভুল করিতে পারিতেছেন না, আর সেই সুদূর অতীতে কত শত কারণে একটি রাজ্যের নাম এড়াইয়া যাইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তথাপি আমাদিগের সাপক্ষে কোন ঐতিহাসিক কারণ বলবৎ না থাকায় আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম যে, মৌর্য্য রাজত্বের অভ্যুদয় কালে ইতিহাস-বর্ণিত প্রবল গঙ্গারাইড় রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত বা লোপ পাইয়াছিল, এবং বাঙ্গলাদেশ স্বাধীনতা হারাইয়া অন্য রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় হইতে ভারতে অন্ধ যুগ বা dark Age আরম্ভ। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে বাঙ্গলাদেশের ইতিহাসের ক্ষীণ ধারাটি আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া নামক পাহাড় হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টিয় তৃতীয় শতাব্দীতে চন্দ্রবর্ম্মা নামক এক ব্যক্তি সপ্তসিন্ধুর মুখ ও বাহ্লীক দেশ হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের উপর রাজত্ব করিতেন। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী-মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে, শুশুনিয়া শিলালিপির চন্দ্রবর্ম্মা ও দিল্লির স্তম্ভলিপির চন্দ্র এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। স্মিথের ন্যায় প্রত্নতাত্ত্বিকগণও এই মত গ্রহণ করিতেছেন।

হয়ত বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত বঙ্গদেশ এক রাজার অধীনে আসিয়াছিল। এই চন্দ্রবর্ম্মার হস্ত হইতে সমুদ্রগুপ্ত সমস্ত বাঙ্গলা জয় করেন। কারণ এলাহাবাদের দুর্গমধ্যে অশোকের শিলাস্তম্ভে সমুদ্রগুপ্তের যে প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে (Fleet's Indica. Vol. III. p. 7), তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে,সমুদ্রগুপ্ত এই চন্দ্রবর্ম্মা রাজাকে যুদ্ধে বিনষ্ট করেন। এই সময়ে স্মিথ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের মতে বঙ্গদেশ গুপ্ত-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়। "সমুদ্রগুপ্তের পিতার নাম ঘটোৎকচ গুপ্ত ও তাঁহার পিতামহের নাম শ্রী গুপ্ত। ইঁহারা বোধ হয় সামান্য ভূস্বামী ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবী রাজদুহিতাকে বিবাহ করিয়া স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।...সমুদ্রগুপ্ত খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর মধ্য ভাগে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য রাজগণের উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্মা, গণপতি নাগ, নাগসেন, অচ্যুত, নন্দী, বসবর্ম্মা, প্রভৃতি আর্য্যরাজগণের রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন।" (বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম খণ্ড ৪৬ পৃঃ) এই প্রবল নরপতির অধীনে যে বাঙ্গলার অধিকাংশ স্থান শাসিত হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। অঙ্গরাজ্য তাঁহার অধীন ছিল। এবং হুগলী জেলার অন্তর্গত মহানদ বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে কোন বিশিষ্ট রাজকীয় নগর স্থাপিত ছিল। কারণ গুপ্তবংশীয় নরপতিগণের খোদিত সুবর্ণমুদ্রার অনেকগুলি এই হুগলী জেলা এবং

গিয়াছে। অবশ্য ইহার অন্য কারণও থাকিতে পারে। কিন্তু মহানদ একটি প্রসিদ্ধ নগর ছিল। এখানকার বিখ্যাত বিহার হইতে গম্ভীর শঙ্খনাদ হইত বলিয়া, ইহার নাম মহান নাদ বা মহানাদ। এই-সব কারণে মহানদের সম্বন্ধে এইরূপ মত পোষণ করা নিতান্ত অযুক্তিকর নয়। কিন্তু এস্থলে এ-সকল অবান্তর বিষয়ের আলোচনা না করাই সঙ্গত। হুগলী জেলার নানা স্থান হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল উল্লেখযোগ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

(১) ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জাহানাবাদ মহকুমার অধীন মাধবপুর গ্রামে ধনুর্ব্বাণ হস্তে রাজমূর্ত্তিবিশিষ্ট সমুদ্রগুপ্তের পাঁচটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের বিবরণ Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1883—84, p. 122 and p. 18এ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

(২) ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে একপৃষ্ঠে ধনুর্ব্বাণ হস্তে রাজমূর্ত্তি ও অপর পৃষ্ঠে লক্ষ্মীমূর্ত্তিবিশিষ্ট সমুদ্রের পুত্র কুমারগুপ্তের তিনটি মুদ্রা মাধবপুর-গ্রাম হইতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার বিবরণ Journal of the Asiatic Society of Bengal 1884—p. 152এ দেওয়া হইয়াছে।

(৩) মহানদে উক্ত মূর্ত্তিবিশিষ্ট এই জাতীয় একটি সুবর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাহা এক্ষণে কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ইহার বিবরণ Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal,

(৪) অশ্বারূঢ় রাজমূর্ত্তি ও পদ্মাসনা লক্ষ্মী মূর্ত্তিবিশিষ্ট কুমারগুপ্তের দুইটি মুদ্রা মাধবপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের বিবরণ Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1884, p.15এ বর্ণিত হইয়াছে।

(৫) একদিকে রাজার মৃগয়ার চিত্র এবং অপর দিকে সিংহবাহিনী দেবীমূর্ত্তিবিশিষ্ট কুমারগুপ্তের একটি মুদ্রা মাধবপুর গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। ইহার বিবরণ Journal of the Royal Asiatic Society 1893, p 121এ দেখিতে পাওয়া যায়।

(৬) একদিকে হস্তিপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি ও অপরদিকে সিংহবাহিনী মূর্ত্তি-অঙ্কিত কুমার-গুপ্তের একটী মুদ্রা মহানদ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ইহার বিবরণ Proceedings of the Asiatic Socity of Bengal, 1882, p. 91 and 104এ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

(৭) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মহানদ হইতে কুমার গুপ্তের পরবর্ত্তী নৃপতি স্কন্দগুপ্তের একটি স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার বিবরণ Procceedings of the Asiatic Society of Bengal 1882, p. 91এ দেওয়া হইয়াছে।

(৮) মহানদ হইতে আবিষ্কৃত একটি মুদ্রা দুই বৎসর পূর্ব্বে জেলাবাসী একটি ভদ্র লোকের নিকট দেখিয়াছিলাম। ইহা সম্ভবতঃ স্কন্দগুপ্তের। এক্ষণে তিনি ইহা হস্তান্তর করিয়া ফেলিয়াছেন।

ইহা ব্যতীত সপ্তগ্রাম হইতেও কয়েকটি কোন্ স্থানে পাঠ করিয়াছি, এক্ষণে স্মরণ করিতে পারিতেছি না। ১৭৮৩ খৃঃঅব্দে কালীঘাটে গুপ্তবংশীয় নৃপতিগণের বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কালীঘাটে আবিষ্কৃত ৩য় চন্দ্রগুপ্তের তিনটী ও বিষ্ণুগুপ্তের পঞ্চদশটি এবং ২য় চন্দ্রগুপ্তের একটি মুদ্রা এক্ষণে লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় গুপ্তের বহু স্বর্ণ-মুদ্রা কালীঘাট হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল প্রমাণের সাহায্যে অনায়াসে বলা যাইতে পারে, হুগলী জেলা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের (তমলুক, এখান হইতে গুপ্তবংশীয় নৃপতি-দের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে) উপর শুধু যে গুপ্তবংশীয় নৃপতিদের প্রাধান্য প্রতিষ্টিত হইয়া-ছিল তাহা নহে, এই ভূভাগের মধ্যে কোন্ স্থানে তাঁহাদের প্রধান আড্ডা ছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করা, হুগলীর ইতিহাস-সঙ্কলনকামী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

ইহার পর আমরা শশাঙ্ক নামক বাঙ্গলার আর একজন প্রবল নরপতির সন্ধান নাই। এই শশাঙ্কের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার ঐতিহাসিক উপকরণ এখনও সংগৃহীত হয় নাই। বাণভট্ট ইঁহাকে গৌড়ের রাজা এবং চৈন পরিব্রাজক ইঁহাকে কর্ণ-সুবর্ণের অধিপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে অনেকে অনুমান করেন মগধ, রাঢ় এবং গৌড় তাঁহার অধিকারে ছিল। রাখাল বাবু প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দ্র গুপ্ত। ইঁহার রাজত্বের শেষভাগে বঙ্গদেশ বা রাঢ়দেশ

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী Ancient Geography of Bengal শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, এই সময়ে রাঢ় জনপদ দুইভাগে বিভক্ত ছিল এবং দক্ষিণ রাঢ়ে এই হুগলী জেলাভিধেয় জনপদ অবস্থিত ছিল। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পর বঙ্গদেশ পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে। ইহা আমরা দশকুমার-চরিত নামক কাব্য হইতে জানিতে পারি।

যে সময়ে রাজেন্দ্রচোল দেব বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন, সে সময়েও দক্ষিণ রাঢ় স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে বোদাগঙ্গার অভিযানের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে স্থানপ্রাপ্ত জাহানাবাদের অন্তর্গত মন্দারণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান উক্ত নরপতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। সে সময়ে বাঙ্গলায় সেন-বংশ রাজত্ব করিত, এবং পবনদূত নামক পুস্তক হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই অধিকার সাময়িক মাত্র; কারণ ইহা পুনরায় শীঘ্রই সেনরাজগণের হস্তগত হয়।

এইখানেই রাঢ়ের ইতিহাস শেষ (বাঙ্গলার ইতিহাস) করিলাম। গুপ্তবংশের পতনের পর বাঙ্গলার ইতিহাস নানা মতভেদে পূর্ণ। তাহার সমালোচনা ও সমাধান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবে এইখানে একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করি। এক সময়ে বঙ্গে ঘোর অরাজকতা ঘটিয়াছিল। এই সময়ে বঙ্গে, কোন প্রবল রাজা না থাকায়, বাঙ্গলা দেশ বৈদেশিক আক্রমণে বিপর্য্যস্ত, পেষিত ও দীর্ণ হইয়া একজন রাজা নির্ব্বাচন করিয়াছিল। কিন্তু এই নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতির সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহারাই ভূঁইয়া বা জমিদারের সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। ইহার পর পাল-রাজারা বঙ্গে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের কীর্ত্তি দক্ষিণ রাঢ়ে অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, হুগলী জেলা প্রভৃতি স্থানে তাঁহারা নামে রাজা থাকিলেও, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীগণই এই জনপদ বাৎসরিক কর দিয়া বা স্বাধীনভাবে শাসন করিতেন। সুতরাং তথায় তাঁহাদিগের শাসন কখনই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

---

# মায়া-বাসর

ফুল দিয়ে সে ভুলিয়ে দিল চুল-বাঁধা,
সেদিন উতল ফাল্গুনী বৈকাল;
মন-সেতারে ভালবাসার সুর-সাধা,

রঙ্গমহল খুল্‌ল অকস্মাৎ,
ঘোম্‌টা দিতে ভুল্‌ল দুটি হাত,
দখিন হাওয়ায় বুকের মাঝে জাগ্‌লে বসন্ত,
চিনিয়ে দিল পাগ্‌লা ফাগুন অচেনা পন্থ।

হইল সুরু লুকানো ফুল-ফোটা,
বিলায় হাসি পলাশ-অশোক-ডাল ;
মিলন-লগন আলোয় ভরে' তমাল-বনে চাঁদ-ওঠা,
সন্ধ্যামণি ফুলের মতন লাল।

এই-আমি আর নই গো আমার সেই-আমি,
মালা-গাঁথায় আন্‌মনে যায় দিন-যামী ;
সে যে আমার একলা-অধিকার,
পরশে তার রসে তরুণ বাসি ফুলের হার।

সেই নিল মোর পরাণ-ঝরা বরণ-অঞ্জলি,
মান-অভিমান-সোহাগ তরঙ্গ ;
উঠ্‌ল পথে বঁধুর নবীন রঙীন্ দীপ জ্বলি',—
ফুলের তূণীর হারায় অনঙ্গ।

মালঞ্চ মোর তারি আলোয়-ঘেরা,
তারে ছেড়ে যায় কি ঘরে ফেরা ?
চোখে-চোখে-চাওয়ার একি সুখ,
নেহারিলাম চিরদিনের সুধায়-ধোয়া মুখ।

পিচ্‌কারিতে ঝর্‌ল রঙের মেলা,
গানের ঢেউয়ে বিহান-হোরি-খেলা ;
সেইত রাজা আমার চির-যৌবনের,
বাঞ্ছিত সেই বন্ধু আমার নন্দনের,
অন্তরঙ্গ-মন্ত্রগুরু মোর
পরিয়ে দিল মুক্তাফলের যুক্ত-করা ডোর।
কণ্ঠ তাহার বীণার মত শুনি,

সেই ছাড়া আর কেউ তো আপন নয়,
সেই আনন্দ, সেইখানে মোর জয়,
সেই জাগরণ, ধ্যানের স্বপন, সেই ভালো,
চিরযুগের পূর্ণিমা সে, পূর্ণশশীর সেই আলো।
দুলিয়ে দিল ঝুলন-রাতের মিলন দোলা ফুল-দোলে,
( আছে ) চির-গোপন স্বপনময়ী রাসেশ্বরী তার কোলে।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্ম্ম

জৈন ধর্ম্মকে উত্তর ভারতে বিকাশ পাইতে যে প্রবল বাধা সহ্য করিতে হইয়াছিল, যে তুমুল আন্দোলনের ভিতর এই নবধর্ম্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস অনেকের একরূপ জানা আছে, কিন্তু এই ধর্ম্মের দক্ষিণ-ভারত-বিজয়কাহিনী জানিবার মত উপাদান ঐতিহাসিকের ভাণ্ডারে যে বড় বেশীদিন আসিয়া সঞ্চিত হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্ম্মের বিস্তার-প্রসঙ্গ বলিতে গেলে আলেকজেণ্ডার কানিংহামের কথা মনে পড়ে। তিনি দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রসার দেখিয়া এবং আশেপাশে জৈন রাজ্য দেখিয়া প্রথমত ভাবিয়াছিলেন যে, এই দুই ধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য বড় অল্পই আছে, নহিলে সমসাময়িক এই দুইটী ধর্ম্ম নির্ব্বিবাদে পাশাপাশি কেমন করিয়া বিস্তার লাভ করিতে পারে? তাই তিনি অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, এই দুইধর্ম্ম একেরই দুইভাবে বিকাশ, দুইটী শাখার মত, তাই একের প্রতিপত্তিতে অন্যের প্রসার অতি সহজেই হইয়া পড়ে। ডাঃ হেমিণ্টন এবং মেজর ডেলমেন্ আরও অধিকদূর অগ্রসর হইয়া কহিলেন, জৈন দেবতা গৌতম ও বৌদ্ধ দেবতা গৌতম একই ব্যক্তি এবং দুইটী ধর্ম্ম একেরই দুই আকারে বিকাশমাত্র। এই প্রসঙ্গে হিউএনসাঙ্গের কথা আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই পরিব্রাজক জৈন মন্দির দেখিয়া যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাও উপরিউক্ত মতের পোষকতা করে। কিন্তু এইখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, হিউএনসাঙ্গ বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি যে জৈনধর্ম্মের অনুকরণশীলতা সম্পর্কে রঙ চড়াইয়া বর্ণনা করিবেন ইহা ত অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই ধর্ম্মের বিশ্লেষণ-ব্যাপার এইক্ষণে থামাইয়া শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন মনে করি যে, বৌদ্ধধর্ম্ম এবং জৈন ধর্ম্ম একানুরূপ না হউক, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যে সমবিদ্বেষী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারেনা। সেইজন্য যখন বৌদ্ধ প্রচারকগণ দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বত-প্রাচীর পার হইয়া দ্রাবিড় ও হিন্দুরাজ্যে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের

গৈরিক পতাকা রোপণ করিয়া দিল, তখন হিন্দু-বিদ্বেষী অপরধর্ম্ম—অর্থাৎ জৈন ধর্ম্মের প্রচারকগণের পক্ষেও যে সে দেশে ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা জানি বৌদ্ধধর্ম্মের বিকাশ হেতু সম্রাট অশোক সমগ্র মৌর্য্য সাম্রাজ্যের বিপুল শক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এরূপ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা জৈনদের ভাগ্যে কখনো ঘটিয়া উঠে নাই। ধর্ম্ম-প্রচারের সেই প্রাচীন যুগে জৈনধর্ম্ম যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছিল, এরূপ অনুমান করা সহজ হইয়া উঠে।

সুপণ্ডিত সুব্রাহ্মণ্য আয়ার তাঁহার ঐতিহাসিক সন্দর্ভে দেখাইয়াছেন যে, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বুদ্ধের মহানির্ব্বাণের দিনেই দক্ষিণভারতের প্রান্তদেশে এবং লঙ্কাদ্বীপে শাক্যবংশীয় বিজয় সিংহের সহিত নীত হইয়াছিল। সিংহল-বিজয়ের দিন হইতেই সেই সমস্ত দেশে বৌদ্ধ যুগ আরম্ভ হইল, মহাবংশে এই কথাটা অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা কিন্তু এখানে জৈনধর্ম্মের প্রসার সম্বন্ধে মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত হইতে আলোচনা করিব। ভদ্রবাহু নামক জৈন পণ্ডিতের প্রভাব সম্রাটের উপর এত অধিক হইয়াছিল যে, চন্দ্রগুপ্ত শেষ-জীবনে তাঁহার নির্দ্দেশমত মহীশূর-রাজ্যের অন্তর্গত শ্রবণ নামক স্থানে বাস করিয়াছিলেন। এই জৈন অধ্যাপক সম্রাটের সহিত অধিক দিন বাস করেন নাই, কিছুদিন পরেই তিনি 'পুন্নদিন' রাজ্যে চলিয়া যান এবং সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। চন্দ্র-গুপ্তের এই দাক্ষিণাত্যে স্থিতি, জনশ্রুতি হইলেও, অশোকের সিদ্ধপুর পর্ব্বতগাত্রে খোদিত লিপি এই জনপ্রবাদকে বিশ্বাসে পরিণত করিতেছে,—মৌর্য্যসাম্রাজ্য যে দাক্ষিণাত্যের ঐ অংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহার সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে জৈনঅধ্যাপক সিংহ-নন্দী মহীশূর-রাজ্যের অপরাংশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সূর্য্যবংশীয় রাজপুত্র মাধব জৈন-প্রভুর ভক্তরূপে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া, কালক্রমে কুলাল নামক রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাঞ্চী নগরের পল্লববংশীয় রাজকুলে কেহ কেহ জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। চালুক্যদিগের পশ্চিমাংশের রাজগণের মধ্যে এবং রাষ্ট্রকুটকুলে জৈন ধর্ম্ম প্রসার লাভ করিয়াছিল। এইরূপে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যসমূহে জৈনধর্ম্ম মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল।

পশ্চিম চালুক্যদিগের কুলতিলক নৃপতিগণ পুলুকেশী, বিজয়াদিত্য এবং দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য জৈনধর্ম্মের জয়-পতাকা উড়াইয়াছিলেন, জৈনদিগকে ভূমিদান এবং জৈন ধর্ম্মালয় স্থাপন ইঁহারা পরম কর্ত্তব্যের মধ্যে ধরিতেন। এই জৈন-পোষকতার কাহিনী চালুক্যদিগের আবিষ্কৃত অনুশাসন হইতে সম্যকরূপে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রকুটরাজ অমোঘবর্ণ জৈনাচার্য্য জিনসেনের শিষ্য ছিলেন এবং পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্ম্মণ উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহে জৈনধর্ম্ম কিরূপে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার আভাস এখানে আমরা পাইলাম।

জৈনধর্ম্মের বিস্তারের জন্য জৈন গুরুগণ যে শুধুই বৌদ্ধদের পাশাপাশি পথ কাটিয়া চলিয়াছিলেন, তাহা নহে।

পরন্তু জৈনাচার্য্য-মণ্ডলী কিরূপে বৌদ্ধ সঙ্ঘ ও বৌদ্ধকাণ্ডারীগণকে বাগ্‌যুদ্ধে আহ্বান করিয়া জয়লাভ করিতেন, তাহাও ভাবিবার বিষয়। জৈনদের একটা বিশেষ লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল, যেমন করিয়াই হউক বুদ্ধ-পন্থী-দিগকে বাক্য-সমরে পরাস্ত করিয়া, বৌদ্ধ ধর্ম্মপতাকা দেশীয় রাজ্য-স্তম্ভ হইতে খসাইতে হইবে এবং সেইস্থলে জৈন জয়পতাকা উড়াইয়া দিতে হইবে। এই প্রকার চেষ্টার অন্তরালে দক্ষিণভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের সহসা অন্তর্ধানের কারণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইউরোপের ধর্ম্মের ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলিলে দেখা যায়, লুথারের নবগঠিত খ্রীষ্টধর্ম্ম কেমন ভাবে কেথলিক্ ও প্রটেষ্টাণ্ট এই দুই দলের সৃষ্টি করিয়া পরস্পরের মনোমালিন্যের সহিত কালক্রমে দুই দলকেই রণাঙ্গনে টানিয়া আনিল। এই দুইদল প্রথম বাক্য-তরঙ্গে, অবশেষে সমর-তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়া পড়িল এবং সেই ভীষণ যুদ্ধের রক্তস্রোত ত্রিশ বৎসরের আগে আর বন্ধ হয় নাই! বৌদ্ধ-জৈন-আন্দোলনে কথার ফাঁকে ফাঁকে অসি চকমক করিয়া উঠে নাই, শুধু বাক্যের তীক্ষ্ণতায় একে অন্যকে আসন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। এমনি ভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অনেকটা পিছাইয়া পড়িল। বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতর হইতে ক্রমেই তেজ ও শক্তির হ্রাস হইয়া পড়িতেছিল, আনন্দ, সারিপুত্র প্রভৃতি পুণ্য-শ্লোক মহাত্মাদের প্রভাব না থাকায় এবং এইরূপ শক্তিশালী পুরুষ খৃষ্টীয় সপ্তম, অষ্টম, ও নবম শতাব্দীর মধ্যেও জন্মগ্রহণ না করায় বৌদ্ধধর্ম্ম কাণ্ডারীবিহীন হইয়া পড়িল। হইয়া উঠিতে লাগিল। জৈনধর্ম্মের তরফ হইতে যে জৈন-বাহিনী বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছিল, তন্মধ্যে সামন্তভদ্র, অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ, মাণিক্যানন্দ, প্রভাচন্দ্র ও গণভদ্র প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এইখানে একটী কথা বলা প্রয়োজন যে, তামিল সাহিত্য প্রমুখাৎ এই অতীতের ইতিহাস অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসে। এই তামিল সাহিত্যের দ্বারাই আমরা জৈন ধর্ম্মের পরাজয়-প্রসঙ্গ বুঝিয়া উঠিতে পারি।

এইবার জৈনধর্ম্মের সমাপ্তির ইতিহাস আলোচনা করিব। জৈনধর্ম্মের ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ-অবস্থা প্রায় একরূপ। ধর্ম্মের ক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে যাইয়া জৈনাচার্য্যের লক্ষ্য হইয়াছিল, শুধুই লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি; কিন্তু কেমন করিয়া ধর্ম্মের প্রভা মানব-নয়নের সম্মুখে সমধিক সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিবে তাহার চেষ্টা মাত্রও হয় নাই—শুধু কথার চটকে মন ভুলাইতে যাইয়া ধর্ম্মের ভিত্তি শিথিল করিয়া দিতে হইল! তাহার পর আর এক কথা এই যে, নানাশ্রেণীর লোকের সমাগম হওয়ায় ধর্ম্মের প্রণালী শ্লথ হইয়া পড়িল এবং ধর্ম্মের প্রাণ যে এই আচার-অনাচারের মিশ্রণে একরূপ ডুবিয়া গেল, তাহার খোঁজ তখনো কেহ রাখে নাই।

তামিল-সাহিত্য পাঠে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে এক হিন্দু ধর্ম্ম-সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিল এবং নবতেজে অনুপ্রাণিত হিন্দু আচার্য্যগণ জৈনদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। জৈন-ধর্ম্ম কোথায় কোন্‌খানে

বিচার আরম্ভ হইল এবং সেই তর্কফলে জৈনদিগের হার হইতে লাগিল। এই হিন্দু-ধর্ম্মের প্রচারক-দলের মধ্যে সম্বন্ধ অন্যতম, ইঁহার প্রবল তর্কের ফলে জৈনধর্ম্মাবলম্বী পাণ্ড্য-নৃপতি হিন্দুধর্ম্মে পুনরায় দীক্ষিত হইলেন। এই ঘটনায় এক জৈনস্তম্ভ খসিয়া পড়িল, এবং ধর্ম্মের ভিত্তি শিথিল হইয়া গেল, কিন্তু হিন্দু-প্রচারকেরা ঐখানেই ক্ষান্ত ছিলেন না, তাঁহার নব নব রাজ্য-বিজয়ের জন্যও নানা অভিযান পাঠাইতে লাগিলেন। অপর একজন হিন্দু-আচার্য্য জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী নরসিংহ বর্ম্মনকে শৈব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এই নরসিংহ বর্ম্মন পল্লববংশীয় এবং বাতাপীর অধিপতি ছিলেন। কিছুদিন পরে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হইল। তাঁহার বক্তৃতার মুখে জৈন নেতাগণ আর টিকিতে পারিলেন না, তারপর কুমারিল ভট্টও তাঁহার অকাট্য যুক্তি দ্বারা জৈনধর্ম্মের অধিকার লুপ্তপ্রায় করিয়া ফেলিলেন।

যখন তামিল প্রদেশে চোল রাজ্য হিন্দুপতাকা উড়াইল, তখন সমগ্র তামিল দেশে আর জৈন-চিহ্ন রহিল না। ধীরে ধীরে দাক্ষিণাত্যে জৈন ধর্ম্ম বিলোপ পাইতে লাগিল—হিন্দুদের মধ্যে আবার চারণ দলের সৃষ্টি হইল। ইঁহাদের মুখ্য কার্য্য হইল, দেশে দেশে গান গাওয়া আর গানের ভিতর দিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রচার করা। এইরূপে দাক্ষিণাত্যে ধর্ম্মের তুমুল আন্দোলন জাগিয়া উঠিল—হিন্দুর লুপ্ত গৌরব আবার ফিরিয়া আসিল। অপ্পর, সম্বন্দ, এবং শঙ্করাচার্য্য দেশে দেশে মঠ স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন।

কেনারী দেশে জৈনধর্ম্ম কিছুকাল অবধি টিকিয়াছিল বটে, কিন্তু লিঙ্গায়ৎ অথবা বীর শৈব ধর্ম্মের দ্বাদশ শতাব্দীতে উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই এই ধর্ম্মের বাকী শক্তিটুকু লুপ্ত হইয়া গেল। মহীশূর দেশেও অবশেষে জৈনস্তম্ভ ধ্বসিয়া পড়িল, পশ্চিম চালুক্য নৃপতি জয়সিংহের প্রবল অনিচ্ছাও আর টিকিল না—অবশেষে তাঁহাকেও শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইল।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

# কাল-বৈশাখী

## এক

### ( পুরন্দরের কথা )

বৈকালে শ্রী যখন আমার সাম্‌নে জল-খাবারের থালা এনে ধর্‌লে, আমি বল্লুম, "ওগো শ্রী, বিনোদকে মনে পড়ে ?"

ভুরু কুঁচ্‌কে শ্রী বল্‌লে, "বিনোদ ? কে বিনোদ ?"

"তুমি হাসালে শ্রী,—বিনোদকে চেন না !"

"তোমার সব-তাতেই হাসি আসে ! বিনোদ আবার কে ?... ...কৈ, মনে পড়্‌চে না ত !"

"সে কি ! যার পরিত্যক্ত সিংহাসনে আজ আমি একছত্র সম্রাট হ'য়ে বসেছি,

তোমার হাতের বরমাল্য যার কণ্ঠ থেকে আমি একের নম্বরের দুরাত্মার মত কেড়ে নিয়েছি,—সেই—"

শ্রীর মুখের ভাব বদ্‌লে গেল। তাড়াতাড়ি বিরক্ত স্বরে সে বলে উঠ্‌ল, "ও, থামো থামো, অত আর ব্যাখ্যানা কর্‌তে হবে না—"

—"কেমন, এবার চিনেছ ত ?"

শ্রী মৃদুস্বরে বল্‌লে, "হুঁ।"

—"তবু ভালো! কবিরা বলেন, পুরনো প্রেম ভোলা যায় না। কিন্তু তুমি দেখছি কবিদের বচনকে অসার বলে প্রমাণ কর্‌তে চাও!"

চোখ রাঙিয়ে শ্রী বল্‌লে, "দ্যাখো, ঠাট্টারও একটা সীমা আছে!"

—"কিন্তু প্রিয়তমে, সে সীমা আমি ত এখনো লঙ্ঘন করি-নি!"—এই বলে আমি জলখাবারের থালার দিকে হাত বাড়ালুম।

শ্রী কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তারপর আস্তে-আস্তে বল্‌লে, "তা কি বল্‌ছিলে, বলনা, থাম্‌লে কেন ?"

—"তোমার ভয়ে।"

—"আমার ভয়ে! এমন কপাল কি আমার হবে গো।"

—"বটে! তাহ'লে তুমি এই চাও যে, আমি তোমাকে ভয় করি ?"

—"সকই স্ত্রীই চায়।"

—"সকল স্ত্রীই চায় যে স্বামীরা ভালো না বেসে, খালি ভয়ে ভয়ে স্ত্রীর কাছে হাত-যোড় করে বসে থাকুক্ ?"

—"না,—তা কেন ? তোমরা আমাদের খানিক আদর কর্‌বে, খানিক সম্ভ্রম কর্‌বে।"

—"অর্থাৎ, সোজা কথায়—খানিক বুকে কর্‌ব, খানিক মাথায় কর্‌ব; খানিক হাস্‌ব, খানিক কাঁদব ? এই হ'ল গিয়ে আদর্শ স্বামীর লক্ষণ—কেমন ?"

শ্রী হেসে বল্‌লে, "তুমি আবার হয়কে নয় কর্‌ছ—অতটা কর্‌তে কি আমি বল্‌ছি গা!"

—"যতটা বলেছ, তার কারণটা কি শুন্‌তে পাই না ?"

—"কারণ আছে অনেক। এই যেমন, ধর, তুমি যদি আমাকে একটুও মেনে চল্‌তে, তাহ'লে আমি যাতে কষ্ট পাই তেমন কাজ কখনো কর্‌তে না।"

—"তুমি যাতে কষ্ট পাও, এমন কি কাজ আমি করেছি শুনি ? আমি ত জানি স্ত্রী-ভক্ত স্বামী বলে বাজারে আমার অত্যন্ত দুর্নাম।"

শ্রী হাত নেড়ে বল্‌লে, "ভাগ্যে তোমার মুখখানি ছিল, তাই এ যাত্রা তুমি তরে' গেলে গো! তুমি আবার স্ত্রী-ভক্ত—পোড়াকপাল!"

আমি মুখে গাম্ভীর্য্যের বোঝা নামিয়ে বল্‌লুম, "প্রমাণ কর, যে আমি স্ত্রীভক্ত নই!"

—"অত প্রমাণ-ট্রমান আমি জানি না। এই যে রোজ সন্ধ্যেবেলায় তুমি ও-বাড়ীর ঐ ধাড়ী ছুঁড়িগুলোর সঙ্গে বসে গান গাও, গল্প-গুজব কর, এটা কি স্ত্রী-ভক্তের লক্ষণ ?"

বুঝ্‌লুম, শ্রীর কোন্‌খানে ব্যথা! শ্রীর এই সন্দেহ, এই ঈর্ষা আজ এতদিনেও আমি কোনমতে দূর কর্‌তে পার্‌লুম না। তার বিশ্বাস, আমাকে লুকে নেবার জন্যে যত

পেতে বসে আছে! এই সন্দেহের জন্যে মাঝেমাঝে আমাকে কি মুস্কিলেই পড়্‌তে হয়!

জল খেয়ে তোয়ালে দিয়ে হাত-মুখ মুছতে মুছতে আমি বল্‌লুম, "কিন্তু শ্রী, তুমি একটা মস্ত ভুল কর্‌ছ। তুমি কি ভাবো যে, তোমার এই একান্ত-অনুগত স্ত্রী-ভক্ত স্বামীটিকে বিদ্রোহী কর্‌বার চেষ্টা ছাড়া ও-বাড়ীর মেয়েগুলির হাতে আর কোন কাজ নেই?"

শ্রী বল্‌লে, "জানি গো জানি, তোমার এই কার্ত্তিকের মত চেহারা দেখে সব মেয়েই মন হারিয়ে বসে থাকে!"

নিজের চেহারা সম্বন্ধে এত-বড় সার্টিফিকেট পেয়ে আমি হো-হো করে' হেসে উঠ্‌লুম। তার পর শ্রীর একখানি হাত ধরে বল্‌লুম, "আচ্ছা, স্বীকার কর্‌লুম সব মেয়েই আমাকে দেখে ভুলে যায়। কিন্তু শুধু এক পক্ষ ভুল্‌লেই ত চল্‌বে না,—তারা ভুল্‌লেও এ পক্ষ ভুল্‌বে কেন?"

শ্রী চোখ ঘুরিয়ে বল্‌লে, "আগুনের কাছে থাক্‌লে ঘী একদিন-না-একদিন গল্‌বেই-গল্‌বে!"

—"মেনে নিচ্ছি। কিন্তু তুমি এ-কথা কেন ভুলে যাচ্ছ যে, তোমার ঐ রূপের আগুনে ঘী অনেকদিন আগেই গলে গেছে। গলানো ঘীকে আর কেউ ত গলাতে আস্‌বে না শ্রী!"

শ্রী এবারে রাগ করে বল্‌লে, "দ্যাখ, তোমার সঙ্গে একটা কথা কয়েও যদি সুখ আছে! হচ্ছিল এক কথা, এল ধান ভান্‌তে শিবের গীত। যে কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, তার আর কোন জবাব নেই।"

—"ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, বড্ড ভুলে গেছি বটে—তুমি বিনোদের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছ ত?"

—"হ্যাঁ।"

—"এতদিন পরে বিনোদের আবার দেখা পেয়েছি। আমাদের পাশের বাড়ীখানা সে ভাড়া নিয়েছে।"

—"তোমার সঙ্গে সে কথা কইলে?"

—"তা কইলে বৈকি! সে নিজেই আমাদের বাড়ীতে এসেছিল—হাজার হোক্ সে আমার ছেলেবেলার সাথী ত! আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল বলে সে ভারি দুঃখিত হয়েছে।"

—"এতদিনে তার বিয়ে-থা হয়ে গেছে ত!"

—"তা হয়েছে বৈকি!"

—"শ্বশুরের গলা কেটে এবার ক'টি হাজার টাকা আদায় করেছে?"

—"ও সব কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার আমার সময় হয়-নি—ইচ্ছেও ছিল না। তা বেশ, তোমার সঙ্গে ত তার আলাপ করিয়ে দেব, তুমিই না-হয় তার কাছ থেকে যা জান্‌বার জেনে নিও।"

মাথা নেড়ে শ্রী বল্‌লে, "না না না,—ও-সব আলাপ-টালাপ আমার সঙ্গে হবে না।"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্লুম, "সেকি, সে যে আমার বাল্যবন্ধু!"

—"তোমার বাল্যবন্ধুকে তুমি মাথায় করে নাচো—তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

—"তা হয় না শ্রী! বিনোদ যে আজকেই আমার সঙ্গে তার স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছে! বল্লে, তার সদরে-অন্দরে আমার অবারিত দ্বার।"

—"এরি-মধ্যে তার স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ করে আসা হয়েছে বুঝি? বেশ, শুনে সুখী হলুম! কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার ঐ বিনোদের কিছুতেই দ্যাখা হবে না—ও-সব সায়েবী-আনা আমার ভালো লাগে না।" এই বলে শ্রী রাগে গর্‌গর্ কর্‌তে-কর্‌তে আমার কাছ থেকে চলে গেল।

তা, শ্রীর রাগের কারণও আছে। বিনোদের হাতে একদিন তাদের কম লাঞ্ছনা ভোগ কর্‌তে হয়-নি ত!

একটা সিগারেট ধরিয়ে, ইজি-চেয়ারে হ্যালান দিয়ে শুয়ে, সেই পুরাণো দিনের কথা ভাবতে লাগলুম।

আমি আর বিনোদ তখন এম-এ পাশ দিয়েছি। বিনোদ মেডিক্যাল কলেজে ঢুকেছে,—সেইসঙ্গে আমারও ডাক্তারী পড়্‌বার কথা ছিল; কিন্তু হঠাৎ বাবার মৃত্যু হওয়াতে আমার আর ডাক্তারী পড়া হ'ল না। বাবা অনেক বিষয়-সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন—আমাকে তারই তত্ত্বাবধানে লেগে থাক্‌তে হ'ল।

বছর-খানেক পরেই শুন্‌লুম, বিনোদের বিবাহ। বিনোদ এসে আমাকে নেমন্তন্ন করে' গেল।

বিবাহের দিন বরযাত্রী হয়ে গেলুম। কম্বুলেটোলায় একটা অন্ধকার-ঘুট্‌ঘুটে, সাপের দেহের মত পাক-খাওয়া, সরু গলির ভিতরে কনের বাড়ী। বাড়ীখানা পুরাণো, ছোট, ভাঙাচোরা, হেলে-পড়া; তার চুণ-বালি খসে ক্ষয়া-ক্ষয়া ইটগুলো পচা মড়ার দেহের ভিতর থেকে হাড়ের মত বেরিয়ে পড়েছে;—নীচের ঘুঁটে দেওয়া। বাড়ীর মালিক বিনোদের হবু-শ্বশুরের চেহারাখানিও ঠিক বাড়ীর সঙ্গে ছন্দ-তাল-মাত্রা বজায় রাখতে পেরেছে। শুন্‌লুম বয়স তাঁর বছর-পঞ্চাশ—কিন্তু দ্যাখাছে ঠিক আশীবছরের জরাজীর্ণ ভেঙে-পড়া বুড়োর মতন। মাথার চুল তুলোর মত সাদা, মাথাটি বুকের পরে নুয়ে পড়েছে, দেহের উপরদিক্‌টা বাজারের ভাগা-দেওয়া কুম্‌ড়োর ফালির মত বেঁকে গেছে—চল্‌তে-ফির্‌তে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছেন। এমন-একটা শুভকার্য্যেও তাঁর মুখে হাসির আভাসটি পর্য্যন্ত নেই—চোখ-দুটিও ভাবহীন, দু-দুটো পাথরের চোখের মত! ভদ্রলোক নব্বই টাকা মাহিনার একটি চাকরি করেন; এই বয়সে একে একে পাঁচটি মেয়ে পার করেছেন—এটি হচ্ছে ষষ্ঠ এবং এর কোলে নাকি সপ্তমও আছে। কিন্তু সপ্তম কন্যাটির বিবাহ হবার আগেই এই বাড়ীখানি যে পড়ে যাবে এবং সেইসঙ্গে এই সাত-মেয়ের একমাত্র বাপটিও যে মানব-লীলা সংবরণ কর্‌বেন, সে-বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না।

এম-এ পাস করে' বিনোদ যে বিয়ের হাটে দুর্লভ পণ্যদ্রব্যে পরিণত হয় নি, যথার্থ মানুষের মত এমন-এক গরীব হতভাগাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করতে অগ্রসর হয়েছে, এজন্যে মনে-মনে তাকে অনেক ধন্যবাদ দিলুম।

ঘনঘন শঙ্খধ্বনির মধ্যে কন্যাকে যখন সভাস্থ করা হ'ল, তখন কিন্তু একেবারেই অবাক হয়ে গেলুম! ভেবেছিলুম, কন্যাটিও হবে বাড়ীর এবং বাড়ীর মালিকেরই উপযুক্ত,

সোনার-চাঁদের আলো! মেয়েটির যেমন রং, তেম্‌নি গড়ন, তেম্‌নি মুখ! বিনোদ তাহলে এ বিবাহ করে' বড় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না!

ছাই ঘেঁটে কোহিনুর আবিষ্কার করেছে বলে বিনোদকে আমরা মনে-মনে বাহবা দিচ্ছি, এমনসময় হঠাৎ একটা অত্যন্ত বেসুরো রকমের গোলমাল উঠল।

ফিরে দেখি, সভার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিনোদের পিতা যৎপরোনাস্তি আস্ফালন এবং চীৎকার করে' বল্‌ছেন, "এ হবে না—কিছুতেই হবে না—যা দেবার কথা, আজকেই আমার কড়ায় গণ্ডায় পাওয়া চাই।"

কন্যার পিতা গলবস্ত্রে যোড়হাত করে' মিনতির স্বরে তাঁকে বল্‌লেন, "আর সাতটা দিন দয়া করে' সবুর করুন মশাই, বাকি টাকা আমি যেখান থেকে পারি জোগাড় করে এনে দেব।"

বিনোদের বাপ গলা উঁচু পর্দায় চড়িয়ে বলে উঠলেন, "ও-সব জোচ্চুরি আমার সঙ্গে চল্‌বে না—আগে টাকা, তারপর সম্প্রদান।"

ব্যাপারটা শুন্‌লুম এই। কথা ছিল, কন্যার পিতা এই বিবাহে বরের বাপকে নগদ দু-হাজার টাকা আর পঞ্চাশভরি সোনা দেবেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা ও দেশের বাড়ী-ঘর-দোর বিক্রী করেও তিনি এখনো ত্রিশভরি সোনা ও একহাজার টাকার বেশী আর-কিছু সংগ্রহ কর্‌তে পারেন-নি। তাই নিয়েই এই হাঙ্গামা বেধেছে।

বিনোদের পিতা সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে আর দেখতেও অম্‌নি পাঁচাপাচি, তাইতেই এত কমে এখানে আমি রাজি হয়েছি! নইলে বাজার যে-রকম চড়া, আমার এম-এ পাস-করা হীরের টুকরো ছেলে কি পড়তে পেত—দশটি হাজারে রাজার ঘরে বিকিয়ে যেত!"

কনের বাপ করুণ স্বরে বল্‌লেন, "মশাই, আপনার সব কথাই আমি মেনে নিচ্ছি! কিন্তু এত দয়া যখন করলেন, তখন আজকের দিনটাতেও রেহাই দিয়ে আমার জাত-কুল-মান রক্ষা করুন! আমি আপনাকে ফাঁকি দেব না, আপনার পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় শোধ কর্‌ব!"

কিন্তু বিনোদের পিতা পাহাড়ের মতই অটল—আজকেই তাঁর-দেনা-পাওনা সব চুকিয়ে দেওয়া চাই-ই-চাই! হয় এস্পার—নয় ওস্পার!

কনের বাপ অবশেষে আর-কোন উপায় না দেখে মাটিতে পড়ে বিনোদের পিতার দুই পা জড়িয়ে ধরলেন।

কিন্তু যে বাঙালী-পিতা পুত্রের জন্মদান করে, পরলোকে আপনার স্বর্গের ব্যবস্থা এবং ইহলোক অর্থের সংস্থান করে নেন, তাঁর মন কিছুতেই নরম হবার নয়,—উচ্চকণ্ঠে তিনি হাঁক্‌লেন, "বিনোদ, বাড়ী চল!"

অনুগত পুত্র তখনি সভা থেকে উঠে পিতার পাশে এসে দাঁড়াল।

অন্তঃপুরের ভিতর থেকে মেয়েদের তীক্ষ্ণ-স্বরে কান্না, কন্যাপক্ষের সকাতর অনুনয়-বিনয় এবং বরপক্ষের অবিরাম তর্জ্জন-গর্জ্জন—এই-সব বিচিত্র অনৈক্যতানে হিন্দুসমাজের

কন্যার দিকে তাকিয়ে দেখি, সে-বেচারী এই শুভবিবাহের সূচনা দেখেই চেলির কাপড়ের ঘেরাটোপের মধ্যে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে।

আমি আস্তে আস্তে বিনোদের সাম্‌নে গিয়ে বল্লুম, "বিনোদ, তুমি এখন কি কর্‌তে চাও?"

বিনোদ সহজ স্বরেই বল্‌লে, "কি আর কর্‌ব, বাড়ী যাব!"

কন্যার ভূলুণ্ঠিত দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে' আমি বল্লুম, "আর ও-বেচারীর দশা কি হবে?"

সেদিকে একবার তাকিয়ে, কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বিনোদ বল্লে, "আমি কি জানি?"

—"লেখাপড়া শিখেও এমন কথা বল্‌তে লজ্জা হ'ল না তোমার?"

বিনোদ তীব্র পরিহাসের বল্লে, "লজ্জা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম—আমি পুরুষ।"

—"কিন্তু তোমার বিবাহে বরযাত্রী হয়ে এসেছি বলে আমার লজ্জা কর্‌ছে।"

—"তাহলে আমার বদলে তুমিই বর হয়ে তোমার লজ্জা নিবারণ কর।"

—"হ্যাঁ, আমি তাইই কর্‌তে চাই।"

ফিরে দেখি, কন্যার পিতা অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্ত্তা শুনছেন। তাঁর পাথুরে চোখদুটি আর নড়ছে না—তারা যেন স্তম্ভিত হয়ে আছে!

আমি তাঁকে বল্লুম, "আপনার যদি অমত না হয়, তাহ'লে আপনার মেয়েকে আমি বিবাহ কর্‌ব।"

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তিনি বললেন, "আপনি, —আপনি—"

আমি হেসে বল্লুম, "ভয় নেই, আমি আপনাদেরই জাতি—গোত্রেও আট্‌কাবে না।"

—"কিন্তু—"

—"এর-মধ্যে একটুও 'কিন্তু' নেই। আমি এম-এ পাস, আমার বাড়ী কল্‌কাতায়, আমার আয় মাসে দু-হাজার টাকারও বেশী। কেমন বিনোদ, আমি মিছেকথা বল্‌ছি কি?"

বিনোদ হতভম্ব হয়ে আমার দিকে ফ্যাল্‌ফেলে চোখে তাকিয়ে রইল।

কনের বাপ একহাতে চোখের জল মুছতে মুছতে, আর-একহাতে আমার একখানা হাত ধরে বল্‌লেন, "বাবা, তোমার মন খুব উঁচু, কিন্তু এ বিবাহে তোমার মত হ'লেও তোমার বাপ-মায়ের—"

বাধা দিয়ে আমি বল্লুম, "তাঁরা পরলোকে।"

—"আমাকে কি দিতে হবে বাবা?"

—"কিছু না। যে টাকা আর গয়না জোগাড় করেছেন, সে-সব আপনার ছোট মেয়ের বিবাহের জন্যে রেখে দিন।......আর অন্দর-মহল থেকে কান্নার আওয়াজ ক্রমেই যেন বেড়ে উঠ্‌ছে—আগে ওটা বন্ধ কর্‌তে বলুন, বিয়ের সময়ে কান্না-টান্না আমার একেবারেই সহ্য হয় না।"

আনন্দে পাগলের মত হয়ে আমার ভবিষ্য শ্বশুর-মশাই চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওগো কান্না থামাও গো, কান্না থামাও, আমি সাক্ষাৎ দেবতাকে জামাই পেয়েছি!

সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতের গলা শোনা গেল, "লগ্নের আর দেরি নেই, বর কোথায়?"

কন্যাপক্ষের সকলে মিলে আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আনন্দধ্বনি করতে লাগল।

এর-মধ্যে বিনোদ আমার কাছে এসে বল্লে, "তুমি বন্ধু হয়ে আমাকে এই অপমানটা করতে চাও ?"

আমি হাসিমুখে বল্লুম, "বন্ধু, সামান্য টাকার লোভে তুমি যখন এমন পরমা সুন্দরী মেয়েকে ত্যাগ করলে, তখন একে গ্রহণ করাই হচ্ছে আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কার্য্য।"

বিনোদ খানিক ইতস্তত করে' শেষটা বল্লে, "আচ্ছা, বাকি টাকা আর গয়না যদি একসপ্তাহের মধ্যে পাই, তাহলে এ-বিবাহে আমি রাজি আছি। কি বলেন বাবা ?"

বিনোদের পিতা মুখ বিকৃত করে' বল্লেন, "কাজেই !"

কিন্তু মেয়ের বাপ মাথা নেড়ে বল্লেন, "সে আর হয় না। আপনারা আমাকে যে অপমান করেছেন তা আমি জীবনে ভুলব না। এর পরেও আপনাদের ঘরে আমি আর মেয়ে দিতে পারব না !"

* * * * *

শ্রীর সঙ্গে এমনি করে'ই আমার বিবাহ হয়।

বিবাহের পর পাঁচবছর কেটে গেছে, এই পাঁচ বছর আমি বিনোদের দেখা পাই-নি। সে যে আমার উপরে মর্ম্মান্তিক চটে গিয়েছিল, তাতে আর সন্দেহ নেই।

এতদিন পরে সেই বিনোদ আবার আমার কাছে ফিরে এসেছে। শুধু ফিরে-আসা নয়, এখন সে আমার প্রতিবেশী !

কিন্তু আমার উপর থেকে বিনোদের রাগ পড়ে গেলেও, বিনোদের উপরে শ্রী দেখছি এখনো দস্তুরমত চটে আছে ! তার এ রাগ কি আর সহজে পড়বে ?

## দুই

( বিনোদের কথা )

হুঁ, পুরন্দর ভেবেছে আমি সে অপমান ভুলে গেছি ! নির্ব্বোধ, অপমান আমি ভুলি না !

না, অপমান আমি ভুলি না—এ স্বভাব আমার চিরকালের। ছেলেবেলায় স্কুলে আমার এক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, বিনয়। তার জন্যে মাষ্টারদের কাছে প্রায়ই আমাকে মার খেতে হ'ত। তারপর কলেজে ঢুকে পর্য্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আর আমার অনেকদিন দেখা হয় নি। গেল-বছরে হঠাৎ সে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সে নাকি ভারি গরীব, তার এক ছেলের বড় অসুখ—আমি তার বাল্যবন্ধু, ডাক্তার হয়েছি, যদি দয়া করে তার ছেলেকে দেখি—এই ছিল তার অনুরোধ। কিন্তু তার সে অনুরোধে আমি কর্ণপাত করি-নি ; এর কারণ, তার টাকা খরচ করবার অক্ষমতা নয়—তার বাল্যকালের শত্রুতা আমি ভুলি-নি বলেই তার অনুরোধে আমি উপেক্ষাপ্রকাশ করেছিলুম।......তাকে ফিরিয়ে দিতে আমার একটুও কষ্ট হয় নি, বরং তার নিরাশ মুখ দেখে আনন্দে আমার মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল !

বিনয়ের অপরাধ ত পুরন্দরের তুলনায় কিছুই নয় বল্লেই হয় ! কিন্তু আমি বিনয়কেই যখন ক্ষমা করি-নি, তখন পুরন্দরকেও যে করব না, এ একেবারে ধরা কথা ! তা করলে অসঙ্গত হবে—মানুষের চরিত্রের মধ্যে অসঙ্গতি থাকলে তার পরকালের আশা একেবারে ঝর্ঝরে হয়ে যায়।

নীতিবাগীশ এখানে বল্‌বেন, অহিংসা পরম ধর্ম্ম, জীবে দয়াই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, নিষ্ঠুরতা মহাপাপ। কিন্তু নিষ্ঠুরতাকে যদি পাপ বল, তবে সে পাপে লিপ্ত না হ'লে পৌরাণিক ভীমার্জ্জুন থেকে সুরু করে' আধুনিক নেপোলিয়ন পর্য্যন্ত কেহই মহামানবে পরিণত হ'তে পার্‌তেন না। জগতের জীবন-সংগ্রামে ঢুকে, যারাই দয়া করেছে তারাই মরেছে, যেমন হরিশ্চন্দ্র। আবার দেখ, বামনকে দয়া করে' বলি এই ফললাভ কর্‌লেন যে, ক্ষুদ্র বামন উচ্চ হয়ে তাঁরই মাথার উপরে দিব্য দু পা দিয়ে দাঁড়ালেন। এখানে হার হ'ল দয়ালু বলির এবং জিৎ হ'ল নিষ্ঠুর বামনের এবং জগতে সেই সফল নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত চির-জাগ্রৎ রাখবার জন্যেই, আজও দস্তুরমত ঘটা করে' বামনের নিত্য পূজা হচ্ছে। হ্যাঁ, বামন হচ্ছেন চরম নিষ্ঠুরতার আদর্শ দেবতা!

আমিও নিষ্ঠুর হ'তে চাই। ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি পুঁথির বাঁধা গতে, বড় বড় বুলিতে আমি ভুল্‌তে চাই না, সে সবে ভুল্‌লে পুরন্দরকে শিক্ষা দেওয়া হবে না।

সেদিনকার সে অপমান আমার বুকের ভিতরে যে জলন্ত চিতা রচনা করেছে, যতদিন না এর উচিতমত প্রতিশোধ নি, ততদিন সে আগুনে শান্তিজল পড়বে না, পড়বে না! সেই বিবাহ-সভায় আমরা এমন কি অন্যায় করেছিলুম জানি না,—কিন্তু তাই নিয়ে চারিদিকে কতদিন ধরে কী ঘোঁট কী টিটকিরি,—এমন-কি আত্মীয়-কুটুম্বদের কাছে দিনকতক আমাদের মুখ-দেখানো পর্য্যন্ত বন্ধু-বান্ধবরা অনেকে আবার কথা না-কয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে যেত—যেন আমরা হাড়ী, কি মেথর! ওঃ, সে অপমান কি ভুল্‌তে পারি?

সুধু অপমান বলে নয়, পুরন্দর আমাকে বড় দাগাই দিয়েছে! শ্রী,—শ্রী! তার জন্যে আমি শ্রীকে হারিয়েছি!......এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়ে, যেদিন তাকে প্রথম দেখেছিলুম, সেদিন তার রূপের বিদ্যুতে চোখ আমার ঝল্‌সে গিয়েছিল! বাঙালীর ঘরে যে এমন জীবন্ত রূপের প্রতিমা থাকতে পারে, এ আমি কখনো কল্পনাও কর্‌তে পারি-নি।...... ছেলের একান্ত ইচ্ছা দেখে, বাবা বেশী প্রাপ্তির আশা ছেড়ে শ্রীর সঙ্গেই আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির কর্‌লেন—অর্থাৎ স্থির করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু হায় রে কপাল, যে দুর্ল্লভ রত্নকে আবিষ্কার কর্‌লুম আমি, তাকে লাভ কর্‌লে অপরে,—আমার ভাগ্যে খালি কাদা ঘেঁটে মরাই সার হ'ল।

বাস্তবিক, সভার মধ্যিখানে পাওনা নিয়ে অতটা গোলমাল করা আমাদের পক্ষে কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাও বলি, ব্যাপারটা যে অমন গুরুতর হয়ে উঠ্‌বে, এও আমরা ভাবি-নি! আমরা ত সত্যিই সভা ছেড়ে চলে আস্‌তুম না,—ভেবেছিলুম, একটু বেশী পীড়াপিড়ি কর্‌লে আর ভয় দেখালেই কনের বাপ টাকা বের কর্‌বার পথ পাবেন না। তখন যদি জানতুম যে, পুরন্দরও শ্রীকে দেখেই মন হারিয়ে বসে আছে, তাহলে বাবাকে কি আর সামান্য টাকার জন্যে অমন হ্যাঙ্গাম কর্‌তে

একসঙ্গে এত অপমান, এত দুঃখ মানুষ কখনো নীরবে হজম কর্তে পারে না! পুরন্দর আমার বাল্যবন্ধু—সত্যি-সত্যি তাকে আমি ভালোবাসতুমও! কিন্তু বন্ধু হয়েও সমাজে সে আমার মাথা হেঁট করে' দিয়েছে, শ্রীকে আমার উন্মুখ আলিঙ্গন থেকে কেড়ে নিয়েছে! আগে সে ছিল আমার অতি-বড় বন্ধু, এখন সে আমার অতি-বড় শত্রু! তাকে ক্ষমা করব না!

শ্রী গেছে—তার বদলে পেয়েছি আমি প্রভাকে। হ্যাঁ, প্রভা, প্রভা—যে প্রভা আমার শ্রী-হীন জীবনের শিখাকে আরো-বেশী নিষ্প্রভ করে' দিয়েছে! এবারকার উদ্বাহ-বন্ধনে উপকরণের কোনই ত্রুটি হয়-নি—নগদ পাঁচহাজার টাকা, গা-সাজানো গয়না, পুরুত, শালগ্রাম শিলা, মন্ত্র-পড়া—একেবারে সবদিকে নিখুঁত! কিন্তু আমি জানি, এ বিবাহ বিবাহই হ'ল না, বাবা সুধু এই সুযোগে তাঁর শূন্যগর্ভ ক্যাশবাক্স পূর্ণ-গর্ভ করে, চাবীটি সাবধানে তাঁর ট্যাঁকের মধ্যে গুঁজে রাখ্লেন মাত্র।

কিন্তু ট্যাঁকের চাবীটি ইহলোকেই ফেলে বাবাকে এখন পরলোকে প্রস্থান কর্তে হয়েছে।......বাবার সে অনেক যত্নের ক্যাশবাক্স আজও আমি খুলিনি! ও-টাকার উপরে আমার একটা দারুণ ঘৃণা আছে! ঐ টাকার দিকে বেশী লোভ থাকার দরুণই ত বাবা আজ আমার এই সর্ব্বনাশটা করেছেন! জমুক্, ও বাক্সের উপরে ধুলো জমুক্! বাবার যদি দরদ বেশী হয় ত পরলোক থেকে এসে ওর ধুলো ঝেড়ে ময়লা মুছে দিয়ে যান যান। ও বাক্স আমি স্পর্শ করব না।

প্রভা আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারে না। তার চোখ-মুখ দেখ্লে মনে হয়, আমাকে সে একটা গোলকধাঁধার মত ভাবে! এ গোলকধাঁধার মধ্যে তার ঢুক্বার শক্তি না থাক্লেও, এটুকু বুঝ্বার মত বুদ্ধি তার ছিল যে, আমি তাকে ভালোবাসি না!

একদিন সে মুখ ফুটে আমাকে বলেছিল, "দ্যাখ, বিয়ের আগে সখীদের মুখে স্বামীর কথা শুন্তুম। তখন ভাব্তুম স্বামী কি সুখের জিনিষ! এখন দেখ্ছি সব মিছে কথা।"

বিছানায় শুয়ে আমি অপরাধ-তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানা বই পড়্ছিলুম। পড়্তে-পড়্তেই বল্লুম, "তাদের মিছে কথা কি তোমার বোঝ্বার ভুল, এটা আগে ভেবে দেখ।"

প্রভা শুয়ে ছিল, উঠে বসে বল্লে, "আমারই বোঝ্বার ভুল যদি হয়, তাহলে এটা ঠিক যে, তাদের স্বামীর সঙ্গে আমার স্বামীর কিছুই মেলে না।"

—"তা হ'তে পারে।"

—"তা হ'তে পারে! কেন তা হবে? কি দোষ আমি করেছি? বল, চুপ করে' রইলে যে?"

আমি নীরবে বই পড়ে যেতে লাগ্লুম। স্ত্রীর কাছে সব-সময়ে সত্য কথা বলা নিরাপদ নয়। সুতরাং এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যে আমি বল্লুম, "কেন প্রভা, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যা কর্ত্তব্য আমি ত তার কিছুই অবহেলা করি-নি! তোমাকে খেতে দিচ্ছি, পর্‌তে দিচ্ছি, তুমি যা চাও তাই পাও। এমন-কি, বাঙালী মেয়েদের কপালে যে

আস্বাদ তুমি পেয়েছ—তোমার পায়ে কয়েদ-খানার বেড়ীর বদলে আমি স্বাধীনতার মহা-চিহ্ন পাদুকা দিয়েছি—তুমি যেখানে খুসি যেতে পার, যার সঙ্গে ইচ্ছে মিশতে পার। আরো কি তুমি চাও ?"

প্রভা দুই চক্ষু কুঞ্চিত করে' বল্লে, "গায়ে গয়না, পরতে কাপড় আর খেতে ভাত পেলেই স্ত্রীর সব দুঃখ ঘুচে যায়? আর, যে স্বাধীনতার কথা তুমি বল্‌ছ, সে ত একটা দাসীরও আছে।"

আমি একটু বিরক্ত স্বরে বল্লুম, "এতেও যদি তোমার মন না ওঠে, আমি নাচার !"

—"নাচার ! দেখ, আমি আর বিয়ের কনেও নই, মূর্খ, অবোধ স্ত্রীলোকও নই ! আমি বেশ বুঝতে পারি তুমি আমাকে ভালোবাসো না—আমাকে ভাবো একটা গলগ্রহের মত। বল, এই যদি তোমার মনে ছিল, তবে আমাকে বিয়ে করেছিলে কেন ?"

আমি আস্তে আস্তে বিছানার উপরে উঠে বস্‌লুম। আমার মেজাজ ক্রমেই চড়ে উঠ্‌ছিল। স্থির স্বরে বল্লুম, "শোন, আমি তোমাকে বিবাহ করিনি ! আমার বাবা আমাকে পণ্যদ্রব্যের মত বাজারে বার করে ছিলেন, আর তোমার বাবা টাকা খরচ করে আমাকে কিনে নিয়েছিলেন—এইমাত্র !"

অকস্মাৎ কবুল জবাব পেয়ে, অত্যন্ত উত্তেজনায় প্রভার মুখ রাঙা হয়ে উঠল ! আমার কাছ থেকে এমন কথা শুনবে বলে সে বোধহয় প্রস্তুত ছিল না ! কিন্তু আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে সে বল্লে, "কিন্তু আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বার আগে তুমি তোমার বাবাকে বলতে পারতে ত ?"—

—"পণ্যদ্রব্যের—যে বিক্রী হচ্ছে তার আবার মতামত কি ? তবে, ক্রেতার মনের মত না হ'লে, সে জিনিষ ফিরিয়ে দিয়ে ঘরের টাকা ফের ঘরে নিয়ে যায় বটে ! আমি যদি তোমার মনের মত না হই, তাহলে তুমিও তাই কর্‌তে পার ! তোমার বাবার টাকা ঐ ক্যাশবাক্সে মজুৎ আছে ;—তোমার টাকা তুমি নাও, আমাকে ফিরিয়ে দাও—মুক্তি দাও !"—এই বলে টেবিলের উপরে ক্যাশবাক্সটা যেখানে ছিল, সেইদিকে আমি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কর্‌লুম।

ক্যাশবাক্সের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে, প্রভা বদ্ধকণ্ঠে বল্লে, "এতদিন পরে, তোমার মুখে এই কথা !"

আমি বল্লুম, "এতদিন পরে এই কথাই আমাকে বল্‌তে হ'ল—কারণ, তুমি নিতান্তই আমাকে বল্‌তে বাধ্য কর্‌লে ! হ্যাঁ, তবে আরো ভালো করে' শোন, আজ যখন আমরা এতটা বেশী এগিয়ে পড়েছি, তখন এইখানেই থেমে যাওয়া ঠিক নয়—আমাদের ভেতরকার সমস্ত লুকোচুরি আজ স্পষ্ট হয়ে যাক্।...... তোমার সখীদের মুখে তুমি যে-সব স্বামীর গল্প শুনেছ, সত্যিই আমি তাদের কারুর মত নই—আমার প্রকৃতি একেবারে আলাদা,—একেবারে উল্টো ! তাই আমার স্ত্রীকে—তোমাকে, আজ আমি স্পষ্টই বল্‌ছি, আমি তোমাকে ভালোবাসি না ! শুন্‌ছ ?—আমি তোমাকে ভালোবাসি না !......এ কথার পরে তুমিও যদি আমাকে না চাও, আমাকে ত্যাগ করে' চলে যাও—আমি তোমাকে একটুও বাধা দেব না। আর, আমি তোমাকে ভালোবাসি না জেনেও তুমি

যদি আমাকে ত্যাগ না কর, তাতেও আমার কোন আপত্তি নেই। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আর যা কর্ত্তব্য আমি তা পালন করতে রাজি আছি,—কেবল, আমি তোমাকে ভালোবাসতে পারব না! আমার যা বলবার ছিল বললুম, এখন তুমি যা ভালো বোঝ, কর।"

প্রভা কোন উত্তর দিল না—তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের আলোটা ফস্ করে' নিবিয়ে দিলে! বোধহয় তার মুখের ভাব পাছে আমি দেখে ফেলি, সেই ভয়ে!

ঘর অন্ধকার এবং স্তব্ধ। তার মধ্যে প্রভার নিশ্বাসের শব্দ খুব স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল—আমার মনে হ'ল যেন, একটা ক্রুদ্ধ সর্পী রুদ্ধ আক্রোশে ক্রমাগত গর্জ্জন করছে!

প্রভাকে আমার মনের ভাব জানানো অত্যন্ত আবশ্যক ছিল; আজ তাই সুযোগ পেয়ে আমি সেটার সদ্ব্যবহার করলুম। সংসারের সমস্ত কাজের ভিড়ে প্রভাকে আমি একদিনও ভুলি-নি—এবং এও আমার সর্ব্বদা মনে আছে, আমাকে প্রতিশোধ নিতে হবে! এতদিন আমি মনে-মনে মতলোব আঁটছিলুম—অনেক ভেবে-চিন্তে যে উপায় স্থির করেছি, তাতে ফল হয় কিনা, এইবার তা দেখবার সময় এসেছে।

প্রভাকে আমার কার্য্যোদ্ধারের একটা প্রধান উপকরণের মত ব্যবহার করব। আমি হচ্ছি ডাক্তার,—শুধু শরীর-বিজ্ঞান নয়, মনোবিজ্ঞানেরও কিছু-কিছু আমাদের জানতে হয়, নইলে আমাদের ব্যবসা চলে না। আমার করুণ জবাব প্রভার মনের উপরে কি-রকম কাজ করবে, সেটা আমি কতকটা বুঝতে পারছি। ভবিষ্যতের জন্যে আমি যে চক্রান্ত স্থির করেছি, প্রভা তা জানে না এবং আমিও তাকে জানতে দেব না। তবু, সম্পূর্ণ অজ্ঞের মত প্রভা যা করবে, খুব-সম্ভব তাতেই আমার কার্য্যোদ্ধারের কতকটা উপায় হবে। এখন দেখা যাক্, প্রভার চরিত্র-সম্বন্ধে আমার যা অভিজ্ঞতা আছে তা ঠিক কিনা—সত্যসত্যই সে আমার পক্ষে না-হয়েও আমাকে সাহায্য করে কিনা!

... ... ... ...

পুরন্দরের বাড়ীর ঠিক পাশেই আমি বাড়ী ভাড়া করেছি বলে সে ভারি খুসি হয়েছে। এতদিনের অদর্শনের পর আমার মত পুরানো বন্ধুকে নিকট-প্রতিবেশী পেয়ে, সে অনেক আনন্দ প্রকাশ করলে। তার এই আনন্দ যে অকৃত্রিম, পুরন্দরের হাসি-মুখ দেখে আমি তা বেশ বুঝতে পারলুম। সে যে আমাকে ঘৃণা করে না, এটা বুঝে আমার বুক থেকে মস্ত একটা বোঝা নেমে গেল।

বন্ধু পুরন্দর, বন্ধু পুরন্দর! খুব ভালো বন্ধু, খুব ভালো! হিসাব-নিকাশ হ'তে এখনো বিলম্ব আছে! (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

# রুষ-সাহিত্যের ধারা

সাহিত্যের বুকে অক্ষয় ছাপ্ মারতে হোলে, তাকে ভাবে ও ভাষায় এমন একটা নতুন অলঙ্কার দিয়ে সাজাতে হবে যে, ইতিপূর্ব্বে আর কেউ তাকে তেমন সম্পদ দিতে পারেনি। জগতে সাহিত্যে যাঁরা নাম কোরেছেন তাঁদের লেখার মধ্যে এই বিশেষত্ব বিশেষ করে দেখতে পাওয়া যায়। লেখকের নিজের একটা স্বাতন্ত্র্য যদি তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে ফুটে না ওঠে, তবে বুঝতে হবে যে তিনি সাধারণের গণ্ডী ছাড়িয়ে একতিলও অগ্রসর হোতে পারেন নি।

রুষিয়ার বর্ত্তমান সাহিত্যের মধ্যে এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ছাড়া আর-একটা এমন জিনিষ চোখে পড়ে, যেটা এত সুস্পষ্ট ভাবে আর-কোন দেশের সাহিত্যের ভিতর দেখতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। রুষিয়ার যে কোন লেখকের গল্প, উপন্যাস, কাব্য কিংবা আত্মচরিত পোড়লেই বুঝতে পারা যায় যে, ঐ সুর রুষিয়ার।

ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ছাপিয়ে তাঁদের সাহিত্যে এই যে একটা একতান সুর বাঁধা রয়েছে, অবশ্য তার একটা কারণ আছে এবং সেই একই কারণে চার শতাব্দী আগে থেকে আরম্ভ কোরে আজ অবধি সেখানকার সমস্ত সাহিত্যিক একটা সহানুভূতির বন্ধনে বাঁধা পোড়েছেন।

রুষিয়ার যে বিপ্লববহ্নি আজ সমস্ত জগতের দিকে রক্তনেত্রে তাকিয়ে রয়েছে, যা আজ জগতের রাজশক্তিকে ধ্বংস কোরে দেবার জন্য পাগলের মত মাথা খুঁড়ে মরছে, সাধারণের চোখে তার আগমন বড় অকস্মাৎ বলে মনে হবে। কিন্তু রুষিয়ার সঙ্গে তার সাহিত্যের ভেতর দিয়ে যাঁর পরিচয় হয়েছে তিনি বুঝতে পারবেন যে, অনেক আগে থেকেই এই বিপ্লব সাহিত্যের ভেতর দিয়ে তার আগমন-বার্ত্তা প্রচার করছিল, আজ সে শুধু মাহেন্দ্র সুযোগে প্রকাশ্যভাবে তার রক্ত নিশান উড়িয়ে, যুদ্ধ যাত্রায় বেরিয়ে পোড়েছে।

আজ যে রুষিয়ার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি তাকে তৈরি কোরে তুলেচে তাদের অতীত সাহিত্য। আর তার অতীত সাহিত্যকে তৈরি কোরে তুলেছে তাদের রাজার মুষল আর তাদের আভিজাত্যের অত্যাচার।

সেখানে অত্যাচারের পেষণে কেমন কোরে সাহিত্যিকদের রক্তের সঙ্গে চুঁইয়ে চুঁইয়ে সাহিত্যের ধারা গলে পড়েছিল, তারই একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

রুষিয়ার অতি-পুরাতন গ্রাম্য সাহিত্যের মধ্যে ভাষা ও ভাবের যেমন আতিশয্য দেখতে পাওয়া যায়, কারো কারো মতে ইউরোপের আর-কোনো দেশের পুরাতন সাহিত্যে ততটা দেখা যায় না।

অবশ্য এই সকল গল্প অথবা কাব্যের মূল আখ্যানভাগ অন্য দেশ থেকে ধার করা হয়েছিল। এমন কি আমাদের দেশের

শ্রীকৃষ্ণের গল্পও এগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। এ সকল গল্প কোথা থেকে কি করে রুষ-সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ কোরল, তা পরবর্ত্তী যুগের V. V. Stasoff প্রভৃতি লেখকেরা অনেক গবেষণার পর বার কোরে গেছেন। তাদের এই সাহিত্য খুঁজলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, সেখানে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ কোরছে, বিদ্রোহ কিংবা অশান্তি নেই, সাহিত্যিকেরা নিরিবিলি আপনার মনে কাজ কোরে যাচ্ছেন। আস্তে আস্তে দুই-একজন লোক এই সাহিত্যে বেশ হাত পাকিয়ে তুলছিলেন, এমন সময় হঠাৎ মোঙ্গলরা রুষিয়া অধিকার কোরে, সকলকে মেরে ধোরে এমন বেয়াকুব বানিয়ে দিলে যে, তাদের আনন্দ আর আমোদ কোথায় উড়ে গেল তার ঠিকানা রইল না। মোঙ্গলদের কিছুদিন পরেই আবার তুর্কীরা লাল টুপি উড়িয়ে এই প্রায় মড়ার উপর আবার নানান কেরামতিতে খাঁড়া ঘুরিয়ে তাদের আরো জবুস্থবু কোরে দিলে। ক্রমে তাদের এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, দেশে আনন্দ বোলে যে কোনো একটা জিনিষের অস্তিত্ব ছিল, তা তাদের মনেই হোত না। রুষিয়ার বর্ত্তমান সাহিত্যের মূল ঠিক এইখানে না হোলেও, এই যুগের একটা প্রবাহ গিয়ে মূলধারার সঙ্গে মিশেছে তার কোন সন্দেহ নাই। তাদের সাহিত্যের মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে যে একটা আনন্দের সুর বয়ে যাচ্ছিল, সেটা বন্ধ হয়ে সেখানে দুঃখ, শোক ও বিষাদের রাগিণী বেজে উঠল। এই সময় আবার তাতারেরা মধ্যে মধ্যে তাদের আক্রমণ কোরে দলে দলে লোককে বন্দী কোরে নিয়ে কখনো কখনো বাস্কাকেরা এসে খানিকটা যায়গা দখল কোরে বোসে কয়েকদিন বেশ অত্যাচার কোরে কিছু খাজনা আদায় কোরে চোলে যেত। এইরকম ভাবে বাইরের অত্যাচারে প্রথমটা জনসাধারণ অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল।

যে সাহিত্য আগে ভদ্রলোকদের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত ছিল, ক্রমে সেটা রাস্তার ভিখিরিদের মুখে মুখে ফেরি হোয়ে বেড়াতে লাগল। এই সময় ভিখিরিরা ঐ সব পুরোণ কাব্য গান গেয়ে লোকের দরজায় ভিক্ষে কোরে বেড়াত। এখনও রুষিয়ার কোন কোন অঞ্চলে ভিখিরিদের মুখে সেই সব পুরোণ গান শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু সমাজের ধর্ম্মাধিকরণেরা এই সব গান গাওয়া বন্ধ কোরে দিলেন। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে দেশে যে একটা আনন্দ-প্রবাহ ছুটতে আরম্ভ কোরেছিল, ভিতর ও বাহির এই দুইয়ের অত্যাচারে তাকে আবার উৎস-মুখে ফিরে যেতে হোল, আর অন্যদিক দিয়ে আর একটা ক্ষীণ করুণ রসধারা বয়ে এল, এককথায় সেটাকে অত্যাচারের ইতিহাস বলা যেতে পারে।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে পোলাণ্ড প্রদেশে রুষিয়ার প্রথম বাইবেল ছাপা হয়। এই বই ছাপা হবার কিছুদিন পরে মস্কোতে এক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। পোলাণ্ডে বাইবেল ছাপা হবার আগে সেখানে হাতে-লেখা বাইবেলের প্রচলন ছিল। এই সব হাতে লেখা বাইবেলে সাধারণতঃ নানারকম ভুল-ভ্রান্তি থাকত। প্রত্যেক লেখক মূল গ্রন্থের সঙ্গে নিজের খেয়ালের খানিকটা কোরে জুড়ে

দিতেন, শেষে দাঁড়াল এই যে আসল বাইবেল যেটুকু, সেটুকু উড়ে গিয়ে নানারকম খেয়ালেই বইগুলি ভরে উঠতে আরম্ভ কোরল। শেষে গ্রীস ও অন্যান্য দেশ থেকে বাইবেল-জানা ভাল পণ্ডিত আনিয়ে এই সব হাতে-লেখা পুঁথি তাঁদের দিয়ে পড়িয়ে তার ভেতর থেকে আসল জিনিষ উদ্ধার করা হয়। বাইবেল সংশোধন ও তার অনুবাদ কোরতে বড় কম সময় লাগে নি। সেই হাতে লেখা রাবিশ থেকে মূল গ্রন্থ মিলিয়ে আসল জিনিষ বার কোরতে সর্ব্বসমেত এক শতাব্দীরও বেশী সময় লেগেছিল।

এই সময় Avakuam নামে একজন non conformist পুরোহিত নিজের জীবন-চরিত লিখে খুব নামজাদা হোয়ে পোড়েছিলেন। অবশ্য এই নাম জাহির করার জন্য তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে সাইবেরিয়াতে নির্ব্বাসিত করা হোয়েছিল। তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে দারুণ শীতের সময় হেঁটে সাইবেরিয়াতে যেতে হোয়েছিল; তাতেও রাজপুরুষদের রাগ মেটেনি, তাঁকে আবার সেখান থেকে হাঁটিয়ে মস্কোতে আনিয়ে জীবন্তে পুড়িয়ে মেরে সমস্ত আপদ চুকিয়ে ফেলা হোল।

রুষিয়ায় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে আজ পর্য্যন্ত এমন খুব কম সাহিত্যিক আছেন, যাঁর ওপর রাজা ও রাজপুরুষদের নজর পড়েনি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম পিটারের রাজত্বের সময় রুষ-সাহিত্যে একটা বিপ্লব হোয়ে গেল।

রাজা পিটার তাঁর অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে

গেলেন। এর মধ্যে উপকার করবার ইচ্ছেটা কতটুকু ছিল সেটা অবশ্য বিবেচনা-সাপেক্ষ।

রুষ-সাহিত্যে তখনকার দিনে যা-কিছু সব পুরোণো শ্লাভ ভাষায় লেখা হোত। অথচ লোকের কথাবার্ত্তা ও ভাবের আদান-প্রদানের ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের এই লিখিত ভাষার কোনরকম সম্পর্কই ছিল না। রাজা পিটার সাধারণের অপরিচিত এই ভাষায় লেখা, দণ্ডবিধি আইন কোরে বন্ধ কোরে দিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে প্রচার কোরে দিলেন যে, এবার থেকে লোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে সেই ভাষায় লিখ্‌তে হবে। কিন্তু এই আইন প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বিষম সমস্যা এসে জুটল, সেটা হচ্ছে লোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে সে ভাষা লিখতে কেউ জানে না,—এমন কি সে ভাষার অক্ষর পর্য্যন্ত কেউ জানে না। অত্যাচারী পিটার নিজে এই ভাষার অক্ষর সৃষ্টি কোরলেন। এই সব অক্ষরের বেশীভাগই পুরোণো শ্লাভ ভাষা থেকে ধার কোরে আন্‌তে হোয়েছিল। এই কাজে রাজা যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। রাজা পিটারের এই ভাষাই আজ পর্য্যন্ত রুষিয়ায় চলে আসছে।

প্রথম পিটারের রাজত্বকালে সাহিত্য-ক্ষেত্রে যাঁরা যশস্বী হোয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে Procopovitch এর নাম করা যেতে পারে। তিনি নিজে একজন পুরোহিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে পৌরহিত্যের গন্ধ বা নীতির বালাই একটুও নাই। Procopovitch এর সঙ্গে এই যুগে Kante-

প্রহসন লিখতেন ও সেই সময়ে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে অনেক স্বাধীন ভাব ও মত জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কোরে দেশের মধ্যে একটা চেতনার ভাব জাগিয়ে তুলতে বিশেষ চেষ্টা কোরেছিলেন। এই Kantemir রুষিয়ার রাজদূত হোয়ে প্রায় আট বৎসরকাল লণ্ডনে বাস কোরেছিলেন। Kantemirএর অব্যবহিত পরেই রুষিয়ায় আর একজন কবির আবির্ভাব হয়। এঁর কবিতায় খালি বিষাদের করুণ সুর ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। এই কবির নাম ছিল Tkretiaovskiy। Kantemirএর হাসি ও Tkretiaovskiyর অশ্রু একসঙ্গেই পাশাপাশি বয়ে চলেছিল, কিন্তু দেশের লোকের কাছে Kantemirই সেই সময় বেশী আদর পেয়েছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে Tkretiaovskiyর কবিতার আদর হয়েছিল বটে, কিন্তু বড় কবি বোলে আজ পর্য্যন্ত কেউ তাঁকে স্বীকার করেনি।

Tkretiaovskiy একজন পুরোহিতের ছেলে ছিলেন। বাল্যে তিনি বাড়ী থেকে পালিয়ে মস্কোতে লেখাপড়া শিখতে যান এবং সেখান থেকে আমষ্টারডাম, প্যারি প্রভৃতি যায়গায় পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। শেষ-বয়সে তিনি সেণ্টপিটার্সবার্গে ফিরে এসে দুঃখ-দারিদ্র্যে অনেক কষ্টভোগ কোরে মারা যান।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত রুষিয়ায় সব থেকে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকের নাম হচ্ছে Tatischeff। Tatischeff রুষিয়ার ঐতিহাসিক ছিলেন না, তিনি একাধারে ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক ছিলেন। এ সব ছাড়া তিনি বিস্তর সামাজিক প্রবন্ধও লিখেছিলেন। আর্চ্চেঞ্জেলের কাছে সমুদ্রের ধারে একটী গণ্ডগ্রামে রুষিয়ার এই মহাপাণ্ডিত এক ধীবরের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় তিনি বাড়ী থেকে পালিয়ে পায়ে হেঁটে মস্কোতে গিয়ে লেখাপড়া শিখ্‌তে আরম্ভ করেন। এইসময় মস্কো বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বেছে বেছে বারজন ছাত্রকে বিদেশে গিয়ে লেখাপড়া শেখবার জন্য বৃত্তি দেওয়া হোত। Tatischeff এই বৃত্তি পেয়ে জার্ম্মাণীতে লেখাপড়া শিখতে গিয়েছিলেন। Tatischeffএর সঙ্গে আর একজন মেধাবী ছাত্র এই বৃত্তি লাভ কোরে জার্ম্মাণী গিয়েছিলেন, তাঁর নাম Lomonosoff। প্রাকৃত-দর্শন, রসায়ন, প্রাকৃত-ভূগোল, খনিজশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিজ্ঞানে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। এ সব ছাড়া তিনি রুষ ভাষায় একখানি ব্যাকরণ তৈরি কোরে গিয়েছেন। Lomonosoff বিজ্ঞানচর্চ্চা ছাড়া ললিত সাহিত্যেরও সেবা কোরে গিয়েছেন। তাঁর লেখা অনেক কবিতা দেখতে পাওয়া যায়। সে সব কবিতার ভেতর ভাবের কোন নূতনত্ব নাই বটে, কিন্তু অনেক রকমের নতুন ছন্দে তিনি কবিতা লিখতেন, পরবর্ত্তী যুগের অনেক ভাল ভাল কবিতা তাঁর এই নতুন ছন্দে লেখা হোয়েছে। রুষিয়ার মহাকবি পুষকিন এই Lomonosoff সম্বন্ধে এক জায়গায় বোলেছেন যে, "তিনি নিজে একটী বিশ্ব-

বিদ্যাশিক্ষা কোরতে গেলে যে সব অসুবিধায় পড়তে হয়, জার্ম্মাণীতে গিয়ে তাঁকে তার চেয়ে কিছু কম অসুবিধা ভোগ কোরতে হয়নি।"

Lomonosoff এর পরেই Sumarokoff-এর নাম করা যেতে পারে। Sumarokoff বড় ঘরের ছেলে ছিলেন এবং তখনকার বড় ঘরের চাল অনুসারে তিনি ফ্রান্সে লেখাপড়া শিখতে গিয়েছিলেন। Sumarokoff অনেকগুলি নাটক রচনা কোরে গিয়েছেন, তা ছাড়া অনেক কবিতাও তাঁর আছে কিন্তু সে সব কবিতা কিংবা নাটকে বিশেষত্ব কিছুই নাই। তাঁর অধিকাংশ নাটকই ফরাসী ভাবে ও ফরাসী নাটকের অনুকরণে লিখিত।

দ্বিতীয় ক্যাথরিণের রাজত্বকালে রুষ-সাহিত্যে আর একটা বিপ্লব হোয়ে গেল। এতদিন সাহিত্যর মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে ফরাসী ভাব বয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু এখন থেকে রুষীয় জীবন এবং রুষিয়ার ঘটনাবলী নিয়ে নাটক ও উপন্যাস রচিত হোতে লাগ্‌ল। রাণী ক্যাথরিণ নিজে বেশ সুরসিকা ছিলেন। তাঁর রচিত অনেক প্রহসন আছে, এই সব প্রহসনের মধ্যে তিনি দেশের বড় লোকদের পুরোণো চাল-চলন ও রাজনীতিকে বেশ খোঁচা দিয়েছেন। তিনি নিজে একখানি মাসিক পত্রিকা বার কোরেছিলেন। এই পত্রিকায় রুষিয়ার রক্ষণশীল দলের সঙ্গে উদারমতাবলম্বীদের ভীষণ মসীযুদ্ধ চল্‌ত। এ ছাড়া তিনি শিক্ষিত মহিলাদের সাহিত্য-রসিক কোরে তোলবার জন্য একটি মহিলা-সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতির সভানেত্রী ছিলেন Princess Vorontoova Dashokova।

রুষিয়ার ইতিহাসের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তাঁর কাছে এই শক্তিশালী রমণীর গুণ ব্যাখ্যা করা বৃথা হবে। রাজনীতিতেও ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এককথায় বোলতে গেলে বলা যেতে পারে যে, ইনি না থাকলে ক্যাথরিণের সিংহাসন লাভ ঘটে উঠত কিনা সন্দেহ। মহিলা-সমিতির নেত্রীর পদ ছাড়া তাঁকে সেখানকার বিজ্ঞান-সভার সভানেত্রী মনোনীত করা হোয়েছিল। Princess এই মহিলা-সমিতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম কোরতেন। এই সমিতির সভ্যাদের সুবিধা ও সমিতির সাহায্যের জন্য তিনি দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম কোরে রুষভাষায় একখানি অভিধান প্রণয়ন করেছিলেন এবং সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর যে-সব সমালোচনা কাগজে প্রকাশিত হোত, সেগুলো আজ পর্য্যন্ত রুষ-সাহিতের অলঙ্কার স্বরূপ হোয়ে রয়েছে। তিনি ফরাসী ভাষায় নিজের জীবন-চরিত ( mon Histoire ) লিখে গিয়েছেন। ইতিহাসের দিক দিয়ে এই বইখানির মূল্য আছে।

সাহিত্যের এই নবযুগে রাজ-শক্তির সাহায্যে সে সময় কবি Derzhavin, প্রহসন-রচয়িতা Von wizin ( Fon vizin ), রুষিয়ার প্রথম দার্শনিক Novikoff ও রাজনৈতিক লেখক Radischefl প্রভৃতির প্রতিভা স্ফূর্ত্তি লাভ কোরেছিল।

Derzhavin রাণী ক্যাথরিণের সভা-কবি ছিলেন এবং রাণীর প্রিয়পাত্র ও পাত্রীদের উপর কবিতা লিখে রাণীর প্রিয় হবার চেষ্টা কোরতেন। তাহোলেও তাঁর কবিতার ভেতর কবিত্ব যে ছিল না সে কথা বোলতে

পারা যায় না। Fon vizin এর প্রহসনগুলি রুষ-সাহিত্যে একটা নূতন জিনিষ। বাইশ বৎসর বয়সের সময় তিনি প্রথম প্রহসন রচনা করেন। এই বইখানির নাম "The Brigadier"। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি লেখা এই বইখানি আজও রুষিয়ার রঙ্গমঞ্চে মাঝে মাঝে অভিনীত হোয়ে থাকে। Fon vizin আরও অনেক প্রহসন লিখে গিয়েছেন।

প্রহসনের আসল গল্পটা প্রায়ই তিনি অন্য দেশের প্রহসন থেকে নিয়েছেন বটে, কিন্তু নাটকের চরিত্রগুলোকে এমন ভাবে নিজেদের দেশের আচার-ব্যবহার ও হাব-ভাবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে দিয়েছেন যে, পাঠক কল্পনাই কোরতে পারবেন না যে, জিনিষটা অন্য জায়গা থেকে ধার কোরে আনা হোয়েছে। পরবর্ত্তী যুগে পুশকিন ও Gogol প্রভৃতি লেখকেরা রুষ চরিত্র ও রুষিয়ার আদর্শ নিয়ে যে এত মাতামাতি কোরে গেছেন, এই Fon viginই তার গোড়াপত্তন কোরে যান।

এই যুগের Bagdanovitch, Hermentizer, Kapnist, Prince Scherbatoff প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। কিন্তু আগে যাঁদের নাম করা হোয়েছে তাঁদের চেয়ে এঁদের প্রতিভা অনেক কম-দরের ছিল।

ক্যাথরিণের রাজত্বের সময় Novikoff নামে একজন সাহিত্যিক খুব কাজ কোরে গিয়েছেন। তিনি রুষ-জীবনে একটা নতুন শক্তি দিয়ে সমস্ত জাতটাকে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা কোরেছিলেন। ক্যাথরিণের পত্রিকাখানিতে Novikoff প্রথমে লিখতে আরম্ভ ক্ষেত্রে প্রবেশ কোরেছিলেন। প্রথমে তিনি প্রহসনের মত রচনায় রুষিয়ার বড় লোকদের, রাজশক্তি ও Serf dom-এর বিরুদ্ধে লিখতেন। এ-বিষয়ে রাণী প্রথমটা নিজে তাঁকে উৎসাহ দিতে আরম্ভ কোরেছিলেন। ক্রমে তাঁর লেখার মধ্যে প্রহসনের হাসিটুকু উবে গিয়ে রুদ্র রাগিণী বেজে উঠতে আরম্ভ কোরল। বাড়াবাড়ি দেখে রাণী তাঁকে উৎসাহ দেওয়া বন্ধ কোরে দিলেন। Novikoffএর মস্কোতে একটা বইয়ের ব্যবসা ছিল এবং এই ব্যবসা থেকে যা লাভ হোত তা তিনি দেশের সেবায় ব্যয় কোরতেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রুষিয়ায় একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষের সময় তিনি ও তাঁর দলের লোকেরা অনেক রকমে দেশকে সাহায্য কোরেছিলেন। এই সময় তাঁর একজন ভক্ত আপনার সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্র-সেবায় উৎসর্গ করেন। ক্রমে Novikoffএর ওপর গবর্মেণ্টের খর দৃষ্টি পোড়তে আরম্ভ হোল; শেষে আর কোন ধার দিয়ে বাগ মানাতে না পেরে, তাঁকে রাজনৈতিক অপরাধে গ্রেপ্তার করা হোল। রাণী ক্যাথরিণ নিজে তাঁর বিচার কোরে তাঁকে মৃত্যু-দণ্ড দিলেন। কিন্তু কোন কারণে (সেটা রাণী নিজেই জানেন) তিনি প্রাণদণ্ড থেকে রেহাই পেলেন এবং তার পরিবর্ত্তে তাঁকে Schusselburg এর দুর্গে বন্দী অবস্থায় রাখবার আদেশ হোল। এই সময় ডাক্তার Bagryanskiy নামে তাঁর একজন ভক্ত স্বেচ্ছায় তাঁর সঙ্গে কারাদণ্ড ভোগ কোরেছিলেন।

ক্যাথরিণের মৃত্যুর পর প্রথম পল রাজত্ব

Novikoff জেল থেকে বেরিয়ে আর কোন-কিছুতে যোগ দেন নি।

এই সময় Labzin নামে এক ব্যক্তি সমাজের মধ্যে যে-সব অনাচার চল্‌ত, তাই নিয়ে খুব লিখতেন, কিন্তু তাঁকেও এই অপরাধে রাজাজ্ঞায় দেশত্যাগী হোতে হোয়েছিল।

প্রথম আলেকজেণ্ডারের সময় এই ধরনের লেখকেরা একটু স্বস্তির হাঁপ ছাড়তে পেরেছিলেন। সে সময় লোকেরা একটু একটু কোরে বুঝতে পাচ্ছিল যে, *Serfdom অত্যন্ত অন্যায়, এবং বর্ত্তমান শাসননীতিতে ভাল লোকই বেশী দণ্ড পেয়ে থাকে আর মন্দ লোক সহজেই অব্যাহতি পায়, রাজনীতি, সমাজনীতি ও শাসননীতির যদি আমূল পরিবর্ত্তন না হয় তবে দেশের আর মঙ্গল নাই। Novikoffএর দলের লোকেরাও এই সময় আবার মাথা-নাড়া দিয়ে উঠল। এই সময় ঐতিহাসিক Karmzon, Turgueneff ভ্রাতৃযুগল (বিখ্যাত ঔপন্যাসিক Tenguenefffএর দুই খুড়া) এবং আর-কয়েকজন রাজনৈতিক লেখক দেশকে নানান দিক দিয়ে সাহায্য কোরেছিলেন। এই যুগে Radischeff নামে একজন রাজনৈতিক লেখক খুব নাম কোরেছিলেন। তিনি ছেলেবেলায় পড়াশুনা কোরতে জার্ম্মানিতে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ফিরে এসে ষ্টার্ণের Sentimental Journeyর অনুকরণে একখানি বই লেখেন, এই বইখানির নাম Journey from St. Petersburg of Moscow; এই বইখানিতে তিনি রুষিয়ার সমাজ ও রাজশক্তিকে যেমন ভাবে দেখেছেন ঠিক তেমনি ভাবে বর্ণনা কোরে গিয়েছেন। বিশেষ করে তিনি Serfdom, শাসননীতি ও বিচারালয়ের অবিচারগুলিকে ঘাঁটাঘাটি করতে আরম্ভ কোরেছিলেন। রাজপুরুষদের আদেশে এই বইখানি প্রকাশ হওয়া মাত্রই সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হোল এবং তারই কিছুদিন পরে তাঁকে ধোরে সাইবীরিয়াতে চালান কোরে দেওয়া হোল। তবে সেখানে তাঁকে বেশীদিন রাখা হয়নি, বছর-দুয়েক পরেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হোয়েছিল। কিন্তু তাঁর স্বদেশে যে ক্রমেই অধঃপতনের মুখে চলেছে, এটা বুঝে মনের খেদে রুষিয়ার এই দেশসেবক আত্মহত্যা কোরেছিলেন। তাঁর লেখা উক্ত বইখানি আজ-পর্য্যন্ত রুষিয়ার কোন রাজা প্রকাশিত হোতে দেন নি। ১৮৭২অব্দে একবার এই বই ছাপা হোয়েছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সমস্ত বই পুড়িয়ে ফেলা হয়। তারপর আবার ১৮৮৮ অব্দে একশখানা বই ছাপিয়ে লুকিয়ে সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল।

Karmzonএর History of Russian State নামে বইখানি রুষ-সাহিত্যে একটা বিপ্লব জাগিয়ে তুলেছিল। একজন সমালোচক বলেছেন, ১৮১২ অব্দের যুদ্ধ রুষিয়ার জাতীয় জীবনে যে পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছিল, Karmozuএর এই ইতিহাসে রুষিয়ার সাহিত্যে তার চেয়ে বেশী পরিবর্ত্তন সাধিত হোয়েছে। রুষিয়ার লোকেরা বলে Karamzon তাদের জাতীয় জীবনে একটা চিরস্থায়ী চেতনার প্রবাহ বইয়ে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর লেখা এই ইতিহাস আট খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রথম সংস্করণে তিন হাজার

বই ছাপা হোয়েছিল আর তার সবগুলিই পঁচিশ দিনের মধ্যে নিঃশেষে বিক্রি হোয়ে গিয়েছিল। ইতিহাস ছাড়া তিনি উপন্যাসও লিখেছিলেন। তাঁর লেখা Letters of a Russian Traveller, Poor Liza ইত্যাদি উপন্যাস রুষ-সাহিত্যে চিরকাল অমর হোয়ে বিরাজ কোরবে। Karamzon এর উপন্যাস রুষিয়ার লোককে কি-রকম মোহিত কোরেছিল, একটা উদাহরণ দিলে সেটা বুঝতে পারা যাবে। তাঁর Poor Liza একটি চাষার মেয়ের জীবন নিয়ে লেখা। এই দরিদ্র বালিকা দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন বড় ঘরের ছেলের প্রেমে পড়ে, শেষকালে তাকে না পেয়ে হতাশ হোয়ে একটা পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা কোরে মনের জ্বালা নিবারণ করে। বইখানা প্রকাশিত হবার পর অনেক যুবককে সেই পুকুরের ধারে গিয়ে বসে বসে অশ্রু-বিসর্জ্জন কোরতে দেখা যেত। তারা বোলত যে, এই পুকুরে বেচারা Liza ডুবে মারা গিয়েছে। ক্রমে সেই পুকুর একটা তীর্থস্থান হোয়ে দাঁড়িয়েছিল। Serfdomএর মূলে যাঁরা কুঠারাঘাত কোরেছিলেন, তার মধ্যে প্রথম বড় আঘাতটা Karamzonই দিয়েছিলেন।

Zhukovsky ছিলেন কবি। এককথায় তাঁকে Romantic কবি বলা যেতে পারে। তিনি পৃথিবীর অনেক বড় কবি—যথা হেডার, বায়রণ, টমাস মুর, হোমার, এমন-কি আমাদের দেশের নল-দময়ন্তী পর্য্যন্ত স্বদেশী ভাষায় অনুবাদ কোরেছিলেন। প্রিন্স ক্রপটকিন তাঁর সম্বন্ধে এক যায়গায় বলেছেন যে, জার্ম্মানরা অনুবাদ কোরতে জানে বটে, কিন্তু Zhukovskiyর এই-সব অনুবাদ এত সুন্দর যে, পৃথিবীর আর কোন ভাষায় আর কোন পুস্তকের এত সুন্দর অনুবাদ নেই। তাঁর কবিতায় প্রকৃতির বর্ণনা, অজানার প্রতি আকর্ষণ, যে-সব স্থান কখনো চোখে দেখা যায় না সেই-সব জায়গার ওপর একটা মোহ, ভালবাসা, বিরহ প্রভৃতির এত সুন্দর বর্ণনা আছে যে, সেগুলি না পোড়লে বোঝানো শক্ত। তাঁর কবিতার মধ্যে কিন্তু স্বাধীনতা কিংবা মানুষের মনের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করবার উপযোগী কোন ভাবের নিতান্ত অভাব দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

---

# ক্ষীরমোহনের হাঁড়ি

## ( ভামিনী-জীবনী—৪ পরিচ্ছেদ )

ছোটগল্প

গঙ্গারাম হাতী-মহাশয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের চরম ভক্ত। বিষম শাক্ত ভামিনীভূষণের কিন্তু ইহাতে আপত্তি করিবার কিছুমাত্র কারণ ছিল না।

তবে হাঁ, গঙ্গারাম আজকাল যে প্রত্যহ রাত দুপুর পর্য্যন্ত, একদল হেঁড়ে-গলা নেড়া-মাথা ভক্তের সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন সুধারসে প্রাণপণে প্রমত্ত হইয়া থাকেন, ভামিনীর ইহার বিরুদ্ধে

করিবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান।

রাত্রে ভামিনী শয়ন করিবার আগে জান্‌লার কাছে গিয়া বিস্ফারিত নেত্রে দেখিলেন, গঙ্গারাম হাতী অনেকগুলি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে উর্দ্ধবাহু হইয়া, ঘাড় ও কোমর বাঁকাইয়া বিপুল আনন্দে বিপুলতর ভুঁড়ি দুলাইয়া নৃত্য এবং সেইসঙ্গে ষণ্ড-কণ্ঠের চীৎকারের দ্বারা সঙ্গীতের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাধা করিতেছেন,

"বোল্ হরিবোল্, বোল্ হরিবোল্,
যায় যাবে জীবন যাবে, তবু হরিবোল—"

"যায় যাবে জীবন যাবে তবু হরিবোল?" —উঃ! এরা বলে কি?"—ভামিনী সভয়ে চম্‌কাইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি জান্‌লা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু জীবন গেলেও যে সাংঘাতিক 'হরিবোল' থামিবার নাম করে না, তুচ্ছ বন্ধ জানলাকে সে কি কখনো ডরায়? জান্‌লা ফুঁড়িয়া তাহা বেপরোয়ার মত সবেগে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। 'হরিবোলে'র মতন অমন মধুর ধ্বনি যে কতটা ভয়ানক হইয়া উঠিতে পারে, শবদাহীর মুখে ভামিনী অনেকবার তাহার প্রমাণ পাইয়াছিলেন। এখন তিনি দেখিলেন, এদিকে সময়ে সময়ে শ্রেণী-বিশেষের কীর্ত্তন-গায়করাও বড় কম যান না! একে ত পুরুষকে নাচিতে দেখিলেই ভামিনীর ধৈর্য্যের বহর বিলক্ষণ কমিয়া যাইত, তাহার উপর কিনা মরিয়া হইয়া হুঙ্কার করিয়া এই 'জীবন-গেলেও-হরিবোল'! ভামিনী একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "নাঃ, এ একটা ভূমিকম্প, একটা লম্ফ-ঝম্প, একটা হত্যাকাণ্ড! এ বাড়ী থেকে তাড়ালে দেখ্‌চি!"

বারংবার চম্‌কাইয়া আঁৎকাইয়া শিহরিয়া, অনেকবার হতাশভাবে এপাশ-ওপাশ করিয়া, আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়া ভামিনী শেষটা সত্যসত্যই সেই প্রায়-অসাধ্য কার্য্যটি সম্পন্ন করিয়া ফেলিলেন,—অর্থাৎ, কোনগতিকে কায়ক্লেশে এ-যাত্রা ঘুমাইয়া পড়িলেন।

* *
*

ভামিনী ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া হাস্যমুখে সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, এই বিকট-হরিনাম-ভীত স্বয়ং শ্রীহরির অব্যর্থ অভিশাপে, গঙ্গারাম প্রমুখ কীর্ত্তনীয়ারা একেবারে বদ্ধ বোবা হইয়া গিয়া সাশ্রুনেত্রে নীরবে হাহাকার করিতেছেন, এমনসময়ে কে তাঁহার গা ধরিয়া ঘনঘন নাড়া দিয়া বলিল, "ওগো, শুন্‌চ? ওঠ, ওঠ!"

অন্ধকার ঘরে চক্ষু মেলিয়া ভামিনী লেপের ভিতর হইতে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখটি ঈষৎ বাহির করিলেন।

দুর্গাকালী ত্রস্তস্বরে বলিল, "ওগো! ওঠ ওঠ—শীগ্‌গির! সর্ব্বনাশ হয়েচে!"

ভামিনী বিছানার উপরে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "অ্যাঁ? কি হয়েচে?"

—"নীচের ঘরে চোর এসেচে!"

—"চোর? বটে, বটে!"—ভামিনী তাড়াতাড়ি আবার শুইয়া পড়িয়া, সুড়্‌সুড়্ করিয়া লেপের ভিতরে গিয়া ঢুকিলেন।

লেপখানা একটানে সরাইয়া দিয়া দুর্গাকালী বলিলেন, "ওকি! চোর এসেচে শুনে শুয়ে পড়্‌লে যে বড়?"

রাত্রের অন্ধকারে বাড়ীতে চোর আসা, ভামিনী যার-পর-নাই অপছন্দ করিতেন। তাঁহার মতে, ভগবান রাত্রিকালটা সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রিয়তমার কোমল বাহুবেষ্টনের মধ্যে নিশ্চেষ্টভাবে আপনার সর্ব্বাঙ্গ এলাইয়া, নিরাপদে ঘুমাইয়া আরাম করিবার জন্য;—অন্তত বিপত্নীক না হইলে, এ সময়ে নির্ব্বোধের মত পরের বাড়ীতে নৈশ-ভ্রমণে যাওয়া কর্ত্তব্য নয়! সুতরাং তিনি বিরক্ত স্বরে বলিলেন, "চোর এসেচে ত আমি কি করব ?"

অন্যসময়ে এমন কথা শুনিলে দুর্গাকালী গালে হাত দিয়া দস্তুরমত অবাক হইয়া হইয়া যাইতেন। কিন্তু এখন আর অবাক হইবার একতিলও সময় ছিল না,—সে ধিক্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "ছি ছি গলায় দড়ী! হ্যাঁগা, তুমি না পুরুষমানুষ!"

স্ত্রীর মুখে এমন বিষম টিট্‌কারি অতি-বড় কাপুরুষেও সহিতে পারে না। ভামিনী কি আর করেন—আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিয়া একেবার শেষ চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "তোমার ভুল হয়েচে দুর্গাকালী! চোর-টোর কিছু আসে-নি, থাম্‌কা আমার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে!"

—"ভুল শুনেচি বৈকি, নীচেয় গিয়ে একবার দেখেই এস না!"

এই যে নীচেয় গিয়া চোরের সঙ্গে দেখা-শুনা করা, এইখানেই ভামিনীর ছিল পরম আপত্তি! তাঁহার মনে পড়িল সেই এক রায়-বাহাদুরের গল্প। এম্‌নি এক ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার রাত্রে, রায়-বাহাদুরের স্ত্রীও ঘুমন্ত স্বামীকে জাগাইয়া বলিয়াছিলেন, ওগো বেরিয়ে দেখ, বাড়ীতে চোর রায়-বাহাদুর শুনিয়া ঘৃণাভরে জ ছিলেন—"আসুক-গে! জানো, ... আমার সঙ্গে 'সেক্‌হ্যাণ্ড' করেন, আর আমি যাব কিনা এই রাত্রে ঘুম থেকে উঠে, যত-সব ছোটলোক চোর-ছ্যাঁচোড়ের সঙ্গে দেখা করতে? লোকে শুনলে যে ছি-ছি করবে—আমার কত-বড় মান তা জানো?"

হায়রে, ভামিনীর যদি নিদেন একটা রায়-সাহেব খেতাবও থাকিত! তাহা হইলে তিনিও আজ এক দাবড়ীতে দুর্গাকালীর মুখর মুখ বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন!

হঠাৎ নীচের ঘরে একটা হাঁড়ি ভাঙার শব্দ হইল!

দুর্গাকালী বলিয়া উঠিল, "ঐ যাঃ! মার কাছ থেকে আজ যে ক্ষীরমোহনগুলো এসেছিল, সেগুলো একটা হাঁড়িতে পূরে রেখেছিলুম, চোরে বুঝি সব খেয়ে ফেল্‌লে!"

ভামিনী ক্ষীরমোহন খাইতে ভারি ভালোবাসিতেন। তাঁহার সেই সাধের ক্ষীরমোহন যে চোরের ভুঁড়ির ভিতরে গিয়া একে একে বিনা-বাধায় আশ্রয় লইতেছে, এটা আন্দাজ করিয়া তাঁহার চিত্তেও অত্যন্ত করুণরসের সঞ্চার হইল। চোর যে কত বড় ঘৃণ্য, জঘন্য এবং নগণ্য জীব, এতক্ষণে তিনি সেটা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন।

দুর্গাকালী নির্দ্দয়ভাবে বলিল, "যাও, যাও! অমন ভূতের মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

ভূতেরা হাঁ-করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে কিনা, ভামিনী তাহা ঠিকমত জানিতেন না। তবে এটুকু তিনি বেশ জানিতেন যে, চোরকে যত

বেশী পালাইবার সময় দেওয়া যায়, তাঁহার নিজের পক্ষে তত বেশী মঙ্গলের কথা।

কিন্তু অবশেষে স্ত্রীর কাছে মুখ-রক্ষার জন্য, প্রাণ-রক্ষার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া আস্তে আস্তে তিনি অগ্রসর হইতে বাধ্য হইলেন।

দুর্গাকালী বলিল, "দেখো, চোরটাকে শেষটা রাগের মাথায় মেরে ফেলনা যেন!"

ভামিনী শুষ্কস্বরে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, না, চোরকে তিনি একেবারে হত্যা করিয়া ফেলিবেন না!

* * *

চোর যাহাতে সাবধান হইয়া পালাইতে পারে, সেজন্য খুব জোরে গলা-খাঁকারি দিতে দিতে তিনি নীচেয় নামিয়া গেলেন। কিন্তু নীচেয় গিয়া দাঁড়াইবামাত্র, ভামিনীর পা-দুটো ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া রীতিমত কাঁপিতে কাঁপিতে পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি সুরু করিল। তাঁহার মনে হইল, হাঁটুর নীচে থেকে দুটো পা-ই যেন খসিয়া গিয়াছে!

দুর্গাকালীও পিছনে পিছনে আসিতেছিল। সে আস্তে আস্তে বলিল, "কিগো, কাঁপচ কেন, ভয় পেলে নাকি?"

—"ভয় পাবার ছেলে আমি নই, বড্ড শীত করচে কিনা।"

ভাঁড়ার-ঘরের ভিতর হইতে চোরের খস্‌খস্‌ পায়ের শব্দ আসিল। ভামিনীর মাথার চুলগুলো পর্য্যন্ত যেন খাড়া হইয়া উঠিল এবং গলা দিয়া একটা অস্পষ্ট ঘড়্‌ঘড়্‌ আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল।

কোনক্রমে কলতলা হইতে মস্ত-বড় আঁশবটিখানা লইয়া আসিয়া, ধীরে ধীরে তিনি ভাঁড়ার-ঘরের দরজার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর চেঁচাইয়া বলিলেন, "ঘরের ভেতরে কে আছ?"

কোন জবাব নাই।

—"ঘরের ভেতরে কে আছ বল, নইলে এখনি আমি পুলিস ডাক্‌ব কিন্তু!"

তবু কোন সাড়া আসিল না।

ভামিনী আন্দাজ করিলেন, এতক্ষণে চোর তবে নিশ্চয়ই পিঠটান দিয়াছে! অনেকটা ভরসা পাইয়া তিনি দুর্গাকালীকে ডাকিয়া বীর-বিক্রমে বলিলেন, "ওগো, তুমি শীগ্‌গির গিয়ে একটা আলো জ্বেলে নিয়ে এস দেখি! আমি এই বঁটি আগ্‌লে দাঁড়িয়ে রইলুম, বেটা বেরিয়েচে কি, এক কোপ্‌ মেরেচি!"

দুর্গাকালী তাড়াতাড়ি তখনি একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া আনিল।

একহাতে আঁশবঁটি উঁচাইয়া এবং অন্য হাতে লণ্ঠন ধরিয়া, ভামিনী সতর্কভাবে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ভয় হইতেছিল, কি-জানি চোরটা যদি ঘরের ভিতরেই আশেপাশে কোথাও লুকাইয়া থাকে!

না! ঘরের ভিতরে সত্যই কেহ নাই! সুধু মেঝের উপরে একটা ভাঙা হাঁড়ির টুক্‌রো ও কতকগুলো ক্ষীরমোহন এদিকে-ওদিকে গড়াগড়ি যাইতেছে।

চোর পালাইয়াছে দেখিয়া ভামিনী অতিশয় আনন্দিত হইয়া, স্ত্রীকে ডাকিয়া গর্ব্বিত স্বরে বলিলেন, "ওগো, ভেতরে এস! বেটা আমায় দেখেই ভয়ে পালিয়েচে!"

তীক্ষ্ণদৃষ্টি দুর্গাকালী কিন্তু ঘরের ভিতরে

ঢুকিয়াই হাঁউমাউ করিয়া চ্যাঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "ওগো মাগো, আলমারির পাশে ওরা কারা গো!"--বলিয়াই সে একছুটে অদৃশ্য!

"এঁ্যা—এঁ্যা—এঁ্যা"—বলিতে বলিতে ভামিনী দ্রুতপদে পিছাইয়া দেয়ালে পিঠ রাখিয়া আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইলেন—একসঙ্গে তাঁহার হাত হইতে লণ্ঠন ও আঁশবঁটি দুইই খসিয়া পড়িল।

এদিকে হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া, চোরেরাও চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "বাবা, আমাদের মেরোনা, আর কথ্খনো এমন কাজ করব না!"

এ আবার কি? এ যে তাঁহারই ছেলে-মেয়ের গলা! এরা এখানে কেন?

আশ্চর্য্য হইয়া ভামিনী বলিলেন, "কেরে? হেবো, পুদী? কোথায় তোরা?"

কান্নার সুরে উত্তর আসিল, "আলমারির পেছনে, বাবা!"

—"তোরা? আল্মারির পেছনে তোরা? অ্যাঁঃ! এখানে কি করতে রে?"

ভামিনীর মেয়ে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, "আমি কিছু জানিনা বাবা! তোমরা যখন ঘুমোচ্ছিলে, দাদা-হতভাগা আমাকে জাগিয়ে বল্লে—'পুদী, চল্, দিদিমা ক্ষীর-মোহন পাঠিয়েচে, লুকিয়ে লুকিয়ে এইবেলা খেয়ে আসি-গে চল্, কেউ টের পাবে না!' এই বলে দাদা আমাকে এখানে জোর করে টেনে নিয়ে এল বাবা!"

* * *

তখন কীর্ত্তন শেষ হইয়া গিয়াছে। গঙ্গারাম হাতী নিজের ঘরে জাঁকাইয়া বসিয়া, একখানা থালায় পাকা তিনটি দিস্তে মাল্পো সাজাইয়া, আসন্ন আহার-আনন্দে উল্লসিত স্বরে গুন্গুন্ করিয়া গাহিতেছিলেন—

"হরি হরি হরি হরি, হরি বল মন,
অন্তিম-কালেতে হবে বৈকুণ্ঠে গমন"—

এমনসময়ে হঠাৎ তিনি শুনিতে পাইলেন, ভামিনীর বাড়ী হইতে তাঁহার দুই ছেলে-মেয়ে প্রাণপণে আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দন করিয়া উঠিল!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

---

# উকিলের কবুলতি

ওকালতি পাশ্ করে মুস্কিলে পড়লুম,
কত ধানে কত চাল তখন না বুঝলুম!
দিন যায় আদালতে, রাত বিনা-নিদ্রে,
না দেখিনু পয়সার মুখ-অরবিন্দে!
ডাক্তারি পাশ হলে কোন্ মিঞা মারতো,
দু'বেলায় অন্ততঃ দুটো টাকা আসতো,
অঙ্কেতে মাথা নেই লাগে পাক চরকি,
তা না হ'লে পড়তুম শিবপুর রুড়কি।
উপ্রিতে মাইনেতে চলে যেত বেশ,
হোতনা এমনতর 'হোপ্লেস্ কেস্'।

পাটেরও দালালিটা কোরবো কি ভাবচি,
নিয়ে ক্ষেত বুনবো কি শাক আর সব্জি?
ছেলে মেয়ে একজাই বাড়ুতেই চোল্লো,
এটা-সেটা ফরমাসে অস্থির কোরলো,

পান খেয়ে হাসিমুখে প্রিয়া কথা কন্‌না,
ক্ষয়ে চুণ হয়ে গেছে তাঁর নাকি গয়না।

আজকাল চাল-ডাল যে-রকম মাগ্‌গী,
ঐ আছে এই তোর মান্‌ বলে ভাগ্যি।
নোয়াটাই হচ্চে এয়োতীর লক্ষণ,
বাজে বাজু বালা চুড়ি ইত্যাদি রক্ষণ।

কেরাণীর কুলিগিরি করতেও ইচ্ছে,
'ভেক্যান্সি' নেই বলে ভাগিয়ে দিচ্চে।
ইস্‌কুল-মাস্‌টারি—তাও পাওয়া শক্ত,
ছুটে-ছুটে হেঁটে-হেঁটে মুখে ওঠে রক্ত।
কপালেও জুটেচেন গিন্নিও তেম্‌নি,
ছেলে-নিতে চাই ঝি, রাঁধতে বাম্‌নি।
তার ওপর আছে বাত—উঃ আঃ রাত-দিন,
দিতে হয় আমাকেই টিপে পা কত্‌দিন!
ঝন্‌ঝন্‌ থন্‌থন্‌ হরদম ঝগড়া,
আমাকে নিয়ে যেন ছক্‌ড়া-নক্‌ড়া!
অর্থাৎ মানে তার নেই মোর পয়সা!—
বাণিজ্যে ধন আসে,—কোরব কি ব্যব্‌সা?
সকলে বলচে—"বাঃ বাঃ বেশ ত!"
কোত্থেকে আসবে অতগুলো রেস্তো?
ভাবচি মনে-মনে কোরবো কি একখান্‌,
ছোটখাটো বিস্‌কুট চা-পানের দোকান।
হয় ভাল একবার রেস্‌ খেলে দেখলে,
হারি ত মোরবোনা—মারি ত জিতলে।

বিজ্ঞ বল্‌চেন, মাথা নেড়ে, বাপু হে!
পড়ে থাক আইনেই মেওয়া ফলে সবুরে।
পরিবার বলচেন নই কোন কর্ম্মের,
যেথা যাই যাইই করি ঘৃতাহুতি ভস্মের।
বিশ্বাস করিনেকো স্ত্রীলোকের বাক্যি,
আশ্বাসো নেই তবু,—যে দগ্ধ ভাগ্যি!

হায় হায় প্রাণ যায় কি ফাঁপরে পড়লুম!
আশার ছলনে ভুলে কি ফলটা লভলুম!
পঁচিশটে টাকা করে ফি বছর গুনচি,
মনে মনে আকাশেতে আশা-ফুল বুনচি।
দিন যায় আদালতে রাত বিনা-নিদ্রে,
আনিটাও আসেনাকো কভু কোন ছিদ্রে।
পটিমারা ছেঁড়া চটি শিকভাঙা ছাতাটা
ঘুচলো না, এ জীবন একেবারে মাটিটা।

এ মাটিতে ফল ফুল নাই যেন ফোললো,
কাঁটাগাছে বিলকুল চারিদিক ভোরলো,
সেজন্যে নিরাশায় হরদম কাঁদবো?
ভাগ্যদেবীর পায়ে মাথা খুঁড়ে সাধবো?
থেঁত্‌লে দিক্‌ ছিঁড়ে নিয়তির চক্র,
দুনিয়ার লোক থাক্‌ করে মুখ বক্র,
কক্‌খনো চোখে জল উঠবেনা চল্‌কে,
যত দিন ঘরে আছে ভাঙা হুঁকো কল্কে।
আর আছে ঝাল-ঝাল-টক্‌-টক্‌ মিষ্টি
প্রিয়া মোর বুকভরা—আলো-করা সৃষ্টি।

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

# কাজরী

২২

কাল রাঁচি পাহাড়ে বেড়াতে গেছলুম। দুটি বন্ধুলাভ হয়েছে—আশা আর সুরমা। দুই ননদ-ভাজ—আশা বৌ, সুরমা তার ননদ। সুরমার বাপ নন্দবাবু রাঁচির উকিল—বাবার সঙ্গে পড়েছিলেন। তাঁরা এসেছিলেন, রাঁচি পাহাড়ে বেড়াতে। বাবার সঙ্গে দেখা হতেই নন্দবাবু যেন কি হয়ে উঠলেন—কত গল্প, কত কথা,—তার আর শেষ নেই!

আশা আর সুরমা দুটি মেয়েই এমন ভালো যে আলাপ হবামাত্র মনে হল, যেন কত-কালের চেনা! আমরা যেন পরস্পরের জন্য আকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছিলুম—কবে দেখা হয়! সত্যি, একবারের দেখায় যে এতখানি ঘনিষ্ঠতা জন্মাতে পারে, এ ধারণাই আমার ছিল না!

আশার স্বামী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে বিলাত গেছেন—একবছরেরও উপর হল। আর সুরমা—বেচারী সুরমা, আহা, সে বিধবা! কি-ই বা তার বয়স! সতেরো কি আঠারো। এই বয়সেই বেচারী তার জীবনের দীপটি নিবিয়ে বসে আছে—দারুণ অন্ধকার বুকে নিয়ে। তার মুখে-চোখে বিষাদের এমন নিবিড় ছায়া পড়েছে, যে হাজার লোকের মধ্যে সে থাক্‌লেও তা চোখে পড়ে, আর পড়লেই বুকটা অম্‌নি হু-হু করে ওঠে! কি রূপ! হায়রে, জীবনটা তার ব্যর্থ, একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেছে!

সুরমাকে দেখে অবধি বুক আমার কেঁপে কেঁপে উঠছে—এর চেয়ে দুর্ভাগ্য নারী-জন্মে আর কি হতে পারে! যে গরীব, পথে পথে ভিক্ষা করে ফেরে, স্বামীর কোলটিতে দিনান্তে একটিবারও যদি সে মাথা গুঁজে পড়তে পায় ত তার কিসের দুঃখ! আর এ—এ যে সব থেকেও কিছু নেই। জগতের বুকে এই যে হাসি-খেলার লীলা চলেছে, আমোদ-প্রমোদের ধারা এই যে ঝর-ঝর ধারে ঝরে পড়ছে—এর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই! ইহলোকে থেকেও সে যেন আর-কোন্ অজানা লোকের ছায়ার মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

আজ যদি আমি—উঃ, মাগো, মনে করতে বুকটা ধবক্ করে ওঠে! পারব না, পারব না, তাহলে আমি কিছুতেই এ-প্রাণ রাখতে পারব না! সব আছে, অথচ—না, না, সে কথা ভাবা যায় না!

... ... ...

ওঁর জন্যে মনটা ভারী অস্থির হয়ে উঠেছে। কেন আসছেন না—উনি কেন আসছেন না? এই যে সেদিন লিখলেন, আমি শীগ্‌গির যাব—পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই যাব। তা আজ ত সাতদিন হতে চল্‌ল—কৈ—এলেন না ত! তবে কি আমায় স্তোক্ দিয়ে ভোলাচ্ছেন শুধু! ওগো, কি কাজ তোমার—কি কাজ সেখানে? এত নিষ্ঠুর, এত নির্ম্মম যে হবে তুমি—!

আর ভাবতে পারি না। আজ এখনো চিঠি এল না! বেলা এখন দুটো—ডাকের

সময় পেরিয়ে গেছে—আজ পাঁচ দিন চিঠি পাইনি!... মাগো, পুরুষমানুষ এমন পাষাণও হতে পারে!

... ... ...

নন্দবাবুর বাড়ী কাল আমাদের নেমন্তন্ন। সকালেই যেতে হবে। কিন্তু মনের এই অবস্থা নিয়ে কোথাও যেতে কি ভালো লাগে! তবু যেতে হবে—না গেলে সুরমা প্রাণে ভারী ব্যথা পাবে!

... ... ...

যদি আজ রাত্রের গাড়ীতে তিনি আসেন? আহা, তা কি হবে! এত দয়া! ভগবান, একবারটি তাঁকে এনে দাও। তুমি ত অন্তর্য্যামী, প্রভু—আমার মনের বেদনা তুমি ত বুঝছ, তবে—?......আর যে সইতে পারি না গো!

২৩

মোরাবাদিতে নন্দবাবুর বাড়ী। বাড়ীখানি যেন ছবির মত। কেমন থাক্-দেওয়া বাগানে ঘেরা, যেন সিঁড়ির ধাপ একটির উপর একটি, ফুলে-পাতায় কে সাজিয়ে রেখেছে! ওধারে পাহাড়—চমৎকার জায়গা!

সুরমা মেয়েটির সঙ্গে যত পরিচয় হচ্ছে, প্রাণটা ততই যেন জলে যাচ্ছে! কেমন সে লেখা-পড়া জানে! কেমন উঁচু মন! নিজের যে এত বড় দুঃখ—এমন বেদনা, তা কি নীরবে সে সহ্য করছে! বা'র থেকে এতটুকু বোঝা যায়না যে ওর প্রাণ চব্বিশ ঘণ্টা তুষের আগুনে পুড়ছে! মনের মধ্যে রাবণের চিতা জ্বেলে সংসারের শত কর্ত্তব্য ও করে যাচ্ছে। লোকজনকে দেখাশোনা, খাওয়ানো-দাওয়ানো—সকলের তদ্বির,—পাঁচজন এলে তাদের সঙ্গে হাসি-গল্প—নিজের শোক একেবারে ডুবিয়ে রেখে—মানুষ এমন করেও করতে পারে কখনো! তার চলাফেরায় কথাবার্তায় হাসি-খুসিতে এমন একটি শান্ত ভাব ফুটে উঠছিল, যে আমি তন্ময় হয়ে অবাক হয়ে শুধু তাকে লক্ষ্য করছিলুম। আমার হাত ধরে যখন সে বল্লে, "সুনীলবাবু এলে তোমাদের দুজনের রোজ এখানে সন্ধ্যার সময় চায়ের নিমন্ত্রণ রইল, ভাই—" তখন সে কথা শুনে আমার চোখে জল এল! আহা, অভাগিনীরে! নিজের সব হারিয়ে পরের সুখেই হাসো তুমি! এমন হাসি হাসতে পারা—সে কজন, সে কজন পারে? আমি কোথায় ওর কাছে নিজের সুখের একটা ইঙ্গিত দিতে ইতস্ততঃ করছি, ভারী বেখাপ্পা বিশ্রী বেমানান সেটা শোনাবে বলে,—ওর প্রাণে কত হারানো সুখের বেদনা বেজে উঠবে বলে ভয় হচ্ছে, আর ও অমন অম্লান বদনে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমারি পাঁচটা সুখের কথা শুনে আনন্দ করছে! ঐ মলিন মুখখানি দেখে ওর শোকের মাত্রা আমরাই হা-হুতাশে বাড়িয়ে তুল্‌ছি, আর ও নিজে ওর ঐ চাঁদ-মুখের নির্ম্মল হাসির ধারায় সে হা-হুতাশগুলো কেমন সহজ ভঙ্গীতে আস্তে আস্তে ঝেড়ে ফেলেছে! সুরমা—সুরমা—সুরমার কি আর তুলনা আছে? আশাকে নিয়ে তামাসাটাই কি সে কম করলে! প্রতি মেলে দাদার চিঠি আসে ত,—একটা মেলে চিঠি ছোট হলে আশার মুখখানি মলিন হয়ে যায় কত, আশার চোখদুটি অমনি ছলছলিয়ে ওঠে!

কথাটা বলবার সময় সুরমার মুখে হাসির এমন একটি স্নিগ্ধ দীপ্তি ফুটে উঠেছিল যে, তেমন দীপ্তি কখনো সন্ধ্যার তারায় দেখিনি কোনদিন, আকাশের চাঁদেও না!

... ... ...

আশার কাছে সুরমার কথা সব শুনলুম। আজ দু'বছর তার স্বামী মারা গেছেন। মা-বাপের কথায় হাতের চুড়ি-বালা সে খোলেনি, চুলও বাঁধতে হত, থানও পর্‌তে পেত না! নন্দবাবু পাগলের মত হয়ে গেছলেন—তার পর বছর-খানেক আগে নন্দবাবু পাগলের মত বাই ধরে বসলেন, সুরমার আবার বিয়ে দেবেন। বাড়ীতে তুমুল আন্দোলন চলল। সুরমার মারও মত হল শেষে। সুরমা প্রথমে কথাটি কয়নি। যখন ব্যাপার খুব পেকে উঠল, তখন একদিন সন্ধ্যার সময় সুরমা হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আস্তে আস্তে ডাকলে, "বাবা"—

আশাও সেখানে বসেছিল।

আশা বললে, "হঠাৎ সে স্বর শুনে আমরা চোখ তুলে দেখি, এ কি মূর্ত্তি! ঠাকুরঝী মাথার চুলগুলো কেটে ফেলেছে, নির্ম্মূল করে—কাপড়ের পাড় ছেঁড়া, গায়ে গয়না নেই, আর চোখের জল মুছে মুছে মুখে কালির এমন সব রেখা পাড়িয়েছে—যেন মুখে ঠিক কে কালি ঢেলে দেছে! এ যেন সে-ঠাকুরঝী নয়, তার কালো ছায়াটুকু! পাগলের মত মূর্ত্তি! বাবা মা দুজনেই চম্‌কে উঠে বল্‌লেন, "এ কি করেছিস, মা?"

ঠাকুরঝী বল্‌লে, "কেন তোমরা ও-সব কথা বলছ! শুনলে পাপ হয় যে! তা-ছাড়া এঁকে কি ভুলে গেছ? তোমরা ভুল্‌লেও আমি ত ভুলিনি বাবা, কখনো ভুলবো না যে।" তার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিল! বুকের কাপড়টা একটু সরে গেছল,—পাছে পড়ে যায়, আমি ধরে ফেললুম,—দেখলুম, ঠাকুরজামাইয়েরি একখানি ছবি তার বুকে ঝুলছে, লাল রেশমে বাঁধা! বাবা-মা কেঁদে ফেল্‌লেন,—বুকে টেনে নিয়ে বল্‌লেন, "না মা, আর কখনো এ চিন্তা আমরা মনের কোণেও আন্‌ব না।" তারপর থেকে কেউ আর কোন দিন সে-সব কথা তোলেনি!"

... ... ...

আবার বিয়ে! দূর! তা হয় না—হয় না—হয় না! হতে নেই—হতে পারে না সে!

... ... ...

কৈ, আজও চিঠি এলনা ত! না, ভাবব না আর। কিন্তু না ভেবেই বা থাকতে পারি কৈ!

... ... ...

আজ চিঠি লিখেছেন, "জরুরি কাজে একবার ঝেরিয়ার যেতে হচ্ছে বলে রাঁচি যেতে পার্‌লুম না। শীগ্‌গিরই যাব।" বাঃ! থাক্‌গো থাক্, তোমার আস্‌তে হবে না। তুমি সুখে থাকো তোমার কয়লার খনি আর টাকার থলি নিয়ে।

... ... ...

একদিনের জন্যও কি আসা যেত না? বেশ, এসো না।

... ... ...

সন্ধ্যার সময় আশা আর সুরমা এসেছিল। তাদের সঙ্গে মাঠের উপর দিয়ে বরিয়াতু

পাহাড়ের নীচে বেড়াতে গেছলুম। সুরমা তাঁর আসবার কথা জিজ্ঞাসা করছিল। বললুম, "কাজের জন্য আসতে পারলেন না।"

আশা বললে, "পুরুষ মানুষরা কাজের ভিড়ে এমন করেও আমাদের ভুলে যায় ভাই —কিন্তু আমরা ত কৈ এক মুহূর্ত্তের জন্য ওদের ভুলি না।"

সুরমা বললে, "তোমরা দুটিতে মিলেছ ভালো! আমি ভাই বৌকে কিছুতে বোঝাতে পারলুম না যে, এই যে পুরুষ মানুষ নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে রাজ্যের গৌরব মাথায় নিতে ছোটে, এ শুধু আমাদেরই জন্য! গৌরবে আমরা গৌরব মানব, এইটেই চ্ছে তাদের সব-চেয়ে বড় সুখ।"

বুঝি এ কথা,—কিন্তু মন কি তা শুনে চুপ করে থাকে কখনো! গৌরব না থাকলেও কি আমরা ওঁদের কর্ম্ম ভালবাসবো? ধ্যেৎ!

* * *

সুরমা মেয়েটিকে যতই দেখছি, ততই মনটা ওর উপর চেপে এঁটে বসছে। সকালে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে স্বামীর ছবিটিকে রোজ সে বুকে নিয়ে বসে—জপ করে। ফুলে-চন্দনে ছবিখানির পূজো করে,—এ তার নিত্যকার কাজ! কোন দিন এর কামাই নেই! তারপর সংসারের সহস্র কাজে নিজেকে সে একেবারে ডুবিয়ে দেয়। চোখে তার এক ফোঁটা জল কেউ কোনদিন দেখেনি, একটা করুণ দীর্ঘ-নিশ্বাসও কেউ কোনদিন কানে শোনেনি। কেমন প্রসন্ন প্রফুল্ল মুখখানি! দিন-রাত হাসিতে ভরা!

একদিন কথায় কথায় আমি বলেছিলুম, —"তোমার পায়ের ধূলো দাও, ভাই—এমন নিষ্ঠা যেন আমারও হয়!"

সে জিভ্ কেটে বললে, "ছি, ছি, ও কথা বলো না, ভাই। তুমি নেবে এই পোড়ারমুখীর পায়ের ধূলো! আর-জন্মে তাঁকে কত হেনস্থা, কত অবহেলা করেছি, সেই পাপে এ-জন্মে তাঁকে পেয়েই হারিয়েছি—তাঁর মূল্য বুঝিনি, মর্য্যাদা বুঝিনি। সে পাপের ক্ষমা চাইছি—যেন আর-জন্মে ছবি নয়, তাঁর পায়ের উপর মাথা রেখে সব পাপ মুছে ফেলতে পারি! এই প্রার্থনা করি, তুমি জন্ম-জন্ম স্বামী-সোহাগিনী হয়ে থাকো ভাই, স্বামীর কোলে মাথা রেখে যেন তুমি মরতে পারো! এর চেয়ে বড় কামনা নারীর আর কিছু হতে পারে না—"

সুরমার চোখ ছলছলিয়ে এল। কথাটা ওল্টাবার জন্য আমি অন্য কথা পাড়বার চেষ্টা করলুম। কিন্তু সুরমা সব কথা উড়িয়ে দিলে—অল্প কথায় নিজের যে কথাটুকু বললে সে—আহা, অভাগিনী বোনটি আমার!

বিয়ের পর ক'দিনই বা সে স্বামীর সঙ্গ পেয়েছিল? স্বামী শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ছিলেন—মেডেলের মালায় বাড়ীর গৌরব দুলিয়ে দিচ্ছিলেন,—ছুটির ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখাশোনা হত। তারপর শিবপুরে কি যে কাল-রোগ হল—বাড়ী আনা হল—কিন্তু মরণের হাত থেকে তাঁকে ফেরানো গেল না আর! একটিবার শুধু রাঁচিতে এসেছিলেন,—সাত দিন ছিলেন। ক'দিনই সন্ধ্যা হলে রাঁচি পাহাড়ে এসে

বসতেন—এই রাঁচি পাহাড়ের গুণ-ব্যাখ্যায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন। তাই সুরমা যখন-তখন বেড়াতে এলে এই পাহাড়েই আসে—এ পাহাড় তার তীর্থ!

* * *

কতদিন সুরমাকে বাঁচতে হবে এখন! নিজের সর্ব্বস্ব ছেড়ে কি করে এই দীর্ঘ সময় কাটাবে সে! না,—সে কথা ভাবতে গেলে সমস্ত পৃথিবীর যেন দম বন্ধ হয়ে আসে—অসহ্য শোকে চারিধার ফেটে চৌচির হয়ে পড়বে বলে মনে হয়!

২৪

চিঠি আসবার সময় চলে গেল, আজও কৈ, চিঠি এল না ত। মনটা ভারী ব্যাকুল হয়ে উঠেছে—বড় মন কেমন করছে! তাঁর ফটোখানা বুকে চেপে ধরলুম, শত শত চুম্বনে ভরে দিলুম!—দেবতা, আমার প্রাণের দেবতা, ওগো, আমি মূর্খ, হীন নারী, তোমার পূজায় অবহেলা করেছি বলে কি তুমি এ শাস্তি দিচ্ছ—না, এ পরীক্ষা? আর যে পারি না প্রভু—আমি জানি, আমি হীন, অতি হীন, তোমার চরণ-সেবার যোগ্যতা আমার নেই—কিন্তু তুমি ত দাসী বলে চরণে স্থান দেছ! তবে—?

অবহেলা! শাস্তি! ভগবান, সুরমার মত শাস্তি যেন দিয়ো না আমায়! আমায় অন্ধ করে দাও, পঙ্গু করে দাও, মূক করে দাও, এমন কি তিনি আমায় ত্যাগ করুন—এ-সব সহ্য হবে—কিন্তু আমার সামনে দিয়ে তিনি চলে যাবেন, এ দৃশ্য যেন এ-চক্ষে না দেখতে হয়!

* * *

আচ্ছা, সত্যি, এ কি এ? রোজ এত কাতরতা জানিয়ে ওঁকে চিঠি লিখচি—তবু কি দয়া হয় না? কবির কথা কি মিছে হবে—?

"এত ভালবাসি এত যারে চাই,
মনে হয় না ত সে যে কাছে নাই,
যেন এ প্রাণের ব্যাকুল বাসনা
তাহারে আনিবে ডাকি।"

কৈ গো কৈ? সে আসে কৈ?

* * *

এই যে চিঠি এসেছে গো, এসেছে—

"না জানি কারে দেখিয়াছি দেখেছি কার মুখ,
সকালে আজ পেয়েছি তার চিঠি—"
পেয়েছি এই সুখে আছি—পেয়েছি এই সুখ—
কারেও আমি দেখাবনাক সেটি—"

হাসি পাচ্ছে নিজের অবস্থা দেখে! এমন কাঙাল হয়েছি আমি আজ, যে দেখার আশা মোটেই করি না—একখানি চিঠি পেলেই স্বর্গ হাতে পাই! অথচ একদিন ছিলুম রাজ-রাজেন্দ্রাণী, "বিপুল গরবে ছিনু বসি কনক-আসনে!"

আগেকার সেই আমোদ আহ্লাদ, সেই হাসি-খুসি—সেই জীবন—সে কি সত্য, না, সে একটা স্বপ্ন আমার জীবনের উপর দিয়ে ভেসে গেছে?

চিঠিতে লিখেছেন, দু'এক দিনের মধ্যেই আসবেন, বোধ হয়!

বোধ হয়! তার মানে,—আসবেন না! বেশ ত, না-ই আসুন—আসব বলে কেন আবার এ যন্ত্রণা দেওয়া!

ওগো, এমন করে আর দগ্ধে মেরো না গো!

"বাঙ্লা! প্রায় শেষ হয়ে এল।"... আসুক্ গো—আমার কি! আমায় শুধু স্তোক্ দেওয়া বৈ ত নয়!

আমি বুঝেছি গো, আমি তোমার কেউ নই, কেউ নই—আমাকে না হলেও তোমার চলে, বেশ চলে! আমার অভাবে তোমার কোন কষ্ট হয় না—সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কোন ত্রুটি ঘটে না! বেশ ত, জীবন থেকে আমায় ছেঁটে ফেলে দিয়ে তুমি যদি শান্তিতে থাক্‌তে পারো, আরামে থাকতে পারো ত কাজ কি—আমি পথের কাঁটা, তোমার পায়ে মিছে কেন ফুটে থাকি! তোমায় ব্যথা দেওয়া ত শুধু! এবার থেকে আমি মনকে শক্ত করব! আর তোমার সুখের পথে কাঁটা হয়ে পড়ে থাকবো না। তুমি টাকা রোজগার কর—টাকার জন্য পাগল হয়ে, অধীর হয়ে ছুটোছুটি কর! টাকার সুখ চিনেছ ত—টাকা, ওগো, টাকাই তোমার সর্ব্বস্ব হোক্!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

---

# শীতের এ আলোখানি

শীতের এ আলোখানি, নয়ন ভরিয়া আনি',
আম থুই পরাণের মাঝে!
শ্যামসুন্দরের হাসি, তারি মাঝে আছে ভাসি,
তাই সুরে, মধু-বাঁশি বাজে॥
রাঙা হয় বুড়ো পাতা, সোণায় সাজায়ে মাথা
ফুটে উঠে গাঁদা ফুলগুলি।
এ আলোর পরশন, চেতনায় ভরে মন,
শীত-নিদ্রা তাই গেছে ভুলি॥
দেবদারু তরু হতে ঝরে পাতা পথে পথে;
ঢাকে ধূলি, সবুজ চাদরে,
শীতে দান হেরি ধরা, যেন প্রাণ ব্যথা-ভরা
নিজ বেশে সাজায় আদরে॥
জবা হাসে রাঙা মুখে, অপরাজিতার বুকে
মৃত্যুঞ্জয়ী সুনীল বরণ;
ধূসর, ক্ষণেক তরে, চেয়ে আছে নীলাম্বরে,
তাই যেন করায় স্মরণ॥

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

---

# মাসকাবারি

## বনফুল

সে দিন একখানি কবিতার বই পড়ছিলাম, নাম 'বনফুল', প্রায় দশ বৎসর হ'ল বেরিয়েছে, খাগ্‌ড়া, মুরশিদাবাদ থেকে। অলস মনে পাতা উল্টে যেতে যেতে বোধ হ'ল, আরো মন দিয়ে পড়া দরকার। সারারাত্রি দুঃস্বপ্নের পর সকালবেলায় বাস্তবের মধ্যে জেগে, গাছের পাতায় ভোরের আলো দেখে, যেমন স্বস্তি পাওয়া যায়, 'বনফুল'-খানি পড়ে' সেই রকম একটা খুসী প্রাণের ভিতর জেগে

উঠল। লেখা কাঁচা, কিন্তু তা'তে কি আসে যায়? কবিতাগুলি পড়বার সময় লেখকের sincerity ও seriousness পাঠককে অধিকার করে। ছন্দ, যতি, শব্দ যেখানে ভাঙা-ভাঙা লাগে, সেখানে লেখকের প্রতি বিরক্তি না হয়ে, সহানুভূতিই হয়; যেখানে তাঁর কথা বাধ্‌ছে, গানের স্রোত আট্‌কে যাচ্ছে, ভাষার উপর সম্পূর্ণ অধিকার না থাকায় ভাব আহত হচ্ছে, সেখানে নিজের প্রাণের ভাষা দিয়ে সেটুকু পূরণ ক'রে দিতে ইচ্ছা হয়। কবি নবীন, এ কথাও যেমন ছত্রে-ছত্রে মনে পড়ে, তেমনি, প্রকৃত কবিত্বশক্তি যে তাঁর মধ্যে সৃষ্টির সার্থকতা, প্রকাশের পরিতৃপ্তি পাবার জন্যে তাগিদ্‌ কচ্ছে, এ কথাও বেশ বোঝা যায়। তাঁর প্রকাশের ভঙ্গি সরস ও নবীন; ভাষায় যে সব খোঁচ্‌ আছে, ছন্দে যে সব উঁচট্‌-খাওয়া আছে, সেইগুলোই যেন তাঁর আবেগের অধীরতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে; কারণ, প্রকাশের যে পীড়া, সেইটে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সে-পীড়াকে জয় করে' তিনি এখনও artistএর সংযম আয়ত্ত করতে পারেন নি। কিন্তু এমন সব কল্পনা, রসমাধুরী এবং ভাষা ও সুরের আচম্বিত উল্লাস স্থানে স্থানে আছে, যে কাব্যসুন্দরীর প্রসন্ন হাসি তাঁকে যে সত্যই ভুলিয়েছে, তা' অবিশ্বাস করা যায় না। আসল কথা, যে sincerity সাহিত্যকলার প্রাণ, যার অভাব আজকাল এত, তারই স্পষ্ট আভাস এই বইখানিতে আছে, তাই মুগ্ধ করে। কাব্যবস্তু যে কি, তা'ত সমালোচনা করে' বোঝান যায় না—it defies all attempt at analysis—নইলে, প্রমাণ করা যেত, যে এই বইখানির কোনো কোনো স্থানে সত্যিকার কাব্যরস আছে,—যা' ভাষা, ছন্দ এমন কি বাক্যার্থেরও অতীত। শুধু ভাষা, ছন্দ ও অর্থে কবিতা হয় না; হ'লে, রবীন্দ্রনাথের এমন সুন্দর ভাষা ও ছন্দ লুঠ করেও আধুনিক বাংলা কবিতা এত রস-রূপ-গন্ধ-বর্জ্জিত হচ্ছে কেন?—সকলেই কবিতায় কেবল নীল আকাশের গায়ে নীল রংএর তুলি বোলাচ্ছেন কেন?

'বনফুলের' একটি কবিতা, যেটি আমার সব-চেয়ে ভাল লেগেছে, এই খানে তুলে' দিলাম। ব্যঞ্জনাটা বোধ হয় আর একটু বেশী হওয়া উচিত ছিল, এখানে ওখানে দু'-একটা কথা বোধ হয় বদ্‌লে দিলেও চল্‌ত। তা' হলেও, আমার কিন্তু যেমন আছে তেমনটিই ভাল লেগেছে। কবিতাটি হচ্ছে এই—

আমি বুঝি, তুমি কেন বাসন্তী প্রভাতে
আন্‌মনে পথ ভুলি' গিয়া
আমারি আঙ্গিনা মাঝে আসি' যাও চলি'
লক্ষ্যহীন মুহূর্ত্ত থামিয়া।
তুমি নাহি বুঝ সখা, সে স্তব্ধ প্রহরে
মুখরি' সে নিভৃত ভবন,
কঙ্কণ-সঙ্কেতে কেন সারি উঠে গাহি'
"আসিলে কি, রে মনোমোহন!"

•

আমি বুঝি, তুমি কেন হে চির-সুন্দর,
মিছামিছি ফুল-তোলা-ছলে,
বিনম্র বচনহারা আসি' দাও দেখা
এ বিজন তালীকুঞ্জ তলে।
তুমি নাহি বুঝ তব কুসুম-চয়ন,
ছলটিরে সত্য করিবারে;
যতনে রোপিল কেবা এ বন-ভবনে
প্রসূনের পাদপ-নিকরে?

নব মেঘে নভঃ ভরা, আমি জানি কার
মন আজি করিছে কেমন!
কে কারে বেড়িয়া ভ্রমে বনে-উপবনে,
কে করিছে নীরবে রোদন!
তুমি শুধু জান সখে, সহকার-শাখে
মাধবীরে দিতে জড়াইয়া,
বন হ'তে বনান্তরে ত্বরিতে চকিতে
ফিরিবারে বেণু বাজাইয়া!

রাধার 'মনোমোহন' যে রাধাকে ভাল বাসেন, রাধা যেন সেইটেই ভাল করে উপলব্ধি করতে চাচ্ছে; কিন্তু ভাবখানা—যেন সে কথা নিজে বেশই বোঝে; যিনি বুঝ্তে দিতে চান না তাঁকে বলছে, ওগো বুঝেছি, আমার কাছে লুকোতে পারবে না। এই ছলনার কল্পনা, আর তার সঙ্গে আগাগোড়া যে ইঙ্গিত-রস ঘনিয়ে উঠেছে, তাইতে কবিতাটি এত মধুর, এত সুশ্রী। রাধার এই উপলব্ধি তিনটি শ্লোকে ক্রমপরিস্ফুট হয়েছে। প্রথম শ্লোকে রাধা বল্ছে, তুমি আমাকে ভালবাস, এখনো সে কথা নিজেই বোঝনি। আমার কঙ্কণ-সঙ্কেতে সারি'কে দিয়ে তোমায় সম্ভাষণ করাচ্ছি, তুমি আন্‌মনা, শুনেও শুনছ না। দ্বিতীয় শ্লোকে চিরসুন্দর আরো কাছে এসেছেন—রাধার বিজন তালী-কুঞ্জের ধারে ফুল তুল্‌তে আসেন, যেন সেইটেই আসল কাজ; কিন্তু রাধার কাছে ছলটিকে সত্য ক'রে তুলতে পারেন না, কেননা, রাধা জানে

যতনে রোপিল কেবা এ বন ভবনে
প্রসূনের পাদপ-নিকরে?

যতই ছলটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছে, ততই রাধা তাঁর ভালবাসার বিষয়ে নিঃসংশয় হ'চ্ছে। এবার যত লুকুচ্ছেন, যত দূরে যাচ্ছেন, ততই তাঁর ছলনা ও সঙ্কেত রাধাকে বেশী করে' আশ্বস্ত কচ্ছে। তৃতীয় শ্লোকে শ্যামসুন্দরের বিশ্বব্যাপ্ত বিরহ-বেদনা, তরুলতিকায় তাঁর প্রেম-চিহ্ন, 'বন হ'তে বনান্তরে ত্বরিতে চকিতে বেণু বাজাইয়া ফেরা'—রাধার বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করেছে, তার মিলনোৎকণ্ঠাকে নিবিড়তম ক'রে তুলেছে।

## বাংলা কবিতা ও সমালোচনা

আমার বোধ হয় বাংলা দেশে আসল কাব্য-রসের আদর কমে আস্‌ছে। কবিতার বাইরের পোষাকটাই passport হোয়ে দাঁড়িয়েছে; অন্তরের প্রাণটুকুর গৌরব নেই। আমার মনে অনেকদিন থেকে একটা সন্দেহ জেগেছে এই, যে বাংলা কাব্যে মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথের সময় পর্য্যন্ত যে নব-জীবনের আবির্ভাব দেখা গেছে, তার স্রোত বড় শীঘ্র জমে' অসাড় হ'য়ে আসছে; বিশেষ, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রকাণ্ড actionএর পর re-actionটা যেন বড় শীঘ্র আরম্ভ হয়েছে,—আমাদের কাব্যসাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর পর বিংশ শতাব্দী না এসে অষ্টাদশ শতাব্দী এসে হাজির হচ্ছে। অর্থাৎ, কাব্য রচনায় কি ভাষা, কি ছন্দ, কি বস্তু, কি ছাঁচ, সকল বিষয়েই convention প্রবল হয়ে উঠেছে। এই conventionএর শাসনে কবিতার মধ্যেও, আত্মপ্রকাশে যেন কুণ্ঠা ও দাসত্ব দেখা যাচ্ছে। অবশ্য, এই 'রবিতপ্ত-কল্পনাকুমুদী' কারো কারো ভাগ্যে ফুটেছে মন্দ নয়, একটু আধটু স্বাতন্ত্র্যও বজায়

রেখেছে; কিন্তু আমি কথাটা বলছি সাধারণভাবে, বাংলা কাব্যের আধুনিকতম অবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে। এমনটি কেন হল?

কারণ খুঁজতে গেলে অনেক দিক দেখতে হয়, আমি শুধু সাহিত্যের দিক থেকে একটা খণ্ড কারণ অনুমান করেছি, সেটা হচ্ছে এই। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এত বড়, আর তার উদয় এত আচম্বিত, যে আমার মনে হয়, হিন্দুর অধিকার-তত্ত্বের কথাটা এ সম্পর্কে খুব খাটে। তাঁর প্রতিভার আলোকে নিজের সৃষ্টি করবার শক্তিকে চালিত করা দূরে থাক্, তাঁর মর্ম্ম পুরাপুরি কেউ বুঝ্‌তে পারেনি। এখনও পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই অনধিকারী। কিন্তু যাঁরা কবিতা লেখেন, তাঁরা সেই শ্রেণীর পাঠক, যাঁদের মনে কেবল একটা ঘোর লেগেছে মাত্র, পড়েন ত' খুব কম লোকেই। এই ঘোর-লাগা মনের উত্তেজনায়, এই বাইরে-থেকে-পাওয়া আবেগের অস্বস্তি থেকে এখনকার অধিকাংশ কবিতার জন্ম। মিষ্টি কথা, মিষ্টি ছন্দ—যা বাইরে-থেকে-পাওয়া, ভিতরের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়াও নয়—একটা কৃত্রিম ভাবাবস্থা—এরি পরিচয় আজকালকার মাসিক পত্রের পাতায় পাতায়। কবি নামের যিনি উপযুক্ত তাঁর টাইটলটাই আগে, ভাবের মৌলিকতা ও সৌন্দর্য্য ক্রমে ফুটে ওঠে। প্রত্যেক কবির ভাষা স্বতন্ত্র, বর্ণমালার অক্ষরগুলাই নিজের নয়—এমন কথা বললে ভুল হয় না। আজ কাল যাঁরা কবিযশঃপ্রার্থী তাঁরা একথা ভুলে যান, যে তাঁদের ভাষাও তাঁদের নয়। এদিকে, ভাবের—বা আরো সূক্ষ্ম করে' ধরলে ভাবের ভঙ্গির—বিশেষত্ব না থাকলে ভাষায় বিশেষত্ব আসে না; সেই কারণেই এই ভাষাই হচ্ছে কবিত্বের প্রথম পরিচয়। এই দিক দিয়ে দেখলে আজকালকার কবিতার নিষ্ফলতা স্পষ্ট চোখে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভার ছাপ এ-যুগের সাহিত্যে থাকবেই, থাকা অন্যায় নয়—কিন্তু তাঁহার বাণী আদর্শ—অনুকরণের বস্তু নয়। তিনি কাব্যসুন্দরীকে যে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে দাঁড় করিয়েছেন—সেই ভঙ্গীরও অন্তরালে যে অপূর্ব্ব কবিদৃষ্টি ও কবিপ্রাণ আছে—বাংলা কাব্যে কাব্যকলার যে অসীম সম্ভাবনার পরিচয় আছে—কল্পনার যে মুক্তির সংবাদ আছে, তা' থেকে আমাদের বিশ্বাস শতগুণ বেড়ে যায়, আত্মশক্তিতে নির্ভর করা সহজ হয়—অনুকরণের বন্ধন নয়, নবসৃষ্টির স্ফূর্ত্তি, মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের এই যে আজন্ম-সাধনার মুক্তিমন্ত্র—তা' নিয়ে এল কিনা বন্ধন! এই বাণী গ্রহণ করবার শক্তি কারও দেখি না। তাই বল্‌ব, রবীন্দ্রনাথের school বলে' সত্যই কিছু গড়ে' ওঠেনি; রবীন্দ্রভক্ত পাঠক থাকতে পারে, কিন্তু ঠিক রবীন্দ্রপন্থী লেখক বলে' পরিচয় দেবার মত স্পর্দ্ধা প্রায় কারো নেই বললেই হয়। বর্ত্তমান সাহিত্যে এই অনধিকার-চর্চ্চার জন্যই প্রকৃত কবিতার এত দুর্ভিক্ষ। এ ফ্যাশানটা এত প্রবল হয়ে উঠেছে, যে প্রাণের সহজ সরল ভাব সহজ সরলভাবে প্রকাশ করলে যে কাব্যরসটুকু উপভোগ করা যায়, সেই উপভোগ থেকে আমরা একেবারে বঞ্চিত হয়েছি।

* * *

আর একটা খুব বড় অভাব হ'য়েছে—সমালোচকের। বাংলা মাসিকে যে সব সমালোচনার নমুনা পাওয়া যায়, তার কথা নাই বল্লাম। সমালোচনা-মূলক যে সব ভারি ভারি প্রবন্ধ বা'র হয়, আর তাই নিয়ে যে সব চেঁচাচেঁচি চারদিক থেকে কাণ ঝালাপালা করে, তার কথা মনে কর্‌লেও হাসি পায়। সব কথাই বাইরের কথা—পাণ্ডিত্যের আতসবাজী, ম্যাগ্নেসিয়ামের আলো, তুবড়ী আর হাউই। ঘরের দিকে, সাহিত্যের ও সমাজের শিক্ষা-সাধনার প্রকৃত অবস্থার দিকে তাকিয়ে কেউ কিছু বলেন না। শেখা বুলি, ধার-করা বড় কথা নিয়ে আমাদের কি হ'বে? সমালোচনার কাজ যদি এই হ'ত যে, যেখানে সাহিত্য-সৃষ্টির সমস্যা নিয়ে লেখকেরা ঘুরপাক খাচ্ছে, পথ পাচ্ছে না—সেখান থেকে দূরে দাঁড়িয়ে মুখখানা মস্ত ক'রে বড়-বড় তত্ত্ব-কথা আউড়ে তা'দের আরো ভড়কে দেওয়া; তারা দূরে থেকে ভক্তি ক'র্‌বে—লিখ্‌বে এক, আর আওড়াবে ভয়ে-ভয়ে তাঁদের বুলি—তা'হ'লে এমন সমালোচনাকে সমালোচনা বলা যেতে পার্‌ত। কিন্তু তাই কি? ঘরের সমস্যা ঠিক কি, সেটাকে শুধু বাইরের দিক থেকে, বিশ্বের দিক থেকে নয়—ঘরের দিক দিয়ে ভাল করে' বুঝে, ভাল টনিকের ব্যবস্থা করে' সমালোচনা ও সৃষ্টি—দুইয়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতিয়ে, সোজা কথাটাই ভাল ক'রে বুঝিয়ে বড় ক'রে তুলে', ভুল ভাঙিয়ে, আশ্বাস দিয়ে, রস-বস্তুর স্বরূপ ও বিরূপ বেশ ক'রে ফুটিয়ে তুলে, উচ্চ-সাহিত্যের পত্তন করাই কি ক্রিটিকের কাজ নয়? ইয়ুরোপের আর্ট-তত্ত্ব একদিনে গড়ে ওঠেনি; আর, তা'ও সেখানকার আর্ট-সিদ্ধি, সাহিত্যিক কীর্ত্তি-পরম্পরার উপর প্রতিষ্ঠিত; সেখানে সৃষ্টি আগে, সমালোচনা পরে, অথবা দুই পাশাপাশি চলেছে—তবে একই প্রতিভায় দুই-ই সঙ্গে-সঙ্গে চলতে পারে বটে। সে রকম মনীষার জন্য আলাদা ক'রে ক্রিটিকের দরকার হয় না—আপনার পথ আপনিই কেটে নেয়, আর্ট-সাধনায় বিপ্লবের সৃষ্টি করে। কিন্তু সে তো সাহিত্যের ভরা কোটালের কথা, মরা কোটালের নয়। রবীন্দ্রনাথের জন্য কোন' ক্রিটিকের প্রয়োজন হয় নি, হ'লে তিনি রবীন্দ্রনাথ হ'তে পারতেন না, একথা সবাই বোঝে। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে বর্ত্তমান যুগে ক্রিটিকের দরকার খুব বেশী।

* * *

কবিতার পক্ষে এ অভাবটা এত বেশী, যে কোন-একটা বড় মাসিক পত্রে কিছুকাল কবিতা প্রকাশ বন্ধ করা হ'য়েছিল শুনেছি। তাঁরা মতলব মন্দ করেন নি। কবিতার ভালমন্দ বিচার করা এমন শক্ত—সবগুলিরই প্রায় সমান জবান, অথচ কেন যে কোনোটা সত্যিই ভাল, আর কোনোটা আদপে ভাল নয়—এর কূলকিনারা না পেয়ে ব'ল্লেন, "বড় ঠকায়, দাও উঠিয়ে! দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।" যাঁদের একটু নাম হ'য়েছে, যাঁদের কবিতার ভালমন্দ সুখ্যাতির দায়ী তাঁ'রা নিজে, তাঁদের কবিতা তো রোজ রোজ মেলে না। যাঁদের নাম নেই

তাঁদের কবিতা যদি ভাল না হ'য়ে মন্দ হ'য়ে দাঁড়ায়, তা'র ম্যাও সাম্‌লাবে কে ? কাজেই দূর হোক্‌গে ও বালাই—জ্ঞানের চেয়ে বুদ্ধিটাই বড়। যাঁ'রা উঠিয়ে দেননি তাঁ'দের ভাবটা বোধ হয় এই যে, ভাল কবিতা তো আজকাল জন্মাচ্চে না, বোধ হয় এর মধ্যে আর জন্মাবেও না—ওরই মধ্যে দু'চারটে যা' হাতের কাছে পাওয়া যায়, নিয়ম-রক্ষে'র জন্যে মাঝে মাঝে বসিয়ে দাও—নেই-মামার চেয়ে কাণামামা ভাল। কবিদের দাম এখনকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তৈরী গ্রাজুয়েটের মতো, কবিতা অনেকেই লেখেন, কিন্তু কবি বলে পরিচিত হ'তে লজ্জা বোধ যাঁ'র না হয়, তিনি সত্যই নিগুণ। আজকালকার কাগজে ছোট গল্প বা উপন্যাস যেমন-তেমন হ'লেও বেরোন' চাই। কিন্তু কবিতা—সে যে বিনা-পয়সার জিনিস! সম্পাদকের courtesyই তা'র দাম, তাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে সব কাগজ কবিতার উপর খড়্গহস্ত, যাঁরা কবিতাকে outlaw ক'রে দিয়েছেন, কিম্বা মাসিক সমালোচনায় কবিতা দেখ্‌লেই প্রকাণ্ড লগুড় হাতে করেন, তাঁদের কাগজেই যত উঞ্ছ কবিতা দেখা যায়। এই তো মাসিক সাহিত্যে কবিতার স্থান! সমালোচক ও সম্পাদকের দৌড় ঐ পর্য্যন্ত, যাঁরা লেখেন তাঁ'দের কথা তো আগেই বলেছি।

* * *

কবিতা চিনবার মতো জহুরী সব দেশে সব সময়েই খুব কম, এ কথা মানতেই হ'বে। এমন সমজদার খুব কম দেখা যায়, যাঁর হাতের মার্কা থাকলে কবিতার কোয়ালিটি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। ম্যাথু আর্নল্ড সু-কবিতার স্বরূপ নির্দ্দেশ করতে পারেন নি ;—কেন, কি হিসাবে এক শ্রেণীর কবিতা উত্তম, সে উত্তর না দিয়ে, সকল যুগের যে সব কবিতা উত্তম বলে চলে' আস্‌ছে, তা'র থেকে কিছু কিছু তুলে দিয়েছেন, আর তারই সঙ্গে সেই ভাবের নিরেস কবিতা তুলে দেখিয়েছেন—তাঁ'র বিশ্বাস, মানুষের মধ্যে রসবোধ বলে' যে একটা সাধারণী বৃত্তি আছে, তা' যদি একেবারে 'ভঁাড়ে-মা-ভবানী' না হয়, আর ঐ সকল কবিতা বোঝবার মতো আভিধানিক বিদ্যার অনটন না হয়, তবে সু-কবিতা কি তা' বোঝাবার জন্যে এই করলেই যথেষ্ট। আমার মনে হয়, সম্পাদকের যদি রসবোধ থাকে, আর তিনি শুধু এই রকম নির্ব্বাচনের উপরেই ঝোঁক দেন, তা'হলেও কবিতার ভাগ্য তবু অনেকটা ফেরে। যাঁরা কেবল গালাগালি করেন তাঁরাও এ কথা মনে রাখেন না যে, প্রতিমাসে বিশ পৃষ্ঠা ক'রে সমালোচনা করার চেয়ে একটি সু-কবিতা নির্ব্বাচন ক'রে প্রকাশ ক'রলে ঢের বেশী কাজ হ'বে, আর-যদি সকল কবিতার উপর নির্ব্বিশেষে তাঁদের অপূর্ব্ব সমালোচনার blunderbuss প্রয়োগ করেন, তা' হ'লে কাজের চেয়ে অকাজই হয় বেশী।

* * *

রসবোধ না থাকার দরুণ সম্পাদকদের নির্ব্বাচন-বুদ্ধি একটি বড় সোজা পথ বা সরল standard আবিষ্কার করেছে। নিতান্ত খাতির না থাকলে, দুই শ্রেণীর কবিতাকে পসন্দ-মার্কা দেওয়া হয়। যাঁরা

রক্ষণশীল, তাঁরা ধর্ম্ম, নীতি বা ভক্তিমূলক কবিতা প্রকাশ ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। যাঁরা উন্নতিশীল তাঁরা ভাষা ও ছন্দের একটু যেমন-তেমন কারদানি, বা অভাব পক্ষে, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিতাপের realistic ছবির পক্ষপাতী; অর্থাৎ ম্যালেরিয়া, মশা, ঝড়, দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবন প্রভৃতির মর্ম্মস্পর্শী কবিতায় পাঠকদের রসবোধ পরীক্ষা করেন।

শ্রীসত্যসুন্দর দাস।

---

# শ্রাবণ, ওহে গায়ন

মিশ্র খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

তোমার ছড়িয়ে পড়া ধারার মাঝে,—
ওহে শ্রাবণ, ওহে গায়ন, আমি পেয়েছি খুঁজে।
আমার হারিয়ে-যাওয়া স্বপ্নসুরের সকল কথা যে,—
তাই, বিষাদ-ঠাটের বীণা আজি প্রসাদরাগে বাজে॥
আমার বিরাগ-ব্যথা-ভরা,
শুক্‌নো ফুলের কণ্ঠমালা-ছড়া,
তাই রূপে গন্ধে নবীন হয়ে এমন মধুর রাজে।
অপরূপ এ যে ইন্দ্রজাল-বাজি!
দিনের পরে দিন্ কেটেছে সহসা আজি,
তোমার ডাকে ভাঙ্‌লো চমক্ মন জমিল কাজে!—
তাই, বিষাদ-ঠাঠের বীণা আজি প্রসাদরাগে বাজে!
গাও দেখি হে সুদূরপুরের গুণি,
তোমার তানে আমার গানটি ভাল করে শুনি!
পূর্ণ হবে মনের আশা, আমার ভাব আমার ভাষা
প্রচার কর বন্ধু তোমার অনুরাগের সাজে।
আমার—, বিষাদ-বীণা প্রসাদরাগে বাজুক সকাল সাঁঝে।

রচনা ও সুর—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলি।

## স্বরলিপি

১´ ০ ১´ ০
গা মা I পা র্সা ণা। ধা পা -ধপা I মা মা -া। গরা -গা মা I
তো মার্ ছ ড়ি য়ে প ড়া ০ ধা রা ০ র০ ০ মা

১´ ॥ ॰ ১´ ॰ ১´
I পা –া –া। মা মপা –ধা I ধা –া ধা। ধা ধা ধা I র্সণা –া ধা।
ঝে ॰ ॰ ও হে॰ ॰ শ্রা ॰ ব ণ ও হে গা॰ ॰ য়

॰ ১´ ॰ ১´ ॰
। পা মা মা I মা মা –া। গরা –া গা I মা –া –া। –া না না I
ন আ মি পে য়ে ॰ ছি॰ ॰ খুঁ জে ॰ ॰ ॰ আ মার

১´ ॰ ১´ ॰
I না র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা I র্সা –র্গা র্রা। র্সা র্সা –র্রা I
হা রি য়ে যা ও য়া স্ব ॰ প্ন সু রের্ ॰

১´ ॰ ১´ ॰
I না না –া। র্সনা –ধা না I র্সা –া –া। –া মগা –া I
স কল্ ॰ ক॰ ॰ গা যে ॰ ॰ ॰ তাই ॰

১´ ॰ ১´ ॰
I মা মপধা –া। ধা ধা –া I ধা র্সণা –া। ধা পমা –গা I
বি ষাদ্ ॰ ঠা টের্ ॰ বী ণা॰ ॰ আ জি ॰

১´ ॰ ১´ ॰
I মা ধা –া। ণা র্সা –া I ধণা –র্সণা –ধা। পা মগা মা II
প্র সাদ্ ॰ রা গে ॰ বা॰ ॰॰ ॰ জে "তো॰ মার্"

॰ ১´ ॰ ১´
। –া র্গা র্গা I র্গা র্গা –র্মা। র্রা র্রা –র্গা I র্রর্সা –না –া।
॰ আ মার্ বি রাগ্ ॰ ব্য থা ॰ ভ॰ ॰ ॰

॰ ১ ॰ ১´ ॰
। র্সা –া –া I না –র্রা র্সা। ণা ণা –া I ণধা –ণা ণা। ণা ণা –র্সা I
রা ॰ ॰ শুক্ ॰ নো ফু লের্ ॰ ক॰ ॰ ণ্ঠ মা লা ॰

১ ॰ ১´ ॰
I ধণা –র্সণা –ধা। পা –া মগা I মা ধা –া। ধা –া ধা I
ছ॰ ॰॰ ॰ ড়া ॰ তাই রূ পে ॰ গ ॰ ন্ধে

১ ০ ১ ০
I ধা ধণা -র্সণা। ধা পমা -গা I মা ধা -া। ণা র্সা -া I
ন বীন্ ০০ হ য়ে০ ০ এ মন্ ০ ম ধুর্ ০

১ ০
I ধণা -র্সণা -ধা। পা মগা মা II
রা০ ০০ ০ জে "তো০ মার্"

০ ১ ০ ১ ০
। -া -া -া I সা সা -া। সন্া -া সা I রা -া -া। -া -া -া I
০ ০ ০ অ প ০ রূপ্ ০ এ যে ০ ০ ০ ০ ০

১ ০ ১ ০
I মা -া মা। মা -গা মা I পা -া -া। -া -া -া I
ই ০ ন্দ্র জাল্ ০ বা জি ০ ০ ০ ০ ০

১ ০ ১ ০
I মা মপা -ধা। ধা ধা -া I ধা -র্সা ণা। ধা পা -া I
দি নের্ ০ প রে ০ দিন্ ০ কে টে ছে ০

১ ০ ১ ০
I মা মা -া। গা -রা গা I মা -া -া। -া -া -া I
স হ ০ সা ০ আ জি ০ ০ ০ ০ ০

১ ০ ১ ০
I র্সা র্সা -র্গা। র্গা র্গা -া I র্গা -া র্রা। র্সনা র্সা -া I
তো মার্ ০ ডা কে ০ ভাঙ্ ০ লো চ০ মক্ ০

১ ০ ১ ০
I র্সা -র্গা র্রা। র্রা র্সা -র্রা I র্সা -না -া। র্সা মগা মা I
মন্ ০ জ মি ল ০ কা ০ ০ জে তা০ ই

১ ০ ১ ০
I মা মপধা -া। ধা ধা -া I ধা র্সণা -া। ধা পমা -গা I
বি ষাদ্ ০ ঠা টের্ ০ বী ণা০ ০ আ জি ০

১ ০ ১ ০
I মা ধা -া। ণা র্সা -া I ধণা -র্সণা -ধা। পা মগা মা II
প্র সাদ্ ০ রা গে ০ বা০ ০০ ০ জে "তো০ মা"র্

• ১ • ১ •
। −া −া −া I সা গা গা । রা রা −গা I সা সা −া । সা সা −রা I
০ ০ ০ গা ও দে খি হে ০ সু দূর ০ পু রের্ ০

১ • ১ ০ ১
I সন্া −া −া । সা −া −া I পা পধা −না । না না −র্সা I ধা নধা −া ।
শু ০ ০ নি ০ ০ তো মার্ ০ তা নে ০ আ মার্ ০

০ ১ • ১ •
। পা −হ্মা পা I হ্মা হ্মা −া । হ্মা হ্মা −পা I গহ্মা −পধা −পহ্মা । পা −া −া I
গান্ ০ টি ভা ল ০ ক রে ০ শু০ ০০ ০০ নি ০ ০

১ ০ ১ ০
I না −া না । না না −া I র্সা র্সা −র্রা । র্সনা র্সা −া I
পূ ০ র্ণ হ বে ০ ম নের ০ আ০ শা ০

১ • ১ •
I র্সা র্সা −া । র্সণা −ধপা −ধা I ধণা র্সণা −া । ধা পা −া I
আ মার্ ০ ভাব্ ০০ ০ আ০ মার্ ০ ভা ষা ০

১ • ১ ০
I র্সা র্গা −া । র্গা র্গা −র্মা I র্রা −া র্রা । র্সনা র্সা −া I
প্র চার্ ০ ক র ০ ব ০ ন্ধু তো০ মার্ ০

১ ০ ১ ০
I না না −া । র্সা র্রা −র্গা I র্সনা −া −া । র্সা মা গা I
অ নু ০ রা গের্ ০ সা০ ০ ০ জে আ মার

১ ০ ১ ০
I মা মপধা −া । ধা ধা −া I ধা র্সণা −া । ধা পমা −গা I
বি ষাদ ০ বী ণা ০ প্র সাদ্ ০ রা গে০ ০

১ ০ ১ ০
I মা ধা −া । ণা র্সা −া I ধণা −র্সণা −ধা । পা মগা মা II II
বা জুক্ ০ স কাল্ ০ সাঁ০ ০০ ০ ঝে "তো০ মার্"

# স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী

এই বৎসর বাঙ্গলা সাহিত্যের অতিশয় দুর্বৎসর। বাঙ্গলা সাহিত্যের এই দীন ভাণ্ডার হইতে একে একে অনেকগুলি উজ্জ্বল রত্ন হারাইয়া গেল। প্রথম যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে শিবনাথের যে একটা বিশেষ স্থান আছে, এটা অস্বীকার করা যায় না। তিনি উপন্যাস, কাব্য, জীবনচরিত ও ইতিহাস প্রভৃতি যাহা-কিছুর জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাহাতেই একটা কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অনন্য-কর্ম্মা হইয়া তিনি যদি সাহিত্যের দিকে মন দিতেন, তাহা হইলে দরিদ্র বাঙ্গলা সাহিত্যের আরো যে কত দিকে কত উন্নতি হইত, তাহা বলা যায় না।

শিবনাথ ব্রাহ্ম ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের কোন-একটি বিশেষ শাখার স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নামের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নামও ব্রাহ্মসমাজ ও বাঙ্গলা-দেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের পর আর কেহ ব্রাহ্মসমাজের উপরে তাঁহার তুল্য প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যে তিন-চারিজন মহাত্মাকে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল, শিবনাথ ছিলেন তাঁহাদেরই মধ্যে অন্যতম। যৌবনেই তিনি সাধারণের নিকট কবি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার যখন একত্রিশ-বত্রিশ বৎসর বয়স, সেই সময় স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামকৃষ্ণ মুখো, রাজকৃষ্ণ রায় বর্ত্তমানকালের অন্যতর কবি।" তাঁহার পুষ্পমালা, ছায়াময়ী-পরিণয় প্রভৃতি কাব্যের নাম আজকাল শুনিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু একদিন বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজে এগুলির নাম রসিকজনের মুখে মুখে ফিরিত।

সোমপ্রকাশ-সম্পাদক স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহার মাতুল ছিলেন। এই সম্পর্কে ছাত্রাবস্থা হইতেই সোমপ্রকাশের সহিত তাঁহার একটা সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। তিনি উহাতে প্রায়ই কবিতা ও প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিতেন। এই সময়ে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের

"হইতাম যদি আমি যমুনার জল,
হে প্রাণবল্লভ"

কবিতাটি বাহির হয়। শিবনাথ ঐ কবিতাটির অনুকরণে সোমপ্রকাশে বিদ্রূপাত্মক একটি কবিতা লেখেন। এই কবিতার দ্বারাই তাঁহার ভাগ্যে প্রথম খ্যাতিলাভ ঘটে। শুনিতে পাওয়া যায়, সেই কবিতা পাঠে তখনকার সাহিত্যমণ্ডলী যথেষ্ট আনন্দলাভ করিয়া-ছিলেন।

কবিতায় তাঁহার যশ লাভ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার উপন্যাসগুলি তাঁহাকে অধিকতর যশস্বী করিয়াছিল। তারকনাথের পর তিনিই সামাজিক উপন্যাসে প্রথমে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার নয়নতারা, মেজবউ, যুগান্তর প্রভৃতি উপন্যাস বাঙ্গলা সাহিত্যের

সম্পদরূপে পরিগণিত। ইহা ভিন্ন তিনি 'রামতনু লাহিড়ী ও তদানীন্তন বঙ্গসমাজ' ও 'আত্মচরিত' নামক দুইখানি মূল্যবান গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি যেমন উৎকৃষ্ট লেখক, তেমনি উৎকৃষ্ট বক্তাও ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা কালে ভাব ও ভাষার আতিশয্যে আসল জিনিষ কখন মারা পড়িত না। সোজা সিধা কথায় অকাট্য যুক্তির দ্বারা তিনি নিজের মত প্রতিপন্ন করিতেন। তাঁহার উপদেশাবলী ও জাতিবিচার সম্বন্ধে বক্তৃতা পাঠ করিলেই এদিকে তাঁহার শক্তি যে কতখানি ছিল, তাহা উপলব্ধি হইতে পারে।

কলিকাতা সহরের প্রায় কুড়ি মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে মজিলপুর গ্রামে শিবনাথের জন্ম হয়। তাঁহারা বৈদিক ব্রাহ্মণ। শিবনাথের পিতা পণ্ডিত হরানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় অতিশয় নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়ই পণ্ডিতের গোষ্ঠী। নিজ-গ্রামে তিনি কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, তারপর ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন সংস্কৃত কলেজের সর্ব্বেসর্ব্বা। শিবনাথ তাঁহার পিতামাতার একমাত্র পুত্র। তাঁহার জীবনে যৌবনেই যে ধর্ম্মজ্ঞান প্রবুদ্ধ হইয়াছিল তাহা তাঁহার মায়ের চরিত্র হইতে তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জননী অতিশয় ধর্ম্মশীলা মহিলা ছিলেন। 'আত্ম-চরিতে' তিনি একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন— "শৈশবে মাতৃদেবীর যে ধর্ম্মভাব দেখিয়াছি তাহা ভুলিবার নহে; ধর্ম্মসাধন তাঁহার প্রাতি-দিনের কার্য্য ছিল। মাটি দিয়া শিব গড়িয়া তিনি নিত্য পূজা করিতেন ও সে পূজাতে অনেকক্ষণ নিমগ্ন থাকিতেন; খাবার অন্ন ঠাকুরদের নিবেদন না করিয়া কাহাকেও খাইতে দিতেন না।" অতি শৈশবেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন 'আমার প্রথমবার বিবাহ যখন হয় তখন আমার কত বয়স তাহা মনে নাই, সাল-তারিখও মনে নাই।' এই বিবাহের কিছুদিন পরে বৈবাহিকের সহিত মতান্তর হওয়ায় তাঁহার পিতা শিবনাথের আর এক বিবাহ দেন। শিবনাথের পিতা অত্যন্ত একরোখা লোক ছিলেন। তাঁহার এত রাশভারী ছিল যে, তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিত না। শিবনাথের যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় তখন তিনি বেশ বড় হইয়াছেন, কিন্তু পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিতে তাঁহার সাহস হয় নাই।

প্রথম যৌবনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। জীবনে যাহা সত্য বুঝিতেন তাহার জন্য তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। ব্রাহ্ম হওয়াতে তিনি পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হন ও সেই অবস্থায় নিজে সস্ত্রীক সংসার চালাইয়া পড়াশুনা শেষ করেন। যে পিতাকে তিনি যমের অধিক ভয় করিতেন, সত্যের জন্য,ধর্ম্মের জন্য তিনি তাঁহাকেও ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই ন্যায়পরায়ণতার জন্য তাঁহার অনেক বন্ধুও পরে শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়া-ছিল। দ্বিতীয় পত্নীকে লইয়া তিনি অনেক দিন সংসার করেন নাই। সে সময় বহু পত্নী লইয়া সংসার করায় সামাজিক কোন দোষ

ছিল না, কিন্তু শিবনাথ এই বীভৎস প্রথার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় পত্নীকে তাঁহার পিত্রালয় হইতে আনাইয়া পুনরায় তাঁহার বিবাহ দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, বরও জুটিয়াছিল, তবে তাঁহার পত্নী অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে রাজি না হওয়ায়, তাহা কার্য্যে সম্ভব হইয়া উঠে নাই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে এরূপ ভাবে দাঁড়াইতে সে সময় আর কেহ পারিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

বাল্যকালে তিনি বিদ্যাসাগর-মহাশয়কে শিক্ষকরূপে পাইয়াছিলেন এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের উচ্চ চরিত্রের আদর্শ তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। এক কথায়,—তাঁহারা কায়মনোপ্রাণে বিদ্যাসাগরের চেলা হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিধবা-বিবাহের নাম শুনিলেই তাঁহারা নাচিয়া উঠিতেন। যেমন করিয়াই হউক একটি বিধবার বিবাহ দিতে পারিলেই যেন দেশ ও সমাজ মুক্তির দিকে খানিকটা অগ্রসর হইয়া পড়িবে, এই ছিল তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা। এই সময়কার এক-একটি বিধবা-বিবাহের সুন্দর সুন্দর চিত্র তাঁহার আত্মচরিতে দেওয়া আছে।

বাল্য হইতে তাঁহার আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান খুব প্রখর ছিল। সেটা তিনি তাঁহার পিতার দিক হইতে খানিকটা এবং তাঁহার শিক্ষকের দিক হইতে খানিকটা লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি তখন সংস্কৃত স্কুলের ছাত্র, পিতার একখানি চিঠির বাহক হইয়া তাঁহাকে স্কুল-সমূহের ইন্স্পেক্টার উড্রো সাহেবের আফিসে একবার যাইতে হইয়াছিল।

ঘরে ঢুকিবামাত্র সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি জুতা খুলিয়া ঘরে ঢোক নাই কেন?"

নির্ভীক শিবনাথ উত্তর দিলেন, "এ ঘরে প্রবেশ করিতে হইলে জুতা খুলিতে হয় জানিলে আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতাম না।" সাহেব বলিলেন, "যাও জুতা খুলিয়া এস।" —"না সাহেব আমি জুতা খুলিব না, আপনার পায়ে জুতা রহিয়াছে। আপনি যদি জুতা খোলেন তবে আমিও জুতা খুলিতে পারি, নচেৎ নয়।"

ইহার পর সাহেবের সহিত এই জুতা খোলা লইয়া অনেকক্ষণ বাদানুবাদ চলিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে কিছুতেই জুতা খুলাইতে পারা যায় নাই।

শিবনাথ তাঁহার বিশেষ বন্ধু আনন্দমোহন, ও সুরেন্দ্রনাথের সহিত প্রথমে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য পরে তাঁহাকে আর-সমস্ত দিক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল এবং ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের জন্যই তাঁহাকে চির-দারিদ্র্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তিনি যদি সংসারিক উন্নতির চেষ্টায় মন দিতেন তাহা হইলে বোধ হয় অনেক অর্থ উপায় করিতে পারিতেন।

শিবনাথ খুব রসিক ছিলেন। তাঁহার উপদেশ ও বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা এ-কথা সত্য কিনা জানেন। অন্যদিকে তিনি শিশুর মত সরল ছিলেন। তাঁহার এই প্রাণখোলা সারল্য তাঁহার লেখার মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাতে গিয়াছিলেন ও সেখানে অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

জীবনে তিনি অনেকবার সাংঘাতিক রোগে পড়িয়া বহুকষ্টে বাঁচিয়া উঠিয়াছিলেন। দেশের এই মহাকর্ম্মী ধর্ম্মপ্রাণ শিবনাথ বহুদিন হইতে রোগশয্যায় পড়িয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। গত পূজার ষষ্ঠীর দিন বাহাত্তর বৎসর বয়সকালে তাঁহার মহৎ প্রাণ দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

---

# সমালোচনা

**ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতি।** শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। মূল্য আট আনা। ভূমিকায় লেখক-দ্বয় লিখিয়াছেন, "পাঠক-সাধারণের মনে যাহাতে অনায়াসে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণা জন্মিতে পারে, সেই ভাবেই ইহা লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি।" বইখানি পড়িয়া আমরা দেখিলাম, লেখকদের চেষ্টা বেশ সফল হইয়াছে। Stubbs, Bagehot, Macaulay ও Gardinerএর বিখ্যাত পুস্তকগুলির সাহায্যে এই বইখানি সঙ্কলিত। ইহার প্রথম ভাগে পার্লামেণ্টের ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্রনীতি ও তৃতীয় ভাগে ভারতে ইংরাজ-শাসন সম্বন্ধে আলোচনা আছে। অবশ্য, যাঁহারা ব্রিটিশ-রাষ্ট্রনীতি লইয়া অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য এই বইখানি লেখা হয় নাই। কিন্তু বাংলা দেশে সে-রকম লোকের সংখ্যা 'কোটিকে গোটিক' মাত্র। সুতরাং এই বইখানি জন-সাধারণের যথেষ্ট উপকারে আসিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। লেখকরা অল্পের ভিতরে, সোজা, মিষ্ট ভাষায় মোটামুটি জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি দিব্য গুছাইয়া বলিয়াছেন, কোনখানে এতটুকু বাড়াবাড়ি করেন নাই। ছাপা-কাগজও ভালো।

—প্রবাস।

**পথে-বিপথে।** শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্‌, কলিকাতা এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি ছোট গল্পের বই। যোলটি ছোট গল্প এ গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। "মোতিবিবি", "অছি", "শুকসারী", "টুপি" প্রভৃতি গল্পগুলি পূর্ব্বে ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পগুলির মৌলিকতা ও মনোহারিত্ব অপূর্ব্ব। শব্দশিল্পীর অনন্যসাধারণ সুনিপুণ তুলীর শব্দ-ব্যঞ্জনায় ছত্রে ছত্রে ছবি ফুটিয়াছে। আরব্য-উপন্যাসের গল্পের মতই এ গল্পগুলি এমনই বিচিত্র রহস্যে ভরা, যে পড়িতে পড়িতে মন মাতিয়া উঠে। গল্পগুলি এমনি আশ্চর্য্য কৌতূহল জাগাইয়া তুলে যে বইখানি পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। রঙের খেলা, ভাষার লীলাও গল্পগুলিতে এমন বিচিত্র রস সঞ্চার করিয়াছে, যে বাঙ্গলা ভাষায় তাহার তুলনা নাই—বইখানি বাঙ্‌লা সাহিত্যে নূতন রকমের উপভোগের সামগ্রী হইয়াছে।

**পদ-চারণ।** শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, এম এ, বার-এ্যাট-ল প্রণীত। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। কবিতা-গ্রন্থ। ছোট ছোট কবিতাগুলি ভাবে উজ্জ্বল, হাস্য করুণ, বিচিত্র রসে সুমধুর। দুইটি জিনিষ সব-চেয়ে মর্ম্মস্পর্শ করে—সে দুইটি এই—কবিতাগুলির অকৃত্রিম আন্তরিক আবেগ এবং প্রকাশের ভঙ্গীতে আশ্চর্য্য সরলতা। আড়ম্বরের লেশ কোথাও নাই। কবির হৃদয়াবেগ নিঝরিণীর স্বচ্ছ প্রবাহের মতই অবাধে বহিয়া চলিয়াছে—ভাবের কণা হীরার টুকরার মতই তাহাতে ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। বইখানির ছাপা বাঁধাই প্রভৃতি বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

---

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

# ভারতী

৪৩শ বর্ষ ]　　পৌষ, ১৩২৬　　[ ৯ম সংখ্যা

## কাল-বৈশাখী

### তিন

( শ্রীর কথা )

জ্বালাতন গো জ্বালাতন! এমন মুস্কিলেও মানুষে পড়ে বাপু! এত করে' বল্লুম—তোমার ঐ বিনোদ-টিনোদের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই না, তা কিছুতেই আমার কথা শুনলে না গা! সেই তাকে নিয়ে আসা হ'ল, তবে ওঁর মনের আশ মিট্‌ল! ভ্যালা জ্বালা যা-হোক্!

হ্যাঁ, বুঝতুম, বিনোদের দুটোর বদলে চারটে পা আছে, আর একটা ল্যাজ আছে, তাহলেও তার সঙ্গে দেখা করার একটা বরং মানে পাওয়া যায়! তা নয়—নিয়ে এলেন কিনা একটা ধেড়ে-মিন্‌সে কাঠখোট্টা লোককে ধরে, ওকে দ্যাখবার জন্যে যেন আমার ঘুম হচ্ছিল না—পোড়া কপাল আর কি!

সুধু আজকে বলে নয়, বিয়ের পর থেকে এমনি কাণ্ড ত হামেসাই হচ্ছে! কী যে এক ঢং উঠেছে জানিনা—বাবুরা আমাদের আর বিবি না-বানিয়ে ছাড়্‌বেন না! রামা-শ্যামা, যাদু-মাধু—ওঁর যত-রাজ্যের যত-সব বন্ধু না মাথামুণ্ডুর দল আছেন, সক্কলকার সাম্‌নেই আমাকে বেরুতে হবে, মুখের ঘোম্‌টা খুলতে হবে, কথা কইতেই হবে! কেন, এটা কি বাসাড়ে বাড়ী, আর আমি কি মেসের দাসী-বাঁদী? প্রথম-প্রথম ভয়ে আমার বুক উড়ে যেত—শেষটা একটু-একটু করে' কতকটা অম্‌নি সইয়ে নিতে হয়েচে! না-সইয়ে কী আর করি বল, যে নাছোড়বান্দা ছিনে-জোঁকের হাতে পড়েছি!

কিন্তু বাইরে যতই আমি মুখ বুজে থাকি, মনে-মনে এ আমি কখনো বরদাস্ত করতে পার্‌ব না—কখ্‌খনো না! হিঁদুর ঘরের মেয়ে আমি—আমার বাপের বাড়ীতে

পিঁয়াজের গন্ধ পর্য্যন্ত কখনো ঢোকে-নি—আমার কি এ-সব মানায়, না ভালো দেখায়? যতটা রয়-সয় তার বেশী ভালো নয়—লেখা-পড়া শিখতে বল, শিখছি; তোমার সঙ্গে যেখানে যেতে বল যাচ্ছি—কিন্তু তোমার ঐ মূর্ত্তিমান ভূতের দলের মাঝখানে গিয়ে বেহায়ার মত বসলে আমার কি মোক্ষলাভ হবে বল!

আর বন্ধুগুলিও কি তেম্‌নি!—মাগো, এক-একটির চেহারা দেখ্‌লে গায়ে যেন কম্প দিয়ে জ্বর আসে! কোনটির গোঁফ-দাড়ী কামানো, মাকুন্দের মত দেখ্‌তে—সকালে চোখে পড়্‌লে অকল্যাণের ভয়ে নেয়ে মরতে হয়। কোনটির মুখে আবার ঝাঁটার মত গোঁফ আর রামছাগলের মত লম্বা দাড়ী—ঠিক একটি আস্ত বনমানুষ—চিঁড়িয়াখানার পিঞ্জ্‌রে ভেঙে পাঁচিল ডিঙিয়ে কোন্‌ ফাঁকে যেন পালিয়ে এসেছেন। কোনটির রং-গড়ন ঠিক মোষের মত, কপাল দিয়ে তেল, ঠোঁট দিয়ে পাণের রস গড়াচ্ছে আর গাপরের মত ভুঁড়িটি সর্ব্বদাই হাঁসফাঁস আর কি-খাই কি-খাই করছে। এ জীবগুলি যে-সব ভাগ্যবতীর ঘর অন্ধকার করেছেন, তাদের কি শক্ত দেখে শিকল কিন্‌বার পয়সা নেই? আমার অমন কার্ত্তিকের মত স্বামীর পাশে কি এই-সব কিম্ভূতকিমাকার নন্দী-ভৃঙ্গীকে দেখ্‌তে শুন্‌তে মানায়, না ভালো দেখায়?……

মাঝে দিনকতক এক মেম-মাষ্টারণী এসে পেত্নীর মত আমাকে পেয়ে বসেছিল। বন্ধুগুলির কাছ থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলেও সে মাগীর হাত থেকে আর কিছুতেই ছাড়ান্‌ ছিল না। রাত্তিরে পড়াশুনো করে' রোজ রোজ নাইতে হ'ত—মেম ছুঁয়ে সে কাপড়ে থাক্‌তে গা যেন ঘিন্‌ঘিন্‌ কর্‌ত। বছরখানেক যেতে-না-যেতেই বুকে সর্দ্দি জমে শক্ত অসুখে পড়্‌লুম। তখন ওঁর হুঁশ্‌ হ'ল, আমাকে খুব-খানিক বকে-ঝকে শেষটা মাষ্টারণীকে বিদায় করে' দিলেন, আমিও আঃ বলে হাঁপ্‌ ছেড়ে বাঁচলুম।

এত যে বলি, তা উনি ত কিছুতেই বোঝ মান্‌বেন না! উনি বলেন, "মেয়েদের আমি অন্ধকূপে ডুবিয়ে রাখ্‌তে চাই না। তারাও যাতে আমাদের মত লেখাপড়া শেখে, আমাদের মত স্বাধীন হয়, সকল পুরুষেরই সেই চেষ্টা করা উচিত।"

আমি বলি, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি গো, যেমন আছি আমাকে তেম্‌নি থাক্‌তে দাও—সুখের চেয়ে স্বোয়াস্তি ভালো!"

—"সেকি শ্রী, স্বাধীনতার যে কত সুবিধে তা কি তুমি জান না!"

—"না, আমি জানি না—জান্‌তেও চাই না। আমি সুধু তোমার পায়ের তলায় দাসী হয়ে থাক্‌তে চাই।"

—"পিঞ্জ্‌রেয় বন্ধ থেকে-থেকে পাখীর যেমন ডানা আড়ষ্ট হয়ে যায়—তোমারও দেখ্‌ছি সেই দশা হয়েছে! এখন খাঁচার দরজা খুলে দিলেও তুমি আর উড়্‌তে পার্‌বে না!"

—"কথার ছিরি দেখ! হ্যাঁ গা, ফাঁক্‌ পেলেই আমি যদি পাখীর মত ফুড়্‌ৎ করে' উড়ে পালাই, তাহলে তুমি কি খুব খুসি হও?"

—"এইজন্যেই তোমাকে ভালো করে' লেখাপড়া শিখ্‌তে বলি! লেখাপড়া শিখ্‌লে

তুমি এমন অজ্ঞানের মত কথা বল্‌তে না —আমার কথার আসল অর্থ বুঝ্‌তে পার্‌তে!"

—"কেন, তোমার ঐ ছাইভস্ম ইংরিজী না পড়্‌লেই কি লেখাপড়া শেখা হয় না? আমি কি মুখ্যু? আমি কি মহাভারত, রামায়ণ আর ভালো ভালো বাঙ্‌লা বই পড়্‌তে পারি না?"

—"কিন্তু ও-সব পড়েও তোমার জ্ঞান হয়েছে এই যে, আমার কথার মানে পর্য্যন্ত তুমি বুঝ্‌তে পার না!"

—"তোমার ও স্বাধীনতা-ফাধিনতা মাথায় থাকুক্, আমার যেটুকু জ্ঞান হয়েছে তাই নিয়েই এ-জন্ম যেন কাটিয়ে দিতে পারি'। তুমি স্বামী, দেবতার চেয়েও তোমাকে আমি বেশী ভক্তি করব—এর চেয়ে বেশী জ্ঞান আমার আর চাই না! সুখে-দুঃখে একমনে তোমার সেবা কর্‌ব—এর চেয়ে বড় ধর্ম্ম আমার আর নেই। হ্যাঁ গা, তোমার ঐ ইংরিজী বইগুলোতে কি এর চেয়েও ভালো জ্ঞানের কথা আছে?"

—"তা আছে বৈ কি! ইংরিজী পড়্‌লে তুমি জান্‌তে পার্‌বে—ভগবানের রাজ্যে সব মানুষই সমান—তা সে মেয়েই হোক্, আর পুরুষই হোক্। স্বামী স্ত্রী,—দুজনেই দুজনকে শ্রদ্ধা কর্‌বে, অন্যায় কর্‌লে দুজনকেই সমান ভাবে দোষী হ'তে হবে, ঘরে-বাইরে দুজনেরই সমান স্বাধীনতা থাক্‌বে।"

জান্‌লা দিয়ে রাস্তাটা দেখিয়ে আমি বল্লুম, "ঐ দেখ, একদল ছেলে একটা ফুটবল নিয়ে হৈচৈ কর্‌তে-কর্‌তে যাচ্ছে! আচ্ছা, আমি যদি এখন ওদের সঙ্গে যাই, তাহলে তুমি কিছু বল্‌বে না ত?"

স্বামী বল্লেন, "যদিও ওদের সঙ্গে যাবার সাহস তোমার হবে না, তবু জিজ্ঞাসা করি, ওদের সঙ্গে তুমি কোথা যেতে চাও?"

—"কেন, মাঠে!"

—"সেখানে গিয়ে কি কর্‌বে?"

—"ফুটবল খেল্‌ব।"

—"ফুটবল! ফুটবল খেল্‌বে?"

—"কাজেই। আমরাও যখন তোমাদেরই মত স্বাধীন, তখন—"

—"দেখ শ্রী, কোন কথাই যে তুমি গম্ভীর হয়ে শুন্‌তে পার না, তার কারণ কি, জান?"

—"না, তার কারণ আমি জানি না। তবে কারণ না জেনেও আমি খুব গম্ভীর হ'তে পারি। দেখ্‌বে? এই দেখ আমি গম্ভীর হলুম!"

স্বামী দুঃখিত ভাবে হেসে বল্লেন, "তোমার সঙ্গে পারা ভার! তুমি এম্‌নি গম্ভীর ভাবে বসে থাক, আমি এখন চল্লুম।"

... ... ...

আজ খাওয়া-দাওয়ার পর ঝোলে নুন্ দেয়-নি বলে উড়ে-বামুনটাকে যখন ধম্‌কাচ্ছিলুম, আর সে যখন আর কোন ওজর না পেয়ে আমাকে বোঝাতে চাইছিল যে, নুনটা বড্ড-বেশী সিদ্ধ হয়ে গলে যাওয়ার দরুণই ঝোলটা আলুণি হয়েছে, তখন আর একটি লোককে সঙ্গে করে' হঠাৎ আমার স্বামী একেবারে উপরে উঠে এলেন।

পালাবার পথ না পেয়ে মুখে তাড়াতাড়ি ঘোম্‌টা টান্‌তে গেলুম, স্বামী বলে উঠ্‌লেন,

"আহা-হা, কর কি! ঘোম্‌টা টান্‌লে ও-ঘোম্‌টা আমি ফের খুলে দেব!"

কাজেই ঘোম্‌টা টানা আর হ'ল না, আমি জড়সড় হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলুম।

স্বামী বল্লেন, "বিনোদ, এই আমার স্ত্রী,—শ্রী, এই আমার বন্ধু বিনোদ!"

কেমন কৌতূহল হ'ল! মুখ তুলে লোকটির দিকে একবার তাকালুম—সেও আমার দিকে চাইলে। তার চোখদুটো যেন আগুনের মত,—চোখোচোখি হ'তেই আমি মুখ নামিয়ে নিলুম।

স্বামী বল্লেন, "বিনোদ, আমার বিবাহে বল্‌তে গেলে তুমিই একরকম ঘটকালি করেছ, সেজন্যে তোমাকে আমরা দুজনে আজ একসঙ্গে ধন্যবাদ দিচ্ছি!"

বিনোদ দু-তিনবার কেশে গলাটা পরিষ্কার করে' নিয়ে বল্লে, "তোমরা কিন্তু এম্‌নি অকৃতজ্ঞ যে, আজ-পর্য্যন্ত ঘটক বিদায় কর্‌তে সময় পাও-নি!"

—"কিন্তু বন্ধু, তোমার মত বিচিত্র ঘটককে আমরা বিদায় করে' দিতে ইচ্ছুক নই; কারণ সেটা সভ্যতাসঙ্গত হবে না। শ্রী, বিনোদের সঙ্গে কথা কও!"

কথা কইতে আমি পারলুম না।—যেমন ছিলুম, তেমনি দাঁড়িয়ে রইলুম, কিন্তু এটা বুঝতে পারলুম যে, বিনোদের চোখদুটো আমার মুখের উপরে অত্যন্ত স্থির হয়ে আছে!

স্বামী হাসতে হাসতে বল্লেন, "বিনোদ, আমার স্ত্রীটিকে তুমি যেন বোবা ঠাউরে নিও না। উনি এখন চুপ করে' আছেন বটে, কিন্তু আমাকে একলা পেলেই এখনি উনি ঠিক স্বদেশী বক্তাদের মত মুখর হয়ে উঠ্‌বেন।"

বিনোদ বল্লে, "তাহলে উনি প্রতিমার মত চুপ করেই থাকুন, আমিও নীরবে ওঁকে পূজা করি! রমণীর মুখে বক্তৃতা শুনলে আমার বুকের মধ্যে যেন কাঁপুনি আসে!"

—"বিনোদের কথা শুন্‌লে ত শ্রী! অতএব সাবধান, আর-কখনো বক্তৃতা দিও না!"

আমার যা রাগ হচ্ছিল! উনি কি আক্কেলের মাথা একেবারে খেয়েছেন—যার-তার সাম্‌নে আমাকে এম্‌নি অপদস্থ করা! আর যেমন উনি, বন্ধুও কি জুটেছে তেমনি! কোথাকার কে তার ঠিক নেই, এসেই একেবারে আমার সঙ্গে ঠাট্টা জুড়ে দিয়েছে! আরে গেল যা!

বিনোদ বোধহয় আমার মনের ভাব বুঝতে পারলে। সে বল্লে, "আচ্ছা ঠাক্‌রোণ, আজ নমস্কার করে' বিদায় হচ্ছি—প্রথম দিনেই আপনার মৌনব্রত আমি ভঙ্গ কর্‌তে চাই না—কারণ, অনেক সাধ্য-সাধনা না-কর্‌লে দেবী-প্রতিমাকে কথা কওয়ানো যায় না।"—এই বলে বিনোদ চলে গেল—আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

... ... ...

## চার

### ( প্রভার কথা )

মাগো, এ ব্যর্থজীবনের বোঝা আর যে আমি বইতে পারি না! এই নিষ্ঠুর সংসারের মধ্যে, এই তুষানলের চিতায় পড়ে আর-কত

দিন আমাকে এমন করে' দগ্ধে দগ্ধে মর্‌তে হবে? শৈশবে বড় সাধে যে আশার বাতি জ্বালিয়েছিলুম, যৌবনের প্রথমেই সে দীপ নির্ব্বাণ হয়েছে! আর কি কখনো এ-জীবনে তার শিখা জ্বলবে,—আবার আমার সকল আঁধার আলো করে'?

না, সে আশা নেই। আমার সকল আশার সাজানো প্রদীপ যে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে—সে ভাঙা দীপ আর ত জোড়া লাগ্‌বে না!

একটা কথা যখন-তখন মনে হয়, এই নারী-জীবন কিসের জীবন? কেতাবে পড়েছি পণ্ডিতরা বলেন, পৃথিবীতে উন্নতি হয় যোগ্যতমের; যে অযোগ্য, ছনিয়ায় তার ঠাঁই নেই—সে ধ্বংস হয়ে যায়। এই নিয়ম নাকি বরাবর চলে আস্‌ছে—জগতের অতীত ইতিহাস অযোগ্যের অন্তিম নিঃশ্বাসে উত্তপ্ত! অনেক বড়-বড় জীব, অনেক বড় বড় জাতি, জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতা ছিল না বলে চির-কালের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে, পৃথিবীর স্তরে-স্তরে আপনাদের পদচিহ্ন এঁকে রেখে। তাই যদি হয়, নারীজাতি তবে কি-করে' আজ পর্য্যন্ত সংসারে বর্ত্তমান আছে? প্রবল পুরুষের কাছে দুর্ব্বল নারী ত প্রতিদিন প্রতিপদে পরাস্ত হচ্ছে! প্রতিভায়, বিদ্যায়, ক্ষমতায় নারী ত কোথাও পুরুষকে হারাতে পারেনি! বিশেষ, এই ভারতবর্ষে—না, বাঙলাদেশে, নারীর বুক যেখানে পুরুষের চল্‌বার রাস্তা, সেখানে এখনো আমরা বেঁচে আছি কোন্ কুহকে? নিত্য যে এত অত্যাচার, এত অবিচার সহ্য কর্‌ছি, তবু ত আমরা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছি না!......না, হয়ত আমাদের প্রাণ বহুদিন লুপ্ত হয়ে গেছে, বেঁচে আছে সুধু আমাদের এই দেহটা—পুরুষ কৃত্রিম উপায়ে এই দেহটাকে জীইয়ে রেখেছে তার কাম-প্রবৃত্তি মেটাবার যন্ত্রের মত, তার পদসেবা কর্‌বার নিরাপদ উপায়ের মত। পুরুষের আবশ্যক, তাই আমাদের প্রাণহীন দেহ এখনো উঠ্‌ছে বস্‌ছে, চল্‌ছে ফির্‌ছে। যেদিন সে আবশ্যক থাক্‌বে না, আমাদের দেহকেও সেদিন সংসারের বাইরে দূর করে' টেনে ফেলে দেওয়া হবে,—ভবিষ্যতের যাদুঘরে তখন অতীতের জীবন-সংগ্রামে মৃত অন্য-অনেক জীবের কঙ্কালের সঙ্গে আমাদেরও দেহাবশেষ দেখে, ভবিষ্যতের মানুষ তখন বল্‌বে, 'অতীতে নারী বলে এক অযোগ্য জাতি ছিল, পুরুষের সঙ্গে জীবন-সংগ্রামে তারা লুপ্ত হয়ে গেছে।'.........

স্বামী সেদিন স্পষ্ট করেই বল্‌লেন, 'আমাকে তিনি ভালোবাসেন না!' পুরুষ এ-কথা অনায়াসেই স্ত্রীকে বল্‌তে পারে—বল্‌লে কোন দোষ নেই! কিন্তু স্ত্রী যদি এম্‌নি অনায়াসে তার মত প্রকাশ করে, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা অত্যন্ত-নিকৃষ্ট কোন অপরাধের চেয়েও বেশী-অপকৃষ্ট হয়ে উঠবে। ......আমাদের দেহের স্বাধীনতা আর মনের স্বাধীনতা দুইই নষ্ট হয়ে গেছে—পুরুষের হাতে আমরা এখন এক-একজন এক-একটি যন্ত্রচালিত পুতুল-মাত্র।

এখন আমি কি কর্‌ব?.........যে স্বামী আমাকে ভালোবাসেন না,—সে স্বামীকে আমি ভালোবাসব কেমন করে? ভালো হোন্ মন্দ হোন্, স্বামীকে পূজা কর্‌তে হবে দেবতার মত,—আদর্শ-সতীরা

এই মহৎ উপদেশ দিয়ে গেছেন। কিন্তু মন যখন বিদ্রোহী, তখনো কি-করে' যে বিমুখ স্বামীর পা-পুজো করা যায়, তা ত আমি কোনমতেই ভেবে পাচ্ছি না! শুনেছি, অনেকে শীতলাকে ভক্তি করে না —করে সুধু ভয়। আর ঐ দেবতাকে যে পূজা দেয়, তাও দেয় ভয়ে-ভয়ে। আমাকেও কি তাই কর্‌তে হবে? স্বামীকে পূজা কর্‌তে হবে ভয়ের দেবতার মত? আর সেই পূজায় যদি সিদ্ধ হই, তাহলে আমিও একজন প্রথমশ্রেণীর সতী হয়ে উঠ্‌ব ত?

না, না—আমি ভুলে যাচ্ছি যে, এ-সব হচ্ছে কেতাবের বানানো কথা! এ-সব কথার অর্থ না বুঝেই, আমি মুখস্থ করে' যেতে পারি টিয়াপাখীর মত, কিন্তু তার সঙ্গে আমার প্রাণের যোগ ত থাকবে না, তাতে ত আমার দেহ তৃপ্ত হবে না! আমার প্রাণ যে সচেতন—দেহ যে রক্ত-মাংসের!

জানিনা, যৌবনের ধর্ম্ম কি? কিন্তু আকাঙ্ক্ষা যদি যৌবনের ধর্ম্ম হয়, তবে সে আকাঙ্ক্ষা আমার ষোলআনাই আছে— আর তা অতৃপ্ত হয়েই আছে! প্রাণ আমার এখন বিশ্বের সকল ঐশ্বর্য্য, সকল সৌন্দর্য্য, সকল রূপ-রস-গন্ধ আর সকল হাসি-গান-আনন্দকে অমৃত-ধারার মত পান করবার জন্যে তৃষিত হয়ে আছে, উন্মুখ হয়ে আছে, কিন্তু নিয়তি আমাকে যে অন্ধকারে বন্ধ করে' রেখেছে—কে আমাকে সে অন্ধ-কারাগার থেকে মুক্তি দেবে, কে দেবে গো— কে দেবে?

সেদিন স্বামী যখন প্রকাশ্যে তাঁর মনের গোপন দিকটা আমাকে খুলে দেখালেন, তখন থেকেই আমারও চোখ খুলে গেছে। আমি যে তাঁর চোখের বালি, বিবাহের পর থেকেই এ সন্দেহ আমার বরাবর ছিল,— তবে সেটা সন্দেহ মাত্র। কিন্তু সেদিনকার স্পষ্টাস্পষ্টি কথার পর আর সন্দেহ কর্‌বার কিছু নেই। ......আমি ত কোন দোষ করি-নি! তবে কেন আমি তাঁর প্রেম থেকে বঞ্চিত হলুম? ......কথাটা বারবার বুঝ্‌বার চেষ্টা করেছি, কিন্তু একবারও বুঝ্‌তে পারি-নি!

এম্‌নি যখন মনের গতিক্, তখন হঠাৎ একদিন স্বামী তাঁর এক বাল্যবন্ধুকে সঙ্গে করে' একেবারে আমার ঘরে এসে ঢুক্‌লেন। আমি তখন স্বরলিপি দেখে হারমোনিয়াম বাজিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি গান মুখস্থ কর্‌ছিলুম:—

—আমার একটি কথা,
বাঁশী জানে, বাঁশী জানে।—

পায়ের শব্দে চম্‌কে পিছন ফিরে দেখ্‌বামাত্রই, একসঙ্গে আমার গান আর বাজনা দুই থেমে গেল।

যিনি এসেছিলেন তিনি আমার স্বামীকে বল্লেন, "বিনোদ, ওঁর একটি কথা যখন বাঁশীই সুধু জানে, তখন সে কথা আমি জোর করে' শুন্‌তে চাই না। আমি এখন একটু নীচেয় গিয়ে বসি, ওঁর গান থাম্‌লে আমায় ডেকো।"

স্বামী বল্লেন, "যেওনা পুরন্দর, থামো! তুমি গান শুন্‌তে ভালোবাসো বলেই এখানে তোমাকে এনেছি।"

—"না বিনোদ, উনি আমার সাম্‌নে লজ্জায় গান গাইতে পারছেন না! আমি যাই।"

স্বামী হো হো করে' হেসে বল্লেন, "লজ্জা কিহে! তোমার স্ত্রীর মত প্রভাকেও আমি লজ্জাবতী লতা করে' রাখি-নি, তাকে আমি নিজের মনের মত করে' গড়ে তুলেছি। লজ্জাকে প্রভা একটা দুর্ব্বলতা বলেই মনে করে।"

স্বামীর কথাগুলো আমার কানে অত্যন্ত বেসুরো লাগ্‌ছিল।

আগন্তুক বল্লেন, "উনি যদি লজ্জিত না-হয়েই থাকেন, তবে আমাকে দেখে গান বন্ধ কর্‌লেন কেন?"

—"প্রভা বোধহয় ভাব্‌ছে তুমি সমঝদার শ্রোতা নও! তা নয় গো, তা নয়, শুন্‌চ প্রভা? এ হচ্চে আমার বাল্যবন্ধু পুরন্দর, আমার মুখে এর কথা নিশ্চয়ই তুমি অনেকবার শুনেচ!"

আমি নমস্কার করে' বল্লুম, "বসুন পুরন্দরবাবু, দাঁড়িয়ে রৈলেন কেন?"

—"আপনার সঙ্গীত-সাধনাকে আমি বাধা দিতে ভয় পাচ্ছি। আপনি ফের গান সুরু না-কর্‌লে আমি ত আর নির্ভয় হ'তে পার্‌ব না!"

অগত্যা আমি আবার হারমোনিয়ামে সুর দিয়ে গান ধরলুম।

গান শেষ হ'লে স্বামী জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কেমন লাগ্‌ল পুরন্দর?"

পুরন্দরবাবু দুই চোখ বন্ধ করে' গান শুন্‌ছিলেন। স্বামীর কথায় চোখ খুলে বল্লেন, "আঃ! গানের সমস্ত মাধুর্য্য তোমার ঐ কর্কশ কণ্ঠস্বর একেবারে মাটি করে' দিলে!"

—"তা তো বুঝচি, কিন্তু প্রভার গান তোমার কেমন লাগল বল দেখি?"

—"চমৎকার! ওঁর গান শুন্‌লে বনের পশুও বশ মান্‌তে বাধ্য হবে!"

—"সত্যি?"

—"হ্যাঁ। এই দেখ না, আমার মত পাষণ্ডও ইতিমধ্যেই ওঁর একান্ত বশীভূত হয়ে পড়েচে।"

আমি বল্লুম, "পুরন্দরবাবু, গান গাইতে আমার লজ্জা হয় না, কিন্তু আমার সাম্‌নে বসেই কেউ যদি আমারি সম্বন্ধে এমন অত্যুক্তি করেন, তাহলে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়!"

পুরন্দরবাবু বল্লেন, "আপনি যদি ফের গান ধরেন,—তাহলে আমি অত্যুক্তি চুলোয় যাক্—সামান্য-উক্তি পর্য্যন্তও কর্‌ব না!—আমি যে আপনার বশীভূত হয়ে পড়েছি, তাহলে আপনি সেটা বিশ্বাস কর্‌বেন ত?"

স্বামী এতক্ষণ খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ তিনি মুখ তুলে বল্লেন, "এত-অল্পে বিকিয়ে যেও না পুরন্দর! প্রভা তাহলে ভাব্‌তে পারে, তুমি সস্তার মাল—খেলো জিনিষ!"

—"না বিনোদ, সস্তা মালের খদ্দের যে বেশী! আপনাকে আমি দুর্লভ করে' রাখতে চাই না! প্রথম ডাকেই যারা বিকিয়ে যেতে পারে, জগতে তাদের চেয়ে সুখী আর কে আছে?"

—"তারা সুখী হয়ে ভুল করে। সুলভের দিকে কেউ চেয়েও দেখে না—কারণ,

সকলের দৃষ্টি দুর্লভকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকে। দেখ, যে ঘাসকে আমরা দু-পায়ে থেঁৎলে যাই, সেই ঘাসের ভেতর থেকেও আদর করে দূর্ব্বাঘাস বেছে নিয়ে আমরা দেবপূজায় সমর্পণ করি। দুর্লভ বলেই দূর্ব্বার আদর।"

—"কিন্তু অতি-দুর্লভ নিন্দার পাত্র।"

—"প্রমাণ ?"

—"শৃগাল ও দ্রাক্ষালতার গল্প মনে কর।"

—"কিন্তু সে ত অক্ষম দুর্ব্বলের কান্না! দুর্ব্বলের স্তুতি-নিন্দা আমি গ্রাহ্য করি না!"

—"বিনোদ,দুর্ব্বলের পক্ষ থেকেও অনেক বল্‌বার কথা আছে। কিন্তু কথায় শুধু কথা বেড়ে যাচ্ছে, অতএব আজ আর আমি দুর্ব্বলের পক্ষ সমর্থন কর্‌ব না!"

—"হ্যাঁ, তার চেয়ে তুমি নিজের পক্ষ সমর্থন কর। প্রভাকে বুঝিয়ে দাও যে, সুলভ হ'লেও তুমি খেলো মাল নও!"

—"তোমার কথার মানে ?"

—"অর্থাৎ, তুমিও একটা গান গাও। তুমি যে ভালো গাইতে পারো, প্রভা বোধহয় তা জানে না!"

আমি খুসি হয়ে বল্লুম, "পুরন্দরবাবু গান গাইতে জানেন বুঝি ?"

পুরন্দরবাবু মুখ টিপে একটুখানি হেসে বল্লেন, "গান গাইতে আর কাঁদতে জানে না কে ? বৈষ্ণবরাও কীর্ত্তন করে, ছুঁচোও কীর্ত্তন করে; মানুষেও গান গায়, গাধাও সুবিধে পেলে ইতস্তত করে না!"

—"না প্রভা, ওর ও-কথা শুন না! পুরন্দর একজন রীতিমত ওস্তাদ!"

আমি পুরন্দরবাবুর সাম্‌নে গিয়ে বল্লুম, "আপনি দয়া করে' একটি গান শোনান্—নৈলে এই প্রথম পরিচয়ের দিনেই আপনার সঙ্গে আমি আড়ি করে' দেব!"

—"না, না, সুন্দরীর সঙ্গে আড়াআড়ি করে' আমি আমার জীবনকে অসুন্দর করে' তুল্‌তে চাই না! কোকিলের লতাকুঞ্জে ভেকের মকধ্বনি শুন্‌তে আপনার যখন এতই আগ্রহ, তখন আমারও আর আপত্তি কর্‌বার কিছু নেই!"

এই বলে পুরন্দরবাবু উঠে হারমোনিয়ামের সুমুখে গিয়ে বস্‌লেন।

তারপর তিনি যা গাইলেন, তা অপূর্ব্ব! তেমন গান জীবনে কখনো শুনি-নি, কণ্ঠস্বরের উপরে মানুষের যে এতটা দখল থাকতে পারে, এঁর গান না-শুন্‌লে আমি তা বিশ্বাস কর্‌তুম না! না-জেনে এঁর সাম্‌নেই এইমাত্র আমি গান গেয়েছি বলে' আমার এম্‌নি লজ্জা কর্‌তে লাগ্‌ল!

গান থাম্‌লে পর আমি খানিকক্ষণ অভিভূত হয়ে বসে রইলুম—সুরগুলো যেন ঢেউয়ের মত তখনো আমার কানের উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছিল!

স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন শুন্‌লে প্রভা ?"

আমি মুগ্ধ স্বরে বল্লুম, "যা শুন্‌লুম, তা আর কখনো শুনি-নি! এমন গলাকে উনি লুকিয়ে রাখ্‌তে চাইছিলেন!"

পুরন্দরবাবু বল্লেন, "আমাদের গলা অনেক শিক্ষায়, অনেক চেষ্টায় তৈরি,—মেয়েদের মত আমাদের গলার আওয়াজ অমন মিষ্টি, অমন স্বাভাবিক নয়—এই জন্যেই বোধহয় সঙ্গীতের

অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সিংহাসন পুরুষকে দেওয়া হয়-নি! ওস্তাদরা নজির দেখিয়ে যতই জাঁক করুন, আমার মতে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের কণ্ঠ ঢের-বেশী মধুর! তাইত আমি আপনার কাছে গান গাইতে চাইছিলুম না!"

আমি বল্লুম, "ও-সব বিনয়ের কথা এখন থাক্! আপনার পায়ের তলায় বসে সারা জন্ম ধরে' শিক্ষা কর্‌লেও অমন গান আমি গাইতে পার্‌ব না!"

স্বামী বল্লেন, "দেখ পুরন্দর, তুমি যদি প্রভাকে গান শেখাও, তাহলে বড় ভালো হয়।"

পুরন্দরবাবু সঙ্কুচিত স্বরে বল্লেন, "মাপ কর ভাই, আমার নিজের শিক্ষাই এখনো সম্পূর্ণ হয়-নি, শিক্ষকের আসনে বস্‌বার যোগ্যতা আমার নেই!"

আমি বল্লুম, "আপনার অসীম বিনয়কে ধন্যবাদ পুরন্দরবাবু! তার চেয়ে স্পষ্ট বলুন না কেন, আমাকে শিক্ষা দিতে আপনার আপত্তি আছে!"

—"আপত্তি! না, আপত্তি আবার কিসের?"

স্বামী বল্লেন, "ব্যস্, তাহলে এই কথাই পাকা হয়ে রৈল যে, কাল থেকে তুমি প্রভার সঙ্গীত-শিক্ষকের পদ গ্রহণ করবে?"

—"আমাকে জোর করে' গুরু করে' দেওয়া হোলো? এটা ভারি অন্যায় হোলো কিন্তু!"

এম্‌নি আর-দু-চারটে কথাবার্ত্তার পর পুরন্দরবাবু চলে গেলেন।

স্বামী আমাকে বল্লেন, "আমার বন্ধুটিকে কেমন লাগ্‌ল?"

—"বেশ। তোমার মত নীরস লোকের এমন সরস বন্ধু হোলো কি-করে'?"

—"শুধু সরস নয়, পুরন্দর কি সুন্দর পুরুষ দেখলে ত? বাঙালীর ঘরে অমন সুশ্রী চেহারা সহজে চোখে পড়ে না!"

—"শুনেচি উনি যেমন বিদ্বান তেমনি ধনবান। ভগবান দেখচি ওঁকে খুব সুখী করে' পৃথিবীতে পাঠিয়েচেন!"

"হাঁ, পুরন্দরকে তুমি যদি হঠাৎ ভালোবেসে ফেল, আমি তাতে আশ্চর্য্য হব না!"

—"কি বলচ? ছিঃ!"

—"বল্‌চি পুরন্দরকে তুমি ভালোবাস্‌লে আমি অশ্চর্য্যও হব না, দুঃখিতও হব না!"

বিস্মিত হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকালুম,—গম্ভীর হয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে, তিনি বসেছিলেন! উনি ঠাট্টা করছেন, না, আমার মন পরখ কর্‌ছেন?—কিছুই বুঝলুম না!

কিন্তু একটা বিষয় আমার নজর এড়ায়-নি। যতক্ষণ পুরন্দরবাবু এখানে ছিলেন, ততক্ষণ উনি যেন একেবারে নূতন মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন! ওঁর অমন প্রসন্ন মুখ, অমন খোলাখুলি ভাব, আমাকে গান শেখাবার জন্যে এত-বেশী আগ্রহ,—এ-সমস্তই আমার কেমন যেন খাপ্‌ছাড়া বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু পুরন্দরবাবু চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওঁর মুখ আবার যে-কে-সেই হয়ে দাঁড়াল,—এতক্ষণ উনি যেন একটা মুখোস পরে ছিলেন!

আমার মনটা ছাঁৎ-ছাঁৎ কর্‌তে লাগল। অস্বাভাবিক কিছু দেখ্‌লেই মানুষের প্রাণ

চঞ্চল হয়ে ওঠে! উনি কি মনে-মনে কিছু মৎলোব্ এঁটেছেন ?

আমার এই স্বামীটিকে আমি ভয় করি। সংসারের কোন মানুষই ওঁকে ভালো করে চিন্‌তে পারবে না—ওঁর চরিত্র ঠিক গোলোক-ধাঁধার মত; তার ভেতরে ঢুকতে গেলে নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌তে হয়। ওঁর ভাবভঙ্গি, কথাবার্ত্তা, মতামত সব অদ্ভুত। আর পাঁচজনে যে পথে চলে, প্রাণ গেলেও উনি সে পথে চল্‌বেন না। সকলের কাছে যেটা উল্টো, ওঁর কাছে সেইটে সোজা। এমন মানুষকে কেউ ভালোবাসতে চায়ও না—বাসতে গেলে পারেও না। আগাগোড়া যার ছন্দপতন, তাকে জীবনের সঙ্গী করা কত কঠিন!

এই-যে আজ যে কথাটা উনি আমাকে বল্লেন, স্ত্রীর মুখের উপরে আর-কোন স্বামী কি তা বল্‌তে পার্‌তেন? আশ্চর্য্য! স্ত্রী যদি সত্যি-সত্যিই পরপুরুষকে ভালোবাসে, স্বামী তাহলে দুঃখিত হবেন না! এমন কথা যে বল্‌তে পারে, নিশ্চয়ই তার বুকের ভিতরে মানুষের প্রাণ নেই!—কিন্তু এ কথাটা উনি কেন বল্লেন? আমি যা একবারও ভাবিনি, উনি তাই ভাবছেন কেন? পুরন্দরবাবু সুপুরুষ বলে' উনি কি ইঙ্গিতে আমাকে সাবধান করে' দিলেন?

স্বামীর মুখের দিকে আর একবার চেয়ে দেখলুম। তেম্‌নি গম্ভীর ভাবে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে', তখনো তিনি বসে আছেন।

একটা চড়ুইপাখীর উপরে লাফ মেরে পড়বার জন্যে একবার একটা বিড়াল ওৎ পেতে বসেছিল। সে-সময়ে বিড়ালটার চোখের ভাব আমি লক্ষ্য করেছিলুম।

মনে হ'ল, আমার স্বামীর চোখের ভাব অনেকটা সেই বিড়ালেরই মত!......

## পাঁচ

### ( পুরন্দরের কথা )

বিনোদের স্ত্রীটি বাস্তবিকই খুব শিক্ষিতা। লেখা-পড়া, গান-বাজনা, ছবি-আঁকা থেকে সুরু করে' ঘরকন্নার সমস্ত কাজ-কর্ম্মেই তার রীতিমত দখল আছে। লোকজনের সঙ্গে কথা-বার্ত্তাতেও তার পটুতা পুরুষের চেয়ে কম নয়। বাঙালীর ঘরের কুণো মেয়েদের মত অকারণ অশোভন লজ্জার ভারেও সে ভেঙে পড়ে না, তার ভাবভঙ্গিও যতদূর সচেতন হ'তে হয়! অর্থাৎ, 'পথে নারী বিবর্জিতা', —নারীজাতির পক্ষে অপমানকর এই প্রবাদ-বাক্যটি প্রভার সম্বন্ধে একেবারে খাটে না, জগতের বিপুল রাজপথে সে অনায়াসেই স্বামীর সহগামিনী হ'তে পার্‌বে।

এই মাস-তিনেকের মধ্যেই প্রভা আমার কাছে নিকট-আত্মীয়ের মত পরিচিত হয়ে পড়েছে। তাকে নাম ধরে না-ডাক্‌লে আমার ওপর সে রাগ করে, আর 'তুমি' ছেড়ে 'আপনি' বল্‌লে, সে ত আমার সঙ্গে কথা-কওয়াই বন্ধ করে' দিতে উদ্যত হয়!

রোজ সন্ধ্যার সময়ে তাকে গান শেখাতে যেতে হয়—এতে আর কামাই কর্‌বার যো নেই! সে নিজে অনেকরকম নূতন খাবার তৈরি কর্‌তে পারে, প্রায়ই আমাকে নিমন্ত্রণ করে' খাওয়ায়। আপত্তি কর্‌লে হেসে বলে, 'এ হচ্ছে আমার গুরুদক্ষিণা।'

কিন্তু প্রভার মনের ভিতরে কোথাও যেন খানিকটা ফাঁক্ আছে! হাসি-গল্পের মাঝখানে থেকে-থেকে সে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়ে, তার মুখখানি যেন কেমন ম্রিয়মান হয়ে আসে। চাঁদের উপর দিয়ে স্বচ্ছ হাল্কা মেঘ ভেসে গেলে যেমন দেখায়, প্রভাকেও তখন অনেকটা তেম্‌নিধারা দেখতে হয়। এর কারণ কিছু বুঝি না। প্রভা কি কোন গোপন দুঃখে কাতর হয়ে আছে? কিসের দুঃখ? মাঝে-মাঝে কথাটা তাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু পাছে আমার কৌতূহলকে সে অন্যায় ভেবে বসে, সেই ভয়ে জিজ্ঞাসা করতেও পারি না।

এদিকে শ্রী কিন্তু ভারি বেঁকে বসেছে। প্রভার সঙ্গে আমি মেলা-মেশা করি, এতেই তার এত রাগ! সে যখন-তখন এসে বলে, "অতবড় ধেড়ে মেয়েকে তুমি গান শেখাবে কেন?"

—"কেনই-বা শেখাব না, আগে তুমি তার কারণ দেখাও।"

—"আমার ভয় করে।"

—"ভয়। ভয় আবার কিসের? প্রভা কি আমাকে খেয়ে ফেল্‌বে?"

—"খেয়ে ফেল্‌তে পারে। ভালো জিনিষ সকলেই খেতে চায়।"

—"শ্রী, চিরকালই কি তোমার এক-রকমে যাবে? খালি স্বামীকে সন্দেহ! ছিঃ।"

—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, হ'তে যদি মেয়েমানুষ, আর বিয়ে করতে যদি তোমারি মত দুষ্ট একটি পুরুষকে, তাহলে টের পেতে মজাটা! হে মা কালি, হে মা দুর্গা! আস্‌চে-জন্মে আমার এই স্বামীটি খুব যেন কালো-কুৎসিত হন!"

—"তাতে তোমার লাভ-লোকসান কি? আস্‌চে জন্মে তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে দেখা ত আর হবে না?"

শ্রী আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে, "ইস্, দেখা হবে না বৈকি। জন্মে-জন্মে তুমিই আমার স্বামী, জন্মে-জন্মে তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে দেখা হতেই হবে। আর, তখন যদি তুমি বেশ কালো-কুৎসিতটি হও, তাহলে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচব। তুমি ছাই-দেখতে হ'লে পোড়ারমুখীরা আর তোমার ওপরে নজর দেবে না।"

—"যে বেচারীদের তুমি পোড়ারমুখী বল্‌চ, তুমি নিজে যে আমার ওপরে তাদের চাইতে ঢের-বেশী নজর দিচ্ছ শ্রী। মাঝে-মাঝে দয়া করে' আমাকে তোমার নজরের আড়ালে যেতে দিও, নৈলে প্রাণ ত আর বাঁচে না। এক-একজন মেয়ের যেমন শুচিবাই থাকে, তোমার এই সন্দেহটাও ঠিক তেম্‌নি করে' তোমাকে পেয়ে বসেচে, এ বাই আর সার্‌বে না দেখচি।"

শ্রী কাঁদো-কাঁদো হয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, "বেশ, বেশ, যত দোষ আমার,—তুমি ভারি লক্ষ্মীটি কিনা, কিছু জান না। এই যে ও-বাড়ীতে বিনোদবাবুর বৌ এসেচে, দুদিন আগে যাকে তুমি চিন্‌তেই না, আজ তুমি তার সঙ্গেই দিন-রাত বসে বসে গল্প কর্‌চ, গান গাইচ,—এটা দেখতে শুন্‌তে কি-রকম বল দেখি? সন্দেহ কি সাধে হয়? তার চেয়ে আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, চোখের ওপরে এ-সব আমি দেখতে পার্‌ব না!"

—"বেশ ত, তোমার যদি বাপের বাড়ীতে যেতে এতই ইচ্ছে হয়ে থাকে, তবে দু-দিন না-হয় সেখানে বেড়িয়েই এস না। আমার তাতে আপত্তি নেই।"

"—ও, বুঝেচি! আমি বাপের বাড়ী গেলে তোমার খুব সুবিধে হয়,—না? মনের সাধে যা-খুসি করে' বেড়াতে পার? হ্যাঁ, বাপের বাড়ীতে যাচ্ছি বৈকি, কখ্খনো ত যাব না, আমি এইখানেই জোঁকের মত মাটি কাম্ড়ে পড়ে থাক্‌ব—সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো!"—

—"আচ্ছা শ্রী, এই যে আজকাল বিনোদ রোজ আমাদের বাড়ীতে আস্‌চে, তুমিও ত একলা তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও, কৈ, আমি ত সেজন্যে তোমাকে কিছু বলি না! তবে আমার পেছনে তুমি লাগো কেন?"

—"তুমি বল্‌বে কোন্ মুখে? বিনোদবাবুর সঙ্গে আমাকে কথা কওয়ালে কে মশাই? সে ত তুমিই! একটা লোক যদি রোজ বাড়ীর ভেতরে এসে আমার সাম্‌নে তীর্থের কাকের মত বসে থাকে, আমার হাতের রান্না খাবে বলে' খোকার মত আব্‌দার করে, আমাকে বৌদিদি বলে' ডাকে, আমার অসুখের সময়ে প্রাণ দিয়ে চিকিৎসা করে, তাহলে তার সঙ্গে কথা না-কয়ে আর করব কি? ধরেভদ্রে নিজেই যা ঘটিয়েচ, তার জন্যে আবার আমাকে দোষ দিতে লজ্জা করবে না তোমার?"

—"না শ্রী না, তোমাকে আমি দোষ দেব কেন? কথা কও, বেশ কর। আমি ত এই চাই!"

—"যা হয়েচে তা হয়েচে! তা-বলে তুমি ভেবনা যেন তোমার সমস্ত বন্ধুর পল্টনটি এসে যখন আমাকে আক্রমণ করবে, আমি তখন রণে ভঙ্গ দেব না! না, আর কারুর সঙ্গে আমি কথা কইব না!"—এই বলে' শ্রী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাস্তবিক, বিনোদের বাহাদুরি আছে! শ্রীকে সে কথা কইয়ে তবে ছেড়েছে! আমি ভেবেছিলুম শ্রীর লজ্জা দূর করা অসম্ভব। কিন্তু সেই অসম্ভবকে সে সম্ভব করেছে।

আর, শ্রীর অসুখের সময়ে সে যে-রকম করে' খেটেছে, তা আর বল্‌বার নয়। অসুখটা খুবই শক্ত হয়ে উঠেছিল, বিনোদের চিকিৎসা আর শুশ্রূষার গুণেই সেটা আর বেশী সাংঘাতিক হ'তে পারে-নি। ডাক্তারীতে বিনোদের মাথা আছে।

বিনোদের অন্য-কোন দোষ আমি দেখ্‌তে পাই না, কিন্তু মাঝে-মাঝে সে যে-সব উদ্ভট মতপ্রকাশ করে, সেগুলোতে আমার পক্ষে সায় দেওয়া ভারি শক্ত। সব-তাতেই ও যে অসাধারণ হ'তে চায়, ঐটে ওর মহা দোষ। পৃথিবীর সমস্ত ব্যাপারেই সীমা বলে একটা কিছু আছে, বিনোদ সেই সীমাকে মানে না।

এই সেদিন সকালে চা খেতে-খেতে আমি খবরের কাগজ পড়ছিলুম। একটা লোক বিষয়ের লোভে একসঙ্গে দুটি নরহত্যা করেছে। বিনোদ আমার সাম্‌নেই বসেছিল। খবরটা তাকে শুনিয়ে বল্লুম, "লোকটা কি পাষণ্ড দেখেচ!"

বিনোদ খানিকক্ষণ কিছুই বল্‌লে না। তারপর কয়েক চুমুকে চায়ের পেয়ালাটি নিঃশেষ করে বল্‌লে, "খুনীকে তুমি নিষ্ঠুর ছাড়া আর কিছু বলতে রাজি নও?"

—"নিশ্চয়ই নই।"

—"আমি কিন্তু খুনীকে বুদ্ধিমান বল্‌ব, যদি সে খুনের কোন সঙ্গত কারণ দেখাতে পারে।"

—"সঙ্গত কারণ মানে?"

—"ধর, কেউ যদি আত্মরক্ষার জন্যে খুন কর্‌তে বাধ্য হয়, তুমি তাকে কি বল্‌বে?"

—"আত্মরক্ষার জন্যে বাধ্য হয়ে হত্যা করা, আর বিষয়ের লোভে স্বেচ্ছায় হত্যা করা, এক কথা নয়।"

—"বিষয়ের লোভে হত্যা করাও আত্মরক্ষা হ'তে পারে। যে-লোকটা দুটো খুন করেচে বল্‌চ, সেও হয়ত খেতে না পেয়ে মর-মর হয়েছিল। নিজে বাঁচবার জন্যেই সে খুন করেচে।"

—"আচ্ছা, আমি না হয় তোমার মতই সমর্থন কর্‌লুম। কিন্তু তাহলেও দেখচি, এ লোকটা নিজে বাঁচবার জন্যে আরো দু-জন লোককে বাঁচবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করলে। এখানে ত তোমার যুক্তি খাট্‌চে না!"

—"অযোগ্য, দুর্ব্বল জীবন-সংগ্রামে বাঁচতে পারে না—এটা যে বিশ্বের ধারা! এখানে হত্যাকারী হত্যা করে' আত্মরক্ষা করেচে, আর হত লোকদুটি অযোগ্য বলে' আত্মরক্ষায় অক্ষম হয়ে যোগ্যতমের পথ থেকে সরে' গেছে।"

—"কিন্তু হত্যার দ্বারা আত্মরক্ষা করে' সবাই যদি স্বার্থরক্ষা কর্‌তে চায়, তাহলে সভ্য সমাজ বল্‌তে কসাইখানা ছাড়া আর-কিছু বোঝাবে না।"

—"পুরন্দর, সভ্য সমাজে কি চোখের উপরে নিয়তই নরহত্যা আর দুর্ব্বল-দলন চল্‌চে না? ছোট করে' দেখ্‌লে সব জিনিষই ছোট দেখায়। কিন্তু 'ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস' দিয়ে যাকেই তুমি বড় করে' দেখ্‌বে, দেখতে পাবে ভিতরে-ভিতরে তার কত অদেখা ব্যাপার লুকনো আছে! পৃথিবীতে যতরকমে যত লোক ধনী হয়েচে, তাদের লক্ষ-লক্ষ টাকা কি লক্ষ লক্ষ গরিব দুর্ব্বল লোকের দীর্ঘশ্বাস জমাট্ করে' তৈরি নয়? তাদের অধীনে কত কুলি-মজুর, কত কেরাণী, কত লোকজন যৎসামান্য মাহিনায়, পয়সার অভাবে অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করে' রোগে-ভুগে উচিতমত সাহায্য না-পেয়ে, দিনে দিনে তিলে তিলে বুকের রক্ত দিয়ে খেটে-খেটে, ক্রমেই কি অকাল-মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চল্‌চে না? লক্ষপতির নিশ্চিন্ত দৃষ্টির সাম্‌নেই, পথের ধূলায়, তাঁর বাড়ীর ছায়ায় শুয়ে, রোগজীর্ণ অনাহার-শীর্ণ ভিখারী যখন অসহায় মৃত্যু-যন্ত্রণায় অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তখন কি তুমি তাকে হত্যাকারী বল্‌বে না? বিচারক যখন চোরকে পাঁচবৎসরের জন্যে কারাবাসের হুকুম দেন, আর চোরের মাতৃহীন শিশু পুত্র-কন্যারা না-খেয়ে একে-একে মর্‌তে থাকে, তখন কি নরহত্যা করা হয় না? ডাক্তার যখন ভিজিটের টাকা পাবেন না বলে সাংঘাতিক পীড়ায় শয্যাগত গরিব রোগীর চিকিৎসা-ভার গ্রহণ করেন না, তখন তুমি তাকে খুনী ছাড়া আর-কিছু বল্‌তে পার কি? এই যে তোমার-আমার উদর-পূর্ত্তির জন্যে নিত্য মৎস্য-মাংসের প্রয়োজন হচ্চে, এও কি হত্যার ফলে নয়? ধনী, দরিদ্র, মানুষ, পশু—সকলের মধ্যেই ত

একই প্রাণের ধারা বয়ে চলেচে! বাঁচ্‌বার আনন্দের কথাই যদি বল, তাহলে কারুকেই আমরা সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত কর্‌তে পারি না!"

—"বিনোদ, একটা সামান্য খুনীর কথা থেকে এত-বড় একটা দার্শনিক সমস্যা আনা তিলকে তাল করা মাত্র।"

—"না, তোমার ঐ হত্যাকারীকে আমি সামান্য লোক মনে করি না! তোমাদের সকলকার মত ও-লোকটি একই স্রোতে গা-ভাসান্ দেয়-নি, ও স্রোতের বিরুদ্ধে নূতন একপথে যেতে চেয়েছিল,—ওকে আমি অসামান্য বলি, ওকে আমি শ্রদ্ধা করি।"

—"তুমি যদি বিচারক হ'তে, তাহলে ওর কি ব্যবস্থা করতে?"

—"বেকসুর খালাস। আমি শাস্তি দিতুম তাদের, খুনের যারা কোন কারণ দেখাতে পার্‌ত না।"

—"বিনোদ, তুমি ভয়ানক লোক!"

—"না, আমি অসাধারণ লোক! কারণ, আমার স্বার্থে যদি কেউ বাধা দেয়, আমি নিজে তাহলে তাকে খুন কর্‌তে পিছপাও হব না!"

বিনোদের মাথায় নিশ্চয় পাগলামির ছিট্ আছে। নইলে এমন কথাও বলে!

ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

---

# গান

মিশ্র যোগিয়া—ঝাঁপতাল।

তোরা কাঁদিস্ সখি নয়ন-জলে;
আমি কাঁদি মোর আঁখি লোর বহেনা ব'লে!
তোরা কাঁদিস্ সখি মিলন চাহি,
আমি কাঁদি হায় তোদের প্রায় বিরহ নাহি!
তোরা কাঁদিস্ ধরি বাসনা বুকে,
আমার সাধ নাই কাঁদি তাই গভীর দুখে।
তোরা কাঁদিস্ রহি ডুবিয়া প্রেমে,
আবেগে বহে চির প্রেম নীর নাহিক থেমে।
আমি কাঁদি কেন নাহি যে হেন ভালবাসা,—
গেছে গীতি, প্রীতি, স্মৃতি, আশা তৃষা—
গিয়াছে চলে সবি—হায় গিয়াছে চলে।

রচনা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

# স্বরলিপি

```
II সা রা । গা পা –া । পধা –নর্সা । –নধা –পা –া I গা রগা ।
   তো রা কাঁ দিস্ ০ স খি ০ ০ ০ ন য়

। সরা –গা রা । সা –া । –া –া –া I পা ধা । র্সা নর্সা –র্রগা ।
   ন ০ জ লে ০ ০ ০ ০ আ মি কাঁ দি ০

। র্রা –র্সা । –া –া নধা I পা ধা । ধর্সা র্সা র্সা । সর্রা র্সা ।
   মো ০ ০ ০ ০র্ আ মি কাঁ দি মোর আঁ খি

। সর্রর্সা –নধা –পা I পা পা । পধা –ণা ধা । পা –া । –া –া –মগা I
   লো ০ র্ ব হে না ০ ব লে ০ ০ ০ ০

I রগা গরা । সরা –গা রা । সা –া । –া –া –া II পা পধা ।
   ব হে না ০ ব লে ০ ০ ০ ০ তো রা

। মা পা ধা । র্সা –নর্সর্রা । –র্সা –া –া I সা র্রা । র্রা সর্রা –র্গা ।
   কাঁ দিস্ স খি ০ ০ ০ ০ মি ল ন চা ০

। র্গর্মা –র্রা । –র্সা –নর্সা –ধা I পা পধা । মা পা ধা । র্সনা –র্রনা ।
   হি ০ ০ ০ ০ তো রা কাঁ দিস্ স খি ০

। –র্সা –া –া I র্সা র্রা । সর্রা –র্গা র্গা । র্গর্মা –র্রা । –র্সা –া –া I
   ০ ০ ০ মি ল ন ০ চা হি ০ ০ ০ ০

I পা দা । দা দা পদা । –ণদা –পা । –া –া –া I { পা ধা ।
   আ মি কাঁ দি হা ০ ০ ০ ০ য় { আ মি

। ধর্সা র্সা সর্রর্সা । না র্সনা । ধা ধনধা –পা I } পনা না । ধনা –া ধা ।
   কাঁ দি হায় তো দে র প্রা য় } বি র হ ০ না

। পা –া । –া –া –মগা I রগা গরা । সরা –গা রা । সা –া । –া –া –া II
   হি ০ ০ ০ ০ বি র হ ০ না হি ০ ০ ০ ০
```

II { রগা –া । গা –া গা । গপা হ্মপা । গা –া গা I রগা রা ।
{ তো ০ রা ০ কাঁ দি স্ ধ ০ রি বা স

। গহ্মা –পধা পহ্মপা । গা –রগরা । (–সা –া –রা) I } সা –া সা I
না ০ বু কে ০ ( ০ ০ ০ ) } আ ০ মার

I সা –ধা । ধা –া –নধা । পা ধা । ধর্সা –া র্সা I পধা –র্সনা ।
সা ধ্ না ০ ই কাঁ দি তা ই গ ভী ০

। –র্রর্সা না ধা । পা –হ্মপা । –গরা –গরা –সা I { পা –ধপা ।
০ র দু খে ০ ০ ০ ০ { তো ০

। মা –পা ধা । ধর্সা –নর্সর্রা । র্সা র্সা –া I র্সা র্রা । র্সর্রা –র্গা র্গা ।
রা ০ কাঁ দি স্ র হি ০ ডু বি য়া ০ প্রে

। র্গর্মা –র্রা । (–র্সা –নর্সা –ধা) I } –র্সা –া র্সা I { পা ধা । ধর্সা র্সা র্সর্রা ।
মে ০ ( ০ ০ ০ ) } ০ ০ আ { বে গে ব হে চি

। র্সা না । ধা ধনধা পা I } গা গরা । সরা –গা রা । সা –া ।
র প্রে ম নী র } না হি ক ০ থে মে ০

। –া –া –রা I { গা –া । রগা –া গা । গপা –হ্মপা । গা গা গমা I
০ ০ ০ { আ ০ মি ০ কাঁ দি ০ কে ন না

। রগা রা । গা –ধা পা । গা গা । রসা –া সরা I } সা সধা ।
হি যে হে ০ ন ভা ল বা ০ সা } গে ছে

। ধা –া ধণা । পা ধা । ধর্সা –া র্সা I নর্সা –র্রর্গা । র্রা র্সা –া ।
গী ০ তি প্রী তি স্মৃ ০ তি আ শা তৃ ষা ০

। –নর্সা –নধা । –নাঃ –ধঃ –পা I পা পা । পধা –ণা ধা । পা –া ।
হা ০ ০ ০ র গি য়া ছে ০ চ লে ০

। ধপা মা –মগা I রগা গরা । সরা –গা রা । সা –া । –া –া –া II
স ০ বি গি য়া ছে ০ চ লে ০ ০ ০ ০

# গল্পের শেষ

শরতের আকাশ স্বচ্ছ নীল সুনির্ম্মল। সোনালি রৌদ্রে গাছের পাতা ঝিকমিক করছে। ক্ষণে ক্ষণে পত্রান্তরাল থেকে দু' চারটে পাখীর কুজনধ্বনি শোনা যাচ্ছে। চারিদিকে কেমন এক স্নিগ্ধ শান্তি। বেলা তখনো অধিক হয়নি। বার্চ হিলের উপরে একটি বেঞ্চে একটি বাঙালী মেয়ে বসে' বই পড়ছেন। মেয়েটি ভারি সুন্দরী, উদ্ভিন্ন-যৌবনা। তিনি যে আধুনিকী এবং শিক্ষিতা তা তাঁর বেশভূষার অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছন্নতায় বেশ বোঝা যায়।

অদূরে আর একটি বেঞ্চে একটি বাঙালী ছেলে বসে'! ফিটফাট পরিচ্ছন্ন ইংরেজি পোষাক পরা। তার কোলের উপর একখানা বই, তবে তার দৃষ্টি বইয়ের উপর নেই—মেয়েটির উপর নিবদ্ধ। তার রং কালো, চেহারা সাদাসিদে।

অপরেশ কদিন থেকেই বাঙালী মেয়েটিকে দেখছে। হোটেলে ব্রেকফাষ্ট করে' সে এসে প্রতিদিনই ছাখে, মেয়েটি সেই নির্দ্দিষ্ট বেঞ্চে বসে' হয় একখানা মাসিক-পত্র নয় একখানা বই নিয়ে পড়ছে। মেয়েটিকে দেখে পর্য্যন্ত তার সঙ্গে পরিচয় করবার জন্যে তার মনটা ভারি উৎসুক হয়ে আছে। কিন্তু কোন্ সূত্রে পরিচয় করে!

সে দিন সে মরিয়া হয়ে উঠে ভাবছিল, আজ যেমন করেই হোক ওর সঙ্গে পরিচয় করতে হবে। কিছুক্ষণ বেঞ্চের উপর বসে' তারপর সে উঠে মেয়েটির সামনে পায়চারি করতে লাগল। এমনি বারকতক ঘোরবার পর হঠাৎ মেয়েটি যেই চোখ তুলে চেয়েছে অমনি সে তাকে একটি ছোট্ট নমস্কার করে' ফেল্লে। অপরেশের মনে হল, মেয়েটির ঠোঁটের কোণে ঈষৎ যেন একটু হাসির রেখা ছাখা দিল এবং সে যেন একটুখানি মাথাটা নত করলে। নমস্কারটা করে' ফেলে অপরেশের এমনি লজ্জা হতে লাগল যে তার মুখখানা কালো না হয়ে সাদা হলে নিশ্চয়ই লাল হয়ে উঠতো। মেয়েটির দিকে সে আর চাইতে পারলে না, তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নেমে হোটেল-মুখে রওনা হল। পথে মনে হল মেয়েটি তার সম্বন্ধে কি ভাবলে কে জানে! নিজের উপর তার অত্যন্ত রাগ হতে লাগল—সে একটা-কিছু বল্লে না কেন! পুরুষমানুষের এত লজ্জা হলে চলে! ইত্যাদি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে পরের দিন ছাখা হলে নিশ্চয়ই কিছু একটা বলবে।

সেদিন অপরেশ সারারাত মেয়েটিকে স্বপ্নে দেখলে। বারবার মেয়েটি যেন কত বিচিত্র মোহন বেশে তার কাছাকাছি আসছে আর সে শত চেষ্টাতেও কিছুতেই তার নাগাল পাচ্ছে না! কত রকমের যে বাধা-বিপত্তি ঘটছে তার আর অন্ত নেই! কতবার যেন কত কথা বলতে যাচ্ছে কিন্তু বলবার সময় আর মুখ ফুটছে না। পরদিন প্রভাতে মেয়েটিকে ছাখবার জন্যে তার মনটা এমনি চঞ্চল ও ব্যাকুল হয়ে উঠল যে ব্রেক্‌-ফাষ্টের কোর্শগুলোকে অত্যন্ত বেয়াড়া এবং

অনাবশ্যক দীর্ঘ মনে হতে লাগ্‌ল। কোনো গতিকে এক পেয়ালা চা আর খান দুই টোষ্ট উদরস্থ করে' চেয়ার ঠেলে সে উঠে পড়্‌ল।

বার্চ হিলে উঠে সে সোজা মেয়েটির বেঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল। বোধ হয় কিছু দ্রুতগতিই গিয়েছিল বা তার মুখের ভাবে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেছিল; কারণ মেয়েটি তার দিকে বিস্মিতভাবে চাইতে লাগ্‌ল। মেয়েটির সঙ্গে চোখোচোখি হতেই অপরেশ যে কি বল্‌বে বা কর্‌বে ভেবে পেলে না। তাড়াতাড়ি বলে' ফেল্লে—আজ বড় ঠাণ্ডা, না? মেয়েটি একটু মুচকে হাস্‌লে—এবারে নিঃসন্দেহ—সেই হাসিতে তার গোলাপী গালদুটির মাঝখানটি টোল খেয়ে গেল—সে বল্লে—হ্যাঁ, বেশ ঠাণ্ডা। এ সব ঘট্‌তে বিলম্ব হল না, চক্ষের নিমেষে সব ঘটে গেল। অপরেশ আর কথা খুঁজে পেলে না। সেই হাসি দেখে আর সেই কণ্ঠস্বর শুনে তার বুকের ভিতরটা দুরদুর কর্‌তে লাগ্‌ল। সে আর না দাঁড়িয়ে একেবারে পাহাড় থেকে নেমে গেল।

প্রথমে তার মনে একটু আনন্দ হল—যাক্‌, কথাটা কওয়া গেছে! তারপর ভাবলে আর কিছু বল্লে হোত!

অপরেশ বরাবরই লাজুক-প্রকৃতির—সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে কথা কইতে গেলেই কি জানি কেন তার জিব জড়িয়ে যায়, স্বর বন্ধ হয়ে আসে, বুকের ভিতরটা কেমন-যেন করে। যাহোক সেদিন সে মনে মনে স্থির করলে পরদিন বেশ করে' বাক্যালাপ জমাতে হবে! অত ভয় পেলে কি চলে! কথায় আছে, None but the brave deserves the fair!

অপরেশ ধনীর সন্তান; কয়েক বৎসর থেকে বাংলা সাহিত্যের আসরে নেমেছে। তার লেখা ছোট গল্প আজকাল ভালো বাংলা মাসিকের পৃষ্ঠায় প্রায়ই চোখে পড়ে। তবে সে রীতিমত Love story এখনো লেখেনি। কারণ তার মনে হয়, ও বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে গল্প failure হবেই। মন-গড়া প্রেমের গল্প একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। তার গল্পে একটু আধটু ভালোবাসার ছিটেফোঁটা মাত্র থাকে, ব্যস্‌।

পরদিন অপরেশ যথাস্থানে গিয়ে ছাখে, মেয়েটি মাথা হেঁট করে গাঢ় অভিনিবেশের সহিত কি একটা পড়ছে। সে একটু দাঁড়িয়ে ভেবে নিলে, তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে মেয়েটির অলক্ষ্যে তার বেঞ্চের ঠিক পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। যা দেখলে তাতে তার মুখ সহসা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল। মেয়েটি আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে তারি লেখা গল্প পড়ছে। এইতো আলাপের সুযোগ হয়েছে! ঐ লেখা নিয়েই আলাপ সুরু করা যেতে পারে!

অপরেশ বল্লে—নমস্কার! আপনি তো খুব পড়েন।

মেয়েটি সহসা চমকে উঠ্‌ল, তারপর ঈষৎ লজ্জিত হাসি হেসে বল্লে—আপনি বুঝি কম পড়েন!

অপরেশ বল্লে—আপনি অপরেশ মুখুজ্যের লেখা পছন্দ করেন?

মেয়েটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল, সে বল্লে—ওঁর গল্প আমার ভারি ভালো লাগে।

চমৎকার লেখেন। আপনার ভালো লাগে না?

অপরেশ কি জবাব দেবে সহসা ঠিক করতে না পেরে বল্লে—কি করে' বলি? বিশেষ এমন কি!

মেয়েটির মুখ লাল হয়ে উঠল। অপরেশ ভাবলে কথাটা বেফাঁশ হ'য়ে গেছে। এখনি সেরে ফেলা চাই। তাড়াতাড়ি বল্লে—তবে কিনা ভালো লাগা না লাগা ব্যক্তিবিশেষের রুচির উপর নির্ভর করে।

মেয়েটি একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বল্লে—আমার রুচির উপর তাহলে আপনার বিশেষ শ্রদ্ধা নেই!

অপরেশ তাড়াতাড়ি ত্রুটি সারবার জন্যে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় দেখলে, পাহাড়ের অপর দিক দিয়ে তার পরিচিত পূর্ণ সেন উঠে আসছে। মাটি করেচে! তার ইচ্ছে হল, পূর্ণটাকে শূলে ছায় বা অমনি-ধারা একটা কিছু করে। মেয়েটিকে তাড়াতাড়ি একটা নমস্কার করে' সে সরে' গেল।

পূর্ণ দূর থেকে তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল—কি হে ভায়া অপরেশ! কেমন আছ? তোমার যে আজকাল টিকি দ্যাখবার জো নেই। থাক কোথায়? ব্যাপার কি?

অপরেশ তার নিকটে গিয়ে তাকে টানতে টানতে নিয়ে যেতে যেতে বল্লে—সব বলছি। তারপর তুমি আছ কেমন, বলো?

পূর্ণ সে কথার উত্তর না দিয়ে বল্লে—হ্যাঁহে বেঞ্চের উপর দিব্যি খাসা মেয়েটি বসে' আছে তো! কে হে?

অপরেশ যথেষ্ট তাচ্ছল্যের স্বরে বল্লে—কে জানে!

সেদিন রাত্রে আহারাদির পর অপরেশ যতই সকালবেলাকার কথা ভাবছিল ততই মনে হচ্ছিল সে তার আশা-ভরসার মূলে স্বহস্তে কুঠারাঘাত করেছে। তার Positionটা কি ছাই শোধরাবার চেষ্টাও করতে পারলে! Psychological momentএ পূর্ণ হতভাগাটা এসে—কি হে অপরেশ! আরে, অপরেশ তো আর পালায়নি! অত যদি দরদ, হোটেলে দ্যাখা করতে পারিস্ নি! ভাবনার ধারা যখন উধাও হয়ে চলেছে তখন হঠাৎ একটা কথা মনে পড়াতে অপরেশের মন থেকে আশার ক্ষীণ রেখাটুকুও অন্তর্হিত হল। সেদিন সকালে সে মেয়েটির আঙুলে যা দেখেছে তাতে সে যে আশার অতীত তাতে আর সন্দেহ নেই। Engagement যখন হয়ে গেছে তখন আর বাকী রৈল কি!

বকাণ্ড-প্রত্যাশী হ'য়ে লাভ নেই জেনে হপ্তাখানেক অপরেশ আর ও-মুখো হয়নি। সেদিন কিন্তু মেঘলা দিনে মনটা বড় উতলা হয়ে উঠল। ঘরে টেঁকা দায় হল। তাই সে আবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাহাড়ে উঠল তারপর চারিদিকটা একবার চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখে নিলে। হায়! যা দেখতে চাইলে, তা কৈ! সব শূন্য! অবসন্ন দেহে নির্জ্জীবের মত সে একটা বেঞ্চে বসে' পড়ে' অচিরে ভাবনার অতলে তলিয়ে গেল। কতক্ষণ কেটে গেছে জানে না, সহসা কার কণ্ঠস্বরে ভারি চমকে উঠল। মুখ তুলে ছাখে, সেই মেয়েটি, একেবারে তার সামনে

দাঁড়িয়ে বল্‌ছে—কি, এতদিন আসেন নি যে?

অপরেশ প্রথমটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল। 'ভাগ্য নামে অতিবর্ষাসম'! এ যে বিশ্বাস করা যায় না! সামলে নিয়ে সে শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—বসুন, বসুন। মেয়েটি বল্লে—বস্‌ছি। কিছুক্ষণ এ'কথা সে'কথার পর সে বল্লে—দেখুন, কিছু মনে যদি না করেন তো আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস কর্‌তে চাই। অপরেশকে তখনো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্নিগ্ধভাবে বল্লে—বসুন। দাঁড়িয়ে থাকবেন না কি?

অপরেশের সর্ব্বাঙ্গ তখন রিমঝিম করছে। সে মেয়েটির পাশে বস্‌ল।

মেয়েটি তখন বল্লে—আচ্ছা, আপনি কি মুখুজ্যে?

অপরেশ সহসা এ প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝতে পারলে না। বল্লে—হ্যাঁ, কেন বলুন দেখি?

মেয়েটির মুখ ঈষৎ রক্তিম হ'য়ে উঠ্‌ল। সে বল্লে—সত্যি করে' বল্‌বেন কিন্তু, কিছু গোপন করবেন না। আচ্ছা, আপনার নাম কি অপরেশ?

—হ্যাঁ।

—সত্যি? তাহলে আপনিই লেখক অপরেশ মুখুজ্যে, কেমন?

অপরেশ প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। প্রথমটা বল্লে—হ্যাঁ, তারপরেই বল্লে—না। তারপর হুড়হুড় করে' বলে' ফেল্লে—ঐ যাচ্ছেতাই রাবিশ গল্পগুলো আমিই লিখি বটে, আপনি যদি তাই জানতে চান—

—হ্যাঁ সেই লোকটির কথাই জিজ্ঞেস করছি। রাবিশ গল্প নয়, গল্পগুলো চমৎকার।

অপরেশ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

মেয়েটি বল্লে—চমৎকার গল্প! ভারি সুন্দর! আপনি কি বলেন?

অপরেশ ঘাড় নেড়ে বল্লে—তাহলে চমৎকার বইকি—বলে' দুজনেই হেসে ফেল্লে।

মেয়েটি বল্‌তে লাগ্‌ল—এ কথাটা হঠাৎ কালকে আমার মনে হল। আপনার বন্ধু আপনাকে অপরেশ বলে' ডাকছিলেন। তারপর সেদিন যখন গল্পগুলো সম্বন্ধে আপনার মত জিজ্ঞেস করছিলুম আপনার সেদিনকার মুখের ভাব দেখে কেমন সন্দেহ হয়েছিল।

অপরেশ অনুতপ্ত স্বরে বল্লে—সেদিন বড় অভব্যতা করেছি, আমায় ক্ষমা কর্‌বেন।

মেয়েটি বল্লে—না না অভব্যতা আবার কি! আপনি তো যথেষ্ট বিনয় প্রকাশই করেছিলেন। আমি মনে মনে স্থির করলুম 'আমি ওঁকে জিজ্ঞেস কর্‌ব, ওঁর পদবী মুখুজ্যে কি না, যদি বলেন হ্যাঁ, তাহলে তো না হয়ে যান্ না।'

অপরেশ স্মিতহাস্যে বল্লে—"আপনি ভালো ডিটেকটিভ হতে পারবেন, দেখ্‌ছি।"

—আর ঠাট্টায় কাজ নেই।

ক্ষণকাল থেমে মেয়েটি আগ্রহ ও পুলক-ভরা কণ্ঠে বল্‌তে লাগ্‌ল, গল্প লিখতে পারা কি চমৎকার! আচ্ছা অপরেশ বাবু, বলুন না, গল্প লিখতে আরম্ভ করেন কি করে'?

এমন লোককে শ্রোতা পেয়ে লাজুক মিতভাষী অপরেশও ক্ষণকালের মধ্যে মুখর হয়ে উঠ্‌ল। গল্প কেমন করে' মনে আসে, কেমন করে' তার পত্তন কর্‌তে হয়, গল্প কেমন করে' ধীরে ধীরে গ'ড়ে' ওঠে সমস্তই সে যথাসাধ্য বোঝাতে লাগ্‌ল। অবশেষে

স্বীকার করলে রীতিমত প্রেমের গল্প লিখতে সে অক্ষম। 'কারণ', সে বল্লে, সে 'ভালোবাসায় পড়লে কেমনধারা মনে হয় তাই আমি জানি না।'

মেয়েটি সংশয়ান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—সত্যি বলছেন?

অপরেশ তার অঙ্গুরীয়ের প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' বল্লে—আপনার কথা অবশ্য আলাদা।

মেয়েটির মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল, গালের উপর আবার টোল খেয়ে গেল। সে কিছুই বল্লে না দেখে অপরেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে অন্য কথা এনে ফেল্লে।

সেদিন অপরেশ যখন হোটেলে ফির্‌ল তখন তার মনে ভারি একটি স্নিগ্ধ পরিতৃপ্তি। মেয়েটিকে তার বড় ভালো লাগে! এমন সপ্রতিভ! একটুও কুণ্ঠা নেই! অথচ তার বাক্যে এবং ব্যবহারে এমন একটি স্নিগ্ধ সরস ভব্যতা! তার সঙ্গে কথা কয়ে সুখ আছে! তারপর ভাবতে ভাবতে এসে আংটির কথা মনে পড়্‌ল। মেয়েটি নিশ্চয়ই engaged, শীগ্‌গিরই বিয়ে হবে বোধ হয়! শেষ চিন্তাটা তার মনের নিভৃত কোণে একটুখানি খোঁচা দিলে।

এমনি করে' একমাস কেটে গেল। মেয়েটির বিয়ের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। প্রায় প্রত্যহই তার সঙ্গে অপরেশের দেখা হয়। কথা কইতে কইতে ধরানো সিগারেট দুই আঙুলের মধ্যেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়—অপরেশের হুঁস থাকে না। এমনি করে' দিনে দিনে তাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব নিবিড় হয়ে উঠেছে। অপরেশ তার নামটি জেনে নিয়েছে—অপর্ণা। ভারি মিষ্টি নাম!

একদিন অপরাহ্ণ-বেলায় উদ্যানের নিভৃত কোণে একটি বেঞ্চের উপর অপরেশ ও অপর্ণা সুখে সমাসীন। অপরেশ পকেট থেকে একখানি চিঠি বার করে' অপর্ণার সামনে ধরলে। এক বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক অপরেশের আধুনিকতম গল্পটি গ্রহণ করে' চিঠিখানি লিখেছিলেন। অপর্ণা সাগ্রহে চিঠিখানি পড়্‌তে লাগ্‌ল। শেষের দিকে লেখা ছিল—"...আমাদের মনে হয় এইটি আপনার সব চেয়ে সেরা গল্প। আর একটা বিষয় আমরা লক্ষ্য কর্‌ছি, আপনার এই গল্পে প্রেমের অভিব্যক্তি বেশ পরিস্ফুট হয়েছে। প্রুফ দু চার দিনের মধ্যেই পাঠাব...."

অপর্ণা চিঠিখানি ভাঁজ করে' অপরেশের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বল্লে—বেশ হয়েছে! খুসি হননি?

'খুসি? হ্যাঁ, হয়েছি বৈ কি।' অপরেশের কণ্ঠে নিরুৎসাহের সুর বাজ্‌ল।

অপর্ণা বল্লে—'কিন্তু আমি ভাবতুম আপনার হাতে প্রেমের গল্প খোলেনা।' তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটু প্রচ্ছন্ন কৌতুকের আভাস ছিল, যদিও অপরেশ তা লক্ষ্য করেনি। সে কেমন-ধারা বিমর্ষ হয়ে গেল। বল্লে—এককালে পারতুম না, এখন দেখ্‌ছি, পারি।

—ভারি অদ্ভুত ত!

—'ভারি বিপদ! আজকাল আমার মাথা একেবারে ঐ রকম গল্পে ভর্তি হয়ে রয়েছে। এই দণ্ডেই'—হাতের সিগারেটটা পুড়ে

এসেছিল, সেটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে অপরেশ বল্লে—'একটা গল্প মাথার মধ্যে একেবারে তোলপাড় লাগিয়ে দিয়েছে।'

'তাই নাকি!' উৎসাহে মেয়েটির চোখদুটি দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল। 'বলুন না আমায় গল্পটা।'

অপরেশ তাচ্ছল্যের স্বরে বল্লে—"ও আপনার ভালো লাগবেনা। ও গল্পের শেষে 'সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করতে লাগল' ধরণের কিছু নেই।"

—হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন, খুব ভালো লাগবে। গল্পটার প্রায় শেষ পর্য্যন্ত দুঃখের কষ্টের কথা চল্‌বে তারপর হঠাৎ একেবারে সব উল্টে যাবে, সব সুখময় আনন্দময় হয়ে যাবে। ঐ ধরণের গল্প আমার বড় ভালো লাগে।

অপরেশের মুখে একটুখানি ম্লান হাসি খেলে গেল।

মেয়েটি বল্লে—কৈ, আরম্ভ করুন।

—বল্লুম তো আপনার ভালো লাগবে না।

—খুব ভালো লাগবে, বলুন। বিষয়টা কি? একটি মেয়ে আর একটি চমৎকার পুরুষের কথা নাকি?

—না, একটি অপরূপ মেয়ে আর একটি অতি-সাধারণ কুদর্শন পুরুষের কথা।

—ভারি মজা ত! আচ্ছা পুরুষটি কি বেজায় কুৎসিত?

—হ্যাঁ কুৎসিত তো বটেই, তার উপর আবার মুখচোরা গোবেচারী ধরণের। যাচ্ছেতাই গল্প, না?

—না না। আচ্ছা মেয়েটি কি রকম?

—মেয়েটি? ভারি সুন্দর—সে ভারি সুন্দর—একেবারে অপরূপ। তার চোখ—সে যে কেমনধারা তা বলা যায় না, উদ্বেল সমুদ্রের জলের উপর যখন সকালের তরুণ রোদ এসে পড়ে সে যেমন হয় তেমনি বোধ হয়। সে চোখ একেবারে রহস্যে ভরা! তার মুখখানি ছোট, ঠোঁট-দুখানি পাতলা লাল টুকটুকে, আর সে ঠোঁটের প্রান্তে একটুখানি হাসি যেন সদাই ঝিকমিক করছে, শরতের সোনালি রোদের মতন। নাকটি বাঁশির মত। মাথায় একরাশ কালো কোঁকড়া চুল।

সহসা অপরেশ জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আমার এই অপরূপ মেয়েটিকে আপনার ভালো লাগে না?

—হ্যাঁ, ভালো লাগে। আচ্ছা, তারপর কি হল?

—মেয়েটি বাগ্‌দত্তা, বিয়ে হল বলে'।

—সেই কুৎসিত পুরুষটার সঙ্গে?

—না, অন্য কারো সঙ্গে।

—আর সেই কুৎসিত লোকটি? সে কি কর্‌লে?

—সে? সে সেই মেয়েটিকে বড্ড ভালবেসে ফেল্লে।

—আহা! তারপর?

—এই তো গল্প।

—কিন্তু শেষটা কি?

—সেইটেই তো সমস্যা। এর শেষ নেই—সেই জন্যেই তো বল্লুম, গল্পটা কিছু নয়। একেবারে বাজে।

অপর্ণা অনেকক্ষণ স্থির হয়ে ভাবলে। তারপর বল্লে—আচ্ছা, ঐ যে কার সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল সে মরে যাক্ না!

অপরেশ বল্লে—খুব ভালো গল্পে তা করা চলে না।

—আচ্ছা না হয় তাদের বিয়ের সম্বন্ধটা ভেঙে যাক্ না!

—তাহলে গল্পটা নিতান্ত খেলো হয়ে পড়ে।

অপর্ণা ক্ষণকাল চুপ করে' রইল। তারপর বল্লে—আচ্ছা যার সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছে সে লোকটা হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয় যদি? তাহলে হয় না?

—তাও কি হয়? সে নিতান্ত আজগুবি ব্যাপার হবে। ও রকম গল্প আজকালকার পাঠকদের গেলানো শক্ত।

অপর্ণা বল্লে—তা বটে, ও রকম গল্প গেলানো শক্ত। আমি এই কথা বলি লোকটা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত থাকুক, তারপর কলমের এক আঁচড়ে তাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না?

—এরকম জলজ্যান্ত একটি ভাবী পতিকে কলমের আঁচড়ে উড়িয়ে দেওয়ার অজুহাতটা জোগায় কে?

অপর্ণা অপরেশের পানে স্থির হয়ে চেয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বল্‌তে লাগ্‌ল—
—আচ্ছা ধরুন মেয়েটি ব্রাহ্ম বা ক্রিশ্চান নয়, সে হিন্দু, সে যে আংটিটী পরেছে, সেটি অলঙ্কার হিসেবেই পরেছে—সেটি বাগ্‌দত্তার নিদর্শন নয়।

অপরেশ ধীরে ধীরে চোখ তুলে তার দৃষ্টি মেয়েটির মুখের উপর রাখলে। তাদের চারচোখের মিলন হল, কেউ চোখ নামালে না। উভয়েই ক্ষণকাল নির্ব্বাক হয়ে রইল। তারপর অপরেশ অবিচলিত কণ্ঠে বল্লে—চমৎকার! ভাবী পতিটি তাহলে সত্যিই উড়ে গেল! আর ফিরবেনা ত?

অপর্ণা নতমুখ নির্ব্বাক।

অপরেশ বল্লে—তা হলে গল্পটা কি সুখের মধ্যে শেষ করা যাবে? আপনার কি মনে হয়?

অপর্ণা মৃদুকণ্ঠে বল্লে—আপনার গল্প, আপনিই জানেন, কেমন করে' শেষ করবেন। আমি আর কি বল্‌ব?

অপরেশ বল্লে—তা হলে আমিই শেষ করি, কেমন?

তার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠ্‌ল। অপর্ণার গ্রীবার দুপাশ দিয়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দুহাত দিয়ে তার সুরভিত কুঞ্চিত কালো কেশে ভরা মাথাটি ধরে' তার নতমুখ তুলে ঊর্দ্ধমুখী সেই অপরূপ চোখদুটির গভীর রহস্যের মধ্যে অপরেশ আপনার দৃষ্টি ডুবিয়ে দিলে।

গল্পটাও মাঠে মারা গেল না।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

# স্বপন-পসারী

ফিরি দ্বারে দ্বারে স্বপনের ফিরি
স্বপন-ব্যাপারী আমি,
নাহি জহরত—হীরা পান্নার
ধুক্‌ধুকি আর থামি।
ভুলের ফুলের মোহন মালিকা
গাঁথিয়াছে হের স্বপন-বালিকা,
যে বীণা বাজা'তে আলো-নীহারিকা
ছায়াপথে যায় থামি'—
তারি সুরে হেঁকে পথ চলি ডেকে,
স্বপন-পসারী আমি।

বাসবের ধনু-বরণ-সুষমা
নীলিমায় মিলি' যায়—
পটগুলি দেখ সেই রঙে আঁকা
মৃণালের তুলিকায়।
গোলাপ—আঁকা এ চুম্বন-রাগে,
বধূ হেসে চায়—বসন্ত জাগে,
ডালিম-দানার রস যেন লাগে
অধরের কিনারায়,—
পটগুলি দেখ কোন্ রঙে আঁকা
মৃণালের তুলিকায়।

একখানি ছবি এই যে হেথায়—
চেয়ে দেখ এর পানে!
এমনটি আর দেখেছ কোথায়,
বল দেখি কোনখানে?
চেয়ে দেখ শুধু আঁখিতে ইহার,
ভঙ্গিমা দেখ অধর-রেখার,
ললাট বেড়িয়া সন্ধ্যা-আঁধার
কেশ-রচনার ভাগে
ছায়া-সুষমার মোহিনী অপার—
চেয়ে দেখ এইখানে!

মর্ম্মমরুর যত দাহ আছে,
—বাসনার মরীচিকা,
আত্মার আধি, নিদারুণ ব্যাধি
ললাটের তলে লিখা।
নিবিড়-আঁধার কেশ-তপোবনে
লুকা'য়ে রেখেছে ঋষি-ধ্যান-ধনে,
ফুরিছে অধর-গোলাপ-কাননে
অলকার ভোগশিখা—
মানবের আশা-নিরাশার সীমা
ও দুটি নয়নে লিখা!

জ্যোৎস্নাচিকণ গুণ্ঠন এই
আঁধার-কবরী ঢাকা—
পরা'য়ে দেখ গো প্রেয়সীর মুখে,
বুঝিবে কি সুধামাখা!
তারার চুমকি—কালো পেশোয়াজ,
মখমল সাজ, সুকোমল ভাঁজ,
পাড়ে লতাপাতা কুসুমের কাজ,
নাহিক' দাগটি আঁকা,
এ চারু বসন-বিভবে সাজিলে
হাসিটি যাবেনা ঢাকা।

এনেছি আরসী—মানস-সরসী,
বিম্বিত বুকে তার—
যে ছায়া তোমারি, আকাশ সকাশে
পড়েছে অসীমাকার!
হেরিবে সেখানে আননে তোমার
শত-পারিজাত-বরণ-বিথার,
শতদল-দল বাসনা-ব্যথার,
আঁখির বিজুলী-হার,—
এনেছি আরসী, সবটুকু তব
বিম্বিত বুকে যার।

অনাদি কালের অসীম দেশের
গোপন নাট্যলীলা
দেখিবারে চাও? ধর অঙ্গুরী—
খচিত মোহিনী শিলা।
যে-স্বপন তুমি দেখিয়াছ রাতে
মনে নাই যাহা জাগিয়া প্রভাতে,
তবু আছে আঁকা হৃদয়ের পাতে
জলরেখা রঙ্গিলা—
সেই জলছবি ফুটাইবে কবি
—অপরূপ সেই লীলা!

দেখিবে যেথানে লতার বিতানে
জোনাকির দীপ জ্বালা,
ফুলে-ফুলে সেথা অতি চুপিসারে
বিলসিছে পরীবালা।
গভীর জ্যোৎস্নানিশীথে জাগিয়া
হেরিবে তোমার বাতায়ন দিয়া,
চন্দ্রকিরণে কে আসে নামিয়া
দুলায়ে মৃণালমালা,
শঙ্খ-ধবল একটি কমল
গাঁথিয়াছে তা'য় বালা।

পাহাড়ের ধারে শিখর-সমীপে
তারাটি যেতেছে দেখা,
রূপার নূপুর বাজা'য়ে তটিনী
নটিনী চলেছে একা।
ঝঙ্কার তার মিলায় আকাশে,
ফিস্‌ফিস্-কথা কভু বা বাতাসে,
চারিদিকে যেন কত চোখ ভাসে,
আলোকে পলক ঢাকা—
সারাটি আকাশে আঁখি বিথারিয়া
কে আছে চাহিয়া একা!

হোথায় কুয়াসা-তুষার-পুরীতে
ঊষার মাধবী-বন,
তা' হেরি' একদা গিরিরাজ-বালা
যৌবন-অচেতন!
তনু এলাইয়া শৈল-সোপানে
ঘুমায় অঘোরে বাহুরশ্মিথানে,
পূর্ণিমা-চাঁদ অতি সাবধানে
করে মুখে চুম্বন,
রূপেরি বাসরে চিরঘুমঘোরে
তাই বালা অচেতন।

ধুধুধু সুদূর প্রান্তর-পথে
শীতশেষ-রজনীতে
মরিয়া গিয়াছে জল-সোহাগিনী
কুমুদেরা সরসীতে;
বিশীর্ণ-কায়া তুরগ-আসীন
ছুটিয়াছে যুবা বীর নিশিদিন,
কণ্ঠে কাতর স্বর হ'ল ক্ষীণ,
—নারে সে যে পাসরিতে
অপ্সরী-প্রিয়া গেল মিলাইয়া
অধর না পরশিতে।

দেব-দানবের মন্থনে আজও
অসীম সাগর নীল
অমৃতের ফেণা ছিটায় আকাশে,
বায়ু কাঁপে ঝিল্‌মিল্‌।
তারি মাঝখানে—কুন্তল লোল,
খসি' পড়ে পা'য় কুহেলি-নিচোল—
নিখিল ভুবন করি' উতরোল,
অমিলের করি' মিল,
সেই ইন্দিরা উরিছেন আজও—
সাগর তেমনি নীল!

অঞ্জন এই আছে সবশেষে
মণি-সম্পুট-ভরা,
আনন্দঘনরসসরসিত,
দিবসের জ্বালাহরা।
দরশে হইবে পরশ উদয়,
ঘুচে যাবে খেদ, যত ভেদভয়,
কায়া আর ছায়া—বৃথা সংশয়,
স্বর্গ হইবে ধরা—
লও কিনে লও স্বপন-পসরা
দিবসের জ্বালাহরা।

ও খানি? কিছু না, বাঁশের বাঁশিটি—
যা'রে তা'রে নাহি সাজে,
লইবে সেজন যেজন বুঝিবে
লাগিবে তাহার কাজে।
এমনি বাজা'লে বাজিবে বেসুর—
সে যেন কোথায়—দূর প্রেতপুর,
নিশান্তবায়ু বহিছে বিধুর
হাহা'র আগার মাঝে,
মানবের পদ-পরশের ধ্বনি
কভু না সেথায় বাজে!

থাক্ থাক্—ও'রে বাজা'য়ে কি কাজ?
থাক্ শুধু ওই খানি!
আর যাহা আছে সব তুলি' লও,
কিছু না কহিব বাণী।
যেজন শুনা'বে, জীবন-মরণ
একই আলোকেতে চির-জাগরণ,
বাঁশীতে করিবে সে-শ্বাস ভরণ
'বেসুরা'কে বশে আনি',
তা'রে বাঁশী দিয়ে স্বপন-পসরা
ধূলায় ফেলিব টানি'।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

---

# কাণাশ্যাম

(নক্সা)

দৃষ্টিশক্তি ছিল তার দুচোখেরই,—কিন্তু ডান চোখটী বাঁ চোখের তুলনায় অনেক ছোট ছিল বলিয়া সকলে তাহাকে 'কাণা শ্যাম' বলিত। তাহার নাম শ্রীশ্যামাচরণ ঘোষ। কুলীন কায়স্থ, মকরন্দ ঘোষের অধস্তন অষ্টা-বিংশতিতম পুরুষ! এতাদৃশ মহাকুলে জন্ম হইলেও মা সরস্বতীর সঙ্গে শ্যামাচরণের পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ ছিল না। গ্রামের রাম-

গতি বর্দ্ধন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় শিশু-কালে শ্যাম কয়েক বৎসর যাতায়াত করিল। প্রথমে মাটীতে খড়ি দিয়া, তারপর তালপাতে কঞ্চির কলম দিয়া—তারপর কলার পাতে খাগের কলম দিয়া এবং সর্ব্বশেষে বালির কাগজে শকুনির পাখার কলমে দাগা বুলাইতে ও অক্ষর লিপি করিতে শিখিয়াছিল। সেই সঙ্গে শতকিয়া, কড়াকিয়া, মণকসা, সুদকসা প্রভৃতিও কিছুকিছু আয়ত্ত করিয়াছিল। তারপর গুরুমহাশয়ের বিদ্যাতে আর তেমন কুলাইয়া উঠিল না। শ্যামাচরণ নিজেও আর বেশীদিন বাগ্‌বাদিনী জননীর স্নেহ-অঙ্কে পড়িয়া থাকা অশোভন মনে করিল,—কাজেই তাহার বিদ্যা-চর্চ্চার ঐখানেই ইতি পড়িল।

শাস্ত্রে আছে,—(অনুস্বার-বিসর্গ থাকিলেই তাহা সংস্কৃত,—এবং সংস্কৃত হইলেই তাহা শাস্ত্র)—

"কিঞ্চিৎ লেখনং
বিবাহেরি কারণং।"—

শ্যাম একে পরম কুলীন,—তার উপর তাহার "কিঞ্চিৎ লেখনং"ও হইয়াছিল,—কাজেই তাহার শুভবিবাহে বিলম্ব বা বাধা ঘটিল না। স্ত্রী বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থের একমাত্র কন্যা ছিল,—কাজেই শ্বশুরের কাল-প্রাপ্তি হইলে শ্যামাচরণের দু'পয়সা বেশ প্রাপ্তির আশা ছিল। কিন্তু, কন্যার বিবাহ দিবার অল্পকাল পরেই একটী সরিকী মোকদ্দমায় শ্যামাচরণের শ্বশুরের প্রথমে সর্ব্বস্বান্ত ও পরে জীবনান্ত ঘটাতে "ওয়ারিশন-সূত্রে" শ্যাম একটী পয়সাও প্রাপ্ত হইল না।

মায়ের নিকট সুন্দর-কুৎসিত নাই,—
প্রসূতির কাছে সে-ও কষিত কাঞ্চন।"

কাজেই "সবেধন নীলমণি" শ্যামাচরণ তাহার বিধবা মাতার বড় আদরের "শ্যাম" ছিল। তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। শ্যামাচরণ যেদিন পাঠশালা হইতে পৃষ্ঠদেশে দুইচারি গণ্ডা "কালশিরা" লইয়া ঘরে ফিরিত, সেদিন তাহার মা পাড়া মাথায় তুলিয়া বলিত,—"কেন! আমার সোনার চাঁদকে পোড়ারমুখো গুরু এমন ক'রে মারে কেন? আমার শ্যাম আর ছেলেদের চেয়ে কিসে কম?—আর যদি কমই হয়,—তাতেই বা কি আসে যায়? যে বংশে তার জন্ম, তার উপর এই ক'বছরে যে লেখাপড়া সে শিখেছে, তা'তে আর কিছু না হোক, "দারোগ্‌গিরি" ক'রে সে খেতে পার্‌বেই!"

"মাগে হাতী পায় ঘোড়া,
কুচ্‌ না হয় ত থোড়া থোড়া।"

—শ্যামাচরণের জননীর আশীর্ব্বাদ অক্ষরে অক্ষরে না ফলিলেও আঠার বৎসর বয়সে শ্যামের পুলিশে,—দারোগাগিরি নহে,—মাসিক ৫৸৹ পাঁচ টাকা তের আনা বেতনে এক কনষ্টেবলের কাজ হইল। সে কালে কনেষ্টবলের বেতন ছিল ছয় টাকা, তার মধ্যে প্রতিমাসে তিন আনা পোষাকের দায় বাবদ সরকার হইতে কাটিয়া রাখিত,—বাকি ৫৸৹ পাঁচ টাকা তের আনায় কনেষ্টবলগণের অশন বসন, বিলাস, ব্যসন,—তদুপরি পরিবার-প্রতিপালন প্রভৃতি যাবতীয় মহামহিম খরচ-পত্র কুলাইয়া উঠিত না। কাজেই তাহাদিগকে বাধ্য হইয়াই "অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে" two pice (দু'পয়সা) উপরি

করিতে হইত। কিছুদিন পরে সরকার বাহাদুর তাঁহার ভ্রম উপলব্ধি করিতে পারিয়া কনেষ্টবলগণের বেতন একবারে ছয় টাকা হইতে সাত টাকায় উন্নতি করিয়া ত দিলেনই; তার উপর পোষাক-পেটির দাম বাবদ মাসে মাসে যে তিন আনা প্রতিগ্রহণ করিতেন, তাহাও "মহকুব" করিয়া দিলেন। সকলেই আশা করিতে লাগিল যে, একবারেই যখন এক টাকা তিন আনা বেতন বাড়িয়া গেল, তখন কনেষ্টবল-চরিত্রে আর কোন গলদ রহিবে না,—"উপরি পাওনা"র জন্য কনেষ্টবলগণের যে চেষ্টা ছিল, বেতন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবার তাহা নিশ্চয়ই বিদূরিত হইবে! যে দেশে (বিশেষজ্ঞগণের মতে) সাত সিকা খরচ করিলে একজনের পরমসুখে একমাস জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, সেদেশে মাসিক সাত টাকা বেতন কি যে-সে কথা?—কিন্তু কনেষ্টবলগণের এতদূর নৈতিক অধঃপতন হইয়া ছিল যে, কর্ত্তৃপক্ষের এতাদৃশ অপূর্ব্ব উদারতাতেও তাহাদের চরিত্র কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত না হইয়া উত্তরোত্তর আরও বরং মন্দের দিকেই যাইতে লাগিল! বেশী মাহিনা পাইয়া তাহাদের "খাঁকৃতি" আরও যেন বাড়িয়া উঠিল। পূর্ব্বে যে দুই আনায় সন্তুষ্ট হইত, বেতন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাওয়াতে, সে আর এখন সিকিটার কম হাতে লইতেও রাজী হয় না!

চাকুরীতে প্রবেশ করিবার অল্প দিন পরেই শ্যাম লাইনবাবুকে (Reserve Office) ধরিয়া গোপালপুর থানায় বদলীর বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিল। গোপালপুর থানাটায় নাকি সেকালে উপরি পাওনা ছিল যথেষ্ট,—লাইনে থাকিবার সময় শ্যাম পুরাতন কনেষ্টবলগণের নিকট এ কথাটা অনেকবার শুনিয়াছিল। সে লাইন বাবুকে বলিল,—"গোপালপুর থানার দারোগা বাবু আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, সেখানে গেলে আর কিছু না হোক্, খাওয়ার খরচটা আমার লাগ্‌বেই না,—গরীব ভদ্রসন্তান,—বুঝ্‌তে ত পারেন, খাওয়ার খরচ বেঁচে গেলেও আমার অনেকটা সাহায্য হবে। কাজেই আপনাকে একটু দয়া কর্‌তেই হবে।" সেই দিন সন্ধ্যাকালে শ্যাম লাইন বাবুর বাসায় গিয়া তাহার একমাসের বেতন লাইন বাবুকে "পান খাইতে" দিয়া আসিল,—এবং পরদিনই তাহার গোপালপুরে বদলির পরোয়ানা বাহির হইয়া গেল। যাঁহারা মনে করেন, "কাকের মাংস কাকে" এবং "জোঁকের রক্ত জোঁকে" খায় না, আশা করি, ইহাতে তাঁহাদের ভ্রম বিদূরিত হইবে। সিনিয়ার (Senior) কনেষ্টবলগণ "রংরুট" (recruit) শ্যামাচরণের প্রতি লাইনবাবুর এই পক্ষপাতের জন্য অনেক হৈ চৈ করিয়াছিল। কিন্তু লাইন বাবু প্রয়োজনমত "বজ্রাদপি কঠোর" এবং স্থল বিশেষে "কুসুমাদপিমৃদু" হইতে জানিতেন বলিয়া উহাদের কাহাকেও "বাবু" "বাছা" বলিয়া, কাহাকেও অচিরাৎ প্রমোশনের "হ্যাপা" দেখাইয়া, কাহাকেও বা চোখ রাঙাইয়া নিরস্ত করিয়া দিলেন।

গোপালপুরে আসিয়া শ্যাম প্রথমেই দারোগাবাবুর কৃপালাভে যত্নশীল ছিল। তখন দারোগাবাবুর "মা ঠাকৃরুণ" সঙ্গে ছিল না, শ্যাম বলিল, "বাবু, মিছামিছি তিন টাকা মাইনে দিয়া একটা বামুন রেখেছেন কেন?

ওতে আপনার কত অসুবিধা, ভেবে দেখুন দেখি! প্রথমেই ধরুন, থানায় কোন ব্রাহ্মণ উপরওয়ালা বা অতিথি-অভ্যাগত আসলেই আপনাকে অন্ন যোগাতে হয়, তারপর ধরুন, —ঠাকরুণ যখন আস্‌বেন, তখন যদি ভালমন্দ কোন জিনিস তাঁর নিজের রাঁধ্‌তে ইচ্ছা হয়, তা'হলে নতুন হাঁড়ী কাঁড়্‌তে হবে, কারণ বামুন ঠাকুর ত আর তাঁকে হেঁশেলে ঢুক্‌তে দেবে না,—তার চেয়েও ভারী কথা,—বামুন ঠাকুর খায় আমাদের তিন জনের সমান! তা, এত হাঙ্গাম না পুইয়ে আপ্‌নি ঠাকুরকে তু'লে দিন, আমিই আপনাকে রেঁধে বেড়ে দেব। আপনারও ঠাকুরের মাইনেটা বেঁচে যাবে, আমিও গরীব ডটীডুটী খে'য়ে বাঁচ্‌ব! আমি ত আপনার পর নই, আমার মায়ের মাস্‌তুত ভাই জগন্নাথ দত্তের সুমুন্দি তারিণী সরকারের সাক্ষাৎ পিশে আপ্‌নি—আপনার ঘরে গোলামের কাজ কর্‌লেও আমার কোন নিন্দা বা অপমান নেই।" শ্যামাচরণের কুটুম্বিতা-সংস্থাপনের চেষ্টা-দর্শনে আন্তরিক অসন্তুষ্ট হইলেও দারোগাবাবু তাহার মূল প্রস্তাবে অসম্মত ছিলেন না, বামুনঠাকুর অবিলম্বে বিদায় প্রাপ্ত হইল।

অল্পকাল মধ্যেই এমন হইয়া উঠিল যে, শ্যামাচরণ না হইলে দারোগাবাবুর গৃহস্থালী অচল হইয়া যায়। চাকর জগু পান সাজিলে তাহাতে চূণ বেশী হয়, তামাক সাজিলে হুঁকার ধূঁয়া সরে না,—খাবার জল দিলে ঘ্রাণে আঁশ্‌টে গন্ধ লাগে, বিছানা বালিশ রোদে দিলে তার এক পিঠ শুকায়, আর এক পিঠ শুকায় না, এমন কি জগু পা টিপিলেও তাহার হাতের কর্কশতায় দারোগাবাবুর কোমল অঙ্গে বেদনা জন্মিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে! কাজেই একে একে এই সব কাজই জগুর হস্ত হইতে শ্যামের হস্তে transfer হইয়া আসিতে লাগিল, শ্যামও অম্লান চিত্তে সমুদায় কাজ সুনির্ব্বাহ করিয়া দারোগাবাবুর মনস্তুষ্টি সাধন করিতে থাকিল। কিছুদিন পরে দারোগাবাবু যখন "পরিবার" বাসায় আনিলেন, শ্যামাচরণ তখন "ঘরের ছেলে" হইয়া তাঁহাকেও সেবায় সন্তুষ্ট করিতে লাগিল। নাতি ঠান্‌দিদি সম্পর্ক,—তার উপর শ্যামের বয়স "মা ঠাকুরুণের" বড় ছেলের চেয়েও কম, কাজেই লজ্জা বা সঙ্কোচের কোন কারণ ছিল না। শ্যাম ঘরদুয়ার ঝাঁটপাট দিয়া, পাণ সাজিয়া, কাপড় কোঁচাইয়া, ছেলেমেয়ের কাঁথা-কানি কাঁচিয়া, নানাস্থান হইতে কাঁচা আম, পাকা তেঁতুল, বড় বড় চাল্‌তে, কচি কচি শাক পাতা সংগ্রহ করিয়া অল্পদিনের মধ্যে "ঠান্‌দিদি"কেও বশ করিয়া ফেলিল। ভাল মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হইলেই, ঠান্‌দিদির সুপারিশে দারোগাবাবু শ্যামকে সঙ্গে লইয়া মফঃস্বলে যাইতে লাগিলেন। এই ভাবে এক-দিকে সর্ব্বপ্রকার ব্যয়ের অভাব, পক্ষান্তরে দুইপয়সা উপরি-উপার্জ্জনে অল্পদিনের মধ্যেই শ্যাম পোষ্ট আপিসের সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কে একখানা খাতা খুলিয়া বেশ দুপয়সা গুছাইয়া ফেলিল। কোন থানে দুই-চারিটা পয়সা পাইলেই শ্যাম তাহা কাছার খুঁটে বাঁধিয়া রাখিত,—চুরি যাইবার ভয়ে সে পয়সা-কড়ি কখনও বাক্সে পেঁটরায় রাখিত না,—সিকিটা পূর্ণ হইলেই পোষ্ট আপিসে গিয়া জমা দিয়া আসিত।

গোপালপুর থানায় পরমসুখে দুই বৎসর অতিবাহিত করিয়া শ্যাম পাট্‌কেপোতায় বদলি হইল। এখানকার দারোগা ছিলেন একজন মুসলমান; তাঁহার সঙ্গে কুটুম্বিতা সংস্থাপনের সম্ভাবনা না থাকায় শ্যাম "দারোগা সাহেব"কে "ধর্ম্ম পিতা" বানাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু দারোগা সাহেব উহাতে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করায় শ্যামকে নিতান্ত দুঃখের সহিত সে চেষ্টায় নিবৃত্ত হইতে হইল। দারোগা সাহেব কড়া মেজাজের লোক ছিলেন। তিনি ইনিস্‌পেক্টারী পাইবার আশায় ইদানীং ঘুষ খাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁবেদারগণও যাহাতে কোন থানে কিছু আদায় করিতে না পারে, সে দিকেও তাঁহার প্রখর দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। এতাদৃশ লোকের অধীনে পড়িয়া প্রথম প্রথম কিছুদিন শ্যামের বড়ই কষ্ট গেল। কিন্তু "প্রতিভাশালী" লোক জলে-জঙ্গলে পড়িলেও নিজের উপায় নিজে করিয়া লইতে পারে। শ্যামও নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জোরে, গোপালপুরের চেয়ে বেশী না হউক, পাট্‌কেপোতাতেও অন্ততঃ সেখানকার সমান আয় বজায় রাখিতে সমর্থ হইল। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলেই শ্যামের আয়ের পথগুলি সম্বন্ধে কতকটা ধারণা জন্মিবে।

একবার কদমগাছিতে বড় চোরের উপদ্রব আরম্ভ হওয়াতে দারোগাসাহেব শ্যামকে কয়েকদিন সেই গ্রামে চৌকিদার দফাদার সহ "রোন্দগস্তি" Rounds করিবার জন্য মোতায়েন করেন। শ্যাম প্রথমেই গ্রামের মাতব্বর শ্রীমন্ত শিকারীর বাড়ী গিয়া নানা কথায় তাহাকে ভিজাইয়া লইল, এবং সে যে-কয়দিন কদমগাছিতে থাকিবে, সে কয়দিনের জন্য শ্রীমন্তেরই গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিতে সম্মত হইল। শ্রীমন্তও একজন "সরকারী লোককে" বাড়ীতে অতিথি-স্বরূপ পাইয়া সত্য সত্যই আপনাকে যথেষ্ট গৌরবান্বিত মনে করিল। শ্যাম উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি চৌকীদার-দফাদার-সহ বেশ ধূমধামের সহিত গ্রামময় ঘুরিয়া "রোন্দগস্তি" করিল। তাহার "বস্তি-ওয়ালা জাগো হো" শব্দে চারিদিকে চার পাঁচ খানি গ্রাম প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সে কয় রাত্রির মধ্যে কোন বাড়ী হইতে এক-গাছি কুটা পর্য্যন্ত চুরি গেল না, কাজেই চারিদিকে শ্যামের নামে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল। ফিরিবার দিন শ্রীমন্ত শিকারী এবং পাড়ার অন্যান্য অনেকের বাগান হইতে শ্যাম পেয়ারা, শসা, লেবু প্রভৃতি নানাপ্রকার ফলমূল চাহিয়া লইয়া নিজের ঝোলাটী পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। গ্রামে অনেক গৃহস্থের ঘরেই চালকুমড়া, মিঠে কুমড়া, বাতাবি-লেবু প্রভৃতির প্রাচুর্য্য ছিল বটে, কিন্তু সে সব জিনিস ঝোলায় লইবারও সুবিধা নাই,-পুঁটলি করিয়া লইলেও দারোগাসাহেবের দৃষ্টি এড়ানো দুষ্কর,—কাজেই প্রবল ইচ্ছা-সত্ত্বেও শ্যাম সে-সব কিছুই গ্রহণ করিতে পারিল না।

এই তিন-চারি দিনে শ্যাম নগদ পয়সা কোন থানেই কিছু পায় নাই, রাত্রে পাড়াগাঁয়ের পথে পথে রোন্দগস্তি করিয়া কোথায় বা কি পাইবে,—সেখানে ত আর আর C আইনের চলন নাই,—কাজেই মনটা তাহার তেমন প্রসন্ন ছিল না। পথে যাইতে যাইতে নানাপ্রকার ফন্দী তাহার

মাথায় উঠিতে লাগিল বটে, কিন্তু কোনটাই কাজে খাটাইবার সুবিধা হইল না।

কদমগাছি হইতে সাত আট মাইল পথ আসিয়া শ্যাম যখন রসুল্লাপুরে উপস্থিত হইয়াছে, বেলা তখন অবসান প্রায়। রসুল্লাপুর হইতে থানা পাঁচ মাইল সাড়ে পাঁচ মাইলের কম নহে। এই গ্রামে পোদ-ভিন্ন আর কোন জাতির বাস ছিল না। পোদজাতি সাধারণতঃ বড় নিরীহ। ইহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী, এবং কৃষিকার্য্যই উহাদের প্রধান উপজীবিকা। নমঃশূদ্র, বাগ্‌দী, মুসলমান প্রভৃতি জাতির ন্যায় পোদেরা কথায় কথায় মামলা মোকদ্দমার ফ্যাসাদে যাইতে চায় না,—কেহ একটা অনিষ্ট করিলেও সহসা রাজদ্বারে না গিয়া উহারা ঘরে ঘরেই মীমাংসার চেষ্টা করে। কাজেই অপব্যয় উহাদের খুব কম। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের কষ্ট পোদের মধ্যে প্রায় কাহারই নাই, বর্দ্ধিষ্ণু প্রজার সংখ্যাও অন্যান্য ইতর জাতির তুলনায় পোদের মধ্যেই অধিক। সে রাত্রিটা কোন উপায়ে এই গ্রামে কাটাইয়া দেওয়া যায় কিনা, শ্যাম মনে মনে তাহাই ভাবিতেছিল, কারণ থানায় গেলেই নিজের চাল ডাল তেল নুন খরচ করিয়া খাইতে হইবে, কিন্তু এখানে থাকিতে পারিলে, আর কিছু না হোক্, অন্ততঃ দুটী "পরান্ন" কোন মতে জুটিয়া যাইবেই! ভাগ্যদেবতা সেদিন শ্যামের উপর নিশ্চয়ই প্রসন্ন ছিলেন, কাজেই একটা "সুবর্ণ সুযোগ" ( Golden opportunity ) অবিলম্বে শ্যামকে বরণ করিয়া লইল।

শ্যাম রসুল্লাপুরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একজন প্রৌঢ়বয়স্ক লোক বাড়ীর দুয়ারে বসিয়া বাঁশের চটা চাঁছিয়া স্তূপাকার করিতেছে। দেখিয়াই শ্যাম বুঝিতে পারিল যে, এবার এই পোদের প্রচুর ধান ফলিয়াছে,—তা' না হইলে সে গোলা বাঁধিবার জন্য এত চটা প্রস্তুত করিবে কেন? এই "শাঁস"—যুক্ত লোকটীকে পাক্‌ড়াও করিতে পারিলে কিছু-না-কিছু আদায় হইবেই ভাবিয়া শ্যাম নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাহার সমীপবর্ত্তী হইল, এবং কোন কথাবার্ত্তা না বলিয়া উহার হাতের চটাটী টান দিয়া লইয়া—তাহার দৈর্ঘ্যটা মাপিয়া ফেলিল। চটাখানা লম্বায় একুশ হাত হইল। অমনি বাঘের মত এক লাফে শ্যাম সেই পোদের উপর পড়িল, এবং পিছ্‌মোড়া দিয়া তাহার দুখানা হাত গামছায় বাঁধিয়া ফেলিল; সে বেচারা ত কিছুই জানে না, এই আকস্মিক বিপদ্‌পাতে ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। "ওরে নশুরে, দৌড়ে আয়রে! আমাকে চাপড়াশীতে বেঁধে নিলরে!"—বলিয়া সে চীৎকার করিবামাত্র চারিদিক্ হইতে ক্ষণকাল মধ্যে স্ত্রীপুরুষ, বালক-বালিকা, যুবা-বৃদ্ধ অনেকে সেখানে ছুটিয়া আসিল। কেমন করিয়া কি ঘটিল, তাহা কেহই জানে না,—"ব্যাপার কি" এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেও কাহারো সাহসে কুলাইয়া উঠিতেছিল না, কারণ তখন শ্যামের ছোট-বড় দুটী চক্ষুই যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ চলিতেছে, এবং বন্দী-দশাপ্রাপ্ত পোদ-নন্দন ঝটিকাক্রান্ত কদলী বৃক্ষের ন্যায় সঘন কম্পিত হইতেছে! "ওঠ্ বেটা, চল্ থানায়,—এবার ভাল ক'রে মজা টের পাবি" বলিয়া লোকটীকে তাড়া করিতে আরম্ভ

করায় গ্রামের "প্রধান" সনাতন মণ্ডল অন্তিম সাহসে নির্ভর করিয়া বলিল, "কি হয়েছে চাপড়াশী মশায়? গদাকে নিয়ে টানাটানি কচ্ছো কেন? কি করেছে ও?" শ্যাম সনাতানের উপর অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি পাত করিয়া বলিল, "কি করেছে, তা থানার গেলেই মালুম হবে, ও একলা নয়,—পাড়ার আরো কত বেটা যে এবার বাঁধা পড়্‌বে, তার ঠিক্ কি?" বিপদের আশঙ্কায় উপস্থিত সকলের বুক দুরদুর্ করিতে লাগিল। শ্যামের নিকট কোন পরিষ্কার উত্তর না পাইয়া সনাতন গদাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আরে কিরে গদা? কথা বলিস্ না কেন?—কি হয়েছে, বল্ না? যদি মেটাবার মত হয়, তবে চাপ-ড়াশী মশায়কে কিছু নজর-সেলামী দিয়ে না হয় মেটাবারই চেষ্টা করি—।" নজর-সেলামীর নাম শুনিয়া শ্যাম বুঝিতে পারিল, চারে মাছ জমিয়াছে, এখন বড়শীতে গাঁথিয়া টানিয়া তুলিতে পারিলেই হয়। সুর একটু নরম করিয়া সে বলিল, "এ কিছু নজর সেলামীর কাজ নয় বাবা,—ও যা করেছে, তাতে দায়রা (transportation) হওয়াও অসম্ভব নয়।"

শ্যামের কথা শুনিয়া কেহ কেহ ভাবিল, গদাই বুঝি কাহাকে খুন করিয়াছে,—কেহ ভাবিল, গদাই হয়ত ডাকাতি করিয়াছে,—কাহারো মনে হইল, গদাই না জানি কার চালে আগুন দিয়াছে। মোদ্দা কথাটা কেহই ঠাহর করিতে না পারিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া একবার গদাই-এর দিকে, একবার শ্যামের শ্যামমূর্ত্তির দিকে, একবার সনাতন মাতব্বরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। গদাই সজল চক্ষে সনাতনের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "আমি ত কিছুই জানিনে খুড়ো,—ব'সে ব'সে চটা চাঁচ্‌ছি, এমন সময় চাপড়াশী মশায় কোথা থেকে এসে, কোন কথা নাই, বাত্রা নাই আমার হাত থেকে একটা চটা টেনে নিয়ে তার লম্বাটা মাপ কর্‌লেন—তারপরেই আমার এই দশা! আমি তোমারই আশ্রয়ে আছি খুড়ো,—যে ক'রে হয়, আমাকে বাঁচাও।"

সনাতন যোড় হস্তে বলিল, 'চাপড়াশী মশায়, দয়া ক'রে গদার হাতটা একবার খুলে দিন, ব্যাপার কি শুনি,—তারপর যদি মেটাবার মত হয়, তবে দয়া করে মিটিয়ে দিয়ে যান্,—আপনার যা মর্য্যাদা তা আমরা দেব, মিছা-মিছি কেন এই মাছি মেরে হাত কালো করবেন?" বেশী টানাটানি করিলে সুতা ছিঁড়িয়া মাছ পলাইয়া যাইতে পারে ভাবিয়া শ্যাম গদাই-এর হাত খুলিয়া দিল বটে, কিন্তু তাহাকে কাছ-ছাড়া হইতে দিল না।

উপস্থিত সকলেই গদাই-এর অপরাধটা কি তাহা জানিবার জন্য শ্যামাচরণের নিকট নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। চোখ মুখ বিকৃত করিয়া শ্যাম বলিল, "অপরাধ কি, জানেন না?—সবাই এখন ন্যাকা হচ্ছেন! মেপে দেখ দেখি একটা চটা,—বেটা একুশ হাততো কর্‌লে! কোন্ ব্যবস্থা-মতে, শুনি? পুরাণে নাই, কোরাণে নাই, এমন কি সত্য-নারাণের পাঁচালীতে পর্য্যন্ত নাই, বেটা কুড়ি হাত কর্‌ল না,—একুশ হাত চটা কর্‌লে কোন্ শাস্ত্রমতে? এ কি যে-সে কথা!"—শ্যামের ভাবভঙ্গী দেখিয়া সকলের মনেই প্রবল ত্রাসের সঞ্চার হইল বটে, কিন্তু গদাইয়ের অপরাধটা

যে কি, তাহা তখনও কেহ বুঝিতে পারিল না। "একুশ হাত চটা কর্‌লে কি দোষ হয়, চাপড়াশী মশায়?" সনাতন এই কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র শ্যাম পুনরায় গদাইকে বন্ধনোদ্যত হইয়া বলিল, "তবেই হয়েছে বাপু,—তুমি সব বুঝেছ,—যেমন পোদের দেশ, তেম্‌নি বেশ বনের শেয়াল রাজা মাতব্বর হয়েছ তুমি,—তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করাও যা,—শূয়ারের মুখে গঙ্গাজল ঢালাও তাই। আমার আর বক্‌বার সময় নেই,—সন্ধ্যে হল বলে,—ওঠ্‌রে গদাই, থানায় চল্‌।" তারপর সমাগত সকলের প্রতি সকোপ দৃষ্টিপাত করিয়া শ্যাম জিজ্ঞাসা করিল, "এখানকার চৌকীদার শালা কোথায় হে? এত বড় কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে তার মহল্লার, অথচ সে বেটার খোঁজ-খবর নাই! যাই ত থানায়, তারপর দেখ্‌ব, বেটা এবার কেমন ক'রে তার চাক্‌রী রাখে। এ সব খবর লাটসাহেব পর্য্যন্ত যাবে,—"

চৌকীদারের ছোট ভাই সেখানে উপস্থিত ছিল; সে বলিল, "দাঁড়ান চাপড়াশী মশায়, দাদাকে আমি ডেকে দিচ্ছি। দাদা পঞ্চায়েত (পঞ্চাইত) বাবুর সঙ্গে টেস্‌কো আদায় কর্‌তে গেছ্‌লো, এতক্ষণে বোধ হয় ঘরে ফিরেছে।" সনাতন মণ্ডল দেখিল, এখনও "বুঝি নাই" বলিলে মাতব্বরী আর তার থাকে না, এতগুলি প্রতিবেশীর সাম্‌নে তাহাকে নেহাৎ হাল্‌কা বনিয়া যাইতে হয়, কাজেই সে গম্ভীরভাবে শ্যামের পানে তাকাইয়া বলিল, "বুঝেছি চাপড়াশী মশায়, সবই আমি বুঝেছি, অপরাধটা খুবই শক্ত বটে, কিন্তু গদাই হচ্ছে চাষা লোক, সে কি আর অত শাস্তর জানে! তা সে না বুঝে এক কাজ ক'রে ফেলেছে, তখন আপনি তাকে ক্ষ্যোমা-ঘেন্না ক'রে রাখ্‌লেও পারেন, মার্‌লেও পারেন।" শ্যাম অপেক্ষাকৃত কোমল সুরে বলিল, "বাবুহে, "জানিনা" বল্‌লে কি আর আইনে ছাড়ে! না দেখে আগুনে হাত দিলে কি হাত পোড়ে না? ও সব কথা ছেড়ে দিয়ে এখন কাজের কথা বল।"

তখনই কোথাও কোথাও ঘোঁট বসিয়া গেল,—এক এক দলে পাঁচ-সাত জনে মিলিয়া এক এক জায়গায় বসিয়া ফিস্‌ফাস্‌ করিতে লাগিল। অবশেষে অনেক বাক্‌চিন্তা, শলা-পরামর্শ, অনুনয়-বিনয়ের পর রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় সাব্যস্ত হইল যে, শ্যাম একুশ হাত চটার জন্য একুশ টাকা লইয়া এবারকার মত গদাইকে নিষ্কৃতি দিবে এবং গদাই তখনই সমুদয় চটা কাটিয়া "বেদ-বিধিমত" কুড়ি হাত করিবে! সে রাত্রির মত গদাই-এর খরচেই সনাতনের বাড়ীতে শ্যামের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার নিষ্পন্ন হইল। সারারাত্রি পাড়ার ঘরে ঘরে বহু দীর্ঘ চটা খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইয়া গৃহস্থের ভয় দূর এবং শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিল।

আর একবার,—শ্যামের মা শ্যামকে এক পত্র লিখিয়াছে, "বাবা শ্যাম, কতকাল তুমি বাড়ী আস নাই, একবার দুদিনের জন্য হ'লেও এসে আমাকে দেখা দিয়ে যাবে। আর বৌমা এবার মাকরী সপ্তমীর ব্রত প্রতিষ্ঠা করবেন, তার খরচ-পত্রও কিছু সঙ্গে নিয়ে আস্‌বে।" সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের খাতায় যাহা একবার জমা দেওয়া হইত, প্রাণান্তেও

শ্যাম তাহা হইতে একটী পয়সা তুলিত না। কাজেই মায়ের পত্র পাইয়া সে একটু বিব্রত হইয়া পড়িল, কারণ তখন তাহার হাতে একটী পয়সাও ছিল না, শীঘ্র যে কোনখানে কিছু মিলিবে, তেমন সম্ভাবনাও দেখা যাইতে ছিল না।

অনেক ভাবনা-চিন্তার পর মনে একটা "সদুপায়" নির্দ্ধারণ করিয়া শুক্রবার দিন অপরাহ্নকালে শ্যাম দারোগা সাহেবের অনুমতি লইয়া বামুনডাঙ্গার হাটে উপস্থিত হইল। বামুনডাঙ্গার চৌকীদার রাইচরণ পরামাণিক, আর তার খুড়ো মাণিক পরামাণিক দফাদার; দুজনের সঙ্গেই শ্যামের বেশ সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। উহারা ছিল নমঃশূদ্রের নাপিত, কাজেই উচ্চবর্ণের কোন হিন্দু উহাদের হাতে ক্ষৌর-কার্য্য করান অপমানজনক মনে করিতেন। কিন্তু শ্যাম কুলীন কায়স্থের সন্তান হইয়াও অসঙ্কোচে উহাদের দ্বারা ক্ষৌরকার্য্য নির্ব্বাহ করাইত। মাণিক এবং রাইচরণ শ্যামের এই অপূর্ব্ব উদারতায় বড় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল,—শ্যামও উহাদের দ্বারা বিনা-পয়সায় ক্ষৌরকার্য্যের সুবিধা পাইয়া নানাপ্রকার মিষ্ট কথায় উহাদিগকে তুষ্ট রাখিত। অন্যান্য কনেষ্টবলেরা শ্যামের এতাদৃশ কার্য্যে প্রতিবাদ করিলে শ্যাম গম্ভীরভাবে বলিত,—"কি করব, বল? সব সময় ত এখানে "ছুরিত্তির" (শ্রোত্রীয়) নাপিত পাওয়া যায় না,—কাজেই ওদের আশ্রয় না নিয়ে উপায় কি? "প্রবাসে নিয়মং নাস্তি" এ কথা ত শাস্ত্রেই লেখা আছে।"

তখন বামুনডাঙ্গার হাটে প্রচুর খেজুরে গুড় বিক্রয় হইত। শীতকালে প্রতি সোম ও শুক্রবারে এই হাট হইতে ন্যূনকল্পে দুই-শত আড়াইশত গাড়ী বোঝাই হইয়া খেজুরে গুড় নানাস্থানে চালান হইত। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে শ্যাম রাইচরণ এবং মাণিককে লইয়া খেয়াঘাটের নিকট উপস্থিত হইল। রাইচরণের পিশতাত ভাই পীতাম্বর ছিল এই খেয়াঘাটের ইজারদার। তাহাকে হস্তগত করিতে শ্যামের কোন কষ্টই পাইতে হইল না। খেয়াঘাটের অদূরে একটা বড় বটগাছ ছিল; রাইচরণের পোষাক-পেটি খুলিয়া শ্যাম তাহাকে সেই বটতলায় শোয়াইয়া রাখিল, এবং একখানা মোটা কাপড়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিল। তারপর শ্যাম ও মাণিক দফাদার দুইজনে নিজ নিজ পোষাক পিঠে ভাল করিয়া পরিয়া পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছে, শীতের বাতাস অল্প অল্প বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। হাটের লোকজন সব যে যার বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানেরা গরুকে ঘাস জল খাওয়াইয়া এবং নিজেরা দুটী আলু বা ডাল ভাতে ভাত মুখে দিয়া গুড়ের কলসী বোঝাই করতঃ গাড়ী লইয়া একে একে হাট ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রথম গাড়ীখানা বট-গাছের নিকট আসিবামাত্র শ্যাম তাহা আটক করিল এবং গাড়োয়ানকে অবিলম্বে তাহার গুড়ের কলসী মাটীতে নামাইয়া গাড়ী খালি করিতে আদেশ দিল। গাড়োয়ান ত অবাক্! চোর নয়, বাটপাড় নয়,—ডাকাত নয়, ঠেঙ্গাড়ে নয়,—সরকারী পোষাক-পরা দুইজন লোক, তারা কেন গুড় মাটীতে নামাইতে

বলে! ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া বেচারা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অমনি শ্যাম কর্কশকণ্ঠে বলিল, "দেরি কচ্ছিস্ কেনরে বেটা? সরকারী হুকুম,—তামিল কর্‌বি কি না, তাই বল্! ঐ দেখ্ একটা লোক পথের ধারে মরে পড়ে আছে,—সে ওলাউঠোয় মল, না জ্বরবিকারে মল,—না শত্রুতে খুন করে গেল, না কি আছাড় খেয়ে প্রাণ বেরুল, লাস দেখে ত তার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না! যাচ্ছিলাম এই দিকে এক কাজে, পথের মধ্যে এই উড়ো ফ্যাসাদ এসে জুটলো আমার কপালে,—তা ফেলে দিয়ে যাবার ত আর উপায় নাই, এই সব কাজই হচ্ছে আমাদের কিনা, কাজেই লাস কাপড়-চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি! সদরে গিয়ে ডাক্তার সাহেবকে দিয়ে কাটালে তবে এর মরণের কারণ বোঝা যাবে। এখন তোর গুড় এইখানে রেখে লাশ নিয়ে যাবি, চল্।" গাড়োয়ান প্রমাদ গণিল! সে অনেক কান্না-কাটি করিল, মহাজনের মাল পথে ফেলিয়া গেলে মহাজন তাহাকে নিষ্কৃতি দিবে না, গাড়ীতে মড়া তুলিলে সে গাড়ীতে আর কেহ মাল তুলিতে চাহিবে না, সে গরীব লোক, এ কোন্ জাত না কোন্ জাতের মড়া, ইহা বহিয়া লইয়া গেলে তাহাকে সমাজে ঠেকিতে হইবে,—এইরূপ কত কথাই সে বলিল, কিন্তু শ্যাম তাহার কোন কথাই কাণে তুলিল না। সরকারী কাজের চেয়ে বড় কোন কাজই হইতে পারে না বলিয়া শ্যাম নিজেই গুড়ের কলসী নামাইবার জন্য টানাটানি আরম্ভ করিল। বেগতিক দেখিয়া গাড়োয়ান পাটনিকে সালিশ মান্য করিল, কিন্তু সে পথ শ্যাম পূর্ব্ব হইতেই রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। পাটনিও শ্যামের পক্ষ অবলম্বন করিয়া গাড়োয়ানকে "লাশ" তুলিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, এবং সামান্য কিছু ঘরভাড়া বাবদ পাইলেই, গাড়োয়ান "লাশ" সদরে পৌছাইয়া ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত গুড়ের কলসীগুলি নিজের ঘরে রাখিতে স্বীকৃত হইল। এইরূপে সকল পথই রুদ্ধ দেখিয়া অবশেষে গাড়োয়ান "ব্রহ্ম-অস্ত্র" নিক্ষেপ করিল। সে শ্যামের হাতে একটী টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "বাবু দয়া ক'রে এই নিয়ে আমাকে ছে'ড়ে দিন, এখনই দেখবেন, আরও কত শত গাড়ী এসে পড়্‌বে, তারই একখানা আপনি ধরে নিয়ে যাবেন।" শ্যাম শান্তমূর্ত্তি ধরিয়া বলিল,—"আচ্ছা, আচ্ছা, তবে তুই এখন যা,—কিন্তু কথা থাকল, যদি আর কোন গাড়ী না পাই, তা হ'লে তোকেই আবার এসে "লাশ" নিয়ে যেতে হবে! তোর নাম ঠিকানাটা ব'লে দিয়ে যা।" গাড়োয়ানের মুখে যা আসিল, একটা ঠিকানা দিয়া বলীবর্দ্দযুগলের লাঙ্গুল সবলে মর্দ্দন করিতে করিতে সে খেয়ার নৌকায় উপস্থিত হইয়া নিজেই লগি খোঁচাইয়া নদী পার হইল এবং অল্পকাল মধ্যেই দৃষ্টিপথের অগোচর হইয়া গেল।

তারপর এক দুই তিন করিয়া অনেক গাড়ী আসিল, এবং তাহাদের কেহ এক টাকা, কেহ আট আনা, কেহ বা একটা সিকি দিয়া এই দারুণ বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে লাগিল। এক সঙ্গে পাঁচ-ছয়খানা গাড়ী যখন আসে, শ্যাম তখন পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সকলেরই পথরোধ করে। তাহার

সেই "লাল পাগড়ী আর নীল কুর্ত্তা" দেখিয়া ভয়ে কেহ অগ্রসর হইতে সাহস পায় না। ষণ্ডামার্ক গোছের কোন গাড়োয়ান একটু তেরিয়ান হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেই শ্যাম তাহার গাড়ী লইয়া সর্ব্বাগ্রে টানাটানি আরম্ভ করে,—বলে, "চল্ বেটা, চল্, তোর বলদ যোড়াটাই দেখ্‌চি সব চেয়ে ভাল,—চল্, তোকেই লাশ নিয়ে যেতেঁ হবে।"—কাজেই আর কেহ কোন কথা বলিতে সাহস পায় না। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই একটী পথ ভিন্ন হাট হইতে বাহির হইবার দ্বিতীয় পথ না থাকায় শ্যামের খর্পরে না পড়িয়া কাহারও এড়াইবার যো ছিল না। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সমানভাবে এইরূপ পীড়ন ও দোহন চলিল। মূর্খ গাড়োয়ানদের মধ্যে এমন বুদ্ধি বা সাহস কাহারও হইল না যে, চাপা দেওয়া কাপড়টা একবার সরাইয়া দেখে যে, উহার নীচে বাঘ আছে, না ভাল্লুক আছে, মানুষ আছে, না গরু আছে! একে ত মরা মানুষ শব্দটাই ভীতি-ব্যঞ্জক, তার উপর কোন্ জাতের মড়া, তাহা কেহই জানে না, শীতকালে ঐ মড়া ঘাঁটিয়া কে স্নান করিতে যাইবে?

শেষ গাড়ীখানা বিদায় করিয়া শ্যাম রাইচরণকে তুলিতে গিয়া দেখে সে পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছে। বড় ভাগ্যের কথা যে, ঘুমের ঘোরে রাইচরণ পাশ-মোড়া দেয় নাই, বা কোনরূপ শব্দ উচ্চারণ করে নাই। তাহা হইলে হয় ত শ্যামের সকল কারচুপি ধরা পড়িয়া এত সাধে একবারে বাজ পড়িত।

পাটনির ঘরে গ্রাস পূর্ণ করিয়া এক কলিকা তামাকু-সেবনান্তর শ্যাম সংগৃহীত অর্থ গণনা করিয়া দেখিল, সর্ব্বসমেত তেতাল্লিশ টাকা দশ আনা আদায় হইয়াছে। রাইচরণকে দশ আনা পয়সা সাধা ছিল,—কারণ সে পরিশ্রমের কাজ কিছুই করে নাই, মজা করিয়া ঘুমাইয়াছে মাত্র! রাইচরণ দাঁতে জিভ্ কাটিয়া বলিল, "বলেন কি ঘোষ মশায়, আপনি ভদ্রলোক, এত কষ্ট করে এই সামান্য ক'টা টাকা পেয়েছো, আমি তারই ভাগ নেব?—এ-ও কি একটা কথা? ও দশ আনা আপনি নিয়ে যান, আপনাদের ছেলে মেয়েদের চিনি বাতাসা কিনে দেবেন!" শ্যাম আর দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়া পয়সা দশ আনা নিজের কাছায় বাঁধিয়া রাখিল। অনেক ভাবনা চিন্তা-এবং তিন চারিবার টাকাগুলি গণনা করিবার পর শ্যাম মাণিক দফাদারের হাতে তিনটি টাকা তুলিয়া দিল। এই তিনটী টাকার পরিবর্ত্তে মাণিক যদি সাইলকের মত শ্যামের বুকের তিন তোলা মাংস চাহিত, শ্যাম বোধ হয় প্রসন্নতর চিত্তে তাহাই মাণিককে ছিঁড়িয়া দিত! তিনটী মাত্র টাকা পাইয়া মাণিক তেমন সন্তুষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। সে শ্যামের হাতের দুইকুড়ি টাকার দিকে যেরূপ লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইতে ছিল, শ্যামের তাহা মোটেই ভাল লাগিল না। সে তাড়া-তাড়ি টাকাগুলি কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া আবার যাত্রা করিল। পীতাম্বর পাটনি আশা করিয়াছিল সেও হয়ত দুই-এক টাকা পাইবে, কিন্তু শ্যাম সে বিষয়ের উল্লেখমাত্র না করায় পীতাম্বর মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে সাহস পাইল না।

থানায় আসিয়া শ্যাম বাকী রাত্রিটুকু

ছটফট করিয়া কাটাইল, পরদিন দশটা বাজিবা-মাত্র পোষ্ট আপিসে গিয়া পঁচিশ টাকা সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা দিয়া আসিল, বাকী পনের টাকা দশ আনা নিজের পথ-খরচ-বাবদ এবং স্ত্রীর ব্রত-প্রতিষ্ঠার জন্য কাছে রাখিল। সেইদিন বৈকালেই দশদিন জরুরী ছুটীর জন্য সদরে সে এক দরখাস্ত পাঠাইয়া দিল।

একুশ বৎসর কনেষ্টবলের কাজ করিবার পর শ্যামের একটিং হেড্ কনেষ্টবলীতে প্রমোশন হইল, বেতন হইল মাসে সাড়ে বার টাকা। কিন্তু বেতনে কি হয়? জমাদারী পাইয়া শ্যামের উপরি পাওনা হইতে লাগিল যথেষ্ট। গলায় দড়ি, জলে ডোবা, সাপেকাটা, আগুণে পোড়া প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অপঘাত তদন্ত এবং সি ও বি ক্লাশ দাগীর গতিবিধি-পর্য্যবেক্ষণ করাই এখন হইল শ্যামের প্রধান কাজ। অপঘাত-মৃত্যুর লাশ ডাক্তারের পরীক্ষার্থ সদরে চালান দিবার ভয় দেখাইয়া শ্যাম অনেক গৃহস্থের নিকট হইতে বহু টাকা আদায় করিতে লাগিল। গভীর রাত্রে দাগীর বাড়ী আসিয়া তাহাদিগকে ঘরে পাওয়া যায় নাই মর্ম্মে রিপোর্ট দিবার ভয় প্রদর্শন করিয়া দাগীদের নিকটেও শ্যামের বেশ দুইপয়সা প্রাপ্তি হইতে লাগিল। কনেষ্টবল শ্যামকে লোকে যতটা ভয় ও মান্য করিত, জমাদার শ্যামের মান্য এবং ভীতি তার চেয়ে অনেক বাড়িয়া গেল। এখন কাহারও বাড়ীতে সে পদধূলি দিলে, গৃহকর্ত্তাকে শ্যামের সম্মানের জন্য পুকুরে জাল ফেলিতে হয়, বাগানে পাঁটা কাটিতে হয়, গয়লা-বাড়ী হইতে ছানা ক্ষীর আনাইতে হয়। সাক্ষাৎ থানার জমাদার—সহজ কথা কি!

দুঃখের বিষয়, শ্যাম বেশী দিন এই অতুল সম্মান উপভোগ করিতে পারিল না। S. B. S. কোম্পানির একখানা পাট-বোঝাই "ফ্লাট্" বান্চাল হইবা সুন্দরবনে নদীগর্ভে নিমগ্ন হইয়া যায়। যে ষ্টীমারখানা "ফ্লাট"কে টানিয়া লইয়া যাইতে ছিল, সেই ষ্টীমারখানাও জখম হইয়া কাজের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। সুন্দরবনে যে সব "বাওয়ালি" (কাঠুরিয়া) কাঠ কাটিতে যায়, ফাঁক-তালে তাহারা ঐ জলমগ্ন "ফ্লাট" হইতে ডুবিয়া ডুবিয়া পাট চুরি করিতে আরম্ভ করিল। দুই-একজন বাওয়ালি ফ্লাটের (Flat) মধ্যে প্রবেশ করিয়া অভিমন্যুর মত নির্গমনের পথ খুঁজিয়া না পাওয়াতে সেইখানেই সলিল-সমাধি লাভ করে। এ'ত আর রামা শ্যামার মাল নয়, ফ্লাট এবং পাট উভয়ই খাস বিলাতী S. B. S. কোম্পানির জিনিস, ইনসিওর করাও ছিল "গান পাউডার প্লট" (Gun Powder Plot) না কি-যেন-ঐ-রকম এক দংষ্ট্রা-দমন কোম্পানির নিকট। কাজেই অবিলম্বে কলিকাতায় বড় সাহেবের অফিস হইতে চতুর্দ্দিকবর্ত্তী আটটী থানার দারোগার উপর গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া চোরা পাট সন্ধানের কড়া হুকুম জারী হইল। সি, আই, ডি হইতেও একজন স্বনামধন্য মুসলমান ইনিস্পেক্টার এই ব্যাপারে মোতায়েন হইলেন। সুন্দরবনে ফ্লাটের পার্শ্বে পাহারার জন্য শ্রীমান্ শ্যামাচরণ স্বয়ং দুইজন কনেষ্টবল-সহ সরেজমীনে উপস্থিত থাকিবার হুকুম প্রাপ্ত হইল।

তখন পূজার অল্পদিন মাত্র বাকী আছে।

বাড়ীতে ছেলে মেয়ে পরিবারের ( ইতিপূর্ব্বেই শ্যামাচরণের গর্ভধারিণীর কাল-প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল ) কাপড়, জামা জুতা, নিজের জন্য যা-হয়-কিছু, এবং জামাতৃ-গৃহে পূজার তত্ব পাঠানো প্রভৃতি নানা বাবদে এই সময়টায় শ্যামের বিস্তর টাকার প্রয়োজন। সুন্দরবনে ডিঙ্গী বাঁধিয়া লোণাজল খাইয়া আর মশা মারিয়া সে দিকে কোন সুবিধাই হইয়া উঠিতে ছিল না।—বহু উদ্বেগে দশদিন অতিবাহিত করিয়া শ্যাম এক বাওয়ালির নৌকায় দারোগা বাবুর নিকট এক পত্র পাঠাইয়া জ্ঞাপন করিল যে, লোণাজল খাইয়া তাহার ভারী পেটের অসুখ করিয়াছে, সুতরাং থানা হইতে যেন আর কাহাকেও তাহার জায়গায় মোতায়েন করা হয়। দারোগা বাবু শ্যামের চরিত্র সবিশেষ অবগত ছিলেন, কাজেই তিনি সে পত্রের প্রাপ্তি-স্বীকার পর্য্যন্ত করিলেন না। এক দুই তিন করিয়া যখন সাত দিন কাটিয়া গেল, তখন শ্যাম বুঝিতে পারিল, থানা হইতে কোন লোক আসিবার আশা বৃথা। এই সময় Gun Powder Plot কোম্পানীর দুইজন সাহেব একখানা ষ্টীমলঞ্চে অকু-স্থলে আগত হইয়াছিলেন; এবং কলিকাতা হইতে আর একখানা ফ্লাট আনাইয়া ডুবুরীর সাহায্যে পাট তোলাইয়া তাহাতে বোঝাই করাইতেছিলেন। শ্যাম গত্যন্তর না দেখিয়া একদিন ষ্টীমলঞ্চের পাশে ডিঙ্গী ভিড়াইয়া সাহেবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "হুজুর, আপনারা নিজেই যখন এসেছেন, তখন আর আমার এখানে থাক্‌বার দরকার কি? যদি অনুমতি করেন, তবে আমি এখন থানায় ফিরে যাই।" সাহেবরা বলিলেন,—"সে সব আমরা কিছুই বলিতে পারিব না,—আমরা আসিয়াছি পাট উঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে,—চোর ঠেকাইতে আসি নাই,—সে কাজ তোমার,—তোমার উপর-ওয়ালার যা হুকুম, তাই তুমি কর, এ বিষয়ে আমাদের নিকট কোন কথা বলা অনাবশ্যক।" কঠিন স্থান দেখিয়া শ্যামকে অগত্যা সরিয়া পড়িতে হইল। কষ্টটা যে তাহার খুব বেশী হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই,—দিবারাত্রি চৌদ্দ হাত লম্বা, আর ৩৮ পৌণে চারি হাত চওড়া একখানা ডিঙ্গীতে পড়িয়া থাকায় যে কি আরাম, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে অনুভবই করিতে পারিবেন না। একটুখানি ডাঙ্গায় নামিয়া যে পায়চারি করিবে, সে উপায়ও নাই, চারিদিকে গভীর জঙ্গল, আর ছোট বড় নদী ও খাল,—সেখানে বড় বড় কেঁদো বাঘ, আর ঢেঁকির মত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুমীর ছাড়া আর কাহারও সঙ্গে আলাপ পরিচয়, দেখা-সাক্ষাৎ বা আত্মীয়তার সম্ভাবনা নাই! কনেষ্টবল দুইজন দাঁড়ী-মাঝিদের সঙ্গে তাস পাশা খেলিয়া তবু কোনমতে সময় অতিবাহিত করিত, শ্যাম সে রসেও বঞ্চিত!

এইভাবে আরও কিছুদিন গেল, তারপর একদিন সকালে শ্যাম ঘটি লইয়া ঘন ঘন নৌকার গলুইয়ের দিকে যাওয়া আসা করিতে লাগিল। এবং ও বেলা সে কিছু আহারও করিল না। বেলা শেষ হইলে ডিঙ্গী খুলিয়া সে সাহেবদের ষ্টীমলঞ্চের নিকট গেল, এবং একজন কনেষ্টবল-প্রমুখাৎ নিজের উদরাময়ের সংবাদ জ্ঞাপন করতঃ সাহেবদের নিকট ঔষধার্থ একটু ব্রাণ্ডি যাচনা করিল।

বলা বাহুল্য যে, পুলিশ বিভাগে কর্ম্ম করিতে করিতে শ্যাম একটু সুরাপান অভ্যাস করিয়াছিল। অবশ্য সে পরের পয়সা ভিন্ন নিজের পয়সায় কদাচ সে কাজ করিত না। সাহেবেরা শ্যামের ধৃষ্টতায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ব্রাণ্ডি ত দিলেনই না, অধিকন্তু শ্যামের হস্তে পুলিস সাহেবের নামে এক চিঠি দিয়া শ্যামকে থানায় ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। শ্যাম ডিঙ্গীর ছাপ্পড় ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হুজুর, আমাকে বিদায় দিচ্ছেন কেন?" সাহেবদ্বয় বলিলেন, "তোমার শরীর যখন অপটু হইয়াছে, তখন তুমি এখানে থাকিয়া আর কি করিবে? তোমার বদলে অন্য লোক পাঠাইবার জন্য আমরা পুলিশ সাহেবকে পত্র লিখিলাম।" সাহেবদের এই অযাচিত করুণায় শ্যাম আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িল, এবং অতিদীন ভাবে হাতযোড় করিয়া বলিল, "হুজুর, আপনারা এই ক'দিনই ত দেখেছেন, আমি কেমন মনোযোগ আর পরিশ্রমের সঙ্গে আপনাদের পাটের খবরদারী করেছি। যদি দয়া করে সেই কথাটির উল্লেখ করে পুলিশ সাহেবকে আমার প্রমোশনের জন্য একটু লিখে দেন, তবে আমি গরীব চিরকালের মত প্রতিপালিত হই।" সাহেবরা বলিলেন, "আর কিছু লিখিতে হইবে না। যাহা লিখিয়াছি, তাহাতেই সব ঠিক্ হইবে।" শ্যাম পরম আহ্লাদে সেলামের পর সেলাম ঠুকিয়া থানায় ফিরিয়া আসিল এবং সেই দিনের ডাকেই নিজে হইতে দু'পয়সার একখানা টিকিট খরচ করিয়া সাহেবদের পত্রখানা সদরে পাঠাইয়া দিল। পাছে থানায় কেহ তাহার এই সম্ভাবিত সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যান্বিত হয়, সেজন্য শ্যাম এ পত্রের কথা কাহাকেও তাই কিছু জানিতে দিল না।

শ্যাম বিনা-হুকুমে চলিয়া আসাতে দারোগা বাবু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ইনিস্‌পেক্টারের যোগে শ্যামের বিরুদ্ধে পুলিশ সাহেবের নিকট এক রিপোর্ট পাঠাইয়া দিলেন। শ্যাম ইহা জানিয়াও তত গ্রাহ্য করিল না, কারণ সে মনে মনে আশা করিতেছিল যে, বীমাকোম্পানীর সাহেবদের চিঠিখানাই পুলিশ সাহেব আগে পাইবেন, কাজেই দারোগার রিপোর্ট ইনিস্‌পেক্টারের হাত ঘুরিয়া সদরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহার প্রমোশনের অর্ডার পাশ হইয়া যাইতেছে।

চতুর্থ দিবসে সদর হইতে এক "Very urgent" পরোয়ানা আসিল। সে পরোয়ানায় শ্যামকে দুই বৎসরের জন্য সাত টাকায় ডিগ্রেড্ করা হইয়াছে, এবং তাহাকে আর কখনও হেড্ কনেষ্টবলের কাজ দেওয়া হইবে না, এই আদেশ হইয়াছে দেখা গেল। হায়রে কপাল! কোথায় রাম রাজা হইবে— তা না হইয়া একবারে জটা বাকল পরিয়া বনবাসে চলিল! পদাবনতির সঙ্গে সঙ্গেই শ্যাম লাইনে বদলী হইল।

থানা হইতে লাইনে যাইবার সময় শ্যাম ভ্রমবশতঃ দুইটা কাচের শিশি, একটা ছোট গেলাস, এক আউন্সের—আর একটা একটু বড়,—কেরোসিন তেল রাখিবার,—এবং বাঁটভাঙ্গা একখানা পুরাতন মরিচা-ধরা কুড়ালি ফেলিয়া গিয়াছিল। সহরে আসিয়া সে যখন এই সাংঘাতিক ভ্রম উপলব্ধি করিল, তখন আর তাহার আপ্‌শোসের সীমা রহিল

না। "সময় খারাপ হইলে এইরকম দশাই ঘটে"—বলিয়া সে অনেক অনুশোচনা করিল, তারপর একখানা পোষ্টকার্ডে থানায় মুন্সীর নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র পাঠাইল।

"ভাই, আমার দুইটা শিশি, আর একখানা কুড়ালি ব্যারাক-ঘরে ফেলিয়া আসিয়াছি, পত্র পাঠ মাত্র তুমি তাহা নিজের হেপাজতে লইবে, নতুবা কেহ সরাইতে পারে। চৌকীদারী হাজিরার দিন ঐ সব মাল নীলাম করিয়া যে মূল্য হয়, তাহা আমার নামে ডাকটিকিট কিনিয়া পাঠাইয়া দিও। আমি ছোট শিশিটা দুই পয়সায়, বড়টা ছপয়সায় এবং কুড়ালিখানা সাড়ে তিন আনায় খরিদ করিয়াছিলাম, নীলামে যদি তার চেয়ে দুই এক পয়সা বেশীতে বিক্রয় হয়, তবে ত ভালই, অন্ততঃ কেনা দামটা না উঠিলে কদাচ যেন ছাড়িও না। যদি কোন মতেই উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিতে না পার, তবে যে কোন উপায়ে হউক, জিনিসগুলি যত শীঘ্র পার আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে। কোন মতে অন্যথা না হয়, আমার শত সহস্র অনুরোধ জানিবে। আমি এই জন্য বড় উদ্বিগ্ন থাকিলাম।"

মফঃস্বল হইতে যত টাকা পয়সাই পা'ক না কেন, শ্যাম কখনও এই মুন্সীকে হাত তুলিয়া একটী পয়সা দেয় নাই, তার উপর মুসলমান বলিয়া শ্যাম তাহাকে একটু অবজ্ঞার চক্ষেও দেখিত, কাজেই শ্যামের উপর মুন্সীর যে প্রেমবাহুল্য ছিল না, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। আজ একটা প্রতিশোধের শুভ সুযোগ পাইয়া মুন্সীজি তাহা পরিত্যাগ করিলেন না। চৌকীদারী হাজিরার দিন তিনি শ্যামের শিশি ও কুড়ালি একবার নাম-মাত্র নীলামে চড়াইলেন। কুড়ালিখানি পাঁচ পয়সা এবং শিশি দুইটা তিন পয়সার বেশী দিয়া কেহ লইতে প্রস্তুত হইল না।

তখন মুন্সী বাজারের এক মনোহারী দোকান হইতে বিস্কুটের একটা পুরাতন টিন চাহিয়া আনিয়া শিশি দুইটী ও কুড়ালিখানা তাহাতে পুরিল, এবং ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ইটের কুচি, ও বালি দিয়া নাড়াচাড়ার উপায় বন্ধ করিয়া দিল। তারপর একখানা ন্যাকড়ায় টিনটিকে উত্তমরূপে জড়াইয়া এবং গালা-মোহর আঁটিয়া unpaid parcel-এ শ্যামের নামে ডাকে পাঠাইয়া দিল। কোথা হইতে না জানি কি আসিল ভাবিয়া শ্যাম চৌদ্দ আনা মাশুল দিয়া ডাক হরকরার নিকট হইতে পার্শ্বেলটী গ্রহণ করিল। পার্শ্বেল উদ্ঘাটন করিয়া শ্যামের মনে যে ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিবার দুশ্চেষ্টা পরিত্যাগ করিলাম। ইটের চাপে বড় শিশিটা শতখণ্ডে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, এবং ছোট শিশিটার গলা খসিয়া পড়িয়াছে, থাকার মধ্যে কেবল কুড়ালিখানি অবিকৃত রহিয়াছে।

শ্যাম তখনই জুড়িদার দুই চারিজনকে ডাকিয়া মুন্সীর এই অর্ব্বাচীনতার পরিচয় অবগত করাইল, তারপর একখানা পোষ্ট কার্ড লিখিয়া তাহার এতাদৃশ মূর্খতার কারণ জানাইতে বলিল। সঙ্গে সঙ্গে এ কথা লিখিতেও বিস্মৃত হইল না যে, পত্রপাঠমাত্র মুন্সী যদি ডাক মাশুলের চৌদ্দ আনা পয়সা শ্যামকে পাঠাইয়া না দেয়, তবে সে মুন্সীর নামে পুলিশ সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিবে।

শ্যামের এই মোলায়েম পত্রখানা পাইয়া মুন্সী যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়াই এ প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাইতেছে।

"মেহেরবান কদরদান
শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ ঘোষ
সাহেব একটিং হেড কং বাহাদুর
মহিমার্ণবেষু

সেলাম বহুত বহুত, পরে আরজ এই যে আপনার রোকা পাইয়া সবিশেষ সকল সমাচার অবগত হইলাম। আপনার মালগুলি ডাকে পাঠাইয়াছি বলিয়া আপনি আমার উপর গোসা হইয়াছেন, কিন্তু আমি যে কি অপরাধ করিয়াছি, তাহা কোন মতেই সম্‌ঝিতে পারিলাম না। ইতিপূর্ব্বে আপনি নিজেই আদেশ করিয়াছিলেন যে, "যদি মালগুলি উচিত মূল্যে বিক্রয় না হয়, তবে যে কোন উপায়ে পার, সত্বর এই সব দ্রব্য আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে।" আমি অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, আপনার কেনা দামের অর্দ্ধেক দিয়াও কেহ নিতে রাজী হইল না। কাজেই আমি তাড়াতাড়ি পহুঁছিবে মনে করিয়া মালগুলি ডাকে পাঠাইয়া দিয়াছি। পার্শ্বেলে মাল নড়াচড়া করিলে পোষ্টাফিসে সে পার্শ্বেল লয় না। তাহা আপনিও জানেন, কাজেই আমি কিছু ইটের কুচি এবং বালি আদি ভরিয়া নড়াচড়ার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। চাপে পড়িয়া বড় শিশিটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে জানিয়া বড় আপ্‌শোষ হইতেছে। ছোট শিশিটার শুধু গলাটী গিয়াছে, তখন আপনি উহা কোন না কোন কাজে লাগাইতে পারিবেন। পার্শ্বেলে যে এত ভাড়া আদায় করিবে, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। পুলিশ সাহেব বাহাদুরের নিকট আমার নামে রিপোর্ট করিবেন লিখিয়াছেন, ইহাতে বড় দুঃখিত হইলাম। আপনার আদেশ প্রতিপালন করিয়া যদি আমার এই পুরস্কার হয়, তবে কি বলিতে পারি? তাঁবেদারের সকল কসুর মাপ করিবেন। আপনার দোয়ায় আমরা সকলেই কুশলে আছি। মেহেরবানি করিয়া সময় সময় আপনার মেজাজ শরীফ্ জানাইয়া তাঁবেদারকে সুখী রাখিবেন। আর কি লিখিব, আমার শত সহস্র সেলাম জানিবেন।

আজ্ঞাধীন তাঁবেদার
শ্রীবরকত তুল্লাখন্দকার
লিং কং
থানা নরুল্লাগাজী।"

শ্যামাচরণ এখন পেন্সন লইয়া দেশে আসিয়াছে। পয়সা-কড়ি সে নেহাৎ মন্দ করে নাই,—দেশে কয়েক বিঘা ভাল খামারও করিয়াছে, তাহাতেই সম্বৎসরের সংসার-খরচ অনায়াসে চলিয়া যায়। "কাণা" বদনামটা কিন্তু তার এমনও দূর হয় নাই। সম্মুখে লোকে তাহাকে "ঘোষ মহাশয়," "জমাদার বাবু" প্রভৃতি প্রীতি-সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিলেও অসাক্ষাতে "কাণাশ্যাম", "কঞ্জুষ", "অনামুখো," "অযাত্রা," "কাণফোঁড়" "হারামজাদা লেঙ্গুর," প্রভৃতি নানাবিধ অভিধান-বহির্ভূত শব্দে অভিহিত করিয়া থাকে। দেশে আসিয়া শ্যাম নানাপ্রকার মামলা মোকদ্দমা বাধাইয়া এবং ফেরেববাজি করিয়া প্রতিবেশীদিগকে অত্যন্ত উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে। এজন্য সকলে তাহাকে

যথেষ্ট ভয় করে, অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত ঘৃণাও করে। শ্যাম যে সে কথা না জানিত তাহা নহে, কিন্তু কেমনই যে স্বভাব-দোষ কখনও সে পরের অনিষ্ট বই ইষ্ট চিন্তা মনে স্থান দিতে পারে না। প্রতিবেশীদের ভরসার মধ্যে এই যে, শ্যামের বয়স তিনকুড়ি পার হইয়া গিয়াছে,—আর হয় ত বেশী-দিন সে তাহাদিগকে জ্বালাতন করিতে পারিবে না। কিন্তু তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?

"গ্রীষ্মকালে দিনং দীর্ঘং শীতকালেতু শর্ব্বরী।
পরাপকারিণঃ সর্ব্বে প্রায়শো দীর্ঘজীবিনঃ॥"

মহীন্দ্রমোহন চন্দ।

---

# ঝর্ণার গান

চপল পায় কেবল ধাই,
কেবল গাই পরীর গান,
পুলক মোর সকল গায়,
বিভোল মোর সকল প্রাণ!

শিথিল সব শিলার পর
চরণ থুই দোদুল মন,
দুপুর-ভোর ঝিঁঝির ডাক,
ঝিমায় পথ, ঘুমায় বন!

বিজন দেশ কূজন নাই,
নিজের পায় বাজাই তাল,
একলা গাই, একলা ধাই,
দিবস রাত, সাঁঝ-সকাল।

ঝুঁকিয়ে ঘাড় ঝুম্-পাহাড়
ভয় দেখায়, চোখ পাকায়;
শঙ্কা নাই, সমান যাই,
টগর-ফুল-নূপুর পায়!

ঘাঘ্‌রা মোর শ্বেত চামর
জরির থান ওড়্‌না গায়,
অলঙ্কার মাণিক-হার,
মুক্ত কেশ,—মুক্তা তায়!

* * * *

তুহিন-লীন কোন্ মুনির
ছিলাম কোন্ স্বপ্নেতে!
জন্ম মোর কোন্ চোখের—
কটাক্ষের সঙ্কেতে!

কোন্ গিরির হিম ললাট
ঘাম্‌ল মোর উদ্ভবে,
কোন্ পরীর টুট্‌ল হার
কোন্ নাচের উৎসবে!—

খেয়াল নাই—নাই রে ভাই
পাই নি তার সংবাদই,
ধাই লীলায়,—খিল্‌খিলাই,—
বুল্‌বুলির বোল্ সাধি!

বন্‌-ঝাউয়ের ঝোপ্‌গুলায়
কাল্‌সারের দল চরে,
শিং শিলায়—শিলার গায়,—
ডাল্‌চিনির রং ধরে!

ঝাঁপিয়ে যাই লাফিয়ে ধাই
দুলিয়ে যাই অচল-ঠাট,
নাড়িয়ে যাই, বাড়িয়ে যাই—
টিলার গায় ডালিম্‌-ফাট।

শালিক শুক বুলায় মুখ
থল্‌-ঝাঁঝির মখ্‌মলে,
জরির জাল আঙ্‌রাখায়
অঙ্গ মোর ঝল্‌মলে!

নিয়ে ধাই, শুনতে পাই
'ফটিক্‌ জল!'—হাঁক্‌ছে কে,
কণ্ঠাতেই তৃষ্ণা যার
নিক্‌ না সেই পাঁক্‌ ছেঁকে।

গরজ যার জল স্যাঁচার
পাৎ-কুয়ায় যাক্‌ না সেই,
সুন্দরের তৃষ্ণা যার
আমরা ধাই তার আশেই।

তার খোঁজেই বিরাম নেই
বিনাই তান—তরল শ্লোক,
চকোর চায় চন্দ্রমায়
আমরা চাই মুগ্ধ চোখ!

চপল পায় কেবল ধাই
উপল-ঘায় দিই ঝিলিক্‌
দুল্‌ দোলাই, মন ভোলাই
ঝিল্‌মিলাই দিগ্বিদিক!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

---

# ভারতের সভ্যতায় ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রভাব

ভারত পৃথিবীর সমস্ত দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই সময়ে পৃথিবীর লোকসংখ্যার অতিবৃদ্ধি হইয়াছিল। পুরাতন মহাদেশের লোকদিগের পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি করিবার কাল চলিয়া গিয়াছিল। বাঁধাবাঁধি অভ্যস্ত পথের অনুসরণে কলুষিত ও দৌর্ব্বল্য-গ্রস্ত হইয়া ভারত বর্ব্বর জাতিদিগের কবলে পতিত হইল। উহাদের অভিযান ও হত্যাকাণ্ড কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চলিল। তথাপি ঐ বর্ব্বর জাতিরাই হিন্দুজাতিকে ও পতিত সমাজকে নবীকৃত করিল; এবং হিন্দুদিগকে স্বকীয় ক্রমবিকাশের পথ অনুসরণ করিবার অবসর দিল।

*
*   *

বর্ব্বরেরা ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে দুইটি জিনিষ আনিয়াছিল।

প্রথম।—আপনাদের নিজের দেহের রক্ত ও নিজের রীতিনীতি। ভারতে অধিষ্ঠিত হইয়া উহারা হিন্দুজাতির সহিত মিশিয়া গিয়া

হিন্দুজাতিকে রূপান্তরিত করিল। উহা হইতে ত্রিবিধ-ফল উৎপন্ন হইল। প্রাচীন ভারতের লোকদের সহিত বর্ব্বরদিগের সম্মিলন হইয়া নূতন নূতন জাতির সৃষ্টি হইল; ভারতের লোককে অভিজাত ও দাস এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সামন্ততন্ত্র আবির্ভূত হইল; বর্ণগুলার আরও টুকরা টুকরা বিভাগ হইল। এই সকল ভেদ-বৈলক্ষণ্য প্রথমে ব্যক্তিগত ছিল, নির্ব্বাচনের ফলে ক্রমে সাধারণ লক্ষণে পরিণত হইল। ভারতের বিভিন্ন জাতিদিগের চরিত্রলক্ষণ ক্রমশ বদ্ধমূল হইতে চলিল, কালক্রমে অভিজাত ও দাস-বর্গের স্বভাব সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হইয়া দাঁড়াইল; অপেক্ষাকৃত সাহসী ও বীর্য্যবান লোকের নির্ব্বাচনে অভিজাতবর্গের স্বভাব একরূপ হইল এবং অপেক্ষাকৃত দীনচেতা ও কোমল প্রকৃতি লোকের নির্ব্বাচনে দাসবর্গের স্বভাব অন্যরূপ হইল। মোটকথা বর্ণগুলার টুকরা টুকরা বিভাগে প্রাচীন ভারতের সুদৃঢ় সমাজগঠন ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং এইরূপে অবনতিগ্রস্ত সমাজ একটা অভিনব জীবনী-শক্তি লাভ করিল।

বর্ব্বরেরা যে দ্বিতীয় জিনিস আনিয়াছিল,—তাহা ইস্‌লাম-ধর্ম্ম। যে সময়ে তাহারা ভারত আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে সেই একই সময়ে পুরোবর্ত্তী-এসিয়া মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বিজিত হয়। পুরোবর্ত্তী-এসিয়ার ও ভূমধ্যসাগরের নদীমাতৃক দেশ সমূহে সভ্যতার সাধারণ নিয়মগুলির বিস্তার-সাধন করাই ইস্‌লাম-ধর্ম্মের বিশেষ-কার্য্য হইয়াছিল। এইরূপে উহারা ফিনিশীয়, গ্রীক, পারসীক, রোমক ও বাইজেন্‌টিন্‌দিগের কার্য্যধারা বজায় রাখে; এমন কি, মনে হয় যেন উহারা সমগ্র এসিয়া ও য়ুরোপকে বশীভূত করিয়াছিল। কিন্তু ইস্‌লামের চেষ্টা য়ুরোপে বিফল হয়; দূর-প্রান্তবর্ত্তী-এসিয়াতেও ইস্‌লাম কখনই প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই; নিকৃষ্ট জাতির অন্তর্ভূত অভিনব ভক্তের দল ইস্‌লামের ধর্ম্মমতকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছিল। পুরোবর্ত্তী-এসিয়াতেও ইস্‌লাম-ধর্ম্ম কলুষিত হইয়া পড়ায়, যে সকল জাতি ইস্‌লাম-ধর্ম্মের ভক্ত ছিল তাহারা ইস্‌লামধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। ইস্‌লাম-ধর্ম্মের যে তত্ত্বটি বহুফল-প্রসূ, প্রকৃতরূপে বিশ্বমানবের অনুকূল, একমাত্র যাহা অসংখ্য ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার উদ্দীপনে সমর্থ, সেই সাম্যনীতিকে ইস্‌লাম ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছিল। তদ্‌বিপরীতে, যে সকল লোক সর্ব্বপ্রথমে ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় তাহারা ইস্‌লাম-ধর্ম্মের কতকগুলি গৌণতত্ত্বকেই বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। যথা,—অদৃষ্টবাদ, অসির দ্বারা বিধর্ম্মীদিগকে স্বধর্ম্মে আনয়ন, এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আধিপত্য ও রাষ্ট্রীয় কার্য্যসম্বন্ধীয় আধিপত্য এই উভয়ের সংমিশ্রণ। এবং এইরূপ দুই কর্ত্তৃত্বের মিশ্রণের গোলযোগ হইতেই স্বেচ্ছাতন্ত্রের আবির্ভাব হয়। যে ধর্ম্ম বিশ্বমানবিক হইতে পারিত সেই ধর্ম্মকে এই সব লোকেরা স্থানীয় ধর্ম্ম করিয়া তুলিল এবং এইরূপে ইস্‌লাম-ধর্ম্মের বিস্তারে দ্রুত অবনতি ঘটিল।

অতএব, বিশ্বমানবতার ইতিহাসে, ইস্‌লাম ধর্ম্ম কতকগুলি বিশেষ জাতির সভ্যতার মুখপাত্র, কিন্তু ভারতের ইতিহাসে ইস্‌লাম ধর্ম্ম সমগ্র মানবীয় সভ্যতার মুখপাত্র হইয়াছিল।

যে ভারত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতেছিল, ইস্‌লাম সেই ভারতকে গ্রীসীয় জ্ঞানবিজ্ঞান, এবং রোমের, বাইজেনশিয়া এবং পাশ্চাত্য য়ুরোপের বিধিব্যবস্থা ও শিল্পকলা শিখাইল। বর্ণভেদ পদ্ধতির দ্বারা এবং সামন্ততন্ত্রের দ্বারা উৎপীড়িত ভারতকে ইস্‌লাম প্রকৃত সাম্যনীতির মতবাদ প্রদান করিল। এই সাম্য নীতির দ্বারাই ইস্‌লামের অনুগামীরা অপেক্ষাকৃত বলবান, বুদ্ধিমান ও মহান্ হইয়া উঠে।

হিন্দুসভ্যতা ও মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক প্রসারিত এসিয়া-য়ুরোপীয় সভ্যতা—এই দুই সভ্যতার বিরোধের যুগই মধ্যযুগ। ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে যে বিরোধ উৎপন্ন হয় সেই একই বিরোধ আবার আরম্ভ হইল। এইবার কিন্তু এই বিরোধের ফলে সাধারণ সভ্যতার প্রভূত লাভ যইল। বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে হিন্দু-লক্ষণের প্রাধান্য ছিল; কিন্তু ইসলামধর্ম্ম ছিল এসিয়ার ধর্ম্ম। বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় বিস্তার লাভ না করিলেও, ইসলামধর্ম্ম অপেক্ষাকৃত পাকা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল; ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বীরা নিছক্ মুসলমান ছিল; পক্ষান্তরে লোক-সাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা নিছক বৌদ্ধ ছিল না।

তাছাড়া, এসিয়া ও য়ুরোপের প্রভাব সমস্ত ভারতীয় সমাজকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বর্ণভেদ পদ্ধতি সমস্ত ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াকে দমন করিবার দিকে উন্মুখ হয়; উহা হইতে সামন্ততন্ত্র, বিবিধ রাষ্ট্রজাতির সংগঠন ও নূতন নূতন ভাষা উদ্দীপিত হইতে আরম্ভ হয়; ইস্‌লাম উহাদের সংখ্যা বাড়াইয়া তুলিল :—সাম্যতন্ত্র ও যোগবাদ, নূতন নূতন বর্ণভেদ, নূতন নূতন ব্যবসায়, সংস্কৃত সাহিত্য হইতে ধরণধারণে ভিন্ন এইরূপ জনসাহিত্য —এই সমস্তের উদ্ভব হইল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# ছাত্র

বেণীমাধব ভট্টাচার্য্যের টোল আছে; টোলে তিনটি ছাত্র। প্রধান ছাত্রটির নাম কেশব; কেশবের বয়স প্রায় চব্বিশ বৎসর, গৌর বর্ণ দেহ, শ্মশ্রুধারী, বাঙ্গলা ও ইংরাজী রীতিমত শিক্ষা করিয়া এখন আবার সংস্কৃত শিখিবার উদ্দেশ্যে বেণীমাধবের কাছে আসিয়াছে।

দ্বিতীয় ছাত্র যাদব—বয়স আঠার বৎসর, বলিষ্ঠ দেহ। যাদবের সহিত সরস্বতীর বড় বনিবনা নাই, তবে সাংসারিক কর্ম্মে যাদব বেশ পটু।

তৃতীয় ছাত্রটি মধুসূদন, বয়স চৌদ্দ বৎসর, লেখা-পড়ায় তাহার ভারী মন। মধু পুঁথি-হস্তে উদয়-অস্ত পাঠ মুখস্ত করে, কিন্তু পড়া দিবার সময় 'কর্ণের যুদ্ধ-বিস্তার' ন্যায় একটা শব্দও বলিতে পারে না। ছেলেটি গো-ব্যাচারি।

বেণীমাধব ছাত্র তিনটিকে বড় ভাল

বাসেন; তবে কখন কখন কেশবের উপর চটিয়া যান। তাহার কারণ আর কিছুই নয়; কেশবের গোঁফ-দাড়ি আছে, মাথায় বড় বড় চুল তাহাতে আবার সিঁথি কাটা এবং সে মোজা ও বুটজুতা ব্যবহার করে। তবে ছেলেটি বড় বুদ্ধিমান,—আরও একটা কি যেন হয়, কেশবকে দেখিলেই বেণীমাধবের মনে কেমন স্নেহের উদ্রেক হয়।

বেণীমাধবের সংসারে অধিক লোক ছিল না। বেণীমাধবের বধির মাতা প্রসন্ন ঠাকুরাণী; পত্নী তারাসুন্দরী ও বেণীমাধবের ষোড়শ বর্ষীয়া কন্যা কমল। বহুদিন পূর্ব্বে বেণীমাধবের একটি পুত্র আট মাসের হইয়া মারা যায়। কমল মাতার ন্যায় রূপ, গুণবতী পিতামাতার স্নেহের পাত্রী, বৃদ্ধা প্রসন্নর ইষ্টদেবী অপেক্ষাও আরাধ্যা। বধিরেরা স্বভাবতঃ বড় রাগী হয়; প্রসন্ন তাই। ছাত্রেরা বহির্ব্বাটীতে, কমল পিতামহীর নিকট, এবং বেণীমাধব বড় ঘরে শয়ন করেন।

পল্লীগ্রামের বসতি মাত্রেরই এক এক-খানি বড় ঘর থাকে, বেণীমাধবেরও আছে। একখানি দক্ষিণ-দ্বারী বড় ঘর আছে। পূর্ব্ব দ্বারী ঘরে প্রসন্ন থাকেন; একটু দূরে পশ্চিম দ্বারী ঘরে রন্ধন হয় ও অর্দ্ধেকটাতে ভাঁড়ার। বাটীর দক্ষিণ দিকে গো-শালা ও পুষ্করিণী, উত্তরে সদর-বাটী ও চতুষ্পাঠী।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় একটী যুবক ধীরে ধীরে বেণীমাধবের বহির্ব্বাটীতে প্রবেশ করিল এবং উদ্যানে পদচারণা করিতে লাগিল। এমন সময় কাহার অস্ফুট কথা যুবকের কর্ণে প্রবেশ করিল। যুবক ক্ষণেক পাদুকা খুলিয়া রাখিয়া নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে বেণীমাধবের গৃহের জানালার নিকট গিয়া কান পাতিয়া দাঁড়াইল। আগ্রহ ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল, অন্য মনে সে বসিয়া পড়িল। রাত্রি বাড়িতে লাগিল। যুবক সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। কতক্ষণ এইভাবে কাটিল।

যখন একরাশ প্রভাতের স্নিগ্ধ মধুর বায়ু আসিয়া কেশবের গাত্রে ঢলিয়া পড়িল, তখন তাহার চৈতন্য হইল। ওঃ, তাইত! ভোর হইয়া গিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উঠিবার সময় হইয়াছে, আর এখানে থাকা উচিত নয়। কেশব উঠিল, উঠিয়া ধীরে ধীরে উদ্যানে পদচারণা করিতে লাগিল।

ওদিকে বাটীর পশ্চিম দিকে চাঁপা গাছে বসিয়া যেমন একটা কোকিল ডাকিল, অমনি কমলের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কমল বোধ হয় স্বপ্ন দেখিতেছিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দুই হাত বুকে চাপিয়া ক্ষণেক সে স্থির হইয়া রহিল, দুই চক্ষে অশ্রু বহিতে লাগিল। ঘর্ম্মসিক্ত বসন গাত্রে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে। বৈশাখ মাস; রাত্রে অতিশয় গ্রীষ্ম ছিল, অগত্যা কমলকে ঘরের জানালা খুলিতে হইয়াছিল, এখনও জানালা খোলা আছে।

সহসা কমল চমকিয়া উঠিল; তাহার বোধ হইল যেন ঘরের ভিতর একটা ছায়া নড়িল! কমল চকিতে জানালার দিকে চাহিল; বোধ হইল, জানালার কাছে কেহ দাঁড়াইয়াছিল, সরিয়া গেল। কমল ভাবিল, লোকটা কে? ভাবিতে গা শিহরিল, অশ্রু মোচন করিয়া ত্রস্তে সে উঠিয়া বসিল।

মানসে অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া বহির্বাটীতে আসিলেন এবং সম্মুখে কেশবকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "এই যে বাবা! আজ আমি মিরহাটে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করাতে যাব। বাড়ী থেকে যাত্রা ক'রে বেরোলাম, এখন মনে পড়ছে, ছাতাটা আনতে ভুলে গেছি। ফির্‌লে যাত্রা ভঙ্গ হবে অতএব তুমি ছাতাটা আমায় এনে দাও।" "যে আজ্ঞা" বলিয়া কেশব বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং যে গৃহে প্রসন্ন ঠাকুরাণী ও কমল শয়ন করিয়াছিল, সেই ঘরের দাওয়ায় উঠিল। একবার এদিকে ওদিকে চাহিয়া দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিল, "ঠাকুর মা!" কমল আবার শিহরিল। বাহির হইতে কেশব আবার ডাকিল, "ঠাকুর মা!" কমল পিতামহীর গা ঠেলিল। "ও ঠাকুমা, তোমায় কে ডাকছে!" কমলের রুদ্ধ কণ্ঠে স্বর বাহির হইতেছিল না। বাহিরের লোকটি বলিল, "একটু জোরেই ডাক।...কার জন্য কেঁদে কেঁদে আজ গলাটা ভাঙ্গ্‌লে ভাই?"

বহিঃস্থিত ব্যক্তির দ্বিতীয় কথায় আর তাহাকে চিনিতে বাকী রহিল না। কমল বড় লজ্জিত ও বিরক্ত হইল, পিতামহীকে আর ডাকিতে পারিল না, কেবল প্রসন্নকে ঠেলিতে লাগিল।

"দুর্গা দুর্গা হরিবোল হরিবোল" বলিয়া বৃদ্ধা উঠিলেন এবং কহিলেন, "ক্যানেলা, কুঁজকো বেলায় আমাকে ঠিলাঠিলি কচ্চিস্ ক্যানে? থির হয়ে শো'না।" বহিঃস্থিত ব্যক্তি কহিল, "আঃ ঠাকুর মা, তুমিও কি স্বপ্ন দেখছ নাকি! ওঠই না।"

কমল অধিকতর লজ্জিত হইয়া ভাবিল, স্বপ্ন কি আবার পরে জানিতে পারে? আমি যে স্বপ্ন দেখিলাম, তা ও জানিল কি করিয়া? যাই হোক, জানালাটা খুলিয়া রাখিয়া ভাল করি নাই।

বৃদ্ধা উঠিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিবা মাত্র সম্মুখে সহাস্য-বদন কেশবকে দেখিয়া কহিলেন, "দুর্গা, দুর্গা, সকালে উঠেই তোর মু'টো দেখলাম, আজ কি আছে বরাতে, কে জানে?"

কেশব বলিল, "আছে—ভাল ভাল সজলা একাদশী তোমার কপালে।"

বৃদ্ধা কহিলেন, "কপালে আবার কি লেগে থাক্‌বে?" বলিয়া কপালে হাত বুলাইয়া প্রস্থান করিলেন।

কমলও বাহির হইতে উদ্যতা হইল, এমন সময় কেশব ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ক্ষিপ্র হস্তে কমলের অঞ্চলের কাপড় ধরিয়া ফেলিল, কহিল, "দাঁড়াও, তোমার কাছে আমার প্রয়োজন আছে, চীৎকার করো না।" এই বলিয়া কমলের মুখের প্রতি অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

কমল বিরক্তও হইয়া কহিল "আমার কাপড় ছাড়।"

কেশব। কাকে স্বপ্ন দেখছিলে, ভাই,—আমাকে আগে বল।

তেজস্বিনী কমল গর্জ্জিয়া উঠিল, "স্বপ্ন কিসের? সে খোঁজে তোমার কি কাজ? আমার কাপড় ছাড়।" কেশব পরিতৃপ্ত নয়নে কমলের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। কমল কহিল, "কাপড় ছাড়, নাহলে আমি চীৎকার করব।"

কেশব। না, চীৎকার করো না। বেশ, এখনকার মত তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু আমার কথা এক সময় শুন্‌তে হবে তোমায়।

কেশব বস্ত্র ত্যাগ করিবা মাত্র কমল ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কেশব ঈষৎ হাসিল, পরক্ষণেই ম্লান মুখে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঘরের আড়া হইতে গোল-পাতার ছত্রটি পাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

প্রাতঃকাল। বেণীমাধবের বহির্ব্বাটীতে যাদব ও মধুসূদন বসিয়া পাঠ মুখস্থ করিতে-ছিল, এমন সময় ছত্র-হস্তে কেশব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। যাদব কহিল, "এই যে দাদা। আপনাকে ভট্‌চায্‌ মশাই খুঁজতে ছিলেন।" কেশব কহিল, "কোথায় তিনি?"

চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বেণীমাধব নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "এই যে কেশব, দাও বাবা, ছাতা দাও। বেলা হয়ে গেল। যেতে হবে অনেকদূর,—আজ বোধ হয় আর ফিরতে পারব না।"

যাদব। কোথায় যাবেন আপনি?

বেণী। আজ বৈশাখী পূর্ণিমা। মিরহাটে একটা বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা আছে, আসবার সময় বৈষ্ণপুর হয়ে আসব।

মধু। ভট্‌চায্‌ মশাই, কি বিক্ষ প্রতিষ্ঠা হবেন?

কেশব। ভেরেণ্ডা। লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার।

মধু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "না, ভট্‌চায মশাই বলেছিলেন কিনা, যেটা বুইতে না পারবে, বুজ্জে নেবে। তাই জিজ্ঞেস কচ্চি।"

কেশব সহাস্য বদনে কহিল, "বেশ, বেশ, বুদ্ধিমান ছাত্রের লক্ষণই এই। যাও, এখন পড়গে। আমি তোমার পড়া নেব।"

কেশব বুদ্ধিমান ও ছাত্রদের মধ্যে উপযুক্ত, তাই বেণীমাধব কেশবের হাতে সাংসারিক ভার সমর্পণ করিয়া দুইদিনের মত গ্রামান্তরে প্রস্থান করিলেন।

আহারাদির পর কেশব যাদব ও মধুকে পড়াইতে বসিল। যাদবকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "এত করে পড়ি, তবু পড়া হয় না! কি জ্বালাতেই পড়েচি। এই তিন বছর এখানে ভট্‌চায মশাইয়ের গরুর খড় কাটতে কাটতে হাতে কড়া পড়ে গেল, তবু শালার মুগ্ধবোধ কিছুতেই আর শেষ হতে চায় না। এ পড়ার চেয়ে পাঁউরুটি বেচাও ভাল।"

কেশব কহিল, "তুমিই সার বুঝেছ। মধু তুমি কি করবে হে, পড়া দেবে, না, ভাত রেঁধে খাবে?" মধু উপক্রমণিকা ব্যাকরণ লইয়া পড়িতে বসিল। কেশব কহিল, "কইহে তোমার ত কিছুই হয়নি। এই নাও তোমার বই নাও।"

মধু। আজ্ঞা, পড়া হয়েছিল।

কেশব। হয়েছিল ত গেল কোথায়?

মধু। আমি গরু তাড়াতে গিয়ে ভুলে গেছি।

কেশব। বেশ, এবার আর উঠোনা, শক্ত হ'য়ে বসে পড়া কর।

মধু। আজ্ঞা তাই বসি।

কেশব। যাদব ত পাঁউরুটি বেচ্‌বে। তুমি যদি ভাত রাঁধ ত, বেড়ি ধর্ত্তে শেখ। আমি দেখি, না হয় ঝুমুর গাইতে যাব।

মধু সভয়ে কহিল, "না, তাহলে ভট্‌চায্‌

মশাই মার্জ্জেন। সেই সেবার, দুলে পাড়ায় ঝুমুর হয়, আমি শুনতে গেছ্লাম, তাই ভট্‌চায মশাই মেরেছিলেন।

কেশব। (সহাস্যে) তুমি শুনতে গিয়েছিলে তাই তিনি মেরেছিলেন। আমি গাইতে যাব তা আমাকে মার্জ্জেন কেন?" মধুসূদন আপন মনে পড়িতে বসিল। কেশব বেদান্ত পরিভাষা লইয়া দেখিতে লাগিল।

সন্ধ্যা বেলা প্রসন্ন ঠাকুরাণী বলিলেন, "হা কোমল! তু আজকে মুখটি নামিয়ে আচিস্ ক্যানে?"

কমল ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "আমি জানি না। তুই হেথ্‌থে যা।"

বৃদ্ধা বড় ঘরের দাওয়াতে মালা জপ করিতে বসিলেন। কমল প্রদীপ জ্বালিয়া প্রত্যেক ঘরে সন্ধ্যা দেখাইয়া শেষে তুলসী তলায় প্রণাম করিল; পরে রন্ধনশালায় মায়ের নিকট প্রদীপ রাখিয়া পিতামহীর নিকট আসিয়া বসিল।

কেশব বাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "মা!" তারাসুন্দরী উত্তর দিলেন, "কেন বাবা?"

কেশব। ভট্‌চায মশাইয়ের গঙ্গাজলের কোশা কোথা?

তারা। কেন, তোমাদের টোলে ত গঙ্গাজল আছে।

কেশব। ছিল একটু, ফুরিয়ে গেছে।

তারা। ঐ পূর্ব্বদ্বারী ঘরের কোলঙ্গায় আছে।

কেশব পূর্ব্বদ্বারী ঘরের আড়া হইতে আসন লইয়া পাতিল; পরে কোশা লইয়া সায়ংসন্ধ্যা করিতে বসিল।

পূর্ণিমা রাত্রি। সন্ধ্যার সময় চন্দ্রোদয় হইয়াছে। জ্যোৎস্না আসিয়া কেশবের গায়ে ঢলিয়া পড়িল। কেশবের সুন্দর দেহ জ্যোৎস্না মাখিয়া দেব কান্তি ধারণ করিল। কমল একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল; পরে কেশবের উপর চোখ পড়িল। কি দেখিল? নীল আকাশে শশধর-সদৃশ কেশবের মুখ-মণ্ডল শোভা পাইতেছে।

উভয়ের চক্ষু মিলিল, কমলের অঙ্গ শিহরিল—কমল লজ্জিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে একটু বিরক্তও হইল, আপদটা আবার আসিয়াছে! সে অভিসম্পাৎ করিল, কেশবের দুই চক্ষু অন্ধ হোক্।

প্রসন্ন ঠাকুরাণী মালা জপ সাঙ্গ করিয়া পূর্ব্বদ্বারী দাওয়াতে উঠিয়া একটি হুকের গায়ে মালা ছড়াটি লাগাইয়া রাখিলেন; পরে অশুদ্ধ মন্ত্রে আপন ইষ্ট দেবীকে প্রণাম করিয়া দাওয়ায় একখানি মাদুর পাতিয়া শয়ন করিলেন; এবং কহিলেন, "ও কোমল, একটা বালিশ দে'না মা!"

কমল একটা মলিন আবরণ-আবৃত উপাধান বৃদ্ধার নিকট ফেলিয়া দিল; প্রসন্ন কহিলেন, "তুইও শো'না হাওয়াতে।"

কমল। না, আমি শোব না।

প্রসন্ন। কেন ঘরে গিরিস্তিতে পচে মরবি!

কমল। তা হোক, আমি ঘরেই শোব।

প্রসন্ন। কেন, এই আমার কাছে শো, আয় শুবি এইখানে।

কমল ভাবিল, বেশ কথা, এই খানেই শুই, আজ একা অন্ধকার ঘরের

মধ্যে শয়ন করিব না। এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে কমল পিতামহীর নিকট শয়ন করিল।

তখন প্রসন্ন ঠাকুরাণী আপন পিত্রালয়ের গল্প আরম্ভ করিলেন। কমল বিরক্ত হইয়া কহিল, "তোমার আর গল্পে কাজ নাই, থামো। গুল দাঁতে দিয়ে মর। মুখে দোক্তার গন্ধ বেরুচ্চে; যা, আমি তোর কাছে শোব না—উঠে যাই।"

প্রসন্ন অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না, না, উঠচিস্ কেনে? আমি এই তোর দিকে পেচু হয়ে শুই, তুই যাস্ না।"

প্রসন্ন কমলের সন্তোষার্থে প্রাচীরের দিকে মুখ করিয়া শুইলেন। কমল প্রসন্নর দিকে মুখ করিয়া শুইল। আবার গল্প চলিতে লাগিল।

কেশব সায়ংসন্ধ্যা-সমাপনান্তে আসন ও গঙ্গাজল যথাস্থানে তুলিয়া রাখিল, পরে কমলের পশ্চাতে আসিয়া শয়ন করিল। কমল অতি সংকীর্ণ স্থানে পড়িল এবং অতিকষ্টে উঠিয়া পলায়ন করিল। কমল উঠিয়া গিয়াছে, বৃদ্ধা তাহা জানিতে পারিলেন। কিন্তু উঠিবার কারণ কিছুই জানিলেন না। প্রসন্ন কহিলেন, "কেন্ লা, উঠলি কেনে? আয়, গল্প বলি আয়। ও কোমল, আয়লো আয়।" পরিহাস করিয়া কেশব ডাকিল, "ও কোমল, আয়লো আয়।"

প্রসন্ন। ও কোমল! আয়, আয়, একটা শোলক বলি আয়।

কেশব। ও কোমল! আয়, আয়, একটা শোলক বলি, আয়।

কমল আজ সমস্ত দিন ম্রিয়মাণ হইয়া আছে। তাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য প্রসন্ন ঠাকুরাণী এত অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু ব্যথিত হৃদয়া কমলার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। প্রসন্ন পুনরায় আদর করিয়া কমলকে ডাকিলেন, "ও কুমলি, বলি, হাদে আয় না, শুন্‌সে।"

কেশব। ও কুমলি! বলি হাদে আয় না, শুন্‌সে।...ঠাকুর মা, ও আসবে না ঠাকুর মা, তুমি আমাকে গল্প বল।

প্রসন্ন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া কেশবকে দেখিয়া কহিলেন, "ও পোড়াকপালে, তুই এসে শুইচিস্! তাই বাছা উঠে গেল! যা, উঠে যা, ভিগোর কতিকার।"

কেশব। বিলক্ষণ, তাই বুঝি পারি! কমল উঠে গেলে কতক্ষণ পরে আমি এসে শুয়েচি।

প্রসন্ন। হ্যাঁরে হ্যাঁ। ও কোমল। ও উঠে যাচ্ছে, আয়, তুই আয়।

কেশব। যাবে বই কি উঠে, বড় গরজ আমার। (একটু জোরে বলিল) ঠাকুর মা! তুমি আমাকে গল্প বল, কমল তোমার গল্প শুন্‌বে না।

প্রসন্ন। তবে কার গল্প শুনবে?

কেশব। (মৃদুস্বরে) ও বরের গল্প শুন্‌বে।

প্রসন্ন। অ্যাঁ কি বল্লি, ও আস্‌বে না?

কেশব। আমি জানি না, ও আস্‌বে কি না।

প্রসন্ন। আয় কোমল, তোর ছেলে-বেলাকার গল্প বলি, আয়। শোলক শোলক বাঁশের গোঁজা, ভাতটি খেলেই পেটটি সোজা। শোলক বলে, ওমা আমাকে নিয়ে

শো'না। এই শোলকটি না বল্লে আমার কোমলের ঘুম হত না।

কেশব হাসিয়া বলিল, "তুমি এখন ঘুম পাড়াও। আমি দেখিগে আবার ভূতেরা কি কচ্চে।

কেশব বহির্বাটিতে প্রস্থান করিল, কিন্তু কমল আসিল না। কমল কোথায় কি করিতেছে! সে পূর্ব্বদ্বারী ঘরের মধ্যে পড়িয়া ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছে; বৃদ্ধার আহ্বান, কেশবের উপহাস সকলই শুনিতেছে। কমলের যে যন্ত্রণা হইতেছে তাহা কেশব ব্যতীত কেহই জানে ন। কেশবের এক একটি কথা শেলের মত কমলের চিত্ত বিদ্ধ করিতেছে, ইহা কেশব ভাল রকমই বুঝিয়াছে।

পরদিন প্রাতে কমল বারি-পূর্ণ কুম্ভ কক্ষে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, "বড় ঘরে কে গা? কপাট খোলা কেন?" বলিয়া কুম্ভ নামাইয়া দাওয়ায় উঠিয়া বলিল, "ঠাকুমার যেমন কাজ—কপাট খুলে আর দেবে না। তাই ত! ঘরে ঘুট্ ঘুট্ করে কি? কুকুর নাকি?" বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সর্ব্বনাশ! কেশব ঘরে ছিল। দ্বার আগুলিয়া হাসিয়া সে বলিল, "আমি বুঝি কুকুর?"

কমলের মুখ শুকাইল, ভীতচিত্তে সে বলিল, "দাদা! আমি ত তোমাকে দেখি নি। তুমি সর, আমি বাহিরে যাই।"

কেশব। আমাকে আর দাদা বলো না। দাদার ভগ্নীপতিকে যা বলে তাই বলো।

কমলের ঘর্ম্মাক্ত কলেবর কম্পিত হইল। কেশব কহিল, "কমল! আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবি! আমি যে তোমার, আমাকে ভয় কি?" কমল উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। কেশব বলিল, "চুপ কর, আমি ত তোমাকে স্পর্শ করি নি। যাও, বাহিরে যাও।"

কমল নড়িল না। কেশব গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলে কমল কপাট বন্ধ করিয়া মেঝেয় উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

২

আজ বাড়িতে একটা গোলযোগ বাধিয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে কমল রুদ্ধ কক্ষে পড়িয়া আছে। প্রসন্নর ও তারাসুন্দরীর আহারাদি কিছুই হয় নাই। কেহ আজ কমলকে উঠাইতে পারিতেছে না, কেহ খাওয়াইতে পারিতেছে না। আজ সকলেই বিষণ্ণ মুখে আছে। ছাত্রেরা আহারাদি করিয়া যথাস্থানে পাঠ মুখস্থ করিতেছেন। কেশব বই খুলিয়া অন্য মনে বসিয়া আছে। এমন সময় বেণীমাধব শুষ্ক মুখে বাটী প্রবেশ করিলেন; ছাত্রেরা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। বেণী-মাধব বলিলেন, "কি গো! বাড়ীর সব ভাল ত!" যাদব বলিল, "আজ্ঞা হাঁ।" বেণীমাধব বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, বিষম ব্যাপার। কারণ জিজ্ঞাসা করায় প্রসন্ন ঠাকুরাণী সরোদনে বলিলেন, "জানি না বাবা! তোমার বিটিই জানে। আজ সকালে উঠে হেতে, আজ কেনে কাল সকাল হেতে মুখটি নামিয়ে আছে। তা'বই আজ সকালে পাট্ ঝাঁট্ কর্‌লে, তা'বই গা ধুয়ে এসে হেতে সে ঘরে খিল্ দিয়েচে, এ আর

আজ কেউ উটুতে পাল্লে না।” বেণীমাধব সবিস্ময়ে কহিলেন, “অঁ্যা, বল কি, কমলের সাড়া-শব্দ পাও নি।”

প্রসন্ন। তা পাবনা কেনে? কোমল আমার সে আজ কেবলই কাদ্‌চে। বাছা কেঁদে কেঁদে ভাসালে।—বলিতে বলিতে প্রসন্ন কাঁদিয়া অধৈর্য্য হইলেন।

বেণীমাধব বলিলেন, “কেঁদোনা। আমি কমলকে ডাক্‌চি”—বলিয়া বেণীমাধব দ্বারে যাইয়া ডাকিলেন, “কমল! ও কমল! ওঠ মা কমলা! আয় মা আমাকে পা ধুতে জল দে মা! মা কমলা! তুমি না উঠলে আজ আর আমি জল খাব না। মা কমল কুমারি, আজ সমস্ত দিন উপবাস করে কতদূর থেকে চলে আসছি। বড় পিপাসা পেয়েছে, একটু জল দে মা!”

বেণীমাধবের বারবার আহ্বানে একমাত্র প্রাণাধিকা কন্যা কমলার দুঃখ উথলিয়া উঠিল। কমল গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল। হৃদয়-বেগ কতক উপশমিত হইলে কমল ধীরে ধীরে উঠিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিল এবং অবনত বদনে বাহিরে আসিয়া বসিল।

বেণীমাধব কহিলেন, “মা! আজ তোমার এত দুঃখ কেন হল? তোমাকে কেউ কিছু বলেছে কি?” কমল ভগ্নস্বরে কহিল, “না”।

“তোমার কোন অসুখ হয়েছে কি?” কমল চক্ষু মুছিয়া বলিল, “না”।

বেণীমাধব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “ওগো যাদব! একবার এস ত বাবা!” বাহির্ব্বাটী হইতে মধুসূদন একটু উচ্চস্বরে কহিল, “এখানে যাদব দাদা নাই—কেশব দাদা আর আমি আছি।” বেণীমাধব বলিলেন—“কেশব! একবার এদিকে এস ত বাবা!” কেশব দিব্য ভদ্রলোকের মত গলা ঝাড়িয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবনত মস্তকে কহিল, “কেন ডাক্‌চেন্?”

কমল কেশবের সাড়া পাইয়া ঘরের মধ্যে উঠিয়া গেলেন। বেণীমাধব বলিলেন, “তোমাদের আহার হয়েচে ত?”

কেশব। আজ্ঞা হাঁ।

বেণী। আজ এ কাণ্ড কেন হল জান?

কেশব। কি কাণ্ড! ওঃ! কমল ভাত খায় নি বটে! তা ত জানিনা।

বেণী। তা ত জানি না! তুমি যে আপনার পড়া ব্যতীত কিছুরই খোঁজ রাখনা, তা জানি। যাও, এখন একটু তামাক সেজে আন।

গুরুর আজ্ঞা পাইয়া কেশব তামাক প্রস্তুত করিতে গেল। পরক্ষণে কেশব তামাকু প্রস্তুত করিয়া মধুসূদনের হস্তে তাহা বাটীর মধ্যে পাঠাইয়া আপনি বাহিরে পুঁথি দেখিতে লাগিল। এরূপ সদাশয়তা দেখিলে কোন্ অধ্যাপক না সন্তুষ্ট হয়!

বেণীমাধব তামাক খাইয়া হুঁকা রাখিয়া স্নান করিয়া আসিলেন। পরে তারাসুন্দরী অন্ন প্রস্তুত করিয়া স্বামী কন্যা ও শ্বশ্রূকে দিয়া আপনি নিকটে বসিয়া রহিলেন।

আহারান্তে অপরাহ্নে বেণীমাধব সদর দ্বারে বসিয়া তামাকু খাইতেছেন, এমন সময়ে প্রসন্ন ঠাকুরাণী একটা হুজুক লইয়া আসিয়া বলিলেন, “হ্যাদেরে বেণী! ও-বাড়ীর মতির মা বল্লে—বলে, কোথায় নাকি বাগ্দেবী নামে ঠাকুর আছেন, তিনি না কি জানা-অজানা

সবই বল্‌তে পারে! তা একবার কমলকে নিয়ে গেলে হয় না?"

বেণী। ভালই ত। তা কমলকে নিয়ে যাও না কেন?

প্রসন্ন। বাপ্‌রে, বল্‌তে গা শিউরে ওঠে, কোমল না গেলে ফুল চড়াবে কে?

বেণী। সে কতদূর?

প্রসন্ন। মতির মা বল্লে যে এই এইখানে, বেশী দূরে নয়।

বেণী। তাহ'লেও বয়স্থা কন্যা, মাত্র তোমার সঙ্গে পাঠান যায় কি?

প্রসন্ন। আমি কি একা যাব? মতির মা যাবে। তেনার পিশি, পঞ্চুর মা, হাড়ি-খুড়ি যাবে। ছেলের লেগে মানৎ কর্ত্তে নিস্তারিণী যাবে।

বেণী। তা হলেও একজন পুরুষমানুষ যাওয়া চাই।

প্রসন্ন। পুরুষমানুষ আবার কাকে নেবে?

বেণী। যাদব আছে।

বেণীমাধবের কথায় প্রসন্ন লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "না বাবা! কেকুই যেতে হবে না, আমি একাই যাব। ও যাদ্‌বা, উয়োকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না। উয়ো যে আমার সঙ্গে গোণ্ডোগোল করে।"

যাদব সরস্বতীর যেমন প্রিয়পাত্র, প্রসন্নরও তেমনি—উভয়ের সমান সদ্ভাব।

বেণীমাধব সহাস্যে বলিলেন, "তা পথে কি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবে?"

প্রসন্ন। তা পারে। ও ছোঁড়া ভারি বদ—উয়োর সাথে আমি যাবনা।

বেণী। তবে না হয় কেশবকে নিয়ে যাও কিন্তু ওর পাঠ দু'দিন বন্ধ হবে। কেশব বেশ হুঁসিয়ার। সবই ভাল, কিন্তু ওই কেমন একটু বাবুগিরি ঐটে আমার বেশ ভাল লাগে না—মাথায় কোঁকড়া চুল তাতে আবার টেরি কাটা, পায়ে মোজা বুট জুতো মুখে কতকগুলো গোঁফ দাড়ি।" বেণীমাধবের কথায় বাধা দিয়া প্রসন্ন কহিলেন, "তা বই কি—শুনেচি কত্তার মুকে, বিদ্যে যত হোক্ আর নাই হোক্; গোঁফ কামিয়ে মাথায় চৈতন রাখলেই ভস্‌চার্জ্জির মত মান্যি-গন্যি হয়।

বেণীমাধব হাসিয়া বলিলেন, "তাই কাল কেশবকে নিয়ে যাও। আজ সব উদ্যোগ করে রাখ।

প্রসন্ন তাঁহার মাথা-মুণ্ড কি উদ্যোগ করিলেন, জানি না, তবে সমস্ত বৈকালটা বকিয়া বকিয়া তারাসুন্দরীকে পাগল করিলেন। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীশরৎকুমারী দেবী।

---

# দারু-ব্রহ্মের ইতিকথা ও উপকথা

অতীত কালের কোনো-এক জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমার দিনে যখন মন্দিরের দ্বার খুল্লো, তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা যে তিন মূর্ত্তির দেখা পেয়েছিলেন, তার বর্ণনার সঙ্গে এখনকার পুরীর মন্দিরের জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার যে একটুও মিল নেই, তা এইটুকু পড়লেই বেশ বোঝা যাবে—

ইন্দ্রদ্যুম্ন দেখলেন—"শঙ্খচক্রগদাপদ্মলক্ষ্ম-

বাহু জনার্দ্দন।” শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম-হস্ত জগন্নাথ। বলরামকে দেখলেন রাজা—“গদা-মুষলচক্রাজং ধারয়ন্ পন্নগাকৃতিঃ ছাত্রাকৃতি-ফণা।” গদা মুষল চক্র ও পদ্মহস্ত, মাথায় সাপের ফণা ছত্রাকার। সুভদ্রাকে দেখলেন রাজা—“চারুবদনাবরাজাভয়ধারিণী।” চারু-বদনা, বরাভয় ও পদ্মহস্তা। ইন্দ্রদ্যুম্ন ছিলেন হিন্দুরাজা, পরম ভাগবৎ। কাজেই তাঁর যা দেখা উচিত ছিল, ঠিক তাই দেখেছিলেন—পুরাণের মতের সঙ্গে হুবহু মিলিয়ে। কিন্তু এখনকার লোকেরা তো ঠিক তিন-দেবতার এ-রূপটি দেখতে পাচ্ছেনা; তারা যা দেখছে, আর পটে লিখে পাণ্ডার সঙ্গে দিয়ে আমাদের যা দেখাচ্ছে, তা না মিল্‌ছে ইন্দ্রদ্যুম্নের সঙ্গে, না মিল্‌ছে পুরাণের সঙ্গে। বৌদ্ধদের বুদ্ধ, ধর্ম্ম, শঙ্খ—এই তিনটি মূর্ত্তির সঙ্গে কতকটা মেলে কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। (বিশ্বকোষ, “জগন্নাথ” ৫৭৫ পৃঃ দেখ।)

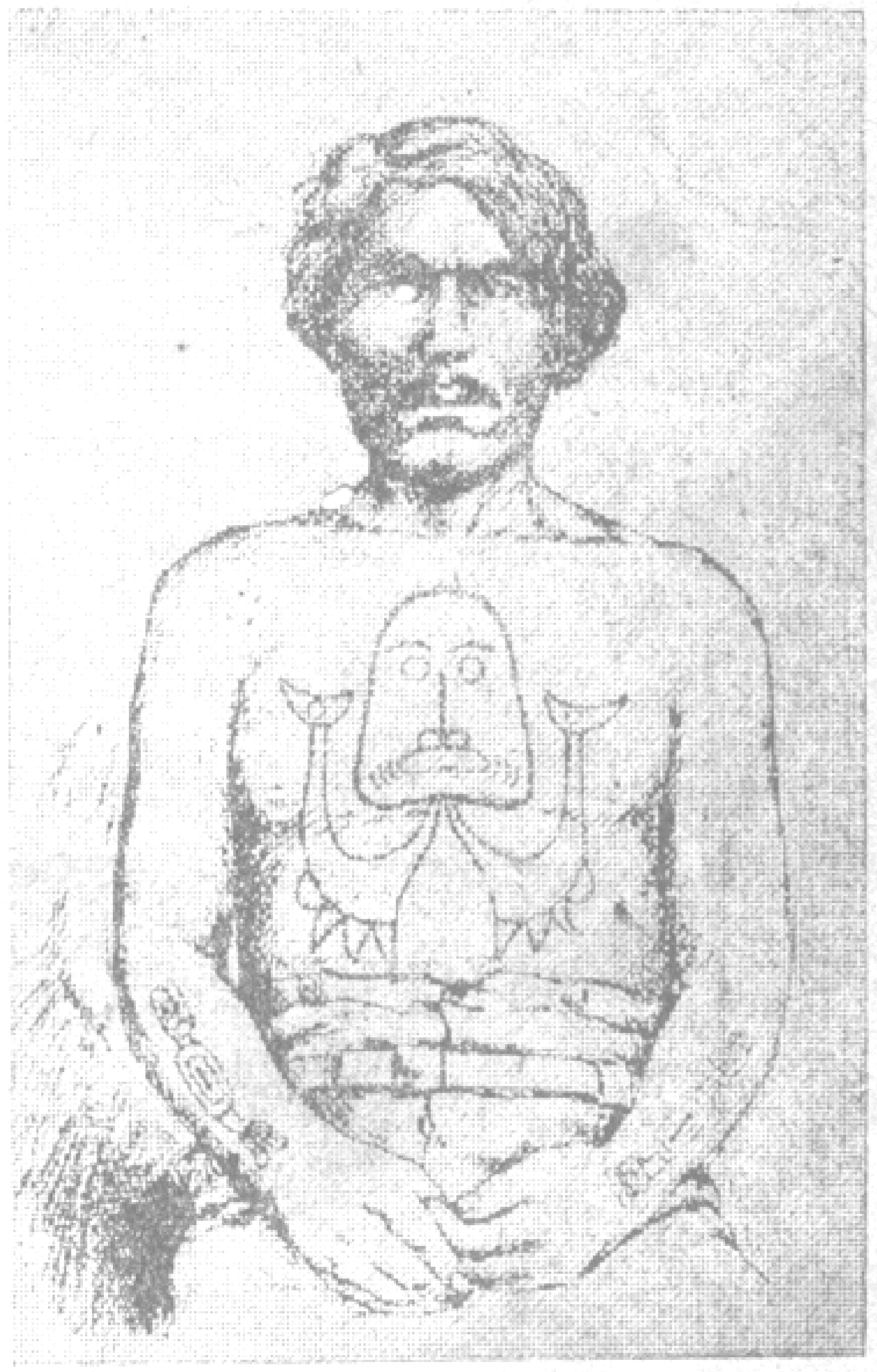
গড়নের দিক দিয়ে দেখলে এই তিন মূর্ত্তি যে ইন্দ্রদ্যুম্নের ঠাকুর তা একেবারে বোধ হয় না; অথচ এটা দেখছি যে যেমন এক তাজমহল, তেমনি এক এই পুরীর ত্রিমূর্ত্তি, আর-কোথাও ভারতবর্ষে এমনটি গড়ন কোনো শিল্পীই দিলেনা—এরি বা অর্থ কি? কাজেই এটা বলতে হবে যে পুরাণের ইন্দ্রদ্যুম্ন কাণ্ডের চেয়ে লোকের মুখে-মুখে সমুদ্র দিয়ে দারু-ব্রহ্মের ভেসে আসার গল্পটায় অনেকখানি সত্য-কথা লুকানো রয়েছে। একখানা কাঠ—মূর্ত্তি কি গাছের গুঁড়ি, বোঝবার যো নেই—ভেসে এসে সমুদ্র-তীরে লাগলো; রাজা লোক দিয়ে হাতি দিয়ে সেটাকে ওঠাবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না; শেষে ইতিক-

জাত যে শবর, সে এসে হাত লাগাতেই দারু—তিনি উঠে এলেন। এটুকুর মধ্যে অনেকখানিই ইন্দ্রদ্যুম্নের স্বপ্ন বা পৌরাণিক কল্পনা; কেবল শবর আর গাছের গুঁড়ি এইটুকুই কাজের কথা। কেন না এরা না হলে কোনো কাজই হতোনা;—গাছ যেখানকার সেখানে থাকতো।

যাই হোক, ধোরে নেওয়া যাক্, ইন্দ্রদ্যুম্নই মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য কাঠ এনে বারোশো কারিগর ডাকলেন—কাঠখানা চেঁচে-ছুলে শাস্ত্র-মতো ত্রিমূর্ত্তি গড়তে। কিন্তু তাদের সাধ্য হল না! সাধ্য হলনা—অস্ত্র ভোঁতা হল, এই কথাই শাস্ত্র ও পুরাণ লিখলেন। কিন্তু শবরদের দেবতা বা কোনো অজানা দ্বীপ থেকে ভেসে-আসা অজ্ঞাত দেবমূর্ত্তির উপরে হাত-চালাতে তাদের সাহসে কুলোলো না, এ-কথা কেউ বলতে চাইলে না। কিন্তু সত্যি কথা চাপা রইলো না। জগন্নাথের ইতিহাসের একদিক পাকা করে বাঁধা হল, আর-একদিক আল্‌গা রইলো। বাসু মহার্ণা, বুড়ো শিল্পী, সে চিরদিন দারু-মূর্ত্তি গড়ে পাকা, সে এসে কাঠ নিয়ে বারো দিনের জন্যে মন্দিরের মধ্যে বসে রাজ-ভোগ খেয়ে আরাম করতে চল্লো। তার পর একসময় যে-মূর্ত্তি ভেসে এসেছিল, তারি ছাঁচে বলরাম আর সুভদ্রা গড়ে, দেবতা এবং রাজা দুয়েরই ভয়ে রাতারাতি একদিন অন্তর্দ্ধান! দিন-দশেক পরে মন্দিরের মধ্যে আর বাটালির শব্দ হয়না, হাতুড়িরও ঘা পড়ে না, সন্দেহ হল! রাজা দরজা খুলে দেখেন—তিন মূর্ত্তি; কিন্তু শাস্ত্রের সঙ্গে মেলেনা। সেই অসম্পূর্ণ মূর্ত্তিকে সোনার হাত-পা দিয়ে গহনা-গাটি

দিয়ে ঢেকে রাজা নিজের ও শাস্ত্রের সম্মান দুইই রেখে, ধন্য হয়ে গেলেন। কিন্তু গোলে পড়লো এখনকার লোক। এই মূর্ত্তি কোথা থেকে, কেমন করে এল, তার আর ঠিক হচ্ছেনা। পণ্ডিতেরা নানা কথা বলেছেন। এই তিন মূর্ত্তির ইতিহাসেরও যেখানে যা ফাঁকি বা যেখানে যা সত্যি আছে তা শুধু বিশ্বকোষের ক'খানা পাতা ওল্টালেই ধরা পড়বে।

আমি শুধু গড়নের দিক দিয়ে বলতে চাই এই তিন মূর্ত্তির জুড়ি মূর্ত্তি ভারতবর্ষে না মিল্লেও, অনেক দেশের আদিম মানুষের মধ্যে মিলবে। শবর জাত যতদিনেরই হোক, তাদের সঙ্গে নানা দ্বীপ-উপদ্বীপের আদিম জাতির শিল্প আর চিন্তার মধ্যে একটা যে মিল, সেটা থাকা অসম্ভব নয়। অসভ্য অবস্থায় প্রায় সব দেশেই সব মানুষের একটা চরিত্রগত মিল দেখা যায়। ভারতের সাঁওতাল-কোল, আফ্রিকার নিগ্রো, ফিজিদ্বীপের অসভ্য—এদের মধ্যে সাজ-সজ্জা আচার-ব্যবহার—এমনি নানা বিষয়ে মিল আছে;—যদিও এক-দেশের থেকে আর-দেশের মধ্যে অনেকখানি সমুদ্র ব্যবধান রয়েছে। এখন যদি বলা যায় যে এই যে পুরীর তিন মূর্ত্তি, এঁরা মোটেই হিন্দুর দেবতা ছিলেন না—এখন হয়েছেন—সমুদ্রতীরের শবর-ধীবরদেরই ইনি মৎস্যেন্দ্ররূপী কোনো আদিম দেবতা, তবে শাস্ত্রের সঙ্গে হয়তো বিরোধ হবে, কিন্তু চাক্ষুষ-প্রমাণের সঙ্গে ঠিক মিলবে—যদি আলাস্কার ধীবর-রাজার যে-মূর্ত্তিটি প্রকাশ করা যাচ্ছে, তার বুকে ও হাতে মৎস্য-দেবতার যে চিহ্ন আঁকা আছে, তার দিকে লক্ষ্য করা যায়। Mr. Niblack এই ছবি "The Open Court" পত্রিকার ১৭৪ পৃষ্ঠায় দিয়েছেন, সে সঙ্গে এইটুকু বর্ণনা



আলাস্কার ধীবর-রাজা

—"Chief Klue has been portrayed by Mr. Niblack, decorated with the totems of the Haida vlllage which he governs. The figure of a codfish is tatooed in his breast and salmon on each arm."

মৎস্যদেবতা আর তাঁর দুই পার্শ্বদেবতা—কুলুই রাজার এই তিন মূর্ত্তি আর আমাদের শবর-রাজার দেবতা, যাঁর অনুচরদের এক-জনকে দৈত্যপতি নাম দিয়ে জগন্নাথের পুজোয়, আর-একজন বলভদ্রগোত্রীয় 'সুয়ার'কে জগন্নাথের ভোগ রাঁধবার ভার দিয়ে জাতি-নির্ব্বিশেষে প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা করে তবে ইন্দ্রদ্যুম্ন ছাড়া পেয়েছেন, সেই আদিম ভারতের তিন মৎস্যদেবতার কোনো সম্পর্ক আছে

কিনা সেটা বিচারের বিষয়। হিন্দুদের মধ্যে মৎস্য, মৎস্য-অবতার থেকে আরম্ভ করে মীনধ্বজ প্রভৃতি অনেক মূর্ত্তিতে এখনো পূজা পাচ্ছেন। এমনি কত আদিম যুগের কত-কি আস্তে-আস্তে রূপান্তর হয়ে নতুন ধর্ম্মের মধ্যে নতুন নামে চলে যায়। শাস্ত্র অনেক ঢাকা-ঢোকা দিয়ে অনেক জোড়া-তাড়া লাগিয়ে ক্রমে সেগুলোকে আপনার করে নেবার চেষ্টা পায়। এই হচ্ছে কথা।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# রসের প্রলাপ

"ঠান্‌দি, আমার ঠাকুরদাদা
  ডাকতো তোমায় কি বলে?"
"সারাদিনটা এলোমেলো
বকিস কেন? বেলা গেলো,
পাগলি আমায় ছেড়ে দেলো—
  যাই কাজে চলে।"

বলো "দুটি পায়ে পড়ি তোমার
  ঠান্‌দিদি গো ঠান্‌দিদি!—"
"সে সব যে ভাই ভুলে গেছি;
তার মরণের পেছোপেছি
'কনে-বউ'-ডাক্ শেষ শুনেছি
  আজ সে কি দিদি?"

"ঠান্‌দি, আমার ঠাকুরদাদা
  দিত তোমায় কি কিনে?"
"হীরের কণ্ঠী ভুবন-আলা,
মাণিক-জ্বালা মুক্তো-মালা।
ছাড়্ না আঁচল—একি জ্বালা!
  —কথা শুনবিনে?"

"বেবাক ঝুটো! সত্যি বলো—
  ঠান্‌দিদি গো ঠান্‌দিদি!—"
"পাঁচ-রকমের রকমারি
কাঁচের চুড়ি বেলোয়ারি,
পায়নাপোলি, পার্শী সাড়ি,
  হিসেব তার কি দি!"

"ঠান্‌দি, আমার ঠাকুরদাদা
  তোমাকে কি করতো ভয়?"
"বাঘ না ভূত? না গুরুমশাই?"
জুজু? না, কি ঠাকুর গোঁসাই?
ভয় যে করবে বল্ দেখি তাই!
  —গোলাম সে ত নয়।"

"দুটি পায়ে পড়ি তোমার
  ঠান্‌দিদি গো ঠান্‌দিদি!—"
"ভয় মানে কি? মোটের মাথায়,
শুনতো কথা চলায়-ফেরায়
হাজ্‌রে দিত রাত দশটায়
  সে মোর আচল-নিধি।"

"ঠান্‌দি, আমার ঠাকুরদাদা
প্রেমের চিঠি লিখতো কি ?"
"থাকলে তুই লো, লিখতো তোকে,
ভুলিয়ে নিত একশোলোকে,
নাত-জামাইটি কাঁদতো শোকে
—'প্রাণ যায় সখি !'

"দুটি পায়ে পড়ি তোমার
ঠান্‌দিদি গো ঠান্‌দিদি !—"
"মৌমাছি কয় ফুলকে ডেকে,
চাতক চেঁচায় মেঘ না দেখে,
দূরের মানুষ দূরকে লেখে ;—
বিরহের বিধি।"

"ঠান্‌দি, আমার ঠাকুরদাদা
কিসে তোমার ভাঙতো মান ?"
"উৎরে গেল সন্ধ্যেবেলা,
যাই আমি, কাজ আছে মেলা,
পোড়ারমুখীর এ কি খেলা
সারা দিনমান !"

"দু'টি পায়ে পড়ি তোমার
ঠান্‌দি আমার ঠান্‌দি গো !—"
"ঝগড়া হলে ধোর্‌তো পায়ে,
গায়-পড়া সে পড়তো গায়ে,
চিরকালের প্রথাটা এ
রণের পরে সন্ধি লো !"

"ঠান্‌দি আমার ঠাকুরদাদা
চুমো দিত দুই গালে ?"
"ফোগ্‌লা-দাঁতে হাসাস্‌নে ভাই !
চুমোর কথা বল্‌ব কি ছাই !
তেমন চুমো দেখ্‌তে না পাই
তোদের এই কালে !"

"দু'টি পায়ে পড়ছি তোমার
ঠান্‌দিদি গো রঙ্গিণী !—"
"আলোর তবে কর্‌ আয়োজন,
জপ-আহ্নিকের নেই প্রয়োজন,
( চল্‌ ) প্রলাপ রচি আমরা দু'জন
দুইবয়সের সঙ্গিনী।"

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

---

# নিশির ডাক

সে একদিন দেবতার খেয়ালে দুপুর বেলাতেই সন্ধ্যা নেমেছিল। ক'দিন থেকেই আকাশটা মেঘলা মেঘলা করে ছিল, সেদিন চারদিককার যত মেঘ জড় হয়ে সহরটার ঠিক উপরেই একটা কালো চাঁদোয়া খাটিয়ে দিলে। দুপুর বেলাতেই মনে হতে লাগ্‌ল, যেন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

সেদিন ছিল রবিবার। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা বৃষ্টি নামবার আগেই গুপীনাথের দরবারে আসর জমিয়ে বসেছিলুম।

আমাদের মধ্যে ঘোর তর্ক চল্‌ছিল যে মৃত্যুর পরে মানুষ আবার ফিরে আস্‌তে পারে কি না, আর এলেও তারা জ্যান্ত

মানুষের কোন ক্ষতি কিংবা ভাল করতে পারে কি না?

তর্কটা ওঠবার কারণ হচ্ছে আমাদের পাড়ায় একজনদের বাড়ীতে ভীষণ ভূতের উপদ্রব চল্‌ছিল। এক ভদ্রলোক স্ত্রী মারা যাবার মাস দুই যেতে-না যেতে আবার একটী বিবাহ করেছিলেন এবং সেই প্রথমা স্ত্রী দ্বিতীয়ার উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার আরম্ভ করেছেন। মহিলাটী খেতে শুতে কোন কাজে সোয়াস্তি পাচ্ছেন না।

ব্যাপারটা যে কি তা আমরা অবশ্য কেউ প্রত্যক্ষ করিনি। তার কারণ আমরা এ-সব বিষয় প্রত্যক্ষ না করেই বিশ্বাস করতে রাজী ছিলুম।

গুপীনাথ কিন্তু এ-সব ভৌতিক ব্যাপার একবারেই বিশ্বাস করতে চায় না, সে বলে, ও সব ভুয়ো কথা। আমরা সকলেই এক-একটা শোনা ভূতুড়ে কাণ্ডকে নিজেদের অভিজ্ঞতা বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা কর্‌ছিলুম, গুপীনাথ নির্ব্বিকার ভাবে সেগুলোকে "আমি ও-সব বিশ্বাস করি না" বলে উড়িয়ে দিতে লাগল।

নিশিকান্ত এতক্ষণ একধারে বসে একটা বড় তাওয়া-দেওয়া কল্‌কের সদ্ব্যবহার করছিল। সুখ-টানটী মেরে সে একটু এগিয়ে এসে বল্লে—"আচ্ছা, আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি, তার উপরে যদি কলম চালাতে হয় ত চালিয়ো।"

নিশিকান্ত বলতে লাগল,—"জন্মাবধিই বিধাতা আমাকে বেশ সুনজরে দেখতে আরম্ভ করেছিলেন। বারো বছর পেরোতে না পেরোতে আমার বাপ, মা, আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে ছিল একেবারে মরে হেজে সব সাফ হয়ে গেল। আমার আজকের অবস্থা দেখে তখনকার বিচার কেউ করোনা, এখন যদি আমার নাইতে খেতে একটু বেলা হয়ে যায় ত অন্ততঃ পঁচিশটী লোক আমার জন্য হায়-হায় করতে থাকে। কিন্তু সেদিন, সেই বারো বছর বয়সে দুনিয়ায় এমন কেউ ছিল না যে আমায় ডেকে জিজ্ঞেস করে, "তোর খাওয়া হয়েছে কি না?"

আমাদের পাড়ায় একজনদের বাড়ীতে একটী বাঙ্গালী চাকর ছিল, তার নাম অমৃত, তার সঙ্গে আমার বড় ভাব ছিল। সে আমায় একদিন পরামর্শ দিলে—দেখ, গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না, তুমি এখান থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে কাজকর্ম্ম করবার চেষ্টা দেখ, বিদেশে গেলে চাকরী কি ব্যবসা যা হয় একটা সুবিধে লেগে যেতে পারে।

সুবিধে লাগবার আশায় আমি সেই দিনই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। তারপর প্রায় দশটী বছর এদেশ সেদেশ ঘুরে সুবিধে ত লাগ্‌লোই না, উল্টে এই ঘোরাটাই আমার একটা রোগ দাঁড়িয়ে গেল। এই রোগের ঠেলায় কখনো আমি এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারতুম না। একদিন এখানে, একদিন সেখানে চাকরী করে, বাসন মেজে, কখনো বা ভাড়াটে গাড়ীর গাড়োয়ানের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সহিসের কাজ করে আমার দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল। আবার হাতে কিছু পয়সা এলে সেই দিনই সেখান থেকে সরে পড়তুম।

এই ঘুর্ণী রোগ ঘোরাতে ঘোরাতে আমায় একদিন রাজপুতানার মরুভূমির মধ্যে এনে ফেল্লে।

রাজপুতানায় অন্য দেশের মত পয়সা রোজগারের সুবিধে মোটেই নেই, সেখানকার সবারই অবস্থা প্রায় আমার মত। কাজ দেবার চেয়ে কাজ করবার মত লোকই সেখানে বেশী। শুনেছিলুম, আমাদের দেশের এক কালী সেখানে আছেন। ইচ্ছে হল, একবার তাঁকে দেখে যাই। বাঙ্গলার সম্পদ ছেড়ে এই ভিখিরীর দেশে তিনি কি সুখে পড়ে আছেন, সেইটে দেখে যাবার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু এই দেবতা দেখতে যাওয়াই আমার কাল হয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে দেবতাদের সঙ্গে আমার যেমন বনিবনা, সেইটে বুঝে না গেলেই চল্‌ত,—কিন্তু তখন ততটা খেয়াল হয়নি।

সন্ধ্যার ঝোঁকে মন্দিরের দরজার কাছে গিয়ে হাজির হলুম। তখন দেবীর আরতি চলেছে। কাঁচা চামড়া আর কাঁসী পিটে যতটা আওয়াজ করা সম্ভব তা হচ্ছে। লোকজন অনেক জড় হয়েছে; স্ত্রীলোকের সংখ্যাও বড় কম নয়। কিন্তু তাদের দেখে মনে হলো, তারা যেন এ ভিখিরীর রাজ্যের লোক নয়। সবাই হাত যোড় কোরে এক দৃষ্টে দেবীপ্রতিমার দিকে তাকিয়ে আছে! আর থেকে থেকে তাল-মাফিক বিকট একটা চিৎকার করে আবার নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই রকম প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে আরতি চল্‌ল; তারপর একে একে সবাই দেবীকে প্রণাম করে যে যার ঘরে চলে গেল। আমি একলা মন্দিরের সাম্‌নে চাতালটাতে বসে বসে ভাব্‌তে লাগলুম—আজকের দিন ত গুজরান হয়ে গেল।

মনে হচ্ছিল, এই সব বড় লোকদের মধ্যে যদি কেউ আমাকে এখান থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার অগাধ সম্পত্তির মালিক করে দেয় ত মন্দ হয় না। ভিতর থেকে আর একজন বলে উঠলেন—দূর্, তাও কখনো হয়?

যিনি কথাটা প্রস্তাব করেছিলেন, তিনি অম্‌নি মাথা নাড়া দিয়ে বল্লেন—কেন হয় না, এ রকম যে একেবারে কখনো হয় নি, এমনো ত নয়।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে রাত বাড়তে লাগল, পুরুত এসে আর একবার কি সব মন্তর আওড়ে প্রতিমার ঘরের দরজায় চাবি লাগিয়ে চলে গেল।

রাত্তিরের ডাক তোমরা কেউ শুনেছ? হাঁ, রাত্তির ডাকে। সে একটা অখণ্ড আওয়াজ, ঝাঁ—ঝাঁ—ঝাঁ—ঝাঁ—আবার মধ্যে মধ্যে সেটা গুম্ হয়ে বাজতে থাকে, ঝম্—ঝঝম্—ঝম্। একমনে শুনতে শুনতে মনে হয়, যেন রাত্তির ডাক্‌ছে—আয়, চলে আয়, আমার এই নিবিড় কালো অন্ধকারের বুকে লুকিয়ে খেলবি যদি আয়। আমি মন্দিরের চাতালে একলা পড়ে পড়ে সেই রাত্তিরের ডাক শুনতে লাগলুম।

একমনে এই ডাক শুনছি, হঠাৎ যেন মনে হল, সেই জমাট ঝাঁ ঝাঁ আওয়াজের মধ্যে থেকে একট মিঠে আওয়াজ ফুটে উঠেছে! আস্তে আস্তে সে আওয়াজটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগ্‌ল। যেন দূরে কে নূপুর পায়ে দিয়ে যাচ্ছে।

ঘুমুরের আওয়াজ অনেক শুনেছি, কিন্তু এ যে তার চেয়ে কত মিঠে, তা যে না শুনেছে সে বুঝতে পার্‌বে না। কিছুক্ষণ ত শুনে

শুনতেই সেই অজানার প্রত্যেক চরণ-বিক্ষেপের তালে তালে আমার বুকের ভিতরটা নাচতে সুরু করলে। তার প্রতি চরণ-ক্ষেপে এমন একটা সুর, এমন একটা মিঠে রাগিণী বেজে উঠ্‌ছিল যে তার চলনের লীলায়িত ভঙ্গী আমার চোখের সাম্‌নে জেগে উঠতে লাগল। মনে হলো, বোধ হয় কোন বড় ঘরের মেয়ে এই রাত্রির ডাক শুনতে পেয়ে অভিসারে বেরিয়ে পড়েছে। একবার ভাবলুম, পেছু নেব নাকি? আবার মনে হল—কাজ কি বাবা! গরীবের ছেলে, শুয়ে পড়—শুয়ে পড়, মনটা যদি বেশী উতলা হয় ত মাথা অবধি চাদরটা টেনে দাও।

মাথার উপর ত চাদর টেনে দিয়ে শুয়ে পড়া গেল। কিন্তু মনের উপর যেই চাদর মুড়ে দেবার চেষ্টা করি, অমনি সেই নূপুরের আওয়াজ যেন চাদরের একটা খুঁট তুলে ধরে বল্‌তে থাকে—কোথায়? দেখি—দেখি, অত লজ্জা কিসের?

আওয়াজটা ক্রমেই মন্দিরের কাছে এগিয়ে আসতে লাগল, শেষে আর পারলুম না, মাথার চাদর তুলে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। উঠেই দেখি, আমার সাম্‌নে একটু দূরে এক সুন্দরী এসে দাঁড়িয়ে আছে। রাজপুতানার কাটখোট্টা বুকে এমন গোলাপ জন্মায় দেখে সত্য-সত্য আমার দেশটার উপর ভক্তি হতে লাগল। দূর থেকে দেখলুম, সুন্দরীর সন্ন্যাসিনীর বেশ, গেরুয়া রংয়ের কাপড়ে তার শরীর ঢাকা, হাতে একটা বড় গোছের চিম্‌টে। বুঝলুম, যেটা এতক্ষণ নূপুর হয়ে আমার বুকের মধ্যে নাগরদোলার তোলপাড় লাগিয়েছিল, সেটা আসলে নূপুরই নয়। মনে হলো, রাজপুতানা কি যাদুকরের দেশ বাবা! চিমটে বাজাবার বাহাদুরী আছে, বটে!

ভৈরবী আমার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আস্‌তে লাগল। দু' এক পা চল্‌তে না চলতেই বুঝলুম, কৈ, এ ত চিম্‌টের আওয়াজ নয়! ঐ ত পায়ে পায়ে বাজ্‌ছে রিণি ঝিণি, রিণি ঝিণি—নিজেকে তারিফ করে বল্লুম—আমার দ্বারা এত বড় ভুল হওয়াও কি সম্ভব? যা মনে করেছি, তা না হয়ে আর যায় না।

সুন্দরী পায়ে পায়ে একেবারে আমার সম্মুখে এসে দাড়াল। তার দিকে চেয়ে দেখে বুঝতে পারলুম, দূর থেকে দেখে তার উপর অবিচার করা হয়েছে, সে সুন্দরী নয়—অপরূপ সুন্দরী। সৌন্দর্য্যের দেবী বল্লেও তার রূপের বোধ হয় ঠিক বিচার করা হয় না। তার পাৎলা গেরুয়া কাপড়ের ভিতর দিয়ে লাল মখমলের পেশোয়াজ দেখা যাচ্ছে, পেশোয়াজের উপরকার সাঁচ্চা জরির সলমা-চুমকীর কাজগুলো সেই গেরুয়া রংয়ের উপর ঝিলিক মার্‌তে লাগ্‌ল। নিটোল বুক বহুমূল্য কাঁচুলী দিয়ে ঢাকা। কাঁচুলীর পর থেকে নীবি-বন্ধনের সীমা অবধি অনাবৃত দেহের বর্ণ বিদ্যুতের মত ঠিকরে এসে আমার চোখকে ধাঁধিয়ে দিতে লাগ্‌ল। একে এই রাজকুমারীর মতন বেশ-ভূষা, তার উপর সর্ব্বাঙ্গ গৈরিক বসনে ঢাকা, হাতে চিমটে ইত্যাদি দেখে মনে হলো নিশ্চয়ই সে অভিসারে বেরিয়েছে। কিন্তু অভিসারেই যদি বেরুবে, তবে পায়ের পাঁয়জোর খুলে আসেনি কেন? আমার মনের ভিতর কি রকম যেন ভয়-ভয় করতে লাগ্‌ল।

ভৈরবী মাথা নীচু করে আমার দিকে আরো অগ্রসর হতে লাগল। এবার সে এত ধীরে ধীরে পা ফেলতে লাগল যে আমার মনে হল মাটিতে তার পা ঠেকছে না। ঠিক যেন প্রথম-প্রণয়-ভীতা সলজ্জ বধূ দয়িতের গৃহপানে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। মনে হল, দেখা যাক্, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! আমি স্থির হয়ে বসে রইলুম।

ততক্ষণে সে আমার পাশে এসে বসে পড়েছে। খানিকক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ সে মুখ তুলে আমার দিকে চাইলে। ওঃ, কি সে করুণ দৃষ্টি! জন্ম-জন্মান্তরেও আমি সে চাহনি ভুলতে পারব না। সে চাহনির স্পর্শে আমার বুকের ভিতরটা একেবারে হিম হয়ে যেতে লাগল। আমার কি রকম যেন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে বল্লে —তবু যাহোক মনে পড়েছে!

—মনে পড়েছে!!! এ বলে কি? কার কথা বলছে?

সে আবার বল্লে—কি, কথা কইবে না? অভিমান হয়েছে?

কোন্ পাষণ্ডকে ভ্রম করে এ কথা কাকে বল্‌ছে সুন্দরী?—হায়, হায়,—সত্য সত্যই আমি যদি সে-ই হতুম!

ভৈরবী আবার বল্লে—ওগো বলনা, কতদিন—কতকাল আর এমনি করে কাটবে? আমাদের কি মিলন হবেনা? এবার সে আমার একখানা হাত চেপে ধরলে।

আমি আর থাকতে পারলুম না। মুখ ফুটে বলে ফেল্লুম—সুন্দরী, আপনার ভ্রম হয়েছে; আপনি যাকে মনে করেছেন আমি সে ভাগ্যবান নই।

ভৈরবী একটু হেসে বল্লে, বাঃ! বেশ কথা বলতে শিখেছ তো! আমার ভুল হচ্ছে? আচ্ছা, দেখ দিকিন এটা চিন্‌তে পার কিনা? এই বলে তার ডান হাতখানা আমার হাতের উপর ধরলে। তার হাতের আঙ্গুলে একখানা বড় হীরের আংটি ঝক্ ঝক্ করছিল, সেটাকে দেখিয়ে বল্লে—এ আংটি কার?

সর্ব্বনাশ আর কি! একটা রূপোর দোয়ানী হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করবার আশা যার তখন নিতান্ত দুরাকাঙ্খা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার কাছে সেই জল্‌জ্বলে হীরের আংটি—অদৃষ্টের বিড়ম্বনা না হলে আর এমন হয়! চুপ করে ভাবতে লাগলুম—কি বলা যায়। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে বল্লে—কেমন, চিনেছো ত? আমি বল্লুম—আমায় মাপ করবেন! আমি কিছু বুঝতে পারছি না, একটু খুলে বলুন।

—আবার সেই দীর্ঘ ইতিহাস খুলে বলতে হবে? ভৈরবী আর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লে। আমার মনে হল, যেন সেই নিশ্বাসের বাতাসে তার দুঃখের বোঝাটা সেই খানেই জমাট বেঁধে স্থির হয়ে মাটিতে পড়ে রইল।

—আর সে সব কথা বলবার আমার ধৈর্য্য নেই। আচ্ছা, আমার সঙ্গে এস, যদি তোমার কিছু মনে পড়ে ত দেখি!

কৌতূহল ক্রমেই বাড়তে লাগল। কোথায় দিন-ভিখারী আমি,—আমার উপর আজ একি সৌভাগ্য-বৃষ্টি ঝরতে আরম্ভ

হয়েছে! মনে মনে বল্লুম, ভগবান তুমি আছ, নইলে আমার উপর কে এমন করে সৌভাগ্য ঢেলে দেবে। কি জানি কেন চট্ করে এতদিন পরে অমৃতের কথা মনে পড়ে গেল। মনে মনে তাকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে বল্লুম—জিতা রহো বাবা অমর্ত্ত, ঠিক বলেছিলি—গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না, এবার দেশে ফিরে গিয়ে নিশ্চয় তোকে বালাখানা বানিয়ে দেবো।

চুপ করে আছি দেখে সুন্দরী বল্লে—কি গো ভয় হচ্ছে? তার কথা শুনে আমার চমক ভাঙ্‌ল—আমি বল্লুম—ভয়! সুন্দরী তোমার সঙ্গে যদি যমের বাড়ীও যেতে হয় ত আমি সুড় সুড় করে চলে যাব। তড়াক করে উঠে বল্লুম—চল, কোথায় যেতে হবে।

ভৈরবী বল্লে—আমার হাত ধর। আমার হাত ধরে সে অগ্রসর হতে লাগ্‌ল। দু'-এক পা চলতে না চলতেই আমার পা দুটো যেন মাটি থেকে উপরে উঠে পড়ল, আমরা শূন্যের উপর দিয়ে শাঁ শাঁ করে ছুটতে লাগ্‌লুম। মাটিতে পা লাগচে না অথচ ঠিক সেই রকম ঠুম্‌কি চালে তার পায়ের পাঁয়জোরের আওয়াজ হতে লাগল।

তাজ্জব করলে দেখছি! নিশ্চয় কোনো হুরীর পাল্লায় পড়েছি। এর সবই দেখি উল্টো রকমের, আচ্ছা যখন সুরু করা গেছে, তখন এর শেষ পর্য্যন্ত না দেখে ছাড়চি না।

শন্ শন্ করে আমরা রাত্রির অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে লাগলুম। সহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে এসে একটা পোড়ো বাড়ীর সামনে এসে সে আমার হাত ছেড়ে দিলে, হাত ছাড়তেই দেখি আমি মাটির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছি।

ভৈরবী বাড়ীটা দেখিয়ে বল্লে—কেমন, মনে পড়ে এই বাড়ী?

—কৈ না, কিছুই ত মনে পড়ছে না।

—আচ্ছা, ঐ গাছটার কথা মনে পড়ে?

দূরে যেন একটা ঘন অন্ধকার আকাশের দিকে কতকগুলো হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এত আঁধার সে জায়গাটা যে রাত্রির অন্ধকারেও সেটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আমি বল্লুম—কৈ, না।

তবে চল—বলে সে আবার আমার হাত ধরলে। আবার আমরা সেই রকম করে আর এক দিকে এগিয়ে চলতে লাগলুম। এবার খানিকক্ষণ পরে আমরা একটা বড় প্রাসাদের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালুম। প্রাসাদের প্রকাণ্ড ফটকে ক'জন প্রহরী পাহারা দিচ্ছে, আমরা তাদের সাম্‌নে দিয়ে ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লুম কিন্তু তারা আমাদের দেখতে পেলে না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—এটা কার বাড়ী?

—তোমার।

একটু রসিকতা করে বল্লুম—বহুৎ আচ্ছা, কিন্তু এই অনুগ্রহ মনে রেখো সুন্দরী, কাল সকালে আবু হুসেনের মত আবার পাগলা-গারদে ঠেলো না যেন।

তারপর আমরা বড় বড় ঘর পার হয়ে যেতে লাগলুম, এক একটা ঘরে হাজার ডালের এক একটা বেলোয়ারী ঝাড় জ্বলছে—আলোয় আলো! তিন চারটে ঘর পেরিয়ে আমরা একটা ঘরে এসে দাঁড়ালুম। ঘরের

মাঝখানে একটা রেশমী পরদা টাঙ্গান ছিল। আমরা সেখানে যেতেই পরদাটা সট্ করে সরে গেল। দেখলুম, ঘরের মধ্যে উঁচু বিছানায় একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আমি বসে রয়েছি, আর পাশে রয়েছে এই ভৈরবী, যার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আমি এই দৃশ্য দেখ্‌চি। আমার একটা হাত সুন্দরীর গলাটা জড়িয়ে ধরেছে, আর একটা হাত তার চিবুক তুলে ধরবার চেষ্টা করছে। যেন—প্রেয়সী রাগ করেছ? এই ভাব আর কি।

তারপর প্রতি ঘরে ঘরে সে আর আমি, কোথাও বসে গল্প করছি, কোথাও দুজনে পাশা খেল্‌ছি, কোন ঘরে সে বসে গান গাইছে, আমি তন্ময় হয়ে শুন্‌ছি, কোথাও বা কোন অলিন্দে বসে বসে আমি প্রেমের কবিতা পড়ছি সে শুন্‌ছে। দেওয়ালে দেওয়ালে আমাদেরই দুজনকার ছবি, প্রাসাদের সর্ব্বাঙ্গে যেন সে আর আমি, আমি আর সে।

অনেকক্ষণ ধরে এই দৃশ্য দেখে দেখে আমরা প্রাসাদের বাইরে চলে এলুম। বাইরে এসে সে আমায় জিজ্ঞেস্ করলে,—এবার বুঝতে পেরেছ?

আমার মনের অবস্থা তখন যে কি রকম দাঁড়িয়েছিল, তা আমি বর্ণনা করতে পারব না। আমি তাকে বল্লুম—সুন্দরী, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, অথচ মর্ম্মান্তিক কৌতূহলে আমি জর্জ্জরিত হয়ে উঠেছি, আমায় সব খুলে বল। নইলে এই দণ্ডে তোমার সামনে আমি আত্মঘাতী হব।

—বটে—বলে সে আমার হাত ধরে একটা বড় জলাশয়ের ধারে নিয়ে গেল। কালো কুচকুচে সেই জলের বুকে পদ্মের মতন শাদা একটা ধবধবে বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে বল্লে—এটা রাণা উদয় সিংহের প্রাসাদ, আর এই দীঘিকে লোকে উদয়সাগর বলে। সেই দীঘি আর সেই প্রাসাদের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে চারি দিকে তাকিয়ে দেখছি, এমন সময় সে আমার একটা হাত ধরে বসতে বল্লে। আমি বসে পড়লুম, সে আমার পাশে বসে বলতে লাগল—

ঐ যে পোড়ো বাড়ীটা, যেখানে প্রথমে তোমায় আমি নিয়ে গিয়েছিলুম, সেটা এক রাঠোর সর্দ্দারের বাড়ী। ঐ সর্দ্দারের এক নাত্নী ছিল, তার নাম ছিল সম্পা। সম্পার মতনই তার দেহের বর্ণ আর সম্পার মতই সে চঞ্চল ছিল, তাই সর্দ্দার তার ঐ নাম রেখেছিলেন। ছেলে বেলাতেই মেয়েটীর বাপ-মা দুই মারা যায়। বৃদ্ধ সর্দ্দার তাকে নিজের হাতে মানুষ করে তুলেছিলেন। সংসারে বৃদ্ধের ঐ নাত্নীটী ছাড়া আর কেউ ছিল না।—এই বলে ভৈরবী একটুখানি চুপ করলে। তারপর আবার সে বল্‌তে লাগ্‌ল,—সর্দ্দার যৌবনে রাজার সেনা-নায়ক ছিলেন, বয়স হলে কাজ থেকে অবসর নেবার পরও রাজার অনুগ্রহ থেকে তিনি বঞ্চিত হন নি। বৃদ্ধ প্রায়ই তাঁর নাত্নীকে নিয়ে রাজার প্রাসাদে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। মেয়েটী দেখতে খুব সুন্দরী ছিল বলে রাজ-অন্তঃপুরের সকলেই তাকে খুব ভাল-বাস্‌ত। সর্দ্দার প্রাসাদে গেলেই নাত্নীটীকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিত। কখনো কখনো দু' একদিন সে অমন অন্তঃপুরেই থাকত কিন্তু বৃদ্ধ সর্দ্দার তার সংসারের শেষ অবলম্বনটীকে

ছেড়ে বেশী দিন থাকতে পারতো না—কাজেই দু' একদিন যেতে না যেতে আবার তাকে সে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেত।

রাজার একমাত্র ছেলে, ভবিষ্যতে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী অরুণের সঙ্গে এই মেয়েটীর বড় ভাব হয়ে গেল। সম্পা যখনি প্রাসাদে আসত, রাজপুত্র তার সঙ্গে খেলা করত, তাকে ছাড়তে চাইত না। যাবার সময় দুজনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে থাকৃত আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় তাদের দু'জনেরই চোখ জলে ভরে উঠ্‌ত।

এমনি করে দুজনকার বয়স বাড়তে লাগ্‌ল। শিশুর ভালোবাসা শেষে যৌবনে প্রেমে পরিণত হল। অবশ্য এদের এই প্রেমের কথা আর কেউ জানতো না। এখন দুজনে আর সে রকম করে খেলবার কিংবা মেশবার অবসর পেতো না বটে, কিন্তু সম্পা প্রাসাদে এলেই অরুণ ছল করে সহস্র আমোদ ফেলে অন্তঃপুরে ছুটে আসত। গোপনে তাদের দেখা-শোনা আর প্রেমালাপ চল্‌ত।

সর্দ্দার যখন কোন কাজে বাড়ী ছেড়ে বাইরে যেত, অরুণ ঘোড়ায় চড়ে সম্পাদের বাড়ী যেত। দূরে একটা বটগাছে তার ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে সে লুকিয়ে সম্পার সঙ্গে দেখা করত। এমনি করে তারা দিনে দিনে নিবিড়তর বন্ধনে আপনাদের বাঁধ্‌তে লাগল। শেষে এমন হল, একজন আর একজনকে ছেড়ে একদণ্ড থাকৃতে পারতো না।

ব্যাপার যখন এতদূর এসে দাঁড়িয়েছে তখন কানাঘুষা হতে হতে কথাটা রাণা ও সর্দ্দার দুজনেরই কাণে উঠ্‌ল। রাজপুত্রের সঙ্গে সর্দ্দারের মেয়ের বিবাহ রাণা কিছুতেই অনুমোদন করবেন না, এটা সর্দ্দার জানতেন। তিনি তাঁর নাত্নীকে রাজপুত্রের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা করতে বারণ কোরে দিলেন। সেইদিন থেকে সম্পার প্রাসাদে যাওয়া একেবারে বন্ধ হোয়ে গেল।

কিন্তু তখন আর এ সব প্রতিবন্ধকে বাধা মানবার সময় ছিল না। অরুণ আর সম্পা গোপনে দেখা করে ঠিক করে ফেল্লে, একদিন রাত্রে অরুণ এসে সম্পাকে তার বাড়ী থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে বিবাহ করবে। তারপর একদিন রাজপুত্র মৃগয়া যাবার ছল করে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে সর্দ্দারের বাড়ী অন্ধকার করে সম্পাকে নিয়ে পালিয়ে গেল।

ব্যাপারটা কিন্তু বেশীদিন চাপা রইল না। একমাস যেতে না যেতেই রাণা ও সর্দ্দার দু'জনেই টের পেলেন যে রাজপুত্রই এই কাণ্ড করেছে। রাণা উপযুক্ত লোক পাঠিয়ে সম্পাকে প্রাসাদে নিয়ে এলেন। অরুণ রাজাকে জানালেন যে সে সম্পাকে বিবাহ করতে চায়। রাণা বল্লেন, তা হতে পারে না, সর্দ্দারের মেয়েকে রাণার ছেলে কখনো বিবাহ করতে পারে না, তা ছাড়া সর্দ্দার জাতিতে রাণা-বংশ অপেক্ষা হীন, এক্ষেত্রে কি করে বিবাহ সম্ভব?

রাণা সম্পাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সর্দ্দারকে অনুরোধ করে পাঠালেন কিন্তু তিনি আর তাকে গৃহে স্থান দিলেন না, রাণাকে বলে পাঠালেন, যে-কন্যা কুলত্যাগ করে বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছে, তাকে আর তিনি গৃহে স্থান দিতে পারেন না। এই

অপমানের বোঝা বৃদ্ধকে আর বেশীদিন বইতে হয় নি, এ ঘটনার কিছুদিন পরেই বৃদ্ধ বীর এ নশ্বর দেহ ছেড়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

পরের মেয়েকে নিয়ে রাণা মহা বিপদে পড়ে গেলেন। তার সঙ্গে রাজকুমারের বিবাহ দিতে পারেন না, অন্য জায়গায় বিবাহ দেবার ব্যবস্থা করলে সে আত্মহত্যা করতে চায়। এই সব ব্যাপারে তিনি বড় বিব্রত হয়ে উঠ্‌লেন। শেষে অনেক চিন্তার পর তিনি সম্পাকে ব্রহ্মচর্য্য নিতে উপদেশ দিলেন।

রাণার আদেশে সেইদিন থেকেই রাজ-পুরোহিত এসে সম্পাকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। বহুমূল্য পেশোয়াজ, অঙ্গের অলঙ্কার খুলে তাকে যৌবনে সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ করতে হল।

বিলাসের সজ্জা খুলে ফেলে সে গৈরিক বসনে দেহ আবৃত করলে বটে, কিন্তু তার বুকের রাজ্য জয় করে যে প্রেমের নিশান পুঁতে গিয়েছিল তাকে সে কোন মতে ভুলতে পারলে না। গুরু এসে যখন বোঝাতেন— এ সংসার অনিত্য, এই পৃথিবী, তরুলতা, আকাশ, কানন সবই তাঁর সৃষ্টি, এর মধ্যেই তাঁকে অনুসন্ধান কর, তাঁর রূপ ধ্যান কর, দেখতে পাবে। সে একমনে দূরের শ্যামল বনের দিকে চেয়ে থাকত, উপরে আকাশের দিকে চাইত। তার ফুলে ফলে তরুলতায়, আকাশে, বাতাসে, গ্রহ-তারায় দিকে দিকে অরুণেরই মূর্ত্তি আরও স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠতে লাগল। তার প্রেমের শিখায় যতই শাস্ত্রের বোঝা চাপান হতে লাগল, সে আগুন গুম্‌রে গুম্‌রে ততই অন্তর্মুখী হয়ে তার ভিতরটাকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে লাগ্‌ল।

অরুণ তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করত, কিন্তু রাণার আদেশে সেখানে প্রহরীর এমন কড়া ব্যবস্থা ছিল যে তার মহলে কোন রকমে পুরুষ প্রবেশ করবার যো ছিল না।

রাজকুমারের তবুও মনটাকে অন্য দিকে দেবার নানা রকম উপায় ছিল। রাণার হুকুমে তাকে তখন দরবারে বস্‌তে হত, মৃগয়ায় যেতে হত, কখনো বা সৈন্যদের সঙ্গে কুচ করতে হোত, এমনি কোরে তার অধিকাংশ সময় কেটে যেত, কিন্তু সে অভাগিনীর দিনে রাতে অন্য চিন্তা ছিল না। কাজের মধ্যে ছিল তার শাস্ত্র পাঠ, কিন্তু বই খুললেই ছত্রে ছত্রে সে অরুণের নাম দেখতে পেত। কতদিন সে গুরুর সামনে পড়তে পড়তে তার নাম করে ফেলেছে। গুরুর কঠিন নির্ম্মম দৃষ্টি বজ্রের মত তার চোখের উপর গিয়ে পড়তেই চমকে উঠে আবার সে পড়তে আরম্ভ করেছে।

এমনি করে রাজা ও রাজ্য এই দুটো প্রাণীর প্রেমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিষ্ঠুরভাবে তাদের অস্ত্র চালিয়েছে আর ক্রমাগত তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে—দু'জনে মিলে নয়—একা—একা।

তাদের সেই অতৃপ্ত বাসনা ক্রমে রাজ্যকে ছারেখারে দিতে আরম্ভ করলে। তাদের অভিশম্পাতে রাণার রাজ্য যায়-যায় হয়ে উঠল। তবুও তিনি অটল হয়ে রইলেন। তাদের দু'জনের অতৃপ্ত কামনা ঐ প্রাসাদের

শিরায় শিরায় প্রত্যেক পাথরের সঙ্গে গাঁথা হয়ে রয়েছে।"

এই অবধি বলেই ভৈরবী একবার চুপ করলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তারপর?—তার-পর—তারপর একদিন রাজপুত্র মৃগয়া কোরতে গিয়ে বন্য জন্তুর কবলে প্রাণ হারালেন।

আমি শিউরে উঠে বললুম—অপঘাত! আচ্ছা, তারপর সম্পা কি করলে?

—সে? সে আর কি করবে! তার কি অন্য গতি ছিল? তাদের মিলনের একমাত্র উপায় সে দেখতে পেলে—মৃত্যু—। হয়ত জীবনে যাকে পায় নি, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তাকে পেতে পারে, এই মনে করে একদিন রাত্রে এই উদয়-সাগরের জলে ঝাঁপ দিয়ে সে আত্মহত্যা করলে।

এই উদয়-সাগরের জলে যখন সে আত্ম-হত্যা করতে আসে, তখন এক সন্ন্যাসী তাকে বলেছিল—তোর মৃত্যুর পর কোনজন্মে কোন সময়ে যদি তোর প্রণয়ীর দেখা পাস্ ত তাকে এই উদয়সাগরের জলে তোর মত আত্মহত্যা করতে বলিস। তোর সুমুখে যদি সে এইখানে ডুবে মরে, তবেই তুই তাকে পাবি, নচেৎ নয়।" এই বলে সে আঙ্গুল বাড়িয়ে আমাকে সেই কালো জলের দিকে কি যেন দেখাতে লাগল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার বললে, জন্ম জন্ম ধরে আমি তোমার জন্য এই সাগরের ধারে বসে আছি, কখন তুমি আসবে, কখন তুমি এই সাগরের জলে এসে লাফিয়ে পড়বে! আমি এই জায়গাটার চারপাশ ছেড়ে কোথাও যেতে পারিনা, ভয় হয়, যদি কখনো তুমি আমায় খুঁজতে এসে ফিরে চলে যাও! আমি সন্ধান পেয়েছিলুম, আজ তুমি কালী-মন্দিরে আসবে। আমাদের সেই দিন গুলোর কথা একবার মনে কর। দেখ, ঐ কালো টলটলে জল। তারপর আমা-দের অনন্ত সম্ভোগ।

আমি তাকে বললুম—সুন্দরী, আমি ত জন্মস্মর নই। গত জন্মের কথা আমার একটুও মনে নাই। তবে ফিরে জন্মে যদি তোমারি প্রেম পাই ত আমি এখনি এখানে ডুবে মরতে পারি।

সুন্দরী তার তুষারের মতন ঠাণ্ডা অধর দিয়ে আমার অধর স্পর্শ করে বল্লে—"যাও, আর দেরী করো না।"

আমি ছুটে সেই সাগরের জলে লাফিয়ে পড়তে গেলুম—মনে হল, যেন সেই কালো মর্ম্মরের মত জল ফুঁড়ে একটা স্কন্ধ বিহীন কদাকার জীব তার লম্বা হাত বাড়িয়ে আমায় লুফে নিতে এল। সম্মুখে তার বীভৎস মূর্ত্তি দেখে আমি পেছিয়ে এলুম। ভৈরবীর কাছে সরে এসে দেখলুম, সে কাঁদছে, তার অশ্রু দেখে আমার মনের ভিতর থেকে মৃত্যু-ভয়টা চলে গেল, আমি লাফিয়ে সেই সাগরের জলে ঝাঁপ দিলুম।

যখন জ্ঞান হল, তখন সকাল হয়ে গিয়েছে। বুঝতে পারলুম, ক'জন লোক আমার পরিচর্য্যা করছে। একটু সুস্থ হতেই তারা আমায় ধরে রাণার রাজ্যের সীমার বাইরে ছেড়ে দিয়ে এল, আর বলে দিলে, ফের যদি তারা আমায় তাদের এলাকায় দেখতে পায় ত আমার সাজা হয়ে যাবে।

তার পর অনেক বার লুকিয়ে আমি উদয়-সাগরের জলে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছি কিন্তু রাণার লোকেরা টের পেয়ে আমায় ধরে ফেলেছে, শেষকালে একদিন তারা আমায় ধরে একেবারে আমাদের দেশে চালান করে দিলে।

আজও কতদিন ঘুমের ঘোরে শুনতে পাই, যেন সম্পা আমাকে সেই মরু-ভূমির দেশে ডাকছে, দেখতে পাই, উদয়-সাগরের ধারে বসে সে যেন জলের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাচ্ছে—এইখানে—এইখানে।

নিশিকান্তর কাহিনী শেষ হয়ে যেতে উমানন্দ প্রথমে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বল্লে—তোমায় নিশ্চয় নিশিতে ডেকেছিল।

গুপীনাথ বল্লে—নিশিতে পাওয়া কি রকম ?

—সে এক রকম ভূত আছে। তারা ঘুমের ঘোরে মানুষকে ডেকে নিয়ে গিয়ে জলে ডুবিয়ে মারে।

গুপীনাথের মুখ ততক্ষণে শুকিয়ে একেবারে আমসির মতন হয়ে গিয়েছে—শুকনো গলাটা ঝেড়ে নিয়ে সে আমায় বল্লে—প্রাণে মেরে ফেলে ?

ভবানন্দ একটু রসিকতা করে তাকে বল্লে—কি যাদু, ভূত বিশ্বাস হয় ?

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

---

# রূপসী

উপদেশে বল্লে পাড়াপড়্সীতে :—
গিলিস্নে টোপ, পড়্বি গাঁথা বঁড়্শীতে।
আজন্ম যে রূপের ক্ষুধায় উপোসী !
কেমন করে' ছাড়্বো তোরে, রূপসী !

উদাস প্রাণে যায় যদি কেউ সন্ন্যাসে,
টিট্‌কারিতে বলে লোকে : হন্ন্যা সে।
অবিশ্বাসে আসনখানা টল্‌বে কি ?
সাধন ছেড়ে, বাঁধন ছেঁড়া চল্‌বে কি ?

ভুল্‌বোনারে পরের কথার ভঙ্গীতে !
আশার বাণী শুন্‌বো ঊষার সঙ্গীতে।
ফুরায় যদি দিনের আলো সাঁঝে গো,
খুঁজ্‌বো তা'কে অমানিশার মাঝে গো !

বুঝেছে ত উমা প্রেমের ইঙ্গিতে
শিব্‌কে ঘিরে থাকে নন্দী ভৃঙ্গীতে।
বসন্ত, তুই মর্‌বি নারে দহনে।
আঁকড়ে ধরে' থাক্‌রে পড়ে' গহনে।

নাই যদি ছাই মেওয়া ফলে সবুরে,
ক্ষুধার জ্বালায় চল্‌বো আমি তবুরে।
জন্মাবধি আছি যদি উপোসী,
ছাড়্‌বো নাক তোমায় ওগো রূপসী।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

# মাসকাবারি

## সত্য-শিব-সুন্দর

মানুষের সঙ্গে মানুষের বাইরের চেহারার যেমন মিল আছে, তেম্‌নি—মানুষের মন ব'লে আর একটা জিনিষ থাকার দরুণ—মনেও খুব গোড়ার দিকে একটা মিল আছে। গোড়ার দিকে বল্‌লাম, তার কারণ, পারিপার্শ্বিক, দেশ কাল ও শিক্ষার প্রভাবে মূল এক হ'লেও, শাখাপ্রশাখা পাতা ফুল নানা রকমের হয়ে থাকে। এই বৈচিত্র্যই হচ্ছে সৌন্দর্য্য; আবার, ঐ মূল বা গোড়ার অংশটা যা' ঐ বৈচিত্র্যকে ধরে' আছে—তাই হচ্ছে সত্য। এই গোড়াকার মিল হচ্ছে সত্য বস্তুর পরিচয়; আর ঐ মিল—যা আছেই, না থাকা অসম্ভব—যদি অমিলের মতো দেখায়, তবে বুঝতে হবে, তলার দিকে কিছু আগাছা বেশী বেড়ে উঠেছে; কিম্বা হয়ত আরও গুরুতর অবস্থা হয়েছে, মাটির ভিতর রস না পেয়ে গাছটা মরে যেতে বসেছে। এই মানুষ-গাছটির মালীগিরি জগতে দুই রকমের লোক দিয়ে হয়ে আস্‌ছে—এক, যাঁরা ঐ গোড়ার ভার নিয়ে আছেন, ঐ খানে জল দেওয়া, সারের ব্যবস্থা, আগাছা কাটাই তাঁদের কাজ! আর একদল আছেন, যাঁরা ফুল-ফলের ভার নিয়ে আছেন—গাছটার ডাল-পালা-সমেত বিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য ও স্বাস্থ্য-রক্ষার ভার নিয়ে আছেন। প্রথম দল সত্যের সেবা করেন, দ্বিতীয় দল মঙ্গলের সাধক।

* * *

আদিম যুগে ঠিক এই রকম division of labour হয় নি বলে' বোধ হয়; গাছটি তেমন বড় হয়ে ওঠেনি, ডালপালা চারিদিকের আকাশ আক্রমণ করে' গলাগলি করে' এত জটিল হয়ে ওঠেনি, তাই মানুষের ধারণা, শিক্ষা ও কর্ম্মের মধ্যে এই সত্যশিব-সুন্দর একাকার হয়ে' মিশে ছিল; শিবের ধারণাটা খুব প্রত্যক্ষ, আর মূল সত্যের অধীন হ'লেও সেইটেই সভ্যতার প্রথম যুগে খুব বড় হয়ে উঠেছিল। এই সত্য ও মঙ্গল দু'য়ে-মেশা যে বস্তুটি, এইটিই ছিল সে গাছটার সবখানি; সুন্দর খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেনি, তা'কে আদিম মানুষ তার সুখ-দুঃখ পিপাসা-বাসনা দিয়ে একটা মাটির মূর্ত্তির মত গড়ে' পূজো করেছিল, তার চিন্ময় মূর্ত্তি, তার আবাহন-মন্ত্র তখনো শেখেনি। ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন কালের শিক্ষা, সাধনা ও চিন্তার ফল খুবই অসাধারণ—সাধারণ-মানব-সভ্যতার ইতিহাসের কথা সে নয়, আর তা' ছাড়া, যুগ ও কাল হিসেব করে' ঐতিহাসিক অনুমান তা'কে নিয়ে চলে না। মোট কথা, সত্য ও মঙ্গল, দুয়ের এই মিশ্র ধারণা—যে ধারণায় সত্য মঙ্গলের উপরেই বেশী নির্ভর করেছে—সেই Prophet-দের বাণীই সাধারণ মানুষ-গাছটির চারা-বয়সে বিশেষ কাজে লেগেছিল। আজও এই বিংশ শতাব্দীতে সে শাস্ত্র বলবৎ আছে; কেবল, মঙ্গলের ধারণাটার মধ্যে সত্যের ভাগ খুব সূক্ষ্ম হয়ে এসেছে—ঐ যে

মিল, যাকে আমি সত্য বলেছি, সেই মিলের খিল ভেঙে গিয়ে—সার্ব্বজনিক মঙ্গল নয়—জাতি বা ব্যক্তির মঙ্গল অর্থাৎ স্বার্থের জয়-ভেরী বেজে উঠেছে।

## এ যুগের সমস্যা

সেই আদিযুগে সত্যটা ছিল একটা ছোট দেশ বা জাতি বা সম্প্রদায়ের সামাজিক মঙ্গলের সঙ্গে গাঁথা; সেই মঙ্গলটাকে সার্ব্বভৌমিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করার যে স্বপ্ন, তাই ছিল মন্ত্রদৃষ্টি, ঈশ্বরের বাণী। জীবনযাত্রার সরলতা; জটিলতার অভাব; কেবল মাত্র অন্ধবাসনা ও প্রবৃত্তির বশে উন্মত্ত যে মানবপ্রকৃতি, তারি সঙ্গে পরিচয়; এবং সেই পরিচয়-ভূমির সংকীর্ণতা—এই সকল অবস্থা চিন্তাকে একমুখী করে যে সত্যদর্শন তখনকার কালে এত সহজ ও সম্ভব করেছিল, তার মধ্যে সর্ব্বমাঙ্গল্যের সহজ উপলব্ধিই ছিল সব চেয়ে বড় কথা। আজ তা' সম্ভব নয়। সেই গাছটির শাখা-প্রশাখা মূলকে আচ্ছন্ন করে' ফেলেছে, তার বিসদৃশ বিচিত্র মূর্ত্তি একেবারে অনেকখানি চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে; সত্য, অর্থাৎ, সেই মূলের মিল কোন্‌খানটায় তা' ঠিক করে' হাতড়া-হাতড়ি করতে হচ্ছে; আর মঙ্গল! সে ত' প্রতিপদেই আপনার বিরুদ্ধে আপনি সাক্ষ্য দিচ্ছে, তার মত বহুরূপী এ যুগে আর কিছুই নেই। এখন, সত্যকে একটু ধরতে পারলে, সেই সত্যের ভিতর দিয়ে মঙ্গলের যে মূর্ত্তিটা চোখে পড়ে, তা'কে মঙ্গললোভী মানুষের দল অমঙ্গল বলবে। বেশ ভালো করে' যারা বুঝে দেখতে চাইবে, আদৌ মঙ্গলকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না; সত্যকে স্বয়ংপ্রভ, পূর্ণ ও স্বয়ংসিদ্ধরূপে দেখবে—তাই থেকেই মঙ্গলের আশ্বাসে সব দ্বন্দ্ব মিটে যাবে।

## আর্ট্‌ সাধনা

এই সত্য, এই মূলটাকে সন্ধান করবে কি দিয়ে? এই শাখা প্রশাখা, নানা রং, নানা ফল—এই প্রকাণ্ড অমিলের মধ্যে সেই মূলের মিলটি, সেই সত্যটিকে কেমন করে' খুঁজে পাবে? খুঁজে ত' বড় পাচ্ছে বলে' বোধ হয় না, নানা মতবাদের—অর্থাৎ, বিরোধের—কোলাহলে সেই মূলরাগিণী আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বিজ্ঞান ও দর্শন analysis ও synthesis এর পথে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে—কিনারা পাওয়া দূরে থাক্‌, ক্রমেই অকূলে গিয়ে পড়ছে। শুধু যুক্তি-তর্কের সাহায্যে সেখানে পৌঁছন যায় না; observation, experiment, তথা genralisation এর সাহায্যে, ratiocinatve intellect তার পাত্তা পায় না। মানুষের মনের মধ্যে সেই যে মিলের কথা বলেছি—সে এই গরমিলের মধ্যে খাবি খাচ্ছে। এই মূলের সাড়া তার মধ্যে আছেই—যত মিথ্যা কথা বলুক, পরস্পরকে প্রতারণা করুক, দল বাঁধুক, বিরোধের সৃষ্টি করুক—তা'র অন্তরের এই মিল, বাহিরের অসামঞ্জস্যকে ঠেলে অদ্বন্দ্ব ও অবিরোধের মধ্যে হাঁফ ছাড়তে চায়। যে-মানুষের মধ্যে এই অমিলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হ'য়ে উঠে, এবং তার উপযুক্ত শক্তির বিকাশ হয়, সে এই মিলন-ভূমিতে এসে দাঁড়ায়—সকল অসামঞ্জস্য ও বিরোধকে একেরই বিচিত্ররূপ বলে' বুঝতে

পারে,—যা' অসামঞ্জস্য ও বিরোধ, তা'ই তার কাছে বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য বলে' বোধ হয়। মঙ্গল অমঙ্গল, পাপ পুণ্য, সুশ্রী-কুশ্রী, এই সত্যসুন্দরের অপূর্ব্ব সমন্বয়রসে মিলে মিশে এক হয়ে যায়। একেই আর্ট-সাধনা বলে; বিশুদ্ধ আর্ট-চেতনায় বৈষ্ণবের লীলারহস্য উপলব্ধি হয়।

* * * *

এই গরমিলের মধ্যে মিল, বিরোধের সমন্বয়—এই ভালো-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গলের ছায়াবাজির মধ্যে সুন্দরের আলো, অদ্বন্দ্বের সত্যজ্যোতি দেখ্‌তে পাওয়ার যে সাধনা, তা, এক কথায় বলতে গেলে—চিত্তশুদ্ধি। মন থেকে সকল সংস্কার দূর করতে হবে, তার স্থানে খুব তাজা (প্রাণ যা'তে আপনি হ'তে সাড়া দেয়, পূর্ব্বশিক্ষাবশে নয়) প্রত্যক্ষ অনুভাব গুলিকে আশ্রয় দিতে হবে; বাইরের সঙ্গে যেমন আদান প্রদানের পথকে মুক্ত রাখ্‌তে হবে, অন্তরের মধ্যে তেমনি কপটতা একেবারে দূর করতে হবে। যা' লোকে সত্য বলে, তা' মানবার আগে, আপনার কাছে সত্য কি না, বীরের মত নির্ভীক হয়ে স্বীকার বা অস্বীকার করতে হবে। কর্ম্মেন্দ্রিয়কে কোনখানে বাধা না দিয়ে, মনকে সদাজাগ্রৎ রাখতে হবে, feeling কে রুদ্ধ না করে' mind কে স্ববশে রাখতে হবে। সর্ব্ব বিষয়ের উপর মনের স্বচ্ছন্দ গতি রেখে, সর্ব্ব বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্যকে অপরোক্ষ করতে হবে। এই দৃষ্টি,—জগতের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা করবার সাধনা—তাই হচ্ছে কবির সৌন্দর্য্য সাধনা, ক্রিটিকের সত্যসাধনা। তাই এ যুগে কবিও ক্রিটিক, ক্রিটিকও কবি; তফাৎ এই যে, কবির আনন্দ সৃষ্টির আনন্দে ভরপূর হয়ে উঠে, ক্রিটিকের আনন্দ তেমন পূর্ণ নয়,—সে আনন্দ ঠিক 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর' নয়, তা' শুধু পাওয়ার আনন্দ, দেওয়ার নয়।

## কবি ও ক্রিটিক

বেশ দেখা যাচ্ছে, এ সাধনা বড় শক্ত সাধনা। কিন্তু এ সাধনায় যিনি সিদ্ধ, তিনি মুক্ত, তিনিই ঋষি। কিছুকেই মানব না, যতক্ষণ-না নিজের অন্তরে সাড়া পাই;—এই সত্যনিষ্ঠা, আবার তারই সঙ্গে, এই আত্মবোধ ও আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারাই বাইরের সকল ক্ষুদ্রতা, সকল সঙ্কীর্ণতা পার হ'য়ে, সকল বিষমতা, বিরোধ ও অসামঞ্জস্যকে সুন্দর করে' দেখা; একই কালে, এক অর্থে আত্মসঙ্কোচ ও আরেক অর্থে আত্মপ্রসার—এ বড় কঠিন সাধনা। মনের সেই স্বস্তি-স্বাচ্ছন্দ্য, প্রাণের সেই অকপটতা উদারতা, ভাবের সেই নিষ্ঠা ও সংযম চাই—যা'তে সংস্কার সত্যসুন্দরের অন্তরায় হ'য়ে না দাঁড়ায়, আবার "অহং"ও উল্টোদিক থেকে ভরাডুবি না করায়। সেই জ্ঞান চাই, যা' সকল মোহকে ধরে,' দিতে পারে, যা' বাস্তবের প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, বন্ধুতা, শত্রুতা, ভাবের পক্ষপাত, ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত অনুরাগ-বিরাগকে জয় করে', নিজের অহংকেও জয় করে', সুন্দরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে', অপরকে পরোক্ষ দর্শন করাতে পারে। এই dis-interestedness, এই impersonal ও abstract এর সাধনা সোজা সাধনা নয়! Artএর indiffe-

rentism কবিকে অপবাদের মত বহন করতে হয়, সমাজ একে দুর্নীতি বলে, উদ্দেশ্য-পরায়ণ অপ-ক্রিটিকেরা একে বস্তুতন্ত্রহীন বলে। কবিও ক্রিটিক, কিন্তু কবির আসল criticism তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে, তাঁর mind তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বহুরূপী হ'য়ে দেখা দেয়, আনন্দের পরিবেষণ করে—চিন্তার দিকটা বিশেষ করে' চিন্তা-হিসেবে ফুটিয়ে তোলা কবির কাজ নয়, তা'তে বরং আর্ট ক্ষুণ্ণ হয়। এই সত্যসুন্দরের প্রচারই হচ্ছে ক্রিটিকের আসল কাজ।

* * *

আমি এই-যে সত্য-শিব-সুন্দরকে ভাগ করে' আলাদা করে' দেখ্‌ছি—সেটা স্বীকার করেই নিচ্ছি; এটা ব্যবহারিক, তাত্ত্বিক নয়। কারণ, সেটা ত' পথের শেষে পরমাবস্থার কথা; সত্যকে পেয়ে তার সঙ্গে শিবসুন্দরের উপলব্ধি করা—সেত' হ'ল সাধকের সিদ্ধ অবস্থা। মানুষের ইতিহাসে তার সকলের চেয়ে বড় কথা—এই সত্যতীর্থের উদ্দেশে সে কতটুকু কোন্‌দিকে অগ্রসর হয়েছে—তাই; সেই যাত্রায়, যাত্রীর দিক থেকে—তীর্থের দিক থেকে নয়—আমি এই এক-বস্তুর ভিন্ন-রূপ কল্পনা করেছি, সেটা মানুষের সমাজের কথা, ইতিহাসের কথা—সেটাকে তত্ত্বকথা বা দার্শনিক মত বলে' কেউ ভুল করবেন না।

আসল কথা, আমার মনে হয়—আধুনিক মানব-মন ঐ সত্য-মঙ্গলকে সুন্দরের মধ্যে দিয়েই পাচ্ছে ও পাবে। এই বিরোধ বিশ্লেষণ ও টুক্‌রা-সত্যের যুগে 'শান্তং শিবম-দ্বৈতং'কে পাওয়ার একমাত্র পথ, এই সৌন্দর্য্যের আনন্দকে পরমতত্ত্বরূপে—শুধু জানা নয়—আত্মানুভূতির সঙ্গে এক করে' পাওয়া। তাই কবির কাজই এখন সব চেয়ে বড় কাজ, তাঁর দায়িত্বও যেমন, আসন ও তেমনি সকলের উপরে। তিনিই বল্‌তে পারেন, 'সর্ব্বধর্ম্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'।

শ্রীসত্যসুন্দর দাস।

---

# কাজরী

২৫

কাল ভারী মজা হয়েছে।

জগন্নাথ পাহাড়ে আমাদের চড়িভাতির ব্যবস্থা ছিল। আমরা সবাই গেছলুম, সুরমারাও গেছল। দু'খানা পুশ্‌পুশ্‌ গাড়ী ভোরেই রওনা হয়েছিল। জগন্নাথ পাহাড় কি এখানে-! ডুরাণ্ডার ও-ধারে, রাঁচির সামানা পেরিয়ে, সেই কতদূরে। বেশ লাগছিল।

চওড়া রাস্তা—আশে-পাশে মাঠ। কালো জুয়ান সাঁওতালের দল তাদের সদা-প্রসন্ন দৃষ্টি নিয়ে পথে চলেছে,—জুয়ান মেয়েরা মাথার চুলে নানা রঙের ফুল এঁটে গান গাইতে গাইতে চলেছে, যে যার কাজে,

কোলে ছেলে, পিঠে বোঝা—এই যে দারিদ্র্য, তাদের তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই! কেমন সুন্দর সহাস মুখগুলি!

আমরা যখন জগন্নাথ পাহাড়ে পৌছুলুম, তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। এগারোটা বেজে গেছে। একেবারে সহরের বাইরে সমস্ত কোলাহলকে দূরে ফেলে রেখে—প্রকৃতির নির্জ্জন বুকে উঁচু টিলার উপর পাথরের মন্দির তার বিরাট গাম্ভীর্য্যে গম্ গম্ করচে! ও-পাশে একটা পুকুর জলে টল্ টল্ করছে। নীল জল—অসংখ্য কচ্ছপে ভরা। গাড়ী থেকে নেমে পাহাড়ে উঠলুম। সামনেই যেন সেই কোন তেতালার উপর মস্ত ফটক, ভিতরে অন্ধকার। তুটো মহল পেরুলুম—সামনে এক কাঠের স্তম্ভের উপর গরুড়-মূর্ত্তি। তারপর আরো ছোট-খাট অসংখ্য মূর্ত্তি রয়েছে—তার একেবারে শেষের মহলে জগন্নাথ-দেব। পুরুত কি অন্য-সব লোকজনকে উড়িয়া বলে ত মনে হলই না। আমরা জিজ্ঞাসা করতে লাগলুম, হঠাৎ এতদূরে জগন্নাথদেব এলেন কি করে?—জবাব পেলুম—এটা অনুসন্ধানের বিষয় বটে!

যাক্, ঠাকুর-টাকুর দেখা হলে নীচে খোলা জায়গায় আমরা জড়ো হলুম। রান্নাবান্নার ব্যবস্থা লোকজন এসে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল—তবু আমাদের সব সেরে নিতে বেলা তিনটে বেজে গেল। এমন ভালো লাগছিল যে, কি বলব!

আশা সুরমা আর আমি তিনজনে মিলে এ-পাহাড় ও-পাহাড় ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। একজন পাণ্ডা এসে বল্লে—ঐ পাহাড়ের নীচে গাছতলায় মানস-নাথ শিব আছেন, ভারী জাগ্রত দেবতা—তাঁকে প্রণাম করবি না?

সুরমা বললে—প্রণাম করে কি হবে?

কামনা পূরণ হোবে, বেটী—

বটে!—বলে আমরা তিনজনে পাহাড় বেয়ে তিনটি ছোট নদীর মতই নাচতে নাচতে সেখানে গিয়ে হাজির হলুম। দেখি, নীচে পাহাড়ের কোলে একটি নুড়ি—নানা রঙে রঙিন্ হয়ে টাট্‌কা-বাসি ফুলের জঞ্জালে পড়ে আছেন,—ইনিই মানস-নাথ।

পাণ্ডা কি একটা মন্ত্র পড়ালে, সে না উড়িয়া ভাষা, না সংস্কৃত—মন্ত্র পড়িয়ে বললে, তোদের কামনা জানা বাবার কাছে।

তখন আমাদের গা-টেপাটেপি চল্‌ল।

আশা বললে, বেশ হয়েছে—দিদি, বাবার মাহাত্ম্য বুঝব'খন। তুমি কামনা কর—বাড়ী গিয়ে যেন দেখি, সুনীলবাবু এসেছেন!

আমার বুকটা ছাঁত্ করে উঠল। আমার মনের মধ্যে ঐ চিন্তাটাই জাগ্‌ছিল যে! তাই মানস-নাথের নাম শুনেই আমি উতলা হয়েছিলুম, ঐ কামনাটি জানাব বলে! কে জানে, ঐ শিলাখণ্ডে কি অপূর্ব্ব শক্তি আছে! আশার কথায় আমি তাই কেমন চম্‌কে উঠলুম।

সুরমা বললে,—আর তুমি?

আশা বললে,—বিলেত থেকে মানুষকে টেনে আন্‌তে তিনি পারবেন কি? সেটা যে আবার সাহেবদের দেশ!

সুরমা বললে, ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা নয়, ভাই। নুড়ি দেখে অবজ্ঞা করো না।

আশা বললে, অবজ্ঞা কিসের, ভাই?

দিদির মনের ঐটিই সব-চেয়ে বড় কামনা নয় কি? কি বল ভাই, দিদি?

সুরমা বল্‌লে, তুই তবে এই কামনা কর্‌ বৌ, যেন কী হপ্তায় দাদার কাছ থেকে আট পাতা করে চিঠি পাস্‌—কেমন? আর তোমরা দুজনে খুব সুখী হও, ভাই, বাবার শরীর ভালো থাক্‌,—আমি এই কামনা করি—সেই বেশ হবে'খন, কেমন?

প্রণাম করে ঐ কামনাই জানালুম। আমার গা কেমন ছম্‌ ছম্‌ করে উঠ্‌ল। মনে হল, এখনি ঐ শিলাখণ্ড ফেটে গম্ভীর ধ্বনি বেজে উঠবে, তাই হবে—তোর এ কামনা পূর্ণ হবে রে! প্রণাম করে উঠে খানিকক্ষণ যেন কেমন স্তম্ভিত-গোছ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তখনই হাসি পেলে—হায়রে, এ'ত সে পুরাণের যুগ নয়—সোনার যুগ নয় যে দেবতারা ভক্তির আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে একটা নারীর প্রাণের বেদনায় গলে গিয়ে ছুটে এসে বলবেন, মাভৈঃ!

কলির দেবতা মানুষের মতই পাষাণ-স্তূপে পরিণত হয়ে আছেন, আজ! মানুষও তেমন খাঁটি নয়, দেবতার প্রাণও আজ তাই টলে না আর!

ফেরবার সময় আমি সুরমাদের সঙ্গে এক-গাড়ীতে উঠে বসেছিলুম। ধূলো উড়িয়ে পুশ্‌পুশ্‌ ছুটেছিল, মাঠ-ভাঙ্গা পথ দিয়ে—চারিদিকে কত বিচিত্র দৃশ্য ফুলঝুরির মত ঝরে-ঝরে পড়ছিল। ভালো করে সব দেখবার জন্য পুশপুশ-ওয়ালাদের বলে দিলুম আমরা,—আস্তে যা।

শীতের বেলা। দিনের আলো ক্ষীণ হয়ে আস্‌ছিল। যখন আমাদের গাড়ী এসে পুরুলিয়া রোডের মোড়ে ঢুকল, তখন বেশ অন্ধকার হয়েছে। পথের দুধারে পুটুশের ঘন ঝোপ—তার মধ্য থেকে অসংখ্য পতঙ্গের একটা স্বপ্ন-বোনা ঝিম্‌-ঝিম্‌ রাগিণী বেজে উঠছিল। নিঃশব্দ জনহীন পথ। সুরমাকে আশাকে নামিয়ে আমি একলাটি চললুম, বাড়ীর পানে। গাড়ীতে বসে তখন কত কথাই মনে জাগছিল। সারাদিনের দৌড়-ঝাঁপের পর ক্লান্ত শরীর তন্দ্রার ঘোরে ঢুলে-ঢুলে পড়ছিল—তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখের সামনে জাগছিল, মানস-নাথের শিলা মূর্ত্তিটি! আমি সমস্ত প্রাণ-মন ঢেলে যেন আমার কামনা জানাচ্ছি—হঠাৎ এমন সময় পাথরের মধ্য থেকে মহাদেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তথাস্তু!

তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল—আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল! কায়-মনে ডেকে বললুম, তাঁকে এনে দাও, ঠাকুর, এই সপ্তাহেই যেন তিনি আসেন, তাঁর দেখা যেন পাই!

আঁধারে-ঘেরা পথ নাড়িয়ে পুশ্‌পুশ্‌ এসে শেষে আমাদের বাঙলায় ঢুকল। বাবা, মা, ভাই-বোনেরা আগেই এসে পৌঁচেছিল—সে পুশপুশটা তখনো বাঙলার কম্পাউণ্ডে দাঁড়িয়ে। আমার পুশপুশ্‌ থামতেই বন্টির চীৎকার শোনা গেল। বাবা এসে বললে, সুনীল এসেছে রে!

আমার সমস্ত শরীর তোলপাড় করে উঠ্‌ল—এখনো স্বপ্ন দেখছি আমি? ভালো করে চোখ খুলে বাবার পানে চাইলুম—না, এ'ত স্বপ্ন নয়!

মানস-নাথ এমন প্রত্যক্ষ দেবতা! ঠাকুর, ঠাকুর!

আমার সমস্ত মন ভক্তিতে আবেশে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল!

আস্তে আস্তে বাড়ীর মধ্যে এসে মার কাছে শুনলুম—উনি ওবেলার এক্সপ্রেশে এসে পৌঁচেছেন। হঠাৎ আসা হল, আসান্‌সোলে কি দরকারে এসেছিলেন—তারপর এইদিকে সটান্ চলে এসেছেন। বাড়ীতে শুধু মালীটা ছিল,—সাঁওতালী মালী। আর কাকেও না দেখে একটা হোটেল খুঁজে নিয়ে সেইখানে নাওয়া-খাওয়া করেছেন—তারপর চাকরের মুখে খবর শুনেছিলেন যে আমরা জগন্নাথ পাহাড়ে গেছি, তাই একেবারে জগন্নাথ পাহাড়ের দিকে রওনাও হয়েছিলেন। ডুরাণ্ডায় ছেলেবেলাকার কোন্ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে তিনি ধরে নিয়ে গেছলেন তাঁর বাসায়। পরে বিকেলবেলা সেই বন্ধুটিকে সঙ্গে নিয়ে হোটেল থেকে আবার জিনিস-পত্র তুলে এখানে এসেছেন।

মানস-নাথ, ঠাকুর,—ঠাকুর,—তোমার এত দয়া!

২৬

সকালে উনি বাবার সঙ্গে নন্দবাবুর বাড়ী বেড়াতে গেছেন। এখানে এসেছেন কি কাজে—কালই চলে যাবেন বল্‌ছেন। আমাকে দেখবার জন্ত আসেননি। যাক্, আমার যেটুকু লাভ!

সেই সন্ধ্যার পর থেকে যে-পর্য্যন্ত না তিনি ঘরে শুতে এলেন, ততক্ষণ কি করে কাটিয়েছি, তা ভগবানই জানেন! ঘুন্টি বুড়ী এসে জ্বালাতন করছিল—গল্প বল, গল্প বল। রোজই বলি। তাদেরই বা দোষ কি—আমার কিন্তু অসহ্য লাগ্‌ছিল! পাশের ঘরে বাবার সঙ্গে উনি কথা কচ্ছিলেন—সমস্ত মন ঢেলে কাণ পেতে আমি সেই কথা শুন্‌ছিলুম। তপসীর বাঙ্‌লা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—কারবারের অবস্থাও খুব আশাপ্রদ! টাকা পয়সার হিসাব করতে-করতে দুজনে যেন মত্ত হয়ে উঠছিলেন।

রাত্রে যখন শুতে এলেন, আমি তখন বিছানায় শুয়ে পড়ছিলুম, একটা বই নিয়ে। অভিমানে মন এমন আচ্ছন্ন হয়েছিল যে বইয়ের মধ্যে কি ছাই আছে না পাঁশ আছে, তার কিছুই খেয়াল হচ্ছিল না। পড়ে পড়ে ভাবছিলুম,—কথা কব না ত,—দেখি, উনি কি করেন।

উনি এসে বিছানার উপর বস্‌লেন, আমার হাত থেকে বইখানা টেনে নিয়ে বল্‌লেন—কিগো, অভিমান হয়েছে! কথা কবে না?

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে তাঁর পানে চাইলুম। আমার মাথার চুলগুলো আঙুল দিয়ে নাড়তে নাড়তে তিনি বললেন, কথা কবে না ত! বেশ, আমি তাহলে তপসীতে ফিরে যাই।—বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

আমি তবু কোন কথা কইলুম না। তাঁর উঠে দাঁড়ানোয় মনটা আরো ছল্‌ছল্ করে উঠ্‌ল। মনে হল, আমার প্রাণের যে জায়গাটায় বেদনা, উনি ঠিক সেই জায়গাটিই দুই পা দিয়ে চেপে মাড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন! চোখের পিছনে একরাশ জল ঠেলে-ঠেলে আস্‌ছিল—বেদনার ভরে ঝরতে পারছিল না।

উনি আবার কাছে এসে বসলেন, বললেন, রাগ করেছ? কথা সত্যিই কবে না, আমার সঙ্গে?

আমি কথা কইলুম, বললুম্—তোমার টাকা-কড়ি বেশ রোজগার হচ্ছে ত! কথার সঙ্গে সঙ্গে দুই চোখ ছাপিয়ে হু-হু করে জল ঝরে পড়ল।

এ চোখে এত জলও ছিল!

উনি বললেন, ছি, কেঁদো না। কাঁদ্‌চ কেন?

কাঁদচি কেন? ওগো, সত্যিই কি বোঝ না, কেন কাঁদি? উনি বললেন,—আমি আসতে পারিনি। কি করব বল। সেখানে যে রকম করে সব ফেঁদে বসেছি, তার একটা ভালো রকম ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত স্থির হতে পারছি না, অনু! টাকার কথা বলছ—কিন্তু এই যে টাকার চেষ্টায় হিমসিম খাচ্ছি—এ'ত তোমারই জন্য অনু। অগাধ সচ্ছলতা হলে আমাদের যে আর কোন অভাব থাকবে না। তোমায় সকল সুখে সুখী করতে পারব যে আমি।

আমি বললুম—কে তোমার টাকা চেয়েছে? আমি কোনদিন কি বলেচি তোমায়—যে আমার হীরে-মতির ভারে ভরে দাও? কোনদিন কি—

—পাগল হয়েছ, তুমি, ছি! ছেলেমান্সী করে না! আমি ত তোমায় অযত্ন করিনি এতটুকু!

—অযত্ন আবার কি করে করতে হয়? দেখা নেই—চিঠি একখানা করে দেওয়া, তা-ও কালে-ভদ্রে—কত কান্নাকাটি করলে তবে পাই। বল দেখি, কি নিয়ে, কি করে আমি এখানে থাকি!

—এই দেখ না—তপসীতে সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেলে তোমার নিয়ে দু'জনে একসঙ্গে থাকব। তখন ত আর তোমার কোন কষ্ট থাক্‌বে না। দু'দিন সবুর কর শুধু!

তারপর আদরে আদরে আমাকে একেবারে তিনি ছেয়ে ফেল্‌লেন! সন্ধ্যা থেকেই মনটাকে বেঁধে খুব শক্ত করে রেখেছিলুম—কথায় আর গল্‌বো না। কিন্তু এমনি দুর্ব্বল এই নারীর মন--দুটো মিষ্টি কথায় সে তার সব অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে একেবারে পোষা কুকুরটির মত তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল!

কথায় কথায় তিনি বললেন, আসান্‌সোলে এসেছিলেন, জান্‌কীরাম আগরওলা বলে এক মাড়োয়ারীর কাছে কয়লা দেবার একটা বন্দোবস্ত করতে। সেখানে এসে শুনলেন, সে এসেছে রাঁচিতে বেড়াতে—তখন ভাবলেন, বাঃ, বেশ হয়েছে, ওঁরও মনটা রাঁচি-রাঁচি কর্‌ছিল—এ বেশ, দু'কাজই সারা হয়ে যাবে!

ওঃ! তাহলে সত্যিই উনি আমার জন্যে এখানে আসেন নি! ওঁর কারবারের বন্দোবস্ত করতেই এসেছেন! একটু-আগে ভাঙাছেঁড়া মনটাকে কুড়িয়ে জোড়া-তালি দিয়ে যে রঙীন প্রাসাদ গড়ে তুলছিলুম, এ কথার ঘায় আবার সেটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। শুধু ভাঙ্গা আর গড়া—গড়া আর ভাঙ্গা, এই নিয়েই কি নারীর জীবন রে! হা ভগবান!

কিন্তু এ দুঃখ করে কি ফল! এ দুঃখ কি কখনো ঘুচবে! কি সুখী ঐ সাঁওতাল মেয়েরা! কোন একটা দুরাশার পিছনে ছুটো-ছুটি নেই—নিজেদের ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে মুখে-মুখে বুকে-বুকে থেকে জীবনের সমস্ত মধুর রসটুকু পরিপূর্ণ পান করছে! আশা তাদের ছোট্ট বটে, কিন্তু সুখ অফুরন্ত! আর

আমরা—ঘরের কোণে অতৃপ্তির বোঝা বুকে নিয়ে দিন-রাত গুমরে মরছি।

* * *

বিকেলে উনি বেড়াতে যাবেন আমায় নিয়ে—আমি হব, ওঁর রাঁচির 'গাইড্'!

আর্শি পেড়ে বসে চুল বাঁধছিলুম। উনি ঘরে এসে বললেন, তোমার হল গা?

আমি তখন চুলটায় সবে চিরুণি ঠেকিয়েছি। মাথার কাপড়টা মাথায় তুলে দিতে যাচ্ছিলুম—উনি বললেন, আহা, থাক্ না! একটু দেখি।

আমি বল্লুম,—যাওঃ, কি বল! বাবা মা সবাই রয়েছে ওখানে।

—আহা, ভয় নেই গো—ওঁরা কেউ এদিকে আস্‌বেন না। তুমি চুল বাঁধো—আমি এই খাটে বসে দেখি! কত রঙ্গে রঙ্গিণী বিনায় বেণীছন্দ!

নাঃ, নাছোড়বন্দা গো।

আমি চুল বাঁধতে লাগলুম—উনি বসে রইলেন। আর্শির বুকে তাঁর চোখের নানা খেলা ফুটে ফুটে উঠতে লাগল। সত্যি, লজ্জা হোক্, তবু ভারী ভালো লাগছিল।

হঠাৎ উনি বললেন, ও কি গো, তোমার মাথার চুল খানিকটা উঠে গেছে যে, এ্যাঁ,—এ দশা আবার ক'দ্দিন হলো?

আমি বললুম, হুঃ, ও কি আজ হয়েছে! তুমি কি আর আমার কোন খবর রাখো যে জানবে!

—না, এ ত ভালো কথা নয়। এর একটা ব্যবস্থা এখনি করতে হবে।

আমি অভিমানের সুরে বললুম,—থাক্‌গে, কোন দরকার নেই। আমার সারা মাথায় টাক পড়ে গেলেই বা তোমার কি! কার জন্যেই বা মাথার যত্ন করবো আমি!

—বটে, আমার চোখ দু'টো তা'হলে দুঃখের ভরে উপ্‌ড়ে বেরিয়ে আসুক, এই চাও! দাঁড়াও, আজই একশিশি হার্‌লীন্ এনে দিতে হচ্ছে—এখানে পাওয়া যাবে না?

আমি বললুম, কি জানি!

দুজনে অনেকটা বেড়িয়ে এসেছি। বরিয়াতু পাহাড়ে গেছলুম। পাহাড়ের উপর উঠে—তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলুম। অসহ্য সুখে প্রাণ-মন ভরে উঠছিল। চোখ আর চাইতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। এই এতদিনের সমস্ত দুঃখ, সমস্ত বেদনা, সব কোথায় উবে গেছল। আবেশের মূর্চ্ছনায় চোখ আপনা-আপনি বুজে আস্‌ছিল। ভাবছিলুম, এ কি মধুর স্বপ্নের মধ্যে সমস্ত জীবনটা পাকিয়ে জড়িয়ে গেছে! আহা, অক্ষয় অমর হোক্ এই সুখের স্বপ্ন! যাক্, সমস্ত জীবন তার বিরাট কোলাহল নিয়ে মুছে যাক্, পৃথিবীর বুকের উপর থেকে লুপ্ত হয়ে যাক্! দু'একটা নিরালা পাখীর ঝঙ্কার গানের টুক্‌রোর মত ভেসে ভেসে আস্‌ছিল—চারিদিক নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রেমের এক অখণ্ড রাগিণী বাজছিল,—বড় মিঠে সুর সে, বড় মন-মাতানো সব-ভোলানো সুর!

উনি গান গাইছিলেন,—

ভালোবেসে সখি নিভৃতে যতনে,
আমার নামটি লিখিয়ো
তোমার মনের মন্দিরে—

আমার মনে হচ্ছিল, আহা, জীবনটা আমাদের এইখানেই শেষ হয়ে থাক্ না!

২৭

কাল ওঁর যাওয়াটা বন্ধ করা গেছে। তবু আর-একদিন কাছে পাওয়া গেছে ত!

কিন্তু এমনি করে কি কাছে পেতে হবে! ওঁর প্রাণটা কেবলি যাই-যাই করবে, আর আমি ছল-কৌশল করে ওঁকে আটকে-আটকে রাখব! জীবনের ত সবে এই আরম্ভ—এখনো কত দীর্ঘ কাল পড়ে আছে! একজন এমনি করে ক্রমাগত দূরে-দূরে সরে-সরে যাবে, আর আমি আমার মনের এই ব্যাকুলতা নিয়ে তার পিছনে ছুটতে থাকব! যে আগে ছুটে চলেছে, তার ত পিছন-পানে ফিরে তাকাবারও একতিল আগ্রহ নেই, অবসর নেই! হারে নারী!

মোরাবাদিতে নন্দবাবুর বাড়ী আমাদের দু'জনের নিমন্ত্রণ ছিল। বেলা দশটার সময় সেখানে গেছলুম। কথা ছিল, দুটোর সময় ফিরব—তারপর চারটের ট্রেণে উনি চলে যাবেন। কিন্তু আশা এক মজা করলে।

সুরমা, আশা দু'জনেই ওঁর সঙ্গে কথা কয়েছিল। নন্দবাবু বললেন, ও-ঘরের লোক,—তোমরা কথা কয়ে আদর-অভ্যর্থনা না করলে চলবে কেন? সত্যি, এমন স্নেহ—নিজেদের ঘরের বাইরে পাব—এ'ত কল্পনাও করি নি! আলাপটুকু বেশ জমেছিল। উনি দু'একটা গানও গাইলেন।

দুটোর সময় আমাদের দুজনের ফেরবার কথা। নন্দবাবু বেরিয়েছিলেন, উনি গান ছেড়ে দিয়ে রিষ্ট ওয়াচের পানে তাকিয়ে ওঠবার জন্য ইসারা করলেন—আমিও উঠে দাঁড়ালুম। আশা বল্লে,—ও কি, এর মধ্যে ওঠা হচ্ছে যে! সেই সন্ধ্যার আগে যাওয়া হবে না।

আমি বল্লুম—উনি যে এই বিকেলের এক্সপ্রেশেই চলে যাবেন।

আশা যেন আকাশ থেকে পড়ল,—বল্লে, সে কি—নাঃ, তা হতেই পারে না। এমন দুষ্টু আশাটা,—যেন কিছু জানে না, অথচ ওখানে গিয়ে প্রথমেই আমি সে কথা ওদের বলেছি। শুনে সে বলেছিল, হ্যাঁ, যাওয়াচ্ছি আজ। দাঁড়াও না! আমি বলেছিলুম, কি করে আট্‌কাবে? তা বলেছিল, সে দেখো তখন। আমার ভয় হয়েছিল—যদি চটে যান! কিন্তু কি ভাগ্যি, চটেন্ নি।

উনি বললেন, আজ আমার না গেলে নয়।

আশা বললে, কেন?

উনি বললেন, না গেলে ভারী লোকসান হবে। এখানে একজন জান্‌কীরাম আগর-ওয়ালার কাছে এসেছিলুম, সে একটা চিঠি দেছে। তার সেই চিঠি নিয়ে এক সাহেবের সঙ্গে আবার দেখা করতে হবে।

আশা বললে, ওঃ, সাহেবের সঙ্গে যখন দেখা করতে হবে, তখন ত, নাঃ, আট্‌কানো চল্‌বেই না। তা এক কাজ কর্‌লে হয় না? একটা লোক ও-বাড়ীতে পাঠিয়ে দি, আপনার বিছানা আর ট্রাঙ্ক ওখান থেকে ষ্টেশনে নিয়ে যাবে'খন—আর আপনাকে আমাদের তৈরী বাগানটা দেখিয়ে একেবারে ষ্টেশনে নিয়ে যাব। কেমন পাহাড়ের উপর ফোয়ারা-টোয়ারা সব তৈরী করিয়েছি—আমাদের নিজেদের হাতের কত কাজ আছে। দেখবেন না?

আশার কথা শুনে আমার মনে ভারী

অভিমান হল, কি! এতদিন একসঙ্গে সব বেড়াচ্ছি-ফিরছি, আমাকে সে বাগানে নিয়ে যাওয়া দূরে থাক্‌, সে বাগানের কথাও একদিন আমায় বলে নি। আর আজ একেবারে—বটে!

আমি বললুম, তুমি যাও ভাই, তোমার নতুন বন্ধুকে নিয়ে। আমি-সে বাগান দেখতে চাই না।

আশা বললে, সে কি—বাগানে তোমার যাওয়া চাই বৈ কি! সেখানেও ভাই দেখো দিদি, এক মানস-নাথ শিব আছেন।

আশা আরো বললে, বাগান দেখে তারপর আমরা ষ্টেশনে ওঁকে গাড়ীতে তুলে দিতে যাব'খন। সে বেশ হবে—না?

অগত্যা—তাই স্থির হল। আশা বাইরে চলে গেল। উনি বললেন, দেখো, যেন ট্রেনটা ঠিক পাই আমি—

আমি বললুম, তা কি আর ট্রেনটা ফেল করিয়ে দেবে—?

মিনিট-পাঁচ পরে আশা আবার ফিরে এল; এসে বল্‌লে,—ঠাকুরঝি যেতে পারবে না। বাবার কে-একজন পাঞ্জাবী বন্ধুর আসবার কথা আছে। তার জন্যে ঘর-টর ঝাড়িয়ে ঠিক করে রাখবে। আমরাই তাহলে যাই—চলুন সুনীলবাবু, একটা রিক্‌শয় আমি যাব—আর একটাতে আপনারা দুজনে, কেমন?

উনি বললেন, আমার বিছানাটার জন্য কোন বন্দোবস্ত করলেন কি? না হলে এই শীতে মারা যাব।

আশা বললে, লোক পাঠিয়েছি। এতক্ষণে সে বেরিয়ে গেছে, বোধ হয়। বলেই আশা, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উনি বললেন, ওগো, তোমার বন্ধুকে বলো, আমার বন্দোবস্ত যেন ঠিক হয়।

আমার মনের অবস্থা তখন এমন হচ্ছিল! ফাঁসি-কাঠে যাকে ঝুলিয়ে দেবার হুকুম হয়েছে, তাকে যদি কেউ বলে, ওগো, কাঠটা ঠিক করে দাও ত—ঝোলাবার সময় যেন ভেঙ্গে না পড়ে—তাহলে তার যে রকম মনের ভাব হয়, আমারও মনের অবস্থা ঠিক সেই রকম হয়েছিল। আমি তাঁর পানে করুণ দৃষ্টিতে চেয়েছিলুম—মুখে কথা ফুটছিল না। কষ্ট লাগছিল, এই ভেবে—বেশ অচপল স্বরেই এ আদেশ ত জানাচ্ছেন উনি! ওঁর গলা একটুও কাঁপছে না ত!

আশা আবার এল—একেবারে যাবার জন্য তৈরী হয়ে, এসে বল্‌লে—আসুন, গাড়ী তৈরী।

তিনজনে বেরুলুম। বেরোবার সময় আশা আমার পানে চেয়ে একটু হাস্‌লে—তখন সে হাসির মানে বুঝতে পারিনি,—বোঝবার মত মনের অবস্থাও ছিল না তখন।

দুটো রিক্‌শ একসঙ্গে বেরুল। তারপর মোড়ের কাছাকাছি এসে আশার রিক্‌শখানা হাওয়ার গতিতে নিমেষে চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

উনি বললেন, বেশ হল—আমরা মনের কথা কইতে পাব'খন।

আর মনের কথা! মনে কি কোন কথা ছিল তখন! আসন্ন বেদনার অসহ্য ভারে সে একেবারে বোবা বনে গেছল! উনি আমার মাথাটা নিজের বুকের উপর টেনে নিলেন—আমি পুতুলের মতই ওঁর বুকে মাথা রাখলুম। পথ, লোকজন, এ-সব কিছুই মনে ছিল না।

আধঘন্টা পরে একটা পাহাড়ের নীচে আমাদের গাড়ী এসে পৌঁছুতেই একটা লোক ছুটে এসে বললে—একটী বাঙালী মা-জী পাহাড় থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

মাথাটা ঝন্ ঝন্ করে উঠল। সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। আমি গাড়ী থেকে নেমে পড়লুম—কি করব? এখন উপায়! শেষটায় রিক্‌শওলা ওঁকে বললে, বাবু, আপনাদেরই আপনার লোক না! আপনি এই গাড়ী করে একবার বাড়ী ফিরুন—ডাক্তার ডাকতে হবে। মা-জী ওখানে চলুন্।

তখন যেন কারো কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। আমি তাড়াতাড়ি সেই লোকটার সঙ্গে পাহাড়ের দিকে ছুটলুম—তিনি যে-গাড়ীতে ছিলেন, সেই গাড়ীতেই ফিরলেন।

খানিকটা এসে দেখি, আশা একটা পাথরের উপর বসে হাসছে। আমি ত অবাক! বললুম, ব্যাপার কি, আশা?

—কিছু না। সুনীলবাবু ফিরেছেন ত!

—হ্যাঁ, তবে যে শুনলুম, তুমি পড়ে গেছ।

—বালাই, আমি পড়ব কেন? পড়লেন সুনীল বাবু ফাঁদে, বুঝলে? আমি এইরকম একটা মতলবই ঠাওরাচ্ছিলুম,—ওঁর যাওয়া কিসে বন্ধ হয়। প্রথমে ভেবেছিলুম, সারা রাঁচি সহরটা ওঁকে প্রদক্ষিণ করাব। তারপর ভাবলুম, তিনি যদি ঘড়ি দেখে বেশী চঞ্চল হয়ে ওঠেন! তারপর আমার গাড়ী আগে ছুটে বেরিয়ে আসতে ভাবলুম, আড়াল থেকে ঐকথা বলে পাঠাই,—একটা বেকুব সাঁওতালীকে বললুম, ঐ যে বাবু আসছে রিকশয়, ওঁকে বলগে মা-জী পড়ে গেছেন। ওকে একটা সিকিও বক্‌শিস দিয়েছি, এর জন্যে, তার পর যা হল, জানই ত।

—বেশ। উনি এখনি কোনো ডাক্তার নিয়ে হাজির হবেন'খন!

—কাকে আবার আনবেন? কা'কেও চেনেন কি এখানে? রিক্‌শওলা ওঁকে এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরিয়ে পাঁচটার সময় আমাদের বাড়ীতে হাজির করাবে। সে কথা ঠিক আছে। উনি যদি রাগ করেন, এই ভয়—না? সে আমরা পাঁচটার মধ্যে ওঁর পৌঁছুবার আগেই বাড়ী ফিরছি ত—সব ঠিক করে দেব'খন।

আমি বললুম, বাগান দেখাবে না?

আশা হেসে বললে, বাগান আবার কোথায় পাব?

আমি বললুম, বটে! এতখানি গড়েছ তুমি!

পাঁচটার মধ্যে ফিরে এসে দেখি, কোথায় তিনি! খানিকটা পরে তিনি এলেন, আমায় দেখে বললেন, এ কি—তুমি এখানে হঠাৎ! কি করে এলে? তিনি কেমন আছেন?

আমি বললুম, তোমার যেতে দেরী দেখে ধরাধরি করে গাড়ীতে এনে আশাকে তুললুম। আমি হেঁটে-হেঁটে এসেছি।

কথাগুলো আশার শেখানো-মতই করেছিলুম, অবশ্য। উনি বললেন, কেমন আছেন?

আমি বললুম, একটু অজ্ঞান হয়ে গেছল। হাত-পা ভাঙ্গেনিক। ডাক্তার এসেছিল—বললে, ভয় নেই কিছু। খুব রক্ষা পেয়েছে এ-যাত্রা।

হঠাৎ আশার কাছ থেকে ডাক এল।

দুজনেই গেলুম। ঘরের জানলা-টানলা বন্ধ ছিল, শুধু একটা টেবিল ল্যাম্পে বাতি জ্বল্‌ছিল।

আশা বললে, আজ আপনার যাওয়া হল না, আমার জন্যে। মাপ করবেন, সুনীল বাবু।

উনি বললেন, সে কি! আপনি যে রক্ষা পেয়েছেন, সেইটেই মস্ত সৌভাগ্য আমাদের

আশা বললে, কাল আসবেন, একবার। বাবা এখনো ফিরলেন না,— আপনার সঙ্গে বাবার কি কথা ছিল, ঐ কয়লার কারবার সম্বন্ধেই।

উনি বললেন, দেখি, কাল আসব'খন। আবার ত সেই বেলা চারটের ট্রেণ!

দু'জনে বাড়ী এলুম। এমন হাসি পাচ্ছিল আমার! কিন্তু ওঁকে কিছু জান্‌তে দেওয়া হবে না—আশা পই-পই করে মানা করেছে, মাথার দিব্যি দিয়েছে! (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

## সমালোচনা

**গোপীচন্দ্র।** শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র প্রণীত প্রকাশক, বিপন লাইব্রেরী ঢাকা। মূল্য পাঁচ সিকা। ময়নামতীর গান বাঙ্গলার প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ময়নামতী গোপীচন্দ্রের মাতা। গোপীচন্দ্রের কাহিনী লইয়া মারাঠা, হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় বিস্তর কাব্য, নাটক, গল্প, ছড়া ও গান রচিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "গোপীচাঁদের কাহিনী লইয়া নাটক নবেল হিন্দী ভাষায় বিস্তর চলিতেছে। গোপীচাঁদের পালা গান হইলে সারা হিন্দুস্থানের লোক মুগ্ধ হইয়া যায়।" পার্শী থিয়েটারে রাজা গোপীচাঁদ নাটকের অভিনয় বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। কিন্তু অনেক বাঙালী গোপীচন্দ্রের নামও বোধ হয় শোনেন নাই—বাঙলা ভাষায় গোপীচন্দ্রের কাহিনী লইয়া কোন নাটক নবেল রচিত হইয়াছে বলিয়াও আমাদের জানা নাই। শিবরতন বাবু ময়নামতীর গান, মাণিকচন্দ্রের গান প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া সরল গদ্যে গোপীচন্দ্রের আখ্যানটুকু এই গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠক এ গ্রন্থ-পাঠে বাঙলার এক প্রাচীন যুগের মনোজ্ঞ ছবি চোখে দেখিবেন। কাহিনীটি যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক এবং ঐতিহাসিক মূল্যও ইহার অল্প নয়। এ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া শিবরতন বাবু বাঙলা সাহিত্যের উপকার সাধন করিয়াছেন।

**ব্রাহ্মণজাতির ইতিহাস।** বিদ্বৎসভা সদ্‌গ্রন্থমালা—তৃতীয় অনুষ্ঠান। শ্রীযুক্ত হরিপদ শাস্ত্রী এম,এ প্রণীত। শ্রীরামপুর, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, সিদ্ধেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। মিঃ প্যাটেলের বিলকে উপলক্ষ করিয়া এই সন্দর্ভটি লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্র ও ইতিহাস হইতে লেখক প্রমাণ করিয়াছেন, "অসবর্ণ বিবাহেই ব্রাহ্মণজাতির পরিপুষ্টি"; এবং "সবর্ণসম্ভূত কোন জাতিই ভারতে নাই।" সন্দর্ভকার মহাভারতের উপরই বেশী নির্ভর করিয়াছেন—মনু, ব্যাস, পারস্করাচার্য্য এবং বোধায়নের উক্তি হইতেও তাঁহার যুক্তি আরো অকাট্য এবং অভ্রান্ত বলিয়া তিনি প্রমাণ করিয়াছেন। লেখকের গবেষণা এবং অধ্যবসায় অসাধারণ। এই যুগসন্ধিক্ষণে তিনি এই শাস্ত্রমত প্রচার করিয়া সমগ্র দেশের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আরো বিশদভাবে তিনি বিষয়টির আলোচনা করিলে আমরা সুখী হইব।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



উপবনে

প্রাচীন চিত্র হইতে



উপবনে

প্রাচীন চিত্র হইতে

# ভারতী

৪৩শ বর্ষ ] মাঘ, ১৩২৬ [ ১০ম সংখ্যা

## যেদিন চাঁদিনী রাত

যেদিন চাঁদনী রাত, জোছনায় আকাশ আকুল,
ফুটে ওঠে ধরণীর বুক ভরে সব সাদা ফুল,
কামিনী মল্লিকা বেলা গন্ধরাজ যূথিকা বকুল,
সেদিন আমার বুকে ব্যথা বাজে, জল ভরে চোখে,
ভাবি আমি, তোমার সে দূরান্তর লোকে
কুসুমের পরিমলে, সুষমার ছন্দে লেখা শ্লোকে,
রজনীর অন্ধকারে, বাতাসের নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
স্মরণে স্বপনে গাঁথি এমনি কি নব নব ভাষে
কতশত ভোলাকথা বারে বারে মনে নিয়ে আসে?
কত গড়ে তোলা আর হায় কত ভেঙে-পড়া আশা,
কত সুখ, কত দুখ, কত ভোলা, কত ভালবাসা?

হয়ত যেখানে আছ, সব সেথা আরো কত ভালো,
যার কাছে তুচ্ছ অতি আমাদের ধরণীর আলো,
এই ফুল, এই পাতা, তরু-তৃণ-লতিকার জাল,
তবুও যখনি চাঁদ পড়ে হেসে মোর জানালায়,
নিরালা শয়নে একা, জেগে-থাকা বেদনা ভুলায়,
জোনাকি আঁধার বনে, একে একে দীপালি জ্বালায়,

অকস্মাৎ গায় পাখী, চারিদিক স্তব্ধ হয়ে শোনে,
মনে হয়, বসুন্ধরা যেন কার পদশব্দ গোণে,
ফুলের সুরভি এসে, আমারে জড়ায় আলিঙ্গনে,
স্বর্গ ভ্রম হয় ধরা, তখনি যে মনে পড়ে যায়,
তুমি নাই, আমি একা, অশ্রুজল শিথান ভিজায়!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

---

# দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্ম্ম

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম যখন অঙ্কুরিত হইল এবং যখন অঙ্কুর হইতে স্ফুট আকৃতি লইয়া দাঁড়াইল, তখন বিরুদ্ধপন্থী ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মরাজ্যে যে সাড়া পড়ে নাই, তাহা নিশ্চয়—তখন বেদরাজ্যের জাগ্রত অভিভাবকেরা এই বেদদ্বেষী নবশিশুর অন্নপ্রাশনেরও খবর রাখিত না। তাহারা উপনিষদের যুগে, বেদের মতবাদের ধারণা, কল্পনা ও সিদ্ধান্ত ইত্যাদি লইয়া ব্যস্ত, দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন আকার লইয়া ষড়দর্শন বিভাগ-স্থাপনে যত্নশীল, বাহিরে যে কাহারা বুঝিতে না পারিয়া শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইতেছে, তাহার খবর লইবার সময় তাহাদের ছিল না। তাহারা "তৎ ত্বম্ অসি—সোঽহম" ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া অমৃতের হাট খুঁজিত—আত্মার অমর-মুকুট-সন্ধানে "খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর', সেইরূপ জ্ঞাননেত্রে সন্ধান করিত, আর কহিত, 'রে অমৃতের পুত্র, মরণের তীর পার হয়ে আয়!' তাহারা মৃত্যুর মালা ফেলিয়া দিয়া পারিজাত-হার গলায় পরিতেছিল, কিন্তু ওদিকে যে চতুর্ব্বর্ণের শেষ বর্ণগুলি দিশেহারা হইয়া উঠিতেছিল, তাহার কথা তাহারা জানিত কি? কর্ম্মপ্রাণ ক্ষত্রিয়, পণ্যশীল বৈশ্য এবং সেবাশীল শূদ্র, তখন কোথায় ছিল? তাহারা সেই দর্শনের সুদৃঢ় প্রাচীরলগ্ন দেবায়তনের দিকে চাহিয়া কি দেখিত? জ্ঞানের বৈষম্যে সে মন্দিরে প্রবেশও যে তাহাদের একরূপ অনধিকার-চর্চ্চারূপে দাঁড়াইয়াছিল। তবে তাহারা কি করিবে? ব্রাহ্মণ যদি শিরস্তম্ভ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল, তাহারা শুধু নিঃসার উরুস্তম্ভ ও পদস্তম্ভরূপে সে মহা-সৌধের নীচে নীরবে শুধু অচলায়তনের ভার বহিবে? ব্রাহ্মণ ব্রহ্মানন্দে কালযোগে ব্রহ্মলীন হইবে, আর তাহারা বুঝি কালের চাপ বুকের উপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বহিয়া আসিবে! তা কি হয়? ঐ যে শিশুর অন্নপ্রাশন হইল, এবার সে শিশু গণ্ডী ছাড়াইয়া পূর্ণ শক্তির রাজ্যে আসিয়া পৌছিল। এবার তাহার মুখের বাণী ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে! যে জাতির জীবন জীর্ণতন্তুতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, এবার তাহাতে নবসূত্র সংযোজিত হইল। যখন ব্রাহ্মণ আপন দায়িত্ব-বোধ ত্যাগ

করিল এবং নিজেকে লইয়া ব্যস্ত থাকিয়া পরের আশ্রয়-ভার পরিহার করিল, তখন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সেই অনাশ্রিতের ভার লইতে সেই মরণাহতের শুশ্রূষা করিবার ভার পাইতে ন্যায়তঃই দাবী করিতে পারে। ব্রাহ্মণের অবহেলায় ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য-চ্যুতিতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল, মাথা তুলিয়া উঠিয়া সমস্ত ভারত নব সুরে মাতাইয়া তুলিল—ব্রাহ্মণ দেখিল, এইবার তাহার মস্তকেও বুঝি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম জগদ্দল শিলা চাপাইয়া ব্রাহ্মণ-শক্তিটুকুকে নিভাইয়া দেয়, তখন ব্রাহ্মণ কাছা-কোঁচা আঁটিয়া সমরাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। এবার কিলজফির গাজানি কমিল, মিত্ররাজন্দের সহিত কোমর বাঁধিয়া ব্রাহ্মণ লড়াই বাধাইল, অগ্নিমিত্র-দ্বারা অশ্বমেধ প্রথার পুনরুত্থান-দ্বারা ব্রাহ্মণ বুঝাইতে চাহিল, মৌর্য্যবংশ স্তিমিত-বৈভব হইয়াছে আমাদের ধূমায়িত মন্ত্রশক্তিতে! বৌদ্ধ-জগতে ব্রাহ্মণ হাঁক-ডাক ছাড়িয়া কহিল, "আমি মরি নাই—আছি, আছি।"

পৌরাণিক যুগে ব্রাহ্মণ গড়িল নবধর্ম্ম। শাক্ত. শৈব, বৈষ্ণব রূপের মুখোস পরিয়া এইবার ধর্ম্মের যে ত্রি-তরঙ্গ উঠিল, তাহাতে কেমন করিয়া বৌদ্ধ-নিশান রাজ্যস্তম্ভ হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার আলোচনা আপাতত নিষ্প্রয়োজন।

এইখানে আমাদের বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে, কেমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ক্ষীণ-দ্যুতি লইয়া দক্ষিণ-ভারতাঙ্গনে আসিয়া উপনীত হইল, এবং কেমন করিয়া অনার্য্য-সেবিত দক্ষিণাপথের উপর দিয়া সে আলোর রথ চাকিতে উল্কাশিখার মত জ্বলিয়া উঠিয়া কুমারিকা-প্রান্তে আসিয়া থামিল; তার পর তাহার পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া সুবর্ণ লঙ্কা-দ্বীপে এক অতি বিশাল আলোকমঞ্চ গড়িয়া তুলিল। উত্তর-ভারতে সে আলোকচ্ছটা ফুটিয়া উঠুক আর নাই উঠুক, দক্ষিণ-ভারতের জনপদে সে বহ্নি-দীপ্তি, বুদ্ধের মহা নির্ব্বাণের দিন হইতেই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছিল—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। রিস্-ডেভিড্‌স্ Rhys-Davids এক জায়গায় বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ এই বৌদ্ধ-উত্থানকে এত অবহেলা-ঔদাসীন্যের চক্ষে দেখিত, যে বৌদ্ধ প্রসার-কাহিনী তাহাদের পুরাণ-ইতিহাস-আলোচনা-প্রসঙ্গের অঙ্গীভূত করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিত; কাজেই ব্রাহ্মণ-রচিত গ্রন্থে বৌদ্ধ ইতিহাসের মূলসূত্র একরূপ চাপা পড়িয়া আছে। এই ধর্ম্মের উত্থান-কাহিনী ও তাহার সহিত দক্ষিণ ভারতের সম্বন্ধ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে, আমাদের প্রথমেই সিংহলের ইতিকথা, প্রসিদ্ধ মহাবংশের শরণ লইতে হইবে। ব্রাহ্মণ-রচিত গ্রন্থে অশোক হইতে বৌদ্ধ-শক্তির একটা ধারা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা পূর্ব্বাভাস লইয়া ব্যস্ত, তাই মহাবংশের কথাই সর্ব্বাগ্রে আলোচ্য।

মহাবংশে কতকটা রূপকথার ভঙ্গীতে সিংহল-বিজয়-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বিজয়-সিংহ সুদূর ভারত-প্রান্ত হইতে কেমন করিয়া সিংহল অধিকার করেন তাহা বলিতে গিয়া দেখি, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সঙ্গে সে আক্রমণের কতটুকু সম্বন্ধ ছিল এবং সেই আক্রমণ-কালে দক্ষিণ-ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহারও সুস্পষ্ট আভাস তাহা

হইতে পাই। বিজয়সিংহ শাক্যবংশীয় রাজকুমার। তিনি গুর্জ্জরের লতা নামক রাজ্যের যুবরাজ; পিতার নাম সিংহবাহু। তাঁহার মাতা কলিঙ্গরাজ-কন্যা। যৌবনে তিনি দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলে, পিতার আজ্ঞায় তাঁহাকে রাজ্য-ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার চক্ষু ফুটিল। দাক্ষিণাত্যে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি পাণ্ড্য-নৃপতির রাজ্য-সীমানায় আসিয়া পৌঁছিলেন। দক্ষিণ মধুরা আর্য্য উপনিবেশগুলির মধ্যে তখন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, এই রাজ্যে পৌঁছিয়া তাঁহার অদৃষ্ট ফিরিয়া গেল। রাজ-জামাতা হইয়া বিজয় সিংহ রাজ্য-গঠনে ও রাজ্য-বিজয়ে মন দিলেন। তাঁহার অনুচরেরা সিংহল দ্বীপের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করাইয়া দিল। জনবাহিনী লইয়া রাজ-কুমার সমুদ্র-বেলা লঙ্ঘন করিয়া জলপথে লঙ্কানগরী-দ্বারে উপনীত হইলেন। লঙ্কার অনতিদূরে শিবির স্থাপিত করিয়া অবস্থান-কালে কুবেণী নাম্নী যক্ষিণীর সহিত রাজকুমারের ভাব-বিনিময় হয়। এই প্রেম-মন্ত্রে যুবরাজ বিজয় সিংহ একদিন কুবেণীর সহায়তায় লঙ্কা নগরীতে অধীশ্বর হইয়া বসিলেন। এতদিন যে স্থানে শিবির স্থাপনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম তাম্রপর্ণী। এই তাম্রপাত হইতে বিজয় সিংহ স্বর্ণ-লঙ্কার কোলে নিজ আসন স্থাপিত করিলেন। সিংহলরাজ কালসেন ও তাঁহার সামন্তবর্গ পরাভূত ও বিনষ্ট হইলেন। কথিত আছে, সিহাল বংশ এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া তদনুকরণে সিংহল নাম হইয়াছে। রাজ্যের নব-প্রতিষ্ঠার সময় বিজয়সিংহ শ্বশুর-রাজ্যের সহিত বিশেষভাবে জড়িত হইতে লাগিলেন। মধুরার সাহায্যে তাঁহার এই রাজত্ব-লাভ হইয়াছে, তাই বিশেষ করিয়া পত্নীর কথা ভাবিবার তিনি অবকাশ পাইলেন। কুবেণী কাঁটার মত পথে ছিল, সহসা কুবেণীর নিরাশ প্রণয়ী এক যক্ষ সমূলে সে কাঁটাও উৎপাটিত করিল, প্রতিহিংসার নিবৃত্তি হইল।

এইরূপে মহাবংশের কথা হইতে আমরা দেখিতে পাই, খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে শাক্যবংশীয় এক রাজনন্দন সিংহল পর্য্যন্ত যাইয়া শাক্যবংশীয় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। বুদ্ধের নির্ব্বাণের অনতিকাল পরে এই ঘটনা ঘটে। বিজয় সিংহ শাক্যবংশ-তিলক, শাক্যসিংহ-বুদ্ধের নব ধর্ম্মের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন না। এ অনুমান ইতিহাস-লেখকেরা করেন, পরন্তু শাক্যসিংহের ধর্ম্ম প্রথমতঃ নিজ-পরিবারে ব্যাপ্ত ছিল—Charity begins at home, স্বজন-প্রেম হইতে বিশ্বজনীন প্রেমের উৎপত্তি হয়। সেইরূপ স্বজন হইতে তাঁহার ধর্ম্ম স্ববংশে ও পরে ভিন্ন ভিন্ন জনপদে প্রবেশ লাভ করে। বিজয়সিংহ যখন পাণ্ড্য-উপনিবেশে গমন করেন, তখন তিনিই প্রথম বুদ্ধের অভিনব ধর্ম্মের আলোক-কণা দাক্ষিণাত্যের পথে ঘাটে, বাটে মাঠে নগরে পল্লীতে বিকীর্ণ করিয়াছিলেন, এ অনুমান সহজ-বোধ্য। ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যে না হউক, ধর্ম্মালোচনার প্রসঙ্গে নিজ বংশ-গৌরব তাঁহার পক্ষে অনুভব করা খুবই স্বাভাবিক।

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কুবেণীর চরিত্র-চিত্রণে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলেও, বিজয়-সিংহের লঙ্কাবিজয় যে শুধু অসির সাহায্যে হয় নাই, তাহা বুঝাইতে গিয়া সিংহল বিজয়ের

অধ্যায়ে তিনি বৌদ্ধ-পতাকা-স্তম্ভ দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। 'অসি চকমক্ বর্ষাফলক ডারি দেয় কত শির' শুধু কি শিরই ডালি দিয়াছিল, না, শিরের মধ্যে নিহিত ধর্ম্মবীজ ফেলিয়া দিয়া নব ধর্ম্মের বীজ পুনরায় রোপিত করিয়াছিল! এই লঙ্কার সমুদ্রপ্রান্তে, জয়-পরাজয়-কাহিনীর নিভৃত প্রদেশে, দুইটী ধর্ম্মশক্তির উদয়াস্ত কি লক্ষিত হয় না—তলোয়ারের খাপের প্রচ্ছন্ন আবরণে দুইটী ধর্ম্মের মৌন দ্বন্দ্বের ইতিহাস কি আমরা পাই না? এই লঙ্কার সমুদ্রতীরে নবধর্ম্মের যে জয় সূচিত হইল, তাহা কি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বর্দ্ধিতশক্তি হইয়া সমগ্র দক্ষিণরাষ্ট্রে বিজয়-নিকেতন গড়িয়া তুলে নাই? লঙ্কাদ্বীপের অধীশ্বরী দেবী ছিলেন কালী। ইঁহার প্রথম স্থানচ্যুতি হইতেই ব্রাহ্মণের চতুর্ব্বর্ণের নিম্নস্তরে কীট ঢুকিয়া গেল, সেই কীট একদিন কি ব্রাহ্মণের বাহন খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দেয় নাই?

ইতিহাসের কষ্টি-পাথরে ঘষিলেও এ কথাটুকু বলিতেই হইবে যে সেই সুদূর কালেও আর্য্য-উপনিবেশ পাণ্ড্য-রাষ্ট্রে ও লঙ্কায় বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষভাবে পরিচিত ছিল, বুদ্ধের ধর্ম্মের সার-মর্ম্ম সমাজের নিম্নস্তরেও পৌঁছিয়াছিল; এইরূপে প্রথম ভূমি-পত্তন হইল—the soil was prepared. আরও একটা সত্য আমরা পাই যে, দাক্ষিণাত্যে তখন আর্য্য-গঠিত রাজ্য অতি অল্পই ছিল, এবং যে কয়েকটী ছিল তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য,—পাণ্ড্যরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম-সংশ্লিষ্ট এক নৃপ-কুমার রাজ-জামাতা হইয়া আর্য্যদের মধ্যেই প্রথমতঃ ধর্ম্মের বীজ অলক্ষ্যে নিহিত করিয়া যান; সেই বীজ কালে যে ফল হইয়া দাঁড়াইল তাহা সকলেই জানেন। বীজ ছাড়া ফল হয় না; তাই মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে সেই উল্লেখযোগ্য বিবাহের কথাই বলিতে হয়।

দাক্ষিণাত্যে তখনও আর্য্য-অনার্য্য সং-মিশ্রণে জাতিসঙ্ঘ গড়িয়া উঠে নাই—আর্য্য রাজ্য হইতে যে সভ্যতার স্রোত দাক্ষিণাত্যের জনবস্তিতে যাইত, সেই স্রোতে অনেক অনার্য্য আসিয়া আর্য্যসমাজ-ভুক্ত হইতে লাগিল—ব্রাহ্মণের ন্যায়ের বিধান লৌহ-শৃঙ্খলের মত তাহদিগকে বাঁধিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দিত। অগস্ত্যের 'তমিরমুনি' আখ্যা হইতে বুঝা যায়, ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম-প্রচারকের হস্তে কেমন করিয়া দাক্ষিণাত্যের বিচিত্র জাতি-সমূহ সমাজ-বন্ধনে ধরা দিতে লাগিল—কেমন করিয়া সমাজের নিম্নস্তর গঠিত হইল। কিন্তু ঠিক বৌদ্ধধর্ম্ম-যুগের সময় সেই ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে প্রচার কার্য্য সমাধা হইয়াছে, তাই আবার দর্শন-জগতে ডুব দিলেন, ন্যায়ের ভাষ্য ও টিকা-টিপ্পনী লইয়া সমস্ত রাজ্য, জগৎ ভুলিয়া গেলেন, ব্রহ্মবিদ্যার তাণ্ডব-নৃত্যে চারিদিক মাতাইয়া তুলিলেন, কিন্তু সেই আড়ষ্ট সমাজের স্তরগুলি কি পঙ্গু হইয়া যাইবে? প্রত্যুত তাহারা পঙ্গু হইয়াছিল, বধির ও বাক্যহীন হইতে বড় বাকী ছিল না! ঠিক্ এই সময় বৌদ্ধধর্ম্মের বিপুল বীণায় শ্রমণেরা দীপক রাগিণী জুড়িয়া দিল, আর অমনি শিথিল জাতির প্রাণে সে সুর সাড়া দিয়া উঠিল—ইহাই জীবনের জয়জয়ন্তী রাগিণী! সে জীবনের গানে সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে নবজীবন জাগিয়া উঠিল, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাণশীল তরঙ্গ জনসঙ্ঘের বক্ষে হিল্লোলিত

হইয়া উঠিল, এইখানেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল।

এই সূত্রপাত-কাহিনীর সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তরের যোগ ছিল, তাই এত বিস্তৃত করিয়া উহারই আলোচনা করিতে হইয়াছে। আমাদের দেশে ইতিহাস এখনও 'হাঁটি হাঁটি পা-পা' করিয়া চলিতে শিখিতেছে, এখনও সে শিশু, স্বভাবশীল গতি লইয়া যুবার মত চলিয়া যাইতে পারে না। তাই একটু হাঁটাহাঁটি করিয়া অর্দ্ধপুষ্ট শিশু আবার ঘুমাইয়া পড়ে, তখন তাহার সেই আধ-আধ বাণীও শুনিবার সুযোগ আমরা হারাইয়া বসি—তখন ভারতের বুকে আবার আঁধারের চাপ আসিয়া পড়ে এবং কালের ইতিহাস সেই অন্ধকারের গুহা-লীন হইয়া গা ঢাকিয়া ফেলে। এখানেও তা'ই। কতদিন চলিয়া গেল। দাক্ষিণাত্যের সঠিক খোঁজ, ইতিহাসের ফল্গুধারা আমাদের চক্ষে কে ধরিয়া দিবে?

অশোকের সময়ে আবার আলোর উদ্বোধন হইল। ইতিহাস-শিশু এখন সম্পূর্ণ জাগ্রত—এবার খবরের অভাব হইবে না। মহাবংশ হইতে জানিতে পারা যায়, অশোকের সময়েই বৌদ্ধধর্ম্ম কি-লঙ্কায় কি-গুর্জ্জরে কি দক্ষিণাপথের জনপদে দেখিতে দেখিতে অবলীলাক্রমে ছাইয়া বসিল। যেদিন কলিঙ্গ-যুদ্ধ হইল, সেদিন ভারতের কেন, পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন—এমন দিন যুগ-যুগান্তকারী—epoch-making day. যেদিন কলিঙ্গ রণে অশোক রক্তারক্তির শোণিত গঙ্গায় বোধিদ্রুম ভাসিয়া যাইতে দেখিলেন, সেই দিনই তাঁহার জীবনে যুগপৎ উদয়াস্ত ঘটিল। তাঁহার কোষ হইতে অসি খসিয়া পড়িল, শিরতাজ ধূলায় লুণ্ঠিত হইল, ঐ রক্ত-গঙ্গার স্রোতে লক্ষ্য করিয়া তিনি দেখিলেন, তাঁহার উদ্দাম ঐশ্বর্য্য-মদধারা শোণিতবিন্দুর সহিত মিশিয়া মহাসাগরের দিকে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। এক তিল এক তিল করিয়া মহারাজ অশোক, বিজেতা অশোক সেই রক্তবিন্দুতে নিঃশেষিত হইলেন, এইরূপে অশোকের শোণিত-তর্পণ সমাধা হইল। 'দেবানামপিয় পিয়াদশী!' বিপুল সাম্রাজ্যের সিংহাসনে যখন বৌদ্ধ ত্রিপিটক স্থাপিত হইল, এবং উহার ভার সমগ্র ভারত বহিতে লাগিল, তখন বৌদ্ধযুগ যে পূর্ণোদ্যমে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা কি আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে? সুদূর লঙ্কা হইতে যখন কুমারিকা পথে দাক্ষিণাত্যের মধ্য দিয়া রাজকুমারি মহীন্দ্রকে বৌদ্ধ চতুর্দ্দোল বহিয়া লইয়াছিল, তখন দক্ষিণভারতে বৌদ্ধশক্তি পূর্ণ আকারে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

দেবপ্রিয় তিষ্য অশোকের রাজ-দরবারে বোধি-বৃক্ষের এক শাখা-পল্লব-প্রার্থী হইয়া দূর লঙ্কা-প্রান্ত হইতে আসিয়াছিলেন। এই বোধিদ্রুমাঙ্কুর সিংহলদ্বীপে কালক্রমে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের যে আলোক-মঞ্চ গড়িয়াছিল, উহারই আলোয় ভারত মহাসাগর দীপ্তিমান হইয়া উঠিয়াছিল—ভারত-জলধি সে আলোর তরঙ্গে ছন্দে ছন্দে হিল্লোলিত হইয়া উঠিলে সে তরঙ্গের বেগ যবদ্বীপ বরাহ দ্বীপ সুবর্ণ দ্বীপ প্রভৃতি জলধি-রাজ্যে পৌঁছিয়া ধর্ম্মের নবযুগ প্রবর্ত্তন করিল। মহীন্দ্র যখন ভগ্নী-সহকারে দক্ষিণাপথে লঙ্কায় পৌঁছিলেন, তখন কথিত আছে, মহীন্দ্র আকাশ-পথে সাগর-প্রান্তে পৌঁছিয়াছিলেন, বায়ুবিহারী আধুনিক

'পোলেটের' দাবী করিতে যাওয়া একটা অসম্ভব কথা। তিষ্য ( খৃঃ পূঃ ২৪৭ ) লঙ্কা-বিহার নির্ম্মাণ করেন, এইরূপ বিহার-নির্ম্মাণ-পদ্ধতির সাড়া তখন জাগিয়া উঠিল। লঙ্কায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিস্তার-প্রসঙ্গ এইজন্য অতি-প্রয়োজনীয় যে, উত্তরভারতে যেমন রাজধানী ও বিশেষতঃ তথাকার বৌদ্ধ-বিহার হইতে প্রচারকগণ প্রচারের সুবিধা পাইতেন, দক্ষিণভারতে একমাত্র লঙ্কা হইতে সেই প্রচার-কার্য্য সুন্দররূপে সমাধা হইত।

লঙ্কার বৌদ্ধ-সঙ্ঘ হইতে যে প্রচার-কার্য্য আরব্ধ হইল, তাহার প্রথম কেন্দ্রস্থল সেই পাণ্ড্যরাজ্য। আমরা দেখিয়াছি, এই পাণ্ড্য-জগতে বৌদ্ধ বীজ বিজয়সিংহের হস্তে প্রথম উপ্ত হইয়াছিল এবং লঙ্কার সহিত পাণ্ড্য-নৃপতির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ থাকায় ধর্ম্ম-প্রচারের কার্য্য এখানেই সুচারুরূপে চলিল ;—হিউ-এন্‌থ্-সঙ্ এক জায়গায় বলিয়াছেন, কাঞ্চী-নগরী বুদ্ধদেবের সমসাময়িক দেশ ও তাঁহারই দ্বারা প্রথম বুদ্ধপন্থী হইয়াছিল। ইতিহাস-বিখ্যাত ধর্ম্মপাল সেইস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন, অশোক ইহার চতুষ্পার্শ্বে বৌদ্ধস্তূপ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক পাশাপাশি জৈনধর্ম্মও দেখিয়াছিলেন। মৌর্য্যসম্রাট অশোক যখন ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠায় মনঃসংযোগ করিলেন, তখন তাঁহার ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ তাঁহারই নির্দ্দেশানুযায়ী দক্ষিণভারতের জন-পদে বৌদ্ধ-পতাকা হাতে লইয়া আনা-গোনা আরম্ভ করিলেন—তাহাদের চরণচিহ্নে চিহ্নিত যে সকল স্থান ছিল, তন্মধ্যে ইতিহাস-লেখকেরা এই কয়েকটীর নাম বিশেষ করিয়া করেন,—মহিষ্যমণ্ডল, বনবাসী, অপরান্ত ও মহারাষ্ট্র দেশ। আধুনিক আলোচনায় মহিষ্য-মণ্ডল বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্যের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, বনবাসী কদম্ব-রাজধানী ও পল্লব রাজ্যের প্রান্তস্থিত। অপরান্ত হইতেছে কন্‌কান্ প্রদেশ। অশোকের যে অনুশাসন এইখানে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অপরান্ত যে বৌদ্ধ-প্রধান স্থান ছিল, সে-বিষয়ে আর সংশয় থাকে না। পুনা প্রদেশের নাম মহারাষ্ট্র। মহীশূর রাজ্যে যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা ধর্ম্মপ্রচারের নিদর্শন অতি সুস্পষ্ট বলিয়া মনে হয়। হিউ-এন্‌থ্ সঙ্ হইতে এ বিষয়ে আমরা অনেক সাহায্য পাই,—তিনি পূর্ব্ব-শৈল ও অপরশৈল নামক সঙ্ঘারামদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। পথে চলিতে চলিতে তিনি অনেক বৌদ্ধ-বিহার প্রত্যক্ষ করিয়া-ছিলেন, এক জায়গায় তিনি সাতবাহন রচিত পরম-রক্ষিত-বিহার সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিয়া-ছেন। এই নিদর্শন ভিন্নও আমরা জানি যে সাতবাহনবংশীয় নরপতিসমূহ বৌদ্ধপন্থী ছিলেন —তাহাদের রাজত্বের সূত্রপাত হয় খৃষ্ট-পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে ; স্মিথ আরও কিছু পূর্ব্বে ইহাদের রাজত্বের আরম্ভ কাল নির্ণয় করেন। সকলেই জানেন, এই অন্ধ্র রাজকুল দাক্ষিণাত্যের একরূপ মুকুট-মণি ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের অন্ধতমসাচ্ছন্ন ইতিহাসের মধ্যে প্রথম আলোর সূত্রপাত হয় এই অন্ধ্র ধারার সহিত। এই অন্ধ্ররাজ্য যখন বৌদ্ধধর্ম্মকে মাথায় করিয়া লইয়াছিল, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের কিরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। এই বংশের কীর্ত্তির নিদর্শন স্বরূপ অমরাবতী স্তূপ আজও ইতিহাসের ভাণ্ডারে এক অতুলনীয়

সম্পদ—উহার শিল্প-নৈপুণ্য, সেই প্রাচীন যুগের শিল্পাদর্শকে আজও সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। অন্ধ্রাজ্য দাক্ষিণাত্যের অনেকাংশে ব্যাপ্ত ছিল। কৃষ্ণার তীরে ধান্যকোট কোহ্লাপুর পৈথান প্রভৃতি স্থানে অন্ধ্রাজকুল দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইত। ইতিহাস্-পাঠে দেখা যায় অশোকের মৃত্যুর পরে অন্ধ্রাজ্য মৌর্য্যরাজ্য হইতে বিমুক্ত-পাশ হইয়া ক্রমশঃ স্ফীতাকারে অবশেষে কণ্বদের হাত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া মৌর্য্য-রাজধানীর সীমা পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। অশোকের মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যের ধর্ম্ম-দণ্ড অন্ধ্দের কবলে আসিয়াছিল, তাহারাই সেই ধর্ম্মের জন্য যত্নপর হইয়াছিলেন।

সেনার ( E. Senart ) প্রকাশিত—Inscription of Piyadasi পাঠে জানা যায়, অশোক শাসন-তন্ত্রে ধর্ম্ম মহামাত্য নামীয় পদ সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন—এই ধর্ম্ম মহামাত্য সকল রাজনৈতিক কর্ম্মচারীর মত, প্রদেশ-বিশেষের ভার গ্রহণ করিতেন। এইরূপে ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্য চলিত। কিন্তু ইহাতে হয়ত ধর্ম্মবিনাশের বীজও নিহিত ছিল; কারণ অশোকের অমাত্যবর্গের ভিতর বিরুদ্ধ-পন্থীরা অবশ্যই মর্ম্মব্যথার অনুভূতি অন্তরে পোষণ করিত এবং এই অন্তর-ইন্ধন অচিরে উত্তর ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা পাইল—কিন্তু দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অনেক কাল টিঁকিয়া গেল। বৌদ্ধধর্ম্মের পাশাপাশি জৈন ধর্ম্ম কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিয়া উভয়ের মধ্যে কোন্দলের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার আভাস আমরা জৈন ইতিহাস-প্রসঙ্গে পাইয়াছি, এখানে নূতন করিয়া আর কিছু বলিবার নাই। খ্রীষ্টীয় সপ্তম, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে এই দ্বন্দ্ব ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। অব্রাহ্মণ ধর্ম্মের দুই ধর্ম্মই যখন যুদ্ধ চালাইল, তখন এই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ কিয়ৎকাল ধরিয়া দর্শক সাজিয়া রহিলেন। যুদ্ধে বুদ্ধ-পন্থীরা হটিতে লাগিলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম তখন সমগ্র আশিয়া-গ্রাসে অগ্রসর হইয়াছে, ক্ষুদ্র দক্ষিণ ভারতের জয়-পরাজয়ে কি আসিয়া যায়! সেই অগ্নি-পরীক্ষার যুগে বৌদ্ধ-দৃষ্টি ভারতের দিকে অন্তর্মুখী না হইয়া, বহির্মুখী হইয়া পড়িল, কাজেই বুদ্ধ-শক্তির হ্রাস হইতে বিলম্ব ঘটিল না। নাগসেনের মত, সারিপুত্রের মত, আনন্দের মত আর বৌদ্ধাচার্য্য জন্মিলেন কই? বিশেষতঃ এই সময়ে মহাযান ধর্ম্মের প্রসার বাড়িয়া উঠায়, হিন্দুর দেবায়তনের দেব-দেবী আসিয়া বুদ্ধ বিহারগুলি জুড়িয়া বসিলেন, তান্ত্রিক ধর্ম্মের সহিত মহাযান সহযোগে বৌদ্ধধর্ম্মের তান্ত্রিক মতে সন্ধি হইয়া গেল, ভেদ অভিবাদ যূপকাষ্ঠে বলিদান হইয়া গেল। এইরূপে বৌদ্ধ-বিরুদ্ধ স্রোতকে ফিরাইয়া সনতন ধর্ম্মস্রোতের সহিত এক করিয়া দেওয়া হইল, তখন বৌদ্ধধর্ম্ম আর ভিন্নরূপে দাঁড়ায় কতদিন? দক্ষিণ ভারতেও তাহাই ঘটিয়াছিল। এতদুপরি শৈব ও বৈষ্ণবদল হীনযান-পন্থীদের লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। শৈবদলপতি মধুরকবি ও বৈষ্ণব নায়ক মাণিক্যবাচা যেমন জৈন দিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তেমনি বৌদ্ধদের প্রতিও মৃত্যুবাণ সন্ধান করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণদলের পুনরুদ্দীপক দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ কুলতিলক শঙ্করাচার্য্যের অগ্নি-গর্জ্জন

সম্মুখে হিম স্তূপের মত বৌদ্ধ-জৈন মত হারিয়া গেল। মালাবর-উপকূল হইতে এই পুরুষের উত্থান। দাক্ষিণাত্যের নগরে-নগরে তাঁহার অগ্নিগর্ভ বাক্যস্রোত বহাইয়া কালান্তক সম তিনি উত্তরভারতে বৌদ্ধ-গগনে উদিত হন। বেরার হইতে আর-এক শক্তিশালীর উদ্ভব হইল—ইঁহার নাম কুমারিল ভট্ট। ইঁহার বাক্যে ইন্দ্র-চন্দ্র পাত হইতে লাগিল। বৌদ্ধেরা যেমন বিহার রচিয়া ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল, সেইরূপ এই সময়ে ব্রাহ্মণ প্রতিদ্বন্দ্বীরা মঠ রচনা করিয়া ধর্ম্মের বিভিন্ন কেন্দ্র গড়িয়া তুলিল। আজ পর্য্যন্ত শঙ্কর মঠ প্রভৃতির অস্তিত্ব সেই অতীতের মহাযুদ্ধের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

# মহাপ্রলয়

( নাটিকা )

## আরম্ভ

ঐ না আসছে, ঐ না আস্‌ছে
অন্ধকারে মস্ত একটা হাঁ!
তোমার দিকেই কটাক্ষ তার,
চাইছেনাক ডাইনে কিম্বা বাঁ!
ওরেই বলে মহাপ্রলয়!
নইলে ওরে আর কিবা কয়?
ঐ দেখনা মেলিয়ে পাখা
ঝড়ের মতো আসছে সাঁ!
ঐ শোনো তার বোল্ বেজেছে
তেড়ে যা, কেড়ে নে,—ধাঁ!

## প্রথম দৃশ্য

রাজপথ

[ দুইজন নিম্নশ্রেণীর বুড়োবুড়ি পোঁটলা-পুঁটলি লইয়া পালাইতেছে। ]

বুড়ো। ওরে পালা, পালা, পালা!

বুড়ি। এলরে, গেলরে, হায়রে, হা!

[ সন্ন্যাসী-বেশে শ্রীনিবাসবাবুর প্রবেশ। ]

শ্রী। বলি, তোমরা যাও কোথায়?

বুড়ো। যাই—যাই।

বুড়ি। পালাই—পালাই।

[ শ্রীনিবাস সবেগে পলাতক বুড়োর হাত ধরিল ]

বুড়ো। ছেড়ে দাও সন্ন্যাসীঠাকুর, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। ঐ সবাই পালিয়ে গেল, আমি একা পড়ে রইলুম।

শ্রী। আগে বল্ কোথা যাচ্ছিস্, তবে ছাড়ব।

বুড়ি। ওগো পালিয়ে এসনা, আবার দাঁড়ালে কেন?

বুড়ো। ঐ শোনো ঠাকুর, মোরে ডেকে গেল। ছেড়ে দাও, নইলে গোলেমালে তাকে হারিয়ে ফেল্‌ব, আর খুঁজে পাবনা। ছেড়ে দাও বাবা, তোমার চরণে গড় করি।

শ্রী। আগে বল্, পালাচ্ছিস কেন?

বুড়ো। বলব কি ছাই, মহাপেল্লয় এল বলে!

শ্রী। না হয় এলই, তা পালাচ্ছিস কেন?

বুড়ো। ভয়ে বাবাঠাকুর—ভয়ে! প্রাণটা নিয়ে সরে পড়তে পারলেই বেঁচে গেছি এবারের মতো।

শ্রী। সরবি কোথায়?

বুড়ো। সে এখনো ঠিক করিনি।

শ্রী। আরে, যাবার তো একটা জায়গা থাকা চাই?

বুড়ো। তুমি যখন বলছ, তখন একটা জায়গা থাকা চাই বৈ কি—নইলে সরি কোন্ দিকে?

শ্রী। কোথায় সেই জায়গা?

বুড়ো। আমি তার কি জানি? সবাই যেখানে সরবে—তুমি, আমি আর ঐ আমার বুড়ি, আর তার ঐ ধামা, ধুচুনি, কুলো, সবই সরবে সেইখানে—এই ত জানি।

[ একদল যুবক-যুবতী ছেলে-মেয়ে ভীষণ চীৎকারে "পালা পালা" শব্দ করিতে-করিতে প্রবেশ করিল। ]

শ্রী। আরে, সেখানটা কোন্ মুখে তাই বল না!

বুড়ো। ( নতুন দলকে দেখাইয়া ) ঐ ওরা যে-মুখে যাচ্ছে, সেই মুখেই। ওদের কাছে শুধোও, আমাকে ছেড়ে দাও বাবা-ঠাকুর!

শ্রী। আচ্ছা বাপু, তোমরা যাচ্ছ কোথায়?

একটি মেয়ে। তা কি জানি! বুড়োরা পালাচ্ছে, তাই আমরাও পালাচ্ছি। আমরা কি একলা পড়ে থাকব না কি?

শ্রী। আমি দেখছি, তোমরা সবাই সেই মহাপ্রলয়ের যে প্রকাণ্ড হাঁ, তার মধ্যে গিয়ে পড়তে চলেছ।

সকলে সমস্বরে।—অ্যাঁ! বল কি বাবা!

শ্রী। হাঁ, একেবারে তার পেটের মধ্যে গিয়ে সেঁধচ্চ।

সমস্বরে সকলে। ও গো বাবা গো! তবে কোন্‌দিকে যাব গো!

শ্রী। (আকাশের দিকে আঙুল তুলিয়া) ঐ দেখছ?

একদল সমস্বরে। দেখছি বৈ কি ঠাকুর! দেখ্‌ছি বৈ কি—মস্ত হাঁ!

অন্যদল তারস্বরে। আরে ওটা না, ওটা না, কেবল হাঁ হাঁ করেই মোলো। ঠাকুর কি বলেন শোন্।

শ্রী। মেঘজাল ছিন্ন ভিন্ন বিদীর্ণ শীর্ণ!

একজন। তাই ত বাবাঠাকুর! তবে কি হবে!

শ্রী। কোনো ভয় নেই, আমি থাক্‌তে কোনো ভয় নেই! আমি তোমাদের রক্ষে করব।

সমস্বরে। তাই কর বাবাঠাকুর! আমরা তোমার ছি-চরণ কিছুতেই ছাড়ব না।

শ্রী। তবে শোন্—

একজন। ওরে শোন্, শোন্!

( সকলে গলবস্ত্র হইয়া শুনিতে লাগিল। )

শ্রী। আমি ছয়দিন ছয়রাত্র অষ্টপ্রহর তপস্যা করে পুণ্যক্ষেত্র কাশীর মতো আর-এক কাশী সৃজন করেছি। কাশীক্ষেত্র যেমন ভীষণ ভূমিকম্পেও টলেনা, আমার এই পুণ্যক্ষেত্র তেম্‌নি মহাপ্রলয়ে একতিলও

টলবেনা। সেইখানে তোমরা সবাই আশ্রয় গ্রহণ কর। এবারের মতো বেঁচে যাবে।

এক বুড়ো। কি আর বলব তোমায়? আস্‌ছে-জন্মে দারোগা হও সন্ন্যাসীঠাকুর!

শ্রী। কিন্তু বাপু, একটি কথা আছে। শুধু-হাতে সেখানে গেলে চল্‌বে না। ঠাকুর-প্রণামী না দিলে যেমন ঠাকুরদর্শন সার্থক হয় না, তেমনি এই পুণ্যক্ষেত্রে শুধু হাতে গেলে সব নিষ্ফল হয়ে যাবে! মহাপ্রলয়কে রুখতে পারবনা। একজনও যদি ফাঁকি দেয়, তাহ'লে তার পাপে আমার এই কাশীক্ষেত্র অতলে তলিয়ে যাবে। সেইজন্যে আমি টিকিট করেছি। টিকিট না দেখালে কাউকে সেখানে ঢুক্‌তে দেওয়া হবে না। টিকিটের দাম অসমর্থ পক্ষে বড়দের আট আনা, ছোটদের চার আনা কাঞ্চনমূল্য! এটুকু বাপু তোমাদের প্রত্যেককে খরচ করতেই হবে।

একজন। তা কি করি বল ঠাকুর! প্রাণের দায়ে সব করতে হয়।

শ্রী। হাঁ বাবা, ঠিক বলেছ। এখন খুসি হয়ে ট্যাঁক থেকে আট গণ্ডা কোরে পয়সা বার করে ফেল দিকি। আর এ-পয়সা তোমাদের জলে যাবে না। সেখানে অনেক তামাসা দেখতে পাবে। মহাপ্রলয়ের সময়টা বেশ আমোদেই কাটবে। নাও নাও, আর দেরী কোরোনা। শেষে টিকিট ফুরিয়ে যাবে, তখন হায় হায় করতে হবে। আর দেখ, যাবার সময় তোমাদের সব ভাই-ব্রাদারিদের ডেকে নিয়ে যেও, বুঝলে। ঐ ঐখানে আমার লোক মোতায়েন আছে, তারা তোমাদের টিকিট-ঘর দেখিয়ে দেবে।

[ সকলের প্রস্থান। ]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### রাজপথের অপর অংশ

[ সন্ন্যাসীবেশ পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীনিবাসবাবুর ভদ্রবেশে প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসবাবু। ]

কৈ। হ্যাঁ হে শ্রীনিবাস, এ সব কি কাণ্ড করছ?

শ্রী। কি কাণ্ড ভাই?

কৈ। এই তোমার সন্ন্যাসী সেজে লোক ঠকানো।

শ্রী। লোক-ঠকানো কি রকম?

কৈ। ঐ তোমার পুণ্যক্ষেত্র সৃজন!

শ্রী। আরে ও তো বিজ্ঞাপনের ভাষা মাত্র। সোজা কথা ঘুরিয়ে না বল্লে কথায় যে চমক লাগে না! আর চমক লাগাতে না পারলে কাউকে যে অকর্ষণ করতে পারা যায় না—এই হচ্ছে জগতের নিয়ম। মাকড়সা যদি সোজা কথায় হাত-জোড় কোরে বলে, হে ভাই পোকা, তুমি আমার মুখের কাছে এস, আমার বড় খিদে পেয়েছে, আমি তোমায় খাব, তা হলে তাকে উপবাসেই মর্‌তে হয়। সেই জন্যেই ত চক্‌চকে সুতোর জাল বুনে পোকা আকর্ষণ করা তার দরকার। অর্থাৎ সে যে পোকা খাবে এই সোজা কথাটা অনেকখানি জাল বুনে তাকে প্রকাশ করতে হয়। এম্‌নি সব জায়গায়। একে তুমি ঠকামি বল্‌তে চাও বল, কিন্তু এ নইলে দুনিয়া চলেনা।

কৈ। যা হোক দাদা, এই ফাঁকতালে তুমি কিছু মেরে নিলে!

শ্রী। তার জন্যে তুমি দুঃখ করছ কেন ভাই? তুমিও কিছু পিটে নাওনা। আমি

ত আর বিশ্বসুদ্ধ সবাইকে গ্রাস করিনি—এখনো ঢের লোক আলগা রয়েছে।

কৈ। আমি আর কি করব ?

শ্রী। এই আমি যা করছি।

কৈ। অর্থাৎ ?

শ্রী। অর্থাৎ ঢের-কিছু করবার পড়ে রয়েছে। বুদ্ধি খাটাতে পারলেই হল। তুমিও তো কম বুজরুগ্ নও।

কৈ। কিন্তু এখন কিছু মাথায় আসছেনা; —প্রলয়ের ভয়ে বোধ হয় মাথাটা বিগ্ড়ে গেছে।

শ্রী। আচ্ছা, আমি বুদ্ধি দিচ্চি।

কৈ। কি যাগে-যাগে পৃথিবীটা রক্ষে করতে হবে না কি ?

শ্রী। আরে না, না! সে সব চলবে না; —হোম্-টোম ভারি পুরোণো হয়ে গেছে। আমি বলি, আর-এক কাজ কর। ঝাঁ করে ক্রিশ্চান পাদ্রি সেজে পড়। বল, এই মহা-প্রলয় থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় আছে; সে হচ্চে—"নোয়স্ আর্ক!" বল, এই আর্কই পুরাকালের মহাপ্লাবনে মানুষকে এক-বার বাঁচিয়েছিল। এবারও যদি উদ্ধার পেতে চাও, তবে আবার সেই আর্কে এসে আশ্রয় গ্রহণ কর—বেঁচে যাবে। এটা যদি লাগসই করে লাগাতে পার ভাই, তাহলে তোমার খদ্দেরের অভাব হবেনা। দশ, বিশ, এমন কি একশ টাকা পর্য্যন্ত টিকিট করতে পার—দেশে ঢের বড় লোক আছে—বিশেষ মাড়োয়ারী।

কৈ। বেশ বুদ্ধি দিয়েছ দাদা, বলিহারি তোমাকে! কিন্তু এখন "আর্ক" পাই কোথা ?

শ্রী। আরে পোর্টকমিশনারের তো অনেক ভাঙা জাহাজ অচল হয়ে পাড়ে আছে, তারই দু-একখানা দখল কোরে বসনা।

কৈ। তাই চল্লুম দাদা, দেখি চেষ্টা করে।

শ্রী। হ্যাঁ হ্যাঁ, চট্পট্ যাও। তুমি ওপারে রইলে, আমি এ-পারে। তুমি জলে আমি ডাঙ্গায়,—দুজনে মিলে লোক-রক্ষে করি। [ কৈলাসের প্রস্থান। ]

[ একদল ছোকরার প্রবেশ—হাতে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র। ]

শ্রী। ওহে ছোকরার দল! বলি, তোমরা যাচ্ছ কোথা বাপু ?

১ম ছো। আজ্ঞে আখ্ড়ায়।

শ্রী। আখ্ড়ায় কেন ?

২য় ছো। রিহার্সাল দিতে।

শ্রী। কিসের রিহার্সাল বাপু ?

৩য় ছো। আজ্ঞে থিয়েটারের।

শ্রী। অ্যাঁ! এ সময় রিহার্সাল! আর কার জন্যেই বা রিহার্সাল ?

৪র্থ ছো। কেন মশাই ?

শ্রী। বলি, মহাপ্রলয়ের কথাটা কি মনে নেই ?

১ম ছো। হ্যাঃ! মহাপ্রলয়! ও সব বাজে কথা শোনেন কেন ?

শ্রী। বাজে কথা কেন বাপু? এ তো আর তোমার-আমার মত হেঁজিপেঁজি লোক বলেনি। যে বলেছে সে একজন সত্যিকার বিলিতি টাট্কা আস্ত সাহেব—হ্যাট্ কোট্ বুট্ পরা!

২য় ছো। যাই বলুন, বিশ্বাস তো হয় না মশাই।

শ্রী। বিশ্বাস না হয় নাই করলে; কিন্তু বাপু, বলা তো যায়না! যদি ঘ্যাচ্ করে ঐ সাহেবের কথাটা বেদবাক্যির মতো ফলে যায়, তাহলেই ত গেছি! তখন কি করবে ?

২য় ছো। কি আর করব ? এই গান-বাজনা করতে-করতেই না হয় মরা যাবে !

শ্রী। ঠিক বলেছ বাবা, আমার পেটের কথাটি টেনে বলেছ। তবে আমি কি বলি জান বাবা, সেই যদি মোলে একটা সৎ-কাজ কোরে মরনা। এই যে ভয়প্রপীড়িত মানব মণ্ডলী দিশেহারা হয়ে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে আছে, এরা আৎকে-আঁৎকে না মোরে যাতে দুদণ্ড একটু হাস্‌তে-হাস্‌তে মরতে পারে, তার একটা ব্যবস্থা করা কি আমাদের উচিত নয় ? সেইজন্যে বাবা, আমি আমার সামান্য সাধ্যমতো একটি আয়োজন করেছি। পরহিতের মতো পুণ্য নেই বাবা! তাই তোমাদের কাছে ভিক্ষে জানাচ্ছি, তোমরা যুবকমণ্ডলী এই পরহিতে আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাকে ধন্য কর।

১ম ছো। আমাদের কি করতে হবে বলুন ?

শ্রী। বেশী কিছু নয় বাবা, বেশী কিছু নয়। মহাপ্রলয়ের দিনটা আমার মুক্তিমণ্ডপে তোমরা একটু গান-বাজনা কোরো, যাতে সেই অমৃতরসে ডুবে মানুষগুলো উৎকট মৃত্যুভয় ভুলে থাকতে পারে।

২য় ছো। বাঃ, এ তো আপনি বেশ বুদ্ধি করেছেন।

শ্রী। এ কি আর আমার বুদ্ধি বাবা! এ আমাদের দেশের মহাপুরুষের কথা—"হেসে খেলে নাওরে যাদু মনের সুখে, যত পার শিঙে ফুঁকে।"

ছোকরার দল। আচ্ছা, আমরা রাজি আছি।

[ বলিয়াই রামশিঙের ভোঁভোঁর সঙ্গে ফ্লুট, হারমোনিয়ম, সেতার, করতাল, ঢোল ইত্যাদি যত বাজনা আছে সব বাজাইয়া দিল।]

শ্রী। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা দীর্ঘজীবী হও, আর পরকালে গন্ধর্ব্বলোকে স্থিতি কর।

১ম ছো। আপনার ঐ দীর্ঘ-জীবনের আশীর্ব্বাদ মহাপ্রলয়টা পর্য্যন্ত স্থগিত রাখলে হয় না ?

শ্রী। না বাবা, ঠাট্টা নয়। সত্যিই তোমরা আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করলে।

২য় ছো। এ আর আমরা বেশী কি করলুম ? লোকেদের আমোদ দেবার জন্যেই তো আমাদের এই পার্টি—আর এই বাদ্য যন্ত্রের ঘটা।

[ পূর্ব্বের মতো রামশিঙার সঙ্গে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া উঠিল। ]

শ্রী। বাঃ বেশ! বেশ! এখন দাও দিকিন বাবা, তোমাদের আখ্‌ড়ার ঠিকানাটা। সেখানে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে প্রোগ্রামটা ঠিক করে আসব।

১ম ছো। এই যে দেখছেন না, এই আমাদের আখ্‌ড়া।

[ শ্রীনিবাস ব্যতীত সকলের প্রস্থান। ]

[ একদল কেরানির প্রবেশ। ]

শ্রী। হ্যাঁ মশাই, আপনারা ত দিব্যি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন; একবার ভাবছেন কি ?

১ম কে। কি ভাব্‌ব মশাই ?

শ্রী। বলি, সেই কথাটা।

২য় কে। কোন্ কথাটা?

শ্রী। আঃ, সেই অলক্ষুণে কথাটা?

৩য় কে। খুলেই বলুন না মশাই, কোন্ কথাটা!

শ্রী। সেই যে কথা মনে আন্‌তে আত্মা-পুরুষ শুকিয়ে ওঠে, মুখে আন্‌তে জিভ কাঠ হয়ে আসে।

৪র্থ কে। সে আবার কি?

শ্রী। সে যে কি, তা কি আবার মনে করিয়ে দিতে হয়? যে কথা অষ্টপ্রহর জপমালা হয়েছে, যা নিয়ে রাস্তায় ঘাটে, ট্রেনে ষ্টীমারে অনবরত তোলাপাড়া চলেছে, যা নিয়ে বিশ্ব-ব্যাপী অন্দোলন, যা নিয়ে পণ্ডিতে-পণ্ডিতে তর্ক, মূর্খ-মূর্খে ঝগড়া, গুণ্ডায়-গুণ্ডায় মারামারি —রক্তপাত,বলি সেকথাটা কি ভুলে গেলেন?

১ম কে। এত ঘটা না কোরে সোজা ভাষায় সে কথাটা বলে ফেলুন দেখি।

শ্রী। আহা, মুখ দিয়ে বেরুচ্চে না যে, নইলে এত হাঁকুপাঁকু করি?

২য় কে। যান মশাই যান, আপনার সঙ্গে বক্‌তে পারি না। আমরা চল্লুম।

শ্রী। যাবেন না, হাতে ধরে বল্‌ছি, যাবেন না,—শুনে যান।

৩য় কে। বলুন শিগ্‌গির।

শ্রী। তবে শুনুন সেই নির্ঘাত বাণী—ম—হা—প্র—ল—য়!

১ম কে। (বন্ধুদের প্রতি) কি হে মহা-প্রলয়টা সত্যিই হবে না কি?

২য় কে। আর বাকি কি দাদা! এক ত ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, বেরিবেরি আছেন, তার উপর সর্ষের তেলে বিষ মিশেছেন; তারপর চাল-কাপড়ের দাম যা হয়ে উঠল, তাতে ত একরকম মরেই আছি; যে প্রাণটুকু ধুক্‌ধুক্ করছে, সেটুকু রাখলেই বা কি, আর টিপে বার করে দিলেই বা কি!

৩য় কে। কিন্তু ভাই, একেবারে টিপে বার করে দিলেই যেন ভালো হয় না। পোড়ে-পোড়ে পাওনাদারের যমযন্ত্রণা সহ্য করার চেয়ে তুড়ি-বাজিয়ে সরে পড়তে পারলেই ত বাঁচা যায়।

৪র্থ কে। আমিও ত তাই বলি—মহা-প্রলয়টা হলে আমরা মরি না ত, বেঁচে যাই!

১ম কে। আমি ত তাহলে আপাতত মেয়ের বাড়ি পোবড়ার তত্ত্বের দায় থেকে রক্ষে পাই। জামাই ত একশ্চন্দ্র নন,—একেবারে পঞ্চপাণ্ডব!

৩য় কে। আর আমার ভাই, পাওনা-দারের দল যেন শ্রীকৃষ্ণের অক্ষৌহিণী সেনা!

২য় কে। পাওনাদারদের এখন শিকেয় তুলে রাখ দাদা!—সে সব ঐ মহাপ্রলয়ের পর।

৩য় কে। তাহলে তোমার আশা আছে মহাপ্রলয়টা হবে।

২য় কে। হয়ত হোক না—মন্দ কি!

৩য় কে। কিন্তু ভাই, আমার একটা ক্ষোভ থেকে যাবে।

৪র্থ কে। তোমার আবার কিসের ক্ষোভ হে?

৩য় কে। এই দশটি বচ্ছর হাড়-ভাঙা খাটুনির পর, এই জানুয়ারীতে একটা প্রমোশন হবার সম্ভাবনা হয়েছে হে! সেটা দেখছি, ভোগে এল না।

১ম কে। (কপালে করাঘাত করিয়া) কপাল ভাই, কপাল!

২য় কে। বড় কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। আসছে মার্চ্চে আমার লাইফ-ইন্‌সুরেন্সের পলিসিটা যে মেচুয়োর হবে। এত দুঃখের টাকা বরবাদ যাবে হে!

৩য় কে। রোসো, তাহলে খতিয়ে দেখতে হচ্চে—গেলে লাভ, কি থাকলে লাভ। বড় ধাঁদায় ফেল্লে হে!

২য় কে। নাঃ, এ মরেও সুখ, বেঁচেও সোয়াস্তি নেই।

শ্রী। ঠিক বলেছেন মশাই—মরেও সুখ নেই, বেঁচেও সোয়াস্তি নেই। তাই ত আমি বলি, যে-ক'দিন থাকা গেছে ফুর্ত্তি কোরে নাও বাবা! জানেন ত মহাপুরুষের উক্তিই আছে :—

(সুরে) হেসে খেলে নাওরে যাদু,
যেতে হবে শিঙে ফুঁকে;
মিছে কেন মরছ খেটে,
বোঝার ভারে পড়ছ ঝুঁকে।

১ম কে। তা ঠিক বলেছেন মশাই!

শ্রী। তাই ত বলছি, অমন কোরে মুখ-শুকিয়ে বেড়াবেন না—বিশেষ এই মহা-প্রলয়ের সময়টা। এতদিন তো দুঃখু করলেন এইবার মরণ-কালে একটু আমোদ করুন।

২য় কে। এ জীবনে আমোদ কি আর আছে?

শ্রী। সেই জন্যেই ত আমি পথ-আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছি। এই মহাপ্রলয়ে কাউকে আমি নিরানন্দে থাকতে দেব না।

১ম কে। আপনি কি মনে করেন সত্যিই মহাপ্রলয় হবে?

শ্রী। বলা ত যায় না; হলে তখন করব কি? তাই আগে থাকতে সামলাচ্চি।

২য় কে। এর আর সামলাবেন কি? যেতে হয় তো সব এক-গাড়েই তো যোবো, তবে আর ভাবনা কিসের?

শ্রী। ভাবনা নেই বটে, কিন্তু ভয় তো ছাড়ে না। তাই এই ভয়কে দূর করা দরকার। বিশেষ যখন ভয় থেকেই ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় শুনেছি।

৩য় কে। কি করে ভয় তাড়াবেন?

শ্রী। সে আমি ঠিক করেছি।

২য় কে। কি করছেন মশাই?

শ্রী। ডাক্তার যেমন রোগীকে অস্ত্রের ভয় থেকে বাঁচাবার জন্তে ক্লোরাফর্ম্ম করে রাখে, আমি তেমনি ভয়পীড়িত মানবকুলকে মহাপ্রলয়ের সময়টা সঙ্গীত-রসে মুগ্ধ করে রাখব। তাদের জান্‌তেও দেব না যে কি হচ্ছে। তাই মহা কৌশলে আমি একটি ব্যূহ রচনা করেছি; তার নাম দিয়েছি মুক্তি-মণ্ডপ। এই তার টিকিট। প্রবেশিকা দুই টাকা মাত্র।

১ম কে। সেখানে হবে কি?

শ্রী। এই নাচ, গান, যাত্রা, থিয়েটার, হাসি, তামাসা। যাকে বলে দুশো মজা, হাজার রগড়। এমন ব্যবস্থা যে সময় কোথা দিয়ে কেটে যাবে, কেউ টেরও পাবেন না। মহাপ্রলয় হয় ত ওরই মধ্যে হয়ে যাবে।

১ম কে। রগড়টা দেখতে হচ্ছে, দিন একখানা টিকিট।

(শ্রীনিবাস টিকিট দিয়া টাকা লইল।)

২য় কে। কিন্তু আমার ট্যাঁক যে গড়ের মাঠ হে!

৩য় কে। আমারও তো তাই!

৪র্থ কে। আমারও তো তাই!

শ্রী। যান্ যান্, চট্ করে বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসুন। এমন মজার রসের থানা ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না। আর দেখুন, মা-লক্ষ্মীদের জন্যেও টিকিট নিতে ভুলবেন না। তাঁদের অর্দ্ধমূল্য।

১ম কে। কেন, অর্দ্ধাঙ্গিনী বোলে নাকি?

( কেরানি-দলের প্রস্থান। )

[ শ্রীনিবাসের চেলা মধুসূদনের প্রবেশ। ]

মধু। গুরুজি, আট আনার টিকিট সব ফুরিয়ে গেছে।

শ্রী। বেশ, এইবার এক টাকার চালাও, আমি দু টাকার গুলো চালাতে থাকি। কিন্তু বাবা, চটপট টিকিট বেচা সেরে নাও, নইলে কে কখন্ কোন দিক থেকে বাগ্ড়া দেবে!

মধু। সেজন্যে ভাববেন না। আপনি যে ফাঁদ পেতেছেন, এর আর ছাড়ন-ছিড়েন নেই। কিন্তু গুরুজি, কৈলেসবাবু ভারি টাকাটা পিট্‌ছেন। তাঁর নোয়াস্ আর্কে মাড়োয়ারীর দল বেজায় ঝুঁকে পড়েছে। দশ-টাকার টিকিট তারা একশ টাকায় কিন্‌ছে।

শ্রী। তাই নাকি!

[ দুজন লোকের হন্-হন্ করিয়া প্রবেশ। ]

শ্রী। শুনেছেন মশাই?

একজন লোক। শুনব আর কি? তোমার ত ঐ মুক্তিমণ্ডপের টিকিট? রাস্তা-ঘাট একেবারে ছেয়ে ফেলেছ বাবা!

[ প্রস্থান। পিছন-পিছন ধাওয়া ক'রিয়া শ্রীনিবাস ও মধুসূদনের প্রস্থান। ]

---

## তৃতীয় দৃশ্য

( গান )

এস সব মুক্তিমণ্ডপে,<br>
(নইলে) মরবে পুড়ে প্রলয়খাণ্ডবে।<br>
ঐ দেখনা আসছে তেড়ে,<br>
ঘন-ঘন মাথা নেড়ে,<br>
উঁচিয়ে শিং, বাঁকিয়ে গলা<br>
প্রলয় ষণ্ড যে!<br>
দেরী না, আর দেরী না,<br>
কোরোনা তুম্-তেরি না,<br>
(চটপট্) টিকিট কিনে ঢুকে পড়'<br>
মুক্তিমণ্ডপে!

[ মাতালদের প্রবেশ। ]

১। কি বাবা মহাপ্রলয়! শিং নিয়ে তেড়ে আসছ? গুঁতোবে? আমরাও গুঁতোব!

২। আরে না, না, গুঁতোবে না, পেরলয় কম্প আস্‌ছে; পৃথিবী টলিয়ে দেবে।

৩। মা-পৃথিবী তো দিনরাতই টলছেন, কখনো তো তাঁকে স্থির থাক্‌তে দেখলুম না।

৪। আর যদি বেশী টলেন, আমরা আরো বেশী-করে ডোস্ চাপিয়ে মায়ের টলুনির সঙ্গে আমাদের তাল ঠিক করে নেব।

১। ঠিক বলেছিস ভাই—<br>
এস মা টলন সমরে!<br>
দেখি মা টলে, কি পুত্র টলে!

---

## চতুর্থ দৃশ্য

[ শ্রীনিবাসের মুক্তিমণ্ডপ। অন্ধকার ষ্টেজের উপর একদল লোক। ]

শ্রী। ( নেপথ্যে ঘণ্টা বাজাইয়া ) এস এস চট্‌পট! আর সময় নেই, এখনি পেল্লয়

কাণ্ড হবে। বাঁচতে চাও তো এই সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকে পড়। ওদিকে নয় মশাই, ওটা মেয়েদের জন্যে খিড়কি। ( চেলার প্রতি ) দেখিসরে মধু, বিনা টিকিটে কেউ না ঢোকে !

[ দলে-দলে লোকের প্রবেশ। অন্ধকারে বলা-বলি চলিতে লাগিল। ]

১। ওরে বাবা, আরো যে লোক ঢোকে !

২। এ যে ক্রমেই 'ব্ল্যাকহোল্' হয়ে উঠল !

৩। এর চেয়ে যে বাইরে মরা ছিল ভালো। এ'যে শোষ-টান নেবারও উপায় রইল না।

৪। চোখে যে কিছু দেখতে পাইনে গো !

৫। ব্যাটা বল্লে, থিয়েটার দেখাবে, হোটেলে খাওয়াবে, তার তো কোনো জোগাড় দেখছিনে—কেবল লোকই ঢোকাচ্চে।

৬। ওগো মশাই, আর চুরুটের ধোঁয়া ছাড়বেন না।

৭। অগ্নিকাণ্ড করবেন না কি !

৮। উঃ ! ঠেলেন কেন মশাই ?

৯। আরে, আমি কেন ঠেলব ? আমাকেই তো ঠেলছে সবাই।

একদল ছোকরা। ওহে চালাটা যেন দুলচে বোধ হয়। ভেঙে পড়বে নাকি !

১। ভেঙে পড়লেই বাঁচি—একটু হাওয়া পাই।

২। কিন্তু বাইরেটা যে প্রলয় হাঁ-কোরে আমাদের গেলবার জন্য বসে আছে—তার কি করছ ?

৩। গিলুক গে বাবা ! এই মুক্তি-মণ্ডপে বন্ধ হয়ে আর মরতে পারিনে !

অনেকে মিলিয়া। ভেঙে ফেল দরজা।

( দুম-দাম্ দরজায় ঘা। )

৪। ব্যাটা বড় ঠকানটা ঠকিয়েছে।

৫। কোথায় গো সন্ন্যাসীঠাকুর, তোমার যাত্রার দল কোথায় ?

শ্রী। ( নেপথ্যে ) যাত্রা এখনি হবে—তোমরা একটু স্থির হও।

বুড়োবুড়ি। আর বাবা, গঙ্গাযাত্রা কোরে দাও, একটু জল-বাতাস পেয়ে বাঁচি।

( সবাই একটু চুপ করিল। )

১। কৈ, আর কেউ সাড়া দেয় না যে !

২। সরে পড়ল না কি ?

৩। কিছু আশ্চর্য্য নয়। সরে পড়বারই দিন পড়ছে। এখন আমরাও আস্তে-আস্তে সরতে পারলে বাঁচি।

[ নেপথ্যে গান ]

আসতেছিল দেখলুম বটে মস্ত-একটা হাঁ,
আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেল, দেখা গেল না।

সকলে। ওহে, ঐ যাত্রা সুরু হয়েছে। চল, চল !

[ মারামারি ঠেলাঠেলি করিয়া প্রস্থান। ]

[ ষ্টেজ আলোকিত। ]

[ শ্রীনিবাস ও তার চেলার প্রবেশ। ]

শ্রী। যাক্, দরজাটা ভেঙে ফেল্লে !

ম। মাথা ভাঙেনি এই ঢের ! এখন চলুন চট্‌পট্ সরে পড়া যাক।

শ্রী। কিন্তু যাত্রাওয়ালারা যখন আসবে ?

ম। আসুক না ! এসে দেখবে যাত্রী একটিও নেই, তারা আপনিই সরবে।

শ্রী। তবে পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে, মণ্ডপ-খালি কোরে আমরাও সরি। ঐ সন্ন্যাসীর

সাজগোজগুলো বেঁধে নে। চল, কৈলেসের নোয়ার জাহাজে চড়ে সরে পড়া যাক্।

[ সং আর কীর্ত্তনের দল লইয়া
কৈলেসের প্রবেশ। ]

গান

আসতেছিল দেখলুম বটে মস্ত-একটা হাঁ,
আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেল, দেখা গেল না!
হাঁক-ডাক তার বিকট তান
( শুধু ) চা-পেয়ালায় তুল্লে তুফান,
মুখোস পরে ভয় দেখালে, দাঁত বসাল না।

শ্রী। কিহে কৈলেস, তোমার কতদূর?

কৈ। বেশীদূর নয় ভাই, ওই পোণ্টুনের কাছেই ভরা ডুবি হয়েছে।

শ্রী। পারের কড়ি কিছু মিল্ল কি?

কৈ। সে কথায় আর কাজ কি দাদা!

শ্রী। শিঙে ফুঁকতে-ফুঁকতে তবে চলেছ কোথায়?

কৈ। এই তোমারি কাছে।

শ্রী। আমার কাছে? আমি চলেছি যে তোমারি কাছে। তোমার নোয়ার জাহাজে করে বিপদসাগরের পারে যদি আমাকে নিয়ে যাও তো এবারের মত বেঁচে যাই দাদা!

কৈ। আর তুমি যদি ভাই খানিকটে সময়ের জন্যে তোমার ঐ মুক্তিমণ্ডপের একটা অন্ধকার কোণে আমায় স্থান দাও তো হাঁপ-ছেড়ে বাঁচি। পিছনে লোক প্রলয় বেগে হাঁ হাঁ কোরে তেড়ে আসছে।

[ নেপথ্যে—ধর ব্যাটাদের! মার ব্যাটাদের! ]

কৈ। ঐ শোনো।

মধু। ওরে তোরা গান ধর না—প্রলয়ের সময়টা সঙ্গীত-রসে ডুবে থাকি!

কৈ। ওরে লাগা ঢোলে চাঁটি!

[ মার মার শব্দ। ]

শ্রী। নাঃ, এবার সত্যিই প্রলয়কাণ্ড হল দেখছি!

মধু। গুরুজি, পৃথিবীর সমস্ত প্রলয়টা তোমাদের দুই বন্ধুর আকর্ষণে এইখানে এসে জড়ো হলো শেষটা।

[ লোকোদের মার মার শব্দে প্রবেশ। ]

কৈ। কিছু ভয় নেই। বাবা, বিপদ-তারণ—মধুসূদন এগিয়ে এস ত।

মধু। কি বলছেন?

কৈ। এঁদের একটু স্থির হতে বল। প্রলয়ের আর দেরী নেই। একবার প্রাণ-ভরে শিঙে ফুঁকে যাই। আর সবাই ঐক্যতানে আমার সঙ্গে যোগ দাও।

( সকলের কীর্ত্তন )

হলনা, হলনা, এবারে হলনা, দেখা হলনারে!
সে যে সরে গেল, কাছে নাহি এল,
ফাঁকি দিয়ে গেল, ও সে বারে-বারে!
তারি আসার কথা শুনে,
রইলেম বসে পহর গুণে,
এলনা, সে তো এলনা, হলনা, দেখা হলনা:
হলনা—হলনা—হলনারে!

শ্রী। তোরা যে যার ঘরে ফিরে যারে!
( আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিস্‌নারে! )

৩

পরদিন প্রাতঃকালে বেণীমাধব প্রসন্নকে কহিলেন, "মা, দেবীর পূজার জন্য কিছু আয়োজন করে নিয়ে যেয়ো।" প্রসন্ন কহিলেন, "বোশেকি গাছে আম পেকেছে তাই পাড়িয়ে নি, আর কলা নিব আর আলো চাল নিব।" বেণীমাধব ছাত্রদিগকে ডাকিলেন। "আজ্ঞা যাই" বলিয়া তিন জনেই একবাক্যে সাড়া দিল এবং পরক্ষণেই বেণীমাধবের অন্তঃপুরে তিন মূর্ত্তিই দেখা দিল। বেণীমাধব বলিলেন, "ওগো, মা যা-যা বলেন তাই কর।" যাদব কহিল, "ঠাকুরমা আমাদের কি কর্ত্তে হবে ?"

প্র। বেণী, কোথা গোল্লা রেখেছ, দাও।

বেণীমাধব পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ওগো, কাল যে বৈদ্যপুর হতে সন্দেশ এনেচি, দাও"—বলিয়া গাড়ু হাতে করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

যাদব করযোড়ে চীৎকার-স্বরে বৃদ্ধাকে কহিল, "হুজুর, এ দাসের প্রতি কি আজ্ঞা হয় ?"

প্র। বৌমা! আলোচাল আর সেই গোল্লা দাও।

কে। (সহাস্যে যুক্তকরে) ধর্ম্মাবতার, এ গরিব ব্রাহ্মণদের স্মরণ করলেন কেন ?

প্র। যাদ্‌বা, ঐ আমটা আমায় পেড়ে দে'না।

যা। (মুখভঙ্গী করিয়া) যাদব বলতে তোমার কি হয় ?

প্র। আমি অত কথা কইতে নারি। তু পেড়ে দিস্ ত দে।

যা। আমি তোমার আম পাড়তে নারি! একটি খেতে দাও ত বল।

প্র। তু বেরো, দূর হ, ডেগোর কতিকার।

যাদব অবজ্ঞাভরে "যে আজ্ঞে, তাই হবে" বলিয়া আপনার কর্ণ টানিয়া ধরিল।

বৃদ্ধা বধির; কাহারও ধীরে-কথা শুনিবার ইচ্ছা হইলে, প্রসন্ন ঠাকুরাণী আপনার কর্ণ টানিয়া বক্তার মুখের নিকট রাখিয়া ধীরে ধীরে শুনিতেন। সেইজন্য যাদব কান টানিলেই প্রসন্ন ঠাকুরাণী চটিয়া লাল হইতেন। প্রসন্ন সক্রোধে কহিলেন, "পাজি ছোঁড়া, হতভাগা ছোঁড়া, তু আমার ছুমু হেতে দূর হ'গা। তু আমার ছুমু হেতে বেরোগা। তু কি কর্ত্তে আমাকে জ্বলন কর্ত্তে এলি ?"

কেশব সহাস্যে কহিল, "হয়েছে! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। ঠাকুরমা, বাড়িতেই যে সঙ্কল্প হল, পথে বেরিয়ে লাঠালাঠি হ'বে দেখচি।"

প্রসন্ন। কেশব, তুমি আমটি পেড়ে দাও ত ভাই।

কেশব কটিতে কাপড় বাঁধিয়া এক লম্ফে গাছে উঠিল। এমন সময় প্রসন্নর সঙ্গিনীগণ ও কমলের সমবয়স্কা নিস্তারিণী প্রভৃতি রমণীগণ সুসজ্জিতা হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

আম্রতলে একটা শেওড়ার চারা হইয়াছিল। যাদব তাহার নিকটে গিয়া কহিল, "ঠাকুর মা, এটা শেওড়া গাছের চারা নয় ?"

বৃদ্ধা পূর্ব্ব হইতেই রাগিয়াছিলেন, যাদবের কথা বৃদ্ধার কর্ণে অসহনীয় হইয়া উঠিল। প্রসন্ন কহিলেন, "নারে, ওটা নিচুর চারা।"

যাদব। নিচু কেন, ও শেওড়া গাছের চারা।

প্র। না, ওটা নিচু গাছ।

যা। হ্যাঁ, নিচু! নিচুর কাছে ছিল ছ'মাস!

প্র। তা না থাকুক তু আপনার যা ক্যান্না।

যা। তা না হয় গেলাম। কিন্তু এই যে শেওড়া পাতার মত পাতা!

প্র। তোকে বলতে হবে না। তু আপনার যা, ও নিচুর পাতা।

যা। (একটা পত্র ছিন্ন করিয়া) এযে শেওড়া পাতার মত গন্ধ।

প্র। তা হোগ্, আমার ওতেই নিচু হবে, তু ছিরিস না।

যা। তোমার জোরে শেওড়া গাছে নিচু হবে না কি?

প্র। হাঁ হ'বে। আমার কোমল ওতে রোজ রোজ জল দেয়। ও শেওড়া গাছ হলেও ওতে নিচু হবে। হবে না! অমনি বাবার ঘরের কথা কি না!

প্রসন্নর বাক্যে প্রতিধ্বনি করিয়া বৃক্ষ হইতে কেশব কহিল, "হবে না, অমনি বাবার ঘরের কথা! নিচু ত নিচু, ওতে বাদাম পেস্তা আঙ্গুর আখ্‌রোট অবধি হ'তে হবে। হবেনা অমনি থাম্‌কা? ও কোমল ওতে জল দেয়। ও যদি শেওড়া হয় তবে আর সূর্য্য-চন্দ্র উদয় হবে না, ঠাকুরমা উদয় হতে দেবেন না।

কেশবের কথা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিল। কেশব আম পাড়িয়া নামিয়া আসিল, বৃদ্ধা তখন সহর্ষে আম, আতপ তণ্ডুল প্রভৃতি গুছাইয়া বাঁধিতে বসিলেন। যাদব কহিল, "ঠাকুরমা! আমাকে একটি আম দাওনা?" বৃদ্ধা কহিলেন, "দুর হ ডেক্‌রা, উও বলতে নাই; বাপরে!"

যা। তবে একটি গোল্লা দাও।

প্র। আঃ দুর হোগ্‌গো ছাই, উও ঠাকুরের আগ আমি কেকুই দিব না।

যা। তবে ঐ পাকা আমটিই দাও না।

প্র। হ্যাদে! তু আমার ছুমু হেতে বেরোগা। উও আমি গুরু এলে দিবনা তার তোকে দিব কি?

যা। না, দেবে না?

প্র। দেবে বইকি রে নচ্ছার!

এমন সময় বেণীমাধব বাটী প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "মা, এখনও তোমরা যাও নি? বেলা যে অনেক হল। বড় রৌদ্র হবে যে।" তখন প্রসন্ন ঠাকুরাণী তাগাদা করিয়া মোট বাঁধা সমাপন করিয়া কহিলেন, "কই, কোমল কোথা? আয় গো।"

কমল আসিল না। প্রসন্ন বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কি জ্বালা! ক'দিন তোর কি হ'য়েছে, জানি না। কোণে হোতে বেরুতে চায় না। কোমল, আয় গো!" তথাপি কমল আসিল না। প্রসন্ন আবার ডাকিলেন, "ও কোমল, আয়।" বেণীমাধব কেশবকে বলিলেন, "যাও গো তোমরা কে যাবে, কাপড় পরে এসগে।"

কেশব ও যাদব বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া আসিল। যাদব কহিল, "কমল কি যাবে নাকি?" প্রসন্ন ঠাকুরাণী কহিলেন, "ওমা,

সে কি কথা! সোনা বাইরে আঁচলে গিরে! ও যদি না যাবে ত আমি যেচ্ছি কার জন্মে!" কেশব মৃদুস্বরে কহিল, "কেন, আমার জন্মে।" একজন প্রতিবাসিনী কহিলেন, "তোমার নেগে ক্যানে?"

কেশব। আমার বিয়ে হবে বলে।

প্রসন্ন ঠাকুরাণী ভাণ্ডার ঘর হইতে কমলকে টানিয়া বাহির করিলেন। কমল রোদন করিতে লাগিল। প্রসন্ন সজল নয়নে কহিলেন, "তু আরি কাঁদিস না,-বাবাকে মানত্ কর্ তিনি মুখ তুলে তাকালে কোন দুঃখু থাকবে না।" কমল কহিল, "আমি যাব না।"

প্র। যাবিনি ক্যানে?

কমল। ওরা গেলে আমি যাব না।

প্র। কারা গেলে তুই যাবিনে?

কমল। ঐ বেটা-ছেলেরা গেলে পরে আমি যাব না।

প্র। ও বেণী! ও তোর বিটি কি বল্‌চে, শোন্।

বেণী। কি বল্‌চে?

প্র। ও বল্‌চে, বেটাছেলেরা গেলে ও যাবে না।

বেণীমাধব ধমক দিয়া কহিলেন, "বেটাছেলেরা গেল, তা তোর কি? এতগুলো স্ত্রীলোক যাবে তাদের সঙ্গে তুই যাবি, তা'তে তোর কি আপত্য শুনি?" কমল আর কথা কহিল না, ধীরে ধীরে উঠানে নামিল। কেশব ও যাদব বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া আসিয়াছিল, বেণীমাধব বলিলেন, "মা বেশ করে দেবীর নিকট মানত ক'রে এস, যেন শীঘ্রই আমার কৃষ্ণধনের সংবাদ পাই।"

তখন দুর্গা দুর্গা বলিয়া সকলে অজ্ঞাত পথে অজানিত গ্রামে যাত্রা করিলেন। যাত্রীগণ গ্রাম পার হইয়া মাঠে পড়িলেন।

যাইতে যাইতে যাদব কহিল, "এই খানেই ত বেলা হ'ল, তবে ঠিকানায় যাব কখন্?" কেশব কহিল, "যখন তোমার শমন আসবে।"

প্র। দূর হঃ! উও বলতে নাই। বালাই ষেঠের বাছা।

মতির মা'ই সেথো; তাঁহার সাহসে নির্ভর করিয়াই সকলে চলিয়াছেন। মতির মা কহিলেন, "যদি বাবার থানে আজ না যেতে পারি, তা হ'লেও আজ আমার মামাত দেওরের বাড়ী থাকবো। চল ক্যান্না, তোমাদের ভাবনা কি?"

প্র। বাবার নাম ক'রে যখন যাচ্চি তখন আর ভয় কি?

মতির মা। হ্যাদেখ বাবার এমনি মহিমে, বলে কোন্ গাঁয়ের কে নাকি বাবার নাম কোরে পূজার সামিগ্রী একটা পাঁঠার গলায় বেঁধে বাবার থানে পাঠিয়ে দিলেন তা বলে তখন খড়ি নদী ভোরে চার পা হ'য়ে ভেসেছিল, তা বলে সেই পাঁটা খড়ি পার হ'য়ে গড় গড় করে চলে গেলেন।

প্র। ব্যাপার শুনে গাটা শিউরুচ্চে। তা বই কি হলো?

মতির মা। তাবই নাকি আপনার পথে সেই পাঁটাকে একটা লোকে আপনার আগুলে ছিল তাবই আপনার পাঁটা যেমন ভ্যা ক'রে তেনাকে স্মরণ করেচে, আর অমনি ভুলুকে ভুলুকে মুখে রক্ত উঠে মিন্‌সে পড়ল আর মল। বাবা বড় জাগ্রত।

কেশব কহিল, "তার বোধ হয় রক্ত-পিত্ত ছিল ?"

যাদব। ঠিক কথা! তার রক্ত ওঠা ছিল।

প্র। ছিল বই কি রে ডিগোর। তু আপনার যাচ্ছিস্ মা।

মতির মা। ঠাকুর-দেবতাকে উপহাস্তি কত্তে নাই।

প্রসন্ন-ঠাকুরাণী ভক্তি-গদ্‌গদ কণ্ঠে যোড় হস্তে কহিলেন, "হে বাবা বাগ্দেবী! তুমি আমার কোমলের ভাল কর। তোমাকে পুরসের চাল দিব পুর ছড়া রম্ভা দিব, পাঁচসিকার গোল্লা দিব। তুমি আমার কেষ্টধনের খোঁজ ক'রে দাও। তবেই দুজনাকে নিয়ে গেয়ে তোমার ছাঁইচে বসিয়ে কৃষ্টধনের উরুণী পেতে দু'জনাতে ফলার ক'রে আসবে।"

এইবার যাদব উচ্চহাস্ত করিয়া প্রসন্নকে কহিল, "ঠাকুর মা, এইরকম মানত কর্লে ঠাকুর বড়ই উপকৃত হ'বেন।" কেশবও হাসিতে লাগিল। প্রসন্নর এইরূপ এক-একটা কথায় যাদব ও কেশবের পরিহাসে কমল বড়ই লজ্জিতা ও ক্ষুব্ধা হইতে লাগিল। তাই কমল বলিয়াছিল, "বেটাছেলেরা গেলে আমি যাব না।"

এই রকমে প্রায় ক্রোশ দুই-আড়াই চলিয়া একটা বৃক্ষতলে যাদব বসিল। কেশব কহিল, "কেন রে! বস্‌লি যে!"

যা। আর ত চলতে পারি না দাদা।

কে। কেন, তোর আবার কি হ'ল ?

যা। বড্ড মাথা ঘুরচে, চোখে অন্ধকার দেখচি।

কে। কি বলিস্‌রে, খিদে পেয়েছে নাকি ?

"জানি না" বলিয়া যাদবেন্দ্র দেব শর্ম্মা নিশ্চিন্ত মনে বৃক্ষ-তলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন করিল। কেশব কহিল, "ও ঠাকুর-মা, তোমার যাদব যে এড়িয়েচে।"

প্র। বালাই, ষেঠের বাছা উও বলতে নাই।

কে। আর বলতে নাই! ওর প্রাণ এদিকে পালায়।

প্র। সে কিরে? তাইত, শুলো কেন ? ও যাদব, বড্ড রোদ লেগেচে কি ?

কে। তা জানিনা ? দেখ, কি হ'ল।

মতির মা। তা হবে না ? কেবল ঠাকুর দিকেন উপহাস্তি ক'চ্চে।

প্র। ও খাওডুলে ছেলে, এতখানি বেলা হ'ল, কিছু খাবে কি ?

মতির মা। খাবে বই কি! ও খিদে সইতে নারে।

যাদব ক্রমে গোঁ গোঁ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। যাদবের অবস্থা দেখিয়া সকলে ভীত হইলেন। কেশব বিরক্ত হইয়া কহিল, "আঃ, কি বিপদেই পড়েচি। একে বৈশাখ মাস, তায় দুপুর বেলা, মাঝ মাঠে একটা ব্রহ্ম-হত্যা হবে না কি!" তখন প্রসন্ন ও মতির মার চৈতন্য হইল যে এটা বৈশাখ মাস এবং যাদব ব্রাহ্মণ। প্রসন্ন সভয়ে কহিলেন, "হেই মা! কি হবে কেশব ? তবে এখন রুপায় ?" কেশব কহিল, "এক কাজ কর। ঐ পুষ্করিণী হতে এক ঘটী জল আন।"

প্রসন্ন ও মতির মা জল আনিতে গেলেন।

কেশব অন্য যাত্রীগণকে বলিলেন, "আপনারা ঐ গাছ তলায় যান্। অত রোদে দাঁড়িয়ে কেন?" যাত্রীগণ বৃক্ষতলে বসিলে পর কেশব বলিল, "যাদব, এখানে আর কেউ নাই। সত্য করে বল্ দেখি ভাই, তোর এ কোন্ অসুখ!" যাদব একবার চারিদিকে চাহিয়া হাসিল, পরে বলিল "দাদা, আমি ঐ বুড়ির সন্দেশগুলি সব পার না করে কিছুতেই উঠব না।" কেশব সহাস্যে কহিল, "দুর মুখু, ও যে ঠাকুরের। অগ্রভাগ তুই খাবি কেমন ক'রে?"

যা। আরাম ক'রে।

কে। তারপর পূজা দি কি দিয়ে?

যা। বুড়ির মাথা দিয়ে। যেমন বলেচে বুড়ি, 'বাপরে আমি ও কেকুই দিব না। এ গুরু এলে দিব না।' তেমুনি আমি ওর সবগুলি পার করবো, তবে ছাড়ব।

কে। আহা! বুড়ি মাথা খুঁড়ে মরবে যে।

যা। তুমিও যেমন দাদা! কোথায় যাব যে বাগ্দেবীর পূজা দেবে?

কে। সে কিরে! যাবি না কি?

যা। সে কি এখানে! নবদ্বীপে গঙ্গা পার হ'য়ে সাড়ে চার ক্রোশ মাঠ পার হ'লে তবে বাগ্দেবী। নদেই ত এখান থেকে আট ক্রোশ; এসেছি প্রায় দুই ক্রোশ, এই সাড়ে চোদ্দ ক্রোশ পথ যাওয়া-আসা সাধারণ কথা?

কে। তবে তখন এলি কেন? আর ওরাই বা বার হ'ল কোন সাহসে? আর তুই আমাকেও ত কিছুই বলিস্ নি।

যা। তা বলি নি, বললে কি আমার কথায় বিশ্বাস করতে?

কে। ছি ছি বড়ই অন্যায় করেছিস্! দেখ্ দেখি এই দুই ক্রোশ এসে কমল আর নিস্তারিণীর মুখ শুকিয়েছে, এখন ওদের কি বলে ফেরাব?

কেশব ও যাদব উভয়ে ক্ষণকাল কি পরামর্শ করিল, পরে কেশব বলিল, "ওরে, ঐ সব আস্‌চে। চুপ কর্।"

যা। দাদা, তবে তুমি সেই কথাটা বলো যেন।

কে। বলব রে। তুই চুপ করে শো'না।

যা। ঐ আসচে, এই বোল বল, ভয় দেখাও, ভয় দেখাও।

কে। আরে চুপ কর্‌না।

জল লইয়া প্রসন্ন ও মতির মা আসিলে কেশব বলিল, "কই, জল দাও।"

"চৈতিন্যি হয়েছে? এই নাও, জল নাও। ছেলের মুখে দাও।"

কে। আর ছেলে! এতক্ষণ ছেলে কত কি বকছিল।

প্র। কি বলছিল?

কে। বলছিল, আর কারো যেতে হবে না। এইখানে আমার পূজা দে। আর বাড়ী গিয়ে একশ' আট শ' তুলসী মধুসূদনকে দিয়ে স্বস্ত্যয়ন কর্ত্তে বল্‌গে। আর দশ হাজার দুর্গা-নাম জপ ক'র্ত্তে হবে।

কেশবের বাক্য শ্রবণে প্রসন্নঠাকুরাণী গললগ্নী-কৃতবাসা হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "হে বাবা! দোহাই বাবা বাগ্দেবী!"

কেশব হাসিয়া বলিল, "ঠাকুর মা! বাবা বাগ্দেবী নয় মা; বাগ্দেবী যে সরস্বতীর অপর নাম।

প্র। কেশব! যাদবের মুখে জল দাও।

কে উনি কি আর যাদব আছেন!

প্র। কেশব! তুমি একটু জল দাও ওঁর মুখে।

কে। জল গিল্‌তে পার্‌বে কি, তা দেব!

প্র। তবে কি হবে?

কে। একটা আম দাও দেখি।

প্র। তাই ত! ঠাকুরদের যে কি করে দেবে?

কে। দাশরথি রায়ের পাঁচালি শোন নি? হরি বলেছেন নিজ মুখে, ভোজন আমার দ্বিজ-মুখে।

তখন প্রসন্ন-ঠাকুরাণী পুঁটলি খুলিয়া একটী আম বাহির করিয়া দিলেন, আমটী যাদবের নাসিকাগ্রে ধরিবামাত্র ঘ্রাণে বুঝিতে পারিয়া যাদব দন্তাঘাতে সদ্য-আহরিত আম্রের অর্দ্ধভাগ কাটিয়া লইয়া স্বচ্ছন্দে তাহা চর্ব্বণ করিতে লাগিল। ইহাতে বৃদ্ধা বুঝিলেন, সত্যই যাদবের স্কন্ধে মা বাগ্দেবীর ভর হইয়াছে! তা নহিলে যে ব্যক্তি জল গিলিতে পারে নাই, সে অপক্ক আম্র চর্ব্বণ করিতেছে, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহিলে কি হয়? যাহা হউক, সমস্ত আম্র এবং বৈদ্যপুরের সন্দেশ-গুলি যাদবের জঠরাগ্নিতে আহুতি দিবামাত্র তাহার ক্ষুধানল প্রায় নির্ব্বাপিত হইল। তখন শ্রীযাদবেন্দ্র দেবশর্ম্মা গাত্রোত্থান করিয়া সদলে বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আর কমলের মুখ শুকাইয়াছে, কাজেই প্রসন্নঠাকু-রাণীকেও ফিরিতে হইল।

৪

সকলে বাটী ফিরিয়া আসিলে বেণী-মাধব কেশবকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে পথে বড় রৌদ্র, সেই কারণে ফিরিতে হইল।

কেশব অধোবদনে আরও কহিল, "আমি আপনার জামাতার সন্ধান করিয়া দিব।" সবিস্ময়ে বেণীমাধব বলিলেন, "অ্যাঁ, তুমি! কি করে তাঁহার অনুসন্ধান করবে?" কেশব মৃদুস্বরে কহিল, "অনুসন্ধান করব।" বলিয়া কেশব তথা হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে প্রসন্ন তারাসুন্দরীকে কহিলেন, "সকাল করে পাট ঝাঁট ক'রে নাও বউমা! তুমি চান্ ক'রে পূজার জো ক'রে দাও। আমি পুরুতকে বলে, মতির মা আর তেনার পিশিকে রাঁধবার জন্যে নাইতে যেতে বলি। তারপর বারোটি বামুন নেমন্তন্ন করে এসে তরকারী কুটে দিবো।"

কমল কহিল, "তোমাকে আর নিমন্ত্রণ কর্ত্তে যেতে হবে না। সে এখনি বাবা যাবেন।"

প্র। ক্যানেলা! গোলমই বা।

ক। না। তুমি কি বলতে কি বলবে।

প্র। কি আবার বলবো? ভালই বলবো।

কমল বিরক্ত হইয়া বলিল, "তবে যাও, মরগে।"

এমন সময় বেণীমাধব আসিয়া বলিলেন, "মা, ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ ক'রে আসবো কি?"

প্রসন্নঠাকুরাণী সহর্ষে কহিলেন, "সে আমি যেচ্ছি। তু আপনার পূজোয় যা।" বলিয়া

প্রসন্নঠাকুরাণী প্রত্যেক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গিয়া কহিলেন, "হ্যা দেখ আমার কিছুই নেই, শাক শুক্ত দিয়ে আজ যেন ঐখানেই হয়। বারোটি বামুন ভোজন করাব আমার ইচ্ছে আছে,—এ আর হয়ে ওঠেনা, তাই বলি, আজকে" ইত্যাদি কত কি বকিয়া প্রতি বাড়ীতে আধঘন্টা করিয়া দাঁড়াইয়া প্রসন্নঠাকুরাণী সকাল সকাল তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিলেন।

এদিকে পুরোহিত-মহাশয় বিষ্ণু-পূজায় বসিয়াছেন। বেণীমাধব ছাত্রদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওগো, তোমরা আজ একটু সকাল সকাল স্নান করে এসে পুরোহিত মহাশয়ের নিকট বসে দুর্গা নাম জপ কর।" পরে কেশবকে বলিলেন, "কিহে বাবা, আজ বাড়ীতে একটা কাজ, আজও কি তোমার তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত অস্নাত থাকতে হয়? হাঁ, আর তুমি যে বলেছিলে আজ আমার জামাতার খোঁজ করবে, তা কখন?"

কেশব মৃদুস্বরে বলিল, "এইবার যাই।"

পাকশালায় দুইজন গৃহিণী রাঁধিতেছেন, আর যৌবনকালে কে কত কর্ম্মিষ্ঠা ছিলেন তাহারই পরিচয় দিতেছেন। তারাসুন্দরী তাহাদের যোগাড় করিয়া দিতেছেন ও তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিতেছেন। কমল নিজ শয়ন-কক্ষে বসিয়া তাম্বুল রচনা করিতেছে। দ্বারে ঘরের মধ্যে স্বস্ত্যয়ন হইতেছে; দাওয়ায় বসিয়া বেণীমাধব তৈল মর্দ্দন করিতেছেন, এমনসময় মধুসূদন ও যাদব স্নান করিয়া আসিল। বেণীমাধব কহিলেন, "হ্যাঁগো, কেশব এল না?"

যা। আজ্ঞে, তিনি তেল মেখে বরাবর নাপিত-বাড়ী গেলেন।

বেণী। দুর্গা, দুর্গা। নাপিতের সৌভাগ্য এবং আমারও। হরি করুন, ওর মতি-গতি ফিরে যাক্, যেন দাড়িগুলো ফেলে আর চুল-গুলো কেটে একটা শিখা রাখে।" এই বলিয়া শামুক ঝাড়িয়া এক টিপ্ নস্য লইয়া উঠিলেন।

ভট্টাচার্য্য স্নানে যাইবার পরক্ষণেই আর্দ্র বসনে কেশব বাটী প্রবেশ করিয়া দেখিল, বাহিরে কেহ নাই, সকলেই কক্ষমধ্যে নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত। কেশব পূর্ব্বদ্বারী ঘরের দ্বারে উঠিয়া দেখিল, কমল একাকিনী গৃহ-মধ্যে বসিয়া তাম্বুল রচনা করিতেছে। কেশব ধীরে ধীরে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কড়ির আল্না হইতে কমলের একখানা বস্ত্র লইয়া সিক্ত বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। সচকিতে কমল দেখিল, কেশবের মুখে আবার সেই হাসি! আবার সেই বিস্ফারিত উজ্জ্বল চোখে কমলকে ভয় দেখাইল, আবার সেই ভ্রূকুটি! ছি ছি, কি বিশ্রী হাসি! অমন হাসি কমল কখনও দেখে নাই। মানুষের হাসি দেখিলে ভয় হয়, কমল তাহা জানিত না! ঐ কেশব কতবার হাসিয়াছে, অন্তরাল হইতে কমল কতবার তাহা দেখিয়াছে, কিন্তু কই কখনো ত কমলের ভয় হইত না। আজ কেশব যাহা করিতেছে, তাহাই কমলের পক্ষে ভীতি-জনক। কমল ত্রস্তপদে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, কেশব বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া স্বীয় আর্দ্রবস্ত্র কমলের মস্তকের উপর রাখিয়া বলিল, "শুকুতে দিও।" কি স্পর্দ্ধা!

কেশবের এত বাড়াবাড়ি আর ত কমল সহ্য করিতে পারে না। তাহার ইচ্ছা হইল, সমস্ত কথা পিতার নিকট বলিয়া দেয়। কিন্তু

না, এখন নয়। আগে নির্ব্বিঘ্নে ব্রাহ্মণ-ভোজন চুকিয়া যাক্—তখন সব কথা বলিয়া দিতে হইবে। কেশবেরও গেলা—দূর হোক্—ওর গেলা না হইল ত কমলের কি! এ সব কথা শুনিলেই বাবা উহাকে তাড়াইয়া দিবেন। তাহা হইলে আর কখনও দেখিতে পাইব না। আর দেখায় কাজ নাই। ও মুখ যেন আর না দেখিতে হয়! মরুক্, আমার দুঃখ ত চিরদিনই আছে, আমার দুঃখের সীমা নাই—তাই বলিয়া কি একটা কলঙ্ক মাথায় লইব! আমি বিধবা না সধবা তার কিছুই জানিনা। কমল আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না; আপন কক্ষে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আবার তাম্বুল রচনা করিতে লাগিল।

এদিকে পুরোহিত-মহাশয় স্বস্ত্যয়ন সমাপন করিয়া চণ্ডীপাঠ করিবার নিমিত্ত চণ্ডীখানি যেমন হাতে করিয়াছেন, অমনি কেশব দাওয়া হইতে ডাকিল, "পুরোহিত-মহাশয়—" পুরোহিত কহিলেন, "কে হে তুমি? কার্য্যের পূর্ব্বে বাধা দাও?"

কেশব। আজ্ঞা, আমি কৃষ্ণদাস।

পুরোহিত। সে কে? তুমি ত কেশব বলিয়া বোধ হইতেছে।

সহাস্যে কেশব সম্মুখে আসিয়া বলিল, "যে কৃষ্ণ, সেই কেশব। একমেবাদ্বিতীয়ম্। এইবার ভট্‌চায-মহাশয়কে ডেকে বল, তাঁর মধুসূদন এসেছে।"

সবিস্ময়ে মধুসূদন কহিলেন, "কই জামাই?"

কে। তুমি ডাকই না। তাঁরা এলে এখনই এখানে জামাইয়ের আবির্ভাব হবে।

যা। কেশব-দাদা, তুমি দাড়িগুলো কামিয়েচ ত গোঁপগুলো ফেল নি, চুলও ছাঁট নি কেন?

কে। দাড়ির মধ্যে জামাই লুকোন ছিল, আজ দাড়ি কামিয়ে জামাই বার করলুম।

মধু। সে আবার কি কথা?

কে। সে কথা এখনি প্রকাশ হবে। যাও তোমাকে যা' বললুম তা কর,—এখনি সব শুনো।

এমন সময়ে বেণীমাধব আসিয়া বলিলেন, "কি গো, তোমরা গোল করছ কেন? কেশব, এখনও জপ করতে ব'স নি?"

যা। আর আপনার জপে প্রয়োজন কি! আপনার জামাই এসেছেন।

মহানন্দে বেণীমাধব কহিলেন, "কই, জামাই কোথা?" কেশব প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া বেণীমাধবকে কহিলেন, "আমাকে চিনতে পারেন?" সবিস্ময়ে বেণী-মাধব কহিলেন, "তুমি ত কেশব, দাড়িগুলো ফেলেছ! না, না, তুমি কে? এ কি, তোমার দাড়িতে ত্রিশূলাকৃতি দাগ কেন? এ যে কৃষ্ণদাসেরই ছিল। আমার প্রাণাধিক কৃষ্ণদাস ছাড়া আর কাহারও মুখে এমন চিহ্ন দেখি নি!" বেণীমাধব উন্মত্তের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, "কেশব, তুমি কে? বাবা, তুমি কে? কেশব রে! তুই কোন্ মায়াবী!" কেশবকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "কেশব! বাবা! তুমি আমার একমাত্র প্রাণাধিকা কমলের স্বামী? তবে এতদিন বল নি কেন?" কেশব কহিল, "চিনতে পারি নি, এতদিন আপনাদের পরিচয়ও পাই নি।"

এস্থলে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল, বাটির যে যেখানে ছিল, সকলেই ছুটিয়া আসিল। প্রসন্ন আসিয়া তাঁহার পূর্ব্ব-কথিত মৃত পৌত্রের নাম করিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, শেষে এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, "ওগো মাগো, আমার কোমলের এমন ভাগ্যি হবে, তা আমি স্বপনেও জানিনা গো! আমার কোমল যে শেওড়াতলায় আম পাবে, তা জানি না। মাগো, আমার কোমল যে ঘরে বসে বর পাবে, তা জানি না মাগো!"

প্রায় দুই প্রহরের সময় ভট্চায-বাড়িতে কোলাহল উঠিল। প্রতিবাসীরা অনুমান করিল হয়ত রন্ধন করিতে গিয়া পাকশালায় আগুন লাগিয়াছে। অনেকে ঘড়া বালতি লইয়া ভীত চিত্তে ছুটিয়া আসিয়া পরে ব্যাপার জানিয়া প্রফুল্ল চিত্তে বাড়ী ফিরিল। ক্রন্দন ও আহারাদি শেষ হইলে বেণীমাধব বৈকালে সর্ব্বসমক্ষে কেশবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেশব! বাবা! আমার পুনর্লব্ধ ধন! তুমি এতকাল কোথায় ছিলে?"

কেশব ও বেণীমাধব উভয়কে উভয়ে কেন যে চিনিতে পারেন নাই, তাহা লইয়া কথা-বার্ত্তা চলিতে লাগিল।

কেশবের বিবাহ হয়, তাহার ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে। বিবাহের পর কেশবের মাতার বসন্ত রোগে মৃত্যু হয়। কেশবের বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়, দামোদর নদীর নিকট স্বাদীপুর নামক গ্রামে। কেশবের মাতৃস্বসার বাড়ী চুঁচুড়ায়। তাঁহারা বড় লোক। তিনি বালবিধবা। ভগিনীর মৃত্যুর পর তিনি কেশবকে লইয়া গিয়া আপনার নিকটে রাখিলেন ও হুগলী কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

কেশব শৈশবে পিতৃহীন, কৈশোরে মাতৃহীন, যৌবনে পত্নীহারা। অভাগার বৈকুণ্ঠেও সুখ নাই, কেশব যে-বার এফ, এ, ক্লাশে পড়িতে লাগিল, সেই সময় কেশবের মাসীমার মৃত্যু হইল! মাসীমার দেবর-পুত্রেরা কেশবকে আর একদিনও গৃহে স্থান দিলেন না। কেশব এইবার অকূল পাথারে ভাসিতে লাগিল। প্রায় দুই বৎসর এদেশ-ওদেশ করিল। মধ্যে মধ্যে চাঁদপুর যাইয়া শ্বশুরের সন্ধান করিত, কিন্তু শ্বশুর নানা হাঙ্গামায় দেশত্যাগ করিয়াছিলেন; গ্রামের কেহ বেণীমাধব সম্বন্ধে নিশ্চয় সংবাদ কেশবকে দিতে পারিল না। তখন কেশব দেশে-বিদেশে ছদ্মবেশে ছদ্মনামে অনেক দিন বেড়াইয়া কাটাইল। অবশেষে ঘটনাচক্রে ছাত্রবেশে বেণীমাধবের বাড়ীতে আসিল। ইহার পূর্ব্বে আরও দুই-একজন অধ্যাপকের নিকট ছাত্র হইয়াছিল; কেশব রূপবান্ ও গুণবান্; বেণীমাধবের বাটী আসিয়া অবধি কেশব আপনার পাঠ লইয়াই রাত্রিদিন ব্যস্ত থাকিত; আহারের সময় ব্যতীত বাটীর ভিতর প্রবেশ করিত না। কখনও কোন রমণীর দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই। সেইদিন রাত্রে কেশব লুকাইয়া গুরু ও তৎপত্নীর কথোপকথন শুনিয়া পরিচয় পাইল। তখন তাহার ইচ্ছা হইল, আত্ম-পরিচয় দেয়। কিন্তু কেশবের ইচ্ছা হইল, কমলাকে একবার পরীক্ষা করিবে, কেননা কমল তাহার পত্নী।

কমল ব্যতীত বেণীমাধবের আর কোন পুত্র-কন্যা নাই। কমলই বেণীমাধবের

সর্ব্বস্বের উত্তরাধিকারিণী। কেশবের মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী কেহই নাই। কাজেই কেশবকে শ্বশুরালয়ে থাকিতে হইল, এরূপ অবস্থায় শ্বশুর-বাড়ী থাকিলে লাভ বই লোকসান নাই, মান্য ব্যতীত অমান্য নাই।

কেশবের প্রকৃত নাম কৃষ্ণদাস। কিন্তু পলাশীর কেহ আর কৃষ্ণদাস বলিতে পারিল না; সে যে কেশব, সেই কেশবই রহিল।

এখন প্রসন্ন-ঠাকুরাণী বড় সুখী; আর এখন যাদবের সহিত বড়-একটা ঝগড়া করেন না। কারণ যাদব এখন বাগ্দেবীর অনুচর হইয়াছে। ভয়, যাদবকে রাগাইলে যদি আবার বাগ্দেবীর কোপ-দৃষ্টিতে পড়িয়া নাত-জামাইটিকে হারাইতে হয়! যদি কেশবের কোন অসুখ হয়, তাহা হইলে যাদবের পূজাটা ভালরকম চলে। প্রসন্ন সময়ে সময়ে যাদবকে বিরলে লইয়া গিয়া বলিতেন, "হ্যা দেখ যাদবা! বাগ্দেবীকে বলো, যেন কমলের একটি পুত্র হয়।"

শ্রীশরৎকুমারী দেবী।

---

# গান

বেহাগ—তেওরা

দাঁড়াও আমার কাছে এসে;
আমি ডাকছি তোমায়, কাঙ্গাল বেশে।
ধনীর ঘরে গরীবের স্থান
হয় না শুনি কোন দেশে—
তাই বলে কি যাব আমি,
সাঁঝের বেলা ভেসে ভেসে?
প্রেমের বলে পাষাণ টলে—
জগৎ মহৎ ভালবেসে॥

রচনা—শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

# স্বরলিপি

১
[ গা সন্‌া ]
২ ৩ ১´ ২
II ন্‌া ন্‌া –া । সা –া । গা –া I { মা –পা মপমা । গা –রগা ।
দাঁ ড়া ও আ ০ মা র্‌ { কা ০ ছে০০ এ ০

৩ [-া]॥ ২ ৩ ১ ২
। র্সা -ার I ( গা র্গা । র্সা সার ) } I পা -া পা । পা -া ।
সে ০ ( এ সে আ মি ) } ডা ক্ ছি তো ০

৩ ১´ ২ ৩
। পা -া I পা ধা -ণধা । পা -ধপা । মা -াপ I [ ] I
মা য় কা ঙ্গা ০ল্ বে ০০ শে ০

১´ ২ ৩ ১´ ২
II {সা পা পা । পা -া । পা -া I পা পা পা । পা -া ।
{ ধ নী র ঘ ০ রে ০ গ রী বের্ স্থা ০

৩ ১´ ২ ৩
। -পা -ধা I ণা -র্সা র্সণা । ণর্সণা -াধ । পধা -পমা I
০ ন্ হ য়্ না০ শু০০ ০ নি০ ০০

১´ ২ ৩ ১´ ২
I মা গা -রগা । মা -া । মা -া I গা গা গা । গা -া ।
কো ন ০ দে ০ শে ০ তা ই ব লে ০

৩ ১´ ২ ৩ ১
। গা -া I গমা -পা মা । গা -া । র্সা -া I ন্া ন্া -া ।
কি ০ ষা০ ০ ব আ ০ মি ০ সাঁ ঝে র্

২ ৩ ১´ ২ ৩
। সা -া । গা -া I সা সা -া । পা -া । পা -া } I
বে ০ লা ০ ভে সে ০ ভে ০ সে ০ }

১´ ২ ৩ ১´ ২
I পা পা -া । পা -া । পা -ধা I পা পা -া । পা -া ।
প্রে মে র্ ব ০ লে ০ পা ষা ণ্ ট ০

৩ ১´ ২ ৩ ১´
। পা -ধা I ণা র্সা -র্সণা । ণর্সণা -াধ । পধা -পমা I মা গা -রসা ।
লে ০ জ গ ০ৎ ম০০ ০ হ০ ০ৎ ভা ল ০

২ ৩
। সা -া । সা -পা II II
বে ০ সে ০

# ভারতের সভ্যতায় য়ুরোপের প্রভাব

আধুনিক রাষ্ট্রজাতিদিগের ইতিহাসের পঞ্চবিংশ ও ষোড় শতাব্দী,—প্রাচীন রাষ্ট্রজাতিদিগের ইতিহাসের গ্রীশীয় ও রোমীয় সম্প্রসারণ যুগের অনুরূপ। সামন্ততন্ত্রের দ্বারা যেসকল লোক খণ্ডাংশে বিভক্ত হইয়াছিল তাহারা বড় বড় রাষ্ট্রের অধীনে আসিয়া আবার একত্র সম্মিলিত হইল। এই বড় বড় রাষ্ট্রগুলি সার্ব্বভৌমিক রাষ্ট্রতন্ত্রের কল্পনা অন্তরে পোষণ করিয়াছিল। এইরূপ রাষ্ট্রবিপ্লব হইতে সর্ব্বপ্রকার ভেদবৈলক্ষণ্য উৎপন্ন হইল। ষোড়শ শতাব্দীতে কতকগুলি ভেদের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষত্ব থাকিয়া গেল; আবার কতকগুলি ভেদ,নির্ব্বাচনের দ্বারা কৌলিক প্রবণতা লাভ করিল। এইরূপ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশাসনতন্ত্র, চিরস্থায়ী সৈন্য-নিয়োগ, উপনিবেশ-রাজ্যবিস্তার, অবাধ তত্ত্বানুসন্ধান, প্রাচীন ধরণের ( classic ) শিল্প, বিলাসিতা ও দৈহিক সুখভোগের বাসনা উৎপন্ন হইল।

তখন কতকগুলি রাষ্ট্রজাতি সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য ভাগাভাগি করিয়া ভোগ করিতেছিল,—সুতরাং তখনকার বিশ্বমানবের ক্রমবিকাশের অনুসরণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সপ্তদশ শতাব্দীতে,প্রাচীন-রীতির পক্ষপাতিতা ও যথেচ্ছাচারী রাষ্ট্রতন্ত্র; অষ্টাদশ শতাব্দীতে, চিন্তার নির্ভীকতা ও কতকগুলি সাধারণ মূল-ধারণা সম্বন্ধে অভিরুচি; উনবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের অভিবৃদ্ধি। এবং এই সকল সামাজিক অবস্থা পর-পর কিরূপে আবির্ভূত হইল তাহা সহজেই দেখা যায়। মনে হয় যেন সপ্তদশ-শতাব্দী লোকের মনের মধ্যে ও বিবেক-বুদ্ধির মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু রীতিনীতির মধ্যে, রাষ্ট্রশাসনের মধ্যে, বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে, শৃঙ্খলাস্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; এমন কি স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজত্বের সংস্থাপনে নির্ভীক ব্যক্তিদিগের কার্য্য অন্যপথে চালিত হইয়াছিল, তাহারা বাধ্য হইয়া চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং লোকের ধারণা ও সংস্কারের মধ্যে গণ্ডগোল বাধাইয়া দেয়। একপ্রকার যথোপযুক্ত নির্ব্বাচণ প্রক্রিয়ার দ্বারা সপ্তদশশতাব্দী, লোকের রীতি-নীতি ও চিন্তার মধ্যে পূর্ণ শৃঙ্খলা উৎপাদন করে। তাহার পর যে অত্যাচার-উৎপীড়ন হইতে সমাজের সুন্দর গঠন ব্যবস্থা বিনিঃসৃত হয়, সেই অত্যাচার উৎপীড়ন শিথিল হইয়া পড়িল, বিধিব্যবস্থা ও শান্তি হইতে ধনবৃদ্ধি হইতে লাগিল; ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উচ্চপদবীতে আরোহণ করিল, রাষ্ট্রশাসনে ভাগ বসাইবার জন্য দাবী করিতে লাগিল এবং সাহিত্যে, নূতন চিন্তা ও মতামত আনয়ন করিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে মানসিক আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং উনবিংশ শতাব্দীতে যে আন্দোলনে উহার কার্য্যগত পরিণাম মাত্র প্রকাশ পায়,—ইহাই সেই আন্দোলনের কারণ।

*

* *

অবশ্য এসিয়া-খণ্ডে উপরি-উক্ত শেষ-চারি শতাব্দীর ক্রমবিকাশ ঐরূপ সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হয় নাই। কতকগুলি উপাদান সম্বন্ধে মন্থর গতি এবং অন্য কতকগুলি

উপাদান সম্বন্ধে দ্রুত অবনতি হওয়ায়, ক্রমবিকাশের নিয়মসূত্রটি অতীব জটিল হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি য়ুরোপখণ্ডে ক্রমবিকাশের যে প্রক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় সেই একই প্রক্রিয়ার স্থূলরেখাগুলি, এসিয়ার সমস্ত রাজ্যের মধ্যে বিশেষত ভারতবর্ষেও আমরা দেখিতে পাই। ষোড়শ শতাব্দীতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন, ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, দর্শন সম্বন্ধীয়, সাহিত্য সম্বন্ধীয় একটা আন্দোলন। সপ্তদশ শতাব্দীতে, কেন্দ্রীভূত রাজ্যতন্ত্র এবং প্রাচীন কালের ধরণ-ধারণ (classic)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল সাম্রাজ্যের পতন, প্রাচীন ধরণধারণের বিলোপ, অরাজকতা। উনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপেরই ন্যায় অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন, এবং ঐ সকল পরিবর্ত্তন স্বয়ং য়ুরোপ কর্ত্তৃকই সংঘটিত হয়।

শেষ চারি শতাব্দীর মধ্যে য়ুরোপীয় সমাজ সমূহ ক্রমাগত পরিপুষ্ট হইয়া উঠায়, ভিন্নদেশে গিয়া বসতি স্থাপনের (Emigration) আন্দোলন, দিগ্‌বিজয়ের আন্দোলন এবং বণিক্-সম্প্রদায়গণের আন্দোলন উৎপন্ন হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম ও ইস্‌লামধর্ম্ম পূর্ব্বেই ভারতের সমক্ষে যে সমস্যা উপস্থাপিত করে আবার সেই সমস্যা ভারতের সমক্ষে উপস্থিত হইল। একদিকে নিজের ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানসমূহ ও পৌরোহিতিক শ্রেণীবিভাগ এবং অন্যদিকে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠানাদি ও বিশ্বমানবিক প্রতিষ্ঠান সমূহ—এই উভয়ের মধ্যে ভারতকে একটা নির্ব্বাচন করা আবশ্যক হইল। কিন্তু যত দীর্ঘকাল ধরিয়াই যুঝাযুঝি হউক না কেন, ইহার পরিণামফল সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই—কেন না, আধুনিক সভ্যতা, ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্য উদ্দীপিত করিতে এতই সমর্থ এবং আধুনিক সভ্যতায় নির্ব্বাচনের উপায় সকল এতই শক্তিমান।

নৈতিক দিক্। যাহাতে সমসাময়িক মনীষি ও পণ্ডিতগণের মতবাদ উদ্দীপন করিতে পারে, এইরূপ ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া এত অধিক কি আর কোন সময়ে উৎপন্ন হইয়াছিল? আধুনিক রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক বিদ্যালয়, সৈনিক কর্ম্ম, রাষ্ট্রশাসনপদ্ধতি, বিধি-ব্যবস্থা, পুলিস—এই সকল নির্ব্বাচনের উপায় সকলের সহিত প্রাচীন কোন সভ্যতার উপায় সমূহের কি তুলনা হইতে পারে?

বৈষয়িক দিক। বিজ্ঞানের আবিষ্কারে নানাবিধ বৈলক্ষণ্যের উদ্ভব। অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা, রাজস্ব পদ্ধতি, চুক্তির কঠোর নিয়মাদি নির্ব্বাচনের উপায় সংস্থাপন করিল।

ভারত এখন সেই যুগে উপনীত হইয়াছে যে যুগে ভারতের সভ্যতা মানব-সাধারণ সভ্যতার সহিত মিশিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের জন্য কোন রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রয়োজন নাই। কেননা, ইতিপূর্ব্বেই ভারত নিজ প্রতিষ্ঠানাদির উন্নতির দ্বারা ও ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রভাবে, ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মোগল আমলে স্বধীয় একতা সম্পাদন করিয়া, ইংলণ্ডের প্রভুত্ব গ্রহণ করিয়া, নানাবিধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া, জাত-গুলাকে আরও খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, ভারত নিজেই আপনার অধিকাংশ কাজ সামাধা করিয়াছে—যাহা বাকী আছে তাহা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যই সম্পূর্ণ করিবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# কাল-বৈশাখী

## ছয়

### বিনোদের কথা

অনেক কষ্টে শ্রীকে বশ করেছি। সে যদি প্রভার মত লেখাপড়া জান্‌ত, তা'হলে তাকে বাগে অন্‌তে আমাকে এত-বেশী বেগ পেতে হ'ত না; কিন্তু শ্রীর মত মেয়েরা সংস্কারের মায়ায় অন্ধ আর আচ্ছন্ন হয়ে থাকে,—যুক্তির ধার দিয়েও তারা যেতে চায় না। তাদের মন-ফেরানো তাই বড় কঠিন।

প্রভা ভাবে, আমার মধ্যে সরসতা কি কোমলতা একটুও নেই। তাকে আমি একদিনও আদর করি-নি, একদিনও প্রাণ খুলে তার সঙ্গে আমি মিশি-নি, আমার মনের ভিতরটা তাই তার চোখের আড়ালেই থেকে গেছে। আমি যে মিষ্টি কথা কইতে পারি, আমার বুকেও যে আবেগ আছে, প্রেম আছে, প্রভা তা কল্পনা কর্‌তেও পারে না। কিন্তু সে যদি আমাকে একদিন শ্রীর সঙ্গে দেখে, তা'হলে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে; কারণ এত সাবধানে থেকেও শ্রীর সাম্‌নে এলে, আমার প্রাণের ছদ্মবেশ মাঝে মাঝে দক্ষিণে হাওয়ায় পরচুলের দাড়ি-গোঁফের মত খুলে পড়ে যায়। প্রভার দৃষ্টি যে-রকম তীক্ষ্ণ, তার বুদ্ধি যে-রকম ধারালো, তাতে শ্রীর সঙ্গে আমায় দেখলে সে হয়ত কিছু সন্দেহ কর্‌তে পারে; এই ভয়েই তাকে আমি মানা করেছি, শ্রীর সঙ্গে আলাপ কর্‌তে।

আমার চিকিৎসায় শ্রীর অসুখ সেরেছে বলে পুরন্দর আমাকে ভারি তারিফ করছে। তার বিশ্বাস, শ্রীর অসুখটা খুবই কঠিন হয়েছিল। তার এই বিশ্বাসে মনটা আমার চাপা হাসিতে ভরে যায়। গাড়ল! অসুখটা খুবই কঠিন হয়েছিল বটে! কিন্তু সহজ অসুখকে যে ডাক্তারেরা অনায়াসেই স্বেচ্ছায় কঠিন ক'রে তুলতে পারে, পুরন্দর ত সে খোঁজ রাখে না! হ্যাঁ, শ্রীকে আমি ঋণী কর্‌তে চাই আমার কাছে। সে বুঝুক, আমি তার পরম-উপকারী বন্ধু। আমি যে ধীরে-ধীরে চারিদিক ঘিরে মাকড়সার জাল রচনা করে' তুল্‌ছি, এরা স্বামী-স্ত্রী কেউ তা দেখতে পাচ্ছে না! একবার এই জালের ভিতরে ধরা পড়্‌লে, কি করে এরা আর বাইরে বেরোয়, সে আমি তখন দেখে নেব!

শ্রীর অসুখের সময়ে তার বিছানার পাশে বসে থাক্‌তে-থাক্‌তে, একটি বিষয় আমি আবিষ্কার করেছি। সেদিন শ্রী পাশ ফিরে শুয়ে আছে, পুরন্দর আর আমি বসে বসে কথা কইছি, এমনসময় আমার বাড়ীর চাকর এসে খবর দিলে, পুরন্দরকে প্রভা ডাক্‌ছে। বেশ দেখ্‌লুম, শুনেই শ্রীর মুখের উপর একটা বিরক্তির আভাস ফুটে উঠল, একটু তীক্ষ্ণ স্বরেই সে বল্লে, "না, এখন তুমি এখানেই থাকো!"

বটে! পুরন্দর যে প্রভার সঙ্গে মেলা-মেশা করে, শ্রীর তাতে আপত্তি আছে! আমাদের এই হিন্দুর ঘরের মেয়েদের আমি

জানি। স্ত্রী-পুরুষদের অবাধ মিলন দেখ্তে এখনো এরা অভ্যস্ত হয়-নি; তাই বাইরে কোন যুবতীর সঙ্গে স্বামীকে আলাপ কর্‌তে দেখ্‌লেই, এদের মন সন্দেহের বিষে কালো হয়ে ওঠে। শ্রীও তাহলে এই দলে? বেশ, বেশ, আমিও ত তাই চাই!

আর-একদিন ঘরে ঢুকে দেখি, শ্রী বসে বসে কি একখানা বই পড়ছে। এমনি তন্ময় ছিল সে, যে আমার পায়ের শব্দও তার কাণে গেল না। সাম্‌নে একটু ঝুঁকে পড়ে দেখে নিলুম, তার হাতের কেতাবখানা কি?—সেখানা হচ্ছে "বশীকরণ তন্ত্র"। শ্রী যে জায়গাটা পড়ছিল, সেখানে বড়-বড় হরফে স্বামী-বশীকরণের মন্ত্র লেখা রয়েছে!

আমি তখন সাড়া দিয়ে বল্লুম, "বৌদিদি!"

শ্রী চম্‌কে উঠে, এক-নিমেষে বইখানা কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেল্‌লে!

—"কি পড়ছিলে বৌদিদি!"

—"ও একখানা বই।"

—"কি বই, নামটা শুনি না!"

—"ভারি ত একখানা বাজে বই, তার আবার নাম শুনে কি হবে?"

—"কিন্তু নামটা আমি যে দেখে ফেলেচি বৌদিদি!"

শ্রী একটু লজ্জিত হয়ে বল্‌লে, "তা দেখেচ ত দেখচ! আমি ত আর চুরি কর্‌ছিলুম না!"

—"না, চুরি কর্‌বে কেন, তুমি স্বামী বশ কর্‌বার মন্ত্র পড়ছিলে! আচ্ছা বৌদিদি, তুমি কি মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, শিকড়—এ-সবে বিশ্বাস কর?"

—"মন্ত্রে-তন্ত্রে ওষুধ-বিষুধে কখনো কি মানুষের মন ফেরানো যায়? এও কি সম্ভব?"

—"তবে তুমি ও-বইখানা পড়ছিলে কেন?"

—"হাতের কাছে বইখানা পেলুম, কি আর করি, বসে-বসে পাতা ওল্টাচ্ছিলুম। নৈলে ও-সবে আমার একটুও বিশ্বাস নেই।"

—"কিন্তু বৌদিদি, আমি ওষুধের গুণে বিশ্বাস করি!"

শ্রী ভারি আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে, "তুমি বিশ্বাস কর?"

মনে মনে হেসে বল্‌লুম, "কেন কর্‌ব না? আমাদের ডাক্তারী বইয়ে এমন ওষুধ অনেক আছে, যাতে লোকের মন ফেরানো যায়!"

শ্রী আগ্রহ-ভরে বলে' উঠ্‌ল, "বল কি ঠাকুরপো! এমন ওষুধও আছে?"

—"তা আছে বৈকি!"

এমনসময় ঘরের বাইরে পুরন্দরের সাড়া পাওয়া গেল।

শ্রী চুপিচুপি বল্‌লে, "ঠাকুরপো, লক্ষীটি, এ বইয়ের কথা ওঁকে জানিও না!"

অনেক মাথা ঘামিয়েও যখন কোন উপায় ঠাওরাতে পাচ্ছিলুম না, তখন সেদিন-কার এই ব্যাপারটা আমার মনের ঝাপ্‌সা ভাব অনেকটা পরিষ্কার করে' দিলে। এত দিনে আমি চল্‌বার ঠিক পথ খুঁজে পেয়েছি, আর আমাকে ঘুরে মরতে হবে না!

এখন এই দুটি সূত্র ধরে আমাকে কাজ করতে হবে।

ক। স্বামী পাছে অন্য রমণী দেখে মুগ্ধ হয়, শ্রী মনে মনে সেই ভয়ে অস্থির।

খ। স্বামী-বশীকরণ মন্ত্রে বা ওষুধে শ্রীর

বিশ্বাস আছে। মুখে সে যে এ-কথা মান্‌ছে না, তা লজ্জা ভিন্ন আর-কিছু নয়!

আমি যে কাজ কর্‌তে বসেছি, সে কাজে সফল হবার প্রধান উপায়, মনোবিজ্ঞান তলিয়ে বোঝা। পুরন্দর, শ্রী আর প্রভা—এদের প্রত্যেক কথাটি, প্রত্যেক ভাবটি পর্য্যন্ত আমাকে লক্ষ্য করতে হবে। মুখের একটি ছোট্ট কথায়, চোখের একটুখানি বাঁকা চাহনিতে, অনেকসময়ে কত যে গোপন অর্থ, অজ্ঞাত ভাব, চরিত্রের রহস্য জান্‌তে পারা যায়, অনেকেই তা জানে না। মানুষের চরিত্র বুঝ্‌তে গেলে, কেবল তার বাইরের চেহারা, তার ব্যবহার বা কাজকর্ম্ম লক্ষ্য কর্‌লে কিছুই জানা যাবে না;—কারণ সে-সব হচ্ছে কৃত্রিম। কিন্তু মানুষের চোখে-মুখে সময়ে-অসময়ে যে-সব ভাবের ইঙ্গিত বিদ্যুতের মত ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়, যারা সেই ক্ষণিক প্রকাশকে সামান্য বলে' অবহেলা করে না, নর-চরিত্রের গুপ্ত-কথা তারাই খোলা পুঁথির মত অনায়াসে পাঠ কর্‌তে পারে। আমিও যদি এখন এই পদ্ধতি অবলম্বন করে' চোখ-কাণকে সজাগ-সতর্ক রাখি, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করি, তাহলে শ্রীও আমার মুঠোর মধ্যে আস্‌বে, পুরন্দরও বুঝ্‌তে পার্‌বে, আমার প্রতিহিংসা কী ভয়ানক!

দুনিয়ায় ন্যায়-অন্যায়ের যে-সব বাঁধা বুলি আছে, সে-সব আমার জন্যে তৈরি নয়। টিয়া-ময়নার মত পরের বুলি মুখস্থ করে' করে' সাধারণ লোকগুলো আপনাদের চিন্তাশক্তি একেবারে হারিয়ে বসে আছে;—তাদের দ্বারা তাই কোন বড় কাজ সম্ভব হয় না। আমার ন্যায়-শাস্ত্র বলে, যাতে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, তাই কর্ত্তব্য; যাতে তা হবে না, সেটাই হচ্ছে অকর্ত্তব্য। ভালো-মন্দ, সু ও কু ব'লে কোন কথা নেই—ও-সব হচ্ছে দুর্ব্বলের ওজর, অক্ষমের আত্মপ্রবোধ। ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাটি হাতে করে' নেপোলিয়ন সম্রাট হন-নি, সেকেন্দর দিগ্বিজয় করেন-নি। কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি করতে হ'লে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ছলনা হচ্ছে সত্যের চেয়ে ঢের-বেশী শ্রেষ্ঠ, কার্য্যকর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির স্বয়ং আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন। দ্রোণাচার্য্যের বধ-কাহিনী এই অমূল্য শিক্ষারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। স্বার্থসিদ্ধির পথে দ্রোণাচার্য্য এসে কণ্টকের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে', ধর্ম্মপুত্র হয়েও যুধিষ্ঠির গুরু-বধকে পাপ মনে করেন-নি,—তাও আবার মিথ্যাকথা কয়ে!

এখন প্রভাকে নিয়ে কি করা যায়?—এটা ঠিক যে, তার সঙ্গে আমাকে আরো কঠোর ব্যবহার করতে হবে। এটা সে স্পষ্টই জেনেছে যে, আমি তাকে একটুও ভালো বাসি না। হাব-ভাব-ব্যবহারে এইবার তাকে আরো জানাতে হবে, সে আমার দু-চোখের বিষ। প্রভাকে আমি ভালো না বাস্‌লেও সতি-সত্যি সে আমার দু-চোখের বিষও নয়, তার প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করাও আমার মনের ইচ্ছা নয়। কিন্তু তবু আমাকে বাধ্য হয়েই নির্দ্দয়তার এই মিথ্যা অভিনয়টা কর্‌তে হবে। অথচ, এটা যে কেবল অভিনয়, এ সত্যটা তাকে কিছুতেই জান্‌তে দেওয়া হবে না। দেখি, অত্যাচারে হতাশ হয়ে প্রভা তার প্রেমহীন জীবনটাকে, দুর্ব্বহ মনে করে'

আমার অভীষ্ট-সিদ্ধির পথে নিয়ে গিয়ে ফেলে কি না ?

## সাত

### স্ত্রীর কথা

বিনোদবাবু জোর করে' আমার ঠাকুর-পো হয়েছেন ! তাঁকে বিনোদবাবু বলে' ডাক্‌লে তিনি মুখভার করেন। রাগ করে' অভিমানের স্বরে বলেন, 'যে আমার শৈশবের প্রাণের বন্ধু, তার স্ত্রী হয়ে তুমি কিনা আমাকে পর ভাবো !'

বাস্তবিক, এই লোকটিকে আমার আগে একটুও ভালো লাগ্‌ত না। আর সত্যিকথা বল্‌তে কি, ইনিও আগে ভালো লাগ্‌বার মত কাজও করেন-নি ;—আমার বিয়ের রাতে এঁর যে মূর্ত্তি আমি দেখেছিলুম ! কিন্তু এখন দেখছি, আসলে ইনি লোক নেহাৎ মন্দ নন। বেশ মেলা-মেশা কর্‌তে পারেন, কথাবার্ত্তা-গুলিও দিব্যি মিষ্টি—একটু যা দোষ, বড় পায়ে-পড়া !

এই দেখনা, সেদিন এসে ধন্না দিয়ে পড়্‌লেন, আমাকে গান গাইতে হবে ! শুনেই ত আমার চক্ষুস্থির ! আজ-পর্য্যন্ত স্বামীর সাম্‌নেই কখনো গান গাইতে পারি-নি, আর আমি কিনা গান গাইব এঁর সাম্‌নে ! আমি বল্‌লুম, "ঠাকুরপো, তুমি কি পাগল হয়েচ ? কি-যে বল তার ঠিক নেই !"

—"কেন বৌদি, আমি ত বেঠিক কিছু বলি-নি ! ঠাকুরপোর সাম্‌নে আর লজ্জা কি ?"

—"লজ্জার কথা হচ্ছে না, গান গাইতে জান্‌লে তবে ত গাইব !"

—"না বৌদি, তুমি লুকুচ্চ। পুরন্দরের স্ত্রী গান গাইতে জানেন না ! এও কি হয় ?"

—"জান্‌লেও আমি গাইতুম না। ঘরের বৌ ত বাইজী নয় যে সকলের সাম্‌নেই নেচে গেয়ে ধিঙ্গি হয়ে বেড়াবে !"

—"না বৌদি, তোমাকে গাইতেই হবে ! লক্ষ্মীটি, বেশী নয়—একটিমাত্র গান !" এই-বলেই তিনি আমার একখানা হাত ধর্‌লেন।

চোখের নিমেষে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রাগ করে' আমি বল্‌লুম, "ওকি ! ছিঃ !"

কাঁচুমাচু মুখে, অপ্রস্তুত হয়ে ঠাকুরপো বল্‌লেন, "রাগ কোরো না বৌদি ! আমি তোমাকে ঠিক নিজের বৌদিদির মতই দেখি, হাত ধর্‌লে তুমি যে আবার রাগ কর্‌বে, অতটা আমি খেয়াল করি-নি !"

—"না, এ-সব আমি ভালোবাসি না !"

—"আমার স্ত্রী পুরন্দরের সাম্‌নে অত গান গায়, তাইতেই আমি ভেবেছিলুম আমার সাম্‌নে গান গাইতে তোমারও হয়ত আপত্তি হবে না।"

—"তোমার স্ত্রী আমার স্বামীর সামনে গান গায়, এটা আমি ভালো কাজ মনে করি না।"

—"কেন ?"

—"কেন, তা আগেই বলেচি। ঘরের বৌ বাইজী নয় ঠাকুরপো !"

—"কথাটা তুমি বাড়িয়ে বল্‌চ বৌদি ! পুরন্দর কি আমার পর ?"

—"মেয়েমানুষের কাছে স্বামী ছাড়া আর সব পুরুষই পরপুরুষ। তাদের সঙ্গে মিশ্‌তে গেলে সাবধানে থাক্‌তে হয়। নৈলে কপাল পুড়্‌তে দেরি লাগে না।"

ঠাকুরপো হাসতে হাসতে বললেন, "কিন্তু এখানে কে কার কপাল পোড়াচ্চে বৌদি? তুমি কি তোমার স্বামীকে বিশ্বাস কর না?"

—"স্বামীকে বিশ্বেস করার কথা তুলচ কেন ঠাকুরপো! মন যে তুলোর মত হাল্‌কা, একটু বাতাসেই কোথায় উড়ে পালায়, আর ধরা যায় না!"

—"না বৌদি, পুরন্দরকে আমি বিশ্বাস করি। তার মন হাল্‌কা নয়, তাই ত তার হাতে প্রভাকে আমি অবাধে ছেড়ে দিয়েচি। এখন তারা দুজনেই দুজনকে বন্ধুর মত ভালোবাসে, একসঙ্গে ওঠে-বসে, হাসে গায় গল্প করে। এই কাল্‌কেই আমি ঘরে ঢুকে দেখলুম, প্রভা পুরন্দরের বুকে হাত দিয়ে কি করচে। আমি—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "কি, আমার স্বামীর বুকে হাত দিয়ে—"

—"অত-বেশী চম্‌কো না বৌদি, আগে সবটা শোনো! আমি ঘরে ঢুকে বললুম 'কি হচ্চে প্রভা?' প্রভা বল্‌লে 'পুরন্দর-বাবুর গলার বোতামটা ছিঁড়ে গিয়েচে কিনা, তাই একটা নতুন ঝিনুকের বোতাম বসিয়ে দিচ্চি।'—আমি আর কিছু না বলে ঘর থেকে চলে এলুম।"

আমি রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলুম, "সেই অবস্থায়, দুজনকে সেই ঘরে রেখে?"

—"হ্যাঁ, তাতে হয়েচে কি? এ-কথাটা তোমাকে কেন বল্‌লুম জানো?"

—"কেন, শুনি?"

—"তুমি হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই—এই ব্যাপারটা ভারি খারাপ ভাববে। কিন্তু আমি বলতে চাই, এটা কিছুমাত্র দূষ্য নয়। এই যে এখনি, আমি তোমার হাত ধরতেই তুমি একেবারে আঁৎকে উঠ্‌লে, সেটা কি ঠিক? সরল নিষ্পাপ মনে কেউ কিছু করলে তাতে কোন দোষ নেই। মন যেখানে খারাপ আসল পাপ হচ্চে সেইখানে।"

—"ঠাকুরপো, তোমরা আজকাল লেখা-পড়া শিখে আমাদের চেয়েও বোকা হয়ে যাচ্ছ। আমরা ত সোজাসুজি এই বুঝি যে, আগুন নিয়ে খেলা করতে নেই। ছোট ছেলে যখন পিদিমে হাত দেয়, তখন সরল মনেই দেয়। তাবলে কি তার হাত পোড়ে না?"

—"তুমি আমার কথা বুঝচ না বৌদি! যাক্‌, আর বুঝিয়েও কাজ নেই। কিন্তু যাবার আগে একটা কথা বলে' যাই। তুমি যেন পুরন্দরের কাছে এ গল্পটা করে' বোসো না! সে তাহলে ভাবতে পারে, আমি প্রভার নামে তোমার কাছে লাগাতে এসেছিলুম!"

ঠাকুরপো চলে গেলে পর আমি নিজের মনে ভাবতে লাগলুম। মেজাজটা আজ ভারি খারাপ হয়ে গেল।

এমনসময়ে স্বজনী এসে ঘরে ঢুকে বল্‌লে, "হ্যাঁলা, ও-বাড়ীর হাওয়া শেষটা তোরও গায়ে লাগল নাকি?"

স্বজনী আমার সমবয়সী সখী—ঠিক আমাদের সুমুখের বাড়ীতেই থাকে। দুপুর বেলায় সে প্রায়ই আমার সঙ্গে গল্প করতে আসে।

আমি বললুম, "ও-বাড়ীর হাওয়া আবার কাকে বলে?"

—"ওলো, এই পাশের বাড়ীর কথা বল্‌চি।"

—"হ্যাঁ, তা হয়েচে কি?"

—"তুইও দেখ্‌চি যে ঐ খিষ্টান-মাগীর মত বেহায়া হয়ে উঠেচিস্! ওর কর্ত্তাটির সঙ্গে এতক্ষণ ধরে' কি মনের কথা হচ্ছিল বল্ ত! পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমার পায়ে খিল ধরে আস্‌ছিল, তবু তোদের ছেয়ের গল্প যেন আর শেষই হ'তে চায় না!"

—"দূর পোড়ারমুখী, ও যে আমার ঠাকুরপো হয়!"

—"তা তোমার ঠাকুরপোটির গিন্নি কিন্তু ভালোমানুষ নয় ভাই! মাগী যাদু জানে।"

—"সে আবার কি?"

—"হ্যাঁ, ও যাদু জানে। আমাদের ঘর থেকে ওদের বাড়ীর খানিকটা দেখা যায়, জানিস্ ত? আমার স্বামীরত্নটি আজকাল তাই জানলার ধারেই বাসা বেঁধেচেন। দিন-রাত খালি ঐ জান্‌লার কাছেই ঘুরঘুর্ কর্‌চেন আর ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে' ওদের বাড়ীর দিকে দুঃখীর মত তাকিয়ে আছেন,—কখন্ ঐ ডাইনি-মাগীর মুখখানি তাঁর চোখে পড়্‌বে, সেই ভাব্‌নায় তাঁর আহার-নিদ্রা সব ঘুচে গেছে!"

—"প্রভাকে তুই দেখেচিস্ স্বজনী?"

—"ওমা, তা আর দেখি-নি! ওকে ত্যাখে-নি কে? রোজ দু-বেলা সকলের সাম্‌নে দিয়ে গাড়ীর দরজা খুলে বেড়াতে যায়—সঙ্গে সঙ্গে ঢাকের ট্যাম্‌টেমির মত তোমার স্বামীটিও তার পিছনে-পিছনে লেগে থাকেন। হ্যাঁ ভাই শ্রী, তুই তোর বরকে মানা কর্‌তে পারিস্ না?"

—"কাকে মানা কর্‌ব ভাই, আমার কথা শুন্‌বে কে? ওঁরা এখন স্ত্রীলোকদের স্বাধীন কর্‌তে চান, কাঙালের কথা বাসি না-হ'লে মিষ্টি লাগ্‌বে কেন?"

—"যা বলেচিস্। প্রভা-ঠাকুরুণের ডানা বোধ হয় ভালো করে' খোলে-নি এখনো। কিন্তু দুদিন পরে যখন ফুড়ুক্ করে' উড়ে পালাবে, সেদিন তোর ঠাকুরপোটির কি দশা হবে বল্ দেখি?"

—"কি আর হবে? হতাশ হয়ে আর-একটা বিয়ে করে' ফেল্‌বে।"

—"আর তার জন্যে যে গারদ তৈরি হবে, তাতে কোথাও একটা মাছি-ঢুকবার ঘুলঘুলিও থাক্‌বে না! কি বলিস্? আচ্ছা ধর্‌লুম, তোর ঠাকুরপো যেন এক বৌয়ের বদলে আর-একটা বৌ পেয়ে বর্ত্তে যাবেন, কিন্তু তোর ত আর একটি বৈ দুটি বর জুটবে না ভাই, নিজের বরটিকে পরের হাতে সঁপে দিয়ে কেমন করে' তুইও নিশ্চিন্তি হয়ে আছিস্ বল্-দিকি!"

—"কপালে দুঃখ থাকলে কে তা খণ্ডাবে বল? আমি আর কি কর্‌ব?"

—"কেন, ও-পাড়ার রাঙা-দিদি ত অনেক মন্ত্র-তন্ত্র, গুণ-টুন্ জানেন, তাঁকে একদিন ডেকে পাঠিয়ে দেখ্‌না, যদি তোর একটা সুরাহা কর্‌তে পারেন!"

—"ঠাকুরপো সেদিন বল্‌ছিলেন, ওঁদের ডাক্তারীতেও নাকি মানুষের মন ফেরাবার ওষুধ আছে।"

—"সত্যি? তাহলে উনি ওঁর বার-ফট্‌কা বৌটিকে বশ কর্‌তে পার্‌চেন না কেন?"

—"ময়রা কি সন্দেশ খায় না? নিজে ডাক্তার, তাই বোধহয় ওষুধে অরুচি।"

—"তাহলে তোর ঠাকুরপোর কাছ থেকে তুই একটা ওষুধ চেয়ে নে না!"

—"না ভাই, সে আমার লজ্জা করে।"

—"আচ্ছা মেয়ে যাহোক্ তুই! এ-সব কাজে আবার লজ্জা! বেশ, নিজের জন্যে না-পারিস্ আমার জন্যে একটা ওষুধ চেয়ে নিস্ ত!"

—"কেন, তোর আবার কিসের জন্যে ওষুধ চাই?"

—"আমার উড়ু-উড়ু বরটির ডানা আড়ষ্ট করে' দিতে চাই। দেখিস্, ভুলিস্-নে যেন,—মাথার দিব্যি!"

স্বজনী চলে গেল।

## আট

### প্রভার কথা

আমাকে নিয়ে স্বামী আমার কি কর্‌তে চান? দিন-কে-দিন তাঁর চরিত্র যেন ক্রমেই দুর্ব্বোধ হয়ে উঠ্‌ছে।

তিনি আমাকে ভালোবাসেন না, এ আমি জানি। কিন্তু এতদিন এ-ভাবটা তাঁর মনের ভিতরেই লুকানো ছিল—বালির নীচে নদীর ধারার মত বাইরে সেটা প্রকাশ পেত না। এখন কিন্তু তাঁর অসহিষ্ণুতা আমাকেও অসহিষ্ণু করে' তুল্‌ছে।

আজকাল তিনি আমার সঙ্গে যে-সব কথা কন, যে-সব ব্যবহার করেন, তা যেমন কর্কশ তেমনি অভদ্র!

আমি ত তাঁর কাছে কোন দোষে দোষী নই! বরং তাঁর মন-পাবার জন্যে সর্ব্বদাই আমি তাঁর মন-যুগিয়ে চলি। তাঁর মুখ না-চেয়ে আমি ত কোন কাজ করি না!

তবে কেন তিনি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন? কেন তিনি কথায়-কথায় রেগে ওঠেন, আমাকে মন্দ কথা বলেন, আমাকে দেখ্‌লেই মুখভার করেন? আজ ক-দিন থেকে তিনি আবার শোবার ঘর পর্য্যন্ত বদ্‌লেছেন—আমার সংসর্গ যেন তাঁর অসহ্য!......তাঁর এই পরিবর্ত্তনটা সুধু আশ্চর্য্য নয়,—আকস্মিক!

অনেক ভাবলুম, কিন্তু নিজের কোন দোষই আবিষ্কার করতে পারলুম না। স্বামীর এই নূতন মূর্ত্তি আমার কাছে যেন কেমন একটা রহস্যের মত মনে হ'তে লাগল।

পুঁথি-পত্রে প্রায়ই একটা কথা পড়ি,—'রমণী-চরিত্র দুর্জ্জ্ঞেয়'। আমি ত দেখছি ঠিক উল্টোটাই! আমার কাছে ত আমার পুরুষজাতীয় স্বামীর চরিত্রটি অপঠিত তাম্র-শাসনের মত দুর্ব্বোধ বলে মনে হচ্ছে—এর একবর্ণও আমি বুঝতে পার্‌ছি না। আসল কথা, মানুষের চরিত্রই জটিল—এখানে পুরুষ-নারীর জন্যে আলাদা ব্যবস্থা যিনি করেন, নিশ্চয়ই তাঁর এক চোখ বন্ধ।

......একটা কথা সর্ব্বদা আমার মনে হয়। আমার স্বামী আর পুরন্দরবাবু, দুজনেই দুজনের পরম বন্ধু, অথচ দুজনের মধ্যে কতটা তফাৎ! পুরন্দরবাবুর স্বভাব কী মধুর, কী সহানুভূতি-ভরা, কী হাস্যে-আনন্দে উজ্জ্বল! পরের দুঃখ-কষ্টে দেখেছি, তিনি নিজের প্রাণে সমান ব্যথা অনুভব করেন। এই সেদিন তিনি আমার কুকুর কালিন্দীর অসুখে, ঠিক ছোট ছেলের মতই অধীর হয়ে পড়েছিলেন। তিনটি বাচ্চা প্রসব করে' কালিন্দীর হঠাৎ অসুখ হয়েছিল। পুরন্দরবাবু না-থাকলে সে নিশ্চয়ই মারা পড়ত। তিনি সারাক্ষণ তার পাশে বসে থাকেন দেখে আমার স্বামী তাঁকে হেসে বল্‌লেন, "ওহে পুরন্দর, একটা

জানোয়ারের পেছনে অতটা বাড়াবাড়ি করলে তোমার দয়ার ভাণ্ডার শীঘ্রই খালি হয়ে পড়বে। তখন মানুষের দুর্দ্দিনে তোমার সে শূন্য ভাণ্ডার কিছুই কাজে লাগ্‌বে না!"

পুরন্দরবাবু কালিন্দীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললেন, "বিনোদ, তোমার-আমার মত এই কুকুরটিরও প্রাণ আছে। সুখে-দুঃখে এও খুসি হয়, এও কাতর হয়! এ প্রাণ ত অবহেলার জিনিষ নয়! বিশেষ, অবোলা জীবের কষ্ট দেখ্‌লে কোনমতেই আমি স্থির থাকৃতে পারি না। আহা, যাতনায় এর চোখ দিয়ে জল পড়্‌চে, দেখ্‌তে পাচ্চ না?"

স্বামী সেদিকে না-তাকিয়েই বল্‌লেন, "পুরন্দর, তোমার উচিত ছিল স্ত্রীলোক হয়ে জন্মানো।"

—"কেন?"

—"এমন দুর্ব্বলতা পুরুষের শোভা পায় না।"

—"হ্যাঁ, এই দুর্ব্বলতা রমণীর আছে বলেই আমরা বাইরের পৃথিবীতে যখন আঘাত পাই, তখন অন্তঃপুরে রমণীর স্নেহের ছায়ায় এসে আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। দয়া-মায়াকে তুমি যদি দুর্ব্বলতা বল বিনোদ, তাহলে আমি তোমার মত সবল হ'তে চাই না।"

স্বামী একটুখানি মুখটেপা হাসি হেসে বল্‌লেন, "আচ্ছা, দিনকতক পরেই আমি তোমাকে বেশ করে' বুঝিয়ে দেব যে, দুনিয়ার হাটে দয়ার দাম একটি কাণাকড়িও নয়। এখানে ডঙ্কা মেরে বিকিয়ে যায়, নির্দ্দয়তা।"

পুরন্দরবাবুও অল্প-একটু হেসে ঘাড় নেড়ে বল্‌লেন, "কিন্তু অবুঝকে তুমি ত বোঝ মানাতে পারবে না বিনোদ! দয়ার যদি খরিদ্দার না জোটে, তাহলে আমি বল্‌ব, অমূল্য বলেই দয়াকে কেউ কিন্‌তে পারলে না।"

* * *

আমার টেবিলের উপরে একখানি খাতা ছিল। একলা বসে-বসে যখন আর ভালো লাগ্‌ত না, তখন সেই খাতার পাতায় আমি হিজিবিজি কবিতা লিখতুম। সেই খাতা একদিন গিয়ে পড়ল পুরন্দরবাবুর হাতে।

পুরন্দরবাবু অনেকক্ষণ ধরে কবিতাগুলি খুব মন দিয়ে পড়তে লাগ্‌লেন। লজ্জায় মাথা হেঁট করে' আমি বসে রইলুম,—ছিঃ, ঐ রাবিসগুলো পড়ে মনে-মনে না-জানি তিনি কতই হাস্‌ছেন! কেন যে মরতে খাতাখানা ওখানে রেখেছিলুম!

পুরন্দরবাবু সমস্ত পড়ে খাতাখানা আবার টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে চুপ করে' বসে রইলেন।

আমি আস্তে-আস্তে জিজ্ঞাসা করলুম, "হঠাৎ আপনি অতটা নীরব কেন? আমার রাবিশের ভারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন নাকি?"

তিনি আমার মুখের উপরে তাঁর সুন্দর প্রশান্ত চোখদুটি স্থির করে' ধীরে-ধীরে বল্‌লেন, "না। অনেকদিন ধরেই আমার মনে যে কথাটা উঁকিঝুঁকি মারছিল, তোমার কবিতা পড়ে আজ সেটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি সেই কথাটাই ভাবছিলুম প্রভা!"

তাঁর কথার অর্থ না-বুঝে আমি বল্লুম,

"আমার কবিতায় আপনার মনের কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল ? এ ভারি আশ্চর্য্য ত !"

—"হ্যাঁ প্রভা ! ঠিক তাই। সত্যই আমার মনে হ'ত, তোমার মনের ভিতরে যেন কি-একটা যাতনা লুকানো আছে।"

আমি চম্‌কে উঠলুম !

তিনি বল্‌লেন, "আজ তোমার কবিতা-গুলিও পড়ে দেখ্‌লুম, এর একটিও সুখের কবিতা নয়। এগুলি তুমি যেন লিখেচ অশ্রুজলে কলম ডুবিয়ে !"

আমি যে সুখী নই, পুরন্দরবাবু তা জান্‌তে পেরেছেন ! কি বল্‌ব ভেবে না-পেয়ে মুখ নীচু করে' আমি বসে রইলুম।

দরদ-ভরা স্বরে পুরন্দরবাবু বল্‌লেন, "কিসের কষ্ট তোমার প্রভা ? আমি তোমার বন্ধু, আমাকে বল্‌বে না ?"

মনের যাতনা মনেই চেপে রাখা যে আরো কত-বড় যাতনা, আমি তা জানি গো জানি ! কিন্তু কাকে বল্‌ব সে কথা—এত-দিন ত আমার এমন-কেউ মরমী ছিল না যে, সে কথা জিজ্ঞাসা করে ! আজ তাই পুরন্দরবাবুর মমতাপূর্ণ জিজ্ঞাসা শুনে আমার মন আত্ম-প্রকাশ কর্‌বার জন্যে যেন ছট্‌ফট্ করতে লাগল—সে গম্ভীর সমবেদনায় আমার চোখের পাতাও আপনা-আপনি সিক্ত হয়ে উঠল !

আমার চোখের জল পুরন্দরবাবুর চোখ এড়াল না। কাছে এগিয়ে এসে তিনি আমার একখানি হাত নিজের হাতের ভিতরে নিয়ে বল্‌লেন, "কেঁদনা প্রভা, কেঁদনা ! আমার জিজ্ঞাসায় তুমি যদি ব্যথা পেয়ে থাক, তাহলে আমি ক্ষমা চাইছি।"

গাঢ় স্বরে আমি বল্‌লুম, "না পুরন্দরবাবু, আপনার কথায় আমার কোন কষ্ট হয়-নি।"

—"তবে ? তবে তুমি কাঁদচ কেন ?"

—"সে কথা আর-একদিন বল্‌ব পুরন্দর-বাবু, আজ আমাকে রেহাই দিন"—এই বলে আর উত্তরের অপেক্ষা না-রেখে, সে ঘর ছেড়ে আমি চলে এলুম !......

যে-সময়ে স্বামীর নিষ্ঠুর ব্যবহারে জীবন আমার বিষাক্ত হয়ে উঠ্‌ছিল, ঠিক সেই-সময়ে পুরন্দরবাবুর এই মধুর সহানুভূতি, শান্তিজলের ধারার মত আমার দগ্ধ প্রাণকে স্নিগ্ধ-শীতল করে' তুল্‌লে। তাঁকে আমার দরদের দরদী জেনে আমার হত-ভাগ্যের যন্ত্রণা যেন অনেকটা কমে গেল। আমার কৃতজ্ঞ মন যেন ডাক্ দিয়ে তাঁকে বল্‌তে চাইলে, হে বন্ধু, তোমার আকৃতি সুন্দর, তোমার প্রকৃতি সুন্দর—তোমার সকলি সুন্দর। তোমাকে আমার আপন-জনের মত লাভ করে' আমি ধন্য হলুম—আমি ধন্য হলুম !

কিন্তু তবু আমার মনের গোপন যাতনা তাঁকে আমি জানাতে পার্‌লুম না,—পার্‌লুম না ঠিক নয়, জানাতে সাহস কর্‌লুম না। কারণ, এটা আমি ঠিক বুঝেছিলুম যে, আমার দুঃখের কাহিনী শুন্‌লে পুরন্দরবাবু কখনো নীরব থাক্‌বেন না। তিনি যে-রকম সরল, স্বামীর মন ফেরাবার জন্যে নিশ্চয়ই চেষ্টা কর্‌বেন। কিন্তু আমার স্বামীটিকে আমি যতটা ভালো করে' চিনেছি, বন্ধু হ'লেও তিনি ততটা তালিয়ে চেনেন-নি। স্বামী যদি একবার বুঝ্‌তে বা জান্‌তে পারেন যে, তাঁর আসল রূপ আমি অন্যের কাছে প্রকাশ

করে' দিয়েছি, তাহ'লে তিনি আর-কখনো আমাকে ক্ষমা করবেন না। সাধ করে' নিজের বিপদ ঘনিয়ে তোলার চেয়ে মৌন থাকাই ভালো; নিয়তির গতি বানের ধারার মত অবাধ—লোকের কথায় সে ফেরে না।

এম্‌নিভাবে দিনের পর দিন চাকা-ভাঙা গাড়ীর মত ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে যাচ্ছে, যাচ্ছে, যাচ্ছে। আমার কাতরতা, মিনতি, চোখের জল,—এ-সব কিছুই স্বামীকে নরম করতে পার্‌লে না, উল্টে দিনে দিনে তিনি যেন আমার কাছ থেকে ক্রমেই আরো তফাতে গিয়ে পড়্‌ছেন। অথচ আজ-পর্য্যন্ত তাঁর এই বিরাগের কোন কারণ বুঝ্‌তে পারলুম না!

কিন্তু স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক যেমন কমে আস্‌ছে, পুরন্দরবাবুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব তেম্‌নি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ছে। আসল কথা না-জান্‌লেও, আমি যে দুঃখী এইটুকু জানাই বোধহয় তাঁর পক্ষে যথেষ্ট হয়েছিল। কারণ সেদিনকার সেই ব্যাপারের পর থেকে তিনি নানা ভাবে—গান গেয়ে, বাঁশী বাজিয়ে, গল্প করে'—আমাকে প্রসন্ন রাখ্‌তে চেষ্টা করতেন। তাঁর এই প্রয়াস আমি বেশ বুঝ্‌তে পারতুম। বাস্তবিক, তিনি না-থাক্‌লে আমার দিন-চলা ভার হয়ে উঠ্‌ত!

ধীরে-ধীরে পুরন্দরবাবু আমার মনের ভিতরে এতখানি জায়গা জুড়ে বস্‌লেন যে, হঠাৎ কোনদিন কোন কারণে তিনি না-এলে আমার মনে হ'ত, বৃথাই গেল সেদিনটা!

পুরন্দরবাবুর প্রাণের পরিচয় যত বেশী করে' পাচ্ছি, ততই সেই এককথাই বারবার আমার মনে হচ্ছে—এঁতে আর আমার স্বামীতে কী তফাৎ! পুরন্দরবাবুকে যে রমণী স্বামীরূপে লাভ করেছে, না-জানি সে তপস্যা করেছিল কত জন্ম ধরে'!

শুনেছি পুরন্দরবাবুর স্ত্রীর নাম শ্রী। আমার বড় ইচ্ছে তাঁর সঙ্গে আলাপ করি। কিন্তু কেন জানি না, স্বামীর তাতে অত্যন্ত আপত্তি! পুরন্দরবাবুও একদিন বল্‌লেন, "তুমি এমন একলা থাক কি-করে' প্রভা?"

—"দোক্‌লা কোথায় পাব বলুন?"

—"কেন, আমার স্ত্রীর সঙ্গে ত অনায়াসে তুমি আলাপ করতে পার!"

অনায়াসে যে পারি না সেটা আর তাঁকে বল্‌লুম না। কিন্তু স্বামীকে আবার একদিন বল্‌লুম, শ্রীর সঙ্গে আমি আলাপ করতে চাই।

দৃঢ়স্বরে তিনি বল্‌লেন, "না, সে হ'তে পারে না।"

—"কেন, তাতে দোষ কি?"

—"তুমি কারণ জান্‌তে চাও? তবে জেনে রাখ, শ্রী তোমার সঙ্গে আলাপ করতে রাজি নয়!"

আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "সে কি? কেন?"

—"পুরন্দরের সঙ্গে তুমি এত-বেশী মেলা-মেশা কর বলে সে তোমার ওপরে তুষ্ট নয়। সে তোমাকে হিংসা করে!"

একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম!...... এমন বিষম কথা শুনব বলে স্বপ্নেও আমি ভাবি-নি!

স্বামী আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বল্‌লেন, "কিন্তু জেনে রাখ, আমি তোমাকে কি পুরন্দরকে একটুও সন্দেহ করি না!"—কথাগুলি তিনি খুবই কোমল

স্বরে বল্‌লেন। তাঁর স্বভাব-নিষ্ঠুর স্বর সেদিন কেন যে হঠাৎ অতটা কোমল হ'ল, তখন তা বুঝি-নি। পরে বুঝেছিলুম।

স্বামী আবার বল্‌লেন, "কিন্তু সাবধান, পুরন্দরকে যেন এ-কথাটা বোলো না। তার স্ত্রীর সন্দেহের কথা তুমি জেনেছ জান্‌লে সেও হয়ত লজ্জায় আর এখানে আস্‌বে না!"

স্বামী চলে গেলেন।... ... ... আমি তেম্‌নি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলুম।...... পুরন্দরবাবু আসা-যাওয়া করেন বন্ধুর মত, তাতেও লোকের সন্দেহ! এ সন্দেহের কি হেতু আছে? সত্যিই কি আমি আমার অজ্ঞাতসারে পতঙ্গের মত চলেছি জ্বলন্ত আগুণের দিকে?......এতদিন এ-সব প্রশ্ন কখনো আমার মনে হয়-নি—তার প্রয়োজনও হয়-নি!... ... ...আজও আমি মনের ভিতরে তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে'ও, কিছুই দেখতে পেলুম না! আমার মন যেন আজ বোবা হয়ে গেছে—আমার ডাকে সে সাড়া দিলে না গো, সাড়া দিলে না!

* * *

* *

*

দিন-কতক পরেই এমন একটা ঘটনা ঘট্‌ল, যাতে আমার জীবনের স্রোত একেবারে বদ্‌লে গেল।

একদিন দুপুরবেলা কি-একটা কাজে স্বামীর ঘরে গেলুম। স্বামী তখন ঘরে ছিলেন না। টেবিলের উপরে একখানা বই খোলা পড়ে রয়েছে। বইখানার নাম দেখ্‌লুম, Reports of Trials for Murder By Poisoning!

বিষ খাইয়ে যারা নরহত্যা করেছে, তাদের বিচারের বিবরণ নিয়ে স্বামীর কি দরকার? একটু কৌতূহলী হয়ে বইখানার পাতা ওল্টাতে লাগলুম। বইখানার সর্ব্বাঙ্গে লাল-নীল পেন্সিলের দাগ আর স্বামীর হাতের লেখায় ছোট-বড় টীকা-টিপ্পনি দেখে বুঝ্‌লুম, তিনি খুব যত্ন করে'ই এখানা পড়েছেন।

পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে বইয়ের মাঝখান থেকে হঠাৎ একখানা কাগজ বেরিয়ে পড়্‌ল। তাতেও স্বামীর হাতের অক্ষরে লেখা রয়েছে দেখলুম:—

আর্সেনিক

উদর ও অন্ত্রের প্রদাহ। জ্বলন্ত যাতনা, বমি ও অতিসার। সময়ে-সময়ে জ্ঞান ও যন্ত্রণা দুইই থাকে না। কখনো-কখনো এপিলেপ্সি ও প্যারালাইসিসের সম্ভাবনা। অত্যন্ত পিপাসা। অনেক সময়ে প্রায় উদরাময় ও কলেরার মত লক্ষণ দেখা যাইতে থাকে।

এক-শো গ্রেণ শ্বেত আর্সেনিক দু-চাম্‌চে কোকোর সঙ্গে মিশাইলে কোকোর রং সামান্য হাল্‌কা হয় মাত্র, বিশেষ কিছু তারতম্য চোখে পড়ে না। ফুটন্ত জল ও দুধের সঙ্গে ঐ কোকো মিশাইলে, তাহার আকারে, আস্বাদে ও গন্ধে কিছুমাত্র অস্বাভাবিকতা বুঝা যাইবে না। ঠিক ঐ পদ্ধতিতে অ্যারারুটও তৈয়ারি করা চলে।—

এই পর্য্যন্ত পড়া হয়েছে, এমন সময়ে,— আচম্বিতে পিছন থেকে আমার উপরে কে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কাগজখানা আমার হাত থেকে একটানে ছিনিয়ে নিলে! চম্‌কে, পিছন

ফিরে দেখি, আমার স্বামী দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর মুখ মড়ার মত ফ্যাকাসে! আমি অবাক্ হয়ে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

তিনি আগে বইখানির ভিতরে কাগজ-খানি আবার রেখে দিলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বল্‌লেন,—"তুমি আমার দরকারি জিনিষে হাত দাও কেন?"

—"কাগজখানা পড়ে দেখছিলুম,' ওতে কি আছে!"

—"কী! তুমি তা'হলে ও-কাগজখানা পড়েছ?"

স্বামীর চেহারা ঠিক পাগলের মত হয়ে উঠল—তাঁর মুখ যে এমন ভয়ানক হতে পারে, আগে আমাদের সে ধারণা মোটেই ছিল না। আমি ভয়ে ভয়ে বল্‌লুম, "হ্যাঁ, পড়েছি, অন্যায় হয়ে থাকে ত মাপ কর আমাকে!"

স্বামী আমার একখানা হাত ধরে সজোরে ঝাঁকানি দিতে-দিতে বল্‌লেন, "পড়েচ? পড়েচ? কে তোমাকে পড়্‌তে বল্‌লে? কার হুকুমে তুমি আমার কাগজ পড়েচ?—" বল্‌তে-বল্‌তে থেমে আমাকে এক ধাক্কা মেরে আবার বল্‌লেন, "যাও, দুর হও! ফের যদি আমার ঘরে পা দাও, তা'হলে—"

ধাক্কা খেয়ে আমি একেবারে ঘরের বাইরে গিয়ে ছিট্‌কে পড়লুম!........কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলুম ঠিক আচ্ছন্নের মত।...অদৃষ্টে শেষে এও ছিল? হা ভগবান!

হঠাৎ আমার স্বামী বাইরে বেরিয়ে এলেন। আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দোষীর মত মিনতির স্বরে বল্‌লেন,—"প্রভা, যা হয়ে গেছে তার জন্যে আমি মাপ চাইছি। জান ত আমি ডাক্তার, কত লোকের গুপ্তকথা আমাকে লুকিয়ে রাখতে হয়? যে কাগজ-খানা তুমি দেখছিলে, সেখানাও গোপনীয় বলেই আমার অমন রাগ হয়েছিল। রাগের মাথায় কি কর্‌তে কি করে ফেলেছি, আমি বুঝতে পারি-নি, আমাকে মাপ কর। আর —আর, ও-কাগজখানার কথা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না-হয়, এর-জন্যেও তোমাকে আমি অনুরোধ কর্‌ছি!"

আমার স্বামীর মাথা আজ নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গেছে—নইলে মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে তিনি এমন বদ্‌লে যাচ্ছেন কেন?

ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

---

# জাতিক্ষয় ও শিশু-মৃত্যু

বিগত যুদ্ধে ইউরোপে ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় হইয়াছে। এই লোকক্ষয় কি করিয়া পূরণ করা যায়—ইউরোপের চিন্তাশীল মনীষী ব্যক্তিরা এখন সেই চিন্তাতে মাথা ঘামাইতে-ছেন। বিলাতে একটী সোসাইটী বা কমিটি গঠিত হইয়াছে; তাঁহারা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন। ঐ কমিটিতে সাক্ষ্য দিবার সময় দুই-একজন পণ্ডিত মতপ্রকাশ

করিয়াছেন—ইউরোপের সভ্য দেশ-সমূহে জন্মের হার অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, উহার প্রধান কারণ, সামাজিক জীবনে বিলাসিতা ও ভোগ-লালসার বৃদ্ধি। সন্তান উৎপাদন ও তাহার পালনের জন্য যে ত্যাগ, সংযম ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, আধুনিক সভ্য নরনারীরা তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। তাহারা স্ত্রী-পুরুষের যৌন সম্মিলনের যে সুখ তাহাই ভোগ করিতে ইচ্ছুক,—কিন্তু সন্তানের জন্ম দিয়া ও পালন করিয়া দেশের ও সমাজের সেবা করিতে পরাঙ্মুখ। অনুসন্ধানে ইহাও প্রকাশ পাইতেছে যে, গত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে সন্তান-জন্ম নিরোধ করিবার জন্য এত কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে—যে শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। কোন কোন পণ্ডিত গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, এই উপায়ে প্রায় কোটি কোটি শিশুর জন্ম নিরোধ করা হইয়াছে। এই সকলের ফলে প্রকৃতিও প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেক সভ্য দেশেই—বিশেষতঃ ফ্রান্সে—নারীদের উৎপাদিকা-শক্তি কমিয়া গিয়াছে,—জন্মের হার অসম্ভব রকম নীচের দিকে নামিয়া যাইতেছে।

এ ত গেল ইউরোপের কথা। আমাদের দেশের অবস্থা এক হিসাবে ঠিক উল্টা। ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্যদেশ-সমূহের তুলনায় আমাদের দেশের জন্মের-হার অসম্ভব রকম বেশী। এমন-কি ইউরোপের জন্মের হারের হ্রাস যেমন ভয়ের কারণ, আমাদের জন্মের হারের আধিক্য তেমনই ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কথাটা অনেকের নিকট অদ্ভুত বোধ হইবে। কিন্তু আসলে তাহা নয়। এ এক অতি আশ্চর্য্য নিয়ম যে, যে-সমাজেই জন্মের হার অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি পায়, মৃত্যুর হারও সেখানে সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠে। অনেক সময় জন্মের হারের চেয়ে মৃত্যুর হার বেশী হইয়া দাঁড়ায়। আর তাহার ফলে জাতি-লোপের সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠে।

যাঁহাদের চক্ষু আছে তাঁহারাই দেখিতেছেন যে, বাঙ্গলা দেশে ঠিক এইরূপে জাতি-লোপের সম্ভাবনা হইয়াছে। গত দশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলা দেশে মৃত্যুর হার অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। বিগত পাঁচ-ছয় বৎসর হইতে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা বেশী হইতেছে। আরও ভয়ের কথা যে, মৃত্যুর হার ক্রমেই বেশীর দিকে যাইতেছে। গত বৎসরে জন্ম মৃত্যুর যে হিসাব বাহির হইয়াছিল, তাহা দেখিলেই এ কথা বুঝা যাইবে। কিন্তু আমাদের বোধ হয় সেদিকে চেতনা নাই। আমরা স্বায়ত্ত শাসনরূপ 'লাড্ডু' পাওয়ার জন্য অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া সাগর-পারে হাঁটা-হাঁটি করিতেছি, কিন্তু এদিকে যে জাতিটা-শুদ্ধ মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছে, সেদিকে কাহারও খেয়াল নাই। ইহাকেই বলে দেশ-হিতৈষিতা। যদি জাতিটাই লোপ পাইল, তবে তোমার স্বায়ত্ত শাসন লইয়া ধুইয়া খাইবে কে?

এই জাতি-লোপের প্রধান লক্ষণ শিশু মৃত্যুর মধ্যে দিয়া প্রকাশ পায়। বিলাতে যুদ্ধের আনুমানিক নানা কারণের সমবায়ে শিশু-মৃত্যুর আধিক্য দেখা দিয়াছিল। উহাতেই সমস্ত জাতিটা-শুদ্ধ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। কি করিয়া তাহার প্রতিকার

করা যায়, তাহার উপায় চিন্তা করিতেছে। কিন্তু বিলাতের চেয়ে আমাদের দেশে শিশু-মৃত্যুর হার হাজার-করা চার গুণেরও বেশী—আর উহা বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু আমাদের মন তবু উহা মানিতে চায় না। দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বে "ভারতী"তে এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে আমাদের দেশে পণ্ডিতগণ ও দেশ-হিতৈষীগণ মিলিয়া অত্যধিক শিশু-মৃত্যু নিবারণের কি উপায় স্থির করিয়াছেন জানি না। কিন্তু স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আমাদের দেশনায়কগণের যে-দিকে দৃষ্টি নাই—গবর্মেণ্টের সেদিকে চেতনা আছে। অল্পদিন পূর্ব্বে বাঙ্গলার গবর্মেণ্ট অত্যধিক শিশু-মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটী কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে আমাদের দুই-এক জন নামজাদা মহারথীও আছেন। এই কমিটি অনুসন্ধান করিয়া কি তথ্য নির্দ্ধারণ করিবেন ও শিশু-মৃত্যু নিবারণের কি উপায় অবলম্বিত হইবে, তাহা জানি না। কিন্তু এ-সম্বন্ধে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির যাহা বলিবার আছে, তাহা এই সুযোগে বলিয়া লই।

দেশব্যাপী ঘোরতর দারিদ্র্যই যে আমাদের সকল দুর্দ্দশার কারণ, এ সত্য আমাদিগকে ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে। এই দারিদ্র্যের ফলে দেশে সাড়ে পনরআনা লোক এক-বেলা করিয়া দুমুঠা খাইতে পায় কিনা সন্দেহ। যাহা পায়, তাহাও কোনরূপে উদরপূরণমাত্র,—কোনরূপে দেহটা বজায় রাখিবার জন্য। শরীরের বল পুষ্টি বা প্রাণ-শক্তির বৃদ্ধি, সেগুলা আমাদের কল্পনায়ও আসে না। সুতরাং আমাদের শরীরে উপযুক্ত প্রাণশক্তি আসিবে কোথা হইতে? বাহিরের প্রতিকূল শক্তি ত জীব-দেহের উপর প্রতিনিয়তই আঘাত করিতেছে। ভিতরের শক্তি যদি তাহার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে, তবেই তাহার রক্ষা—নতুবা মৃত্যু অনিবার্য্য। আমাদের জাতির সেই রক্ষণী বা ধারণী শক্তি হ্রাস পাইতেছে। কাজেই বাহিরের প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে আমরা পারিয়া উঠিতেছি না। দেশে নানা-রূপ নূতন নূতন মারাত্মক রোগের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। এক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগেই প্রায় এক কোটি ভারতবাসীর প্রাণ গেল। ম্যালেরিয়ার ত কথাই নাই। প্রতিবৎসরই এই রক্তশোষক রাক্ষস প্রায় অর্দ্ধকোটি ভারত-বাসীকে গ্রাস করিতেছে। বাঙ্গলা দেশ আবার এই রাক্ষসের বিশেষ প্রিয়স্থান।

এই ঘোরতর দারিদ্র্যের মূল কি? শত বৎসর পূর্ব্বেও ত এরূপ দারিদ্র্য ছিল না! শত বৎসর পূর্ব্বেও ত বাঙ্গালীর শরীরে বল-বীর্য্য ছিল,—তাহার দেহে শান্তি ছিল, মনে আনন্দ ছিল! কারণ খুঁজিতে গেলেই মনে পড়ে ডাক্তার মাথুর সেই কথা—"Tremendous impact between the civilizations of East and West"—অর্থাৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার ভয়ঙ্কর সঙ্ঘর্ষ! শান্তিপ্রিয়, নিরীহ, পরলোকে-দৃষ্টি নিবদ্ধ ভারতবাসী যখন তাহার ছায়াঘেরা পল্লীগ্রামে নিশ্চিন্ত প্রাণে বাস করিতেছিল, তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার ভীষণ জীবনসংগ্রামের রুদ্রলীলা, কল-কারখানা, বাণিজ্যবহর প্রভৃতি লইয়া তাহার মধ্যে আসিয়া পড়িল।

আফিঙের নেশার ঘোরে যাহারা চোখ বুজিয়াছিল, তলোয়ারের খোঁচায় আবার জাগিয়া উঠিয়া তাহারা উদ্দেশ্যহীন ভাবে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কিন্তু তমোভাবের মধ্যে আমরা ডুবিয়াছিলাম, রজোগুণের দীপ্তি সহ করিতে পারিলাম না। পাশ্চাত্য সভ্যতার ট্রেণ ধরিবার জন্য প্রাণের দায়ে দৌড়াদৌড়ি করিয়া আমাদের দেহ অবসন্ন, মন ক্লান্ত হইয়া পড়িল। দেশব্যাপী দারিদ্র্য ও তাহার নিত্য-সহচর শিশু-মৃত্যু, অকাল-বার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু দেখা দিল; নূতন নূতন নানা রোগ অতিথি হইয়া আমাদের ঘরে আশ্রয় লইতে লাগিল।

সকলের চেয়ে বড় সমস্যা এই দারিদ্র্য-সমস্যা। যদি বাঁচিতে চাই, তবে এই সমস্যার আশু মীমাংসা প্রয়োজন। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বাহ্য-প্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির যে সামঞ্জস্য রক্ষার শক্তি, তাহাকেই প্রাণশক্তি বলিয়াছেন। এ অতি পুরাণো কথা। প্রাণবন্ত জাতি তাহার বাহিরের অবস্থার সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লইতে পারে। নব নব অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারে। কিন্তু এইটিই আমরা পারিতেছি না, তাই পদে পদে আমরা পিছাইয়া পড়িতেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে মুখে অনেক বড় বড় কথা বলিতেছি, কিন্তু কাজে কোনটাই লাগাইতে পারিতেছি না।

দারিদ্র্য ও শ্রম-সমস্যার যে সকল আন্দোলন পৃথিবীর সর্ব্বত্র চলিতেছে, খবরের কাগজে ত আমরা তাহা সকলেই পড়ি,—আমাদের নেতারাও সে সম্বন্ধে লম্বা লম্বা বক্তৃতাও দেন। গণতন্ত্রের (Democracy) গোড়ার কথাই এই আন্দোলনের মধ্যে। প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপিত হইলে তবেই পৃথিবীর দারিদ্র্য-সমস্যার দূর হইবে। কিন্তু আমরা কি এই গণতন্ত্র বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি? আমাদের দেশব্যাপী দারিদ্র্য দূর করিবার এই একটী রাস্তা খোলা আছে—গণতন্ত্র। কিন্তু সে রাজনৈতিক গণতন্ত্র নহে; সামাজিক গণতন্ত্র। এই সামাজিক গণতন্ত্র যদি আমরা অবলম্বন করিতে পারি তবেই আমাদের মুক্তি। কিন্তু সেই গণতন্ত্রের বেনো জল যাহাতে আমাদের দেশে না ঢুকিতে পারে সেজন্য আমরা জাতিভেদের শক্ত বেড়া দিয়া রাখিয়াছি! জাতিভেদ কোন্‌কালে ভারতবর্ষে কিজন্য সৃষ্টি হইয়াছিল—জানি না;—উহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও শুনিতে চাই না। চোখের উপর দেখিতেছি যে, জাতিভেদের প্রাণহীন খোলসকে পূজা করিয়া দারিদ্র্য-সমস্যা আমাদের দেশে আরও গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। তেল-জলে মিশ খায় না। গণতন্ত্র ও জাতিভেদ—পরস্পর-বিরোধী। অবশ্য এমন কথা বলিতেছি না যে জাতিভেদ দূর হইলেই দারিদ্র্য-সমস্যা দূর হইবে। তাহার জন্য শিল্প বাণিজ্য ও কৃষি প্রভৃতির আধুনিক পৃথিবীর উপযোগী প্রভূত উন্নতি চাই। কিন্তু যাহারা সেই-সব কাজ করিবে, আগে তাহাদিগকে মুক্তি দিতে হইবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী যে অপমান ও লাঞ্ছনা,—তাহার কলঙ্ক ধুইয়া ফেলিতে হইবে।

দারিদ্র্য ব্যতীত আমাদের জাতিলোপের আর একটী প্রধান কারণ, বাল্যবিবাহ ও বাল্য-মাতৃত্ব। ইহাই যে আমাদের সমস্ত জাতির জীবনীশক্তি হ্রাস করিয়া দিতেছে,

—সমস্ত জাতিটাকে বামনের জাতি করিয়া তুলিতেছে, তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। এইজন্য মাতৃত্বই যে অত্যধিক শিশু-মৃত্যুর একটী প্রধান কারণ,তাহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। অপুষ্ট দেহ, অপরিণত-বয়স্কা জননীর সন্তান যে ক্ষীণদেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, সে ত বুঝিতে বেশী বিলম্ব হয় না। আমাদের অনেক শিশু জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করে আর যাহারা জন্মে তাহারাও এমন ক্ষীণ জীবনীশক্তি লইয়া জন্মে যে, বাহ্য-প্রকৃতির ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিবার ক্ষমতা তাহাদের মোটেই থাকে না। কাজেই অকালে পৃথিবী পরিত্যাগ, তাহাদের পক্ষে অনিবার্য্য। কেবল কি তাহাই? সঙ্গে সঙ্গে বালিকা জননীরও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়ে, তাহারও অকালে মৃত্যু ঘটে। তাই বাঙ্গলা দেশে যেমন শিশু-মৃত্যু অত্যধিক, তেমনই প্রসূতির মৃত্যু-সংখ্যাও অত্যধিক। পনেরো হইতে কুড়ি বৎসর বয়সের রমণীদের মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। কেহ কেহ অবরোধ-প্রথা, ইহার একটা কারণ মনে করেন, কিন্তু সেটা তত গুরুতর নহে। কাঁচা শরীরে সন্তানের জন্ম দিয়াই অধিকাংশ বালিকার অকাল-মৃত্যু ঘটে। একথা স্বীকার করা দূরে থাকুক, আমাদের দেশের অনেক পণ্ডিত নানা ঐন্দ্রজালিক যুক্তিজালে উহার বিপরীত কথা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। কেহ কেহ এমনও বলেন যে, একটু বেশী বয়সে মেয়েদের বিবাহ হইলে ও সন্তান হইলে জাতিটা রসাতলে যাইবে—হিন্দুধর্ম্ম লোপ পাইবে। হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ যে এতটা দুর্ব্বল তাহা আমাদের বিশ্বাস নহে। প্রাচীন হিন্দু-সমাজে যে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ভারতীয় আর্য্য চিকিৎসা শাস্ত্রেও বাল্য মাতৃত্বের দোষকীর্ত্তন করা আছে। সে সমস্ত ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি (বাঙ্গলাদেশে শিশু-মৃত্যু—ভারতী, ১৩২৩)।

যৌবন-বিবাহের বিরুদ্ধবাদীদের একটী প্রধান আপত্তি যে, উহা প্রচলিত হইলে হিন্দুর যৌথ পরিবার ভাঙ্গিয়া যাইবে; ইউরোপের ন্যায় প্রেম ও কোর্টসিপের প্রথা প্রচলিত হইবে; ফলে সমাজে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে ও ইউরোপে যে সকল যৌন সমস্যা উৎকট ভাবে দেখা দিয়াছে, আমাদের দেশেও সেগুলি দেখা দিবে। কিন্তু মেয়েদের বিবাহের বয়স নয় দশ বৎসর হইতে ষোল-সতেরো বৎসর হইলেই যে ঐ-সকল উৎকট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু দেখি না। আজকাল কন্যা-দায়ের চাপে মেয়েদের বিবাহের বয়স অনেক স্থলেই ত তের, চৌদ্দ কি তার চেয়ে বেশী বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উঠিতে দেখা যায়। তাহাতে যে পৃথিবী রসাতলে যাইতেছে তাহা তো বোধ হয় না। তের-চৌদ্দ ছাড়িয়া ষোল-সতেরো বৎসর বয়স, বিবাহের জন্য প্রচলিত হইলেই কোর্টসিপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য ব্যাধিগুলা আমাদের সমাজে প্রবেশ করিয়া আমাদের শান্তির নীড় ভাঙ্গিয়া দিবে,এরূপ মনে করিবার কি বৈধ কারণ আছে জানি না। বরং একটু বেশী বয়সে মেয়েদের বিবাহ হইলে তাহারা যে সুগৃহিণী ও সুজননী হইতে পারিবে, এ বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

আর একটা কথা। বিবাহের উদ্দেশ্য শুধু ব্যক্তিগত বা কৌলিক ব্যাপার মনে করিলে চলিবে না। জাতি ও দেশের উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগকে বিবাহ-প্রথার যুগোপোযোগী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। জাতির মূলই সুজাত ও সুস্থ শিশু। তাহার জন্য চাই সুস্থ ও শরীরে-মনে বলশালী পিতা-মাতা। বাল্য বিবাহ সে আদর্শের পক্ষে বাধা দেয়। সুস্থ ও সবল পিতামাতা পাইতে হইলে আমাদের ছেলেমেয়েদের বিবাহের বয়স বাড়াইতে হইবে ও তাহাদিগকে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করিয়া শিক্ষিত করিতে হইবে। আধুনিক উন্নত ইউরোপ এ-দিকে বেশ প্রখর দৃষ্টি রাখিয়াছে। নববিজ্ঞান সৌজাত্য-বিদ্যার মূল উদ্দেশ্যই এইরূপ সুস্থ, সবল ও বুদ্ধিমান জাতির গঠন। এই সৌজাত্য-বিদ্যার মূল নীতি আমাদিগকেও অনুসরণ করিতে হইবে। আধুনিক জীব-বিদ্যা ও বংশানুক্রম তত্ত্ব যে সকল শিক্ষা দেয়, সেগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিজ্ঞান সকল জাতিরই সাধারণ সম্পত্তি। প্রাণবান সুস্থ জাতি সেই সম্পত্তির ব্যবহার করিতে জানে। অলস জীবন্মৃত জাতি তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া উহাকে উপেক্ষা করিয়া, গভীর দুর্দ্দশার মধ্যে ডুবিতে থাকে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

---

# রিক্ত করে

বন্ধু আমার ফিরলে ঘরে
অনেক দিনের পর,
আজকে এসো পরাণ-প্রিয়
নিঃস্ব মনোহর।
ফিরলে তুমি তীর্থ করে
অতুল দুটী রিক্ত করে,
বিশ্বজিতের দানের শেষে
আজকে অবসর।

ফুলের সাজি উজার করে
দেবের রাঙ্গা পায়,
পঞ্চাতপের যজ্ঞ শেষে
আজকে এলে হায়।

যা ছিল ওই পত্রপুটে
বিলিয়ে দিলে হরির লুটে,
রিক্ত তুমি, তোমার দানে
সিক্ত চরাচর।

আন্‌লে অলকনন্দা এবং
মন্দাকিনীর জল,
স্পর্শিল শির আশীষ-ভরা
শূন্য করতল,
এসো ধরার লাঞ্ছিত হে
এসো আমার বাঞ্ছিত হে,
এসো আমার প্রাণ-জুড়ানো
হিয়ার অধীশ্বর।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

# মাসকাবারি

## পূর্ব্বানুবৃত্তি

সত্যসুন্দরের কথা আমি যেমন করে' বলতে চেয়েছি, তেমন করে' বলা এখনও হয়-নি—তা' বেশ বুঝতে পারি। সব কথা ক্রমে-ক্রমে বলবার চেষ্টা করব; আশা করি আমার যেটুকু বক্তব্য, অন্ততঃ সেটুকু, সময়ে গুছিয়ে বল্‌তে পার্‌ব। কথাটা পাছে metaphysical হ'য়ে পড়ে, সে ভয় আমার আছে; কারণ, আমার উদ্দেশ্য, কোনো Philosophy of Art সৃষ্টি করা নয়। কথাটা সত্য, এ বিশ্বাস আমার আছে—কারণ কথাটা একেবারেই নতুন নয়, বিশেষ করে' আলোচনা করা যাচ্ছে মাত্র। সুন্দরকে যদি সহজ-সুন্দর করে' তুলতে না পারি—সে দোষ আমারি, সুন্দর কখনও অসুন্দর বা অসত্য হ'তে পারেন না। মনে রাখতে হবে, 'বক্তুরেব হি তজ্জাড্যং শ্রোতা যত্র ন বুধ্যতে।'

### সুন্দর-বিজ্ঞান

এই যে সুন্দরের কথা আমরা বলছি, জগৎব্যাপারে ইনিই সব চেয়ে সুপ্রকাশ। ইনি যে আনন্দ মানুষের মনে সঞ্চার করেন, তার থেকেই আর্টের জন্ম; এই আর্ট-চেষ্টা মানুষের চেতনার সমবয়সী। আদিযুগের মানুষ এঁকে যে ভাবে উপলব্ধি করেছিল, সেই উপলব্ধি ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; আর, এই উপলব্ধি নানাজাতি, নানা প্রাকৃতিক অবস্থানের মধ্যে নানাযুগে নানাভাবে করেছে। এই সুন্দর যে-রসে মানুষের মনকে অভিষিক্ত করেছেন, সেই রসেই ভক্তি ও প্রেমের উদ্ভব হয়েছে—তার থেকেই লোকধর্ম্মের বিকাশ, 'religious perception' ফুটে উঠেছে; মানুষ কবি হয়েছে, ভক্ত হয়েছে; দেশে-দেশে যুগে-যুগে ঋষিদের আবির্ভাব হয়েছে। সার্ব্বজনীন যে-ধর্ম্ম মানুষের মনকে নির্ব্বিশেষে অধিকার করেছে, মানুষ যোড়-হাত করে', জলভরা চোখে, বিনম্র হৃদয়ে, আত্মসমর্পণ করে' যে-সব ধর্ম্মবিধান সর্ব্বসম্মতিক্রমে শিরোধার্য্য করে' নিয়েছে—সেই ধর্ম্মচেতনার মূলে এই সুন্দরেরই বশ্যতা স্বীকার রয়েছে। এখানে সকলের প্রকৃতি সমভাবে সায় দিয়াছে; তার কারণ, এই সৌন্দর্য্য-উপলব্ধি, এই রসজ্ঞান, আলো ও বায়ুসেবনের মত তার দেহপ্রকৃতিরই ধর্ম্ম। তার সকল ইন্দ্রিয় এই সুন্দরের অধীন, এই সুন্দরের পরিচর্য্যা করে—পঞ্চেন্দ্রিয়ের মুক্তদ্বার দিয়ে এ' প্রবেশ করে, ও ইন্দ্রিয়াধিপতি মনকে হরণ করে। এ অবস্থা সকলেরই, তাই এর থেকে পাওয়া যে religious perception, তা' বিশ্বজনীন—সকলের পক্ষে সমান। ধর্ম্মবিধানের বশ্যতা আন্তরিক; সেই বশ্যতাসূত্রে সর্ব্বমানব সমপ্রাণতা লাভ করে; এই সমপ্রাণতার উপরেই আর্ট প্রতিষ্ঠিত।

### সুন্দর-মঙ্গল

কিন্তু এই সুন্দরের পরিচয়ের সঙ্গে যে religious perception আছে, তা' সার্ব্বজনীন আর্টের ভিত্তি হ'লেও,এইখানেই আর্টের

আসল বাধা; কেমন করে’—তাই বলছি। সুন্দরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রকাশ মানুষের মনে আত্মবিরোধের সৃষ্টি করে। সুন্দরের মধ্যে সত্যকে সে যেমন অস্পষ্টভাবে অনুভব করে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সেই অস্পষ্ট-অনুভব-করা সুন্দরের সঙ্গে আপনার যোগসাধনের চেষ্টায়, আত্ম-চরিত শোধন করার দিকে ঝুঁকে’ পড়ে, —সুন্দর পূর্ণ প্রকাশ না হ’তেই মঙ্গল-অমঙ্গল-বোধ তা’কে আচ্ছন্ন করে; ধর্ম্ম, নিয়ম, সংযম, তপস্যা, আত্মনিগ্রহ, বৈরাগ্য—মানুষের উপাসনার বিষয় হয়। এই বিরোধের পরিচয়, ও তার জন্যে এই বিরোধ দূর করার সংগ্রাম তা’কে একেবারে পেয়ে বসে, সুন্দরকে পেতে-না-পেতে অসুন্দরের বিভীষিকা তাকে অস্থির করে তোলে। সুন্দর-অসুন্দরের বিরোধ যখন স্পষ্ট দেখা দেয়, তখন মানুষের মনে মঙ্গলকামনা বিশেষ করে’ জাগ্রৎ হয়ে উঠে। কামনার স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ—যা’ সাধারণ অজ্ঞান মানুষ-সমাজে চিরদিন আছে ও থাকবে, তার বিরুদ্ধে মানুষের এই মহৎ আক্রোশ খুব ভালো, সমাজস্থিতির পক্ষে খুবই দরকার। যে প্রয়োজনটা সার্ব্বজনীন, যা’কে সাধারণ মানুষ সাধারণ জ্ঞানে বেশ প্রত্যক্ষ করে, তার চেয়ে বড় কিছু মানুষের চেতনায় সহজে স্থান পায় না। এমনি করে’ সুন্দরও শেষকালে মঙ্গলের আড়ালে প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়।

## আসল কথা

কিন্তু আসল কথাটা কি? জগতের প্রয়োজনটাই বড়, তার উপর কারো কথা-বলা চলে না। সুন্দরকেই সত্য বলে’ উপলব্ধি করা সহজ নয়—করানো ত’ আরও শক্ত। ইন্দ্রিয়-দ্বারে যে রূপ আমাদের মনকে স্পর্শ করে, সেই রূপোত্থিত রসে তিন রকম অবস্থা হয়। সাধারণ মানুষ তা’তে নিকৃষ্ট সুখের সন্ধান পায়, কামনার উদ্রেক হয়; এই কাম, দুর্ব্বলতা ও স্বার্থপরতার মূল। উচ্চতর প্রকৃতিতে এই রস নিঃস্বার্থ ‘কামনা’র—বিশ্বহিত-কামনার উদ্রেক করে, আত্মপ্রসার হয়। যে সুখ সে পায়, তা’ আর সকলকে পাওয়াতে চায়; এই সুখকে উৎকৃষ্ট জেনে’ ইতর সুখকে ধিক্কৃত করে; একটা আদর্শ-বোধ জন্মে, বাস্তব ও সেই আদর্শের ভেদ তার মনে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠে—এই দ্বৈততত্ত্ব, এই দ্বন্দ্ব, এই ভক্তিবাদ, উচ্চতর সুখের আশ্বাসে মানুষের নিকৃষ্ট বৃত্তিদমন করে’ যে ধর্ম্ম স্থাপন করে, সাধারণের পক্ষে তা’ বড় হিতকর। এখানেও মানুষ পূর্ণসত্যকে উপলব্ধি করে না; এমন-কি, এই আদর্শ বা ‘ভগবান’—এর চেয়ে সত্য বস্তুর কল্পনা সাধারণের অগ্রাহ্য; কারণ, তা’র প্রয়োজন বোধ সাধারণের মধ্যে নেই। কিন্তু, এই সুন্দর যে উচ্চতম প্রকৃতিতে পূর্ণ প্রকাশ হ’য়ে তাকে অদ্বন্দ্বাবস্থায় তুলে ধরেন, যে অসাধারণ মানুষের আত্মা আনন্দ আস্বাদ করে, —মঙ্গল-অমঙ্গল, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সব এড়িয়ে গিয়ে এই সুন্দরের মধ্যে, সমস্যার সমাধান নয়—তিরোধান, উপলব্ধি করে, তারি মধ্যে, সেই আদি-মানবের—সাধারণ মানুষের—সহজ সৌন্দর্য্যবোধ চরম সার্থকতা লাভ করে। চিত্তের মধ্যে এই বিরোধের অভাবই সত্যদর্শন, —এই সত্য-দর্শনকে আমাদের ঋষিরা মুক্তি বলেছেন।

## আদি রহস্য

বাহিরে রূপ, অন্তরে রসজ্ঞ আত্মা, মধ্যে ইন্দ্রিয়ের স্পর্শসেতু—সর্ব্বকালে সর্ব্বমানব এই অবস্থায় অবস্থিত হ'য়ে রয়েছে। মানুষের স্বাভাবিকতম অবস্থা এই। তাই মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা সহজ স্বাভাবিক হ'তে হ'লে এই অবস্থার প্রতিকূলে না হ'য়ে, অনুকূলেই হ'বে। এ-রহস্য সৃষ্টি ও জন্মরহস্যের মতই অপূর্ব্ব—ঐ খানেই আদি, ঐ খানেই অন্ত; যেখানেই বাঁধন, সেখানেই মুক্তি। মানুষ তা' না বুঝে', মাঝখানে ঘুরপাক খাচ্ছে, ক্রমাগত দ্বন্দ্বচক্রে ঘুরছে। সৃষ্টিরহস্য আমারি দেহরহস্যের সঙ্গে গাঁথা! চেতনার প্রথম প্রত্যুষে পাঁচদিক থেকে পাঁচ রকমে, যে সুন্দর, আমার গায়ে হাত বুলিয়েছিলেন, সেই পাঁচের সাহায্যে, পাঁচেরই সাধনায় যখন তিনি আনন্দরূপে এক হ'য়ে দাঁড়াবেন, তখন তিনি সত্যই সুন্দর, সত্য-সুন্দর। কিন্তু তাঁকে পাবার সাধনা সাধারণতঃ কেউ করে না। তাঁকে অখণ্ডরূপে দেখা ব্যক্তিগত জীবনে অনেক ঘটেছে—মানব-সাধারণের চেতনায় তাঁর পরিচয় সুস্পষ্ট হয় নি। জ্ঞান, সুন্দরকে বর্জ্জন করে' অগ্রসর হ'তে চেষ্টা করে; ভক্তি, সুন্দরকে মঙ্গলের দ্বারা খণ্ডিত করে' সত্যকে তা' থেকে তফাৎ করে', রাখতে চেয়েছে; সুন্দরকে সত্যের প্রতিষ্ঠাভূমি করতে কেউ সাহস পায় নি।

## ভারতীয় সাধনা

এই সুন্দর থেকে আনন্দ, ও আনন্দ থেকে ভূমার চেতনা, ও তথা মুক্তির সন্ধান ভারতবর্ষ পেয়েছিল—কিন্তু, তত্ত্বের গহন-গুহায় তা' নিহিত হয়ে আছে। এই আনন্দকে আর্টের সাহায্যে বিশ্বমানবের সঙ্গে ভাগ করে' নেওয়ার কথা সে ভাবে নি, চিন্তাটাকে আয়ত্ত করেছিল, ভাবকে রূপ দিতে পারে নি। এই রূপ-দেওয়া, এই expression, আর্টের কাজ। এই আর্টের ভিতর দিয়েই সত্যসুন্দর সাধারণের ভাব ও ভাবনার বস্তু হ'য়ে দাঁড়াতে পারেন; সে কাজ ভারতবর্ষ ভালো করে' করতে পারে নি। অধিকার-তত্ত্বই তার বড় কথা—সকলকে সমভাবে অনুভাবিত করার যে কাজ, তা' সে অসম্ভব বলেই বুঝেছিল। তাই আজ এই সত্য-সুন্দরের কথা কবির মুখেও নিতান্ত অসত্য-সুন্দর বলে' বোধ হচ্ছে। ভারতের বাইরে থেকে যে খণ্ড সত্যের সাধনা, নিম্নাধিকারের কথা, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে আমাদের দেশকে অভিভূত করে' ফেলেছে, সেই বাস্তববাদ, প্রয়োজন-নীতি, এই সত্যসুন্দরের বিরুদ্ধে কলরব করছে। শুধু তাই নয়, আবার বলছে, সেই কথাই ভারতেরও কথা। বিশ্বহিত ও বিশ্বমঙ্গলকে সেই খণ্ডসত্য, খণ্ডসুন্দরের নিম্নভূমি থেকে দেখছে, যা' বুঝতে পারছে না তা'কে ছোট করছে, কাজেকাজেই ভারতের সাধনাকে শ্রদ্ধা করার ছলে অপমানই করছে। ভারতবর্ষের মহা অপরাধ এই যে, মানুষের মধ্যে সে আত্মাকে দেখেছে, তাকেই বড় বলে' জেনেছে; মনুষ্য-সাধারণের জ্ঞানের দিক থেকে, তার মধ্যে কেবল জীবাত্মাকেই দেখেনি, তাই তার বিশ্বহিতের ধারণা ও নীতিজ্ঞান কিম্ভূত বলেই বোধ হয়। ভারতবর্ষ সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে শিবকেও উপলব্ধি

করেছে, কিন্তু সে-শিব সত্যসুন্দরের সঙ্গে যুক্ত, সে কেবল religionএর দ্বারাই সীমাবদ্ধ নয়। সে সকলের মধ্যে সত্যকে দেখ্‌তে চেয়েছে; অমানুষ বিক্রমে, অসাধারণ সাহসে, ঐকান্তিক নিষ্ঠায়, সে পূর্ণসত্যকে প্রত্যক্ষ করে' তবে নিবৃত্ত হয়েছিল, অর্দ্ধপথে থামে নি। তাই, তার সুন্দর সত্যেরই রূপ—সম্পূর্ণ, অদ্বন্দ্বিত, তার মধ্যে অমঙ্গলের কল্পনাও থাকতে পারে না। এই সত্য-সুন্দরের আনন্দ, ভাব থেকে রূপে যখন সুপ্রকাশ হ'বে—নূতন আর্টের জন্ম হবে, তখন সত্য-সুন্দরকে, তত্ত্ব-বিচারে নয়, ভাবের ভিতর দিয়ে আমরা লাভ করব।

* * * *

তাই হয়েছে, সেই আর্টের জন্ম হয়েছে রবীন্দ্র-সাহিত্যে। এই সত্যসুন্দর, অর্থাৎ intellect ও feeling এর অপূর্ব্ব সমতা রক্ষা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায়। সুন্দরের মধ্যে দিয়ে সত্যের উপলব্ধি, সত্যের প্রেরণায় সুন্দরের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা, এমন করে' আর কখনও হয় নি। ঋষিরা যাঁকে ভাবের মধ্যে পেয়েছিলেন ও চিন্তার আকারে গেঁথেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকেই রূপের মধ্যে পেয়ে, আর্টে সুপ্রকাশ করেছেন; এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার অবসর পরে হবে।

## সত্য-সুন্দর ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনা

রবীন্দ্রসাহিত্যের পঠন-পাঠন ফলে আজকাল একটা কথা প্রায় শোনা যাচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের যুগের ভাবে বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য গড়তে চেয়েছেন। এর ভিতরকার অভিযোগটা এই যে, তিনি উপনিষদের উচ্চ তত্ত্ব আশ্রয় করে একটা colourless universalism—এর প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চেয়েছেন; ভারতীয় সাধনা পরবর্ত্তী যুগসকলের মধ্য দিয়ে—বিশেষতঃ পৌরাণিক ও মধ্য যুগে, যে বিচিত্র সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক খাল-নদী কেটে অগ্রসর হয়েছে, জাতীয় জীবনের ধারা যে অতীতকে আশ্রয় করে', পুষ্ট করে' এ-কাল যাবৎ অগ্রসর হয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও অবশ্যম্ভাবীরূপে হ'বে—সেই অতীতকে একেবারে স্বীকার না করে', তিনি যে সাহিত্যের পত্তন করেছেন, তা' নিতান্তই আকাশ-কুসুম, তার মূল নেই, শাখা নেই—তার অতীত নেই, বর্ত্তমানের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই—এক-কথায়, তা' আত্মতন্ত্র, অবাস্তব, বস্তুতন্ত্রহীন।

* * * *

বিশুদ্ধ সাহিত্যের দিক থেকে—কবিত্বের দিক থেকে—আর্টের দিক থেকে, এর উত্তর এই যে, রবীন্দ্রনাথ যদি কেবল কতকগুলি abstract ও abstruse ভাব উপনিষদের যুগ থেকে আমদানী করে ছন্দে গেঁথে ও গদ্যে প্যারাফ্রেজ করে থাকেন, তবে তিনি, আকাশচারী ব্যোমবিহারী ত' পরের কথা, কবিই ন'ন, তাঁর লেখা আর্ট হয় কেমন করে'? তিনি ত' শুধু তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করেন নি; তিনি ভাবকে রূপ দিয়েছেন, তপোবনের আত্মপ্রত্যয়কে বিশ্বপ্রত্যয়ে রূপান্তরিত করেছেন; যা' তত্ত্ব ছিল তা'কে কাব্যের কলেবর দিয়েছেন, তা'কে তিনি বিশ্বমানবের ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বস্বরূপে প্রতিফলিত করেছেন; তাঁর গানে আমাদের প্রত্যেকের ও সকলের হৃদয়-স্পন্দন, অন্তরতম আশা-আকাঙ্ক্ষা

সেই সত্যশিবসুন্দরের সুরে বেজে উঠেছে। এই যে যোগ—এই জগতের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে' ঊর্দ্ধমুখে সেই সত্যশিব-সুন্দরের গান—এ' ত' কোনো যুগের সাহিত্যে এমন সুপরিস্ফুট ছিল না! উপনিষদের philosophyকে এই মানবত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা—অথবা, এই মৃন্ময়তাকে উপনিষদের alchemyতে খাঁটি সোনায় পরিণত করা—এ ত' এ পর্য্যন্ত কেউ করেনি; 'ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'র কথা এমন করে' কে বলেছিল! সেই দ্বৈতা-দ্বৈতকে এমন করে' জীবনের সকল খুঁটি-নাটি, বাস্তবের অভিজ্ঞতা, চির-পরিচিতের মধ্য দিয়ে, সত্যসুন্দরের সোনার কাঠি ঠেকিয়ে, এমন অপূর্ব্ব কাব্যসৃষ্টি কে করেছিল! 'The touch of truth is the touch of life'—বড় সুন্দর কথা! উপনিষদে সেই truth ছিল, কিন্তু তার touch এমন করে' এই বহু শতাব্দীর মৃতদেহে কেউ দিতে পারে-নি; তিনি দিয়েছেন, তাই, জীবন-বিহঙ্গী শতবরণের পাখা মেলে' ঝটপট করে' উঠে বসেছে; যা' তত্ত্বকথা ছিল, তা' সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে,—যা' আকাশ-কুসুমের মত ছিল, তা' শিকড়-সমেত বোঁটায় ফুটে' উঠেছে। উপনিষদের সত্য, সুন্দরের মূর্ত্তি ধারণ করেছে। তিনি উপনিষদ থেকে কাব্যে নামেন নি, কাব্য থেকে উপনিষদে উঠেছেন—তিনি বাস্তবকেই সত্য-সুন্দরের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, sense-কে spiritualise করেছেন; philosophy নয়, আর্টের পথে মুক্তির সন্ধান করেছেন। তাঁর প্রতিভার অনন্যসাধারণ মৌলিকতা এইখানে। তিনি উপনিষদ আবৃত্তি করেন-নি; সাহিত্য-সৃষ্টি করেছেন।

## সত্যসুন্দর বনাম বস্তুতন্ত্র

আসল কথা, উপনিষদিক যুগের যে সত্য-সাধনা, তা' তপোবনের তরুপ্রাচীর লঙ্ঘন করে' জাতির জীবনে, সর্ব্বাঙ্গে, সঞ্চারিত হ'তে পারে-নি। প্রয়োজন ও সুবিধা, এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কালধর্ম্মের মধ্যে সে যে কোথায় কি-আকারে লুপ্ত বা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তার সন্ধান কেউ রাখত না; মোক্ষ ও মুক্তির তত্ত্ব হিসেবে, অধিকারী-অনধিকারী ভেদে তার চর্চ্চা হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু জগৎ ও জীবনের বাস্তব সমস্যার দিক থেকে তাকে কেউ মানেনি, মানতে চায়নি।

তারপর পৌরাণিক ও মধ্যযুগ বলতে যে আশ্চর্য্য রীতিনীতি আচার-প্রথার খিচুড়ীর যুগ বুঝতে হয়, সে যুগে এই জীবন ও জগতের আসল সমস্যাটা সমাধান করবার প্রয়োজন কেউ বোধ করেনি। যে দিকে যেমন গলদ, সেদিকে তেম্নি কাজ-চালানো রকমের তালি—ক্রমাগত এই রকম হ'তে হ'তে জীবনটা এত-রংয়ের এত-আকারের তালিতে ভরে' উঠেছে, যে জ্ঞানের একনিষ্ঠা তাকে স্বীকার করতে পারে না, বিশ্বাস কোনো রকমে বরদাস্ত করতে পারে। সেই বিশ্বাসের অভ্যাস জড়তা নিয়ে এসেছে, বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। আমরা যে কি তা' নিজেরাই জানিনে; জানা'তে গেলে, নিজেরাই, সেই তালি ছিঁড়ে যাবার ভয়ে লাঠি হাতি নিয়ে আত্মরক্ষা করি। জীবনটা যখন এই নানা রংএর পুরাণো ময়লা

তালিতে ঢেকে গিয়েছে, তখন সেই তালির সেলাই-খোলা মুখগুলো খুলে' দিয়ে, ভিতরকার আসল জীবন, ও তারি এক-বোঁটায়-গাঁথা বিচিত্র দলগুলিকে একেবারে রবির আলোকে যিনি ধরলেন, তাঁকে এই তালি-পরা মানুষ কল্পনাবিলাসী বলে' দোষ দিচ্ছে। তাঁর কাব্যে নাকি criticism of life নেই! তা' ত' নেই-ই! সে ওই তালিপরা জীবনের criticism নয়—সে ভিতরকার ঐ আসল lifeএর criticism, life of lifeএর criticism.

## রবীন্দ্রনাথের আর্ট।

যে ভারি ও মোটা মিথ্যার পর্দা আমাদের জীবনটাকে শত তালিময় হয়ে ঢেকে রেখেছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যে সে পর্দার রং নেই। কিন্তু ঐ পর্দার চাপের মধ্যে থেকেও তার শত ছিদ্রমুখে যে সত্যিকার জীবন অহরহ মুক্তি ভিক্ষা করছে—সেই জীবনকে তিনি তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে মুক্তি দিয়েছেন। সেই মুক্তি দেওয়ার পর দেখা গেল, এত বড় মুক্তির সংবাদ ইয়ুরোপও পায়-নি। সেখানকার সাহিত্যে যে criticism of life এর কথা শোনা যায়, তা'ও সেখানকার মানুষের মনকে তৃপ্তি দিতে পারেনি। রূপ নিয়ে যা'রা বসেছিল, তা'রা আজ অরূপের সন্ধানে কৃচ্ছ্রসাধন করছে—appearanceএর মধ্যে realকে দেখবার তৃষ্ণায় ছটফট করছে; যে-সাহিত্যের সাধনা বিংশশতাব্দীর প্রাক্কালে ইয়ুরোপে চলেছে, তার মধ্যে সিদ্ধির অমৃতরস এখনো সঞ্চার হয়নি; সংগ্রাম, সমস্যা, সংশয় ও বিরোধের জ্বালাই তার মধ্যে বেশী ফুটে উঠেছে—সে সাধনায় শক্তির পরিচয় আছে, সিদ্ধির পরমানন্দের পরিচয় নেই। তার মধ্যে যে mind এর element আছে, তা যেন philosophical বা scientific,—artistic নয়। শেক্‌স্‌পীয়রের আত্মবিলোপকরা নাটকীয় কল্পনা; গেটের আর্টসাধনা—sweet objectivity; Romantic movement এর প্রবল subbjectivity—কিছুতেই কিছু হ'ল না। Literature of mind, literature of feeling—কিছুতেই আধুনিক মানুষের আত্মার ক্ষুধা মেটাতে পারলে না। সব তাতেই সেই conflict of sense and duty থেকে যায়। Schillerএর সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব—যার সাধনায় তিনি এই দ্বন্দ্বের হাত এড়াবার পন্থা দেখিয়েছিলেন—তা'ও অসম্পূর্ণ রয়ে গেল; সে সাধনায় সৌন্দর্য্যধ্যানে ক্ষণিক মুক্তি পাওয়া যায়, স্থায়ী মুক্তি নেই; তাই, pessimist Schopenhauer শেষকালে বলেছিলেন,—"The Hindu sannyasin shows the way"—তিনিও সত্যসুন্দরের আনন্দমূর্ত্তি দেখেন-নি। ইউরোপের আর্টবাদ নিছক ভোগবাদে পরিণত হ'য়ে, ইংরেজ Oscar Wildeএর wildismএ এসে ঠেকেছে—যাঁর লেখায়, ক্রিটিকদের মতে, সৌন্দর্য্যের Fleurs du Mal বা বিষপুষ্প ফুটে উঠেছে! তারপর রূপের মধ্যে যে অরূপের কথা বলেছি (Maetrlink); appearance এর মধ্যে যে সত্যের সন্ধান চেষ্টার কথা বলেছি (Ibsen-Streindberg) তাই আজও চলেছ। কিন্তু এই যে সব লেখক সত্যের সাধনা করছেন, কেউ বিজ্ঞানবাদী, কেউ mystic—

এঁদের ভিতরেও সত্যকে সুন্দরের মধ্যে ধরে দেওয়ার যে সাহিত্যসাধনা, তা' তেমন স্ফূর্ত্তি পাচ্ছে না। তার কারণ, আমার এই মনে হয় যে, সত্যকে সুন্দরের মধ্যে দিয়ে দেখতে হ'লে একই কালে আত্মস্থ ও আত্মনির্লিপ্ত থাকার যে ক্ষমতা ; subjective ও objective দুই দৃষ্টি মিলে যে দিব্যদৃষ্টি ; 'ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'র যে অবিভক্ত, দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা—সেই আনন্দময় কল্পনা বা আত্মরতির অভাবে। ত্যাগ না করতে পারলে ভোগের বিশুদ্ধতা হয় না; এই বিশুদ্ধ ভোগই সাহিত্যিকের যথার্থ আনন্দ, এই আনন্দের অবস্থা থেকেই আত্মাহ্লাদিনী সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব। জীবনকে সমগ্র ভাবে গ্রহণ করে' সেই অটল আর্টিষ্টের অবস্থায় উঠতে পারবেন যিনি—তাঁর পক্ষেই কেবল যথার্থ Criticism of Life সম্ভব। অতিমাত্রায় আত্মতন্ত্র অথবা অতিমাত্রায় বস্তুতন্ত্র হওয়া, আপনার ভাবেই বিভোর থাকা বা একেবারে আপনাকে বিলিয়ে দেওয়া —এই দুই রকমের কবি-প্রকৃতি এতদিন উৎকৃষ্ট কল্পনার সাহায্যে অনেক কীর্ত্তিই করেছে, রসিক-সুজন তা' থেকে চিরদিন রস পেয়ে এসেছেন, পাবেন-ও। কিন্তু আধুনিক মানুষের মন এ'তে আর তেমন রস উপভোগ করছে না ; সত্যই, কাব্যে Criticism চায়! এখন আমরা কবির কাছে অনেক বড় কল্পনার দাবী করি, সে কল্পনায় সকলদিককে একদিক করে' তোলা চাই।

* * *

সমস্ত বৈচিত্র্য, সমস্ত বিরোধকে একটি অখণ্ড ঐক্যসূত্রে যুক্ত করে', যে কবি—যে সুন্দরের পুরোহিত—দেখাতে পারবেন, তাঁকেই আমরা চাই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনায় এই যোগসাধনার পরিচয় যেমন পাই, এমন আর কোথাও নয়। সুন্দরকে তিনি এমন দিব্য উপলব্ধি করেছেন, যে একেবারে সত্যের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে। তাঁর কাব্যে বাসনা, মোহ, ভ্রম, সংশয়, সংগ্রাম, সব আছে —সত্যসুন্দরের সুরে বেজে উঠবে বলে'। কোনোখানে সেটা presentiment এর মত ; কোনোখানে sensuousness এর অতি-তীব্র অনুরণনে senseই মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে ; কোনোখানে তা' স্পষ্ট, পরিস্কার ; কোনোখানে তা' গানের মধ্যে অসীম অনির্ব্বচনীয় হ'য়ে উঠেছে। সাধক যেমন তাঁর ইষ্টমন্ত্রকে সকল সাধনায় সাধন করতে চান, রবীন্দ্রনাথ তেমনি তাঁর মন্ত্রদৃষ্টিকে প্রকৃত artist এর মত, বহু বিচিত্র তন্ত্রের অধীন করে' সাধনা করে চলেছেন। নিজকে এমন মুক্ত রেখে তাঁর একই মানস-মণিকে সকলদিকে ঘুরিয়ে এমন নব-নব রশ্মিপাত করেছেন,—ভাষায়, ভঙ্গিতে, সুরে—যে বাংলা দেশের অনেক 'ক্রিটিক' তাঁর মধ্যে ভাবের ঐক্য পান না। এই-যে অফুরন্ত সৃষ্টির উৎসব, এই যে এক বাঁশীতে এত সুরের উদ্বোধন, এই যে কবিপ্রাণের উল্লাসময়-বহু বিচিত্র নৃত্যভঙ্গি—একবারও তাল কাটে না, —এ শক্তি আসে কোথা' থেকে? ইয়রোপের আর্টতত্ত্ব, সৌন্দর্য্যসাধনা এ নয়—এ Subjective ও নয়, Objective ও নয় ; এ যা'—তার নতুন করে' নামকরণ করতে হবে, ভবিষ্যতের ক্রিটিকের কাজ তাই।

শ্রীসত্যসুন্দর দাস।

# কাজরী

২৭

* *   * *   * *
*   *   *

অমোদের বিয়ের তারিখ আজ চার বৎসর পূর্ণ হল। যেবার এক-বৎসর পূর্ণ হয়—সেবার উনি উৎসবের কি আয়োজনই না করেছিলেন! ফুলের গহনায় আমায় সাজিয়ে সাজিয়ে, ফুলে-ফুলে বিছানা-ঘর সব একেবারে ছেয়ে ফেলেছিলেন!

দ্বিতীয় বৎসর বার্ষিক উৎসবের তারিখে উনি ছিলেন বিদেশে,—আমি বাপের বাড়ীতে। সারাদিন মনটা বিশ্রী অবসন্ন হয়েছিল। বিকেলে সারা আকাশ জমাট মেঘে ভরে কালো হয়ে এল। সন্ধ্যা হবার আগেই সে কি ভয়ঙ্কর ঝড় উঠল, রাজ্যের ধুলো-বালি উড়িয়ে, দোর-জান্‌লা ভেঙ্গে—তারপর মুষলধারে বৃষ্টি নামল! পথ ঘাট একেবারে জলে জলময় হয়ে গেল। বন্দুকের গুলি খেয়ে পাখী যেমন রক্তাক্ত বুকে ছট্‌ফট্‌ করে' শেষে নির্জীব হয়ে পড়ে, সারাদিনের ছট্‌ফটানির পর রক্তাক্ত মন নিয়ে বিছানায় নির্জীবের মত আমি লুটিয়ে পড়লুম। সেই বৃষ্টির ধারায় আমার মনে আশার ক্ষীণ রেখা-টুকুও ধুয়ে মুছে গেল। বাহিরে বৃষ্টি পড়ছে ঝম্-ঝম্-ঝম্—মনের মধ্যে অশ্রুও তেমনি ঝরে ঝরে পড়্‌ছিল ঝর্-ঝর্-ঝর্! হঠাৎ ককড় শব্দে মেঘ ডেকে উঠল—সাশির কাঁচের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুতের একটা ছুটন্ত হল্‌কা আমায় একেবারে কাঁপিয়ে তুলে দিলে। উঠে বসলুম আমি। বাড়ী রাস্তা সব তখন নিঝুম,—শুধু একটা একঘেয়ে ঝুপ্-ঝুপ্-ঝুপ্-ঝুপ্ শব্দ সেই দারুণ স্তব্ধতার বুকটাকে চিরে চিরে চিরে চিরে ছুটে চলেছিল!

ঘরের মধ্যে আমি একলাই ছিলুম। রাত তখন প্রায় দশটা। হঠাৎ আমার ঘরের দোরটা খুলে গেল—ভাবলুম, দম্‌কা হাওয়ায় বুঝি! হু-হু করে জলো হাওয়া ঘরে ঢুকে পড়ল, যেন এক দৈত্যের সমস্ত প্রাণ-ভিজিয়ে-দেওয়া অট্টহাসির মতই। উঠে দোরটা ভেজিয়ে দিতে যাব, দেখি, উনি! আমি চম্‌কে উঠলুম। এ কি, জেগে আমি স্বপ্ন দেখচি না কি? বারান্দায় আলো জল্‌-ছিল। সেই আলোয় দেখি, স্বপ্ন ত নয়,—না, এ যে স্পষ্ট দেখছি, উনিই। প্রকাণ্ড ভারী বর্ষাতির ওভার-কোটটা গা থেকে খুলে হুকে টাঙিয়ে রাখছেন! আমার মনের সে কি ভাব যে হল তখন, তা বল্‌তে পারিনে। সমস্ত শরীর-মন কেঁপে উঠল—! জুতো খুলে উনি ঘরে ঢুকে পড়্‌লেন,—দোর্‌টা ভেজিয়ে দিয়ে বললেন, -কি গো, অবাক হয়ে গেলে যে!

আমি আঁচল চাপা দিয়ে মুখের হাসি লুকোতে গেলুম। সে হাসি কি লুকোনো যায়? হেসে বললুম,—তুমি?

উনি বল্‌লেন,—হাঁ আমি। কি, মুখে আর কথা সরছে না যে! আমি কে, জানো?

আমি হেসে একেবারে লুটিয়ে পড়লুম। বললুম,—কে?

উনি বললেন—আমি দৈত্য, তোমার প্রিয়তমের মূর্ত্তি ধরে এসেচি! বুঝলে?

তাঁর কাপড়টা চোখে কেমন ভিজে-ভিজে ঠেক্‌ছিল, হাত দিয়ে দেখি, কোঁচা ভিজেই বটে। আমি বললুম,—দৈত্য হও, যে হও,—ভিজে কাপড় ছেড়ে শুক্‌নো কাপড় পরত আগে।—বলেই আমি বাইরে যাচ্ছিলুম। উনি খপ্ করে আমার হাতটা ধরে ফেলে বললেন,—যাচ্ছ কোথায়?

আমি বললুম,—মার কাছ থেকে এক্‌-খানা কাপড় আনিগে।

—কি বলে আনবে?

—যা বলেই আনি না, তোমার সে ভাবনায় কাজ কি?

—আরে দাঁড়াও, আমি যে এসেচি, তা তোমাদের বাড়ীর কেউ জানে না—ঝী কি চাকর অবধি নয়।

—কি রকম?

—না। একটু দূরে গাড়ী থেকে আমি নেমে পড়েছি। তারপর সেই বৃষ্টিতে অন্ধকারে গা ঢেকে তোমাদের বাড়ী এসে ত ঢুকলুম। দেখি,—সদরের ফটক খোলাই আছে—শুধু ভেজানো ছিল। তখন পা টিপে পা টিপে এসে উপরে উঠলুম। তুমিও এ-ঘরে এখন থাকবে না, ভেবেছিলুম। ভেবেছিলুম, এই বৃষ্টির রাতে মার ঘরে বসে সব জটলা পাকিয়ে গল্প করছ!

আমি বললুম,—যদি এ ঘরে আমি না থাকতুম, তাহলে—?

—তাহলে আমি দিব্যি করে এই বিছানাতেই শুয়ে পড়তুম। আর ভোরবেলা কারো ঘুম ভাঙবার আগেই চলে যেতুম। যাবার সময় অবশ্য দু'ছত্র চিঠি লিখে রেখে যেতুম!

আমি বললুম,—বটেই ত! যাও, দেখি, চলে! ভারী ত ক্ষমতা!

উনি বল্‌লেন, যাব,—দেখবে?

আমি বললুম,—বটেই ত!—চলে যাবে! যাও, তুমি ভারি দুষ্টু!

তিনি বল্‌লেন,—কেন, দুষ্টু কিসে?

আমি বললুম,—চলে গেলে দেখা হত না। মা ত বলেছে, এই দুর্য্যোগে একলা শুতে হবে না তোকে, আমার কাছে শুবি আজ।... যাই, মাকে এখন বলে আসিগে, তুমি এসেছ।

উনি বললেন,—আর বলে না! এত রাত্রে এই দুর্য্যোগে এসেছি, কি ভাববেন? তার চেয়ে দু'জনেই এই ঘরে থাকি,—তুমি বরং বলে এসো গে, হোক্ এই বৃষ্টি মা, এই ঘরেই শোব'খন।

আমি বললুম,—যাঃ—

উনি বল্‌লেন,—তোমার বাবা কি ভাববেন? চোরের মত এই দুর্য্যোগে জামাই-চন্দর এসে হঠাৎ উদয় হলেন!

আমি বল্‌লুম—বাবা ত বাড়ী ফেরেনি এখনো। তুমি এসেছ জানলে বাবার মার,—দুজনেরই খুব আহ্লাদ হবে।

উনি বললেন,—কিন্তু আমি যে খেয়ে-দেয়ে এসেছি। সেটা কি খারাপ দেখাবে না? ভাববেন, সম্পর্ক যা-কিছু তোমারই সঙ্গে!

আমি বললুম,—কোথায় খেলে শুনি? কল্‌কাতাতেই বা ফিরলে কবে?

উনি বল্‌লেন,—আজ সকালে ফিরেছি। বৌদি ঠিক বুঝতে পেরেছে। বললে,

কিগো, ২৭শে বোশেখে ঠিক ফিরেছ ত! আমি সে কথা উড়িয়ে দিয়ে বললুম, বটে, আজ ২৭এ বোশেখ না কি? বাঃ, ভারী মিলে গেছে ত! বৌদিকে বলেছি, আমার এক বন্ধু আছে না—বঙ্কিম? তা সেই বঙ্কিমের আজ বিয়ে। সে চিঠি লিখেছিল—তাবে গে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল, আমায় আস্‌তেই হবে। তাই আর কি আস্‌তে হল। আবার কালই চলে যাব।

আমি বল্লুম,—ওঃ, তবে বুঝি বরযাত্রী গিয়ে নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছ!

উনি বল্লেন,—কোথায় বরযাত্রী গেলুম যে নেমন্তন্ন খাব! বঙ্কিম বলে আমার কোন্ বন্ধু কস্মিন কালেও নেই। আহা, এ-সব না বললে হঠাৎ এই আসার কারণটা বোঝাতুম কি দিয়ে?

আমি বল্লুম,—তাহলে খাওয়া হয় নি তোমার?

উনি বল্লেন,—বরযাত্রী সেজে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি বটে, সেই ঝড়ের আগে। তারপর ঐ ঝড়ের সময়টায় এক বন্ধুর বাড়ীতে গেছলুম। তার নাম অবশ্য বঙ্কিম নয়, তার নাম গদাধর। এমন সময় ঝড় এল, বৃষ্টি এল, তখন সেই বন্ধুর বাড়ীতেই খিচুড়ি পাকানো হল—তাই খেয়ে আসচি আমি। সেখানেও কত হুঁসিয়ার হতে হয়েছিল, জানো? বন্ধুর বাড়ী বলে এসেচি, বাড়ী যাচ্ছি,—আর বাড়ীতে সকলে জানে, আমি বরযাত্রী গেছি।

—বেশ!—বলে আমি মার কাছে গেলুম। কথাটা যে কত যা-তা বাজে কথা পাড়ার পর কি কষ্টে বলেছিলুম, তা মনে হলে আজো অবাক হয়ে যাই!

তারপর আর-বছরের কথা। আমি এখানে ছিলুম, উনি ছিলেন তপসীতে। আসতে পারেন নি—তবু একটা ছোট চিঠি পাঠিয়ে ছিলেন। লিখেছিলেন,—আজকের তারিখটিকে মনে রেখো!—ছোট্ট চিঠি, তবু প্রাণ আমার মুগ্ধ হয়ে গেছল। এই দিনটাতে যে বিশেষ করে আমায় মনে করেছেন—এতেই কত খুসী হয়ে ছিলুম।

আর আজ? ঐ সন্ধ্যা হয়ে আসচে! সারাদিন চারিধার ঝলসে দিয়ে সূর্য্য ঐ বড় বাড়ীটার পিছনে লুকিয়ে পড়ছে! একটুও বাতাস বইছে না। চারিধার অম্‌নি গুমট্ হয়ে আছে—আর সমস্ত শরীর দিয়ে কি-রকম্ ঝাঁজ ফুটে বেরুচ্ছে। আজ কৈ, সারাদিনেও ত চিঠি এল না। চিঠি আস্‌বার সময় গেছে। আজ কি একবারও আমায় মনে পড়্‌ল না? আমায় না মনে পড়ুক, আজ আমার এই সোনার চাঁদটির কথা, এই নতুন অতিথির কথা,—এ'ও মনে পড়্‌ল না! এর কথাটাও একবারও মনে পড়া উচিত ছিল ত।

খোকা ঘুমুচ্ছে। খোকার মুখে একেবারে তাঁর ছায়াটুকু কে যেন এঁটে দিয়েছে। মন যখন বড় খারাপ হয়, তখন খোকাকে বুকে চেপে ধরেই কোনমতে নিজেকে খাড়া রাখি। ও যদি না থাকত? ওঃ, তাহলে এই দুর্দ্দিনে দম বন্ধ হয়েই বুঝি মরে যেতুম।

কিন্তু তবুও এতে কতটুকু সান্ত্বনাই বা পাই! শুনেচি, রামচন্দ্র সোনার সীতা গড়ে দুঃখ ভোলবার চেষ্টা করেছিলেন। দুঃখ ভুলে ছিলেন কি না, সে কথা কেউ খুলে বলেনি অবশ্য!

* * *

এই ডায়েরিখানি ভাগ্যে লিখেছিলুম। কত সুখের দিনের কত-কত কথাই যে এতে গাঁথা রয়েছে! পড়ি আর পড়ি,—নিজের সুখের কথা পড়ে দুই চোখ আমার জলে ভরে ওঠে! এখন যেন সে-সব সুখের দিনগুলোকে স্বপ্নের বলে মনে হয়। সে-সব দিন কি আর ফিরবে?

দিদি বলে,—তোর কি হয়েছে; বল্ দেখি! অত যে হাসিখুসি সে-সব তোর গেল কোথায়?

হায় রে, দিদি কি বুঝবে? এ দুঃখ দিদিকে ত কখনো পেতে হয় নি। ভগবান্ করুন, এ দুঃখ তাকে কখনো না পেতে হয়! অতি-বড় শত্রু যে, সে-ও যেন স্বামীর সঙ্গ-ছাড়া কখনো না হয়!

* * *

রাত দশটা। কোন চিঠি এল না ত। ভুলে গেছেন, ওগো আজকের দিনও তিনি ভুলে গেছেন। সকালে বড়ঠাকুরের কাছে চিঠি এসেছে। তিনি ভালো আছেন। ভালোই থাকুন্ চিরদিন। আমি পথের কাঁটা —তাঁর পায়ে ফুটে কখনো যেন তাঁকে এতটুকু ব্যথা না দি!

২৯

ও আমার সোনা, ওরে যাদু, ও আমার মাণিক,—তুই হাস্‌ছিস্! কেন তোর এ হাসি, ধন? কার জন্যে হাসছিস্—কে তোর এ হাসি দেখ্‌বে?

ওরে, তুইই ত নতুন শিকলে বেঁধেছিস্ আমাকে! নাহলে—

তপ্‌সীতে যাওয়া হল না—হবেও না, বোধ হয়। এই রকম ভাবতে ভাবতেই কোন্ দিন মরে যাব! আমার মরাই ভালো। আমি মরে গেলে ওঁর ত আজ আর কোন দুঃখ হবে না—আমার জন্যে উনি এতটুকু অভাবও বোধ কর্‌বেন না ত! আমি গেলে ওঁর যে কোন অভাব হবে না, এই দুঃখই যে আমার সব-চেয়ে বড় দুঃখ গো! এ নারী জন্ম নিয়ে মিথ্যেই পৃথিবীতে এসে-ছিলুম!

কিন্তু না, মরব কি? মরণের পথও বন্ধ যে আজ। খোকা আমার সে পথও বন্ধ করেছে! উঃ—এই বেঁচে মরে থাকা—এ যে কি কষ্টের, যে আমার দশায় পড়েছে, সে ই শুধু জানে।

তপ্‌সীর বাঙ্‌লা তৈরী হয়ে গেছে। খোকা পেটে এল, কাজেই আমার যাওয়া বন্ধ হল। তিনমাস হল, খোকা এসেছে,— ছ'মাসের আগে আমাকে এঁরা সেখানে পাঠাবেন না ত।

তিনি এসে বুঝিয়ে গেলেন,—কষ্ট হবে, অনু লক্ষ্মীটি, আর ক'টা মাস কষ্ট করে এখানে কাটিয়ে দাও। তারপর খোকার ভাত হয়ে গেলেই তোমাদের দুজনকে আমি সেখানে নিয়ে যাব।

তিনি ত এই কথা বলে বেশ হাসিমুখেই চলে গেলেন—কিন্তু এই ক'টা মাস আমি কি করে কাটাই?

খোকা? তাকে নাওয়ানো, খাওয়ানো তাকে দেখা-শোনা—এ-সব কোন কাজই করতে হয় না আমায়! ভাবনা আর ভাবনা —আচ্ছা, তাই ভাবি, অনেকের স্বামীই ত এমন বিদেশে যায়, বিদেশে চাকরি করে, বিদেশে থাকে,—তাদের সকলেই কি এমনি

দিবারাত্রি যাতনার আগুনে পুড়ে সারা হচ্ছে!

* * * *

কাল তাঁর চিঠি আসেনি—একটি লাইনও না। আমার খপর না-ই নিলেন, খোকার খপরও কি নিতে সাধ হয় না? দিনে-দিনে সে কেমন বেড়ে উঠছে—সে কেমন চোখ তুলে চাইতে শিখ্‌চে, সে কেমন হাস্‌তে শিখ্‌চে! রঙীন কাগজের ফুলগুলো দেখে এখন কেমন একদৃষ্টে সে চেয়ে থাকে! দেখে দেখে আমার চোখের নেশা আর কাটে না। রোজ সকালে উঠেই চেয়ে ভাবি, আজ আর-এক-দিনের বড় হল খোকা—দেখি, তার রাঙা ঠোঁটের হাসিতে আবার কি নতুন রঙ ফুটে উঠ্‌ল,—তার চোখের দৃষ্টি আজ আবার কতখানি মধু টেনে আন্‌লে! এ-সবের খপর নিতে তাঁর কি এতটুকু সাধ হয় না! পুরুষ মানুষ এমন কঠিনও হতে পারে! আশ্চর্য্য!

* * * *

৩০

কাল বায়োস্কোপ দেখতে গেছলুম। দিদি বড্ড জেদ কর্‌লে, আমি না গেলে যাবে না, বল্‌লে—কাজেই যেতে হল। নাহলে আমার আর ও-সব ভালো লাগে না। অথচ এই বায়োস্কোপেই যেতে পেলে একদিন—সে কি আহ্লাদ হত! মানুষের মন কখন্ কি চাইবে,—দেবতাও তা বল্‌তে পারেন না, বোধ হয়!

খোকাকে পেয়ে বুব্‌ড়ির ভারী আমোদ। "ভাইটি" কবে তাকে 'দাদা' বলে ডাকবে, কবে তার সঙ্গে এ-ঘর ও-ঘর ছুটোছুটি করবে,—এরি প্রশ্ন তুলে সে অস্থির! ভাইটি দাঁড়াচ্ছে না কেন, চলছে না কেন?—তার ভারী দুঃখ! সে এখন পড়তে শিখেছে, ভাইটির সাম্‌নে যখন-তখন বই এনে বসচে, আর বল্‌চে,—ভাই বল,—

অ-য় অজগর আস্‌চে তেড়ে—
আ-য় আমটি আমি খাব কেড়ে—

তারপরই আব্দার—গ্যাখোনা, কাকি মা—ভাই পড়ছে না!

ভাগ্যে বুব্‌ড়ি আছে, খোকা আছে, না হলে পাগল হয়ে গেছ্‌লুম আর কি!

* * * *

বায়োস্কোপে কেমন ছবিখানি দেখলুম। জোন্‌স্ আর আলিস্—দুটি ছেলে-মেয়ে, দু'জনে কত ভাব। একজন আর-একজনকে ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারে না। রাতদিন বাগানে-বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রজাপতি ধরছে, ফুল তুল্‌ছে, জলে পড়ে সাঁতার কাট্‌ছে—এক-প্রাণ একেবারে। তারপর কত বাধা ঠেলে দুজনের বিয়ে হল—বিয়ের পরই কিন্তু তাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। আলিস্ তার সেলাই, রান্না-বান্না, ঘরের কাজ এই সব নিয়ে দিবারাত্রি ব্যস্ত—আর জোন্‌স্ বেচারী তার মুখের একটা মিষ্টি কথা, ঠোঁটের একটু মিষ্টি হাসির লোভে আশে-পাশে ঘুর্-ঘুর্ করে বেড়াচ্ছে। আলিস্ যখন-তখন ধম্‌কে উঠে বল্‌ছে—ছি, পুরুষমানুষ তুমি, আমার পিছনে কেন? যাও, কাজ-কর্ম্ম করগে যাও না—দুটো পয়সা রোজগারের উপায় দেখগে না! এমনি ধমক-চমক খেয়ে-খেয়ে জোন্‌সের শেষে এমন হল, যে দিনান্তে দু'পয়সা রোজ-গার করে সে ঐ আলিসের বকুনির ভয়ে

আর বাড়ীর ত্রিসীমা মাড়াতে চাইত না। বেচারী যত মদের দোকানে আর জুয়ার আড্ডায় বদমায়েসদের দলে পড়ে থাক্‌ত। সেখানে তার এক প্রণয়িনী জুট্‌ল—সঁরাই-খানার দাসী। সেই দাসীটার সঙ্গে রঙ্গ বেড়ে উঠতে সরাইওয়ালার ভয়ঙ্কর হিংসে হল—তার পর একদিন জোন্‌সের সঙ্গে তার কি সে হাতাহাতি, দাঙ্গা! দাঙ্গার গোলে জোন্‌সের ঘুঁষি খেয়ে সঁরাইওয়ালাটা পড়ে মরে গেল। ফাঁসির ভয়ে জোন্‌স্ একেবারে দেশত্যাগী হয়ে বনে জঙ্গলে চোরের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল—আর আলিস্‌ও তখন জোন্‌স্ মরে গেছে ভেবে দেখে-শুনে একজন বিষয়ী লোককে বিয়ে করে বস্‌ল। তারপর আরো নানান্ ঘটনা ঘটে শেষে একদিন আলিস্‌ও যখন তার সেই বিষয়ী স্বামীর একটা পয়সার হিসাব মেলাতে না পারায় তার জুতো-লাথি খাচ্ছে, তখন ঝড়ের মত কোত্থেকে জোন্‌স্ এসে হাজির। দুজনে দুজনকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারপর আলিসের ঐ বিষয়ী স্বামীটা দোকান দেখতে বেরুলে দুজনে একসঙ্গে পালিয়ে এক পাহাড়ের ধারে চলে এল। পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরণার জল পড়ছে—পাহাড়ের গায়ে নানান্ রঙের ফুল ফুটেছে, আর ওদিকে আকাশের আঁধার কেটে লাল টকটকে সূর্য্য ফুটে বেরুচ্ছে। সেই রঙীন আলোয় আলিস জোন্‌সের ঠোঁটে চুমুর তুলি বুলিয়ে দিলে!

শেষের দিকটা যাই হোক, গোড়ার ব্যাপারটা দেখে অবধি আমার কেবলি মনে হচ্ছে, সত্যি, এ-জগতে ঐ টাকার কারবারটা যদি একদম না থাক্‌ত! দুটো প্রাণের এমন সহজ মেলা-মেশা কেমন স্বপ্নের মিহি সুতো বেয়ে দুটো হৃদয় এক হয়ে দুল্‌তে দুল্‌তে চলেছে—মধ্যে থেকে ঐ টাকা-কড়িই যত অনর্থ বাধিয়ে তুলছে বৈ ত নয়! এরি জন্য এত ছুটোছুটি, এত লাফালাফি, এত মাতামাতি চলেছে! সকাল হল, পুরুষ চল্‌ল, দুটো পয়সার সন্ধানে—আর নারী তাকে খাইয়ে-দাইয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে দিলে,—যাও, দিন-ভোর ভালো করে নিজের গতর খাটাওগে যাও। কেন? না, ঐ টাকায় কত খাবার-দাবার মিলবে, ঐ টাকায় দুজনের বিলাসের কত সামগ্রী কেনা হবে, গহনা, কাপড়-জামা-জুতো, আরো কত কি! তারপর সন্ধ্যার সময় পুরুষ ফিরল, পকেট বাজাতে বাজাতে—নারী এক-মুখ হাসি নিয়ে তাকে অভ্যর্থনা কর্‌লে! টাকাগুলি বাজিয়ে বাজিয়ে গুণে গুণে বাক্সয় তুলে রাখলে। তারপর দুজনের খাওয়া-দাওয়া চুকল, হিসেব-নিকেস চল্‌ল,—কতগুলি এল, কতগুলি যাবে, কতগুলি বাক্সয় থাকবে। তার পর দু'জনে শুয়ে পড়ল—বিশ্রামের জন্যে। আবার কালকের জন্যে তৈরি হতে হবে ত। কাল আবার টাকা আন্‌তে হবে। ধরা-বাঁধা ব্যবস্থা! একচুল তফাত্ হবার জো নেই!

এই যদি মানুষের জীবন, তবে তাদের প্রাণের মধ্যে এত আশা, এত সাধ, এত সোহাগ, এত প্রীতি, এত অনুরাগ—এত রাশি-রাশ স্বপ্ন, সুর, আর হাসি কেন ঢেলে দিয়েছিলে ভগবান্—কেন ঢেলে দিয়েছিলে?

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

# আমাদের অন্ন-সমস্যা

আমাদের জাতীয় জীবনে সমস্যার অন্ত নাই, তবে অন্নসমস্যা যে আমাদের সব চেয়ে বড় সমস্যা তা প্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষী সাবুদ ডাকা নিষ্প্রয়োজন। কারণ উহা আমরা অহরহ হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি। পেটে ভাত না থাকিলে যে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং দুর্ব্বল শরীর যে ব্যাধির আক্রমণ এড়াইবার একান্ত অনুপযুক্ত, সে কথা বুঝাইবার জন্যও বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না—আমাদের দেশে নবাগত ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে এক বৎসরে ৬০ লক্ষ লোকের মৃত্যুর কথাটা একবার স্মরণ করিলেই যথেষ্ট। খাদ্যের পরিমাণ অনুপাতে খাদকের সংখ্যা ঢের বেশী হইলে অন্ন-সমস্যা তো চিরস্থায়ী হইবেই। দেশের পনেরো-আনা লোক জীবনে কখনো পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, এই নিদারুণ ব্যাপার তাই সম্ভব হইয়াছে। তারপর আর একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিবেন দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ঘরের অনেক স্ত্রীলোককে অধিকাংশ দিন একরকম অনাহারেই কাটাইতে হয়, কারণ, হিন্দুর পারিবারিক ব্যবস্থায় বাড়ীর পুরুষদের আহার শেষ হইবার পর অবশিষ্ট যা থাকে তাহাই মেয়েরা আহার করিয়া থাকেন। এবং প্রায়ই অবশিষ্ট কিছুই থাকে না।

এই অন্ন-সমস্যা মিটাইবার অনেক ঔষধ অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন ছেলেদের শিল্পশিক্ষা দাও, কেহ বলেন লাঙল ধর, কেহ বলেন দেশে নিত্য নব নব কল-কারখানা স্থাপন কর। কেহ বলেন দক্ষিণ আমেরিকা বা অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া জঙ্গল কাটিয়া উপনিবেশ স্থাপন কর। এই সব পরামর্শ অনেকটা গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালার মতন। গোড়ার গলদ রহিয়াই গেল—খাদ্যের অনুপাতে খাদকের সংখ্যা কমাও এ পরামর্শ শোনা গেল না। ঘরে যদি আহার্য্য বিরল তবে সন্তানের জন্ম দাও কেন?—এ ন্যায্য প্রশ্ন কেহ করিল না। মোটা বেতনের অসংখ্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত রাখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ যদি প্রজার নিকট নিত্য নূতন কর সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে প্রজারা বোধ হয় বলে তোমার মোটা বেতনের কর্ম্মচারীর সংখ্যা কমাও, উহাদের বেতনের হার কমাও, সর্ব্বপ্রকার বাজে খরচ বন্ধ কর। তাহাতেও খরচ কুলাইতে না পার তখন নূতন কর বসাইয়ো; তার আগে নয়। অভাবের সৃষ্টি করিয়া অভাব মিটাইবার ব্যবস্থার জন্য আকাশ-পাতাল তোলপাড় করা রোগ সৃষ্টি করিয়া ডাক্তারের বাড়ী ছুটাছুটি করার তুল্য। রোগ সৃষ্টি না করিলে তো কোনো বালাই পোহাইতে হয় না। অন্ন-সমস্যা সমাধানের জন্য একশো-এক-রকম উপায় নির্দ্দেশ করা তখনই শোভা পাইবে, যখন প্রাধন উপায়টা—খাদ্যের পরিমাণ অনুপাতে খাদকের সংখ্যার সামঞ্জস্য বিধান—সকলে গ্রহণ করিয়াও সমস্যা মিটাইতে অক্ষম হইবে।

হিন্দুর পক্ষে বিবাহ অবশ্য-করণীয়।

পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা—পুত্র চাই-ই—না হইলে পরলোকে গতি হইবে না! পুত্র পিণ্ড না দিলে "পুন্নাম্নো নরকাৎ"কে ত্রাণ করিবে? ইহলোকের ব্যবস্থায় গোলযোগ ঘটে ঘটুক পরলোকের ব্যবস্থাটা পাকারকম হওয়া চাই! তাই সকল হিন্দুই বিবাহ করে, তা সে অন্ধ খঞ্জ, পঙ্গু, আর দারুণ ব্যাধিগ্রস্তই হউক। অর্থ-উপার্জ্জনে অক্ষম হইলই বা, তা বলিয়া বিবাহ করিবে না! কেন, বাপ দাদা কি সবাই উপার্জ্জনক্ষম ছিলেন? তাঁরা কি বিবাহ করেন নাই! শাস্ত্রের অনুশাসন অমান্য করিয়া নরকের পথ তো আর প্রশস্ত করা চলে না! পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহে না কি ধর্ম্মভাব মোটেই নাই, তাই বোধ হয় সেখানে পুরুষ নিজে যে-ভাবে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত, অর্থাৎ যেমন খায়, যেমন পরে, যেমন বাড়ীতে থাকে এক কথায় যেরূপ আরাম ও সচ্ছলতার মধ্যে সে বর্দ্ধিত হইয়াছে, স্বীয় স্ত্রীপুত্রের জন্য তদনুরূপ ব্যবস্থা করিবার উপযোগী আয়ের সংস্থান না করিয়া বিবাহ করে না। অবিবাহিত জীবনের দুঃখ বা অসুবিধা যদি কিছু থাকে তা সে নিজেই ভোগ করে, সে-দুঃখের জালে আর দশজনকে জড়ায় না। অর্থাৎ যে-দুঃখের নিরোধ তার হাতে সে-দুঃখকে অনাবশ্যক বরণ করিয়া লইয়া সারাজীবন অদৃষ্টকে ধিক্কার দ্যায় না। তারপর যে বিবাহ করে, সে দ্যাখে, তার আয়ের পরিমাণ যা, তাহাতে ছেলেপুলের উপযুক্ত ভরণপোষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে কি না। যদি না হয় তাহা হইলে সে ছেলেপুলের জন্ম যাহাতে না হয় সে সম্বন্ধে সাবধান হয়। ঘরে বাড়তি খাদ্য নাই তাই বাড়তি খাদকেরও সৃষ্টি করে না।

বাংলায় একটা কথা আছে—আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে। অর্থাৎ সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু করিতে যাওয়াটা বিড়ম্বনা। মাসিক ত্রিশ টাকা বেতন পাই, সহসা যদি একটা ঘোড়া কিনিয়া বসি, যে, মাসে দশ টাকার দানা খাইবে; বা কুড়ি টাকা দিয়া একটা বাড়ী ভাড়া করি, তাহা হইলে কেহই বোধ হয় আমার সুবুদ্ধির প্রশংসা করিবে না। বিবাহের বেলাও সেই কথাই না খাটিবে কেন? নিজের প্রয়োজনীয় অন্ন বস্ত্র যোগাড় হইয়া উঠিতেছে না, নিজের আকাঙ্ক্ষিত স্বাচ্ছন্দ্য পাইতেছি না, আবার একটা বিবাহ করিয়া বসি। ফলে বিবাহ-বাসরের রঙীন স্বপ্ন বধূ লইয়া গৃহে ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই উবিয়া যায় এবং প্রতি-দিনের অতি বাস্তব জীবনের শত দারিদ্র্য ও অভাবের মেলায় সাহানার সুর লজ্জায় ও সঙ্কোচে নীরব হয়। তারপর বৎসর না ফিরিতেই মা ষষ্ঠীর কৃপাবর্ষণ আরম্ভ হয় যদিচ মা লক্ষ্মীর কৃপণতা লাঘবের কোনো লক্ষণ দ্যাখা যায় না। ফলে অবস্থাটা যা দাঁড়ায় তা হাস্য-রসিক কবি বর্ণনা করিয়াছেন এইরূপে—ইচ্ছা হয় রে ছুটে পালাই পগারে কি পাহাড়ে!

দীন-দরিদ্র চাষী এবং দিন-মজুরের কথা ছাড়িয়া দিই—মধ্যবিত্ত বাঙালী সম্প্রদায়ের মধ্যে কি দেখিতে পাই? ঘরে স্বামী-স্ত্রীর খাদ্য পরিধেয় নাই অথচ বংশবৃদ্ধিটা বাৎসরিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। ইহার উপর যমজ সন্তান হইলে তো একেবারে সোনায়

সোহাগা! "বিয়ে করলেই পুত্রকন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা"—বঙ্গ-দম্পতী সম্বন্ধে একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, অণুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। জগতের সহিত এই সব দুর্ভাগ্য শিশুর অধিকাংশের পরিচয়-কাল অতি সংক্ষিপ্ত—আসা আর যাওয়া, এই পর্য্যন্ত। যারা কোনো গতিকে টিঁকিয়া থাকে তারা কিরূপে বাড়িয়া উঠে সে কথা নাই বা বলিলাম—অজ্ঞতার নিরানন্দ অন্ধকারে, দারিদ্র্যের কঠিন পেষণে, অনশনের দুঃসহ জ্বালায় ইহারা জীবনে শতবার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। জীবন ইহাদের নিকট বিড়ম্বনা, ধরিত্রীর কোলে জন্ম ইহাদের নিকট বিধাতার অভিশাপ।

এক আত্মীয়কে একবার তাঁর পত্নীর ভগ্নস্বাস্থ্য এবং ছেলেপুলের অবজ্ঞাত অনাদৃত নিরানন্দ জীবনের উল্লেখ করিয়া বংশবৃদ্ধি কার্য্যে ইতি করিতে বলায় তিনি অতি তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিয়াছিলেন—তা আর কি হবে, বিয়ে করলেই ছেলে পুলে হয়! বিবেকবুদ্ধি এবং কর্ত্তব্যবোধ যেখানে নিন্দিত সেখানে এরূপ উদাসীনতার অভাবই অস্বাভাবিক।

উপায় কি? মলথ্যসের ভক্তেরা বলিবেন সুখে স্বচ্ছন্দে স্ত্রীপুত্র প্রতিপালনে এবং তাঁহাদিগকে জীবনে উন্নত হইবার নিত্য নব সুযোগ দানে যাঁরা অক্ষম তাঁরা অবিবাহিত থাকুন। সৌজাত্য-পন্থী (Eugenist) বলিবেন যাঁরা দেহে ও মনে সুস্থ বলিষ্ঠ এবং নীরোগ কেবল তাঁরাই বিবাহ করুন। অন্যে নয়। উন্নত জাতিগঠনের ইহাই একমাত্র উপায়।

প্রথম উপায় অবলম্বন করা অধিকাংশ লোকের পক্ষে সুসাধ্য নয়। কারণ, আহার নিদ্রার ন্যায়, মানুষের পক্ষে, মৈথুনও অপরিহার্য্য। সৌজাত্যপন্থীদের মত ও জনসাধারণের গ্রহণ করা সম্ভব নয়, কারণ, সমষ্টির মঙ্গলের জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করিবার উপযোগী নিঃস্বার্থপরতা ব্যক্তি এখনো লাভ করে নাই।

এ ক্ষেত্রে একটা মধ্যপথ আবিষ্কার করাই শ্রেয়। যারা নিঃস্ব পঙ্গু বা দুরন্ত বা সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত তারা বিবাহ হইতে বিরত থাকুক। অবশিষ্ট যারা বিবাহ করিবে তারা যথাসময়ে করুক। অর্থাৎ বিবাহার্থী স্ত্রী ও পুরুষ শরীরে ও মনে বিবাহের সকল দায়িত্ব গ্রহণের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া ও-কাজে ব্রতী হউক। আমাদের দেশে আজকাল সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের কল্যাণে বরের বয়স কতকটা বাড়িলেও কন্যার বয়স বাড়ে নাই বলিলেও চলে। কন্যার রূপের অভাব বা কন্যার পিতার অর্থাভাববশত বর না জোটায় কন্যার বয়স কখনো কখনো বাড়িয়া যায় এই পর্য্যন্ত।

একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স পার হইলে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বংশবৃদ্ধি করিবার ক্ষমতায় ভাঁটা পড়ে, সেই বয়সে বিবাহ করিলে বংশবৃদ্ধি রহিয়া সহিয়া হয়, 'বন্যা'র মত হইবার আশঙ্কা থাকে না। এ সম্বন্ধে অষ্ট্রীয়ার পণ্ডিত Joseph Korosi বিশেষ গবেষণা করিয়াছেন। প্রায় ৭২০০০ দম্পতীর বিবাহের বয়স, তাঁহাদের সন্তানের সংখ্যা ও জন্মের সময়ের সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পুরুষের ২৫ এবং স্ত্রীলোকের ১৮ বৎসর বয়সের পর হইতে বংশবৃদ্ধি করিবার ক্ষমতায় ভাঁটা পড়িতে-সুরু

হয়। অতএব স্বামী-স্ত্রীর বয়স যত অল্প হইবে বংশবৃদ্ধি হইবার তত বেশী সম্ভাবনা। অর্থাৎ বাল্যবিবাহ-প্রথা অন্ন-সমস্যার একটি বিশেষ কারণ। সমগ্র ভারতবর্ষে, গত ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ বৎসর বয়সের চেয়ে ছোট বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ছিল ১৫৩৫১৮ জন এবং বিবাহিত রমণীর সংখ্যা ছিল ৩০২৪২৫ জন! পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়সের বিবাহিত পুরুষ ও রমণীর সংখ্যা যথাক্রমে দশলক্ষের কিছু কম এবং কুড়ি লক্ষের কিছু বেশী! অন্ন-সমস্যা আমাদের দেশে সংক্রামক হইবে না তো হইবে কোথায়?

সন্তানের জন্মরোধ করা মানুষের সাধ্যাতীত নয়। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে সন্তানের জন্মরোধ করা সম্ভব তাহা যে কোনো ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে উপযুক্ত পুস্তকেরও অভাব নাই। * অধিকাংশ লোক অজ্ঞতার জন্য এবং কেহ কেহ আলস্যবশত এই সব উপায় অবলম্বন করেন না। বংশবৃদ্ধি রোধ করিবার উপকরণ ঔষধ প্রভৃতি সকল বড় ডাক্তারখানাতেই পাওয়া যায়। পুত্র বা কন্যার সমগ্র ভার গ্রহণ করিয়া তাহাকে যথার্থভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে যে চিন্তা অর্থ ও সময় ব্যয় হয় তার তুলনায় এই সব ঔষধাদির মূল্য অতি তুচ্ছ। বংশবৃদ্ধি রোধ করিবার চেষ্টায় কিছুমাত্র লজ্জা নাই—গভীর লজ্জা আছে পিতা হইয়া পুত্রকন্যাকে মানুষ হইবার সুযোগ ও সুবিধা দিবার অক্ষমতায়; নিরন্তর গর্ভধারণের দুঃসহ ক্লেশে জীর্ণশীর্ণ রুগ্না স্ত্রীর প্রতি উদাসীনতায় এবং অক্ষম দুর্ব্বল পঙ্গুর দল সৃষ্টি করিয়া দুর্ভাগ্য দেশকে আরো ভারান্বিত করিয়া তোলায়।

জানি অনেকে আপত্তি তুলিবেন—কাজটা ধর্ম্মসঙ্গত নয়, কেননা ওটা জীবহত্যারই নামান্তর। তাঁরা গোড়াতেই গলদ করেন—যে জীব জন্মাইল না তার আবার মৃত্যু কি? আমি তো সন্তানকে জন্মাইতেই দিলাম না। একদল বলিবেন—কাজটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ, ভগবানের অভিপ্রায় উহাতে ব্যর্থ করা হয়। মানুষ তো যুগে যুগে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া, তাহার উপর জয়ী হইয়া, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা বাড়াইবার জন্য তাহাকে শত কাজে লাগাইয়াছে—ইহাই তো মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরব। মানুষ তো অসহায়ভাবে প্রকৃতির পায়ের তলে মাথা পাতিয়া থাকে নাই। ধরিত্রীর কোলে যেদিন জন্মগ্রহণ করি সেদিন কাপড় জামা জুতা পরিয়া আসি না, কই তাই বলিয়া দিগম্বর বেশে কাহাকেও তো ঘুরিয়া ফিরিতে দেখি না। মুখের উপর যে দাড়ি গোঁফ গজায়, হাত পায়ের আঙুলে যে নখ জন্মে, মাথার উপর যে চুল হয়, সে সব চাঁচিবার কাটিবার এবং ছাঁটিবার জন্য নাপিত ডাকি কেন? ভগবানের

* ১। কন্যাদায়ের প্রতিকার (সচিত্র) K. M. Dass & Co., 75 Shampuker Street, Calcutta.

২। Unemployment and Limitation of Family (Profusely illustrated) Rs, 2-8. K. M. Dass & Co.

৩। Marriage and the Mysteries by C. J. Welon Re. 1-8. Sold by D. B. Taraporevala Sons & Co., 103 Medows Street, Fort, Bombay.

দান বলিয়া তো সেগুলিকে সযত্নে বাড়াইয়া তুলিয়া বনমানুষের রূপ ধারণ করি না। তারপর ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র শীত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত বাড়ী তৈরি করি। প্রকৃতির মুক্ত উদার আকাশ-তলে দাঁড়াইয়া জলেও ভিজিনা, রৌদ্রেও পুড়িনা, শীতেও কাঁপি না। আসল কথা, যাহাতে আমাদের অসুবিধা ঘটে, যাহা আমাদের দৃষ্টি না অন্তরকে পীড়িত করে,সে সমস্ত প্রকৃতির দানকে সযত্নে পরিহার করি।

কেউ হয়তো বলিবেন—ছেলে কি খাইবে পরিবে, কেমন করিয়া মানুষ হইবে, সে চিন্তায় তোমার দরকার কি বাপু? জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি! কথাটা শুনিতে বেশ, কিন্তু ওটা যে একেবারে বাজে কথা, ওর যে এক কাণাকড়াও মূল্য নাই, তা মনে মনে আপনিও জানেন আমিও জানি। তাই যদি হইবে তবে দেশে অহরহ পঙ্গপালের মত লোক মরে কেন?

মহামারী, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, শতেক ব্যাধি নিয়ত দেশের বুকে নৃত্য করিয়া ফিরিতেছে। কোটি কোটি লোক পোকা-মাকড়ের মত মরিতেছে। এই সেদিন পূর্ব্ববঙ্গে ঝড়ঝঞ্ঝায় খণ্ডপ্রলয় ঘটাইল। অমনি শোনা গেল নিরন্ন সর্ব্বহারা হাজার হাজার লোকের হাহা-কারধ্বনি। সভাসমিতি হইতেছে, চাঁদা উঠিতেছে; দুঃস্থের সাহায্যার্থ স্বেচ্ছাসেবকেরা ছুটিতেছে—খুব ভালো কথা। কিন্তু কত চাঁদা তুলিবে? কত জনকে বাঁচাইবে? কতদিন সাহায্য করিবে? জনগণের স্থায়ী মঙ্গল কতটুকু হইবে? নিরন্নের সংখ্যা কি কমিবে? অন্নের জন্ত হাহাকার শান্ত হইবে? গোড়ার গলদ যতদিন না মিটিবে ততদিন কিছুই হইবে না। ভস্মে ঘী ঢালিয়া কি লাভ?

অবশেষে পাঠক-পাঠিকাকে তিনটি প্রশ্ন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি—

(১) পিতা বা মাতার শরীরে বা মনে কোনো সংক্রামক রোগের বীজ নিহিত থাকিলে সেরূপ দম্পতীকে বংশবৃদ্ধি করিতে দিয়া প্রকারান্তরে সমাজ-শরীরে বিষ-বিস্তার কার্য্যে সাহায্য করা হয় না কি? তাহাতে বাধা দেওয়া সকল দেশ-ভক্তের কর্ত্তব্য কি না?

(২) আর্থিক অসচ্ছলতা হেতু কাহারো যদি সন্তানগণকে পুষ্টিকর আহার, পরিচ্ছন্ন বেশ, উপযুক্ত শিক্ষা এবং জীবনে উন্নতি-লাভের সুযোগ প্রদানের ক্ষমতা না থাকে তবে আমাদের সহজবুদ্ধি কি বলে?

(৩) শারীরিক অসুস্থতা বা দুর্ব্বলতা হেতু স্ত্রী যদি সন্তান প্রসব করিতে বা নব-জাত শিশুকে স্তন্যদানে অক্ষম হন তবে তাঁকে সন্তানের জননী হইতে বাধ্য করিয়া তাঁর এবং শিশুর জীবন সংশয় করিলে আমাদের মনুষ্যত্ব কি ধিক্কার দ্যায় না?

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

# ভ্রাতুষ্পুত্রী

১

অন্ধ লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ভ্যাকো ধীরে ধীরে পরিহিত জামাটিতে কর সঞ্চালন করিতেছিলেন; সহসা ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিলেন—"ক্লেয়ার!"

পাশে এক তরুণী বসিয়া কি সেলাই করিতেছিল। সেলাই রাখিয়া বলিল,—"কি বল্‌ছেন, কাকা?"

হতভাগ্য বৃদ্ধ দশবৎসর পূর্ব্বে লোডির যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর গোলায় ডান্‌ পা-খানি হারাইয়াছিলেন; সেই সময় হইতে তাঁহার চক্ষুদ্বয়ও চিরদিনের জন্য দৃষ্টি-শক্তি-হীন হইয়াছিল; সে সময়ে তিনি ছিলেন, সম্রাটের অধীনে একজন সার্জ্জেণ্ট মাত্র।

অনাড়ম্বর ক্ষুদ্র গৃহখানি লেফ্‌টেনাণ্ট ও তাঁহার পালিতা ভ্রাতুষ্পুত্রী ভিন্ন আর কখনও কাহারও দর্শন লাভ করিয়াছিল কি না, বলা দুষ্কর! আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িত ভ্যাকো ভ্রাতুষ্পুত্রীর সান্নিধ্য অনুভব করিয়া বিস্মিত-ভাবে বলিলেন, "ক্লেয়ার, দেখ দেখি, আমার বুকের উপর একটা তালি রয়েছে, না? হাঁ, বুক থেকে কোমর পর্য্যন্ত একটা লম্বা ছেঁড়া যেন সেলাই করে দেওয়া হয়েছে। আমার মনে পড়ে আমরা যখন লোডির কাঁটায়-ভরা ঝোপ ঠেলে অগ্রসর হচ্ছিলাম, তখন আমার জামার এইখানটি ফেঁসে যায়। সেদিনের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ এ একটা গৌরবের জিনিস বটে! কিন্তু পাগ্‌লী, আজ লেফ্‌টেনাণ্ট ভ্যাকো সর্জ্জেণ্ট্‌ সাজবে কেন? তুমি সম্রাট নেপোলিয়নকে আবেদন করলে—তিনি আমার বীরত্বের পুরস্কার-স্বরূপ যেদিন আমাকে লেফ্‌টেনাণ্ট করে পাঠান, সেই দিনই তোমাকে লেফ্‌টেনাণ্টের পোষাক কিনতে বলেছি! সে পোষাক কি তুমি আজ আমাকে পরাও নি?" বৃদ্ধ নীরব হইলেন।

মেরী ক্লেয়ার্‌ কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বৃদ্ধের বুকের কাপড় লক্ষ্য করিলেন। তারপর বলিলেন—"কেন কাকা, আপনি ত লেফ্‌টেনাণ্টের পোষাকই প'রে অছেন।"

ভ্যাকো বলিলেন—"তবে এখানে ছোঁড়ার দাগ কেন? তুমি নিশ্চয় আমার জামা ছিঁড়ে দাও নি!"

মৃদু সহানুভূতির সুরে ক্লেয়ার বলিলেন,—"কাকা, আপনি ভুল করছেন, এই রকম জোড়াদেওয়া থাকিলে কোমরের কাছে জামাটি বেশ দেখায়। আপনি কি জানেন না, এখনকার সমস্ত অফিসার সম্রাটের আজ্ঞায় এইরকম জামা পরতে বাধ্য। এই আঁটসাঁট পোষাকে ফরাসীবীরকে অপদার্থ জার্ম্মাণ আর অষ্ট্রীয়ানদের চেয়েও বহুগুণে কর্ম্মঠ ও সুন্দর দেখায়।"

ভ্যাকো আনন্দিত ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"ঠিক! বাহারের চেয়ে উপকারিতাটাই ভাল! তা তুমি কিছু মনে কর নি বোধ হয়! আচ্ছা, সম্রাট কি সত্যই আজ আমাদের এই ছোট্ট সহরখানি দেখতে আসছেন?"

পিরেনীজ পর্ব্বতের পাদ-দেশে সেণ্ট্‌ জীন

নগর সেদিন রাজ-দম্পতীর দর্শন-আশায় বিচিত্র বেশে সজ্জিত হইয়াছিল। বাহিরের জনারণ্য ও তাহাদের ব্যগ্রভাব হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল—তাঁহাদের আগমনের আর অধিক বিলম্ব নাই। ক্লেয়ার বলিল—"হাঁ, সত্যই আসছেন।" বৃদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"মা, আমাকে একেবারে জানালার পাশে বসিয়ে দাও। আর সাসিগুলা ভাল করে খুলে দাও, যেন প্রভু তাঁর কৃতজ্ঞ ভৃত্যকে শোভাযাত্রার সময়ে দেখতে পান। হাঁ, তিনি আমাকে দেখতে চাইবেন বৈ কি! যিনি অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধকে উচ্চপদ আর তার উপযুক্ত বৃত্তি দেন, তিনি কখনও সেবককে ভুলতে পারেন না!"

কিছুক্ষণ থামিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—"ক্লেয়ার, আজ যদি আমার দু'খানা পা-ই থাকত,—আর, আজ যদি ভগবান আমার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতেন, তবে দেখতে, সম্রাটের নামে এই পঙ্গুর বিকল দেহ কিরকম করে হাজার শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ত। ওঃ! মনে পড়ে সেই এক দিনের কথা,—যেদিন ধূসর বস্ত্রাবৃত ক্ষুদ্রকায় রাজরাজেশ্বরের আজ্ঞায় আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে কামানের মুখে ছুটে গিয়েছিলাম! আর সেদিন ফিরবেনা;—হায়, আজ সে একটা স্বপ্নমাত্র!" কিছুক্ষণের জন্য বিভোরভাবে তিনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—"যাও ক্লেয়ার, তোমার যে নতুন মস্‌লিনের গাউনটা কেনা হয়েছে, সেটা পরে এস! সার্জ্জেণ্টের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে ছিটের পোষাকে মানাতে পারে, লেফ্‌টেনাণ্টের বাড়ীর মেয়েকে তাতে মানায় না!"

ক্লেয়ার ততক্ষণ ঠুন্‌ঠুন্‌ করিয়া কতকগুলি রন্ধনপাত্র নাড়াচাড়া করিতেছিল, এইবার ধীরে ধীরে একটা কাচ-পাত্র পূর্ণ করিয়া ঝোল আনিয়া অন্ধের সম্মুখে ধরিল, বলিল, "কাকা, খেয়ে ফেলুন।" বৃদ্ধ সন্তর্পণে দক্ষিণ হস্তে পাত্রটি উঠাইয়া উৎফুল্ল মুখে পান করিতে লাগিলেন; তাঁহার পালিতা ভ্রাতুষ্পুত্রী তৃপ্তির সহিত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সহসা বাহিরের কোলাহলে ভ্যাকোর চমক ভাঙ্গিল; তিনি বলিলেন, "ক্লেয়ার কৈ, সম্রাট সহরে প্রবেশ করছেন, এখনও তুমি সাজগোজ করলে না?"

ক্লেয়ার বলিল—"এই ত আমি মস্‌লিনের পোষাকই পরেছি। ভ্যাকো হাত দিয়া তাহার পরিচ্ছদ অনুভব করিয়া বলিলেন—"এ কি, এমন শক্ত কেন?" ক্লেয়ার বলিল—"এই পোষাকই যে এখন সম্রাজ্ঞীর পছন্দ।" রাজপথের উভয় পার্শ্বে শত শত ভেরী গভীর গর্জ্জনে বাজিয়া উঠিল। দুর্গশিখর কম্পিত করিয়া কামান হাঁকিল—ক্রম্‌!

পরক্ষণেই সুদীর্ঘ অশ্বারোহীশ্রেণী এক সুশৃঙ্খল যন্ত্রের মতই রণবাদ্যের তালেতালে শিক্ষিত অশ্ব নাচাইয়া নগরের তোরণদ্বার অতিক্রম করিল। তাহাদের পশ্চাতে উজ্জ্বল বেশধারী সেনানায়কগণ গর্ব্বিত দৃষ্টিতে পৃথিবীকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিল! বর্ম্মে, অস্ত্রে, শিরস্ত্রাণে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের দীপ্ত কিরণ পড়ায় একটা বিদ্যুতের ঘূর্ণাবর্ত্ত দর্শকের নয়নকে অন্ধ করিয়া দিল! কি বিশাল এই সৈন্যসংঘ! কি বিরাট তাহাদের আড়ম্বর! লেফ্‌টেনাণ্ট ভ্যাকো উদ্বেগাকুল চিত্তে জানালার পার্শ্বে পড়িয়াছিলেন, সহসা

একটা গম্ভীর শব্দ হইল—"জয় সম্রাটের জয়!" বৃদ্ধ খাড়া হইয়া বসিলেন! তাঁহার মুখখানি হর্ষে বিষাদে এক অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিল। আপনার ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, এ জয়ধ্বনি প্রাণহীন; —আন্তরিক নয়! হায়, তাঁহাদের সেই রণক্ষেত্রের জয়ধ্বনি, আর আজিকার এই ভীতিব্যঞ্জক কোলাহল,—উভয়ে কত প্রভেদ!

ছায়াবাজির মত সৈন্যদল নানাবেশে নানাভাবে অগ্রসর হইল। তাহাদের পশ্চাতে ভুবন-বিজয়ী সম্রাটের রমণীয় রথখানি মন্থর গতিতে চলিতে চলিতে "হোটেল দ্য ফ্রান্সে"র সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুসজ্জিত প্রাসাদের দ্বারে নগরবাসী প্রিফেক্টের গৃহিণী ফুলের এক প্রকাণ্ড তোড়া হাতে দাঁড়াইয়াছিলেন! সম্রাজ্ঞী যোসেফাইন রথ হইতে নামিবামাত্র তিনি সসম্ভ্রমে তাঁহার হস্তে সেইটি প্রদান করিলেন। সম্রাজ্ঞী নম্র হাস্যে সেই ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর, যেন কখনও এরূপ দ্রব্য দেখেন নাই, এমনি ভাবে উহা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন, কর্ণেলপত্নী আপনার বিচিত্র কাশ্মীরী শালখানি দোলাইয়া বন্দীগণকে সঙ্কেত করিলেন। পরক্ষণেই অমনি একশত বালক-বালিকা মিহিসুরে সম্রাটের বিজয়গাথা গাহিতে লাগিল!

সম্রাট অসহিষ্ণুভাবে চারিদিকে চাহিলেন, —সৈন্য এবং সেনাপতি, শিশু এবং বৃদ্ধ সহস্র সহস্র বিস্মিত নেত্র তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে! কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টি নেপোলিয়ন সেখানে আন্তরিক ভক্তি বোধ হয় খুঁজিয়া পাইলেন না। একটা কৃত্রিম বাহ্য আড়ম্বর দেখিতে কি তিনি এতটা শ্রম স্বীকার করিয়াছেন? তাঁহার যে সমস্ত পূর্ব্ব-সেবককে তিনি ইটালী, জার্ম্মাণী, ও বেলজিয়ম প্রদেশ-রক্ষণে নিয়োজিত করিয়া আসিয়াছেন, তাহারা যদি আজ এখানে উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে, ইহাদের ভালো করিয়াই দেখাইত রাজপূজা কাহাকে বলে! আর এই স্পেন-বিজয়ের জন্য আমন্ত্রিত অনিচ্ছাগত প্রাণহীনের দল!—সম্রাট কাহাকে বলে, তাহাই তাহারা জানে না!

নেপোলিয়ন মাটির দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিলেন,—আবার কি মূর্খদিগকে নাচাইয়া তুলিতে পারিব না! জননী ফ্রান্সের বিপদের কর্ণধার! জগতে এই তর্জ্জনীর ইঙ্গিত কোন্ অসাধ্য সাধন না করিতে পারে? সহসা সম্রাট পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন; বক্তৃতা-রত কর্ণেল প্রিফেক্টের কার্য্যে বাধা দিয়া বলিলেন,—"নগরে কোন বৃত্তিভোগী প্রাচীন কর্ম্মচারী আছেন কি, যিনি আমার তরফে ফ্রান্সের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন?"

কর্ণেল মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, —"প্রভু, লেফ্‌টেনাণ্ট ভ্যাকো এই নগরেই বাস করেন।"

সম্রাটের স্বীয় সৈন্যমণ্ডলীর নাম স্মরণ রাখিবার শক্তি অসামান্য ছিল। তিনি-ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"সার্জ্জেণ্ট ভ্যাকো, না, লেফ্‌টেনাণ্ট ভ্যাকো? যিনি অষ্টারলিজের যুদ্ধে আহত হন্?"

"না প্রভু, যিনি লোডির যুদ্ধে খঞ্জ এবং দৃষ্টি-শক্তিহীন হন। সম্রাটের অসীম কৃপায় তিনি এখন বৃত্তি-ভোগী লেফ্‌টেনাণ্ট। বৃদ্ধ তাঁর যোগ্য পুরস্কারই পেয়েছেন!"

সম্রাট ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন—"ভ্যাকো? হাঁ! শীঘ্র তাকে আমার কাছে আনো! কে সে? লেফ্‌টেনাণ্ট ভ্যাকো?"

কর্ণেল বলিলেন—"তিনি চলচ্ছক্তিহীন, অন্ধ, তাঁকে কি করে এখানে আনা যাবে?"

সম্রাট বলিলেন—"আমাকে তবে তার কাছে নিয়ে চল।"

কর্ণেল অগ্রসর হইলেন। বিপুল রাজ-পথ-ব্যাপী জন-স্রোত স্তব্ধ হইয়া সম্রাটকে পথ ছাড়িয়া দিল। ধীর পদক্ষেপে দুই তিনটী প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া নেপোলিয়ন ভ্যাকোর কুটীর-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

২

লেফ্‌টেনান্টের বাতায়নে বাতাসের আগে সংবাদ আসিয়া পৌছিয়াছে,—সম্রাট স্বয়ং তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন! দুই হস্তে ভ্রাতুষ্পুত্রীর করদ্বয় চাপিয়া ধরিয়া তিনি উন্মাদের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্লেয়ার, ওরা যা বলছে তা কি সত্য? বল মা, শীঘ্র বল, সত্যই কি আমার প্রভু আমাকে দেখতে আসছেন?"

বাহিরের দিকে চাহিয়া ক্লেয়ার দেখিল—অদূরে ইউরোপের রাজ-চক্রবর্ত্তী অগ্রসর হইতেছেন।

কম্পিত কণ্ঠে ক্লেয়ার বলিল—"হাঁ কাকা, সত্য!" সেই জনহীন ক্ষুদ্র গৃহে মেরী ক্লেয়ারের বিবর্ণ মুখ কেহ লক্ষ্য করিল না একবার মনে হইল, তাহার জ্ঞান বুঝি লুপ্ত হইয়া আসিতেছে! প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া অসহায়া বালিকা দ্বারের দিকে চলিল।

ভ্যাকোর গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইবামাত্র সম্রাট কর্ণেলকে পশ্চাতে রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মেরী ক্লেয়ার নত হইয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রম অভিবাদন জানাইল। তাহার প্রণাম-ভঙ্গীতে এমন বিচিত্র রমণীয় লালিত্য ফুটিয়া উঠিল যে যোসেফাইনের নব্য শিক্ষিতা সখী-গণের নিত্যদৃষ্ট অস্বস্তিকর অভিবাদনের চেয়ে তাহা বহুগুণে সুন্দর। সম্রাট তাহা লক্ষ্য করিলেন—একটু মুগ্ধও হইলেন। ক্লেয়ার দাঁড়াইয়া উঠিলে নেপোলিয়ন গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "এই বাড়ীটা—?"

দুইবার চেষ্টার পর মেরী ক্লেয়ারের মুখ খুলিল, কম্পিতস্বরে সে বলিল—"লেফ্‌টেনাণ্ট ভ্যাকোর।" চোখ তুলিয়া সে আবার শিহরিয়া উঠিল;—সম্রাট অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাহার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিতেছেন! আবেদনের সুরে ক্লেয়ার বলিল,—"মহামহিম সম্রাট, লেফ্‌টেনাণ্ট ভ্যাকো আপনার জন্য মৃত্যুকে বরণ করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাঁর মত বিশ্বস্ত সেবক—"

অসহিষ্ণুভাবে সম্রাট বলিলেন, "থাম;—তুমি কে?"

মেরী ক্লেয়ারের মুখে একটা রক্তিম আভা দেখা দিল; সে বলিল—"আমি ভ্যাকোর দত্তক ভ্রাতুষ্পুত্রী, সম্রাটের দাসানুদাসী।"

নেপোলিয়ন বলিলেন—"তোমার পিতা?"

তরুণী চমকিয়া বলিল—"লোডির যুদ্ধে সম্রাটের জন্যই নিহত।"

সম্রাট তাহার কথার শেষ পর্য্যন্ত

অপেক্ষা করিলেন না; বাতায়ন-পার্শ্বে বৃদ্ধ অন্ধ যেখানে একাকী উপবিষ্ট ছিলেন, সেই-দিকে চলিলেন। উৎকর্ণ সৈনিকের কর্ণে তাঁহার গুরু পদশব্দ পৌঁছিবামাত্র তিনিও আপন ন্যুব্জদেহ যথাসাধ্য উন্নত করিয়া ললাটে করস্পর্শপূর্ব্বক সামরিক প্রথায় অভিবাদন জানাইলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল, একবার "জয়, সম্রাটের জয়" বলিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠেন; কিন্তু দুর্ব্বলকণ্ঠ সে জয়-নাদ তুলিতে অক্ষম! একটা অস্ফুট চীৎকার ক্ষীণ স্বরে ধ্বনিত হইয়াই অর্দ্ধপথে থামিয়া গেল! নেপোলিয়ন তাহার মূল্য বুঝিলেন। তিনি আরও সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার পশ্চাতে কর্ণেল ও প্রধান সেনানায়কগণ পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সম্রাট ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে পশ্চাৎ ফিরিলেন। তারপর বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তোমার নাম?"

সসম্ভ্রম উত্তর আসিল—"ভ্যাকো।"

"তোমার পদ?"

ভ্যাকো সানন্দে বলিলেন—"আপনার অনুগ্রহে লেফ্‌টেনাণ্ট্।"

নেপোলিয়ন বলিলেন—"আবেদন করেছিলে?"

ভ্যাকো বলিলেন—"আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী আমার হয়ে প্রার্থনা পাঠিয়েছিল। আমিও নিশ্চিন্ত ছিলাম—ভক্ত সেবক অনাহারে মরছে শুনলে প্রভু নিশ্চয় প্রতিকার করবেন। আমি আপনার কর্ম্মচারীদের দয়ায় নির্ভর করিনি—স্বয়ং আপনিই আমার পত্র পেয়েছিলেন। সেইজন্যই বোধ হয় আমার পদোন্নতি আর বৃত্তিভোগ এত সহজে সম্ভব হয়েছে?"

ঘরের এক কোণে ধব্‌ধবে সাদা দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া ক্লেয়ার দাঁড়াইয়াছিল; তাহার বক্ষ দ্রুততালে স্পন্দিত হইতেছিল।

সম্রাট সেদিকে চাহিবামাত্র ক্লেয়ার তাঁহার পানে করুণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখে নেপোলিয়ন ভ্যাকোকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ পোষাক কোথায় পেলে?"

বৃদ্ধ অকুণ্ঠিতভাবে বলিলেন—"আপনার আদেশ পেয়েই 'বেয়ন' নগর থেকে কিনিয়ে আনিয়েছি।"

সম্রাট তাঁহার একটী স্কন্ধের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন—"এটী কি?"

ক্লেয়ার সোজা হইয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধের উভয় স্কন্ধে ছাগলোমের কৃত্রিম ঝালর শোভা পাইতেছিল,—সম্রাট তাহাই পরীক্ষা করিতেছিলেন!

অন্ধ ভ্যাকো বলিলেন—"কেন প্রভু! এই ত লেফ্‌টেনাণ্টের পোষাকে সোনার-ঝালর! আমি দেখতে না পেলেও জরির কাজ বেশ বুঝতে পারছি ত।"

ক্লেয়ার উৎকণ্ঠিতভাবে চাহিয়া আছে,—নেপোলিয়ন তাহা দেখিলেন; একটা ব্যঙ্গের হাসি তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। "বালিকা, লেফ্‌টেনাণ্টের জামা কি এই রকম?"

পুরাতন অস্পষ্ট শোণিতচিহ্নযুক্ত সেলাই-করা সার্জ্জেণ্টের পোষাকটীই! ক্লেয়ার মাথা নত করিল। সম্রাট ভ্যাকোকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রী—?"

বৃদ্ধ বলিলেন—"বড় লক্ষ্মী মেয়ে,—

আমাকে বড় যত্ন করে। আপনার আগমন-উপলক্ষে আমি একটী মস্‌লিনের গাউন তাকে দিয়েছি। আমার দেখবার শক্তি নাই,—আপনি বলুন ত, ওকে ভাল দেখায় না কি ?"

সম্রাট বিস্মিতভাবে বলিলেন—"মস্‌লিন !"

বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে বলিলেন—"মস্‌লিন বৈ কি ! আর তা না হলেই বা চলবে কেন ? লেফ্‌টেনাণ্টের বাড়ীর মেয়ে ত বটে !"

নেপোলিয়ন শুভ্র অল্প-মূল্যের ছিটের পোষাক-পরিহিতা ভীতা মূর্ত্তিটীর পানে চাহিয়া বলিলেন,—"তুমি মস্‌লিনের পোষাক্‌ পরেছ ! চমৎকার ! তোমাদের সম্রাজ্ঞী বড় মস্‌লিন ভালবাসেন—তাঁকে একবার দেখাবে ?"

ক্লেয়ার অভিবাদন করিয়া কহিল,—"আমার সমস্তই আপনার দয়ার উপর নির্ভর করছে। আজ্ঞা করুন।"

পার্শ্বস্থিত সৈনিকবর্গকে অকারণে ভর্ৎসনা করিয়া, দীর্ঘপদক্ষেপে নেপোলিয়ন বালিকার নিকট উপস্থিত হইলেন। গাউনের হাতার কাছে খানিকটা ঝল্‌ঝলে কাপড় আপনার অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—"হাঁ, মস্‌লিনই বটে ! লেফ্‌টে-নাণ্টের ভ্রাতুষ্পুত্রীর উপযুক্ত বেশ !"

ক্লেয়ার বলিল—"সম্রাট, এটা সাদা ছিটের পোষাক, মস্‌লিন নয়।"

সম্রাট বলিলেন—"সে কি ?"

তাঁহার কঠোর মুখের দিকে সরল দৃষ্টি রাখিয়া তরুণী বলিল—"আদেশ করুন ! আমি শাস্তির জন্য প্রস্তুত। সমস্ত দোষ আমার।"

"কি তোমার দোষ ?"

"সম্রাট সমস্তই জান্‌তে পেরেছেন ত ! তবে আর কেন।"

নেপোলিয়ন বলিলেন—"তুমি তবে বলতে চাও—"

ক্লেয়ারের সুন্দর মুখখানি নীল হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল—"আমি বলতে চাই,—অন্ধ, পঙ্গু, অনাহারে মৃতপ্রায় সার্জ্জেণ্ট ভ্যাকোঁর জীবনে কোন অবলম্বন ছিল না। কে তাঁর প্রার্থনা শুনবে ? সহস্র লোলুপ-দৃষ্টি অতিক্রম করে কেমন করে তাঁর আবেদন সিংহাসন-তলে সম্রাটের পায়ে পৌঁছুবে ? প্রভু, সে যে অসম্ভব ! তাই আমি সত্য গোপন করেছি। আমি তাঁকে বলেছি—মহিমাময় সম্রাট তাঁকে বৃত্তি দিয়েছেন। সারা মাস সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করে যে কটী মুদ্রা উপার্জ্জন করি, তাঁকে সম্রাটের বেতন বলে তাই তাঁর হাতে তুলে দি। তাতেই তিনি সন্তুষ্টচিত্তে শেষজীবনের সমস্ত দুঃখ ভুলে আছেন !"

সম্রাট কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"তুমি রমণী, ঘটনাগুলিকে বেশ ছবির মত মনোহারী করে সাজাতে তোমার পার-দর্শিতা আছে। কিন্তু আমি তোমাদের জাতিটাকে ভালরকম চিনি ! যেমন মায়া-জাল ছড়াতে পার, তেমনি কেঁদেও ভাসাতে পার ! বাঃ, এখনও যে চোখে জল নাই ? যোষেফাইন্‌ হলে এতক্ষণ আর রক্ষা ছিল না ! কাঁদো একটু !"

নেপোলিয়ন থামিলেন।—"যাক, চোখের জল পড়ুক বা না পড়ুক, আমার তাতে আসে যায় না। তবে—তুমি মিথ্যাবাদিনী—বৃদ্ধকে তুমি মিথ্যা বলেছ !"

"আমি অস্বীকার করি না, সম্রাট। তাঁর শেষ জীবনের দিনগুলো যাতে সুখ-শান্তির শীতল ছায়ায় অতিবাহিত হয়,—আমি তাই করেছি।"

শ্রোতা জানালার দিকে গিয়া দাঁড়াইলেন। সম্রাজ্ঞী হোটেলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, নিকটে রমণী কেহ নাই বলিলেও হয়। পদস্থ সৈনিকগণ চারিপাশে দাঁড়াইয়া। তিনি আবার তরুণীর দিকে চাহিলেন।

"ভদ্রে, যদি আমি ভ্যাকোকে জানাই—তুমি সাদা কাপড়ের পোষাক পরে আছ ?"

"তবে তিনি বুঝবেন, তাঁর সঙ্গে আমি ছলনা করেছি।"

"যদি আমি সার্জ্জেণ্টকে বলি, তাঁর আবেদন মঞ্জুর করা দূরে থাকুক—আমি তা চক্ষেও দেখি নি ?"

"তবে তিনি বুঝবেন—আমি তাঁকে প্রতারণা করেছি।"

"যদি তাঁকে জানাই—তিনি পুরাতন সার্জ্জেণ্টের জামা পরে আছেন ?"

মেরী ক্লেয়ার বলিল,—"তা হলে প্রভু,—তিনি জানবেন, চিরদিন তিনি সার্জ্জেণ্টই আছেন। তিনি বুঝবেন যে ক্লেয়ার তাঁকে ভালবাসে—তাঁর সকল-যন্ত্রণার ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ বার্দ্ধক্যের একমাত্র একটা গৌরবময় পদ প্রাণপণে কৃত্রিম উপায়েও সে তাঁকে যুগিয়েছে! আরও জানবেন,—সম্রাট তাঁর ভক্ত সেবককে স্মরণ রাখেন না,—তিনি অকৃতজ্ঞ!"

রোষকষায়িত লোচনে নেপোলিয়ন বলিলেন—"তবে তুমি স্বীকার কর—তুমি মিথ্যাবাদিনী ?"

ক্লেয়ার বলিল—"করি।"

"কিন্তু এইটেই কি একমাত্র মিথ্যা ? মিথ্যাবাদিনীর প্রতারণার পথ কি এইখানেই শেষ হয়েছে ?"

মুহূর্ত্তকালের জন্য গৃহ নিস্তব্ধ হইল। বাতায়ন-পথে সম্রাটের মুখে সূর্য্যরশ্মি আসিয়া পড়িল, তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেন। নীল-আকাশের তলে পিরেনীজের ধূম্রাভ শৃঙ্গশ্রেণী থরে থরে উঠিয়া গিয়াছে; কোথাও শুভ্র-তুষাররাশি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। অদূরে হোটেলের মধ্যে তখন পূর্ণমাত্রায় উৎসব চলিয়াছিল।

মেরী ক্লেয়ার উত্তর দিল—"না, আরও আছে।"

সম্রাট বলিলেন—"কি বলিতে চাও, বল!"

রমণী একবার শিহরিয়া উঠিল; তার-পর দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"তার আগে বলুন, আপনি ওঁকে কিছু বলবেন না, ওই হতভাগ্য—"

বাধা দিয়া শ্রোতা বলিলেন—"অবশ্যই বলব!" রমণীর স্পর্দ্ধার কথা ভাবিয়া তিনি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ক্লেয়ার তাহার নীলিমাভ আয়ত নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া কহিল—"একজন অন্ধ পঙ্গু অসহায় বৃদ্ধের জীবন-দীপ এমন নির্দ্দয়-ভাবে নির্ব্বাপিত করতে মহাপ্রাণ সম্রাট কি একটুও বিচলিত হবেন না ?"

জটিল অস্ফুট হাসি হাসিয়া নেপোলিয়ন বলিলেন—"না! যার কাছে কোন উপ-কারের আশা নাই, তার জন্য আমার কিছুমাত্র দুঃখ হয় না, আর তা না হওয়াই স্বাভাবিক!"

রমণী হতাশভাবে এবার দেওয়ালে ভর দিয়া দাঁড়াইল। সম্রাট ক্রূর বর্ব্বরের মত দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতেছিলেন।

সহসা ক্লেয়ার সোজা হইয়া মাথা তুলিল। মধুর হাসি হাসিয়া বলিল—"যাক্, আমি আর কোন কথা ঢাকব না। সম্রাট যদি অনুগ্রহ করে আমার কাহিনী শোনেন, তা হলে সম্ভবতঃ, অপদার্থ রাজগৌরবে স্ফীতদেহ বর্ত্তমান লেফ্‌টেনাণ্টদের স্মরণ করে, এই রাজভক্ত বৃদ্ধের কৃত্রিম পদ অব্যাহত রাখবেন।"

সম্রাট গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"রমণী, তুমি আমাকেও সর্ত্ত-বন্দী করতে চাও? তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা!"

ভর্ৎসিতা স্মিতমুখে অভিবাদন করিয়া বলিল—"না প্রভু, আমার সাধ্য কি আপনাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করি! আমি কেবল একটা বিনিময় করতে চাই! সেণ্ট্‌জীন্ নগরের নিঃসম্পর্ক অসহায় একজন রাজভক্তের প্রাপ্য লেফ্‌টেনাণ্ট পদের বিনিময়ে আমি আমার পরিচয় আপনাকে জানাতে চাই! এতেও কি অন্যায় করা হয়?"

সম্রাটের মুখ প্রশান্ত হইল। তিনি বলিলেন—"কে তুমি?"

তরুণী বলিল—"তাই বলছি। প্যারিস থেকে পালিয়ে আমি এই সেণ্টজীন নগরে এসেছিলাম। উদ্দেশ্য—চলে যাবার জন্য সুযোগ-অন্বেষণ।"

"তবে তুমি একজন দেশত্যাগী—রাজ-দ্রোহী! তারপর? বলে যাও!"

তরুণী অকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"সেদিন শীতের এক হিম-ভরা সন্ধ্যায় চলিতে চলিতে চরণ অবশ হইয়া আসিল। রাত্রির আগমনে তুষারপাত আরম্ভ হইল। অজানা নগরের জনহীন রাজপথে মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া শুইয়া পড়িয়াছি—এমন সময় ভগবান বুঝি দয়া করিলেন। একজন পথচারী অশ্বপালক আমাকে তাহার অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া স্থানীয় কষ্টম হাউসের দ্বারে বসাইয়া দিয়া গেল। কিন্তু সেখানে বিপদের সম্ভাবনা বড় কম ছিল না। আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে চলিলাম। সূচীভেদ্য অন্ধকারে প্রবল ধারে বৃষ্টি পড়িতে-ছিল। পথে পথে পাগলের মত ফিরিলাম, কাহারও দেখা পাইলাম না। অবশেষে বাহির হইতে একটা উন্মুক্ত দ্বার-পথে প্রদীপালোক দেখিয়া আমি সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকিলাম্। ভগবান জানেন—কোন কু-অভিসন্ধি আমার ছিল না। তখন প্রাণের দায়ে একটু আগুন পোহাইবার জন্য—একটু মাথা রাখিবার ঠাঁইয়ের জন্য যে মিথ্যার সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি, এতদিনে তাহা হইতে বুঝি কূল পাইলাম!"

সম্রাট যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। বিস্মিত-ভাবে তীব্রকণ্ঠে বলিলেন—"তারপর?"

তরুণী বলিল—"আমি গৃহমধ্যে আর কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া অগ্নিকুণ্ডের পাশেই বসিয়া পড়িলাম। মনে করিয়া-ছিলাম, প্রত্যূষে শ্রান্তি দূর করিয়া গন্তব্যপথে চলিয়া যাইব। কিন্তু হায়, একঘণ্টা পরে আমার সমস্ত চিন্তা ভিন্ন পথে ঘুরিয়া গেল। দেখিলাম—গৃহের একমাত্র অধিবাসী অন্ধ বৃদ্ধ কাতরভাবে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর আগমন-প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হইয়া আছেন। তাঁহার

পিতার বিবরণ, তাহার বিবরণ—সমস্তই বৃদ্ধের স্বাগত আলাপে জানিতে পারিলাম। বুঝিলাম, সে এই অন্ধের শুশ্রূষা করিতে আসিবে বলিয়া আশা দিয়াছে, কিন্তু আসে নাই। অসহায় বৃদ্ধ সারাদিন উপবাসে কাটাইয়া সম্রাটের নাম স্মরণ করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। একটা নূতন খেয়াল হঠাৎ আমার মাথায় চাপিল। ভাবিলাম, এমন আশ্রয়স্থানের বিনিময়ে এক-জন হতভাগ্যের সঙ্গী হওয়া, তাঁহার দুঃখময় জীবনে একটু সহায়তা করা মন্দ কি! সম্রাট, সেইদিন হইতে প্রাণপণ-যত্নে আপনার এই সেবককে পালন করিতে—"

বাধা দিয়া নেপোলিয়ন বলিলেন—"আর আমারই ছায়ার বসে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে,—বল, বল! থামলে কেন?"

দৃঢ়স্বরে তরুণী বলিল,—"না সম্রাট, আপনার এই ভৃত্যের গৃহে বসিয়া সে পাপ-চিন্তা আমার হৃদয়ে আর কখনও জাগে নাই। তাছাড়া বহুপূর্ব্বেই আমার সকল আশা চূর্ণ হইয়াছে। আমার স্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। হায়, এই রাজ-পূজকের ভক্তি-তরঙ্গে তাঁহার স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রী সাজিয়া অবধি,—অজ্ঞাতনামা প্রতারিকার সমস্ত রাজদ্রোহের সঙ্কল্প যে কখন কোথায় খসিয়া গিয়াছে, তাহা নিজেই জানি নাই!"

সম্রাট অগ্রসর হইয়া ক্রেয়ারের স্কন্ধ স্পর্শ করিলেন। "রমণী, সত্য করে বল, তুমি কে?"

তাঁহার ভ্রূকুটি-কুটিল চক্ষের দিকে চাহিয়া তরুণী বলিল—"আগে বলুন, আমি বন্দী হলেও ভ্যাকোকে কোন কথা বলবেন না?"

ক্রুদ্ধ সম্রাট বলিলেন—"সে চিন্তা আমার! যা বলা উচিত, তা অবশ্যই বলব। মনে রেখো বালিকা, আমার কথায় এখন তোমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে!"

তরুণী হাসিল। "তা জানি, সম্রাট। কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"আমার নাম আপনি জানেন না।"

"আমার সামরিক কর্ম্মচারীরা সে নাম আদায় করবে।"

"আমার কিন্তু তাতে সন্দেহ আছে! সম্রাট, যারা দু'বেলা পথে ঘাটে আমাকে দেখেও ঠিক করতে পারল না, আমি কে—তারা যে দু'দিন যন্ত্রণা দিয়ে আমার নাম জেনে নেবে—এ কি সম্ভব!"

তারপর আরও দুই-পা অগ্রসর হইয়া সম্রাটের কাণের কাছে মুখ লইয়া তরুণী বলিল—"১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারী নগরের পথে পথে যে প্রসিদ্ধ বিজ্ঞাপন দেখা গিয়াছিল, তাহা সম্ভবতঃ এখনও আপনার স্মরণ আছে। পুরুষ বা স্ত্রীলোক—যে রাজদ্রোহী নগরের ষড়যন্ত্রকারীগণকে সেই ঘোষণাপত্র-প্রচারে উত্তেজিত করে—যে এই সংবাদ তাহা-দিগকে জ্ঞাত করিয়া, নগরের বিপুল জনতাকে আপনার শত্রু করিয়া তোলে—আপনার কর্ম্মচারী আজ পর্য্যন্তও তাহার কোন সন্ধান পায় নাই, পাইবার ভরসাও রাখে না। মুঁসে ফক্ অনুমান করিয়াছিলেন—সে এক প্রৌঢ়া রমণী।"

তরুণী নিশ্বাস লইবার জন্য থামিল। ইউরোপের রাজচক্রবর্ত্তী মূঢ়ের মত চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। তাহার মনে হইল,

কুটীরের চারিপার্শ্ব হইতে সশস্ত্র রাজদ্রোহিগণ যেন লাফাইয়া পড়িতেছে; দেওয়ালের গায়ে তাঁহার সমস্ত কলঙ্ক কালো-ছাপার অক্ষরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। ঐ যে ঘরের কোণে লোহার সিন্দুক ঐ যে ছাদের উপর চিমনীর ছিদ্র, উহারাও যেন তাঁহার উচ্ছেদ-সাধন করিতে—তাঁহার সিংহাসন-মূল শিথিল করিতে উদ্যত হইতেছে! তিনি মাথার টুপি খুলিয়া ঘাম মুছিতে লাগিলেন।

ক্লেয়ার বলিল,—"সম্রাট, মুঁসে ফকের চিন্তাশীলতা প্রশংসনীয়; কিন্তু তিনি কি মনে করেন, বয়স না হইলে কেহ কোন মহৎ কাজ করিতে পারে না? হাঁ সম্রাট, আমি তখন এটাকে মহৎ কাজ বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। আমি আমার পুরাতন অভিপ্রায় ছাড়িয়াছি, কিন্তু এখনও সেই সম্ভ্রান্ত প্রাচীন রাজবংশের শোচনীয় পরিণাম ভুলি নাই। একজন অসভ্য কর্সিক যোদ্ধাকে যাহারা নির্ব্বিবাদে সিংহাসনে তুলিতে পারে, তাহারা কোন্ অনুরোধে—কোন্ সাহসে ভ্রাতৃরক্তে দেশের মাটী কলঙ্কিত করিয়াছিল, বুঝিতে পারি না!"

সম্রাটের নয়নে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তিনি বলিলেন—"কর্ণেল, এই প্রগল্‌ভা বালিকাকে বন্দী কর!"

ভীমকান্তি সৈনিকদ্বয় দুইপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। রমণী আদেশের স্বরে কহিল—"সম্রাট, ভ্যাবোর কি হবে কিছু স্থির করলেন কি?"

সম্রাট চিন্তাক্লিষ্ট মুখে রাজপথের দিকে চাহিলেন, তাঁহার হস্তদ্বয় পৃষ্ঠের পশ্চাতে নিবদ্ধ। ইহাকে তিনি কি উত্তর দিবেন? যে বীররমণী শত্রুর করাল-কবলে নৈরাশ্যের অতল সমুদ্রে ঝাঁপ দিবার সময়ও পরের জন্য আবেদন করে, তাহাকে কোন্ শাস্তি দেওয়া সমীচীন?

৩

যোসেফাইন্ সাধারণতঃ পদব্রজে পথে বাহির হইতেন না। কিন্তু সেদিন তাঁহার কি খেয়াল গেল—তিনি সেণ্টজীনের হোটেলে সখীদের থাকিতে বলিয়া, নিজে বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রিফেক্ত-পত্নী হোটেলের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে স্থানীয় দ্রষ্টব্য দৃশ্যগুলি দেখাইতেছিলেন; সম্রাজ্ঞী তাঁহার হাত ধরিয়া রাজপথ বাহিয়া চলিলেন। কিন্তু বেশীদূর যাইতে হইল না। দলে দলে নাগরিকা রমণী, বৃদ্ধ, বালক, শিশু চারিদিক হইতে আসিয়া সেই মহিমময়ী দীর্ঘাকৃতি রাজবনিতাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। যোসেফাইন মধুর হাসি হাসিয়া একটী বালকের পিঠ চাপড়াইলেন, দুই তিনটী শিশুর গাল টিপিয়া দিলেন। তারপর এক দরিদ্রা মাতার ক্রোড় হইতে তাঁহার নাদুস্-নুদুস ছেলেটীকে আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া নাচাইয়া গালে তাহার চুমা দিলেন। মিষ্টস্বরে বলিলেন—"বীরের দেশের বীরপুত্র, লড়াই করতে পারবে ত?" চারিদিকে বিরাট জনসংঘ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। এক প্রচণ্ড সিংহনাদে পথিপার্শ্বস্থ গৃহগুলি যেন থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সম্রাট তাহা শুনিলেন।

সে জয়নাদে কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিল না,—শিশুর শুভ্র হাস্যের মতই তাহা পবিত্র।

নেপোলিয়ন দ্রুতপদে কুটীর ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন; সেখানে সকলে যাহাতে

তাঁহাকে দেখিতে পায় এমনিভাবে দাঁড়াইলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার পানে চাহিল না,—সম্রাট সেজন্য তাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইতেও পারিলেন না। তিনি সেই প্রকাশ্য রাজপথে প্রদীপ্ত সূর্য্যালোকে জন-বন্দিতা রাজলক্ষীকে দরিদ্র শিশুর মুখচুম্বনোদ্যত দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিলেন, তাঁহাতে আর আপনাতে কত প্রভেদ! একজন দেবী—ভক্তের প্রণতি গ্রহণ করিবার জন্য স্বর্গ ছাড়িয়া আসিয়াছেন, আর-একজন শয়তান—বলপূর্ব্বক অনিচ্ছুকের কাছে সম্মানের রাজকর শুধু সংগ্রহ করিতে চাহেন!

সম্রাট ধীরে ধীরে পত্নীর পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। যোসেফাইন্ উদ্বিগ্নভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিলেন, হয়ত এই নির্লজ্জতার জন্য স্বামী তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু সম্রাটের চিরান্ধকার মুখখানি তখন প্রশান্ত। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"কল্যাণি, দেশের প্রকৃত একজন বীর সন্তান দেখতে চাও, একজন অসম-সাহসী যোদ্ধা?—শত্রুর তোপের মুখে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সের নামে আপনার চরণ আর চক্ষু যে বিসর্জ্জন দিয়েছে! সে নিজে চলতে পারে না, তুমি কি তাকে দেখে তৃপ্তিলাভ করতে চাও না?" সম্রাট যোসেফাইনের হাত ধরিলেন। তারপর উৎকর্ণ জনতার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। নারীমণ্ডলী অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে, তাহাদের কোলে এবং অঞ্চলের অন্তরালে আশ্রয় লইয়া শিশুগণ বিস্ফারিত নয়নে তাঁহাকে দেখিতেছে! কেবল কয়েকজন বৃদ্ধ ও যুবা নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহার কথা শুনিবার লোভ ছাড়ে নাই।

নেপোলিয়ন সহজভাবে কহিলেন—"লেফ্‌টেনাণ্ট ভ্যাকোর পেন্‌সন্ তেমন বেশী নয়। তুমি যদি বল,—আমি তাকে আমাদের মঙ্গল-কামনায় ভোজ দেবার জন্য কিছু মুদ্রা বেশী দিতে পারি।"

সম্রাজ্ঞী বিনীতস্বরে উত্তর দিলেন—"প্রভু, যারা ফ্রান্সের জন্য যুদ্ধ করেছে, তাদের আমার সাহায্যে প্রয়োজন কি! সম্রাট বীর,—তিনি অবশ্যই বীরের যোগ্য পুরস্কার তাকে দেবেনই!"

আবার আনন্দধ্বনি আকাশ চিরিয়া জাগিয়া উঠিল। জনতা ধীরপদে অগ্রসর হইয়া রাজদম্পতীকে প্রায় ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। সম্রাটের এবার দুঃখ করিবার কিছু ছিল না; এমন কি দু-একটী অসমসাহসিক শিশু তাঁহার ঝল্‌ঝলে জামাটী স্পর্শ করিতেও ভীত হয় নাই!

সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী ভিড় ঠেলিয়া বৃদ্ধের কুটীরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে গর্ব্বিত সশস্ত্র সৈন্য ও সেনানায়কদিগকে, কর্ণেলকে বা মেজরকে তিনি কোন কথা বলিলেন না; কক্ষের একপ্রান্তে প্রহরীবেষ্টিতা শ্বেতবস্ত্রাবৃতা বন্দিনী যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেইদিকে চাহিয়া স্মিতমুখে বলিলেন—"ভদ্রে, আমি দেখলাম, লেফ্‌টেনাণ্ট—লেফ্‌টেনাণ্ট ভ্যাকোর পক্ষে সম্রাজ্ঞীর কাছে চলে যাওয়া দুঃসাধ্য! তাই, তাঁকে সঙ্গে করে আন্‌লুম, সম্রাজ্ঞী নিজে লেফ্‌টেনাণ্টকে দেখতে এসেছেন।" যোসেফাইন বিবর্ণ-মুখ হতভাগ্যের দিকে সহানুভূতির চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। সম্রাট আবার বলিলেন—"ভদ্রে, সম্রাজ্ঞী যদি জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নাম কি বলব?"

রমণী ভাবিতেছিল—ইহার মধ্যেও কি কোন রহস্য থাকিতে পারে? সম্রাটের প্রশ্নে নতজানু হইয়া সে বলিল—"আপনি যদি আমাকে তাঁর কাছে চিনিয়ে দিতে চান্ তাহলে দয়া করে বল্‌বেন, আমার নাম 'মাদাম্ নয়েরগ্রাঁস্'! আপনার বিশ্বস্তা সেবিকা!"

সম্রাট নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। এই প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের রাজভক্তি ও বিশ্বস্ততার কথা তিনি কেবল কাণে শোনেন নাই,—অনেকবার মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা উপলব্ধিও করিয়াছিলেন। তাহারা প্রজা-হস্তে নিহত হতভাগ্য রাজাকে প্রাণের মত ভালবাসিত, এখন সমগ্র ফ্রান্সের মধ্যে নেপোলিয়নের রাজ-পথে তাহাদের মত তীক্ষ্ণ কণ্টক আর কেহ নাই।

সম্রাট বলিলেন—"আমার বিশ্বস্ত সেবিকা তুমি! হায়, তাহলে জগতে আমার ভীষণতম শত্রু আর কে?"

মেরী ক্লেয়ার বলিল—"আপনি যদি আমার জীবন রক্ষা করেন,—আর লেফ্‌টেনান্টের শেষ জীবনটা তাঁকে শান্তিতে কাটাতে দেন—তবে সম্রাট—আপনাকে অনুতপ্ত হতে হবে না। আমি কৃতজ্ঞ, আপনি যদি কৃপা করেন, তবে ভবিষ্যতে এ উপকার চিরদিন আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রাখব।"

নেপোলিয়ন ধীরে ধীরে করপ্রসারণ করিলে, ক্লেয়ার তাহার সাহায্যে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর উভয়ে ভীত-বিস্মিত সৈন্যশ্রেণী ও সভাসদগণের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন—একেবারে সম্রাজ্ঞীর সম্মুখে গিয়া থামিলেন। যোসেফাইন কোমল-স্নিগ্ধদৃষ্টিতে যুবতীর দিকে চাহিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন; তারপর উভয়ে গৃহের একপ্রান্তে দুইখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন।

সম্রাটের মুখখানি অস্বাভাবিক করুণ হইয়া পড়িয়াছিল। লেফ্‌টেনান্টের স্কন্ধে একটী আশীষ-হস্ত রাখিয়া তিনি বাহিরের জনারণ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। পথের উভয়-পার্শ্বে সুসজ্জিত অশ্বারোহী সেনা সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে। বড় বড় গাছগুলার ছাওয়ায়, শাখায়, নিকটবর্ত্তী সমস্ত গৃহের ছাদে, পথের ধারে অসংখ্য লোক তাঁহার কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছে। গৃহের দ্বারে বাতায়ন পার্শ্বে কয়েকজোড়া চোখ উঁকিঝুঁকি দিতেছে। সম্রাটের সহাস্যমুখ সহসা একটু গম্ভীর হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন—"লেফ্‌টেনান্ট্ ভ্যাকো, আজ যদি আমি তোমার মত কয়েক সহস্রমাত্র যোদ্ধা পেতাম, তবে কাল সমগ্র ইউরোপ আমার রাজছত্রতলে নতশির হ'ত!"

অদূরে উপবিষ্টা রমণীদ্বয় মধুর হাসি হাসিলেন। অভ্রভেদী জয়-রবে উন্মত্ত জন-সংঘ প্রাণভরা আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—"জয়, সম্রাটের জয়!"

শ্রী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

# উচ্চৈঃশ্রবা

( Victor Hugoর অনুসরণে )

প্রাণপণে তার রশ্মি পাকড়ি' ধরিনু পক্ষিরাজে,
পেশীগুলা ফুলে' শিরায় ধরিল গিরা,
অতি দুর্দ্দম উন্মদ বেগ রুদ্ধ করার কাজে
কুঞ্চিত তাল, আঙুলেতে কালশিরা।

* * *

ঐরাবতের মত উঠেছিল সাগর-ফেনার স্রোতে
মহাতেজা সেই দিব্য তুরগবর;
আহার তাহার প্রতিদিন হয় অরুণের হাত হ'তে,
তারার প্রাসাদে, আলোর থালার 'পর।

অতুলন গতি, অমিত মহিমা, কিছুতে মানে না কশ,
ক্রমাগত ধায় উর্দ্ধ আকাশ-পানে,
গভীর-স্বনন হ্রেষারবে ভরি' প্রতিপলে দিক্‌দশ,
গগনের নীল খিলানে সে খুর হানে।

এই অপরূপ অদ্ভুত প্রাণী, চড়িয়া তাহারি 'পরে,
সুরার পাত্র স্বর্গের দিকে ধরি',
তারার শিথায় মশাল জ্বালায়ে লইয়া যে যার করে,
কবিরা সবাই ছোটে বায়ু সন্তরি'।

তারি নিশ্বাসে বহে মৃদুগীতি, গরজয় মহাগান—
সে কি ভয়রাশি, বাসনার সন্তাপ!
পিধান হইতে ঝলসিয়া উঠে তরবারি দ্যুতিমান্,
নৃপতি-হৃদয়ে উলসয় মহাপাপ!

সৃষ্টির শেষ-ভবিষ্যতের প্রলয়ের নীল রাতে,
মৃত্যু, নিরাশা—দুই দানবেরে বহি'
উধাও ছোটে সে,কালো ডানা মেলি' নিসাড় ঝঞ্ঝাবাতে,
চাঁদ নিবে যায় তাহারি আড়ালে রহি'।

অন্ধমুনির রোদনের রবে, ভীমের কঠিন পণে,
যেমন উচিত—নাসা বিস্ফার হয়,
কবি যে-ছন্দে বিশ্বরূপের যেয়ান গীতায় ভণে—
তারি তালে-তালে পড়িছে চরণচয়।

গলিত ফলের উপরে, দেখ, সে নোয়ায় তরুর শাখা,
জননী যেন সে, মৃত সুত লয়ে কাঁদে;
তাহারি কারণে অশোক-কাননে আনন অশ্রুমাখা,
গান্ধারী তাই নয়নে বসন বাঁধে।

কল্পলোকের যাত্রী মহান্! থামেনা অর্দ্ধপথে,
উড়িছে কেশর, সদাই ত্বরিত গতি,
অসম্ভবেরি অতল-পরশ নহিলে সে কোনমতে
অধীর-গমন-শাসনে করে না মতি।

তড়িতের চেয়ে চকিত গমনে ধেয়ে চলে দিশি দিশি,
লোকালোক-গিরি-শিখরে সহসা বসে,
হেম-স্যন্দনে বাহন হয় সে, যখন সপ্তঋষি
প্রহরক্লান্ত, বিবশ তন্দ্রালসে।

মহানীলব্যোমে বিহরে স্বাধীন উদাস অকুতোভয়,
একমুখে ধায় কভু সে মেরুর পানে,
রাশিমেখলার নাগর-দোলায় দোল খেতে সাধ হয়,
ভীমঘূর্ণনে ভয় নাই তার প্রাণে!

করে সে প্রয়াণ উর্দ্ধ আকাশে কুজ্ঝটি ভেদ করি',
উতারিতে চায় অসীম পন্থ শেষে—
অন্ধ-তমস ঘনমসীময় সঙ্কোচে যায় সরি'
হেরিয়া নবীন দিবালোক যেই দেশে।

অবাঙ্মনসগোচর তাহার সেই পথ হ'তে ফিরে',
অতি-অসহন দহন-দৃষ্টি দিয়া
নিরখি' বারেক ক্ষীণপ্রাণ এই মানুষ-কীটানুটিরে
হিম করি' দেয় ভয়-কম্পিত হিয়া।

* * *

অশান্ত বটে, ধরি' তবু তা'য় চালায় আপন পথে,
বহুসাধনায়, কত কবি মতিমান,
মহাগহ্বর পার হ'য়ে যায় চড়ি 'তায় কোনোমতে,
—জ্ঞানী নয় যেথা এক পা'ও আগুয়ান।

জগত-জনের প্রাণমন শুধু তাহারি শাসন মানে,
যম—সেও নমে, হইবারে নির্ভয় ;
তারি প্রাঙ্গণ মার্জ্জন করি' সারাদিন অবসানে
বিদুর নীরবে খুদ-কুঁড়া খুঁটি 'লয়।

প্রাণ চমকিয়া যার পথে কভু দেখা দেয় একবার,
সেজন জীবনে পা[illegible]না সুখের লেশ,
তার দিবসের সকল প্রহরে গোধূলি-অন্ধকার,
প্রাণ জর্জ্জর, নিরাশার নাহি শেষ।

পিঠ থেকে পড়ে' অনেক সওয়ার বহুদূর পশ্চাতে
কোথায় হারায়—ধূলায় ধূসর দেহ।
ক্ষমা সে জানে না, দয়া নাই তার,—ফলে তাই হাতে হাতে
স্পর্দ্ধার ফল—আঁটিতে পারেনি কেহ।

আগুনের-ফুল-ঝল্‌মল্‌-করা বক্ষের দুই পাশ
স্ফুরিত গর্ব্বে, নিজ বিক্রমে ধায় ;
বীর ভবভূতি, শেক্ষপীয়র, কৌশলে ধরি' রাশ
দিয়েছিল বটে কবিতার বেড়ী পায়।

* * *

আমি তবু তা'র ঘুরাইয়া দিনু ভাবনা সে দিশাহারী
—স্বর্গ-নরক, রাজাদের ইতিহাস ;
নিয়ে গেনু তারে—আঁধারবিলাসী অসীম-আকাশচারী—
মাঠে মাঠে যেথা ফুল ফোটে বারোমাস।

নিয়ে গেনু ধরে' মাঠের মাঝারে সুরভি তৃণের পাশে,
যেথায় মধুর প্রভাতে পুলক-ভরা
ফুটিছে-টুটিছে রাখালিয়া-গীতি চুম্বনে কলহাসে,
অমরার শোভা পলকে ধরিছে ধরা।

নিকটে তাহার নদী-তীর-ভূমি, সেথানে লইনু তারে—
যেথায় জনমে সুকোমল পদাবলী,
সুনীল সলিলে কণ্টক শোভে শ্লোকের কমল-হারে,
ত্রিদল ত্রিপদী ফুটে' আছে গলাগলি।

অক্ষিগোলকে বিদ্যুৎ হানি' তরঙ্গে তুরঙ্গবর,
বিদ্যুৎ সে যে খড়্গ-ফলক প্রায়।

সিন্ধুর বুকে ঝড়ের দাপটে গর্জ্জে যেমন ধর—
সেইমত তার পঞ্জর উথলায়।

সে যে হাহা করে, ছুটে' যেতে পুনঃ অজানার উদ্দেশে,
পৃথিবীর মায়া বাঁধন কাটিতে চায় ;
নীলশিখা সম নিশ্বাস তার ফুঁসিছে সর্ব্বনেশে,
চোখে তার তিন-ভুবনের জ্যোতি ভায়।

সুরার সাধক তান্ত্রিক যত নর-নারী অগণন
সেই সাথে সব চীৎকার করি' ওঠে ;
সহসা আকাশে একসারি মুখ গম্ভীর-দরশন—
থির-কটাক্ষ নয়নের পাঁতি ফোটে।

তারকারা এবে জ্বলিতে জ্বলিতে গগনের গম্বুজে
শিহরি' কাঁপিল শুনি' সে আর্ত্তস্বর,
কাঁপে যথা দীপ, রমণী যখন তুলসীর বেদী পূজে,
—থরথরি' হাতে, সন্ধ্যাপবন 'পর।

যতবার রুষি' ঝাপটিল তার দু'পাখা আঁধার-কালো
আঘাতি' অধীর পাংশু আকাশ-গায়,
ততবার তত তারকাপুঞ্জ নিবা'য়ে তাদের আলো,
গভীর আঁধারে অসীমায় ডুবে যায়।

* *

আমি তবু তার কেশরের মুঠি ধরেছিনু দৃঢ় বলে,
দেখাইনু তারে স্বপনের ফুলবন,
প্রকৃতি যেথায় বিলাস-লীলায় মুনিদেরো মন ছলে,
জোনাকীরা জ্বলে শিলাগৃহে অগণন।

দেখাইনু তারে ছায়া-তরুদল সুদূর মাঠের শেষে,
আষাঢ়ের-ধারা-পরশে-রঙীন ঘাস,
নন্দন বলি' বাখানে যে ঠাঁই কবিগণ সবদেশে,
যার গানে তারা বাঁশিতে ভরিছে শ্বাস।

এ হেন সময়ে দেখিলেন পথে কবি-গুরু বাল্মীকি,
শুধালেন, 'বাছা, চলেছ এ কোন্ কাজে ?'
কহিলাম, 'তাত! উচ্চৈঃশ্রবা—এ সেই পৌরাণিকী—
চরাইতে যাই স্বর্গতুরগরাজে।'

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

কালকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

# ভারতী

৪৩শ বর্ষ ]        ফাল্গুন, ১৩২৬        [ ১১শ সংখ্যা

## ধূপের ধোঁয়ায়

( নাটিকা )

### নাট্যোক্ত চরিত্র

সীতা
ঊর্ম্মিলা
মাণ্ডবী
শ্রুতকীর্ত্তি
} অযোধ্যার রাজবধূ।

কুরঙ্গিকা
বিহঙ্গিকা
চঞ্চরীকা
নকুলিকা
} রাজবধূদের প্রধান প্রধান সহচরী।

তন্দ্রাবুড়ী ... ( ওরফে চন্দ্রাবলী ) সুমিত্রার দাসী।

বেত্রবতী ... প্রতীহারিণী।

মালিনী

শবরী

ভাণমতী

যবনী শাস্ত্রী

তরঙ্গিকা
নিপুনিকা
বল্লরিকা
মুকুলিকা
পতঙ্গিকা
সুপর্ণিকা
কপোতিকা
সাগরিকা
আরাত্রিকা
মদনিকা
} পুরবাসিনী তরুণী।

দাসী, মালী, চামর-ধারিনী, করঙ্কবাহিনী, সখীর দল, বধূনাট্যের দল, যবনীর দল।

# প্রথম অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ, শ্রুতকীর্ত্তির আরাম-ঘর। হাতীর দাঁতের পালঙ্কে অর্দ্ধশয়ান মুক্তকেশী শ্রুতকীর্ত্তি; প্রধান সহচরী নকুলিকা তাঁর মুক্তকেশে ধূপের ধোঁয়া দিচ্ছে। সখীর দল ইতস্তত ছড়িয়ে আছে; এদের কারো হাতে চামর, কারো হাতে পদ্মপাতা; কারো বা ধূপদানী, আবার কারো বা মৃণালের মালা।

সখীর দল। (গাইছে)

গায়ে সই সইবে না রোদ
শুকিয়ে নে চুল ধূপদানীতে!
জোছনা নিছিয়ে-নেওয়া
নিছনি তোর মুখখানিতে।
দুপুরে দারুণ রোদে
সারীশুক নয়ন মোদে,
হরিণী হারায় দিশা
মরীচিকার হাত-ছানিতে।

ঝাঁঝি সব ঝাঁঝিয়ে গেছে
সায়রে জলের মাঝে,
ঝাঁঝা রোদ মাথার পরে
মগজে ঝাঁঝর বাজে!
থেয়ে যায় হল্‌কা হাওয়া
হ'ল দায় আরাম পাওয়া
বসুধার বুকের সুধা
ফুরায় রোদের বালাই নিতে!
পলাশের চক্ষু রাঙা
ভ্রমরী ঝিম্‌ঝি গেছে,
দুনিয়ার শুক্‌নো পাতায়
খামোকাই ঘুর লেগেছে!
সারঙের সুর নেমে যায়,
পাপিয়ার তান থেমে যায়,
আকাশের শান্ ঘেমে যায়
চাতক পাখীর কাৎরানিতে!
উশীরের গুচ্ছ কোথা?
মৃণালের কইয়ে মালা?
ঘিরে দে পদ্মপাতায়,—
বাতাসে বিষের জ্বালা!
দিনে রাত ঘনিয়ে আনো,—
ঘরে আজ চুল শুকানো,—
চামরে ঢুলিয়ে নয়ন
ধূপের ধোঁয়ার আম্‌দানীতে।

শ্রুতকীর্ত্তি। (চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে) তোর ধূপদানী সরিয়ে নে, নকুলিকা,... ...কত ধোঁয়া কল্লি দ্যাখ্ দেখি, মাথা ধ'রে গেল।

নকুলিকা। চুল কিন্তু ভিজে রয়েছে···

শ্রুতকীর্ত্তি। তা' থাক্, তুই ধূপদানী সরিয়ে-নে;···ধোঁয়া ক'রেছে দ্যাখনা, যেন গোয়াল-ঘরে সাঁজাল দিয়েছে।

নকুলিকা। সাঁজ না হ'তেই সাঁজাল,··· কসুর হয়েছে!

শ্রুতকীর্ত্তি। দ্যাখ্, নকুলিকা!...

নকুলিকা। এরা সব যে, হুক্কা-হুয়ার দোহার্‌কী সুরু ক'রেছে,...আমি ব'লি সন্ধ্যেই বা হ'ল;···অযোধ্যায় আজকাল দিন-দুপুরে শেয়াল-রাগিনী শোনা যাচ্ছে!...সম্রাট বশিষ্ঠাশ্রমে গিয়ে অবধি এমনি অরাজকই হয়েছে বটে!

শ্রুতকীর্ত্তি। নকুলিকা!...সব সময়ে নকল ভালো লাগে না।

নকুলিকা। আসল মানুষকে ডাকব নাকি?

শ্রুতকীর্ত্তি। আবার!...

নকুলিকা। আবার কই?...এই তো প্রথম বার।···না, না, থুড়ি, ভুল হয়েছে··· দ্বিতীয় বার। তা' আমার উপর চোখ

পাকালে কি হবে? আমি আর কি করব বল? দুপুর রোদ্দুরে, তিন দেউড়ী পার হ'য়ে, চিঠি নিয়ে দৌড়-পাড়াপাড়ি কল্লুম,—তোমার তাঁকে বল্লুম,—চিঠি জরুরি, জবাব চাই। তিনি তখন নিজের তৈরী শতরঞ্জের খেলার ছক পেতে বসেছেন,—খেলাতেই মত্ত, ঘাড় না তুলেই বলা হ'ল, 'তুমি যখন পত্রবাহক তখন চিঠি যে জরুর-ই, তা বুঝতে পেরেছি; কিন্তু জবাব'—এই পর্য্যন্ত ব'লেই ভুরু কুঁচকে বাতাসের গায়ে আল্পনা দিতে লাগ্‌লেন। আমি প্রহর খানেক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলে এলুম।

শ্রুতকীর্ত্তি। উঃ পুরুষ মানুষ কি হৃদয়-হীন!—কি স্বার্থপর, খেলায় মত্ত—চিঠির জবাব দেবার অবসর নেই!—একটু দায়িত্ব-জ্ঞানও কি নেই? সম্রাট নগরের বাইরে, ধূমকেতুর দোষদৃষ্টি কাটাবার জন্যে কুলগুরুর আশ্রমে স্বস্ত্যয়নে ব্যস্ত,—এদিকে এঁরা চার ভায়ে পাঁচ-পরের ভরসায় দুর্গ ছেড়ে কোথায় যে চলেছেন, তা তাঁরাই জানেন, আর ধর্ম্মই জানেন।

নকুলিকা। ( ছোটো গলায় ) মন্দ কি? নতুনতর বন্দোবস্ত, রাজা অমঙ্গলকে রাজ্য থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছেন!—রাজ-পুত্তুররা তাকে নেমন্তন্ন ক'রে ডেকে আন্‌ছেন! অমঙ্গল-বেচারারই মুস্কিল! কার কথা রাখে বল দেখি!

শ্রুতকীর্ত্তি। সঙ্গে নিয়ে যেতে বল্লুম, তা' তো হ'লই না; এমন কি কোথায় যে যাওয়া হচ্ছে তা'ও বলা হ'ল না; লুকোনো হ'ল।

নকুলিকা। কোথাও লড়াই বাধ্‌ল না তো!

শ্রুতকীর্ত্তি। উহুঁ, লড়াই বাধ্‌লে সে কথা চাপা থাক্‌ত না,—চারদিকে সাজ, সাজ পড়ে যেত।

নকুলিকা। তবে? মৃগয়া?

শ্রুতকীর্ত্তি। উহুঁ, সে কথা ঢেকে রাখত না...

নকুলিকা। তবে? আবার বিয়ে নাকি?

শ্রুতকীর্ত্তি। বিচিত্র কি?

নকুলিকা। চার ভায়ের এক সঙ্গে?

শ্রুতকীর্ত্তি। হ'তে পারে,—আমাদের বেলা কি হয়েছিল?

নকুলিকা। না, না, তাও কখনো হয়, এত প্রণয়।

শ্রুতকীর্ত্তি। খুব হয় নকুলিকা, তুই পুরুষ মানুষকে চিনিস নি, ওরা সাপের সঙ্গেও ভাব রাখে আবার ব্যাঙের সঙ্গেও ভাব রাখে। তলারও কুড়োয়, গাছেরও পাড়ে।

নকুলিকা। আমার তো তা মনে হয় না।

শ্রুতকীর্ত্তি। আচ্ছা তোর কি মনে হয় ঠিক কোরে বল্ দেখি।

নকুলিকা। আমার মনে হয় পুরুষ মানুষের মন গানের কলির মতন, কখনো ফাঁকের দিকে গড়ায়, কখনো বা সমের দিকে ঝোঁকে। ভয়ের কোনো কারণ নেই,... ফাঁকের ঘর থেকে দ্বিগুণ ঝোঁকে সমের ঘরেই ফিরে আস্‌বে।...পুরুষ মানুষ...একটু ফাঁকা ভালোবাসে,...মাঝে মাঝে একটু ফাঁকে না যেতে পেলে হাঁপিয়ে ওঠে। ওরা পাখীর জাত...হক্-না-হক্ উড়ে বেড়াতে ভালোবাসে।

শ্রুতকীর্ত্তি। হুঁ, পুরুষ মানুষ পাখীর জাত, ওদের সব ফুর্ত্তির প্রাণ ; আর মেয়ে-মানুষ কুনো বেড়াল, কোণ থেকে নড়তে নেই। (পরিক্রমণ)

নকুলিকা। (ছোট গলায়) না, মাথা বিগড়েছে দেখছি, গোড়ে গোড় দিয়ে দেখা যাক্।

শ্রুতকীর্ত্তি। আমাদের যেন প্রাণ হাঁপায় না, আমাদের ফাঁকায় যাবার দরকার হয় না, যত জোয়ার-ভাঁটা ওঁদের প্রাণে ; আমাদের একটানা গঙ্গা, কেবল ঘর আর ঘর।

নকুলিকা। যা বলেছ আমাদের খালি আরসুলা, টিকটিকি আর মাকোষার সঙ্গে গা-ঘেঁসাঘেসি কোরে ঐ ঘর কামড়েই থাকতে হয়।...

শ্রুতকীর্ত্তি। আমোদ নেই, আহ্লাদ নেই......

নকুলিকা। ফুর্ত্তি নেই......

শ্রুতকীর্ত্তি। ফুর্ত্তি শুধু ওঁদের,—

নকুলিকা। আর আমরা কেবল ছার পোকার মতন বাড়ী কামড়ে পড়ে থাকতে জন্মেছি।

নকুলিকা। (গান)

তফাৎ করিয়া খাসা ওঁরা দূরে চলে যান,
সখীর দল। আমরা বসিয়া থাকি আলতো।
নকুলিকা। দুনিয়াতে ওঁদেরি যা ফুর্ত্তির প্রাণ, সই,
আমরা এসেছি ভেসে, ফালতো।
সখীর দল। মিছাই পরেছি পায়ে আলতা,
নকুলিকা। মিছাই রেঁধেছি গুড় চালতা।
সখীর দল। নালতে ভিজায়ে রাতে,
মিছে ছেঁকে দিই প্রাতে,
নকুলিকা। পোছে নাকো তবু আজ কাল তো।
সখীর দল। ওঁরা সব মর্দ্দ—ফুর্ত্তির কর্দ্দ লম্বা,
নকুলিকা। আমাদের বেলা শুধু রম্ভা।
সখীর দল। অথচ না হ'লে নারী
দিন চলা হ'ত ভারি,
নকুলিকা। হেঁশেলেতে কে উনুন্ জ্বালতো?
সখীর দল। অবলা বলিয়া সই সইরে'
এত অপমান জ্বালা সইরে!
নকুলিকা। নাহি বাঁচি নাহি মরি,
ঝাঁকড়ে জীবন ধরি,
কি হবে উপায় হায় বল্ তা,
সখীর দল। সাথে যেতে কর যদি বায়না,
আবৃত্তিটা কাণে পৌছায় না ;
ভালোবাসা ছিল মিঠে
গোড়াতে পায়েস পিঠে,
নকুলিকা। শেষে কিনা আথুথুথু। পলতা!
সখীর দল। আরসুলা-টিকটিকি রঙ্গে,
কোণ নিয়ে থাকো নারী সঙ্গে,
অশ্বমেধের ঘোড়া
বাইরে ফেরেন ওঁরা,
নকুলিকা। হাঁৎড়ে না মেলে হালচাল্ তো।
সখীর দল। চ'লে যায় পায় পায় পায়রে!
হায় সখী হায় হায় হায় রে!
অবাক্ নয়নে চাই,
ছায়া কায়া ঠাই ঠাই,
সখীর দল। (যেন) খ'সে পড়ে নারিকেল-বালতো!

শ্রুতকীর্ত্তি। নাঃ, কিছুই ভালো লাগছে না।...নকুলিকা, পাল্কী তৈরী করতে বল্... দিদির মহলে যাব।

নকুলিকা। রোসো, রোসো, যেনাই পায়ের শব্দ পাচ্ছি,...কারা আসছে!... (এগিয়ে)...আর পাল্কী ব'লে কি হবে?... তিনি নিজেই আসছেন।

[সীতা, ঊর্ম্মিলা ও মাণ্ডবীর প্রবেশ]

শ্রুতকীর্ত্তি। বা!...দিদি!...তুমি...

তোমরা !... এস, এস,...বেশ !...এই আমি তোমাদের কাছেই যাচ্ছিলুম।

সীতা। কেন, শ্রুতি, মন টিঁকছে না বুঝি ?...এরি মধ্যে ঘর ফাঁকা ঠেকছে ?... তুই হ্যাংলি বোন, এখনো যে ওরা দুর্গের বাইরেও যায় নি।

শ্রুতকীর্ত্তি। না দিদি ঠিক তা নয়...

সীতা। তবে ?

শ্রুতকীর্ত্তি। তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শো আছে,...আচ্ছা, দিনে দিনে এ সব কি ঘটছে ?...এগুলো কি সব উচিত হচ্ছে ?

সীতা। কী গুলো ?

শ্রুতকীর্ত্তি। এইযে আমাদের কাছে লুকিয়ে কোথায় সব যাওয়া হচ্ছে...

সীতা। তা' গেলই বা,...ঘুরে আসুক, চার ভাইয়ে তো প্রায় একঠাঁই হবার সুযোগ হয় না,...আশ মিটিয়ে বেড়িয়ে নিক,...আমরাও চার বোনে মনের আশ মিটিয়ে গল্পগুজব ক'রে নিই, কবে আবার নন্দীগ্রামে চ'লে যাবি।...আবার কবে দ্যাখা শুনো হবে তার ঠিক কি ? যে ক'দিন আছিস্ সে কটাদিন চার বোনে মিলে আযোধ্যাকে মিথিলা ক'রে তোলা যাবে, কি বলিস্ ?

শ্রুতকীর্ত্তি। (নিরুত্তর)

সীতা। চুপ ক'রে রইলি যে ?...ওদের ভায়ে ভায়ে ভাব, আর আমাদের বোনে বোনে বুঝি আড়ি ?

শ্রুতকীর্ত্তি। না দিদি আমার এ লুকোচুরি ভালো ঠেকছে না ;...দশবচ্ছর হোলো বিয়ে হয়েছে, এমন ভাব তো কখনো দেখিনি, আগে তো এ রকম ছিল না।

মাণ্ডবী। ধূমকেতু লো ধূমকেতু, এ-সব ধূমকেতু ওঠার ফল,—এই মধুমাসে অসহ্য গ্রীষ্ম,......

উর্ম্মিলা। আর এই মধুর দাম্পত্য জীবনে তার চেয়েও অসহ্য সংশয়ের গুমট্...

মাণ্ডবী। 'রাহো গৈমেদকং ধার্য্যং কেতৌ মরকতং তথা' শ্রুতি, ভালো চাস্ তো একটা মরকত-মণি ধারণ কর্ ; ও কেতুও যে ধূমকেতুও সে।

উর্ম্মিলা। অশ্বগন্ধার মূল ধারণ কর্‌লেও হয়, আস্তাবলের বাগান থেকে আনিয়ে নে না।

মাণ্ডবী। আস্তাবলের বাগান কেন ?

উর্ম্মিলা। আস্তাবল নইলে অশ্বগন্ধা পাবে কোথায় ?

সীতা। ক্ষ্যাপাকে আর ক্ষ্যাপাস্ নি বোন, ক্ষমা দে।

শ্রুতকীর্ত্তি। না দিদি ক্ষ্যাপা নয়,... আমি স্পষ্ট কথা চাই,...সঙ্গে নিয়ে না যায় বেশ, নিয়ে যেতে হবে না ;...চাই-নি যেতে ; কিন্তু, কোথায় যাওয়া হবে, তা' বল্‌বে না কেন ?

সীতা। তুই কি সন্দেহ করিস্, শ্রুতি ?... আমি করিনি,...কর্‌লে বাঁচতুম না।

শ্রুতকীর্ত্তি। না, ঠিক সন্দেহ নয়।... তবে কি জানো,...এ কি-রকম জানো,...এ যেন নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া।... আচ্ছা, ব'লে গেলে কি হয় ?...আমরা কি যাওয়া কেড়ে নেব ?

সীতা। রাজবংশের মেয়ে হ'য়ে তুই এই কথাটা বল্‌লি, শ্রুতি ?...জানিস্ নে ?... রাজবংশে যাদের জন্ম তাদের কত বিষয়ে

সাবধান হয়ে চল্‌তে হয়?...দুদিন পরে রাজ্যের ভার যাদের মাথায় নিতে হবে, মন্ত্র-গুপ্তি তাদের সাধনার সামগ্রী...সব কথা জানিয়েই যে যেতে হবে তার কি মানে আছে?

শ্রুতকীর্ত্তি। আমি অতশত বুঝতে চাইনে,...স্ত্রী তো স্বামীর ছায়া,...হাঁ কি না, স্ত্রী সর্ব্বদা ছায়ার মতন স্বামীর অনু-গামিনী হবে, আমাদের সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে কেন?...তুমিই বলো,...হয় বল শাস্ত্রের এ কথা ভুয়ো, নয় তো...

মাণ্ডবী। নয় তো, আর কি? চল, সবাই মিলে ওদের রথের অনুগমন করি অর্থাৎ কি না পিছন পিছন ধাওয়া করি...

ঊর্ম্মিলা। যদি ওরা ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করে?...

মাণ্ডবী। তবে ঘোড়ার ল্যাজ ধ'রে সটান্ ঝুলে পড়ি,...অনুগমন তো কর্‌তে হবে,...

শ্রুতকীর্ত্তি। যাওঃ,...আমি সে কথা বল্‌ছিনে।

সীতা। তবে?

শ্রুতকীর্ত্তি। কোথায় যাওয়া হচ্ছে, অন্তত, সেইটে জান্‌তে হবে,...

সীতা। কি ক'রে?

শ্রুতকীর্ত্তি। ফের চিঠি লিখে।

সীতা। বেশ, লেখো।

শ্রুতকীর্ত্তি। সবাই মিলে,...চার বোনে।

সীতা। আমার অত কৌতূহল নেই, তোমরা লেখ।...

ঊর্ম্মিলা। দিদি না লিখ্‌লে আমিও লিখ্‌ব না।

মাণ্ডবী। আমিও না।

শ্রুতকীর্ত্তি। এই ছাখো, দিদি, তুমি না লিখলে কিচ্ছু হবে না;...নারীর ন্যায্য অধিকার দাবী করবার লোকের অভাবে মাঠে মারা যাবে।

সীতা। তুই জ্বালালি,...কি লিখতে হবে, শুনি?

শ্রুতকীর্ত্তি। লিখে দাও না যা' ভাল হয়, তুমি তো বেশ গুছিয়ে লিখতে পারো, লিখে দাও না দু'কলম।

সীতা। না, না, তুই বল্।

শ্রুতকীর্ত্তি। ঐ...ঐকথা,...সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হ'ল না,...কোথায় যাওয়া হচ্ছে তাও বলা হ'ল না। অতএব...

মাণ্ডবী। অতএব,...তোমাদের সঙ্গে আড়ি!
আমরা রইলুম বাড়ি!
আমরা রাঁধব, আমরা বাড়্‌ব,
আমরা খাব পায়েস।
চব্বিশ ঘণ্টার চোদ্দ ঘণ্টা
ঘুমিয়ে করব আয়েস!

শ্রুতকীর্ত্তি। নাঃ তোমাদের দিয়ে কোনো কাজ হবে না, তোমরা খালি ঠাট্টাই শিখেছ। আমি চল্লুম আর্য্যা সুমিত্রার কাছে।

সীতা। না, না, তাঁকে আর জ্বালাস্-নে। আমার মহলে চল্, সেইখানে গিয়ে চিঠি চাপাটি যা মন চায় তাই হবে।

মাণ্ডবী ও ঊর্ম্মিলা। আমি চাপাটি চাই,...চিঠি চাই-নে,...আমি চাপাটির দলে।

(সকলের প্রস্থান।)

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

[ মেয়ে-মহলের দেউড়ী; চন্দন কাঠের প্রকাণ্ড কটক ভেজানো রয়েছে, ফটকের গায়ে নক্সার সূর্য্যমুখী ফুলগুলির ঠিক মাঝে মাঝে মানানসই লোহার গুলো; কাটা দরজাটা ঈষৎ খোলা। বেত হাতে বেত্রবতী পায়চারি করছে। ]

বেত্রবতী। ( খস্‌খসের চৌকো পাখার বাতাস খেতে খেতে ) দেড় ঘটি আঁব-পোড়ার সরবৎ, আড়াই ঘটি মিছরির পানা, আর ঘড়াটাক সরযূর জল !...উদরস্থ হ'ল কি জিবে ঠেকে উবে গেল, তা' ঠিক ধরতে পারলুম না!...কষ্ট ক'রে মুখে ঢাললুম এইটুকুই মনে আছে;...হুঁ, আর মনে আছে ঢক্ ঢক্ বক্-বক্ শব্দ!...উঃ আগুন!...বিধাতা-পুরুষ পবন দেবকে বরখাস্ত কোরে তার জায়গায় অগ্নিদেবকে বাহাল্ করলেন নাকি!... বসন্তোৎসবের আগেই এমন দুরন্ত,—গরম তো জন্মে? কখনো দেখি-নি!...যে দিন থেকে ঝাঁটা-কাঁটা ধূমকেতুটা উঠেছে সেইদিন থেকেই এই অগ্নিবৃষ্টি সুরু হয়েছে!...সুষ্যি গ'লে আগুনের পানা তৈরী হচ্ছে, উঃ আগুন!

[ হাতে চোখ ঢেকে উপবেশন ও তন্দ্রাবেশ ]

নেপথ্যে। হা-আ,...বেম্মোতলায় আগুন লেগেছে!...পায়ের তেলোয় ফোস্কা!...মরে গেলুম মা,...সারা হ'য়ে গেলুম!

[ কাটা দরজার ভিতর দিয়ে গুড়ি মেরে তন্দ্রাবুড়ির প্রবেশ ]

তন্দ্রাবুড়ী। আ-আঃ, ঠাঁইটে বেশ ঠাণ্ডা রে, অন্ধকার কিনা, শ্যাঁতা,...একটু জিরিয়ে নিই মা, জুড়িয়ে নিই,...আহা-হা-হা কাঁকাল্ ...দরদ্...( বেত্রবতীর স্কন্ধে উপবেশন )

বেত্রবতী। ( চম্‌কে উঠে ) কি এ?... অ্যাঁ...কে এ?...রাম, রাম, নেবে বস না,... ঘাড়ের উপর বসবার জায়গা?

তন্দ্রাবুড়ী। অ!—মা! অন্ধকারে দেখ্‌তে পাইনি,—আমি বলি মোড়াটা!...কে? অ! —মা! বেতন্ত দিদি!

বেত্রবতী। আর বেতন্ত দিদি,...দুরন্ত গরমের চোটে নিতান্ত কাহিল অবস্থায় এক পাশে প'ড়ে আছি আমি!...বলি যাওয়া হয়েছিল কোথা?

তন্দ্রাবুড়ী। আর কোথা?...ঐ নক্‌খনের হোতায়;...খেয়ে উঠে সবে পানটি মুখে দিইছি,...সুমিত্তিরে রাণীর হুকুম হ'ল...যা' রাম-নক্‌খনকে নিম্মাল্যি দিয়ে আয়, দিয়ে এলুম,...যাত্রা করে বেরিয়েছে, আর তো ঘর ঢুক্‌বে না, দিয়ে এলুম,...এসে সবে গা গড়াবার গোছ করিছি আবার ডাক পড়্‌ল,... কি সমাচার? না, হাতীর দাঁতের গাছ-কৌটোয় ভুজ্জিপাতার লেখন আছে,...যা', রাম-নক্‌খনকে দিয়ে আয়,...পঞ্চাশটে দাসী রয়েছে,...তা' আর কাউকে দিয়ে বিশ্বাস হবে না,...আমাকেই নিয়ে যেতে হবে,... তা কি করব?...রাজার রাণী...মুখ ফুটে বল্‌লে,...ঠেল্‌তে পারিনে।...কৌটো বার করলুম,...খুলে দেখি অ-মা! দুখানা লেখন,... কোন্‌খানা নিই—কোন্‌খানা থুই, বিষম ফাঁপর,...সুধুতে গেলুম,...তা' রাণী তখন পুজোয় ব'সেছে,...কারে সুধুই কি করি?... তা কৌটোসুদ্ধই নিয়ে গেলুম।

বেত্রবতী। তা বেশ ক'রেছ...বুদ্ধির কাজই ক'রেছ।

তন্দ্রাবুড়ী। তা' আর বল্‌তে! নইলে কি

আবার টানা-পোড়েন করব নাকি...সাতমহল মাড়িয়ে ?...এই রোদ্দুরে ?

বেত্রবতী। তা বই কি, তাতে এই বুড়ো বয়েস...

তন্দ্রাবুড়ী। ( গলা খাঁকার দিয়ে ) না বেতস্ত দিদি আমি বুড়ো হইনি, আমায় রোগে এমন ক'রেছে। তা' যা' বল্‌ছিলুম,...তেতে-পুড়ে কৌটোশুদ্ধ নক্‌খনকে তো দিলুম,...সে আবার কৌটো খুলে দু'খানা চিঠিই রামকে দিলে...তুজনে বিড়বিড় ক'রে পড়্‌লে,...তারপর কি বলাবলি কর্‌লে, ক'রে ট'রে অ-মা! শেষে আমার ওপর তম্বি! তা' বাছা তম্বি কর্‌লে কি হবে ?...বলে—

কোন্ হাঁড়ির কি বৃত্তান্ত।
আমি কি জানি তপ্ত পান্ত ॥

তা' যা' বল্‌ছিলুম, মুখখানা হাঁড়িপানা ক'রে, একখানা লেখন *কৌটোয় ভ'রে নক্‌খন কৌটোটা ফেরৎ পাঠালে,...তাই নিয়ে যাচ্ছি।

বেত্রবতী। তা নিয়ে যাবে বইকি,... নিয়ে যাবে না তো কি ফেলে দেবে,...গরীব লোক, গায়ের রাগ গায়েই মার্‌তে হবে।

তন্দ্রাবুড়ী। ঐ গায়ের রাগ গায়ে মেরেই তো চুলগুলো সব অসময়ে শোণের নুড়ি হ'য়ে গেল,...তা যা বল্‌ছিলুম মা,...দোষ কল্লে সুমিত্তিরে রাণী, আমি খেলুম চোখ-রাঙানি। ...তোমরা রাজার রাণী রাজার ঝি লেখাপড়া জানো, লেখন চিনে আমায় হাতে হাতে বুঝিয়ে দিয়ে পূজোয় বস্‌লেই তো হ'ত,... অ্যাঁ...আবার তাও বলি বাছা,...সুমিত্তিরেরই বা অপরাধ কি ?...ওর কি আর মাথার ঠিক আছে, না মনের ঠিক আছে ?...রাজা গেলেন দেশ ভের্‌মনে, সঙ্গে গেলেন কে না পাট-রাণী কৌশল্যে,...তা যা পাটরাণী যাবে না, যাক্!...আর গেলেন কে না নাটের রাণী কেকই, নইলে যে তিনি গোসা ঘরে ঢুক্‌বেন। ...তিন রাণীর মধ্যে দুজন গেলেন রাজার সঙ্গে,...কেন, আরেকজন কি যেতে জানেনা ? ...সুমিত্তিরে নেহাৎ ভালোমানুষ...মুখ ফুটে কোনো কিছুই বলেনা, তাই যত হেনস্তা তাকে ;...সে একলাটি প'ড়ে রইল ; নইলে বাড়ী আগ্‌লাবে কে ? বউদের সব চরাবে কে ? ঘরে সন্ধে দেবে কে ?...বলি এতে কি আর মানুষের মনের ঠিক্ থাকে ? রাজা আমাদের বুড়ো হ'তে বসেছেন, কিন্তু এক-চোখোমি ঘুচ্‌ল না।

বেত্রবতী। রাজা-রাজ্‌ড়ার কাণ্ড!... আমাদের ও-সব কথায় কাজ কি আয়ি।

তন্দ্রাবুড়ী। না, তাই বল্‌ছি,...বলি নক্‌খন আমার ওপর রাগ কর্‌লে কিনা!... আমি ওরে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছি, ...ওর মা সুমিত্তিরে, তারে হ'তে দেখ্‌লুম,... মানুষ কর্‌লুম,...আমার ওপর তম্বি কর্‌লে,... তা করুক্!

বেত্রবতী। তুমি রাগ করনি তো ?

তন্দ্রাবুড়ী। তা কি পারি বেতস্ত দিদি ? ওদের অকল্যেণ হবে যে ? সুমিত্তিরের ক্ষুদ্ কুঁড়ো নক্‌খন, শিবরাত্তিরের সোল্‌তে, আঁধার ঘরের মাণিক, ওদের তুটিকে নিয়ে সুমিত্তিরে সংসারী হয়েছে, ওদের ওপর আমি রাগ করব ? ( গালে মুখে চড়াতে চড়াতে ) আরে আমার কপাল! আরে আমার কপাল!

বেত্রবতী। না, না, আমিও তো তাই

বল্‌ছিলুম, তুমি কি রাগ্‌তে পার!...বলি হ্যাঁ আয়ি, তোমার গাম্‌ছার কি?

তন্দ্রাবুড়ী। অ-মা! ও সেই কোটোটা আর কটা কাঁচা বেল,...বড় দেউড়ীর দারোয়ানেরা পাড়ছিল কি না,...তাই...চেয়ে আন্‌লুম,...কাঁচা বেল,...পুড়িয়ে খাব।

বেত্রবতী। তা' বেশ ক'রেছ; এখন আমাদের বেল পোড়াই আহার, আর তামাক পোড়াই বাহার।

তন্দ্রাবুড়ী। (আপন মনে) দেখ্‌লুম ঠাউরে ঠাউরে গোটাকতক বেল পেকেছে, তা'...

[ নকুলিকা ও কুরঙ্গিকার প্রবেশ ]।

নকুলিকা। পেকেছে তো পেকেছে, বেল পাক্‌লে কাগের কি?

তন্দ্রাবুড়ী। কে লা?...নকুলি বুঝি,...তুই বড় নকুলে,...তা' হ্যাঁলা, আমি কি কাগ?

নকুলিকা। ষাট্‌! তুমি কাগ হ'তে যাবে কেন? তুমি হ'চ্ছ "কাগ্‌ভুষণ্ডির কাকী, কাকাতুয়া পাখী!"..তন্দ্রা আয়ি, কই, আজকে আমায় পান দিলে না?

তন্দ্রাবুড়ী। ওলো আমার নাম তন্দরা নয়, তন্দরা নয়, আমার নাম চন্দরা, আকাশের চাঁদ...বুঝেছিস্‌?

নকুলিকা। তবে যে সবাই তন্দ্রাবুড়ী বলে?

তন্দ্রাবুড়ী। তা' বুঝি জানিস্‌ নে—(সুরে)

এই, বয়স যখন তিনকুড়ি সাত
ফোক্‌লা দাঁতের কল্যাণে,
তখন, চন্দ্রাবলীই তন্দ্রাবুড়ী
নকুলিকা। গঙ্গাপ্রাপ্তি সজ্ঞানে!
তন্দ্রাবুড়ী। যখন, সবাই চোলে দু'চক্ষু
নকুলিকা। ভুঁয়ে, না গড়াতেই ঘড়র্ ফুঃ!
তন্দ্রাবুড়ী। তখন, নতুন নতুন আখ্যা নিতুই
নাৎনী-নাতির ব্যাখ্যানে।

নকুলিকা। তা বাপু, নাৎনী নাতির দোষ কি?...সব বয়সে মানায়, সকল বয়সে মানে হয়, তাকেই তো বলি নাম। বাপ মায়ে সে রকম নাম রাখে না কেন? তা রাখা হয় না; নাম কি? না কুসুমিকা, অরুণিকা, মদনমোহিনী। কুসুমিকা যখন বোঁটাসারিকা তখনো কুসুমিকা! অরুণিকা যখন আম্‌সী-গালিকা তখনো অরুণিকা!...মদনমোহিনী যখন যমদূতেরও মন মোহন করতে পারেন কিনা সন্দেহ, তখনো নাম জিজ্ঞাসা করলে বলতে বাধ্য হবেন সেই মদনমোহিনী!

তন্দ্রাবুড়ী। এত রঙ্গও জানিস্‌ তুই!

নকুলিকা। রঙ্গ?...কই, ঠোঁটে একটুও রং নেই,...তুমি পান দিলে না, তন্দ্রাবুড়ী!

কুরঙ্গিকা। খবর্দ্দার আয়ি! ওকে দিয়ো না, তোমায় বুড়ী বলেছে।

নকুলিকা। থুড়ি, তন্দ্রাবুড়ী নয়, তন্দ্রা আয়ি,...না, না, চন্দ্রা আয়ি,...এইবার দাও।

তন্দ্রাবুড়ী। তুই সেই পানের গানটা বল্‌, নইলে দেব না।

নকুলিকা। তুমি দাও আগে...

তন্দ্রাবুড়ী। তুমি গাও আগে...

নকুলিকা। (হাত পাতিয়া) আচ্ছা ডান হাত বাঁ হাত...

কুরঙ্গিকা। আচ্ছা, আমি মীমাংসা করে দিচ্ছি; তুমি তান ছাড়, আর তুমি পান ছাড়, হাঁ!...এইবার বিচারকের বেতন...হাঁ!

নকুলিকা। ( পানের খিলি হাতে নিয়ে )

( গান )

পাহাড়ে ছিল এলাচ, লঙ্গ পার-ঘাটে।
কুরঙ্গিকা। লালচে রাঙা ঠোঁটের জুট্‌ল এক হাটে।
নকুলিকা। ছিল যে চুণ-ভাটিতে,—
কুরঙ্গিকা। খয়েরের বাগানটিতে,—
উভয়ে। সুপারির সঙ্গে তারাও ফন্দী কি আঁটে।
নকুলিকা। মিলে শেষ পান-খিলিতে,—
কুরঙ্গিকা। রূপসীর বালাই নিতে,—
উভয়ে। লিখে যায় রঙীন লেখা হাসির কপাটে।
নকুলিকা। মধুরে মধুর ক'রে
কুরঙ্গিকা। সুবাসে যায় রে ভ'রে
উভয়ে। মিঠে খাল কি মন্তরে নাচায় একনাটে।

কুরঙ্গিকা। তুই যাবি, না, আম্রির সঙ্গে সারাদিন রঙ্গ করবি?···বেলা গড়িয়ে গেল... এর পর গেলে কুমারদের সঙ্গে খাওয়াও হবে না,...চিঠিও দেওয়া হবে না।...তিন দেউড়ী পার হয়ে যেতে হবে, মনে থাকে যেন।

নকুলিকা। রোস্‌ না ভাই, একটু জিরোই,···আমার বড্ড গা' টিস্‌টিস্‌ কর্‌ছে।

কুরঙ্গিকা। অ! বটে! আমারও বড্ড হাত নিস্‌পিস্‌ করছে ( কিল )।

নকুলিকা। যা' না,...স্থাখ্‌, রাগালে কিন্তু এখ্‌খুনি গালাগালি কর্‌ব...

কুরঙ্গিকা। গালাগালি?...কি রকম গালাগালি ভাই!...যেমন হাতে হাতে হাতা-হাতি, চুলে চুলে চুলোচুলি, গলায় গলায় গলাগলি,...তেম্‌নি ধারা নাকি?

নকুলিকা। হুঁ হুঁ!

কুরঙ্গিকা। না, না,···খবরদার!... চাল্‌তার মতন গাল তোর,...খবরদার!

নকুলিকা। তা' বই কি!

কুরঙ্গিকা। খবর্দ্দার! চাল্‌তা আমি মোটে ভালোবাসি না,...চাল্‌তার অম্বল অব্‌ধি ছুঁই না;...খবর্দ্দার...চাল্‌তা গালে গালাগালি করোনা, কিন্তু...ভালো হবে না, বল্‌ছি; এই খবরদার, এই!... খবরদার! এই—

( প্রস্থান )

নকুলিকা। ( যেতে যেতে ) বেত্রবতী! আমাদের দেউড়ীগুলো পার ক'রে দিয়ে যাও, আমরা রাজকুমারদের চিঠি দিতে যাচ্ছি।

( প্রস্থান )

বেত্রবতী। নাঃ-আবার এই রোদ্দুরে ভোগালে।

( প্রস্থান )

তন্দ্রাবুড়ী। ( গাম্‌ছায় জিনিস গুছিয়ে নিতে নিতে ) যাই আমিও যাই, একলাটি হেতায় কি করব।

( প্রস্থান )

নেপথ্যে। আরে দূর,...আরে ছেই,··· আরে দূর,...কোন্‌ দিক সাম্‌লাই,···দূর হ', দূর হ', দূর হ',...ঐ যাঃ!

[ তন্দ্রাবুড়ীর পুনঃপ্রবেশ ]

তন্দ্রাবুড়ী। নিয়ে গেল, নিয়ে গেল, মাথা খেলে আমার!···অ বাপু কিষ্কিন্ধেবাসী, অ হনুমান!...ও গাছ-মোণ্ডা নয়...ও হাতীর দাঁতের গাছ-কৌটো...ও খাওয়া যায় না রে খাওয়া যায় না,...দিয়ে যা,...কি আপদেই পড়্‌লুম গা,···অ বেতস্ত দিদি!...মুখপোড়া বেল নিলে না, আমার মাথা খেতে কৌটো নিয়ে পালালো,...দিয়ে যা রে দিয়ে যা···বলি, অ হনুমান্‌...অ কিচ্‌কিন্ধে!...অ মুখপোড়া!

( প্রস্থান )

## তৃতীয় দৃশ্য

[ হাওয়া-মঞ্জিল, চারিদিকে শ্বেতপাথরের জালি; একদিকে একটা মস্ত মালতী লতার গাছ লতিয়ে উঠে চাঁদোয়া রচনা করেছে। ছোটো মাটির কুণ্ডায় জুঁই ফুলের গাছ। শ্বেতপাথরের বেদীর উপর সীতা, উর্ম্মিলা ও মাণ্ডবী উপবিষ্টা, কাছে বিহঙ্গিকা। ]

বিহঙ্গিকা। গান—

কুঁড়ি ওই পাথ্‌না মেলে!—
পাপ্‌ড়ি ব'লে ভুল কর' না!
দেছে শুধ্‌ পাথায় ভ্রমর,
তাই বুঝি ফুল উদাস-মনা!
বাঁধা যে আছে বোঁটায়,—
ভুলে যায়,—পরাণ লোটায়;—
কেঁদে কয় বন্ধু! আমায়
শেখাও দূরের আনাগোনা।
মিনতি হ'ল মিছে, চায় না পিছে, ভ্রমর মোটে,
করে ফুল আথাল্‌-পাথাল্‌ উতল হাওয়ায় মাথা কোটে!
খুলে যায় বোঁটার বাঁধন,—
বুঝি বা ঘুচ্‌ল কাঁদন;
না রে না,—হর্ষে বিষাদ,—
ধুলায় লোটায় চাঁদের কোণা।

সীতা। ফুলের দুঃখু তার সঙ্গী চলে গেল, সে সঙ্গে যেতে পেলে না, বেচারী সঙ্গ-সুখে বঞ্চিত হ'ল।...ভোম্‌রা কি ভাব্‌লে তা ভোম্‌রাই জানে।...যারা দূরে যায় তারা পুরোনো হারিয়ে নতুন পায়।...কত নতুন ফুলের সৌরভ,...কত নতুন পাখীর কাকলি ...কত নতুন চোখের বিদ্যুৎ···তাদের মন হরণ করবার জন্যে···বিজন বনেও মায়াপুরী নির্ম্মাণ ক'রে রেখেছে। কিন্তু, যারা চোখের জল সম্বল ক'রে পিছনে পড়ে রইল,···ম্লান হাসি হেসে, আপনার জনকে বিদায় দিয়ে, আঁধার মুখে ঘরের অন্ধকার কোণে ফিরে এল, তাদের সব শূন্য, সব খালি, সব ফাঁকা! সেই পুরোনো ঘর-দুয়ার, সেই পুরোনো সাজ-সরঞ্জাম, সেই সমস্ত!...নতুনের মধ্যে?... ভরা ঘরের মাঝখানে—দুর্ভর ব্যাকুলতা, ঘর-ভরা কান্না,...বুকভরা হাহাকার!...চেনা মুখের হাসি চাইলেও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, স্মরণের সোনার কৌটোয় সাত রাজার ধন মাণিক হ'য়ে বিরাজ করে।

উর্ম্মিলা। দিদি!

সীতা। (আকাশের দিকে চেয়ে, অন্য-মনস্কভাবে) পূব্‌দিকের শাদা মেঘগুলো সোনার বর্ণ হ'য়ে উঠেছে,...আজ কি পূর্ণিমা?

উর্ম্মিলা। আজ তো নয়.. কাল...

সীতা। এটা না মধু-পূর্ণিমা?

উর্ম্মিলা। হ্যাঁ, মধু-পূর্ণিমা...বসন্তোৎসব।

সীতা। এবার বসন্তোৎসব নিরানন্দে কাটাতে হবে,...এবার নিরুৎসব।

মাণ্ডবী। এটা কি এঁদের ভালো হ'ল? ...শ্রুতিকে তখন হেসে উড়িয়ে দিচ্ছিলুম, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি নানা রকমে বঞ্চিত হচ্ছি ...চারিদিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।

উর্ম্মিলা। এখন মনে হচ্ছে, শ্রুতি কিচ্ছু অন্যায় করে নি, ঠিকই করেছে...

সীতা। দ্যাখো, চিঠির কি জবাব আসে...

বিহঙ্গিকা। ঐ দ্যাখো...ঐ···ধূমকেতু উদয় হয়েছে। ··

মাণ্ডবী। কি প্রকাণ্ড ওর পুচ্ছ!···পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম আকাশ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হয়ে গেল,...চাঁদ নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

উর্ম্মিলা। ওটা ধূমকেতু না কালকেতু...

বিহঙ্গিকা। না কপালকেতু?

মাণ্ডবী। শুনেছি, ওটার নাম তামস-

কীলক, আমাদের কপালে কালকেতু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উর্ম্মিলা। কালও যেখানে উঠেছিল আজও ঠিক সেইখানে।...আজ চৌদ্দ দিন ধরে ঐ একটা জায়গাতেই উদয় হচ্ছে।

মাণ্ডবী। শুনেছি নাকি ওটা যে দেশে যে ক'দিন দ্যাখা যায় সে দেশে তত বৎসর অমঙ্গল।

সীতা। অমঙ্গলের আর বাকী কি ?... এরি মধ্যে তো মনের ভিতর সব গোলমাল সেঁধিয়েছে...সব যেন কেমন...

মাণ্ডবী। আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো হ'য়ে পড়্ছে !

বিহঙ্গিকা। তবু মহারাজ দস্তুরমত স্বস্ত্যয়ন করাচ্ছেন।

মাণ্ডবী। (অন্যমনস্ক ভাবে) তাইতো! নকুলিকার হ'ল কি ? এখনো ফির্‌ল না !... কুরঙ্গিকাই বা কি কর্‌লে ?

উর্ম্মিলা। কি জানি ?...শ্রুতি তো ছট্‌ফটিয়ে বেড়াচ্ছে···

সীতা। বিহঙ্গিকা দ্যাখ তো এগিয়ে... নকুলিকা, কুরঙ্গিকা কেউ ফির্‌ল না ?

(নকুলিকা, কুরঙ্গিকা ও শ্রুতকীর্ত্তির প্রবেশ)

কুরঙ্গিকা। ফিরেছি...জবাব এনেছি... চার চার খানা জবাব এনেছি...শিরোপা চাই ...পুরস্কার,...

নকুলিকা। হুঁ,...শিরোপা চাই...

কুরঙ্গিকা। তোর কিসের শিরোপা, র‍্যা ?...তুই তো যেতে চাস্‌নি,...বলেছিলি জবাব দেবে না,...তার পর তন্দ্রাবুড়ীর ওখানে ফষ্টিনষ্টি করে দেড়ঘণ্টা কাটালি,... শিরোপা দেবে না গলায় পা দেবে।

নকুলিকা। দ্যাখ্, তুই কুরঙ্গিকা না ভুজঙ্গিকা ?

কুরঙ্গিকা। কেন বল্ তো...

বিহঙ্গিকা। নইলে, নকুলিকার সঙ্গে অত লাগিস্ কেন ?...ঠিক যেন সাপে নেউলে...

নকুলিকা। বল্ তো ভাই বল্‌তো...

শ্রুতকীর্ত্তি। নে, নে,...চিঠি দে...

নকুলিকা। আগে বখশিস—

(গান)

(আমায়) করে চাপরাশী চিঠি রাশি রাশি
পাঠালে ! হাঁটালে ! খাটালে !

শ্রুতকীর্ত্তি। তাই বুঝি সারা বেলাটা বেবাক
বাহির-মহলে কাটালে ?

নকুলিকা। সে কসুর মোটে নয় আমাদেরি,
জবাব পেতে যে হ'য়ে গেল দেরী ;

শ্রুতকীর্ত্তি। দে, দে, চিঠি দেখি,—

নকুলিকা। —বখ্‌শিস ?

শ্রুতকীর্ত্তি। —দ্যাখ্—
ভাল হবে নাক ঘাঁটালে, আমায় ঘাটালে।

নকুলিকা। বেশী নাহি চাই কোরোনাকো কোপ,
পাগড়ী নাগরা দাড়ি আর গোঁফ,
(চাপরাশ চাপদাড়ি আর গোঁফ,)

কুরঙ্গিকা। চোপ্ চোপ্, নিজে সব নিবি বুঝি ?...
ধর্ম্মে সবে না ছাঁটালে, আমায় ছাঁটালে।

নকুলিকা। গোঁফ নেই গোঁফে তেল দিবি কিরে ?...
ভারি লোভ দেখি কাঁটালে, গাছের কাঁটালে ॥

মাণ্ডবী। আচ্ছা, পাগড়ী, নাগরা আমি দেব এখন,...আমায় দে...

(কুরঙ্গিকার ভথাকরণ)

উর্ম্মিলা। চিঠি সব পড়্‌বে কে...

মাণ্ডবী। দিদি যাকে বল্‌বে...

সীতা। যে বড় সেই পড়্‌বে...আমায় দাও

...( পাঠ ) উর্ম্মিলা, তোমার আজকের পত্রের বচন-বিন্যাস মোটেই উর্ম্মি-মালার কলধ্বনির মতন নয়, এ একেবারে তরঙ্গভঙ্গ। সে যা' হোক্, আমরা চার ভাইএ কোথায় যাচ্ছি তা' তোমায় বল্‌তে পার্‌লুম না, কেন যাচ্ছি তাও না। তুমি জানো কারো কাছে জবাবদিহি করা আমার স্বভাব নয়। এতে যদি অভিমান কর নাচার। ইতি—লক্ষ্মণ।

উর্ম্মিলা। ( অধোবদনে রইলেন )

শ্রুতকীর্ত্তি। ( অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ) উঃ!

সীতা। ( আর একখানা খুলে ) এ খানা দেখ্‌ছি আমার ( নীরবে পাঠ )।

মাণ্ডবী। কই ?...পড় !

সীতা। কী আর পড়ব...ঐ একই কথা,...( আর একখানা খুলে পাঠ )...

মাণ্ডবী, তোমার চিঠি কোথায় 'মম শিরসি মণ্ডনম্' হবে,...তা না হয়ে একেবারে কোদণ্ড-টঙ্কার !...একেবারে যুদ্ধং দেহি !... চিঠিতে তোমার এই চণ্ডীমূর্ত্তি দেখে, হে কোপনে! সত্যই আমাকে একটু গণ্ডগোলে পড়্‌তে হয়েছে। কোথায় যাচ্ছি সে কথাটা তোমার কাছে বিজ্ঞাপিত করা হয়নি ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছ যে সজ্ঞানে সরযূ-লাভ হ'লেও এই আজ্ঞাবহ ভৃত্যকে সে সংবাদ জ্ঞাপন করবে না! কি আশ্চর্য্য! তোমার মতন প্রজ্ঞাবতী নারীর কি এই বিচার? ভালো, আমি...থুড়ি...আমরাও প্রতিজ্ঞা করছি, যে তোমরা না আহ্বান করলে আর ওমুখো হব না, এমন কি নগরেও ফিরব না; যে দিকে দুই চক্ষু যায় আক্ষেপের সঙ্গে বল্‌তে হচ্ছে, যে সেই পথেরই পথিক হব। অভিমান নামক সামগ্রীটি কেবল ভামিনী কুলেরই এক চেটে নয়। ইতি—

তোমার হতভম্ব ভর্ত্তা ভরত বর্ম্মা।

উর্ম্মিলা। ( মাণ্ডবীর মুখের দিকে চাইলেন )।

মাণ্ডবী। ( গালে হাত দিয়ে ভাবতে বস্‌লেন কি নিজের গালে নিজে চিম্‌টি কেটে বিদ্রোহী হাসিটার বেয়াদবীর দণ্ডবিধান করলেন তা' ঠিক বুঝ্‌তে পারা গেল না )।

শ্রুতকীর্ত্তি। ( দাঁড়িয়ে উঠে আবার ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে দুই হাতের মুঠো শক্ত ক'রে বসে পড়্‌লেন )।

সীতা। শ্রুতি! এইবার তোর চিঠি,... ( পাঠ ) শ্রুতকীর্ত্তি, তোমার আবার একি নূতন কীর্ত্তি! দস্তুরমত নারীবিদ্রোহ পাকিয়ে তুলেছ দেখ্‌ছি। তোমরা চারজনে একজোট হ'য়ে আমাদের চার ভাইকে দমিয়ে দেবে ভেবেছ? সেটি হচ্ছে না, আমরাও চারজনে এককাট্টা হলুম, জান্‌বে। দেখি, কারা হারে আর কারা জেতে। বিদায়ের আগে শুধু এইটুকু বলে রাখ্‌ছি, যে তোমরা বিধিমতে সাধ্য-সাধনা না ক'র্‌লে সাধের অযোধ্যায় আর পদার্পণ করছি নি। ইতি—

তোমার—শত্রুর শত্রু।

পুনশ্চ:—লিখেছ কথা না রাখ্‌লে আর চিঠি লিখ্‌বে না, এই তোমার প্রতিজ্ঞা। ভালো, আমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে চাইনে। তবে স্বামীর কর্ত্তব্য আমায় করতেই হবে। যদি কোনোদিন স্মরণ করবার আবশ্যক হয় তবে এইসঙ্গে যে অঙ্গুরী পাঠালুম, সেইটি পাঠিয়ে দিও। ইতি শ—

মাণ্ডবী। তা হ'লে ঠিকানা দিয়েছে।

সীতা। কই না (চিঠি উল্টেপাল্টে দেখ্‌লেন)।

মাণ্ডবী। কোথায় পাঠাতে হবে বলেনি? ...নকুলিকা!

নকুলিকা। কই সে কথা আমাদের কিছু বলেন নি—

শ্রুতকীর্ত্তি। তা বল্‌তে যাবে কেন?... আশা জাগিয়ে নিরাশ ক'রে অপমানের উপর অপমান করবার ও আর একটা ফন্দী।

মাণ্ডবী। দেখ্‌লে দিদি, চিঠির সব ছিরি দেখ্‌লে?

উর্ম্মিলা। কি হবে, দিদি?...অযোধ্যা যোদ্ধাশূন্য হ'য়ে রইল; কি হবে?

মাণ্ডবী। কি আবার হবে,...ওঁরা নইলে সত্যিই কি অযোধ্যা অরণ্য হবে...

উর্ম্মিলা। আমাদের পক্ষে হবে বই কি...

শ্রুতকীর্ত্তি। না, না, তুমি অমন দমে যেয়ো না...দমে গেলে চল্‌বে না...আমাদের অভিমানের অপমান ক'রেছে...আমাদের বিদ্রোহী বলেছে,...বেশ...আমরা বিদ্রোহই ঘোষণা করলুম।

মাণ্ডবী। আমরা রোগে পড়ি, মরে যাই, ...কোনো খবর দেব না।

শ্রুতকীর্ত্তি। বিপদ্ হোক্ আপদ্ হোক্... কোনো খবর দেব না,...কোশল দুর্গ শত্রু এসে ঘেরাও করলেও না।

সীতা। ভগবান করুন, তেমন দিন যেন না হয়।

শ্রুতকীর্ত্তি। যদি হয়, মেয়েরাই এ দুর্গ রক্ষা করবে পুরুষের শরণাপন্ন হবে না। জয় হয় ভালোই...হেরে যাই অগ্নিদেব আছেন।

সীতা। শ্রুতি, তুই কি বক্‌ছিস্?...

মাণ্ডবী। সব তাতেই কি বাড়াবাড়ি?

শ্রুতকীর্ত্তি। না, দিদি, বাড়াবাড়ি নয়,... যারা অকারণে আমাদের মনে আঘাত দিতে পারে, তাদের করুণা ভিক্ষা ভিন্ন, সত্যিই কি আমাদের কোনো উপায় নেই?...তুমি দেখো, আমি দেখিয়ে দেব খুব উপায় আছে।... যারা অভিমানের মান রাখ্‌তে জানে না, তাদের পায়ে না ধর্‌লে দিন চল্‌বে না?... খুব চল্‌বে।...ছোটো ছোটো কাজের ভিতর দিয়ে দেখিয়ে দেব,...খুব চল্‌বে। আজ থেকে আমার মহলের সমস্ত কাজ...সমস্ত কাজের ব্যবস্থা আমি মেয়েদের দিয়ে করাব। আর তাদের সবাইকে বলে দেব, যেন কোনো কাজে কোনো পুরুষের কোনো সাহায্য না নেওয়া হয়।

নকুলিকা। তা হ'লে তোমার মহলে সন্ধ্যা-সকালে সানাই বাজ্‌বে না?

শ্রুতকীর্ত্তি। যদি মেয়ে বাজন্‌দার পাওয়া যায় বাজ্‌বে...

নকুলিকা। নইলে?

শ্রুতকীর্ত্তি। বাজ্‌বে না।

নকুলিকা। হাঁড়ী চড়্‌বে না?

শ্রুতকীর্ত্তি। যদি মেয়ে-সূপকার পাওয়া যায় চড়্‌বে...

নকুলিকা। নইলে?

শ্রুতকীর্ত্তি। চড়্‌বে না।

নকুলিকা। তোমার সখের বাগানে গাছ-পালায় জল পড়বে না?

শ্রুতকীর্ত্তি। যদি মেয়ে উদ্যান-পাল পাওয়া যায় পড়বে...

নকুলিকা। নইলে?

শ্রুতকীর্ত্তি। পড়বে না।

নকুলিকা। তা' হ'লে আর এক পা এগিয়ে গাছগুলি সব কেটে বাগানে শুধু লতা রাখ্‌লেই তো ভালো হয়। ব্যাকরণে বলেছে গাছগুলো সব পুরুষ···

শ্রুতকীর্ত্তি। হাসি নয়,...তাই হবে; আমার বাগানের লতাদের আর গাছের মুখাপেক্ষী ক'রে রাখ্‌ব না। যা' বলেছি তা' করব, যতদুর চালানো যায়, চালাব; শেষ না দেখে ছাড়্‌ব না।

ঊর্ম্মিলা। মনে থাকে যেন কাল মদন-মহোৎসব...কন্দর্প-মন্দিরে যাবিনে তো?... কন্দর্প পুরুষ-দেবতা।

শ্রুতকীর্ত্তি। যাই না যাই দেখ্‌তেই পাবে...

মাণ্ডবী। হ্যাঁ, যখন বিদ্রোহী বলেছে তখন বিদ্রোহ কাকে বলে তা দেখিয়ে দেওয়া চাই।

নেপথ্যে। সরে যাও!...সরে যাও!... হাওয়া-মঞ্জিলে হনুমান পড়েছে!...সাবধান! সরে যাও!

ঊর্ম্মিলা। (সভয়ে) সরে এস দিদি, সরে এস!

সীতা। চল্ ভিতরে যাই।

(সকলের প্রস্থান)।

## দ্বিতীয় অঙ্ক।

### প্রথম দৃশ্য।

[ শ্রুতকীর্ত্তির মহল-সংলগ্ন 'শ্যামল-আরাম' নামক পুষ্পবাটিকা; মাঝে মাঝে ইট-বাধানো পথ; পথের ইটগুলি কতকটা মৎস্যপঞ্জরের ছাঁদে সাজানো, মাঝে মাঝে আবার স্বস্তিকের ছাঁদে বসানো হয়েছে। স্বস্তিকের মাঝ থেকে কোথাও ফিন্‌কি দিয়ে ফোয়ারা ছুটেছে, কোথাও রজনীগন্ধার পুষ্প-দণ্ড উঠেছে। ঝিলে—পদ্মবন, পদ্মবনের মাঝে মাঝে শ্বেতপাথরের পদ্মকলি। দূরে প্রাচীরের ধারে ধারে অশোক, বকুল, চাঁপা, নাগকেশর ও মুচুকুন্দের গাছ। তার কোলে গন্ধরাজ, টগর, রঙন, জুঁই, চামেলী প্রভৃতি। একটা ফুল্‌করী পাথরের বেদীর উপর একরাশ কৃষ্ণচূড়ার ফুল। নিপুণিকা, প্রাতিকা, মুকুলিকা প্রভৃতি তরুণীর দল একটা বকুলগাছের ডালে দোলা বাঁধ্‌তে ব্যস্ত। ]

তরুণীর দল। (গান)।

চারি চক্ষে যে চেনাচিনি, অয়ি কিশোরী!
তারে, জীয়াইয়ে রেখ মিনতি করি!
তোরি তরে ঝরোকারে রেখেছে রে খোলা।
সাড়া দাও, পাঁয়জোরে আওয়াজে ভরি'!
তোরি তরে তরু পরে বেঁধেছে রে দোলা!
ভুলে যাও, ভুলে চ'লে এস ভ্রমরী!
তোরি তরে সরোবরে ফুটায়েছে ফুল রে!
তুলে নাও, কোনো ছলে পথ বিসরি'!
তোরি তরে অন্তরে জুটায়েছে ভুল রে!
যদি চাও দাও ভেঙে সে ভুল ওরি!

মুকুলিকা। কি সুন্দর, ভাই, আখ্, কি চমৎকার!

সকলে। কি? ভাই, কি?

মুকুলিকা। দেখে যা, দেখে যা, ফুলের ফোটা দেখে যা', সন্ধ্যামণির বন্ধ করা পাপ্‌ড়ি দেখতে দেখতে খুলে যাচ্ছে!

সকলে। ওরে আয় আয়, ফুলের ফোটা দেখ্‌বি আয়!

(গান)

'ফুলের ফোটা দেখ্‌বি কে!'
সাঁঝের পরী যায় ডেকে।
যেই ইসারায় ঈষৎ শশী
হাস্‌ল নীলাকাশ থেকে।
সাঁঝের পরী যায় ডেকে।

আবছা আলোয় উস্‌খুসিয়ে
রসের বেদন উস্‌কে দিয়ে
বাতাস বিভোল্,—কুঁড়ির প্রথম
পাপ্‌ড়ি খোলার হাই লেগে !
ঝুম্‌কো-লতার ঝুরির ডোরায়
অবাক ঝিঁঝিঁ ঝিমিয়ে চায় !
কুঁড়ি নয় যে কুসুম
নিঝুম হ'য়ে দেখ্‌ছে তায় !
পাপিয়া কোকিল উঠ্‌ছে গেয়ে
ফুল-ফোয়ারার ছন্দ পেয়ে,
বল্‌ছে জোনাক আলোর বুলি
ভালোবাসার বোল্ ঢেকে।

কপোতিকা। সন্ধ্যা হ'য়ে এল, বা রে ! মালিনী কই ?

নিপুণিকা। আমার ফুলের চোলিটার কি ক'ল্লে কে জানে !

মুকুলিকা। ভারী মজার লোক, যা হোক্...

কপোতিকা। কাল উৎসব, আজ কি আর তার মরবার ফুরসুৎ আছে ?...

নেপথ্যে। ( গান )

খাস্ বাগানের ঠাস্ গোলাপে রাশ ক'রে !
বেঁধেছি পরিপাটী এই তোড়াটি বসন্তে উদাস ক'রে !

নিপুণিকা। মর্‌বে কি ?...অনেক কাল বাঁচবে,...ঐ যে তার গলা পাচ্ছিস্ নি ?

( মালিনীর প্রবেশ )

মালিনী। ( গান )

খাস্-বাগানের ঠাস্ গোলাপে রাশ ক'রে !
বেঁধেছি পরিপাটী এই তোড়াটি মৌমাছি নিরাশ ক'রে !
এনেছি জুঁয়ের গোড়ে যত্নে গ'ড়ে
ফুলের তোড়ে মন্ত্রে বেঁধে,
এনেছি ফুলের চোলি কলি কলি
বেল্-চামেলি ছন্দে গেঁথে,
গড়েছি ফুলের পাখা ফুল-পতাকা
মালঞ্চ উদাস ক'রে !
কেড়েছি পঞ্চশরের সব ক'টি শর
কিশোর হাসির দাস ক'রে !

কপোতিকা। মালিনী, অ মালিনী !

নিপুণিকা। ফুলের চোলি ? এনেছ তো...

মালিনী। এনেছি বই কি, সব এনেছি... শুধু ফুলের চোলি ?...হুঁঃ !...কত রকম ফুলের গয়না এনেছি, তা তো ছাখনি...আজ বসন্তোৎসবের সন্‌ধুৎ,...এই আজ আর কাল ...এই দু'দিন সোনার গয়না গায়ে ঠেকাতেই নেই, তা বুঝি জান না ?...

( গান )

আজ, ফাগুন-দিনে ফুল গহনা
সোনা নামঞ্জুর !
কঠিন সোনা আজকে মানা
আজ রাখ তায় দূর !
ফুলের কাঁকন ফুলের মুকুট
( আর ) ফুলের রতন-চূড়
ফুলের নূপুর বাজ্‌বে নীরব
সৌরভে ভরপুর !

সকলে। আমি নেব...ফুলের গয়না... আমি কিন্‌ব...

নিপুণিকা। ক' সুট আছে ? কুলোবে তো ?

মুকুলিকা। বেশ হ'ল ভাই আর স্যাক্‌রার খোসামোদ করতে হবে না।

( গান )

সকলে। আমরা, ডাক্‌বনা আর ড্যাক্‌রাকে—
স্যাক্‌রাকে !
আমাদের, গয়না হবে নিত্যি-নতুন
মালঞ্চে হাজার শাখে।
ওরা ছ্যায়নাকো পান্, স্যায়নাকো বানি,
শুধু, দিয়েই খুসী প্রত্যাশী নয়, জানি খুব জানি ;
আর রইল না ভয় চোর-ডাকাতের
সোনায় যারা টাঁক রাখে !

নিপুণিকা। তোর মালঞ্চ-সুটের গয়না কত ক'রে পড়বে, ভাই,...কি দিতে হবে?

মালিনী। তাড়াতাড়ি কি, তার জন্যে ব্যস্ত হ'তে হবে না,...যা হয় দিয়ো না তখন, ...রাজার মালঞ্চের ফুল, তার তো আর দাম লাগবে না,...আমার মজুরি,...যা' হয় দিয়ো।

নিপুণিকা। আমার ফুলের চোলিটা? ...ওটার জন্যে কি দিতে হবে?

(গান)

তরুণীর দল। চামেলির এই কাঁচলি বেচবি কি দরে?
মালিনী। বুনেছি সোহাগ দিয়ে বেচব আদরে।
তরুণীর দল। কি জিনিস্ চাস্ মালিনী?
মালিনী। সোহাগের সর খালি নিই।
নয়নের নিই আরতি ফুল্ল অধরে।
তরুণীর দল। না, না, ভাই ঠিক বল না,
মালিনী। তবে চাই কানের সোনা,
দরদী দর ক'রনা কিনতে সুন্দরে।

(ফুল নিয়ে তরুণীদের প্রস্থান)

(শ্রুতকীর্তি ও নকুলিকার প্রবেশ)

নকুলিকা। মালিনী! উদ্যান-পালিকে! দাঁড়াও! দাঁড়াও!

শ্রুতকীর্তি। মালিনী! এদিকে এস!... শোনো,...আমার মহলে আমি পুরুষের সংশ্রব রাখতে চাইনে...তুমি বাগানের সব কাজ করতে পারবে?

মালিনী। (বিস্মিত ভাবে) সব কাজ?

শ্রুতকীর্তি। হ্যাঁ...সমস্ত কাজ,...ঘাস্ নিড়ানো, মাটি কোদ্লানো, কলম বাঁধা, সার দেওয়া,...

নকুলিকা। দরকার হ'লে গাছে ওঠা, ডাল ঝুড়ে দেওয়া, জঙ্গল কেটে ফেলা...

মালিনী। কেন, মালী?

শ্রুতকীর্তি। বল্লুম পুরুষের সংশ্রব রাখব না...মালী ছাড়িয়ে দেওয়া হবে...

মালিনী। গাছে উঠতে হবে?...গাছ কাট্তে হবে?...

শ্রুতকীর্তি। হাঁ, হবে...কতবার বলব...

মালিনী। তা...আচ্ছা...আপনি যখন বলছেন...তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করে দেখব;... তা সম্প্রতি কি করতে হবে?

শ্রুতকীর্তি। সম্প্রতি বাগান থেকে সমস্ত গাছ কেটে উড়িয়ে দিতে হবে;...অর্থাৎ সংস্কৃতে যাকে বৃক্ষ বলা যেতে পারে সেই সব গাছ কেটে ফেলতে হবে, ..লতা গাছ কাট্তে হবে না।

মালিনী। বাগানে ঘোড়দৌড় হবে বুঝি?

নকুলিকা। না, না, ঘোড়দৌড় হবে কেন,...বুঝতে পারলে না, লতা গাছ মেয়ে জাতের গাছ কিনা, তাই ওদের কাটা হবে না, বাকী সব পুরুষ গাছ...তাই সেগুলো সব বাগানের বার করে দেওয়া হবে,...তা সহজে তো বার করা যাবে না...তাই অস্ত্রের সাহায্য নিতে হবে...কেটে উড়িয়ে দিতে হবে।

মালিনী। (ঈষৎ একটু ঘোমটা টেনে) গাছ পুরুষ মানুষ?...কি ক'রে জানলেন?

নকুলিকা। ব্যাকরণ ব'লে এক শাস্তর আছে,...সেই শাস্তরে সব লেখা আছে,...

মালিনী। (প্রণাম ক'রে) শাস্তরে বলেছে?...তা হলে কাটতে হবে বই কি!... তা এক কাজ করলে হয় না,...কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুল্লে হয় না,...মালীদের তো তাড়িয়ে দেবেন, তা মালীদের দিয়ে গাছগুলো কাটিয়ে

নিয়ে তাড়িয়ে দিলেই তো সকল দিকে সুবিধে হয়।

শ্রুতকীর্ত্তি। না, না,...যা বল্‌ছি তাই কর।

মালিনী। যে আজ্ঞা, তাই করব।... আচ্ছা, যে সব গাছের সঙ্গে লতাগুলো জড়িয়ে গেছে সে গাছগুলো কি বাদ রাখা যাবে!

শ্রুতকীর্ত্তি। লতার পাকগুলো আস্তে আস্তে খুলে নিয়ে, তারপর কোপ লাগাবে।

মালিনী। লতাগুলোতে বাঁশের ঠেক্‌নো দিতে পারি?

নকুলিকা। বাঁশ মেয়ে না পুরুষ?... আচ্ছা, ব্যাকরণ দেখে পরে ব'লে পাঠাব, ...এখন যেতে পার।

মালিনী। (যেতে যেতে ফিরে এসে) কাল মদন-মহোৎসব, কাল্‌কের দিনে অশোক বকুল চাঁপা গাছগুলো সব কাটব? না, কাল বাদে পরশু কাট্‌লে চল্‌বে?

শ্রুতকীর্ত্তি। না, কালই কাজ সুরু করা চাই, যাও।

মালিনী। যে আজ্ঞে।

(প্রস্থান)

শ্রুতকীর্ত্তি। নকুলিকা,...বধূনাট্যের দলে খবর পাঠানো হয়েছে?

নকুলিকা। হয়েছে...সন্ধ্যে বেলায় নৃত্য-শালায় আস্‌তে বলে দিইছি।...কি পালা হবে তা তো ব'লে দেওয়া হ'ল না।

শ্রুতকীর্ত্তি। সে হবে এখন।

নেপথ্যে। গান—

তোমারে, মার্‌লে কে কোন্ বাণে হায় রে
ও বনের পায়রা মোর।

শ্রুতকীর্ত্তি। নকুলিকা! কে গান গায়? দেখ্ তো!

নকুলিকা। (নেপথ্যের দিকে এগিয়ে) ও একটা পাখ্‌মারাদের মেয়ে...এইদিকেই আস্‌ছে, ...ঐ যে কুরঙ্গিকা ওর সঙ্গে...এইদিকেই আস্‌ছে।

(একজন শবরী ও কুরঙ্গিকার প্রবেশ)

শবরী। (গান)

তোমারে, মার্‌লে কে? কোন্ বাণে? হায় রে!
ও বনের পায়রা মোর!
হায়! হায়!

বন্ধু! আমার মেল আঁখি!
জনমের সাথী গো এ তো নয় রাতি!
কেন এই ঘুমের ঘোর!
হায়! হায়!

বন্ধু! আমার মেল আঁখি!
কাকলি কর্‌ব যে ঝর্‌নার বোল ধর্‌ব
মিলায়ে পাখ্‌না পাখায়!
হায়! হায়!

সঙ্গী! আমার মেল আঁখি!
কেবলি, ডাক্‌ছি আর, চক্ষের জল মাখ্‌ছি,
বাতাসে হুতাশ জাগায়!
হায়! হায়!
বন্ধু! আমার মেল আঁখি!

শ্রুতকীর্ত্তি। এ কে রে কুরঙ্গিকা!... কোথায় পেলি একে?

কুরঙ্গিকা। পাখী বেচ্‌তে এসেছে,... দেউড়ীতে বেত্রবতী আট্‌কেছিল...আমি অনেক ব'লে ক'য়ে নিয়ে এলুম।

শবরী। পাখী নেবে গা রাণী? পাখী? (কুরঙ্গিকা ও নকুলিকার পরস্পরে কানে কানে কথা)।

শ্রুতকীর্ত্তি। কি পাখী ?...দেখি !... পায়রা ?...পায়রা কি হবে ? রাজপুরীতে পায়রার অভাব কি ?

শবরী। এ পায়রার অনেক গুণ !

শ্রুতকীর্ত্তি। কি গুণ ?...চিঠি নিয়ে যেতে পারে ?...সে রকম পায়রাও এখানে ঢের আছে।

শবরী। উঁহু,...এ জুড়ি-ভাঙা পায়রা, জুড়িদারের কাছে চিঠি নিয়ে যায়,...যাকে মনে ক'রে চিঠি ছাড়্বে...তারি হাতে পৌঁছে দেবে।

শ্রুতকীর্ত্তি। বটে ?...বটে ?...এ পায়রা তুই কোথায় পেলি শবরী ?

শবরী। আমাদের সর্দ্দারের যে সর্দ্দার তার কাছে পেয়েছি। তার নাম তুষ্‌মন-কাটারী।

কুরঙ্গিকা। (চোখ্ টিপে মানা কর্‌লে) অত নাম ধামের দরকার কি আমাদের··· কি দাম চাস্ ? তাই বল্ না।

শবরী। এই পায়রার ওজনে সোনা চাই।...সর্দ্দার-রাজা বলে দিয়েছে...তার কমে বেচ্‌তে মানা আছে...

শ্রুতকীর্ত্তি। আচ্ছা, তাই হবে,...নকুলিকা, পায়রার ওজনে যত সোনা হয়, দিয়ে দিস্।

(প্রস্থানোদ্যত)

শবরী। বাস্ ?...হ'য়ে গেল সওদা ?... আর কিছু চাই নে ?...আমার ঘরে অনেক রকম জানোয়ার আছে...

শ্রুতকীর্ত্তি। (একটু ভেবে) আচ্ছা, আপাতত একটা মেয়ে-কোকিল, একটা মেয়ে-ময়ূর আর একটা মেয়ে-হরিণ এনে দিস্।

নকুলিকা। কেন ?...তোমার হরিণ, ময়ূর সব-কি হল ?

শ্রুতকীর্ত্তি। কি আর হবে ?...তাড়িয়ে দিয়েছি, উড়িয়ে দিয়েছি,...পুরুষ-জন্তু পুষব না,...ওদের হৃদয় নেই।

নকুলিকা। অ !...বুঝেছি...তা দেখ্ শবরী, তুই রাণীজীর জন্যে একটা মেয়ে-হরিণ, একটা মেয়ে-ময়ূর আর একটা মেয়ে-কোকিল নিয়ে আস্‌বি,...বুঝেচিস্ তো ?

শবরী। বুঝেছি।

শ্রুতকীর্ত্তি। নকুলিকা, তোর কিছু ফর্‌মাস থাকে তো, অমনি ব'লে দে, মেয়ে-জন্তু হওয়া চাই কিন্তু,...আমি চল্লুম।

(প্রস্থান)

নকুলিকা। (একটু ভেবে) আমার জন্যে ?...মেয়ে জন্তু ?...নাঃ,...আচ্ছা, আনিস্ একটা মেয়ে-গরু।

শবরী। যে হুকুম।

কুরঙ্গিকা। দাঁড়িয়ে রইলি যে...পায়রার ওজনে সোনা নেবে ?...সোনা অত সস্তা নয়,... যাও তুষমন্-কাটারির কাছে...সেইখানে দু'শো মণ চারশো মণ যা' চাইবে...তাই পাবে,... যাও।

নকুলিকা। কে পায়রা পাঠিয়েছে ?...হাঃ হাঃ হাঃ...কে ?...কে ?...ভুলে গেলুম !... কে ?

কুরঙ্গিকা। তুষমন্-কাটারি...চমৎকার নাম—

নকুলিকা। বা নামের চমৎকার তর্জ্জমা...

উভয়ে। হিঃ হিঃ হিঃ (মুখে কাপড় দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে প্রস্থান)।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ স্নানাগারের সম্মুখ ; অসংখ্য ধাপওয়ালা একটা সিঁড়ির খানিকটা ছাখা যাচ্ছে, সিঁড়ির মাথা থেকে পাতাল-ঘরে আলো এসে পড়েছে। একটা কুলুঙ্গিতে সিঁদুর-মাখানো একটা মকরের পিঠে বরুণের মুর্ত্তি ; একটা কুলুঙ্গিতে কতকগুলো ফুল আরেকটাতে একটা কৌটো। একজন যবনী শাস্ত্রী ধনুর্ব্বাণ নিয়ে পায়চারি করছে। স্নানাগারের ভিতর থেকে দর্পণ, কাজল-লতা প্রভৃতি নিয়ে চঞ্চল-চরণে চঞ্চরীকার প্রবেশ। ]

যবনী। চিঞ্চিনাটি !

চঞ্চরীকা। ( মুখ ভেংচিয়ে ) চিঞ্চিনাটি ! পিছনে ডাকৃছ কেন বাবুইহাটি ? পাথরের সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে পড়ে মর্‌ব ?

যবনী। মর্‌ব ? না পর্ব্ব,—কাল পর্ব্বদিন ?

চঞ্চরীকা। হ্যাঁ গো, কাল মদন মহোৎসব,—ভালোবাসার পরব।

যবনী। ( আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি হেসে ), ভালোবাসা ?...ঈরস্...কি আফ্রোজিনি ?... মেয়ে কি মরদ ?

চঞ্চরীকা। আমাদের ভালোবাসার ঠাকুর মেয়ে নয়, মরদ, তাঁর নাম কন্দর্প।

যবনী। আমাদের যবন-মণ্ডলে ভালো-বাসার ভারি দেবতা হচ্ছে মেয়ে লোক... তার নাম আফ্রোজিনি,...হাল্‌কা দেবতা ঈরস্ ধনুক নিয়ে বেড়ায়,...আফ্রোজিনির বেটা।

চঞ্চরীকা। ধনুক নিয়ে বেড়ায় ?...সে তো আমাদের কন্দর্প,...তোমরা তাকে কি বল ?

যবনী। ঈরস।

চঞ্চরীকা। কী রস ?

যবনী। ( চঞ্চরীকার কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ) ঈরস।

চঞ্চরীকা। ও রসে আমাদের কাজ নেই, আমাদের কন্দর্পই ভালো।...আবার ভালো-বাসার মেয়ে-দেবতা ? তার নাম কি বল্লে ?

যবনী। ওর দু' নাম,...কেউ বল্‌ছে আফ্রোজিনি,...কেউ বল্‌ছে আফ্রোদিতি।

চঞ্চরীকা। যবনী, তোর কপাল খুলেছে।

যবনী। ( কপালে হাত বুলিয়ে দেখে ) কই ?

চঞ্চরীকা। হাত বুলিয়ে কি দেখ্‌ছিস্ ? ...তুই দেখ্‌তে পাবি নি ; আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌ছি।

যবনী। ( সবিস্ময়ে মুখের দিকে চেয়ে বোকাটে হাসি হাস্‌তে লাগ্‌ল )

চঞ্চরীকা। শোন্, বলি,...তোদের এই ভালোবাসার মেয়ে-দেবতার কথা শ্রুতকীর্ত্তি ঠাকুরুণকে বল্‌তে পারিস্ ?...বখ্‌শিস্ পাবি।

যবনী। ছোটো কর্ত্রী আমাদের দেব্‌তা পুজ্‌বে ? আমরাও কাল পুজ্‌ব ;...মিছিল্ বার হবে,...আফ্রোজিনির মিছিল...নৌকায় বার হবে।

চঞ্চরীকা। কোথায় ? সরযূতে ?

যবনী। না, ফুল-বাড়ীর ঝিলে ;...যত মেয়ে শাস্ত্রী মিলে চাঁদা তুলেছি। নৌকা সাজাব... গেছো পশমের ফুল দিয়ে, লাল টক্ টক্ ফুল দিয়ে।

চঞ্চরীকা। গেছো পশম ?...সে কি ?

যবনী। ভারি বড় গাছ...ভারি লাল লাল ফুল।

চঞ্চরীকা। ( হেসে ) অ ! শিমুল !

যবনী। হুঁ, আমরা গেছো পশম বলি... আমার দেশে গাছে পশম হয় না,...তোমার দেশ ভারি মজার...গাছে পশম হয়।

চঞ্চরীকা। তা তো হয়!...কিন্তু এত ফুল থাক্‌তে শিমুল ফুল কেন?

যবনী। লাল...কলিজার মতন লাল... কি রং!

চঞ্চরিকা। তোমরা রংই সার জেনেছ, ...গন্ধফুল ভালো লাগে না?

যবনী। গন্ধ ফুল?...হাঁচি হয়,...সর্দ্দি!

চঞ্চরীকা। শিমুল ফুল ধুয়ে খাও... চল্লুম।

(প্রস্থান)।

(স্নানাগারের ভিতর থেকে সীতা ও ঊর্ম্মিলার প্রবেশ)।

যবনী। (গ্রীক ধরণে অভিবাদন ক'রে কুলুঙ্গি থেকে একটা কৌটা নিয়ে সীতার সাম্‌নে ধ'রে) কৌটা!...

সীতা। কৌটো?...কিসের কৌটো?... কোত্থেকে এল?

যবনী। কিপোস্‌ ফেলেছে...

সীতা। কিপোস্‌?...কিপোস্‌ কে?

যবনী। (মাথা চুলকিয়ে) কিপোস্‌... কিপোস্‌...কপি।

ঊর্ম্মিলা। কপি?...বাঁদর?...বাঁদরে ফেলেছে?...দেখি (কৌটো খুলে) ভিতরে ভূর্জ্জপত্রে কি লেখা রয়েছে,...চিঠি,...গোড়াটা নেই, বাঁদরে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে...

সীতা। যতটুকু আছে তাই পড়ে ছাখ না।...

ঊর্ম্মিলা। (পাঠ) পুরোহিত-পরিষদ্ এবং স্বয়ং মহর্ষির এই অভিমত। এই বায়সাকৃতি ধূমকেতুর উদয়ে শুধু রাজ্যেরই যে সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা তাহা নহে, অপিচ দীর্ঘ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা। এই উভয় অমঙ্গলের নিরাকরণ জন্য পুরোহিত-পরিষদ্ গ্রহযাগের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তদ্ভিন্ন মহর্ষি আজ্ঞা করিয়াছেন, যে আগামী বসন্তোৎসবের পূর্ব্বাহ্নে কোনো পক্ষকে কোনো কারণ না দর্শাইয়া পৃথক্ করিয়া দিতে হইবে। শ্রীমহর্ষি বলেন বসন্তোৎসবের সময়ে চিরাকাঙ্ক্ষিত আনন্দের পরিবর্ত্তে আকস্মিক ভাবে তীব্র মানসিক দুঃখভোগ ঘটাইতে পারিলে গ্রহ-বৈগুণ্যের খণ্ডন হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রীমান্ বা শ্রীমতীদের মধ্যে কেহ ঘুণাক্ষরেও যেন জানিতে না পারেন। জানিলে সমস্তই পণ্ড হইবে। ইতি অঙ্গ-বঙ্গ-সিন্ধু-সৌবীর-সৌরাষ্ট্র-কাশী-মগধাদি-সমস্ত-সামন্ত-সঙ্ঘ-মৌলি-মণি-রঞ্জিত-পাদপীঠ-অষ্টোত্তর-শত-শ্রীযুক্ত মহারাজ উত্তর-কোশল-স্বামী...

সীতা। আর পড়্‌তে হবে না,... ঊর্ম্মিলা!...

ঊর্ম্মিলা। (বিষণ্ণ মুখে) দিদি!... কেন পড়্‌লুম...কেন জান্‌লুম...কি হবে, দিদি!

সীতা। মহর্ষির সমস্ত ইষ্ট-চেষ্টা পণ্ড হ'য়ে গেল...কিন্তু কাকে দোষ দেব?... তোমায়?...না যবনীকে?...না যে বাঁদর এই কৌটো ফেলেছে তাকে?...কাউকে না, ...দোষ অদৃষ্টের।

ঊর্ম্মিলা। কি হবে দিদি!

সীতা। কি হবে?...যা ভবিতব্য...যা বিধাতার ইচ্ছে।...তুই বিষণ্ণ হ'স্‌নি ঊর্ম্মিলা! মনের বল হারাস্‌ নি,...হয় তো ধূমকেতুর অমঙ্গল-সূচনা ধোঁয়াতেই অবসান হবে।

নৌকো ডুব্‌তে পারে বলে,…কে কবে ঝড়ের আগে নৌকো ডুবোয়!

উর্ম্মিলা।-(নিরুত্তর)

সীতা। আর তা' ছাড়া আরেকটা কথা ভাব্‌বার আছে,…আমরা দু'বোনে যা' জেনেছি তার ফল চারজনকে যেন না ভুগ্‌তে হয়। সে সম্বন্ধে সাবধান হ'য়ে চল্‌তে হবে। আমাদের বিষণ্ণ দেখ্‌লে, সেই বিষণ্ণতার কারণ জান্‌বার জন্যে সবারি কৌতূহল হবে, কাজেই ক্রমে…

(তন্দ্রা বুড়ীর প্রবেশ)।

তন্দ্রাবুড়ী। অ! মা! তোমরা এখানে,…আর আমি খুঁজে খুঁজে আলা!…

উর্ম্মিলা। কেন আয়ি!

তন্দ্রাবুড়ী। এই ধূম-খেত্তরের দোষ কাটাবার জন্যে তোমার শ্বাশুড়ী… সুমিত্তিরের…মহলে স্বস্তেন হচ্ছে,…তাই হোমের ফোঁটা পর্‌বার জন্যে তোমাদের ডাক্‌ছে।

সীতা। চল যাই…সপ্তভূমক প্রাসাদে তো!

তন্দ্রাবুড়ী। হ্যাঁ গো; আবার কোথা!… (সহসা উর্ম্মিলার হাতে কৌটো দেখে) অ-মা! কি আশ্চর্য্যি!…এ কৌটো তুমি কোথায় পেলে…ছাদে ভাখো, ছাদে ভাখো… কি আশ্চর্য্যি!

সীতা। বাঁদরে বুঝি ফেলেছিল…এই যবনী কুড়িয়ে পেয়েছে…এই মাত্র দিলে…

তন্দ্রাবুড়ী। কই দেখি দেখি, হ্যাঁ এই ত…এইত বটে। গায়ে তিন-থাক শঙ্খ-লতা…এযে সুমিত্তিরের…এযে তোমার শ্বাশুড়ীর…আমায় রাখ্‌তে দিয়েছিল, দিদি, জিম্মে করে দিয়েছিল,…তা' পোড়া বাঁদরের জ্বালায় কি কিছু রাখ্‌বার যো আছে গা'!… যদি খোঁজ পড়ে…আর খুঁজে না পায়…তা হ'লে এখুনি অনথ্থ করবে। দাও দিদি দাও।…তা' ভাখ, দিদি, বাঁদরে নিয়ে গিয়েছিল ব'ল না যেন…

উর্ম্মিলা। ব'লে আর কি হবে।

(সীতা ও উর্ম্মিলার প্রস্থান)

তন্দ্রাবুড়ী। আজ দশ বছর বিয়ে হয়েছে…চার চারটে বো'য়ের কারো কি ছেলে হ'তে নেই গা?…সুমিত্তিরেকে বলি, যে রাজাকে ব'লে একটা পুৎ-ষষ্টির যগ্‌গি টগ্‌গি করাও, তা কারো গেরাজ্যি হয় না।… ভালো স্থাথায় কি গা?…চার চারটে বো'য়ের কারো কোলে ছেলে নেই…রাজার রাজ্যি ব'য়ে যায়…ভালো স্থাথায় কি? অ্যাঁ? এই সুমিত্তিরেকে মানুষ কর্‌লুম…তার ছেলে নক্ষণকে মানুষ কর্‌লুম,…এখন নক্ষণের একটী ছেলে হ'লে মানুষ মুনুষ ক'রে দিয়ে যাই। সত্যি কিছু ছেরকাল থাক্‌বনা। তাই বলি,…বলি, তোমাদেরও তো ঐ পুৎ-ষষ্টির যগ্‌গি ক'রেই ছেলে হয়েছিল, তা বোয়েদের বেলাও না হয় সেই যগ্‌গি করাও, তা কারো গেরাজ্জি নেই…রাজার রাজ্যি ব'য়ে যায়…ভালো স্থাথায় কি গা, অ্যাঁ?

(প্রস্থান)

## তৃতীয় দৃশ্য

[নৃত্যশালা, সারি সারি পিতলের দীপ-বৃক্ষ, তার ডালে ডালে অভ্রের আবরণে ঢাকা দীপ জ্বল্‌ছে। দেওয়ালের মাথার কাছে চারদিকে মৃণালবাহী মরালশ্রেণী আঁকা রয়েছে, তার নীচে কিন্নর-দম্পতী বীণা বাজাতে বাজাতে যেন শূন্যমার্গে চলেছে।

তার নীচে তরঙ্গ-লেখা। পিল্লেয় পিল্লে-রাগ রাগিণীর মূর্ত্তি। এক পাশে একটা কাঞ্চন দণ্ডে একটা মণিময় ময়ূর। চীনাংশুকে ঢাকা আসন্দিকা নামক আসনে শ্রুতকীর্ত্তি ও মাণ্ডবী আসীন। পাশে দুখানা আসন খালি রয়েছে। পিছনে চামরধারিণী ও পানের বাটা নিয়ে করঙ্কবাহিনী। সাম্‌নে রক্ত-কম্বলাসনে বধু-নাট্যের দল। মৃদঙ্গ, বেণু, বীণা প্রভৃতি যন্ত্র ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে।]

শ্রুতকীর্ত্তি। না, না, না,...এবার বসন্তোৎসবে ও-রকম ধরণের গান টান চল্‌বে না। ও ভালেবাসার পালা শুনে শুনে ঝালা-পালা হওয়া গেছে, অন্য কোনো পদ্মী-টালা থাকে তো বলো।

প্রথমা। ভালোবাসার গান ভালো লাগছে না? প্রেমের পালা পছন্দ নয়? তবে ত মুস্কিল! আমাদের এলাকায় প্রীতি ছাড়া যে গীতই নেই। বধূ-নাট্যের ভিৎ হ'ল ভালোবাসার গানে।

দ্বিতীয়া। সেই জন্যেই ত সারস্বতমণ্ডলী থেকে আমাদের কাউকে উপাধি দিয়েছে প্রীতিতীর্থ, কাউকে দিয়েছে যত্ন-রত্ন, কাউকে দিয়েছে সোহাগ-ভূষণ।

তৃতীয়া। রোসো, রোসো! আচ্ছা দেখুন, আপনারা প্রেমের ছাড়া আর কোনো পালা যদি শুনতে চান, তবে আমার মামা মশায়ের তৈরি একটা নতুন পালা শোনাতে পারি। মামা মশাই আমার কবিও বটেন, আবার কবিরাজও বটেন। সেই জন্যে তিনি কবিত্বে এবং কবিরাজত্বে মিলিয়ে যে নাটকটি রচনা করেছেন, তার নাম হচ্ছে 'আধি-ব্যাধি-ওষধি-চম্পূ'...তাতে গদ্যে-পদ্যে সমস্ত টোট্‌কা ওষুধের সঙ্গে আধি-ব্যাধির যুদ্ধের কথা পালার আকারে লেখা হ'য়েছে;...পালাটি জ্ঞাতব্য তথ্যে একেবারে টইটম্বুর...আজ্ঞে করেন তো...

মাণ্ডবী। না, আমাদের ঘুঙ্‌ড়ি-কাশি হয় নি, অন্য কিছু থাকে তো বলো...

তৃতীয়া। আজ্ঞে, বিদ্যে-ডুগ্‌ডুগি মশায় এ পালা পড়ে খুব...

মাণ্ডবী। তা হোক্ বিদ্যে ডুগ্‌ডুগি মশায়ের বুলিতে ভালুক নাচ্‌তে পারে, মানুষে নাচে না।

চতুর্থী। আজ্ঞে আমাদের পাড়ার তর্ক-চর্চ্চা মশায়ের তৈরি একটি মানুষের মতন পালা আমার মুখস্থ আছে; যদি শোনেন তো গাই...সেটি একটি দার্শনিক পালা...তার নাম হচ্ছে 'তত্ত্ব-তাণ্ডব' বা 'সর্ব্বতত্ত্ব-সংঘট্ট-ঘটোৎ-কচকচি'...এতে সর্ব্বতত্ত্বের সারমর্ম্ম নাট্যা-কারে গ্রথিত করা হ'য়েছে। এতে বিশ্বতত্ত্ব, নিঃস্বতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব, অলঙ্কার-তত্ত্ব, স্বর্ণকার-তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, অশ্বতত্ত্ব, ডিম্বতত্ত্ব...

মাণ্ডবী। ব্যস্‌-ব্যস্‌...তত্ত্বের গর্ত্তে জ্যান্তে কবর হ'য়ে গেল দেখ্‌ছি! থামো, থামো...

পঞ্চমী। ওগো থামো না, জানি, তোমার পালা পছন্দ হবে না! (এগিয়ে এসে) আচ্ছা, দেখুন, আপনাদের সদুপদেশ-পূর্ণ উপাদেয় পালা শুন্‌তে আপত্তি আছে কি?

মাণ্ডবী। কত আর 'না, না,' করা যায়...

শ্রুতকীর্ত্তি। আচ্ছা, শোনাও...(কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে হাত বাড়িয়ে পান নিলেন।)

পঞ্চমী। আমাদের এই পালাটির নাম

"ভুবনের মাসী" বা "কর্ম্মদোষে কর্ণ-কর্ত্তন"; প্রস্তাবনাটা একটু শুনুন,—

(সুরে) ভুবন নামেতে ব্যাদড়া বালক
তার ছিল এক মাসী,
আহা, ভুবনের দোষ দেখে দেখিত না—
সে মাসী সর্ব্বনাশী !
ক্রমে, কলাচুরি মূলোচুরি ক'রে বাড়ে
ভুবনের আস্কারা,
চোর হ'তে পাকা ডাকাত হ'ল সে
ব্যাব্‌সা মানুষ-মারা !
শেষে, ধরা পড়ে গেল বিচার হইল
ভুবনের হবে ফাঁসী,
হাউ হাউ কেঁদে লাড়ু মুড়ি বেঁধে,
ছুটে এল তার মাসী।
তখন, মাসীরে ভুবন দেখে বলে "শোন্
কথা আছে কাণে কাণে,
আহা! কাছে গেল মাসী বোন্‌পোর মনে
কী আছে কিছু না জানে !
জগৎ স্তব্ধ সহসা শব্দ
হইল কটাস ক'রে,
কেটে নেছে কাণ মাসীর ভুবন
ডাকাতে-দাঁতের জোরে ;
ফাঁসীর কারণ মাসী কাঁদে, আর
উপদেশ পাই মোরা,
আস্কারা পেলে তস্কর হয়
রাস্কেল বোন্‌পোরা !

মাণ্ডবী। দ্যাখো বাপু, আমাদের চার বোনের মধ্যে কারো বোন্‌পো নেই, এ উপদেশ নিয়ে আমরা কি করব? আচ্ছা এ কি তুমি নিজে লিখেছ?

পঞ্চমী। আজ্ঞে, না, মৌলিকতার দাবি করি নে, অন্যের রচনা নাট্যাকারে গ্রথিত করি।

মাণ্ডবী। ভবিষ্যতে আর পরের এলাকায় অনধিকার প্রবেশ ক'র না, ফাঁড়িতে পাঠিয়ে দেবে।

শ্রুতকীর্ত্তি। নাঃ, ভেবেছিলুম বধূনাট্যের দলটাকে চাঙ্গা ক'রে, মেয়েদের দিয়ে শিল্প-সাধনায় একটা নতুন মৌচাক্ সৃষ্টি করব…; কিন্তু ক্রমশঃ হতাশ হয়ে পড়্‌তে হচ্ছে…

ষষ্ঠী। না, না, হতাশ হ'য়ে পড়বেন না,…অপনাদের কাছ থেকে আমরা অনেক আশা করি। আচ্ছা আরেকটি জিনিস আপনাদের শোনাই,…এ পালা শুন্‌লে হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। এ পালায় আচারপরায়ণা আচার্য্যানীদের একটি বিশেষ বাণী বিঘোষিত হয়েছে, এটি আমাদের গার্হস্থ্য পবিত্রতার সনাতন সঙ্গীত,…পালাটির নাম হচ্ছে শ্রী শ্রীগোবর-মঙ্গল! (অন্যান্য সভ্যাদের প্রতি) ধর না ভাই, সকলে মিলে শোনাই।

(গান)

জয় জয় শ্রীগোময়! গোলোকে বসতি হয়,
শুচি তুমি শুচিতার সেতু!
বৈকুণ্ঠের গোবরাটে গোবরিয়া পোকা হাঁটে
গায়ে তার গোময় যেহেতু!
বধূনাট্যের দল। হায় রে, গায়ে তার গোময় যেহেতু!
ষষ্ঠী। সৃষ্টি আগে বৃষরূপে ধর্ম্ম নাদিলেন চুপে
সেই নাদে সৃষ্টির পত্তন,
সংসার হইল তাই ষাঁড়ের গোবর ভাই
অকেজো অখদ্যে অকারণ!
বধূনাট্যের দল। হায় রে, অকেজো অখদ্যে অকারণ!
ষষ্ঠী। গোবর অমূল্য ধন ধরিলেন গোবরধন
নন্দের নন্দন নিজকরে;
গোবরে যে ঘেন্না করে, গোভূতে তাহারে ধরে,
হয় সেই ল্যাজে ও গোবরে।

মাণ্ডবী। বাস্, বাস্, আর গাইতে হবে না...থামো,...এ যে দেখ্ছি...

উপদেশ-পুঁটুলির পুঁটিরাম কবি।
গ'ড়েছে গোবর দিয়ে বাগ্দেবীর ছবি।

বধূনাট্যের দল। (বিস্মিত ভাবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগ্ল)।

মাণ্ডবী। এ সকড়ি ঘরের পালা নাচঘরে কেন?

শ্রুতকীর্ত্তি। না জম্ছে না, জম্ছে না (পিছন না ফিরে কাঁধের উপর দিয়ে পান নিয়ে)। কেন দিদি আজ্ জম্ছেনা বল তো?

মাণ্ডবী। জম্বে কি?—

বচনের বীণ্কার বীণ্কারী কই তার?
মরমের তরঙ্গের তার বাজে কই?
গরজের বাজ্না এ, খোঁজে শুধু খাজ্না এ,
ভালুকের নাচ্না এ, এতে রাজি নই।

শ্রুতকীর্ত্তি। নাঃ জম্ছে না, অন্য কোনো ভালো পালা নেই?

প্রথমা। আছে বই কি, ভালো ভালো পুরণো পালা আছে, যেমন লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর, সমুদ্র-মন্থন, মাতৃকা-মঙ্গল বা কার্ত্তিকের জন্ম, কুরুর জয় বা পুরুষ-সাবিত্রী।

শ্রুতকীর্ত্তি। এমন পালা নেই যাতে সব স্ত্রীলোক,...পুরুষের নাম-গন্ধ নেই?

দ্বিতীয়া। আজ্ঞে,...অভিনয় যারা করবে ...তারা সবাই স্ত্রীলোক,...কিন্তু পালাতে পুরুষ আছে বই কি; তবে, সে সব ভূমিকাও আমরাই গ্রহণ করব। মেয়েরা পুরুষ সাজ্বে।

শ্রুতকীর্ত্তি। না না, আমি ও-রকম চাইছি নে,...ও রকম চাইনে;...নাঃ জম্ছে না, জম্ছে না।

(নকুলিকার প্রবেশ)।

শ্রুতকীর্ত্তি। কই? দিদি এলেন না?

নকুলিকা। না, তাঁর শরীর একটু অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে, তিনি আস্তে পার্বেন না।

শ্রুতকীর্ত্তি। শরীর অসুস্থ নয়,...মনে সুখ নেই,...তাই এলেন না,...আমি বুঝেছি।

মাণ্ডবী। উর্ম্মিলার কি হ'ল?

নকুলিকা। সীতাদেবী একলাটি আছেন, সেইজন্যে তিনি তার কাছে রয়েছেন।

শ্রুতকীর্ত্তি। নাঃ আজকে আর জম্বে না,...সব মাটি...সকল রকমে মাটি...সব মাটি। (প্রস্থান)।

মাণ্ডবী। (ছোটো গলায়) নকুলিকা, শ্রুতির অবস্থা দেখলি?...ও বাইরে কারুকে জান্তে দিচ্ছে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওর মন কাঁদ্তে সুরু ক'রেছে।

নকুলিকা। ওঁর একলার নয়, অনেকেরই মন কাঁদ্তে সুরু ক'রেছে। এই বসন্তকাল... চাঁদনী রাত...এমন রাতে একলাটি;...এক রকম ভালো...বসন্তে নিম্ব-ভোজন।

(প্রস্থান)

প্রথমা। আজ আমরা কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলুম, কে জানে, কারুকে খুসীও করতে পার্লুম না, নিজেরাও খুসী হওয়া গেল না।

দ্বিতীয়া। রাজবধূদের প্রসন্ন হাসিটুকুও আজ পাওয়া গেল না, প্রশংসা-ভিখারীর হাত-পাতাই সার।...

তৃতীয়া। সব ভিখারীরই এক দশা।

সকলে। (গান)।

(ও তুই) ব্যাকুল হ'য়ে বাড়ালি হাত দান পাবি বলি।
(দেখি) ফির্ল যে তোর আপন বুকেই শূন্য অঞ্জলি।
(তোর) বাজ্ল সারং বিফল গানে,
(হায়) ধর্ল না রং কারু প্রাণে,
(শেষে) চোখের জলের বন্যা প্রবল রইল কেবলি।

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

পুষ্পবাটিকার অপর অংশ, দূরে কন্দর্প-মন্দির দ্যাখা যাচ্চে। মন্দিরের গায়ে চকাচকি, হংস-হংসী, ময়ুর-ময়ুরী, কপোত-কপোতীর আধ্-খোদাই নক্সা। পাশে ঝিল, ঝিলে ফুল দিয়ে সাজানো একখানা নৌকো। এদিকে মাধবী-লতা-জড়ানো তমাল গাছে একটা ফুল দিয়ে সাজানো দোলা ঝুল্‌ছে। মুকুলিকার পিছন পিছন বল্লরীকার প্রবেশ।

বল্লরীকা। স্বজনী! শোজ্‌নে কুঁড়ি!

মুকুলিকা। কি স্বজনী বড়াই-বুড়ী!

বল্লরীকা। দেখ গায় ফাগের গুঁড়ি!

মুকুলিকা। ফকুড়ি ফের? বটে?···বটে?

বল্লরীকা। দিই না দু'টি আজ কি চটে?

মুকুলিকা। দিস্‌'খুনি সেই সন্ধ্যেবেলা,
জম্‌বে যখন লোকের মেলা।
বলি হ্যাঁলা! রকম কিলো?

বল্লরীকা। রকম কি আর? দুঃসমাচার হুতুম্‌-থুমোর হুম্‌কি এলো!

মুকুলিকা। সে কি রকম?

বল্লরীকা। বন্ধ এবার বকম-বকম।

মুকুলিকা। হেঁয়ালি রাখ্‌···বল্‌না খুলে!

বল্লরীকা। দ্যাখ্‌না নিজের চক্ষু তুলে!
কুড়ুল নিয়ে আস্‌ছে কারা
অশোক বকুল শিরীষ পারুল
সব গাছেরই দফা সারা!

মুকুলিকা। কাট্‌বে না তো দোলা-সমেত তমালটাকে?

বল্লরীকা। চল্‌ দেখিগে দাঁড়িয়ে ফাঁকে।
(অন্তরালে গমন)।

(মালিনী ও স্ত্রীবেশে মালীর প্রবেশ)।

মালিনী। শিগগীর সেরে নাও, এখুনি ছোটো কর্ত্রী এসে পড়বে...মুস্কিল হবে···এই গাছটা·· এই গাছটা।

মালী। তুইওতো আচ্ছা লোক দেখছি, ...আজ পূজোর দিনে· দেবতার চোখের সাম্‌নে···জ্যান্ত গাছটাকে প্রাণে মারব?··· ছোটো কর্ত্রী তোকে বলেছে...তুই কাট্‌ না, আমার তো চাক্‌রী এম্‌নেও খসেছে, অম্‌নেও খসেছে।

মালিনী। হ্যাঁগা আমি কি পারি?... আমি হলুম নারী...যাতে জোরের দরকার সে কাজ কি আমাদের দিয়ে হয়?

মালী। আ তোমার মুখে (জিভ কেটে) বেগুন!...ছোটো কর্ত্রীকে কাল সে কথা বলিস্‌নি কেন?·· ওঁর কথায় আমি দেবতার গাছ কাটি...নিজের পায়ে কুড়ুল মারি,... বলি দেবতার কোপে পড়ে শেষে এই বুড়ো বয়সে কি আবার বিয়ে কর্‌ব নাকি?

মালিনী। তা হলই বা, বলে, ভাগ্যিমানের ...আমরা মরি!

মালী। তুই কি আমায় ভাগ্যিমানি ঠাওরালি ন্যা?

মালিনী। পুরুষ মানুষ সবাই ভাগ্যিমান ...ভাগ্যি ওদের ল্যাজে বাঁধা!

মালী। না নাঃ, শেষে কি সত্যি তোকে হারাব? কেন তুই সং সাজিয়ে এখানে নিয়ে এলি?

মালিনী। আহা, না কাটো, দুটো কোপ দিয়ে রাখনা, ছোটো কর্ত্রীর চোখে পড়ুক, কাজ দ্যাখানো নিয়ে বিষয়।

মালী। নাঃ, তোর সাহস থাকে তুই কাট্‌।

মালিনী। আহা বড় কথাই বল্লেন, উনি দেবতার মন্দির ভয় রাখেন, আমি তো রাখি নি!...আর, তোমার কাজ আমাকে কখনো সাজে!

মালী। কেন?...তোমার সাজটা আমায় দিব্যি সাজল, আর আমার কাজটা তোমায় সাজবে না? না হয় উড়ে-সুন্দরীদের মতন মালকোঁচা মারো!

মালিনী। বচনের খোঁচা দিতে খুব মজবুত, কাজের বেলায় ঢু ঢু!

মালী। ওরে! আর কোঁচাও দিতে হবে না, খোঁচাও খেতে হবে না, এইবার সিধে চোঁচা দিই চ'...কারা আস্‌ছে···

মালিনী। তা এলই বা,...চোঁচা দিতে যাব কেন?

মালী। তা নইলে এই চোঁচের মতন মোচের বাহার দেখলেই বুড়ো জেলে এখনি বোঁচা ক'রে ছেড়ে দেবে,...দিই চোঁচা .. আমা-হ'তে ও কাজ আজ কিছুতেই হবে না।

মালিনী। খবর্দ্দার, ঘোম্‌টা টেনে দাও ···পালিয়ো না।

[ বল্লরীকা ও মুকুলিকার প্রবেশ ]

বল্লরীকা। মালিনী, এ আবার কে লো?

মালিনী। ও নতুন মালিনী।

মুকুলিকা। বাস্‌ রে!···এ যে বোম্বাই মালিনী!

মালিনী। বোম্বাই কি?...ও আমার সম্পর্কে (ঢোক গিলে) বোন্‌ হয়,···দিদি।

বল্লরীকা। দিদি কি লো,···মরদ মরদ ঠেক্‌ছে যে!

মালিনী। তা' মেয়ে-ছেলেকে মরদের কাজ করতে হ'লে অমন একটু ঠেক্‌বে বই কি;...ছোটো কর্ত্রীর হুকুম তো জান না, তা মেনে চল্‌লে, ক্রমে আমাদেরও গোঁফ বেরুবে।

মুকুলিকা। তা' হ্যাঁ ভাই, তোর দিদিকে মরদের কাজ করতে হয় কেন?

মালিনী। অ-মা!...তা জানমা?...ওর যে হট্টমালার দেশে বিয়ে হয়েছে,...সেখানে গাই-বলদে চষে কিনা, তাই।

বল্লরীকা। তা ভাই, আমরা মেয়েছেলে আমাদের দেখে তোর দিদি ঘোমটা দিচ্ছে কেন?

মালিনী। (নিরুত্তর)।

মালী। (সলজ্জ অঙ্গভঙ্গী)।

মুকুলিকা। ভাই বোম্বাই মালিনী, ঘোমটা খোলো,.. তোমায় দেখি,···ভাব করবে না?...সে কি ভাই (ঘোমটায় টান দিয়ে)··· ওঃ সাবাস্‌! বোম্বাই মালিনীর গোঁফ যে রে!

বল্লরীকা। মেয়ে-ছেলের গোঁফ কি লো? ···বলি হ্যাঁ মালিনী!

মালিনী। চুপ্‌! চুপ্‌!...গোল করে কি বোন্‌? দিদি আমার লজ্জা পাবে;···তা জান না, দিদির ঐ তো রোগ! কত কবরেজ কত বদ্যি দেখলে...কিছুতেই কিছু হ'ল না। ...তা' সেদিন ওদের গাঁয়ে একজন সন্ন্যাসী এসেছিল, সে একটি মাদুলি দিয়ে গেছে,... মধুপূর্ণিমের দিন সরযূর জলে ডুব দিয়ে সেই মাদুলি ধারণ করলে নাকি ভালো হয়; তাইতো আমার এখানে এসেছে,...নইলে ওদের কিসের দুঃখু,···বলে,গোয়াল-ভরা গাই, গোলা-ভরা ধান, গা-ভরা গয়না।—তা এখন চল্লুম ভাই,...আজ আবার ক' দণ্ডের পর বুঝি

পুর্ণিমে ছেড়ে যাবে, তার আগে নাইয়ে নিয়ে আসিগে,...চল দিদি, চল, নাইবার জোগাড় দেখিগে।

( একদিকে মালী ও মালিনী ও অন্যদিকে নিপুণিকা ও বল্লরীকার প্রস্থান )

(সাজিতে ফুল নিয়ে জনকয়েক তরুণীর প্রবেশ)

প্রথমা। চল্ ভাই, এইবেলা পূজো দিয়ে আসি।...এখনি ভিড় হ'য়ে পড়বে।

দ্বিতীয়। পুরুৎ এসেচে ?

তৃতীয়। এ পূজোয় আবার পুরুৎ কি ? ...আমরাই পুরুৎ!

( গান )

সকলে। আমায়, অশোক ফুলের রূপটি দাও !
মদন ! সদয় নেত্রে চাও !
মল্লিকারি মনোহরণ
মন্ত্র শিখাও, কিশোর-শরণ ;
নীলোৎপলের কাজল দিয়ে দৃষ্টি ছাও !
আমের মুকুল আকুল আশা
সফল কর ভালোবাসা
অরুণ অরবিন্দ হিয়ায় রস বনাও !
মদন ! সদয়-নেত্রে চাও !

( মন্দিরের দিকে গমন )

( মুকুলিকা, বল্লরীকা ও অন্যদিকে নিপুণিকা ও তরঙ্গিকার প্রবেশ )

বল্লরীকা। এই যে, লোক আস্‌তে সুরু হয়েছে।

নিপুণিকা। ওলো, এর গায়ে দে, এর গায়ে দে,...

মুকুলিকা। আরে না, না, আমায় না... ছিঃ...দিলে ? নেহাৎ দিলে···দাও...আল্‌-কাৎরা টাৎরা দিয়োনা কিন্তু...

( গান )

সকলে। যদি, নেহাৎ দেবে তবে না হয় বরং
দাও আবীর চুলে গায়ে বাসন্তী রং।
যদি ফাগুণ লাগে
( প্রাণে ফাগুণ লাগে )
তবে রঙীন ফাগে
সবে, রাঙাও সখী ! প্রাণে রাজাও সারং!

মুকুলিকা। আরে বাস্ বাস্,...হয়েছে ...হয়েছে...সব রং এখনি খরচ ক'রে ফেল্লে যে...

তরঙ্গিকা। রঙের অভাব কি ?...রাজ-বাড়ীর দৌলতে কাজ্‌লা দীঘি আজ এতক্ষণ আবীরের ঠেলায় লালদীঘি হয়ে উঠল...

মুকুলিকা। ঐ দ্যাখো...ওরা আবার কারা···

( কপোতিকা ও সুপর্ণিকার প্রবেশ )

তরঙ্গিকা। এমন দিনে ধবধবে কাপড় পরে বেরিয়েছ?...তোমাদের সাহস ত কম নয়?···তোমরা কে গা?...

কপোতিকা। আমরা কপোত কপোতী···

মুকুলিকা। তোমরা বোবা পায়রা নাকি ?

কপোতিকা। শুনবে—বকম্‌ বকম?···

( গান )

আমি তোরে খুব—খুব—
খুব ভালোবাসি লো বাসি !
দিয়ে তোরি রূপে ডুব,
অপরূপ স্বপনে ভাসি !
তনু হল ঘুম্ ঘুম্,—
মনোভব-কুঙ্কুম,—
অনুভবে রুম্‌ঝুম্ অধরে হাসি !

( উভয়ের মন্দিরের দিকে প্রস্থান )

নিপুণিকা। ওরে, ওদের গায়ে রং দেওয়া হল না? চলে গেল যে...

তরুণিকা। ওদের পর খারাপ হ'য়ে যাবে,...যাক্ গে...

নিপুণিকা। আ-হা-হা-হা ফট্‌কা পায়রা ক'রে ছেড়ে দিতে হয়;...বা! আবার কারা আসে রে...

( কুসুমিকা ও ফুল্লরিকার প্রবেশ )

গলা-ধরাধরি করে তোমরা আবার কে গো?

কুসুমিকা। আমরা একবৃন্তে দুটি ফুল...

( গান )

আমরা দু'টি স্বর্গ লুটে মর্ত্ত ভরেছি!
অনুরাগের পরাগ পরিবর্ত্ত করেছি!
ফুটেছি এক বৃন্ত'পরি,
বিভোল বাতাস উদাস করি,
পরিমলের আমরা পরী মূর্ত্তি ধরেছি!
পরস্পরে পরশ করি'
পরশ-মণির ক্ষোভ পাশরি,
জীবন-মরণ প্রেমের সাধন সর্ত্ত করেছি!

নিপুণিকা। ওরে এদের ছাড়িস্ নি...দে, দে,...রং দে...

কুসুমিকা। ফুলের গায়ে আর রং দিয়ে কি হবে...আমরা অম্‌নিতেই রঙীন্...

( গাইতে গাইতে মন্দিরের দিকে প্রস্থান )

নিপুণিকা। ওঃ ধুম লেগে গেছে...আবার কারা আসছে... ওরে, মদনিকা মদন সেজেছে...হাতে ফুলের ধনুক...

( মদন রতির বেশে মদনিকা ও আরাত্রিকার প্রবেশ )

তরঙ্গিকা। মাথায় ফুলের মটুক...তোমরা কে গা?...যেন চেন চেন করছি...তোমরা কে ভাই?...

মদনিকা। যারা, কুসুম-শরে পাগল করে আমরা সেই

আরাত্রিকা। মোদের, সকল কথা ব্যক্ত হবে সঙ্গীতেই...

( গান )

উভয়ে। আমরা, কথা বলি শুধু বাঁশীতে!
করি কানাকানি মন-জানাজানি
মল্লিকা-ফুল-রাশিতে!
অঙ্কুরে মোরা মুঞ্জরি,
নয়নে নয়নে গুঞ্জরি,
আমরা, নিখিল হিয়ার হিন্দোলে দুলি
চির ভালোবাসা বাসিতে!
কুসুম-ধনুর গুণ টেনে
মরণের বুকে বাণ হেনে
জীবনেরি জয় লিখে দিই নিতি
চামেলি চাঁদের হাসিতে।

নিপুণিকা। রং দে...রং দে...

মদনিকা। সাবধান...বাণ মারব!

তরঙ্গিকা। মারো...আজ বাণ খেতেই তো বেরিয়েছি।

সকলে। মারো বাণ, করো মানা, তা ব'লে কি রং দেব না!

( হুড়োহুড়ি করতে করতে সকলের মন্দিরের দিকে প্রস্থান )

( প্রজাপতির বেশে পতঙ্গিকার প্রবেশ )

পতঙ্গিকা। ( গান )

আমি, গোপনে এসেছি স্বপনে ভেসে!
পশেছি না জেনে ফুলেরি দেশে!
হেথা, চামেলি মালতী চাঁপারে দেখে
শেষে যে অশোকে গিয়েছি ঠেকে,
এঁকে গেছে বুকে ছবি নিমেষে,
কেমনে রহি রে ভালো না বেসে!
নীরবে শুয়েছি ছুঁয়েছি চুপে

ডুবেছি ডুবেছি ডুবেছি রূপে
ডুবে ভেসে গেছি সুরেরি রেশে
প্রাণেরি গানেরি তানেরি শেষে!

[ মন্দিরের দিকে প্রস্থান ]

[ মদনিকা, আরাত্রিকা, নিপুণিকা প্রভৃতির পুনঃপ্রবেশ ]

নিপুণিকা। ওরে এইবারে দে রং···ওর পাকাটির বাণ ফুরিয়ে গেছে, তূণ খালি—

তরঙ্গিকা। বাণ মেরে ভারি উস্তম্-কুস্তম্ করা হয়েছে, না—রোসো—এই যে—এই যে—

( গান )

সকলে। ও যে, সকল হিয়া বেঁধে কুসুম-শরে—
ওরে, সবাই মারো সই কাঁকন-করে।
ওর আবীর লোহ
ওর রঙীন মোহ
মুহু, পড়ুক ঝ'রে ঝ'রে ভুবন পরে।

[ সকলের প্রস্থান।

( শ্রুতকীর্ত্তি ও নকুলিকার প্রবেশ )

শ্রুতকীর্ত্তি। আর বছর এই বসন্তোৎসবের দিনে, আকস্মিক আনন্দে, দিনের বেলাতেই অকাল-জ্যোৎস্নার ব্রত করেছিলুম···তিমিধ্বজের পৌত্র নক্রধ্বজকে পরাস্ত ক'রে সেদিন ওরা হঠাৎ নগরে ফির্‌ল···ফের্‌বার কোনো সম্ভাবনা ছিল না...আর এবার···

নকুলিকা। এবার সবাই মিলে অকাল বাদলের ব্রত করছি...হঠাৎ সব অন্ধকার-হ'য়ে গেছে।...উৎসবটা একেবারে অপৌরুষেয় হ'য়ে উঠেছে...পুরুষের নাম-গন্ধ নেই;··· অর্দ্ধেক সম্রাটের সঙ্গে তপোবনে...অর্দ্ধেক কুমারদের সঙ্গে নিরুদ্দেশ!...একলা মেয়েরাই এবার এক হাতে উৎসবের তালি বাজাবার চেষ্টায় আছে।...ভালো কথা, শবরী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে···ওর হরিণ কি রাখা হবে?

শ্রুতকীর্ত্তি। না, না, ও হরিণ ফিরিয়ে দে, ...ও আমার চাই নি,...ওর শিং নেই, কোনো বাহারই নেই...

নকুলিকা। মেয়ে-হরিণ আন্‌তে বলা হয়েছিল, যে, মেয়ে-হরিণের শিং হয় বুঝি!... ময়ূরটা? রাখব?

শ্রুতকীর্ত্তি। না, না, ও পেখম ধরে না, ন্যাড়া-বোঁচা,...বিশ্রী··

নকুলিকা। মেয়ে-ময়ূর বুঝি পেখম ধরে?...কোকিলটা?...ওটা থাক্‌···কি বল?

শ্রুতকীর্ত্তি। তুই যে বল্‌ছিস্ ও ডাকবে না,···না ডাকে তো পুষে কি হবে?

নকুলিকা। মেয়ে-কোকিল কোনো পুরুষেও ডাক্‌বেনা। কেবল ক্যার্ ক্যার্ করবে, কুহুধ্বনি ভুলেও করবে না।

শ্রুতকীর্ত্তি। তা তো আগে বলিস্ নি।

নকুলিকা। তুমি যে কোনো পুরুষ জানোয়ার পুষবে না···তা' ব'লে কি করব?

শ্রুতকীর্ত্তি। যাক্‌গে, ..আচ্ছা তুই যে কি আন্‌তে দিয়েছিলি···এনেছে?

নকুলিকা। হ্যাঁ এনেছে। একটি মেয়ে-গরু আন্‌তে দিয়েছিলুম, তা এনেছে;... তোমার মেয়ে-ময়ূর পেখম ধরবে না, মেয়ে-কোকিল গান করতে পারবে না, কিন্তু আমার মেয়ে-গরু দিব্যি দুধ দেবে।

শ্রুতকীর্ত্তি। যা তুই! ( নেপথ্যের দিকে চেয়ে ) ছি, ছি, ওদিকের গাছগুলো কেটে বাগানটা বড় বিশ্রী দেখ্‌তে হয়েছে!

নকুলিকা। তা' কি কর্‌বে বল!... ব্যাকরণে গাছকে যে পুরুষ বলেছে;···

শ্রুতকীর্ত্তি। তুই যা'…আর জ্বালাস্ নে!

নেপথ্যে। (গান)

নীল সিন্ধুর সিত পঙ্কজিনী!

জয়! জয়! জয় দেবী! আফ্রোজিনি!

নকুলিকা। ঐ দেখ তোমার মনের মতন মিছিল বেরিয়েছে, যবনীরা ওদের মেয়ে-কন্দর্পকে নৌকোয় নিয়ে গান্ গাইতে গাইতে আস্‌ছে।…ঐযে নৌকোখানার ঢাকৃনি প্রকাণ্ড ঝিনুকের মতন একবার ফাঁক হচ্ছে আর একবার বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে; ঐযে মেয়ে-কন্দর্প, নৌকোর ভিতরে অঙ্গ ঢেলে আরাম করছেন।

শ্রুতকীর্ত্তি। আর মেয়ে-কন্দর্পে কাজ নেই,…চল্, আমাদের চিরকেলে কন্দর্পকে ফুল দিয়ে আসি।

নকুলিকা। দর্প তাহ'লে টিঁকল না!

(প্রস্থান)

(ঝিলে নৌকোয় গুণ টান্‌তে টান্‌তে যবনীদের প্রবেশ)

যবনীর দল। (গান)

নীল সিন্ধুর সিত পঙ্কজিনী!
জয়! জয়! জয় দেবী আফ্রোজিনী!
শুক্তির অঙ্কে সুপ্তিহরা!
তৃপ্তির গর্ভে তৃষ্ণা-ভরা!
যৌবন-ধাত্রী গো গৌরবিনী!
স্ফূর্ত্তির যাত্রিনী আফ্রোজিনী!
দেবরাজ-পুত্রিকা মূর্ত্তপ্রীতি!
সুন্দরী! শুকতারা! আফ্রোদিতি!
চির-প্রেমপাত্রী গো সম্মোহিনী!
মনোভব-মাতৃকা! আফ্রোজিনী!

(প্রস্থান)

(অন্য নৌকায় কয়েকজন তরুণীর প্রবেশ)

প্রথমা। এগিয়ে গেল… দাসীদের নৌকো এগিয়ে গেল!…আস্পর্দ্ধা!…জোরে বাও… জোরে বাও!

দ্বিতীয়া। আজ উৎসবের দিন…কন্দর্পের দরবারে সবাই সমান…যাক্‌গে এগিয়ে… আভিজাত্যের দর্প আজ কর্‌তে নেই…চল্‌না, দিব্যি আস্তে আস্তে গাইতে গাইতে, বাইতে বাইতে যাওয়া যাবে,…আমোদ নিয়ে কথা।

সকলে। (গান)

যদি কুসুম শরে হৃদয় বেঁধে
তবে কেঁদনা,
ও যে, ফুলের সুখ-পরশ মাঝে
মৃদু বেদনা!
ওযে, দিনের দাহে কুঞ্জ-ছায়ে
স্বপ্ন আনে বিভোল্ বায়ে
ঘুমের শেষে আলোর দেশে
আধ-চেতনা।

(বাইতে বাইতে প্রস্থান)

(কয়েকজন তরুণীর প্রবেশ)

প্রথম। এই, আজ দোল্ খেতে হবে… দোল্ খেতে হবে (দোলায় উঠে)…একটু দুলিয়ে দে না ভাই…আমি আবার তোর বেলায় দেব'খুনি; নে, না।

দ্বিতীয়। আচ্ছা, নে, গান ধর…

(গান)

ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দে!
দুনিয়াতে আজ নতুন হাওয়া
দুলিয়েছে মন ভুলিয়েছে!
শাখায় শাখায় আমের মুকুল,
পারুল, চাঁপা, অশোক, বকুল—
দুল্‌ছে দোদুল আকুল হাওয়ায়
ভোমরা ফেরে পায় সেধে!

(আজ) কোকিল ডাকে নতুন স্বরে,
নতুন ফোটে নতুন ঝ'রে,
নতুন ছবি আঁখির পরে
জাগ্‌ল মোহন ফাঁদ ফেঁদে !

( নকুলিকা ও শ্রুতকীর্ত্তির পুনঃপ্রবেশ )

নকুলিকা। ( একহাতে তালি দেওয়ার ভঙ্গী ক'রে ) বাঃ! বাঃ! বাঃ।

শ্রুতকীর্ত্তি। নকুলিকা! ও আবার কি? তোর কি সবই অদ্ভুত?

নকুলিকা। একহাতে তালি দিয়ে একটু নতুন রকম ফুর্ত্তির চেষ্টায় আছি !

শ্রুতকীর্ত্তি। তা কখনো হয়?...সব বিটকেল্...

নকুলিকা। আজ কিন্তু দেখ্‌ছি সবাই ঐ চেষ্টাই করছে!...এরা দেখেও শিখছে না... ঠেকেও শিখছে না...আমি এই ঠেকে শিখলুম ...দেখলুম একহাতে তালি-বাজানো সুবিধা হয় না।

( গান )

তালি বাজ্‌লনা সই, একহাতে কই বাজ্‌ল না !
নাচতে গেলাম এক পায়ে, তাও সাজ্‌ল না !

শ্রুতকীর্ত্তি। তুই বড় বাড়িয়েছিস্।

নকুলিকা। ( সুরে )

বল্‌ছে সবাই বাড়াবাড়ি
শুক সারিতে আড়াআড়ি,
তেল ঢেলে আর ফল কি, বলো, রাধাই যখন নাচ্‌লনা।

( প্রস্থান )

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

[ হাওয়া-মঞ্জিল, সমীপ অপরাহ্ন, অন্যমনস্কভাবে উর্ম্মিলার প্রবেশ। ]

নেপথ্যে। ( গান )

রইল না রে জীবন
এ আর রইল না !
যারি পরে ভরসা
শেষে সেই দেখি ভর্ সইল না !
না দেখি আর কূল পাথারে
শকতি যে নাই সাঁতারে,
ভেরে এল অঙ্গ
ভরা ডুব্‌ল বুঝি রইল না !

উর্ম্মিলা। বিহঙ্গিকা! বিহঙ্গিকা!... এ সঙ্গীত তুই কোথায় পেলি...আমার কুণ্ঠিত অন্তরের অস্ফুট হাহাকার সুরের ইন্দ্রজালে কি ক'রে ফুটিয়ে তুল্‌লি! বিহঙ্গিকা!...কই বিহঙ্গিকা তো এখানে নেই!...কে গাইলে? ...বেলা প'ড়ে আসিছে...পড়ন্ত রোদ্দুরে ঝরা বকুলগুলো শুকিয়ে কুঁক্‌ড়ে যাচ্ছে,... আমার মনের ভিতরটাও অম্‌নি শুকিয়ে যাচ্ছে...ঠিক অম্‌নি কুঁক্‌ড়ে যাচ্ছে...হুতাশের হাওয়া বইছে...আর যে পারছি না, আর যে সইছে না.. কি কল্লুম,...কি হ'ল; বিধাতা!... যে দুর্ব্বল...তার পায়ে পায়ে অপরাধ...পদে পদে আতঙ্ক...সে কেবল কাঁদতেই জন্মেছে।

( চোখ ঢেকে নীরবে ক্রন্দন )

( সীতার প্রবেশ )

সীতা। উর্ম্মিলা!...ছি বোন্...শুধু শুধু চোখের জল ফেল্‌তে নেই...ওতে অমঙ্গলকে ডেকে আনা হয়।...দুর্দ্দিন আস্‌বার আগেই তুই যে আতঙ্কে শুকিয়ে যেতে বসেছিস্,... কপালে দীর্ঘ বিচ্ছেদ থাকে...তা কি তুই চোখের জল দিয়ে রদ করতে পারবি?

উর্ম্মিলা। না দিদি, আমি তো কাঁদিনি ...কে গান গাইছিল,...সেই গান শুনে, মনটা কেমন যেন উদাস হ'য়ে গেল;...গানের সুর শুন্‌লে আমার প্রাণের ভিতরটা কেমন আকুলি বিকুলি করতে থাকে...চোখ ছল্ ছলিয়ে আসে...ও কিছু নয়!

সীতা। আমাকে ভোলাস্‌নি, বোন্,… ধূমকেতুর ধোঁয়ায় এখনো তোর মনটা ঘোলাটে হ'য়ে রয়েছে! প্রাণের ভিতর যার কান্নার মেঘ থম্‌থমিয়ে আছে, গানের হাওয়ায় তারি বাদ্‌লা নামে। সহজ হ'য়ে নে…সহজ হ'য়ে নে;…গ্রহ-তারা ফলের সূচক মাত্র… ধূমকেতু বল্‌ছে তোমার আমার চল্‌বার পথে বিস্তর বিঘ্ন আছে!…কিন্তু সেই বিপদে যে ডুব্‌ব তা কে বল্‌লে?…ধূমকেতু বলে গেল, বন্যা আস্‌বে, বাঁধের মাটি আল্‌গা, সাবধান! এমন অবস্থায়, লোক বাঁধের গোড়ায় নতুন ক'রে মাটি দ্যায়, না চোখের জল ঢেলে বন্যার আগেই বাঁধ ধ্বসিয়ে দ্যায়?…কি করে?… বল্ দেখি!

ঊর্ম্মিলা। যার বাঁধ দেবার শক্তি আছে সে বাঁধ দ্যায়, যার নেই সে কাঁদ্‌তেই বসে।

সীতা। তোর শক্তি নেই কি ক'রে জান্‌লি?

ঊর্ম্মিলা। নিজের শক্তি নিজে জানিনে?

সীতা। না, জানিস্‌নে,…তুই কেন,… কেউ জানে না,…ঘাড়ে বোঝা না চাপ্‌লে ঘাড়ের যে কতটা জোর তা পরীক্ষা হয় না;…বিপদ ঘাড়ে এসে পড়লে মানুষ অসাধ্য সাধন করে; …মানুষের শক্তির সীমা নেই।

( দাসীর প্রবেশ )

দাসী। ছোটো কর্ত্রী আপনাদের কাছে নিবেদন করছেন,…কামরূপ থেকে একজন ভাণমতী এসেছে।

সীতা। কোথায়?

দাসী। এই মেয়ে-মহলের অঙ্গনে।

সীতা। চল্ ঊর্ম্মিলা, ভাণমতীর খেলা দেখিগে।

ঊর্ম্মিলা। চ—লো।

( প্রস্থান )

## তৃতীয় দৃশ্য

[ মেয়ে-মহলের অঙ্গন। দূরে দস্তুর প্রাচীর; চারিদিকে বেলে-পাথরের ঘর; সোনার জাল-আঁটা ঝরোকা; নাগদন্তের ভরনায় জালির বারাণ্ডা। সখীর দল; সিংহ-পীঠিকায় মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি; পাদপীঠিকায় বিহঙ্গিকা, কুরঙ্গিকা; মাটিতে ভাণমতী। ভাণমতীর উঁচু খোঁপা, পরনে নীলাম্বরী, গাছ-কোমর ক'রে বাঁধা। এক হাতে আস্ত শাখের শাঁখা, এক হাতে একটা গাছের শিকড় কঙ্কণের আকারে জড়ানো। এক কাণে কড়ি, আর এক কাণে আধ্-কপালে সুপারি। হাতে ময়ূরপুচ্ছের চামর। সাম্‌নে একটা আধ-খোলা বেতের ঝাপি। একটা শূন্য খাঁচা ও একটা রঙীন হাঁড়ি। ]

ভাণমতী। লাগ্ ভেল্‌কী লাগ্, জলে জ্বালাই আগ, লাগ্ ভেল্‌কি লাগ্! লাগ্ লাগ্ লাগ্!

( গান )

আস্‌মানে শিকলি লট্‌কিয়ে দোল্ খাই,
গাছ রুয়ে সাজো ফল ফলাই,
শূনো পিঁজ্‌রাতে পাপিয়া ময়নায়
সিরজিয়ে হরেক বোল্ বলাই!

মাণ্ডবী। বটে! তবে তো খুব গুণিন্ দেখ্‌ছি!…আর কিছু দেখাতে পারো?

ভাণমতী। ( গান )

কেউটিয়া গোখ্‌রো মুখ-থেকে নিক্‌লাই,
ইসারায় হয় মোর ফুল বিষ্টি!
নখের আয়নাতে দুনিয়াটা উজ্‌লাই,
মন্তরে তারা চাঁদ ছিষ্টি!

মাণ্ডবী। তুমি নখ-দর্পণ জানো?

ভাণমতী। জানি কিছু-মিছু!

শ্রুতকীর্ত্তি। আচ্ছা দেখাও।

[ একদিক দিয়ে সীতা, উর্ম্মিলা ও অন্যদিক দিয়ে নকুলিকার প্রবেশ ]

মাণ্ডবী। এই যে, দিদি,...এস,...এখানে নখদর্পণ হচ্ছে।

সীতা। (বস্‌তে বস্‌তে) ভাণমতীকে ডাকালে কে? শ্রুতি বুঝি? মেয়েদের সব কেরামতী এক দিনেই দেখে ফেল্‌তে হয় বুঝি?

মাণ্ডবী। না কেউ ডাকায় নি,...আপনি জুটেছে!

ভাণমতী। তিন তুড়ি তিন ফুঁক্!
দিই কুক্ কাঁপে বুক
ধুক্‌পুক্···ধুক্‌পুক্!
ঝক্ ঝক্ করে নখ!
এই দ্যাখ কার মুখ!

নকুলিকা। দেখি! দেখি! বাঃ আশ্চর্য্য! ···যুবরাজ রামচন্দ্র!

ভাণমতী। দিই ফুঁক্ কাঁপে বুক!
ঝক্ ঝক্ করে নখ!
চেয়ে দেখো কার মুখ!

সীতা। আশ্চর্য্য...দেবর লক্ষ্মণ!...বাঃ, চোখ না পাল্‌টাতেই বদ্‌লে গেল! বাঃ...এ কে?...বাঃ—এ যে দেবর ভরত!

উর্ম্মিলা। আবার বদ্‌লাচ্ছে···এবার শ্রুতি ভালো ক'রে দ্যাখ...কে!

মাণ্ডবী। এ বর ...শ্রুতকীর্ত্তির!

সখীরদল। দ্যাখোগো!...হ্যাঁগা...ওগো ...অ ভাণমতী!···বলি থামো না,···সবাই মিলে...ওগো!

মাণ্ডবী। আহা সবাই মিলে কি কলরব হচ্ছে?...আচ্ছা ভাণমতী, নখদর্পণে যাঁদের দ্যাখালে, তাঁরা এখন...এই মুহূর্ত্তে কোথায় আছেন, কি করছেন, তা তোমার বিদ্যার বলে দ্যাখাতে পারো?

ভাণমতী। (হেসে) পারি কিছু কিছু! ···আয়, আয় চলে আয়, কে যায়, কে যায়? পুবদিকে কে যায়?···ঐরাবতে ইন্দির যায়... ...হাজার চক্ষে কটমট চায়, চোখে দেখিস্, না, নখে দেখিস্? ..নখেও দেখি, চোখেও দেখি!...ঠিক বল্‌ছিস্ তো?...হাঁ গুরু হাঁ,... ঠিক বল্‌ছি,...হাঁ তাই বল্,...আর, না দেখিস্ তো চশ্‌মা নে,...মনের ছবি আস্‌মানে!··· ইন্দির যায়! ইন্দির যায়! পুবদিকে আর কে যায়?···বঙ্গ মগধের রাজা যায়···

"মাথাতে যার বরুণছত্র, সমুদ্র যার সেনা।
মীণাঙ্ক যার ঝাণ্ডা নিশান, কড়ির লেনা দেনা॥

সকলে। চমৎকার! চমৎকার!

ভাণমতী। নাঃ পুবদিকে নেই! পশ্চিম দিকে কে যায়? মকর-বাহন বরুণ যায়! অথই জলে দিক ভোলায়! সাঁতার জলে ফুল ছড়ায়! পাথার জলে জাল জড়ায়। আর কে যায়?...সিন্ধু-সুরাটের রাজা যায়,

ঘোড়ায় চ'ড়ে হেলার ভরে,
সিংহ হাতী শিকার করে।
শূলের আগায় হূনের মাথা
শকের সকল দর্প হরে॥

চোখে দেখছি না নখে দেখছি?···নখের কল্যাণে চোখেই দেখছি!

সকলে। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

ভাণমতী। নাঃ এদিকেও নেই!··· দক্ষিণদিকে কে যায়?...মহিষবাহন যম যায়! যমের ভাই নিয়ম যায়!...যমদূতেরা চোখ

পাকায় !...আর কে যায়, লঙ্কার রাজা রাবণ যায়...

"বড়বা-মুখ যজ্ঞকুণ্ডে
শত্রুমুণ্ড দ্যায় আহুতি।
দশটা মাথা, বিশটা ফন্দী,
লাখের উপর নাতি পুতি॥

সকলে। এই রাবণ!...ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি!... কি ভীষণ!

ভাণমতী। নাঃ এদিকেও নেই!... বাকী আছে উত্তর,...উত্তর দাও উত্তর দিক! যা' দেখাবে ঠিক্ ঠিক্! উত্তর দিকে কে যায়? ...মানুষের কাঁধে কুবের যায়, সোনার গুঁড়ো উড়িয়ে যায়!...সোনার কুমড়ো গড়িয়ে যায়! ...আর কে যায়, সিদ্ধপুরের রাজা যায়,...

"সোনাপোকার পেট টিপে যে
বার ক'রে স্থায় সোনা।
ধ্বজাতে যায় সপ্তচামর
হাওয়ায় আনাগোনা॥"

নাঃ এদিকেও নেই!

সকলে। (সভয়ে) সে কি!...

মাণ্ডবী। সেকি?...কোথাও নেই কি? ভালো ক'রে স্থাখ...ভালো ক'রে দ্যাখ!

ভাণমতী। নখেও দেখলুম, চোখেও দেখলুম, লোকেও দেখলে, আমিও দেখলুম, সিদ্ধপুরে নেই, যম-কোটিতে নেই, লঙ্কায় নেই, কোথাও নেই!...বায়ুকোণে বায়ু বল্লেন ওড়াই নি, ..অগ্নিকোণে অগ্নি বললেন পোড়াইনি; ঈশানের জট খালি, নৈর্ঋতের কোল খালি!

শ্রুতকীর্ত্তি। কী বকছ...ভালো ক'রে দ্যাখ—

ভাণমতী। ফের তুড়ি ফের ফুঁক! ধুক্‌পুক্—ধুক্‌পুক্॥ নয়, তিন, তিন এক। দূরে নেই কাছে দ্যাখ। পায়ের তলায় চাতাল দেখি, চাতালের তলে পাতাল দেখি!

পাতালে দেখি বাসুকি।
সুধার ভাণ্ড কোলে ক'রে
নাগ বাসুকি অসুখী॥

হাজার মাথা নেড়ে বলছেন, হেথায় নেই, হেথায় নেই, হেথায় নেই!...তবে কোথায়? নয়ে তিন তিনে এক, মাথার উপর চেয়ে দ্যাখ; মাথার উপর কি দেখি? অরুণ-রথে সূর্য্যিকে দেখি।—সূর্য্যি মামা, সূর্য্যি মামা, মাথা খাও। সূর্য্যি বংশের চুড়ো দেখাও!

সূর্য্যি বল্লেন ইশারায়,
ইশারায় দিশা পাই!
কি দেখিরে কি দেখি,
সূর্য্যি-বংশের চার চুড়ো চার ভাইকে দেখি!
—সরযূর তীরে সব্বাইকে দেখি,—কিন্তু—
চার জনকেই ঘেরাও করে,
দিচ্ছে হাঁকার বুনোর দল!
কোশল রাজ্য উঠছে কেঁপে,
এমনি বিষম কোলাহল।

মাণ্ডবী। ভাণমতী! এ তোমার কী ভাণ?

ভাণমতী। (নিজের মনে) চোখে দেখিস্?...না নখে দেখিস্?...গুরুর দয়ায় চোখেও দেখি, নখেও দেখি,...ঠিক দেখ্‌ছিস্? হঁ গুরু-হাঁ! গুরু বলছেন, না দেখিস্ তো চস্‌মা নে...মনের ছবি আস্‌মানে।

শ্রুতকীর্ত্তি। একে ছেড় না!... নকুলিকা!...যবনী সান্ত্রীকে ডাক্,...এ বোধ হয়...বুনোদের চর,...শত্রুর চর,...আমি আস্‌ছি...ছেড় না!...

ভাণমতী। (অট্টহাস্য) হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ! (হাসির ধমকে সকলে চোখে অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌ল; সমস্ত গোলমাল হ'য়ে গেল, এই সুযোগে ভাণমতীর প্রস্থান)।

## চতুর্থ দৃশ্য

(প্রাসাদ শিখর; শতঘ্নী-সজ্জিত প্রহরা-গুম্বজ; চূড়ায় চূড়ায় সোনার কলস। শবরীর দেওয়া পায়রা বুকের ভিতর ক'রে নিয়ে শ্রুতকীর্ত্তির প্রবেশ।)

শ্রুতকীর্ত্তি। হাজার হাজার পাহাড়ী নগরের দিকে আস্‌ছে,·· সরযূর জল তোলপাড় ক'রে আস্‌ছে,...কী সর্ব্বনাশ!...নগরে সৈন্য নেই,...সেনাপতি যুবরাজদের সঙ্গে,...কী করব?...মন্ত্রী-পরিষদে খবর দেব? তারা কি খবর পায় নি?...চরেরা খবর দ্যায় নি?··· কী করব?...সর্ব্বনাশ হ'ল!...দুর্গ-রক্ষার কোনো আয়োজন নেই,···কোনো বন্দোবস্ত নেই,...যবনী-সান্ত্রীদের খবর দেব?···দুর্গে চার পাঁচ শো মেয়ে আছে···তাদের সবাইকে হাতিয়ার দেব?···দুর্গের দরজা বন্ধ ক'রে লড়াই করব?···কিন্তু এঁদের চার ভাইকে যে পাহাড়ীরা ঘেরাও ক'রেছে! হয়তো বন্দী ক'রেছে;···যুদ্ধ করলে এঁদের যদি অনিষ্ট করে? বর্ব্বরগুলো যদি প্রাণের হানি ঘটায়?...কী করব?·· আর ভাব্‌তে পারি নে···ভাব্‌বার সময় নেই...আংটি বেঁধে পায়রাটাকে ছেড়ে দিই!···পায়রা ঠিক্ পৌঁছবে তো! পায়রা পরখ ক'রে নিই নি, ...শবরী ঠকায় নি তো?···ভাব্‌বার সময় নেই...

(পায়রা উড়িয়ে দিলেন)

যাচ্ছে...যাচ্ছে...ঐদিকেই যাচ্ছে!

(ব্যগ্রভাবে পায়রার গতি নিরীক্ষণ)

(নকুলিকার প্রবেশ)

নকুলিকা। বাঃ! সাবাস্!···পায়রা পাঠানো হচ্ছে?···এই বুঝি প্রতিজ্ঞা?

শ্রুতকীর্ত্তি। থাম্ তুই নকুলিকা!··· বিপদের সময় বিদ্রূপ ভালো লাগে না।

নকুলিকা। বিপদ!···কিসের বিপদ!

শ্রুতকীর্ত্তি। দেখ্‌ছিস্ নে?...পঙ্গপালের মতন আস্‌ছে,···নগর অরক্ষিত,...দেখ্‌ছিস্ নে?

নকুলিকা। তুমি পাগল!...সে ভাব্‌না তোমার কেন? যারা রাজ্যের কর্ণধার, তারা কি ভাব্‌ছ, সত্যিই স্ত্রীলোকের হাতে দুর্গ সঁপে নিশ্চিন্ত আছে?...কঞ্চুকের জায়গায় কঞ্চুলিকা বাহাল করেছে?···তুমি ভুল বুঝেছ;...রজ্জুতে তোমার সর্পভ্রম হয়েছে;... পাহাড়ীরা দুর্গ লুঠ্ করতে আস্‌ছে না,... তুষার-প্লাবনে গরীবদের সর্ব্বস্ব গেছে...তাই আশ্রয়ের ভিখারী হ'য়ে ওরা দিগ্বিদিকে বেরিয়ে পড়েছে,...পথে যুবরাজদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা,···তাঁদের কাছে দুঃখ জানাতে,... আশ্রয় দেবেন বলে আশ্বাস দিয়ে, তাঁরাই ওদের সঙ্গে নিয়ে আস্‌ছেন। ঐ দ্যাখো, সূর্য্য-বংশের চার চুড়োর চারখানা রথের চুড়োতেই সগৌরবে নিশান উড়্‌ছে।...

শ্রুতকীর্ত্তি। তুই এত খবর কোথায় পেলি?

নকুলিকা। নগরের দরজায় পাহাড়ীর দঙ্গল দেখে পাছে নগরের লোক ভয় পায়, তাই তাদের আতঙ্ক নিবারণের জন্যে মন্ত্রী-পরিষদ এইমাত্র ঘোষণা দিয়ে জানিয়েছেন;···

সেই খবরই তোমায় দিতে আস্‌ছিলুম ; আসতে আসতে দেখি, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার বিরহ-যন্ত্রণা সইতে না পেরে…কাব্যের নায়িকার মতন, সখী আমাদের কপোত-দূত প্রেরণে ব্যস্ত !

শ্রুতকীর্ত্তি। আমি কি পায়রা পাঠাতুম্‌, …ভাণমতীর ভড়ুঙে কথায় আর বর্ব্বরদের ভিড় দেখে মনে হ'ল,…হয়তো ওরা বিপদে পড়েছে !…তা ওরা সোজাসুজি দুর্গে না এসে সরযূর তীরে কি করছে ?

নকুলিকা। তোমরা না ডাক্‌লে ওঁরা দুর্গে ফির্‌বেন না, বলেছিলেন, বোধ হয়, সেই প্রতিজ্ঞা পালন করা হচ্ছে।…এইবার আস্‌বেন…তোমার কপোত-দূত পৌঁছলেই আসবেন।

শ্রুতকীর্ত্তি। হার হ'ল নকুলিকা, আমাদেরি হার হ'ল !

নকুলিকা। (হেসে) হারটাকে যদি জিৎ ব'লে প্রমাণ ক'রে দিতে পারি ?…কি উপহার দেবে ?

শ্রুতকীর্ত্তি। (সাগ্রহে) যা চাস্‌ !

নকুলিকা। আচ্ছা, এই কথাতো ?… তবে শোনো…একে একে সব বলি, প্রথম কথা, তোমার পায়রা যে রাজকুমারের কাছে ঠিক পৌঁছবে…তা কি ক'রে তুমি জান্‌লে ?… শবরী যদি ঠকিয়ে থাকে ?

শ্রুতকীর্ত্তি। আমিও একটু আগে সে কথা ভাব্‌ছিলুম।

নকুলিকা। ভেবে কি ঠাওরালে ?

শ্রুতকীর্ত্তি। কিছু নাঃ !

নকুলিকা। পায়রা পৌঁছবে !…

শ্রুতকীর্ত্তি। বলিস্‌ কি ?…তা হ'লে…

নকুলিকা। পৌঁছবে,…তার কারণ, তুমি পায়রা যাঁর কাছে পাঠিয়েছ, শবরীর মারফতে পায়রাটি তিনিই পাঠিয়েছিলেন।… ও চিঠি-বাজ পায়রা, ঠিক পৌঁছবে !…আরও খবর আছে, ভানমতীও তাঁরই চর।

শ্রুতকীর্ত্তি। সব বুঝেছি,…তা' হ'লে কৌশলে আমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়েছে, ছলে হার মানিয়েছে !

নকুলিকা। অবলা ব'লে তাচ্ছিল্য ক'রে বলপ্রকাশ করে নি, কৌশলে হার মানিয়েছে…তুমি এ পরাজয়কে পরাজয় বলে স্বীকার কর ?

শ্রুতকীর্ত্তি। না !

নকুলিকা। (হাত পেতে) বক্‌শিস্‌ !… প্রমাণ ক'রে দিয়েছি।…যা বলেছিলুম প্রমাণ ক'রে দিয়েছি।

শ্রুতকীর্ত্তি। তুই সব জান্‌তিস্‌ ?

নকুলিকা। না ঠিক জান্‌তুম না,… খানিকটা আন্দাজ…খানিকটা জানা…

শ্রুতকীর্ত্তি। অথচ আমায় বলিস্‌ নি,…উপহার দেব তোমায় ?…উপহার দেব না প্রহার দেব…

(সীতা, উর্ম্মিলা ও মাণ্ডবীর প্রবেশ)

সীতা। শ্রুতি, খবর পেয়েছিস্‌ ?

শ্রুতকীর্ত্তি। পেয়েছি !

মাণ্ডবী। শুধু মন্ত্রী-পরিষদের ঘোষণা নয়, আরো খবর আছে…

সীতা। মহাদেবী সুমিত্রার কাছে এইমাত্র পত্র এসেছে…সম্রাট বশিষ্ঠাশ্রম থেকে নগরের দিকে যাত্রা ক'রেছেন,…আজই রাত্রে পৌঁছবেন।

শ্রুতকীর্ত্তি। অ!

মান্দবী। অ!...খবরটায় পেট ভরল না,...তবে ত্থাখ,...সম্রাটের চিঠি...( চিঠি দিলেন )...এইখানটা পড়ে ত্থাখ...

শ্রুতকীর্ত্তি। ( পাঠ ) পরে মহর্ষি বলিলেন, যে, যে পাপের জন্য বাল্মীকি নিষাদকে অভিসম্পাৎ দিয়াছিলেন, ভাবিয়া দেখিলাম, আমি কিয়ৎ পরিমাণে সেই পাপের ভাগী হইতে বসিয়াছি। সময় থাকিতে সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। অতএব শ্রীমান্ ও শ্রীমতী বধূ-মাতাদের গ্রহ-শান্তির জন্য পূর্ব্বে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলাম, মদন-মহোৎসবের রাত্রে তাহা রহিত করিতে চাই। বিরহ-দুঃখ উভয় পক্ষই ইতিমধ্যে অল্পবিস্তর ভোগ করিয়াছেন। অলম্ অতি বিস্তরেণ। ফল হইবার হয় উহাতেই হইবে। ইতি...

মাণ্ডবী। ওঃ! একটা দিনের মধ্যে...কত কাণ্ড, কত বিভ্রাট,...কী তুলক্রাম!...কিন্তু শ্রুতি!...তুই মাঝে থেকে কি কাণ্ড কর্‌লি বল দেখি!

সীতা। সে কথা আর তুলিস্ নি, বোন,...

ঊর্ম্মিলা। যেতে দাও...যেতে দাও... ছেলে মানুষ...

নকুলিকা। ও কিছু নয়,...একে এই দারুণ গরম,...তার উপর নতুন বিরহ,...তার উপর ধূপের ধোঁয়া...একেবারে তেরস্পর্শ!...এতে মাথাটা একটু বেঠিক হবারই কথা। ঠিক থাকাই বিচিত্র।

সকলে। ও কিছু নয়...ও কিছু নয়...

( নীচের তলায় শঙ্খ, ঝারি, বন্দন-মালা প্রভৃতি নিয়ে সখীর দলের প্রবেশ। )

সখীর দল। ( গান )

কিছু নয়, ধূপের ধোঁয়ায় হঠাৎ কেমন
মাথাটা গেছ্‌ল ঘ'রে।
মনে হয়, স্বপ্ন যেন চক্ষু মেলে
দেখেছি দিন দু'পরে!
কলহ দম্পতীর এই, দোষ কিছু নেই,
সবারি ঘটে এমন,
বিরহ বিদ্রোহী হয়, জ্বলে হৃদয়,
গোপনে গলে নয়ন!
খেয়ালে দেয়াল তুলে মনের ভুলে
মিছে রই মুখ ফিরায়ে,
শেষে ঠিক মেঘ কেটে যায়, চাঁদ হেসে চায়
নীরবে মন ভিড়ায়ে!
সারীশুক পুরুষ নারী দুই দোঁহারি
আড়াআড়ি মোহের ঘোরে,
হ'য়ে রয় হাসির কথা দ্বন্দ্ব-ব্যথা
চোখের জলে মুক্তা কোরে।

যবনিকা।*

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

* এই নাটিকায় রাজবধূদের মাথায় স্বস্তি-মুকুট; পরনে তিল-ফুল বুটিদার ও ভোম্‌রা বুটিদার ও ভাণ্ডীর-বুটিদার জরির তেরছা ডুরে। কাণে কর্ণিকা; হাতে 'যবাঙ্কুরী' নামক উৎসর্পী কঙ্কন; গলায় মুক্তার শতাবলী হার; কোমরে কাঞ্চী; পায়ে 'ভ্রমরী' নূপুর। প্রধান সহচরীদের মাথায় মুক্তার সীমন্তিকা; পরনে জরির তেরছা ডুরে, বুটি নাই। কাণে 'তালপত্রী'; হাতে তালী কঙ্কন; পায়ে 'গুঞ্জরী' নূপুর। তরুণীদের মাথায় মুক্তার একাবলী; পরণে বাসন্তী রঙের শাড়ী। কাণে চাঁপা, হাতে গুঞ্জাবলী কঙ্কণ; পায়ে নূপুর। গায়ে ফুলের গহনা। বধূনাট্যের কারো মাথায় চাঁপাই চুড়ো, কারো জোড়-চামর-খোঁপা, কারো ত্রিধম্মিল্ল, কারো চতুঃশৃঙ্গ, কারো পঞ্চফণা। বেত্রবতী ও যবনীদের গায়ে কঞ্চুক; কানে কুণ্ডল।

# ভারতের ভবিষ্যৎ

( ফরাসী হইতে )

দেশের অবস্থা ও লোকের মনের গতি আলোচনা করিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের যাহা মনে হয় এক্ষণে তাহার একটু আভাস দিব।

পর পর দুইটি প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। প্রথম প্রশ্নটি এই :—ভারত বিদ্রোহী হইবে কি? পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য আর একবার শেষ চেষ্টা করিবে কি?

এই প্রথম প্রশ্নের উত্তরে ইহা নিশ্চিত-রূপে বলা যাইতে পারে, ভারতের বিদ্রোহ অসম্ভব।

অবশ্য এখনো ভারতে এমন-সব উপাদান বর্ত্তমান আছে যাহা হইতে বিদ্রোহ উৎপন্ন হইতে পারে। জাতিতে জাতিতে বৈরিতা, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অন্ধ-উন্মত্ততা, দুর্ভিক্ষ, লোকের রীতিনীতির সংস্কার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা।

কিন্তু ১৮৫৭ অব্দে যে অবস্থা ছিল এখন আর সে অবস্থা নাই। সেই বৃহৎ বিদ্রোহ পদদলিত ও নিষ্পেষিত হইয়াছিল; এরূপ চেষ্টা আবার যে হইবে তাহা মনে হয় না। ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে গতিবিধি পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ হইয়াছে, নিত্য নিয়মিতভাবে চলিতেছে। ব্রিটিশগভর্মেণ্ট, এখন অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানেডা, ইজিপ্ট ও কেপের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে পারে। য়ুরোপীয় সভ্যতা স্পষ্টরূপে ও নিশ্চিতভাবে জয়লাভ করিয়াছে। ভারত-বাসীরা ইহার প্রভাব বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, এবং উপভোগ করিতেছে। এ সভ্যতা চলিয়া যায় কাহারও ইচ্ছা নহে। তা ছাড়া য়ুরোপীয় সভ্যতা সমগ্র এসিয়া-খণ্ডে সর্ব্বশক্তিমান। ১৮৫৭ অব্দে সাইবিরিয়া ও ভারতবর্ষ ছাড়া য়ুরোপের আর কোন অধিকৃত দেশ ছিল না। অধুনা রুশিয়া মধ্য-এসিয়া জয় করিয়াছে, ইংলণ্ড বেলুচিস্থান জয় করিয়াছে। ফ্রান্‌স ও ইংলণ্ড ইন্দো-চীনকে আপনাদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। জাপান স্বকীয় রীতি-নীতির ও প্রতিষ্ঠানাদির সংস্কার করিয়াছে। য়ুরোপীয় রাষ্ট্রশক্তি সকল,—তুর্কি, পারস্য ও চীনের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছে। প্রতিদিন সকল দেশের জাহাজ ভারতের বন্দরে আসিয়া লাগিতেছে। ভারত-বাসীরা বুঝিতেছে,—তাহাদের সভ্যতা পরাজিত হইয়াছে এবং ইংলণ্ডের অবিদ্যমানে, যুক্ত-রাজ্য, রুশিয়া, ফ্রান্‌স কিংবা জর্ম্মনি পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহাদের স্কন্ধে আবার চাপাইয়া দিবে।

* * *

তারপর দ্বিতীয় প্রশ্নটি এই :—

ভারতীয় সভ্যতা হিন্দ-য়ুরোপীয় সভ্যতায় কিরূপে পরিণত হইবে?

এই সমস্যার সমাধানটি প্রথমেই এইরূপ-ভাবে উপস্থিত হয়; ভারতবাসীরা অনতি-বিলম্বে ইংলণ্ডের জোয়াল স্বকীয় স্কন্ধ হইতে ফেলিয়া দিবে এবং জাপানীদিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে আপনাদিগকে রূপান্তরিত করিবে। বিদ্রোহের পরিবর্ত্তে একটা বিপ্লব ঘটিবে। ভারতবর্ষে একদল বৈপ্লবিক যে আছে তাহাতে সন্দেহ নাই :—ইংরেজি স্কুলের অল্প-বয়স্ক ছাত্রবৃন্দ। উহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই একমাত্র অবলম্বন—গভর্ণমেণ্টের চাকরী; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ত সকলকেই চাকরী দিতে পারেন না। যাহারা চাকরী পায়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের উন্নতির আশা অল্পই। যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অনুগৃহীত, তাহারাও বড় চাকরী কখনই পায় না। এই সব হত-ভাগ্য উমেদার ও অসন্তুষ্ট কর্ম্মচারীরা, শেষে সংবাদপত্রের সম্পাদক, সভা-সমিতিওয়ালা ও জন-বক্তা হইয়া দাঁড়ায়; তাহারা উপস্থিত রাষ্ট্রপদ্ধতির বদল চায়, পরিবর্ত্তনের দাবী করে—সে পরিবর্ত্তন যাহাই হোক্ না কেন। কিন্তু সফলতা লাভ করিতে হইলে, জন-বক্তাদিগের দলে জনসাধারণকে পাওয়া চাই, কিন্তু জনসাধারণ, ক্ষেত্রভূমি সম্বন্ধীয় কিংবা সমাজ সম্বন্ধীয় কোন কথার উদ্দেশেই রাষ্ট্র-বিপ্লবে যোগ দিয়া থাকে। ভারতবর্ষে ক্ষেত্রভূমি ঘটিত কোন সমস্যা নাই। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশসমূহে ভূমি কৃষকের; বঙ্গদেশে চাষীর স্বত্বাধিকার জমিদারের বিরুদ্ধে; সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, জমিদার গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না। যদি ভারতে কোন সামাজিক সমস্যা কখন উপস্থিত হয়, সে বর্ণভেদ পদ্ধতির বিরুদ্ধেই হইবে, ইংরেজ-শাসন পদ্ধতির বিরুদ্ধে নহে। বর্ণভেদ পদ্ধতির পক্ষ সমর্থন করায় ইংরেজের কোন গরজ নাই। ভারতবাসীরা যদি জেদ্ করিয়া এ বিষয়ে বাধা না দিত তাহা হইলে ইংরাজেরা কোন্-কালে জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধন করিত।

তা ছাড়া বাঙ্গলায় কোন আন্দোলন উপস্থিত হইলে বোম্বায়ে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, অথবা দাক্ষিণাত্যে তৎসম্বন্ধে অল্পই সহানুভূতি হইবে। মুসলমানেরা উহার বৈরী হইবে এবং রাজারা উহার বিরোধী হইবে।

ইংরাজের আধিপত্য হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে ভারতের এক হওয়া চাই। কিন্তু অতি-বৃহৎ অতি-অধ্যুসিত বিচ্ছিন্ন উপাদানসমূহে সংগঠিত ভারত, জাপানের মতো হঠাৎ একটা বিপ্লব বাধাইয়া একতা সম্পাদন করিতে কখনই পারিবে না। ভারতের একতা আস্তে আস্তে ছাড়া তাড়াতাড়ি কখনই হইতে পারিবে না, আর সে একতা কোন এক পাশ্চাত্য রাজশক্তির প্রভাবাধীনে সংসাধিত হইবে। ইংলণ্ডই কি সেই রাজ-শক্তি? হাঁ, তাহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# উনো-দুনো

যারা উনিশ কিম্বা উনত্রিশের আর উনচল্লিশের একটুও বেশি নয়, তারা কোনো-মতেই বুঝতে পারবে না উনপঞ্চাশে মানুষের কি অবস্থা করে! এ-সময়টায় সভাপতি হয়ে স্থির হয়ে বসা কিম্বা গুছিয়ে কিছু বলা একেবারেই মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় বোলে আমার তো বিশ্বাস নেই। উনষাটের ঘাটে নিরাপদে পৌঁছবার জন্যে মানুষ তখন পোঁটলা-পুঁটুলি গুছিয়ে নিতেই এমন ব্যস্ত থাকে যে সময়ে খাওয়া, সময়ে নিদ্রা, কিছুরই ঠিক থাকে না; ফলে ডাক্তার-বদ্যি ডাকতে হয়। তারা পাঁচজনে মিলে কোনো-রকমে ষাটের ঘাটের দিকে ঠেলে-ঠুলে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করে; সব সময়ে যে পারে, তা নয়। ষাট্ ষাট্ বোলে যদি বা উনষাটের ঘাট পার হওয়া গেল, তখন উনসত্তরের পারে সত্তর পৌঁছবার জন্যে এমন তাড়া পড়ে যায় যে চোখে-মুখে দেখবার অবসর থাকে না। উন-আশির দিকে চেয়ে কেবলি মনটা বলতে থাকে "আসি, আসি!" তারপরে জীবন-নদীর দুই পারে দুটো ঘাট উন-নব্বইয়ের আর নিরেনব্বইয়ের, বোঝা বইতে-বইতে নৌকো গিয়ে তীরের কাছে নীরে ভরাডুবি হ'ল! তারপরেই একশো। সেই গোড়াকার 'এক'টা দুটো গোল তাকিয়া মাথায় আর পায়ে দিয়ে লম্বা শুলেন,—সব উনো যোগ দিয়ে হল দুনো বা শূন্যের পর শূন্য। এইতো গেল উনপঞ্চাশের পর-পারের হিসেব। এইবার উনপঞ্চাশের অপর পারের নামতাটা কসে দেখা যাক। নয় পর্য্যন্ত মানুষ-হওয়ার পালা; মা ছাড়া কেউ তখন আমাদের মানুষের মধ্যেই ধরতে চায় না। তারপর উনিশ; তখন নতুন গোঁফের রেখায় হাত বুলিয়ে, বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বল—ইস্! আমি উনোটা কিসে তোমাদের চেয়ে? উনত্রিশে গোঁফজোড়া ছুঁচোলো কোরে পাকিয়ে গলা-ছেড়ে বলা হয়—উনত্রিশ! এই বুক-ফুলিয়ে ইস্ বলতে বলতে উনচল্লিশ আরো চড়াসুরে বলা চলে; তারপরেই চড়াসুরে বাঁধা তার হঠাৎ আলগা হয়ে 'ব্যস্' বোলে ওঠে। উনপঞ্চাশ! পঞ্চাশ! এর পর থেকে নামতার সুর নামতেই থাকলো আর চড়াবার উপায় নেই! কাজেই 'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ' শাস্ত্রে লেখা হল।

যাবার সম্পূর্ণ ইচ্ছে না থাকলেও, ব্রজেৎ শব্দটার খণ্ডতয়ের মতো পিছলে যেতে যে হবে, তা উনপঞ্চাশে পৌঁছেই মনে পড়ে যায়। কাজেই উনপঞ্চাশ একটা কাদা-লেপা পিছল পথ বোলেই আমার আজ মনে হচ্ছে। যেন সুইচ্ ব্যাক্ গাড়ির মতো কেবলি গড়িয়ে চলেছি—আসছে-ভাদরে আমার পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনটার দিকে! এখন সভাপতি কেন, নিজের আরাম-কেদারাটিতেও স্থির হয়ে থাকা যায় এমন শক্তি আমার দেহেরও নেই, মনেরও নেই। কাজেই এই লেখাটুকু পড়া শেষ

* হাইল্যাণ্ড ডিবেটিং ক্লাবের বাৎসরিক উৎসবে সভাপতির উপহার।

কোরে যদি হঠাৎ আমি এখান থেকে সরে পড়ি, তবে তোমরা আশ্চর্য্য হবে না এবং অসময়ে চলে যাবার দরুন আমার অপরাধ নেবে না, বা নিজেদের সভাভঙ্গ করেও যেতে চাইবে না—সহসা। উনো-দুনো যে রকম হিসেবটা আমি লিখলেম, তাতে কোরে তোমরা ভাবছ, এবারের পাঁজির ভবিষ্যৎ-বক্তাদের মতে ঊনপঞ্চাশ-পবনের তাড়ায় পৃথিবীর মধ্যে যে বিপর্য্যয় কাণ্ডটা ঘটার কথা ছিল, সেটা ফস্‌কে আমারি উপরে এসে পড়েছে! এবং পঞ্চাশের ঘাটে পৌছলে আমার যে কি অবস্থা হবে সে-বিষয়েও হয়তো কেউ-কেউ চিন্তা করছ। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি—মাভৈঃ! এই ঊনপঞ্চাশের ঝোড়ো বাতাসের মধ্যে দিয়ে যতই আমি ভাদরের দিকে পঞ্চাশের ঘরের মুখে এগিয়ে চলেছি, ততই বুঝতে পারছি, ঊনপঞ্চাশের খর বাতাস ঊনিশ থেকে আরম্ভ কোরে কৈশোর আর যৌবনের ফুলন্ত ডাল থেকে যখন শুকনো পাতার মতো ছিঁড়ে নিয়ে জীবনটাকে বার্দ্ধক্যের দিকে উড়িয়ে নিতে চলেছে, তখনি দোটানায় পড়ে মনটা চঞ্চল হয়েছে; এর পর নদী বয়ে যখন ভেলা ভাসিয়ে চলে যাব, তখন দেখা যাবে হয়তো ছেলেবেলায় যে বিরহ মা-সুরে কেঁদেছে, যৌবনে যে-বিরহ পিয়া পিয়া বলে ডেকেছে, সেই বিরহেরই স্রোত বার্দ্ধক্যে ছল্-ছল্ সুর নিয়ে হৃদয়কে কাণায়-কাণায় পূর্ণ কোরে চলেছে—আর কিছু নয়! এই তো আমার নিজের বয়েসের উনো-দুনোর হিসেবের একটা খসড়া। এইবার আমার এতকালের পড়া-শুনোর সঠিক হিসেবের চুম্বকটা তোমাদের দিই। তার পরেই এই ছাত্রসভা থেকে ছুটি নিয়ে, আমি—বুড়ো বনে' যাবার বিশেষ চেষ্টা করবো। তবে একেবারে সব হাস্যরস বাদ দিয়ে গম্ভীর হয়ে—যেন শান্তরসটি মূর্ত্তিমান—এইভাবে থাকা বেশীক্ষণ যে আমার দ্বারা ঘটবে, তা আমার নিজের তো বিশ্বাস নেই। কেননা এর প্রমাণ আমি বছর-দুই আগে পেয়েছি। বলি শোনো!

সেবারে প্রায় দক্ষিণ-দুয়োরটায় ধাক্কা দিয়ে ফিরে এসে হঠাৎ মনে হলো—সর্ব্বনাশ! এতকাল তো একটি দিনও চোখ-বুজে ধ্যান ধারণা নিদিধ্যাসন কিছুই করা হয়নি,—একেবারে চোখ খুলে চলে এসেছি; হঠাৎ আজ যদি দুইচোখ চিরকালের মতো বন্ধ হতো, তবে কি অপ্রস্তুত-অবস্থাতেই আমাকে চিত্রগুপ্তের সামনে হাজির হতে হতো! এতোগুলো চিত্র এঁকেছি বলে তো তখন ছাড়া পেতেম না! খেতাব-কেতাব কিছুরই দোহাই চিত্রগুপ্ত মানতো না, স্বর্গের পথও ছাড়তো না! মনে-মনে এই তোলাপাড়া কোরে রোগশয্যা ছেড়েই আমি একদিন ঊষাকালে বাড়ির চিলের ছাদে গিয়ে বসে ধ্যান আরম্ভ করলেম—স্থির হয়ে চোখ বুজে। সেদিন সারারাত বাদলের পরে মেঘ কেটে পৃথিবীর পূব-সীমায় একটা অতি বিচিত্র চমৎকার সূর্য্যোদয়ের ঘটা আরম্ভ হয়েছে। তারি সামনে আমি একেবারে চোখ-বুজে আলোর আলোকে দেখবার চেষ্টা করছি। এর মধ্যে যে অনেকখানি হাস্যরস আছে সেটা একেবারেই মনে ছিলনা। হঠাৎ এক-সময় বুকের মধ্যে একটা হাসির ধাক্কা এল; আর ঠিক সেই সময় কানের কাছে কে যেন বোলে গেল চোখটা খুলে দেখনা আর্টিষ্ট! চোখ খুলে দেখলেম যা, তাতে বিস্ময়ের অবধি রইলনা। সেইদিন থেকে স্থির জানলেম, চোখ

যখন আপনি বুজবে, তখন বন্ধ করা, না হলে জোর কোরে ঘরের কপাটের মতো চোখের পাতাদুটো বন্ধ কোরে আলোর পাখীকে ফাঁদে ফেলে পোষ-মানাবার চেষ্টাটা একেবারেই ভুল। গম্ভীরতা যদি পেতে চাও তো মাঝে-মাঝে চোখ-বোজাটা তোমরা অভ্যাস কোরো; কিন্তু রসের গভীরতা তাতে কোরে কতটা পাবে, তা আমি ঠিক জানিনে। কেননা ও পরীক্ষা আমি একেবারেই করে দেখিনি। সুতরাং জীবনের গভীর সমস্যাগুলোর মীমাংসা আমার দ্বারা তোমরা কোনোদিন করিয়ে নিতে পারছনা—সভাপতির যোগ্যাসনে অযোগ্য আমাকে বসিয়ে দিয়েও।

জ্ঞান হয়ে অবধি আমি তিন রকমের তিন সরস্বতীর পরিচয় করলেম; তাঁদের কথা কিছু-কিছু তোমাদের বলে যেতে চাই। নয় থেকে উনিশ পর্য্যন্ত কলম-সরস্বতীর, উনিশ থেকে উনত্রিশ তাল-সরস্বতী, আর তার পর থেকে এ-পর্য্যন্ত কলা-সরস্বতীর সেবা কোরে কিছু-একটা পাবার চেষ্টা করছি; সে-কিছুটা যে কি, তা আমিও জানিনে, আর যারা ঘাড় ধোরে এই তিন সরস্বতীর কাছে আমাকে উপস্থিত করেছে, তারাও জানে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলম-সরস্বতী সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের তাল-সরস্বতী আর আর্টস্কুলের কলা-সরস্বতী এই তিনের মন যুগিয়ে এত-কাল চ'লে পেলেম যে কি, তা তো বুঝলেম না; কিন্তু পেলেম না যা, তা বেশ বুঝতে পারছি। পরে পরে তারি একটা হিসেব-নিকেস করি শোনো।

প্রথম, কলম-সরস্বতীর কথা—হয় হাঁসের কলম, নয় বাঁশের কলম এই দিয়ে তখন লিখতে হ'তো; Independent Pen ছিলনা যে, যা-খুসি লিখবো; Fountain Pen'ও ছিল না যে ভাবের উৎস অবাধে বার হতে পারে। সাধুভাষার কড়াকড়ি এত তখন বেশী যে বাবাকে মাকে চিঠি লিখতে সেবক-শ্রী না দিলে কোনো ছেলের রক্ষে ছিলনা। এখনকার শিক্ষাটায় যেমন বিলিতি কলমের চাষ দেখা যাচ্ছে, তখনকার শিক্ষায় পণ্ডিতি কলমের ঘোরতর প্রাদুর্ভাব দেখা যেত। আমি জানিনে, এখনকার ছেলে-পড়াবার প্রথা, ঠিক তখনকার চেয়ে কতটা বদলেছে; তবে ইস্কুলের ছেলেদের ধরণ-ধারণ দেখে তখনকার সঙ্গে এখনকার একটা বিশেষ তফাৎ আমি লক্ষ্য করি। এখন দেখি সব বাড়ির ছেলে-গুলি বিনাআপত্তিতে ভালোমানুষের মতো শেলেট আর রাশ-রাশ বই বহে ঠিক টাইম মতোই ইস্কুলে চলেছে। তাদের মুখের ভাব দেখলে খুব উৎসাহ কিম্বা যথেষ্ট আপত্তি যে ইস্কুল যেতে আছে তা বোঝা যায় না। কিন্তু সেকালে দেখেছি দশটার আগে থেকেই ঘরে-ঘরে এক-আধটা ছেলের কান্না আর আপত্তিজনক চীৎকার উঠত। আমার পক্ষে তো এ ঘটনা নিত্যকার ছিল বল্লেই হয়—আমি মাটি-কামড়ে পড়ে আছি, আর চাকর আমায় মাটির বুকে থেকে হিড়্‌হিড়্‌ কোরে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে ইস্কুল-গাড়ীতে তুলছে। এই শক্ত আপত্তির ছাপ এখনকার ছাত্রদলের মধ্যে বড়-একটা না পাবার কারণটা কি, বিচার কোরে দেখলে দুটো যুক্তি মনে আসে—হয় এখনকার ইস্কুলগুলো এমন মনোরম হয়ে উঠেছে যে ছেলেরা খুসি হয়ে সেখানে যাচ্ছে, নয়তো বছরের পরে বছর ধোরে বিশ্ব-বিদ্যার জাঁতা-কলের চাপনে ছেলেগুলো

এমন ব্রেক্ হয়ে গেছে যে আপত্তি করবার ক্ষমতাটাও তারা হারিয়ে বসেছে! এর উদাহরণ আমি আমাদের ছেলেবেলায় ইস্কুল ঘোড়াটির ইতিহাস দিয়ে বোঝাই। অনেক দিন ধোরে গাড়ি টানছে সে। প্রথম আফিসে যেতো—ছ'বেলা নিয়মিত; তার পর শক্তি কমবার সঙ্গে-সঙ্গে বেচারী ইস্কুলে দৌড়া-দৌড়ি করত—আমাদের নিয়ে। এককালে যে ছিল দুষ্ট, কালে সে হল এমন শিষ্ট যে দশটার ঘড়ি পড়লেই বেচারা আপনি এসে গাড়ির দুটো জোয়ালের মধ্যে খাড়া হতো; আর সহিস কাজের শেষে তাকে ছেড়ে দিলেই, সে আপনার আস্তানায় সুড়সুড় ঢুকতো! জোতের মধ্যে জোতা-পড়তে জীব-মাত্রেরই যে স্বাভাবিক আপত্তি, সেটুকু রইলনা; অথচ গাড়ি-টানার যন্ত্রণা যে মানুষেরা কোনো নতুন রকম চাকা আবিস্কার কোরে কমিয়ে দিলে তাও নয়। এই রকম হাড়-ভাঙা পরিশ্রম দিয়েও সজীবকে ক্রমে নির্জীব কোরে পোষ মানিয়ে ফেলার অন্তরকম উদাহরণ আর-এক'টা দিই শোনো। একটা উড়ো কাকাতুয়া ব্যাধের কাছ থেকে কে জানে কেমন কোরে আপনার দুষ্টবুদ্ধি খাটিয়ে পালিয়ে এসে আমার বাগানে ঢুকলো। বাগানের মালী তাকে খাবারের লোভ দেখিয়ে অনেক ডাকাডাকি কোরে যখন পেরে উঠলনা, তখন ফাঁস-কলে তাকে ধোরে, পায়ে শিকলি কিন্তু মন উড়ু উড়ু অবস্থায় আমার কাছে বকশিশ পেয়ে সঁপে দিয়ে গেল। আমি সে পাশবদ্ধ দুষ্ট পাখীকে পড়াবার আর পোষ-মানাবার ভার নিলেম। উড়ে মালিটা—হতে পারে ব্যাধটাও—পাখীটাকে রীতিমতো চপেটা-ঘাত কোরে থাকবে, আদর কোরে মাথা চুলকে দেবার বেলা বোধ হয় সেই জন্যেই সে পাখী বিষম আপত্তি আমাকে জানালে, এবং হাতমাত্রকে সে চিরশত্রুর মতো বাগে পেলে সহজে ছাড়বে না, সেটাও বলে দিলে কর্কশ ভাষায়।

তখন দাঁড়ে পাখী আর কেদারায় আমি, দুজনে তর্ক-বিতর্ক চল্লো কতকটা এইভাবে—

হে পাখী, আমি তোমার মাথা চুলকে দিতে চাই, আপত্তি কর কেন?

ওহে মানুষ, তোমাকে বিশ্বাস কি যে তোমার হাত মাথাটা চুলকে দেবে; চাপড়ে দেবেনা?

রে পাখী, তুমি নির্ব্বোধ; অবিশ্বাস কোরোনা হাত-মাত্রকে। এস দেখি তোমার মাথার উকুন বেছে দিই!

রে মানুষ, খবরদার! পায়ে শিকলি, পালাবার উপায় নেই, তাই বোলে ভেবোনা এই শুকচঞ্চু দুটো থাকতে তোমার হাত আমার মাথার কাছে এগোতে দেবো।

ওহে পাখী, দেখছি হাতেই তোমার অবিশ্বাস; আমাকে নয়। আচ্ছা, আমি হাত না দিয়ে যদি একটা আর-কিছু দিয়ে তোমার আদর করি?

ওগো মানুষ, আর যাই আনো, লাঠি আমার কাছে এনোনা বলছি খবরদার! বাঁশের আগায় ফাঁস লাগিয়ে একবার আমায় ধরেছ, এখন বাঁশ কেন কাঠিটি পর্য্যন্ত আমার চক্ষুশূল হয়েছে। মাথার কাছে কিছু এনেছো কি, তাতে কামড় দিয়েছি!

পাখীর দিক থেকে আসতে লাগল পড়া ও পোষ-মানবার বিষয়ে প্রচণ্ড আপত্তি; আর আমার দিকে থেকে চল্লো হাতখানায়

সাতপুরু মোটা কাপড় জড়িয়ে খুব নরম কোরে কাকাতুয়ার মাথাটা নিজের কবলে আনবার চেষ্টা-চরিত্র। হাজার মুখের কথা, precept যা করতে পারেনি, সাতপুরু ছেঁড়া নেকড়া তাই করলে। মাথার জন্যে পাখীর, আর হাতের জন্যে আমার ভাবনা দূর হল। কিন্তু পাখী পড়তে চাইলে না! সেই যে মালিটা তার গলায় ফাঁস দিয়ে টেনেছিল, সে দুঃখু সে কিছুতে ভুলতে পারলে না। মানুষের ভাষা—যেটা পাখীর পক্ষে সাধু-ভাষা বলা যেতে পারে—সেটা সে উচ্চারণ করতে একেবারেই নারাজ হল এবং বাইরে পোষ মানলেও ভিতরে-ভিতরে সে শিকলি কাটবার মতলবে রইল। দুধ রুটি ছোলা কলা কিছুতে তাকে দাঁড়ে ধোরে রাখতে পারবে না বুঝলেম! মালি পরামর্শ দিলে পাখীটাকে এক মাসকলাই-ভোর আফিম কিছুদিন খাওয়াতে। মালির বুদ্ধি শুনে পাখীটার পক্ষী-জন্ম ঘুচিয়ে দেবার জন্যে খরচের খাতায় তাকে স্থান দেবো কিনা ভাবছি, সেই সময় পাখী পালালো রাতারাতি শিকলি কেটে! উড়ো-পাখী উড়ে পালালো, তাতে দুঃখু নেই; কিন্তু মালিটা একটা শক্ত ফাঁস নিয়ে আমগাছে আবার উঠেছে দেখে, আমি রাগ সামলাতে পারলেম না; কড়া হুকুম দিলেম, যে পাখী ধরবে তাকে পাখী-চুরির নালিসে জেল দেওয়াবো। তার পর সেই গাছের দিকে চেয়ে পাখীতে আর আমাতে আর-একবার আলাপ চল্লো—

ছি ছি পাখী, তুমি বড় ভুল করলে!

কেন মশায়, ভুলটা হল কোথায়? পাখীর যা উচিত কাজ তাইতো করেছি। পা হয়েছে আমার ডালে বসতে; দাঁড়ে নয়! ঠোঁট ও জিভ হয়েছে—আমের বোল ছাড়াতে, রসপান করতে; হাত কামড়াতে, শিকলি কাটতে, হরিবোল বলতে নয়! ডানা দুখানা হয়েছে—উড়তে, বাতাসের পরশ পেতে; হাতের পরশ নয়। তবে ভুলটা হল কোন্‌খানে?

বুঝলে না হে পাখী, আমার মতো বড় আর্টিষ্ট যদি তোমাকে পড়িয়ে-শুনিয়ে মানুষ কোরে তুলতো, তাহলে তোমার নাম জগৎবিখ্যাত হয়ে যেত। আর তুমি অমর হতে পারতে যদি দাঁড়ে-বসা তোমার ছবি আমি তুলে নিতে পারতেম।

পাখীটা খানিক গম্ভীর হয়ে কি ভাবলে, তারপর আমার কাছে থেকে সরে গাছের একেবারে আগডালে গিয়ে উঠে বল্লে—"ক্যাঃ!" অসাধু ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে—"নাঃ।"

বোকা পাখী মাথা চুলকে দেবার লোভে ধরা দেবে না নিশ্চয় জানলেম। কিন্তু দাঁড়ে সাজানো থরে-থরে পাঁউরুটি বিস্কুট—বিদেশী প্রথায়; এবং ন্যাশানাল প্রথায় সকালে-বিকেলে খালি বাতাসে-ভরা গুড়-বাতাসা আধখানা—এর লোভ ত্যাগ কোরে পাখী তার স্বধর্ম্ম বজায় রেখে যে-পাখী সেই-পাখীই থাকতে পারবে কিনা বেশিদিন, আমার খুব সন্দেহ হলো। সন্ধ্যাপূজার শাঁখ বাজলে, আমি national প্রথায় শাঁখ-আলু দাঁড়ে সাজিয়ে পাখীকে ডাক দিলেম—

এস পাখী, একাদশীর পারণ করবে।

পাখীটা একবার ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়ের দিকে চাইলে।

আমি আশা পেয়ে আবার ডাকলেম—"এস!" পাখী তখনো আসেনা দেখে বক্তৃতা

সুরু করলেম—"ভারতবর্ষের তুমি। অতএব তোমার দেশের গাছের ফল খেয়ে যদি আধপেটাও তোমায় থাক্‌তে হয় তাতে তো তোমার আপত্তি করা সাজে না। বরং গৌরবই বোধ কোরে খুসি থাকা উচিত।"

পাখী আমার জাতীয় গৌরবের শাঁখালু-ফাঁদের দিকে আড়-চোখে চেয়ে নাক সিঁটকোলে।

আমি সে-রাতের মতো চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়ে, পরদিন সকালে বিদেশী রুটি-বিস্কুটের নৈবেদ্য দিয়ে দাঁড় ভর্ত্তি কোরে গাছে ঝুলিয়ে সরে দাঁড়ালেম। দশটা বাজলো, পাখী এলনা। আমি ভাতের থালা নিয়ে রন্ধন-শালায় নিজে খেতে বসলেম। ফিরে এসে দেখি দাঁড়ে খাবার নেই; পাখীও সাদা ডানা নীল-আকাশে মেলে নিজের মনোমত দেশে উড়ে পালিয়েছে। একটা বেরাল গাছ-বেয়ে আস্তে-আস্তে নেমে আমার দিকে চেয়ে, ল্যাজটা একবার আকাশের দিকে উঁচু করে খুব ভালোমানুষের মতো আমার লাইব্রেরীতে গিয়ে সেঁধোলো।

পাখী-পড়ানোর আর পোষ-মানানোর উনো দুনো এই পর্য্যন্ত। এক উপায়—আফিং দিয়ে তার পক্ষীজন্ম লোপ করে দেওয়া;—সে কেবলই ঝিমোবে। দ্বিতীয়—অখাদ্য-কুখাদ্য দিয়ে এমনি তার দুষ্ট ক্ষিদে বাড়িয়ে দেওয়া যে ওগুলো না পেলে সে আর কিছুতে খুসি হবে না এবং খেয়ে-খেয়ে এমন ফুলে উঠবে যে নিজের ভারে নিজেই তার নড়া-চড়া শক্ত হবে। তৃতীয়—তাকে একাদশী করিয়ে-করিয়ে তার আত্মাপুরুষের আত্মম্ভরিতা এতটা জাগ্রত করা হবে যাতে আপনার national শিঙে আপনি ফুঁকতে একটুও সে কষ্ট পাবে না—আত্মারাম পাখী! বিদ্যালয়ের কলম-সরস্বতী নয় থেকে উনিশ বছর পর্য্যন্ত আমায় বেঁধে এই তিন উপায়েতেই পোষ মানাতে চেষ্টা করে-ছিলেন। উপায়গুলোর সঙ্গে অল্পবিস্তর এখনকার ছাত্রদেরও পরিচয় আছে এবং বিদ্যালয়ের বেত-ও-পুস্তক রঞ্জিত-হস্তে কলম-সরস্বতীর রূপ সকলেই দেখেছ বোধ হয়। কাজেই সে সব খুটিনাটি হিসেবে গিয়ে সময় নষ্ট করা বৃথা।—ততক্ষণ ছেলেবেলার দুটো কথা এখন লিখে রাখলে আমার জীবন-চরিতকার যে গোকুলে বাড়ছে, তার কাজে লাগতে পারে।

প্রথম যে-দাঁড়ে আমাকে ভর্ত্তি হতে হয়েছিল সেটার নাম ছিল নর্ম্মাল ইস্কুল। প্রায় ঘরের দুয়োরে বল্‌তে গেলেই হয়। কাজেই বাড়ী থেকে খুব ছাড়াছাড়ি হয়েছে—এটা বোধ করা যেতনা। লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত জোড়া-বেত সামনে নিয়ে ঢুলতেন আর এক-একবার ছেলে পড়াতেন; আর পোড়োরা অন্ধকার ঘরে সারি-সারি একডালে অনেকগুলো চড়াই পাখীর মতো ঘেঁসাঘেঁসি কোরে বসে দুর্গাঠাকুরের অসুরের মতো লক্ষ্মীনাথ মূর্ত্তির ছাপ মনে গ্রহণ করতো—পাঁচ বছর বয়স থেকে ছয় সাত আট পর্য্যন্ত! এর মধ্যে মধ্যাহ্নে কতকটা হাঁপছাড়া—জল-খাওয়া, খেলাধূলো, ছুটোছুটি—আর শেষ-বেলায় গেলারিতে থাকে-থাকে বোসে দক্ষিণ কখনো বাম হস্ত কখনো দুই হস্ত উত্তোলন ইত্যাদি ড্রিল—যেন নতুন-ওঠা পালকগুলো ঝেড়ে নেওয়া; তারপর "মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার জয়!" বোলে বাড়ির দিকে ছুট। মনটা সারা-দিনের পরে যেখানে প্রজাপতি উড়ছে কাঁচ-পোকা পান্নার টুকরোর মতো দেয়ালের গায়ে লেগে রয়েছে, পোষা কাঠবেরালী আমার জন্যে

এদিকে-ওদিকে চাচ্ছে, সেই বাড়ী আর বাগানে যেতে এমন ব্যস্ত হতো যে গাড়ী আসতে দেরী হলে কোনো দিন হেঁটে, নয়তো চাকরটার কাঁধে চড়েই পালাতেম। ইস্কুলের মধ্যে মনকে টানবার যেগুলো ছিল সেগুলো ছেলেধরার অব্যর্থ ফাঁদ; অথচ হেডমাষ্টার গোপালবাবুর মাথায়—সমুদ্রের ঝিনুক, ইষ্টিম ইঞ্জিনের খেলনা, এমনি সব আশ্চর্য্য সামগ্রীগুলো কাঁচের আলমারির ওপারে বন্ধ রাখার বুদ্ধি কেন এসেছিল, তার উদ্দেশ এখন আর পাওয়া শক্ত। তিনি বেঁচে থাকলে শুধোতেম।

যে-অপরাধে কলম-স্বরস্বতী জোড়-বেত মেরে আমাকে এই নর্ম্মালস্কুল থেকে সরে পড়তে অনুরোধ করেছিলেন, সেটাও শোনো।

ইংলিসের বাঙালী মাষ্টার নিজের রিডার নিজের ইস্কুলে এবং আমাদের উপরে চলাচ্ছেন। পুড়িং কথার মানে নিয়ে আট বছরের দুষ্টু পাখী আমার সঙ্গে মাষ্টারের মতের মিল হলনা। মাষ্টার বলাতে চান—পুডিং pudding নয়, পাডিং। আর তার মানে পিঠে। আমি বলি কখনই নয়, ওটা পুডিং; আর আমি তা খেয়েছি, পিঠের মতো একেবারেই নয়। ঝগড়া মিটলো না, মাষ্টারের ভুল ধরায় শাস্তি পিঠে নিয়ে আমি বেরিয়ে একেবারে সমষ্কৃত কলেজে পালিয়ে এলেম। সেইখানে উনিশ বৎসর পর্য্যন্ত পড়েছি। কিন্তু কলেজের গায়ে অমন যে গোল-দীঘির সবুজ ঘাস, ফুলগাছ-দেওয়া বাগান, সেটার দিকের প্রবেশ-পথের জানলাগুলো, গরাদ-আঁটা ফাটকের তালা কাউকে খুলে দিতে দেখিনি, কাজেই কাঁচা বয়সেই কলম-স্বরস্বতীর একটা চমৎকার বন্দনা লিখে বিদ্যা-মন্দিরের এনট্রান্স থেকেই সরে পড়তে আমি একটুকুও লজ্জা বোধ করিনি বরং উৎসাহই দেখিয়েছিলেম। বন্দনাটা সব মনে নেই; কিন্তু মনে আছে হেড-মাষ্টারের কাছে সে জন্যে খুব তারিফ পেয়েছিলেম।

"এস মা হৃদয়ে বসো,
হৃদির আঁধার নাশো।
দয়া কর আমারে মা, আমি ক্ষুদ্র প্রাণী!!"

এটা আমার উনিশ বছরের original composition; মনে কোরো না কারু চুরি, আর যদিই বা হয়, হৃদির আঁধার নিয়ে যে ক্ষুদ্রপ্রাণী সেদিন বেরিয়েছে, সেতো আর বি, এ, হবার জন্যে Question paperএর শীলমোহর খুলে দেখবার চেষ্টা করেনি যে—কি কলা, কি কলম কোনো স্বরস্বতী তাকে অভিশাপ দেবেন।

উনিশ বছরে নিজেকে ক্ষুদ্রপ্রাণী বোলে জ্ঞান করছি জেনে তোমরা মনে-মনে নিশ্চয় হাসছ। কিন্তু ভেবে দেখো ক্ষুদ্রপ্রাণী না হলে বিদ্যার জাঁতি-কলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়া আমার পক্ষে কতটা শক্ত হতো!

কলমের চারা-বাগানের Glass House ছেড়েই আমার সঙ্গীতের তালগাছের দিকে নজর পড়লো! আমি তারি ছায়ায় বা যতটা ছায়া তালগাছের দেওয়া সম্ভব, সেই-খানে বোসে তাল-স্বরস্বতীর ঢোলের পিঠে আর এক-একবার তাঁর বীণার তারেও বাঁ-হাত বোলাতে সুরু করলেম। উনত্রিশ পর্য্যন্ত এই ভাবে বাঁ-হাতে তানসেনের তাল-স্বরস্বতীর সেবা চলেছিল। ফল কিন্তু পাইনি। উনত্রিশের ভাদ্র মাসেও তাল পোড়ে বাঁ-হাতটা দোরস্ত হ'লনা, —বীণার উপরে সে যথেচ্ছা বিচরণ আরোহণ অবরোহণ ঘাত-প্রতিঘাত করেই ক্ষান্ত হলো;

—তাল-স্বরস্বতীর শাসন মেনে বীণা-দণ্ডকে দাঁড় ভেবে বসতে সে কিছুতে স্বীকার করতে চাইলে না উনত্রিশেও! মনপাখী কালোয়াতি গান তান মান গমকের করতব এ-সবে আপত্তি কোরে কলা-ভবনের চুড়োয় গিয়ে ডাক দিলে "ক্যাঃ" অস্যার্থ "নাঃ"—ইতি অসাধু ভাষা প্রয়োগ কোরে তাল-স্বরস্বতীর তাল সামলে একটু জিরোতে বসেছি, আর-একটা আটা-কাঠির মতো প্রকাণ্ড তুলি খানিক তেল-রং চিটচিটে আঠা নিয়ে আস্তে-আস্তে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। কলার জন্যে তখন আমার বিষম ক্ষিদে লেগেছে। আমি কলা ভ্রমে তুলি যেমন ধরবো, অমনি বাঁধা পড়লেম ;—তুলিটা চট্ কোরে আমাকে একটা নানারকম তেকাটার দাঁড়ে ঠাসা একটা ঘরে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। ঘরটা বড়, চারিদিকে নরকঙ্কাল দিয়ে সাজানো, তার উপরে ঝক্‌ঝকে চওড়া গিল্টির ফ্রেমে বাঁধানো পূব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-জোড়া খানকয়েক পেন্‌টিং। প্রধান হচ্ছে তার মধ্যে দুখানা। একখানা, বিবসনা ভিনস্ ; আর একগোছা দ্রাক্ষাফল—এমন চমৎকার যে চেনবার জো নেই—আসল কি নকল। সেই বিবসনাকে আমি ভাবলেম কলা-স্বরস্বতী ; আর ও-দিকের সেই দ্রাক্ষাগুচ্ছকে তাঁর পেসাদী নৈবেদ্য ভেবে পক্ষীস্বভাববশত যেমন সেটা ঠোকরাতে যাবো, অমনি কতকগুলো চুণকান-করা মানুষের মূর্ত্তির মধ্যে থেকে কালো-কালো বাদুড় বেরিয়ে আমাকে ঘিরে বলতে লাগলো—"কেমন ভালো লাগলো না?" আমি আমার ভাষায় বল্লেম—"দেখতে লাগলো ভালো, কিন্তু ঠুকরে তো কোন সোয়াদ পেলেম না।" তারা বলে উঠলো—"তুমি কেমন বাদুড় হে! এ-সব জিনিষ দেখে বুঝতে হয়, তা জান না! এখানে তোমার পোষাবে না, বেরোও।" আমি বল্লেম—"আমি পক্ষী, ফল চাখ্‌তে হয়, তাই জানি।" বিবসনা সুন্দরী হেসে বল্লেন—"তবে তুমি বাইরে যাও। আমার আর-একবোন কলা-ভবনের সীমানার বাইরে রাস্তায় বোসে ফলমূল বিলোচ্ছে, সেটা পাগলী, তার কাছে যাও।" আমি বল্লেম—"যাচ্ছি, একটু জিরিয়ে নিই। বলুন দেখি আপনার নামটি।"

"কলা-বিদ্যেধরি।"

"কোথায় বাড়ি?"

"গিল্টি করা যাদুঘরে।"

"আপনার বোনকে বাইরে রেখেছেন কেন?"

"সে যে কালো; ধুলো-কাদা মেখে থাকে। কোনো বিদ্যেয় তার জ্ঞান হয়নি,—না অস্থি-বিদ্যে, না কিছু!"

আমি বল্লেম—"আমারো তো তাই। বিদ্যে কি বিদ্যালয়ের দিকে যেতে ভয় পাই, তুমি বিদ্যেধরী শুনে অবধি পালাই পালাই করছি। আমাকে যাদু করোনা যেন!"

"কেন? যদি যাদু করি, বেশতো সুখে থাকবে! ভ্রান্তিমান অলঙ্কারের শিকল গড়িয়ে তোমায় পরাবো; খাওয়াবো কলার চোপা আর নকল-আঙুরের রস, সুখেই তো থাকবে। মরীচিকার সন্ধানে বৃথা যাচ্ছ, জলজীয়ন্তের মতো কলা-বিদ্যেধরীকে ছেড়ে কলাস্বরস্বতীর মিছে সন্ধানে কেন মরতে যাবে? এসো।" আমি দেখলেম বিদ্যেধরীর রূপ মিলিয়ে গিয়ে ভিতরের কঙ্কাল দেখা দিচ্ছে, আর একটা হাত প্রকাণ্ড এক তুলির আটাকাঠি হয়ে

এগিয়ে আসবার জোগাড় করছে আমার দিকে! আমি 'মাগো' বোলে বন্ধ ঘরের সাসি ভেঙে চড়াই-পাখীটার মতো উড়ে পালালেম কলাভবনের বাইরে। তখন বয়েস প্রায় আমার উনচল্লিশে গিয়ে ঠেকেছে; কাজেই বিদ্যেধরী আর ধরি ধরি কোরে সঙ্গে এসে লোভ দেখালে না। আমি এবারের মতো বেঁচে গেলেম। প্রত্যেক জীবের পক্ষে যা স্বাভাবিক, সেই সহজ আর নিজের ভাষায় তারপর থেকে এই উনপঞ্চাশ পর্য্যন্ত নিজেও অনেক কইলেম, কইতে উপদেশ দিলেম, ভারতীর কুঞ্জবনে ঘুরলেম-ফিরলেম—নবরসের নব-নব সোয়াদ পেয়ে, কিন্তু তবু দেখি সাধ মেটে না; যা চাইলেম, যাকে চাইলেম, তাকে এখনো পেলেম না; সন্ধানে-সন্ধানে মন কেবলি উড়ে-উড়ে ঘুরে-ঘুরেই বেড়ালো। এখন সন্ধ্যা হ'ল ভাবছি—কাগজেও লেখা নয়, তালপাতাতেও দাগা নয়, ওড়াও নয়, নড়াও নয়, মনের কুঞ্জবনে বসে গুন্‌গুন্ করা আর পদ্মপাতায় উনপঞ্চাশ বছরের জলবিন্দুর মতো কেবলি টল্‌মল্ করা ছাড়া আর-কিছু করবার নেই।

কি International, কি National, কিবা Occidental কি Oriental বহুরূপিণী বিদ্যাধরীর বিশ্ববিদ্যালয়, কলাভবন—এমনি সব নানা ফাঁদ এড়িয়ে উনো থেকে দুনোর দিকে সহজে চলবার উপায় একটা আবিস্কার ছেলেবেলাতেই আমি করেছিলেম; কিন্তু পেটেণ্ট করিনি, কাজেই সেই পেটেণ্ট ওষুধের formula বা বিদ্যাধর-বিদ্যাধরীর যাদু কাটাবার বীজমন্ত্রটা তোমাদের বোলে দিতে আমার আপত্তি নেই। মন্ত্রটা লেখবার আর ছাপিয়ে বিলি করবার খরচটা যদি আমারি স্কন্ধে না চাপিয়ে, এবং মন্ত্রের ফলাফলের জন্যে আমাকে দায়ী না কোরে, সব ব্যয় আর দায় দুটোই তোমরা বইতে প্রস্তুত হও, তবে বলি শোনো চুপিচুপি। পাঁজীতে লেখে একটা স্বরস্বতী পুজো বছরে করতে। সেটা ভুল। প্রতিদিন উষাকালে উঠে মনে-মনে বলবে আজ স্বরস্বতী পুজো;—পড়তে নেই, লিখতে নেই, কলমের দিকে যেতে নেই, exercise করতে স্বরস্বতীর নিষেধ। এই বোলে মাষ্টারের আর ইস্কুলের দিকে দূর থেকে নমস্কার দিয়ে প্রণাম করবে বারো-মাস। এই ভাবে দশমহাবিদ্যা আর চতুঃষষ্টি-কলার সাধনা কোরে পঞ্চাশে যেদিন পৌছবে, সেদিন ঠিক আমারই মতো অঙ্ক অঙ্কন বাদন বেদন সব জিনিষের মর্ম্মজ্ঞ হয়ে সুখে থাকবে বোলে আমার তো বিশ্বাস। কিন্তু গুরু-জনদের এ খবর জানিও না; তাহলে ধমক খাবে, আর এই বুড়ো বয়েসে কাগজে লিখে রোজগার কোরে আমার পেট চলা দায় হবে এবং আসছে বারে তোমাদের মধ্যেও আমার প্রবেশ নিষেধ হয়ে যাবে—বয়েসের উনো-দুনোর তালে-তালে সহজে তোমাদের চলতে বলার অপরাধে।

অতএব উনপঞ্চাশের ফেরে পড়ে যে কথাগুলো আজ বল্লেম, সেগুলো বুঝে-সুঝে গ্রহণ কোরো। এবং পাছে এই লেখাটা নিয়ে তোমরা কেউ সমালোচনা লিখতে অনর্থক সময় নষ্ট কর সেজন্যে আমি নিজেই এর একটা কঠিন সমালোচনা লিখে দিচ্ছি তোমাদের। এ লেখাটা হচ্ছে—art of writing that which looks like meaning something but actually means nothing.

এই রকম লেখাকে অলঙ্কার-শাস্ত্রে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার নাম দেওয়া হয়েছে। এই রকম অসার লেখা, অথচ সার বোলে তাকে কেউ-কেউ গ্রহণ করেন, ভ্রমেও পড়েন, এটা প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এও দেখছি দুধের ফেনার মধ্যে দুধের যেমন গন্ধ থাকে, দুধ থাকে না; জামাইষষ্ঠীর দিনে শ্যালিকাদের হাতে-গড়া ঠকানো সন্দেশে চিনি থাকে না কিন্তু রস যথেষ্ট থাকে, তেমনি আমার এ লেখাটা ছেলে-ভোলানো ছড়া, বর-ঠকানো ফাঁকি এবং বুড়ো-ক্ষেপানো লোহার-কলাই ভাজাও বলতে পারো। আমাদের বিদ্যা শিক্ষার দীক্ষার মধ্যে যেমন National Denaational International এমনি নানা উনে-দুনো ফাঁকি চলছে, তেমনি ভাষাতেও কেমন ফাঁকি চলে তা দেখালেম কতকটা। শিল্পেতেও এই ফাঁকি চলেছে। কারে-কারবারে ঘরে-বাইরে ফাঁকা আওয়াজের ফাঁকি-বাজি আমিও দেখিয়েছি এবং অন্যেও আমায় দেখিয়েছে যথেষ্ট। অন্যের কথা নিয়ে নাড়া-চাড়া করলে তারা রাগ করবে; কাজেই নিজের ভাষা নিজের কাজ দিয়ে নিজের শিঙে নিজে ফোঁকবার অপরাধটা স্কন্ধে নিয়ে আমায় তোমাদের বলতে হচ্ছে, আমিও একজন ফাঁকি-বাজিগর; আর সেই জন্যেই নানাদিকে নানা বাজি যা চলেছে তার হিসেবের ফাঁকির উনো-দুনো গুলো ধরবার সুবিধে আমার হয়েছে। রংকে ফেনিয়ে, ভাবকে ফেনিয়ে, ভাষাকে ফেনিয়ে অনেকবার আমি তোমাদের সামনে ধরেছি, হাততালিও পেয়েছি এবং ওর মধ্যে যারা ফাঁকি ধরেছে, তাদের কাছে গালাগালিও খেয়েছি; আর মনে-মনে হেসেছি। গোড়ায়-গোড়ায় দেশের শিল্পটার দিকে দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে কত ফাঁকা-আওয়াজ দিয়ে আমার লেখা, রেখা সমস্তই যে ভর্ত্তি কোরে সাধারণের দরবারে হাজির হ'তে হয়েছে, তা ভাবলে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই! এই যে ভারত-শিল্প বলে কথাটা সবার মুখে এখন চলে গেছে, সেটাকে বাজারে চালাবার জন্যে একটা প্রকাণ্ড ফাঁদ আমাকে পাতবার ভার দিয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলে একদিন; এবং ব্যাধ যেমন মরা হরিণের ছালে সেজে আসল হরিণ ধরতে চলে, তেমনি আমাকেও কখনো মোগল, কখনো ক্ষপণক, কখনো বোষ্টম, কখনো শাক্ত—এমনি নানা শিল্পীর বেশ ধোরে লোক ভোলাতে হয়েছে। এ ভাব কোনোদিন দেখাতে সাহস হয়নি যে বিদেশের শিল্প আমি পছন্দ করেছি। এই যে এত বড় একটা ফাঁকি নিয়ে একটা লোক তোমাদের মধ্যে বিচরণ করছে, এ যদি সত্যি কথা বলে তো হয়-তো তোমরা বিশ্বাস করবে'না এবং এর অনেক মিথ্যা তোমরা হয়তো সত্যি বোলে গ্রহণ করে শেষকালে ঠকে যাবে। তাই আমি মনে করেছি—এখন থেকে আমি মৌনব্রত যতটা পারি অভ্যাস করতে চেষ্টা করব, কিন্তু তার পূর্ব্বে আর্ট জিনিষটা যে কেবলি পূবদেশে এবং পূবের মধ্যে আমাদের দেশেই প্রবলভাবে আছে, সেটা বিশ্বাস করতে আমি তোমাদের মানা করছি। এককাল ছিল যখন art এর দিকে তোমাদের আকর্ষণ করবার জন্যে ভারত-শিল্পের National রাম-শিঙেটায় খুব জোরে আমাকে ফুঁ দিতে হয়েছে, কিন্তু এখন আমি

দেশের শিঙে ফোঁকার ভার দশের হাতে দিয়ে নিজের ভাবনা নিয়ে গুছিয়ে বসবার একটু ছুটি জোগাড় করে নিয়েছি—সদুপায়, অসদুপায় যেমন কোরেই হোক। কি দেশ, কি বিদেশ দু'জায়গারই কলা-বিদ্যেধরীদের ফাঁদ এড়িয়ে আমি উড়ে পড়েছি। এখন আর শিল্পের জাতি-বিভাগ নিয়ে লড়ালড়ি কোরে মরতে আমায় হাজার লোভ দেখিয়েও তোমরা নামিয়ে আনতে পারবে না,—এমন কি নিজের শিঙে নিজে ফোঁকবার আশা দিয়েও না। কেননা বাজার আর সেখানকার দর-কসাকসির হট্টগোল ছাড়িয়ে পালিয়ে এসেই আমি বুঝতে পারছি যে, কলা-বিদ্যাধরী আর্টের যে ঘন স্তরে বাস করে সেই নিম্নস্তর ছাড়িয়ে একটা জায়গা আছে, যেখানে কলা-স্বরস্বতী পদ্মবনে বিরাজ করছেন—আর সেখানে আর্টের জাতিভেদ নেই; দেশ-বিদেশ সব সেখানে সমান, সবাই নিজের নিজের পূজার অর্ঘ নিয়ে সেখানে চলেছে। সেখানে গ্রীক, পার্শী, হিন্দু, মুসলমান, চিনে, জাপানী এ-সবে ভিন্নতা নেই, এ তর্কও নেই। আছে কেবল বিচার—আর্ট কিম্বা আর্ট নয়, নকল কিম্বা আসল, আপনার কিম্বা পরের; এমন কি নিজের আর্টও পূর্ব্বপুরুষের ধার-করা-পরস্ব কি না, এই বিচারই সেখানকার কথা; অন্য তর্কও নেই, কথাও নেই, ঝগড়াঝাটিও নেই।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# সে

('ভার্য্যা—যত্র নির্বৃতি')

তপ্ত ধরার মুখের উপর মেঘের মত সে যে—  
আমার বুকের আগুন-হাওয়া সেই ত' জুড়ায়েছে!  
আঁধার-ঘন কেশের রাশে কুঞ্জ রচি' সে যে  
গোপন করি' আনন আমার অধরমধু দে'ছে।

শ্রাবণ-রাতে ক্ষণিক-চাওয়া চাঁদের মত হেসে'  
মুক্ত করি মেঘের দুয়ার স্বপন দেখায় যে সে,  
কালোর কোলে হঠাৎ-আলোর ঝিলিক নাহি তায়'  
দীপ্তি চেয়ে তৃপ্তি দেবে আঁখির জলে ভেসে'।

শরৎ-প্রাতের আকাশ যেমন—স্বচ্ছ নয়ন দুটি—  
আগমনীর গানের সুরে আলোক উঠে ফুটি';  
কোজাগরের জ্যোস্নামধুর বিষাদ-হারা হাসি,  
ধূলায় যেন সিউলি লোটে রূপের গরব টুটি'!

বসন্তেরি লক্ষ্মী সাজে সাঁঝের আঙিনাতে,  
সিঁথীর সীমায় অশোক-শোভা প্রদীপ-চাঁপা হাতে,  
জুড়ায় আঁখি জুড়ায় যেগো ফুরায় নাক' আশা,  
পেয়েছি তা'য় কত জনম-যুগের সাধনাতে!

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

# কাল-বৈশাখী

## নয়

### পুরন্দরের কথা

— পৃথিবীতে ক্রমেই সভ্যতা বাড়ছে বটে, কিন্তু মানুষ যে সেইসঙ্গে ক্রমেই সভ্য হয়ে উঠছে না, সে-বিষয়ে আমার আর একটুও সন্দেহ নেই। সৃষ্টির আদিম যুগে মানুষের উপরে যে পশুত্বের খোলস ছিল, সেটা অবশ্য এখন আমাদের চক্ষে পড়ে না। কারণ মানুষের বাহিরটা এখন মনুষ্যত্বের খোলস দিয়েই ঢাকা আছে রীতিমত!

আদিম যুগে মানুষের বাইরেকার পশুত্বকে ঠেলে মাঝে-মাঝে তার ভিতরকার মনুষ্যত্ব আত্ম-প্রকাশ করত এবং সেই প্রকাশকে সে সত্যরূপে স্বীকার করেছিল বলেই মানুষ তার বর্ত্তমান পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু সেই বাইরেকার পশুত্ব এখন মানুষের ভিতরে গিয়ে গুপ্তভাবে সুপ্ত হয়ে আছে মাত্র,— একেবাঁরে লুপ্ত হয়-নি;—থেকে-থেকে তাই তার উপরকার মনুষ্যত্বের ঘেরাটোপ ছিঁড়ে ভিতরকার সুপ্ত পশুত্ব জেগে উঠে বেরিয়ে পড়ে! পৃথিবীতে যাদের দৃষ্টি একটু তীক্ষ্ণ, এটা তারা নিশ্চয় লক্ষ্য করে' দেখেছে।

আমিও সেদিন উপর-উপরি এমনি দুটি দৃষ্টান্ত দেখলুম।

উমানাথ আমাদের প্রতিবেশী। তার স্ত্রী স্বজনীর সঙ্গে স্ত্রীর খুব মাথামাখি আছে। পাড়া-পড়্‌সীর সঙ্গে লোকের যেমন জানাশুনা থাকে, উমানাথের সঙ্গে আমারও তেম্‌নি অল্প-বিস্তর মুখের পরিচয় ছিল।

একদিন বাইরের ঘরে একলাটি বসে-বসে বই পড়্‌ছিলুম। কিন্তু সন্ধ্যার আব্‌ছায়া ক্রমেই গাঢ় হয়ে ওঠাতে বইখানা মুড়ে আমি মুখ তুলে দেখি, উমানাথ ঘরের ভিতরে এসে ঢুক্‌ল।

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "কি উমানাথ, এমন-সময়ে তুমি যে এখানে?"

উমানাথ জুতো-খুলে চাদরের উপরে এসে বসে বল্‌লে, "কেন, আস্‌তে কি নেই ভাই?"

—"সে কি কথা, আস্‌বে বৈকি! তবে এমন সময়ে তুমি ত বড়-একটা আমার বাড়ীতে আস না, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলুম।"

—"বিকেল থেকে মনটা আজ কেমন গুম্‌রে আছে, বাড়ীতে হাত-পা গুটিয়ে একলা একটি প্রথম শ্রেণীর জড়ভরতের মত বসে থাক্‌তে আর ভালো লাগ্‌ছিল না, তাই তোমার সঙ্গে দুটো গল্পস্বল্প কর্‌তে এলুম আর কি।"

—"একলা কেন হে, তোমার অর্দ্ধাঙ্গ কি এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পিত্রালয়ে পড়ে আছেন?"

—"না, আছেন এইখানেই, কিন্তু তার সঙ্গে ত আমি কথাবার্ত্তা কইতে পাই না!"

—"বটে? তোমাদের দাম্পত্য জীবন তাহলে বিয়োগান্ত নাটকের শেষ-দৃশ্যের মত হয়ে উঠেছে বল?"

—"মোটেই না। স্ত্রীর সঙ্গে আমি কথাবার্ত্তা কইতে পাই না—এইমাত্র!"

—"পাও না? অর্থাৎ—"

—"অর্থাৎ, আমার স্ত্রীটি অশ্রান্তভাবে অনর্গল এত-বেশী বাক্যব্যয় করেন যে, তার মাঝখানে কথা-কওয়া ত দূরের কথা, সামান্য দু-একটি কমা কি সেমি-কোলন বসাবার ফাঁক পর্য্যন্ত আমি খুঁজে পাই না। কাজেই দায়ে পড়ে আমি স্ত্রীর সাম্‌নে বক্তা না-হয়ে শ্রোতা হয়েই থাকি।"

—"বেশ কর, বুদ্ধিমানের কাজই কর। মেয়েরা যখন কথা কইতে চান, তখন তাঁদের কথার প্রতিবাদ করতে গেলে মূল্যবান সময়ের অপব্যয় হয় মাত্র। বাধ দিয়ে দামোদরের বন্যা থামানো যায়, কিন্তু বাধা দিয়ে মেয়েদের কথার স্রোত বন্ধ করা ত যায়ই না, বরং সে স্রোতের বেগ খরতর করে' তোলা হয়! এ একেবারে যাচাই-করা খাঁটি কথা!"

—"কিন্তু ক্রমাগত মুখবন্ধ করে' বাড়ীতে বসে থেকে শেষটা কি সত্যি-সত্যি বোবা হয়ে যাব? কাজেই মাঝে-মাঝে পাড়া-পড়্‌শীর কাছে এসে মুখের ব্যায়াম করতে হয়।"

—"কিন্তু উমানাথ, আজ তুমি ভারি অসময়ে ব্যায়াম করতে এসেছ! আমাকে এখনি বাইরে যেতে হবে।"

—"বাইরে? কোথায়?"

—"আমাদের পাশের বাড়ীতে আমার এক বন্ধু-পত্নী আছেন, রোজ এই সময়ে আমি তাঁকে গান শেখাতে যাই।"

—"ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, ও-বাড়ীতে একটি মহিলা ভারি চমৎকার গান গা'ন বটে। তা বেশ ত, চলনা আমিও তোমার সঙ্গে যাই! আমি গান শুনতে বড় ভালোবাসি।"

—"সে কি উমানাথ, তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি বল? তোমাকে ত ওঁরা চেনেন না!"

—"তুমি পরিচয় করে দিলেই চিন্‌বেন! ওঁদের বাড়ীতে ত পর্দ্দা-প্রথা নেই, আমার সাম্‌নে আস্‌তেও ওঁদের কিছু লজ্জা হবে না!"

—"উমানাথ, অনেকের মত তোমারও একটা মস্ত ভুল ধারণা আছে দেখ্‌ছি। কোন বাড়ীতে স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে বলে, সেই বাড়ীর মেয়েরা যে চেনা-অচেনা 'ঘরের-বাইরের যার-তার সঙ্গে সমান ভাবে কথা কইবেন, এও কি কখনো সম্ভব?"

—"কেন, ও-বাড়ীর মেয়েটির সঙ্গে তোমার ত খুব মাখামাখি আছে দেখতে পাই, আমাকে বন্ধু বলে সঙ্গে নিয়ে গেলে উনি আমার ওপরে নিশ্চই অসন্তুষ্ট হবেন না।"

আমি বিরক্ত হয়ে বল্‌লুম, "উমানাথ, তুমি যখন বুঝবে না, তখন আমি আর কি বল্‌ব বল! তবে এইটুকু জেনে রাখ, তুমি যা বল্‌ছ তা অসম্ভব!"

উমানাথ খানিকক্ষণ চুপ করে' বসে রইল। তারপর কেমন-একটা বিশ্রী সুরে বল্‌লে, "এতে আর বোঝাবুঝির কিছু নেই পুরন্দর! বুঝ্‌তে আমি সব পেরেছি! আমাকে ও-বাড়ীতে নিয়ে গেলে পাছে তোমার নিজের কিছু অসুবিধে হয়, তাই তুমি এতটা নারাজ হচ্ছ! বেশ ভাই বেশ, ওখানে তুমি একলাই তবে রাজত্ব কর, তোমার মুখের গ্রাস আমি কেড়ে নিতে চাই না।"

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লুম, "উমানাথ, এ তুমি কি বল্‌ছ!"

উমানাথ ঠোঁট-দুখানা উল্‌টে, অসভ্যের মত হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "এ কথা সুধু আমি বল্‌ছি না—পাড়ার অনেকেই বল্‌ছে! ও-

বাড়ীতে তোমরা যে প্রেমের পাঠশালাটি খুলেছ, তার খবর কে না জানে? কিন্তু সে পাঠশালায় তোমরা যে আমার মত নতুন পোড়োকে নাও না, এটা অবশ্য আমার জানা ছিল না!"

রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ থর্‌-থর্ করে' কাঁপতে লাগ্‌ল। কোনক্রমে রাগ সাম্‌লে বল্‌লুম, "উমানাথ, তোমরা অতি ঘৃণ্য জীব! আমার দুর্ণামের জন্যে আমি ভাবি না,—আর সেজন্যে তোমাদের কিছু বল্‌তেও চাই না। কিন্তু আমার বাড়ীতেই বসে তুমি যে একজন মহিলার নির্দ্দোষ নামে কলঙ্ক লেপন করবে, এ কথনোই হ'তে পারে না। ওঠ, ওঠ,—উঠে যাও!.........এখনো উঠলে না? দরোয়ান!"

দ্বারবান সাড়া দেবার আগেই ক্রোধারক্ত মুখে উমানাথ উঠে দাঁড়াল। অপমানিত স্বরে বল্‌লে, "আমাকে তাড়িয়ে তুমি আমার মুখ বন্ধ কর্‌তে চাও? কিন্তু তোমার নিজের স্ত্রীর মুখ কি-করে' বন্ধ কর্‌বে? তাকেও কি তাড়িয়ে দেবে?"

—"অসভ্য! আমার স্ত্রীর কথায় তোমার কি দরকার?"

—"আমার কি দরকার? কিছু না! তবে তোমার স্ত্রী যদি আমার স্ত্রীর কাছে তোমার গুণের কাহিনী বলে, তাহলে—"

—"তাহলে সে কথা আবার আমার কাছে এসে বলা তোমার উচিত নয়! যাক্‌, এ-সব উচিত-অনুচিত নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না, তুমি এখন বিদেয় হলেই আমি সুখী হব।"

উমানাথ আর-কিছু না-বলে', আমার দিকে একটা বিরাগ-ভরা দৃষ্টিনিক্ষেপ করে' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এম্‌নি আমাদের দেশের লোক! অন্য কোন রমণীর সঙ্গে পুরুষের আলাপ হ'লেই যে-দেশের লোক সে আলাপকে প্রেমালাপ বলে' ভেবে নেয়, সে-দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার বিস্তার হ'তে ঢের দেরি আছে। স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতার যোগ্য করে' তোল্‌বার আগে, এখানে পুরুষদের মন তৈরি করে' তুল্‌তে হবে। আজ্‌কের এই ব্যাপারটা দেখে বেশ বুঝতে পারছি, এদেশে স্ত্রীলোকদের চেয়ে পুরুষরাই বেশী-অযোগ্য।

কিন্তু একটা কথা মনকে ব্যথা দিতে লাগ্‌ল। শ্রী, আমার সঙ্গে প্রভার সম্বন্ধটাকেও সন্দেহ করে! শুধু তাই নয়—নিজের সন্দেহের কথা আজকাল সে ঘরের বাইরেও প্রচার করছে! কী অন্যায়, কী অন্যায়!

ভাব্‌তে ভাব্‌তে শ্রীর কাছে গেলুম। শ্রী তখন আল্‌মারির তাকে কতকগুলো নতুন পুতুল সাজিয়ে রাখ্‌ছিল, আমার পায়ের শব্দে ফিরে দাঁড়াল। একটা পাথরের নাড়ুগোপাল দেখিয়ে বল্‌লে, "এটি দেখতে কেমন, বল ত? আজ কিনেছি।"

নাড়ুগোপালের সমালোচনা কর্‌বার জন্যে আমার তখন কিছুমাত্র উৎসাহ ছিল না। আমি তার চোখের উপরে চোখ রেখে বল্‌লুম, "শ্রী, তুমি লেখাপড়া যখন কর্‌বেই না, তখন এই-সব সাজানো-গোছানোর কাজেও তোমার মনটাকে যদি নিযুক্ত রাখ, তাহলে আমিও কিছু নিশ্চিন্ত থাকতে পারি!"

শ্রী আমার হাতদুখানা তার নিজের

দিকে টেনে নিয়ে হেসে বললে, "কি গো মষ্টারমশাই, আজ যে বড় ঘরে ঢুকেই উপদেশ সুরু করলে? ব্যাপার কি?"

—"হ্যাঁ শ্রী, ব্যাপার এতদুর এগিয়েছে যে, আমার উপদেশটা মন দিয়ে শোনা তোমার পক্ষে অত্যন্ত দরকার হয়ে উঠেছে!"

শ্রী দু-হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে, তার কাণের কাছটা আমার ওষ্ঠাধরের উপরে চেপে বল্‌লে, "নাও, হয়েচে ত? আমার এই কাণের ভেতরে এখন যত পার উপদেশ-বৃষ্টি কর!......কৈ গো, চুপ করে' রইলে বড় যে? বেশ, উপদেশ যদি না দাও ত, আমার গালটা যে তোমার ঠোঁটের কাছে আছে, তা বোধ হয় দেখতে পাচ্ছ? নিদেন সেখানে একটা—বুঝেচ?"

শ্রীর এ-সব চাপল্য এখন আমার মোটেই ভালো লাগ্‌ল না, আস্তে আস্তে তাকে সরিয়ে দিয়ে বল্‌লুম, "শ্রী, তুমি কি চাও বল দেখি? তোমার ঐ নাড়ুগোপালটির মত আমিও না নড়েচড়ে চুপচাপ এই আলমারির ভেতরে সাজানো থাকি?"

—"তা তুমি রাজি হবে কেন? তুমি যে ছটফটে!"

—"আমি পুরুষমানুষ হয়েও অন্তঃপুর থেকে বেরুব না, তুমি ছাড়া আর কারুর সঙ্গে কথা কইতে পাব না, এই কি তোমার মনের ইচ্ছে?"

—"ঠিক বলেছ! কিন্তু আমার মনের এত-বড় ইচ্ছেটা তুমি কি করে' জান্‌তে পার্‌লে গা? ভারি আশ্চয্যি ত!"

—"আর, তোমার এই ইচ্ছে পূর্ণ না-হ'লেই স্বামীকে তুমি অবিশ্বাস করবে, পাঁচ-জনের কাছে স্বামীর নামে কলঙ্ক রটাবে, যা বলা উচিত নয় এমন-সব কথা বল্‌তেও তোমার লজ্জা হবে না? ছিঃ শ্রী, তুমি যে এতটা এগুতে পার আগে আমি তা ভবি-নি!"

এতক্ষণে শ্রীর মুখে উদ্বেগের লক্ষণ ফুটে উঠল! অবাক হয়ে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বাধো-বাধো স্বরে সে বল্‌লে, "তুমি—তুমি, কি বল্‌চ গা?"

—"উমানাথের স্ত্রীর কাছে তুমি আমার আর বিনোদের স্ত্রী সম্বন্ধে কি বলেচ?"

শ্রীর মুখ শুকিয়ে গেল। আম্‌তা আম্‌তা করে' বল্‌লে, "আমি ত এমন-কিছু বলি-নি!"

—"যতটুকু বলেচ, পাড়ার লোকের পক্ষে ততটুকুই যথেষ্ট হয়েচে! তারা তাই নিয়ে যে-সব কথা বল্‌চে, কোন ভদ্রলোক তা শুন্‌তে পারে না। আর তাদেরি বা অপরাধ কি, নিজের স্ত্রী যাকে বিশ্বাস করে না, পরে তাকে সাধু বলে' মান্‌বে কেন? ছিছি, এমন কথাও শেষটা শুন্‌তে হোলো?"

শ্রী ঘাড় হেট করে' কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

—"শ্রী, তোমার সন্দেহ করার এই কদর্য্য স্বভাব ছাড়ো, সব জিনিষকে বেশ সহজ ভাবে দেখতে আর বুঝ্‌তে চেষ্টা কর। এতকাল আমার সঙ্গে রইলে, এখনো আমাকে চিন্‌তে পার্‌লে না? এমন ভাবে আর বেশী-দিন চল্‌লে ভবিষ্যতে তুমি কষ্ট পাবে শ্রী,—এ ছাড়া আমি তোমায় আর-কিছু বল্‌তে চাই না।"

* * *

সেদিন প্রভাকে গান-শেখাতে যেতে

একটু রাত হ'ল। প্রভার ঘরে গিয়ে তাকে দেখ্‌তে পেলুম না। তার নাম ধরে ডাকতেই পাশের ঘর থেকে বিনোদ বেরিয়ে এসে বল্‌লে, "প্রভা বোধহয় ছাদের ওপরে আছে। তুমি সেইখানেই যাও।"

ছাদে উঠে দেখি, সুন্দর চাঁদনী রাত। সমস্ত আকাশ ভরে স্বচ্ছ দুধের মত জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে পড়েছে; মাথার উপরে অবাধ অসীমতাকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন পরী-লোকের মোহন স্বপ্নের মত, অপূর্ব্ব মায়ার মত। দূর থেকে নগর-বিহঙ্গের মুখেও আজ বন-শ্যামলতার স্মৃতি-গীতি ফুটে উঠেছে এবং বাতাস যেন নিখিল প্রেমিকের প্রণয়-কামনা বক্ষে ভ'রে, দিকে দিকে পাগল হয়ে কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে!

ছাদের এককোণে একখানা শীতলপাটি বিছানো। আল্‌সের উপরে রজনীগন্ধার একটা চীনেমাটির টব এবং সেই টবের উপরে দুই হাত রেখে, সাম্‌নের দিকে হেলে বুকের ভিতরে মুখ গুঁজে প্রভা, একলাটি চুপ্‌টি করে' বসে আছে।

আস্তে-আস্তে শীতলপাটির একপাশে গিয়ে আমিও বসে পড়্‌লুম। প্রভাকে ডাক্‌লুম—সে চম্‌কে উঠল, কোন সাড়াও দিলে না, মুখও তুল্‌লে না। ভাবলুম, এমন চমৎকার চাঁদের আলোয়, ঠাণ্ডা বাতাসে বোধহয় তার তন্দ্রা এসেছে।

আর-কিছু না-বলে' আকাশের দিকে চেয়ে, মৃদুস্বরে আমি বারোয়াঁয় একটা গান ধরলুম।.........

প্রভা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে, আমার দিকে ফিরে বস্‌ল।

চাঁদের আলোয় তার মুখ দেখে আমার গান আপনি থেমে গেল! কী বিষণ্ণ প্রভার মুখ!......তার চোখদুটিও যেন রুদ্ধ অশ্রুর ভারে ফুলে উঠেছে! সে মুখ দেখ্‌লে এখন একটি শিশুও তার প্রাণের কাতরতা বুঝতে পারে! আজ একটা-কিছু অঘটন ঘটেছে!

এতক্ষণ যা ভুলেছিলুম ফের সেই কথাটা হঠাৎ আমার মনে হয়ে গেল। প্রভার কাছেও কি আজ কেউ এসে সেই কুৎসিত ইঙ্গিত দিয়ে গেছে? আর তাই শুনেই কি সে এমন ব্যাকুল হয়ে পড়েছে? অসম্ভব নয়!

—"প্রভা, আজ কি তুমি কিছু দুঃখ পেয়েচ?"

প্রভা অল্প-একটুখানি ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে, "সংসারে যখন এসেচি পুরন্দরবাবু, তখন সুখও পাচ্চি দুঃখও পাচ্চি—এ ত নিত্যকার ঘটনা! সুতরাং এ-কথা আর নতুন করে' জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন কেন?"

প্রভার কথার ভঙ্গি দেখে আমার সন্দেহ আরো ঘনিয়ে উঠল। বল্‌লুম, "তুমি কি শুনেচ বল প্রভা, আমার কাছে কিছু লুকিও না।"

—"না, আপনার কাছে আজ আমি আর কিছুই লুকবো না। এতক্ষণ বসে বসে আমি সেই কথাই ভাবছিলুম।"

—"তবে বল, কি শুনেচ?"

—"কিন্তু শোনাশুনির কথা আপনি কি বলচেন? কী আমি শুনেচি?"

একটু ইতস্তত করে' শেষটা আমি বলে ফেল্‌লুম, "তোমার-আমার সম্বন্ধে একটা

কুৎসিত কথা পাড়ার কেউ এসে কি তোমাকে বা বিনোদকে বলে' গেছে ?"

প্রভা সচমকে বলে' উঠল, "কুৎসিত কথা ? কি কথা ? কৈ, আমি ত কিছুই শুনি-নি ?" একটু থেমে, সে আবার বল্‌লে, "বুঝেচি। কিন্তু ও-রকম কথা পাড়ার অলস লোকেরা বরাবরই রটিয়ে থাকে, সে-সব আমি গ্রাহ্যই করি না, আর সেজন্যেও আজ আমার মনে কোন কষ্ট হয়-নি। কিন্তু—"

—"থাম্‌লে কেন প্রভা ?"

প্রভা শূন্যদৃষ্টিতে চাঁদের দিকে মুখ তুলে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বল্‌লে, "পুরন্দরবাবু, আজ্‌কের এই চাঁদের আলো দেখে কারুর হয়ত মনেই পড়বে না যে, এ-জগতে কত-বড় এক অন্ধকার আছে! এই চাঁদের আলো যেমন সত্য, সেই অন্ধকারও তেম্‌নি সত্য! এ-কথাটা বারবার ভুলে যায় বলেই বোধহয় মানুষ এত কষ্ট পায়!"

—"কিন্তু, তুমি আমাকে কি বল্‌বে বল্‌ছিলে ? সেই কথাই আগে বল।"

—"হ্যাঁ, সেই কথাই ত বল্‌চি। জানেন পুরন্দরবাবু, পূর্ণিমার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাও গাছের পাতার উপর-দিকেই পড়ে, পাতার তলার অন্ধকার যেমন নিবিড় তেমনি নিবিড়ই থাকে ?"

প্রভা আজ হঠাৎ নতুন মানুষের মতন কথা কইছে কেন ? তার হোলো কি ? আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লুম, "প্রভা, আজ তুমি এমন—"

—"আপনি ভাব্‌চেন বোধহয়, আমার কথাগুলো ঠিক সহজ মানুষের কথার মত শোনাচ্চে না ? তাই হবে। এতদিন ধরে আমি প্রাণপণে সহজ মানুষের মতই থাক্‌তে চেষ্টা করেচি, কিন্তু আমার চেষ্টা যে বিফল হোলো, তার জন্যে আমি দোষী নই!......এতদিন পরে অভাগী আমি, বেশ বুঝতে পারচি, ঐ চাঁদের আলো কেবল আমার বুকের উপরেই পড়বে—পৃথিবীর চোখকে মিছে মায়ায় ভুলিয়ে! আমার বুকের ভিতরে কী যে অন্ধকার, তা কি কেউ আর দেখতে পাবে ?"

—"প্রভা, এ-সব কি শুন্‌চি ? আমি ত কিছুই বুঝতে পারচি না।"

—"আচ্ছা পুরন্দরবাবু, রমণী-জীবনের চেয়ে অনির্দ্দিষ্ট জীবন আর কিছু আছে কি ?"

—"এ কথা কেন জিজ্ঞাসা কর্‌চ ?"

—"কারণ, এ জিজ্ঞাসার কোন উত্তর আমি নিজের কাছে পাই-নি! বাজার-থেকে-কিনে-আনা মাটির একটা তুচ্ছ প্রাণ-হীন খেলনার সার্থকতা যেমন শিশুর পছন্দ-অপছন্দের উপরে নির্ভর করে, আমাদের নারীজাতির জীবনটাও অবিকল তেম্‌নিধারা! বিবাহের পর স্বামীর যদি পছন্দ হোলো, তবেই আমরা বাঁচলুম, নইলে—নইলে—" বল্‌তে বল্‌তে প্রভা একেবারে থেমে পড়ল।

... ... ... এতক্ষণ আমি যেন একটা গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম—এইবার অকস্মাৎ পথ খুঁজে পেলুম! প্রভার মনের মাঝে যে একটা চাপা দরদ আছে, এ-কথা আমি অনেকদিন আগেই বুঝেছিলুম, কিন্তু তার কোন কারণ বুঝতে পারি-নি। আজ প্রভার কথাবার্ত্তা শুনে আমার মনে হঠাৎ একটা ইঙ্গিত জেগে উঠ্‌ল, তাড়াতাড়ি

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "প্রভা, বিনোদ কি তোমাকে অবহেলা করে ?"

প্রভা পরিষ্কার স্বরে জবাব দিলে, "হ্যাঁ।"

—"বল কি প্রভা ?"

—"বিবাহের পর থেকে স্বামীর আদর একদিনও পাই-নি, সে অবহেলা-অনাদরও নীরবে সয়ে ছিলুম, কিন্তু আজ তিনি আমার গায়ে হাত তুলেছেন !"

—"তোমার গায়ে হাত ! বিনোদ কি স্ত্রীলোকের গায়ে—"

—"কিন্তু তাঁর প্রহারকেও উপহারের মত আমি হাসিমুখে নিতে পারতুম, স্বামীর ভালোবাসা পাওয়া আমার কপালে যদি একদিনও ঘটত ! ... ... ... পুরন্দরবাবু, বলুন, এমন জীবন নিয়ে আমি কি করব, কি-করে' আমি বেঁচে থাক্‌ব ? আজীবন কেউ কি ব্যর্থতার সঙ্গে যুঝ্‌তে পারে ? যুঝে যুঝে আমি ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছি—আর আমার শক্তি নেই, আর আমি পারি না !"

প্রভার এই মর্ম্মভেদী কাতরতা আমার বুকের ভিতরটা যেন তোলপাড় করে তুললে,—আমি আর একটিও কথা কইতে পারলুম না।

প্রভা খুব আস্তে-আস্তে বল্‌লে, "এ দুঃখের কথা, আপনি একদিন জিজ্ঞাসাও করেছিলেন, তবু আমি বল্‌তে পারি-নি ! কিন্তু স্বামীর ঘৃণা আজ এমন চরমে উঠেচে যে, নিজেকে আর আমি সাম্‌লে রাখতে পারচি না ! আপনি আমার বন্ধু, বলুন, আমার এখন উপায় কি ?"

—"কি বলব প্রভা, তোমার কথা শুনে আমি ত আর কথা কইবার ভাষা খুঁজে পাচ্চি না ! ভিতরে ভিতরে এমন যে ব্যাপার চল্‌চে, এতটা ত আমি কল্পনাও করি-নি !"

—"আপনি যা কল্পনা করতেও পারেন নি, আমার জীবনে নিশিদিন তা সত্য হয়ে জেগে আছে ! স্বামী আমায় স্পষ্ট করে' বলেছেন, আমাকে তিনি চান না—একেবারে না !"

—"তুমি বিনোদকে এত ভালোবাসো, আর সে তোমাকে—"

বাধা দিয়ে প্রভা বল্‌লে, "পুরন্দরবাবু, স্বামীকে আমি ভালোবাসি না !"

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

প্রভা বল্‌লে, "হ্যাঁ, ভালোবাস্‌বার অনেক অবসর আমি খুঁজেচি, কিন্তু সে অবসর তিনি ত আমাকে দেন-নি পুরন্দরবাবু ! আমি প্রাণপণে তাঁর সেবা করেচি, তাঁর প্রতিদিনকার নিষ্ঠুর ব্যবহার তুচ্ছ ভেবে উড়িয়ে দিয়েচি, তাঁর সমস্ত ঘৃণা-বিরক্তিও আমাকে হতাশ করতে পারে-নি, তবু আমি ছায়ার মত তাঁর পিছনে পিছনে ছুটেচি, কুকুরের মত তাঁর পায়ে পড়ে' তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি জানিয়েছি,—সামান্য একটু হাসির জন্যে, দুটো মিষ্টি কথার জন্যে, এতটুকু ভালোবাসার জন্যে, আমি তাঁর পথের উপরে গিয়ে ধূলোর মত গড়াগড়ি দিয়েছি,—কিন্তু সব মিছে হয়েচে, সব ব্যর্থ হয়ে গেছে ! পাষাণ-মন্দিরের পাষাণ দেবতাও আমার সে প্রাণপণ আত্মনিবেদনে তাঁর পাথরের মুখ তুলে চাইতেন ! কিন্তু আমার স্বামীর অটলতা একদিনের,—এক মুহূর্ত্তের

জন্যেও একটুও টলে-নি—তিনি বারবার সেই এক-কথাই বলেছেন,—আমাকে তিনি ভালোবাসেন না, কখনো বাসবেনও না! ... ... ... শুধু তাই নয় পুরন্দর-বাবু, আজ কয়মাস ধরে, এখানে এসে পর্য্যন্ত তিনি যেন আরো কঠিন হয়ে উঠেচেন, দিন-রাত সমস্তক্ষণ সে কঠিনতার সাম্‌নে অধীর না হয়ে বসে থাকা, মানুষের পক্ষে অসম্ভব! তাঁর সেই নির্ম্মম, বুক-পোড়ানো ব্যবহারে অনেকদিন থেকেই আমার মন তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে আছে, তাঁকে যে এতদিনু আমি একেবারে ত্যাগ করে' চলে যাই নি—এ খালি কর্ত্তব্যের জন্যে। কিন্তু এমন নিঃসম্বল হয়ে আমি ত আর কর্ত্তব্যপালনও করতে পার্‌চি না! বলুন, এমন করে কতদিন আর সইতে পারা যায়? আমার এ জীবন ত মানুষের জীবন বটে! এ ত পরের-হাতে-চলা, একটা কলের যন্ত্র নয়! জ্বলে-পুড়ে বুক যে আমার খাক্ হয়ে যাচ্ছে! এ যে অসহ্য—অসহ্য! আমারও প্রাণ আছে, যৌবন আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে! আমি মানুষ—এই সুন্দর পৃথিবীতে আমি ব্যর্থ হ'তে চাই না, আমি বাঁচতে চাই,—আমি বাঁচতে চাই! আপনার মত আত্মীয় আমার আর কেউ নেই—কি-কর্‌লে আমি মুক্তি পাব, আপনিই আমাকে বলে' দিন!"

—"প্রভা! তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?"

—"আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারচেন না? আমি মুক্তি চাইছি—মুক্তি! স্বামীর নিষ্ঠুরতা আর আমি সহ্য কর্‌তে পারছি না—আপনার কাছে আমি মুক্তি চাইছি!"

—"আমার কাছে?"

প্রভা আমার চোখের উপরে তার হঠাৎ জ্বলন্ত চোখের উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি ফিরিয়ে, অত্যন্ত স্থির স্বরে বল্‌লে, "হ্যাঁ, আপনার কাছে!"

—"প্রভা! প্রভা——"

—"আজ এই কথা বল্‌ব বলেই আমি প্রস্তুত হয়ে আছি। আপনার সঙ্গে প্রথম যেদিন আমার দেখা হয়, সেইদিন থেকেই আমার মনের গতি ফিরে গিয়েছে। এমন ভাবে গোপনে মনের গতি হয়ত অনেকেরই ফেরে, কিন্তু হয়ত তা বাইরে কখনো প্রকাশ পায় না! আমিও আমার এ গোপন কথা চিরদিনই গোপন রাখব ভেবেছিলুম, কিন্তু নিরাশার শেষ সীমায় এসে এখন বুঝ্‌চি, এ গুপ্ত কথা প্রকাশ না করলে আমি আর বাঁচব না! আমি—"

প্রভার এই অভাবিত আত্মপ্রকাশে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম!

কোথা থেকে একখানা কালো মেঘ এসে চাঁদের মুখ ঢেকে দিলে—অন্ধকারের একখানা যবনিকা এসে চারিদিক ঝাপ্‌সা করে' তুল্‌লে।... ... ...

সেই স্বচ্ছ আঁধারে আচম্বিতে কে আমার বুকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কার দুখানি হাত এসে এক নিমেষে আমার বক্ষ বেষ্টন করে' ধর্‌ল—সঙ্গে-সঙ্গে কে আমার মুখের উপরে মুখ রেখে আকুল ভাবে চুম্বনের উপর চুম্বন কর্‌তে লাগ্‌ল!

... ... ... উঃ! কী জ্বালা! আমার মুখ যে পুড়ে গেল—পুড়ে গেল! সর্পাহতের মত আর্ত্তনাদ করে' কাতরস্বরে আমি বলে' উঠলুম, "প্রভা, প্রভা! তোমাদের নারীত্বকে

আমি পূজা করি, নারীত্বের উপরে আমার অবিশ্বাস করিয়ে দিও না!—তোমার এই চুম্বনকে আমি গ্রহণ করলুম,—সন্তানের মুখে জননীর চুম্বনের মত!"

## দশ

### বিনোদের কথা

ভগবান বলে' সত্যিই যদি কোন সৃষ্টি-কর্ত্তা থাকেন, তবে আমাকে তিনি যে একটা নূতন উপাদানে সৃষ্টি করেছেন, তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। আর-পাঁচজনের মত আমিও যদি সাধারণ মানুষ হতুম, তাহলে সে রাত্রে ছাদের উপরকার সেই স্মরণীয় দৃশ্য দেখে আমি অমন শান্ত ও স্তব্ধ হয়ে থাকৃতে পারতুম না! না, আমি সাধারণ মানুষ নই—আর, ... ... এজন্যে আমি গর্ব্বিত!

তেমন দৃশ্য যে দেখতে হবে, এ আমি আগে থাকৃতেই জান্‌তুম। অভিনয়ের কোথায় কি ভাবের বিকাশ হবে,কোথায় কি সাজসজ্জা, কি দৃশ্যপট হবে, রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ সে-সব কথা আগে-থাকৃতেই জেনে রাখে; কারণ, তাকে আপন হাতেই অভিনয়ের উপযোগী সমস্ত কাজকর্ম্ম, বন্দোবস্ত গুছিয়ে-গাছিয়ে ঠিক করে' রাখতে হয়। তাই প্রতি রাত্রে নিত্য-নূতন দর্শকের দল যখন অভিনয়ের আকস্মিক ও বিচিত্র ভাবে অভিভূত, উত্তেজিত ও চমৎকৃত হয়ে ওঠে, রঙ্গালয়ের কর্ত্তা তখন কিছুমাত্র বিস্মিত ও ভাবাপ্লুত হয় না। এ ত তার নিজের হাতেই সাজানো-গুছানো, এ ত হবেই,—এ না হওয়াই ত আশ্চর্য্য!

সুতরাং সেই জ্যোৎস্না-রাত্রে ছাদের উপরে প্রেমের লীলা দেখে, আমিও কিছুমাত্র বিস্মিত হই-নি! নিজের হাতেই আমি জমি তৈরি করেছি, ফাঁদ পেতেছি, সব বন্দোবস্ত ঠিক করেছি,—আমার এত চেষ্টা-যত্নের আয়োজন ত বিফল হ'তে পারে না,—আমি যে এতদিন ধরে এই মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করে'ই একাগ্রমনে বসেছিলুম!

একদিকে অত্যাচারী, নিষ্ঠুর, প্রেমহীন স্বামী; আর-একদিকে সুপুরুষ, সদালাপী, সহৃদয় বন্ধু;—মাঝখানে অতৃপ্ত, অসুখী ও উপেক্ষিত যুবতীর নিরানন্দ জীবন! পাত্র-পাত্রীর সমাবেশ যদি এমনধারা হয়, তবে এই ত্রিধারার পরিণাম কি, সেটা বোঝা একটুও শক্ত নয়।

পরিণামের দিকেই দৃষ্টি স্থির রেখে একান্তভাবে আমি কাজ করে' যাচ্ছিলুম। এখন আমি বুঝতে পারছি, দুরাচার স্বামীর ভূমিকায় আমি যে-কোন প্রথমশ্রেণীর নটের চেয়ে খারাপ অভিনয় করি-নি। আমার অভিনয় যে সার্থক হয়েছে, এইটেই তার জ্বলন্ত প্রমাণ!

কিন্তু এখনো আমার হাতে অনেক কাজ বাকি আছে। আমার চক্রান্তের প্লটের প্রথম পরিচ্ছেদ হচ্ছে, 'আমার কপটতায় ভুলে পুরন্দরের পরাজয়'। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্ত্রীকে প্রায় পোষ মানিয়েছি। তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমার অভিনয়ে পুরন্দর ও প্রভার পতন হোলো—কিন্তু এখনো যে অনেক পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ করতে হবে!... ...

ইতিমধ্যেই আমি আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে অনেকটা অগ্রসর হয়েছি।... ...সে রাত্রে ছাদের একপাশে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে, প্রভা ও পুরন্দরের কথা খানিকক্ষণ শোন্‌বার

পরই মনে হোলো, আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। এতদিন যে ফাঁক খুঁজছিলুম, সেই ফাঁক আজ আমি পেয়েছি! তখনি নেমে এসে, তাড়াতাড়ি আমি পুরন্দরের বাড়ীতে গিয়ে ঢুকলুম। উপরে উঠে দেখলুম, শ্রী একলাটি বসে বসে পাণ সাজছে।

আমাকে দেখে সে বল্লে, "ঠাকুর-পো! —এমনসময়ে যে ?"

আগে চারিদিকে চেয়ে দেখলুম। না, কেউ কোথাও নেই! তবু গলাটা যথাসম্ভব খাটো করে' বল্লুম, "বৌদি, আমার বন্ধু হয়েও তোমার স্বামী আমাকে এমন দাগাটা দিলেন! এ আমি স্বপ্নেও ভাবি-নি!"

শ্রী ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে' আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বল্লে, "কি বল্‌চ ঠাকুরপো ?"

—"না, এ আমি স্বপ্নেও ভাবি-নি! ওঃ, বন্ধু হয়ে এমন ব্যবহার!"

শ্রী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য্য স্বরে বল্লে, "কেন ঠাকুরপো, উনি কি করেচেন ?"

—"কি করেচে ? পুরন্দর আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিতে চায়!"

ঘাড় তুলে ক্রুদ্ধ, তিরস্কারের স্বরে শ্রী বলে' উঠ্‌ল,—"ঠাকুরপো!"

—"তুমি রাগ কর্‌চ বৌদি ? হ্যাঁ, এ বিশ্বাস কর্‌বার কথা নয়! আমি স্বচক্ষে দেখেও এখনো বিশ্বাস কর্‌তে পারচি না—যা দেখেচি, যা শুনেচি সব সত্য কিনা!"

—"ঠাকুরপো, তোমার কথা আমি বুঝতে পারচি না। স্বচক্ষে তুমি কি দেখেচ ?"

—"যা আমি দেখেচি, ইচ্ছে করলে তুমিও তা দেখ্‌তে পার। তোমাদের ছাদে ওঠ্‌বার সিঁড়ি আছে ত ?"

—"হ্যাঁ, আছে।"

—"তবে এস আমার সঙ্গে।"

আজ পূর্ণিমার রাত, এ-বাড়ীর ছাদের পাশেই আমাদের ছাদ, সমস্ত দৃশ্য ঠিক দিনের বেলার মতই স্পষ্ট দেখা যাবে!

আমার পিছনে পিছনে শ্রী তাদের ছাদের উপরে গিয়ে উঠল।... ...কিন্তু, কি বিপদ! কোথা থেকে একখানা মেঘ এসে চাঁদকে ঢেকে ফেলেছে, চারিদিক একেবারে অন্ধকার হয়ে না গেলেও, কেমন আব্‌ছায়ার মত ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছে।

শ্রী বল্লে, "কৈ ঠাকুরপো, কি দেখাবে বলেছিলে, দেখাও!"

আমাদের ছাদের দিকে চেয়ে দেখলুম। পুরন্দর আর প্রভাকে দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু চেন্‌বার যো নেই—ভারি অস্পষ্ট।

—"বৌদি, আমাদের ছাদের দিকে চেয়ে দেখ। কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ কি ?"

—"হ্যাঁ, কারা যেন নড়্‌চে-চড়্‌চে। ওরা কে ?"

—"এখনি দেখ্‌তে পাবে। মেঘটা সরে যাক্!"

... ... ...আস্তে আস্তে চাঁদের উপর থেকে মেঘখানা কেটে গেল—চারিদিক আবার আলোয় আলো!

যতখানি দেখ্‌ব মনে করেছিলুম, তার চেয়ে ঢের-বেশী দেখলুম!......পুরন্দর আপনাকে প্রভার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে' নিচ্ছে!

একটা তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ করে' শ্রী সেই-খানেই বসে পড়ল!

পাছে ওরা দেখে ফেলে, সেই ভয়ে শ্রীকে তাড়াতাড়ি চিলের ঘরের ভিতরে টেনে নিয়ে এলুম।

ঘরের ভিতর থেকে শ্রী পাগলের মত আবার বাইরে ছুটে যেতে গেল। দরজার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমি তাকে বাধা দিলুম।

শ্রী আকুল স্বরে বল্লে' উঠল, "ওগো আমাকে ছেড়ে দাও! আমি আবার দেখ্‌ব—আমি আবার দেখ্‌ব! নিশ্চয় আমি ভুল দেখেছি—এ হ'তে পারে না! আমার স্বামী—আমার স্বামী—না, এ হ'তে পারে না—আমি ভুল দেখেছি!"

—"বৌদি, তুমি ভুল দেখনি, যা দেখ্‌লে তা সত্য।"

আমাকে দু-হাতে ঠেলে দিয়ে সে বল্‌লে, "না, তুমি মিছে কথা বল্‌চ···সব মিছে কথা! সরে যাও—তুমি সরে যাও! নৈলে আমি এইখান থেকেই চ্যাঁচাব!"

—"বৌদি, অমন কোরো না, ঠাণ্ডা হও! তুমি সব দেখেছ, এ-কথা জান্‌তে পার্‌লে পুরন্দর হয়ত আর বাড়ীতেই ফির্‌বে না—আমার স্ত্রীকে নিয়ে একেবারে দেশান্তরী হয়ে যাবে!"

শ্রীর মত স্ত্রীলোককে কোন্‌দিক থেকে ঘা মার্‌লে বশ করা যায়, তা আমি বেশ বুঝে নিয়েছিলুম। আমার কথা শুনে, স্বামীকে একেবারে হারাবার ভয়ে শ্রী তখনি অনেকটা শান্ত হয়ে পড়ল। আচ্ছন্নের মত অবশ হয়ে মাটির উপরে বসে, দু-হাতে মুখ ঢেকে সে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

আমি তাকে খানিকক্ষণ কাঁদবার অবকাশ দিলুম।... ... ...

তারপর ধীরে ধীরে বল্‌লুম, "বৌদি, এখন অস্থির হবার সময় নয়, মাথা ঠাণ্ডা রেখে ধীরে-সুস্থে বুঝে-সুঝে সব কাজ কর্‌তে হবে। উপস্থিত তোমারও যে দশা, আমারও সেই দশা। তুমিও তোমার স্বামী হারাতে বসেচ, আমিও আমার স্ত্রী হারাতে বসেচি। তবু দেখ, আমি একটুও অস্থির হই-নি।"

শ্রী আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে গাঢ় স্বরে বল্‌লে, "ওগো, তোমরা পুরুষ-মানুষ, এ পৃথিবীতে নিজের স্ত্রী ছাড়া তোমাদের আরো অনেক আনন্দ আছে—স্ত্রীর সঙ্গে-সঙ্গে তোমাদের জীবনের সকল আশা ত চলে যায় না! কিন্তু স্বামী হারালে আমরা আর কার মুখ-চেয়ে বেঁচে থাকব ঠাকুর-পো?"

স্বামীকে হারাবার ভয়ে শ্রীর এতটা আকুলতা আমার ভালো লাগল না! কিন্তু মনের ভাব মনেই লুকিয়ে মুখে আমি বললুম, "কিন্তু স্বামীকেই-বা তুমি হারাবে কেন—"

বাধা দিয়ে শ্রী বলে' উঠ্‌ল, "হারাব না? চোখের উপরে আজ যা দেখলুম, তারপরেও স্বামীর কাছে আমি আর কি আশা কর্‌তে পারি? স্বামীর সঙ্গে আর কি-বলে' আমি কথা কইব, কেমন করে' ভালো মনে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াব, তাঁর সঙ্গে চোখোচোখি হ'লে লজ্জায়-ঘৃণায় আমারি যে মাথা কাটা যাবে! মাগো, আমার কপালে শেষে এই ছিল—" শ্রী আবার কান্না জুড়ে দিলে!

—"কেঁদনা বৌদি, কেঁদনা! তোমার

স্বামী যাতে আবার তোমারি হন, আমি প্রাণপণে তা কর্‌ব!"

—"কর্‌বে? কি-করে কর্‌বে ঠাকুরপো?"

শ্রীর কথার জবাব দিতে যাব—নীচে থেকে হঠাৎ পুরন্দরের গলা পেলুম। এরি মধ্যে তার প্রেমের লীলা সাঙ্গ হয়ে গেল!—আশ্চর্য্য! তাড়াতাড়ি বল্‌লুম, "চোখের জল মুছে ফেল বৌদি, পুরন্দর এসেচে! সাবধান, সে যেন কিছুই টের না পায়, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই তাকে হারাবে! আমার ওপরে নির্ভর করে' থাক, পুরন্দরের মন যাতে ফেরে, তার উপায় কাল্‌কেই আমি তোমায় করে' দেব! হতাশ হোয়ো না—পুরন্দরকেও কিছু বোলো না!"

—আজ থেকে আমি শ্রীর কাছে মরমী বন্ধু হয়ে গেলুম। আমার যুক্তি-পরামর্শ এখন থেকে তার কাছে অকাট্য হবে। এই ত আমি চাই!

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

---

# বাঙ্গালার লাভজনক দুইটী কৃষি

## শন

শনের চাষ পূর্ব্বে এ-দেশে খুবই হইত। কিন্তু পাটের চাষের বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহা একপ্রকার লোপ পাইয়া যাইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে শনের চাষ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। অথচ শন বেশ লাভজনক কৃষি;—ইহা শুধু মুখের কথা নহে, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে পাট এবং শনের মধ্যে, খাটুনি-খরচের অনুপাতে শনই বর্ত্তমান সময়ে অধিক লাভজনক কৃষি। একথা অবশ্য না বলিবার যো নাই যে, পাট হইতে যতগুলি টাকা বিদেশ হইতে দেশে আসে, তুলনায় শন সে জায়গায় দাঁড়াইতেও পারে না। শন যেরূপ দেশেতেই ব্যবহারে লাগিয়া যায়, পাটেতে তা হয় না। পাট বুনিয়া বিক্রির জন্য বিদেশী বণিকদের মুখের দিকে তীর্থের কাকের মত চাহিয়া থাকিতে হয়। তাহাতে অনেক সময় সুফল ফলে না। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিগত ইউরোপীয় সমর। আর এবারকার দুর্ভিক্ষেও ভাল করিয়া তদন্ত করিয়া দেখিয়াছি, যাহাদের ঘরে পঞ্চাশ মন পর্য্যন্ত পাট মজুত রহিয়াছে, তাহারাও উদর পুরিয়া দুবেলা ভাত খাইতে পায় নাই; হঠাৎ মাঝে পাট বিক্রি বন্ধ হইয়া যাওয়াতেই এই দুর্দ্দশা। তবেই দেখা যাইতেছে যিনি যাহাই করুন না কেন, যদি দেশে তাহার ব্যবহার ( utilise ) না করিতে পারা যায়, তবেই ঘাড় বাঁকাইয়া পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়।

**শনের ধর্ম্ম।**—কর্ষণ ইত্যাদি জমি-প্রস্তুত-প্রণালী অন্যান্য কৃষি-সামগ্রীর অনুরূপ। বছরে দুইবারই ইহার চাষ করা যায়। হৈমন্তিক চাষই বিশেষ ভাবে উপযুক্ত। নালিতা বা পাটের ন্যায় জলে পচাইয়া সুতা বাহির করিতে হয়। এই সুতা বা পাট মণ-প্রতি ১৫৲ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ২২৲ টাকা পর্য্যন্ত এ অঞ্চলে বিক্রয় হইয়া থাকে, আর এই শনের পাট হইতে যে সুতা কাটা হয়, তাহা প্রতি সেরে দেড় টাকা

হইতে তিন টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া থাকে। সুতার সূক্ষ্মতা ও উৎকৃষ্টতা অনুসারে এর চেয়েও বেশী দর হইয়া থাকে। মোট কথা গড়ে ৮০৲ টাকা হইতে ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত কাটা সুতার মণ খুবই হয়।

**সুতা-কাটার প্রণালী।**—ত্রিপুরার কুণ্ডা Industrial Institution-এ কৈবর্ত্ত-জাতীয় মেয়েরা ঐ সুতা কাটিয়া থাকে। চরকার সাহায্যে ঐ সুতা কাটা হয় না, হাতে "টাকুর" সাহায্যে ঐ সুতা কাটিয়া থাকে। ইহা নিতান্ত মামুলি ধরণের।

প্রথমতঃ চাউলের কুড়ার (Rice dust) সঙ্গে সুতাগুলিকে একটু সিদ্ধ বা গরম করিয়া ডলিয়া চাপিয়া সুতা-কাটার উপযোগী করিয়া লইতে হয়; ইহাতে যে সুতা কাটা হয়, তাহার প্রতি সেরে বার-তের ছটাক কাটা-সুতা প্রস্তুত হয়, বাকী তিন-চার ছটাক খোয়ান যায়; সুতা-কাটার পারিশ্রমিক ইত্যাদি দিয়াও তাহাতে যথেষ্ট লাভ হয়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

দুঃখের বিষয় এই সুতা-কাটার প্রণালীকে উন্নত করিবার প্রয়াস আজ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। যন্ত্রাদির সাহায্যে সুতা কাটিলে শ্রম ও সময় আরও কমিয়া ইহা একটী বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কুণ্ডা শিল্প-বিদ্যালয়ে জাল ভিন্নও শন-সুতার দ্বারা কোটের কাপড় এবং "কার্পেটের কাপড়" প্রস্তুত করা হইয়াছে। কার্পেট ও কাপড় বেশ সুন্দর মজবুত হইয়াছে। ইহার বুনন-প্রণালী আরো উন্নত করার চেষ্টা উক্ত বিদ্যালয়ে চলিতেছে।

**শনের গুণ।**—শনের আর-একটা বিশেষ গুণ এই যে, যে ক্ষেতে শনের চাষ করা যায়, শন কাটিয়া লইলে পর উহাতে অন্য ফসল উৎপন্ন করিলে ফসলের হার অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। শনের শিকড় পচিয়া উৎকৃষ্ট সার তৈয়ার হয়।

## পেঁয়াজ

পেঁয়াজও একটী অত্যন্ত লাভজনক কৃষি। ইহার চাষ এতদ্দেশে ত্রিপুরা, নোয়াখালি শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে কপালী ও মুসলমান সম্প্রদায় অল্পবিস্তর কিছু করিয়া থাকে। ত্রিপুরা জেলার কপালী গৃহস্থেরা পেঁয়াজের চাষ করিয়া বেশ লাভবান হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের গৃহস্থেরা ইহার চাষ বড় করে না। ভাল প্রণালীতে চাষ করিলে সেরে মণ ফলে, তাহা আমাদের স্বচক্ষে দেখা। তা ছাড়া যে-কোন ভাবে চাষ করিলেও এক সেরেতে আধমণ খুবই হয়।

কর্ষণের গভীরতা ও তদ্বিরের উপরই ফসলের হার বৃদ্ধি পায়। ইহা বপন করিয়া চাষ করিতে হয় না, রোপন-প্রণালী আলু ইত্যাদির মত। কার্ত্তিক মাসেই ইহার চাষ বিশেষ ভাবে হয়। অগ্রহায়ণ মাসেও করা যাইতে পারে, তবে একটু অসময় হইয়া পড়ে। শেষের চাষের পেঁয়াজে কিন্তু খুব ভাল বীজ হয়। পচিয়া লোকসান যায় না। এক বিঘা জমিতে সাতমণ পেঁয়াজ চাষ করা যায়।

"বোম্বাই পেঁয়াজ" অপেক্ষা আমাদের দেশী পেঁয়াজ এদেশে অধিক ফলিয়া থাকে, ইহাই চাষাদের মত। আমরা তুলনা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাই নাই। রসুনের চাষও পেঁয়াজেরই অনুরূপ।

শ্রীসত্যভূষণ দত্ত

# প্রতীক্ষায়

অস্তগিরির পরে,
ঝড় উঠেছে রঙের বনে আলোর বৃষ্টি ঝরে !

সবুজ মাঠের ক্ষেতে,
ধূপছায়া-রঙ সাড়ীর আঁচল কে রেখেছে পেতে !

ঐ গগন-কিনারায়,
শাদা মেঘের পাল তুলে কার পান্‌সি ভেসে যায় !

কালো দিঘীর জলে,
হাওয়ার কাঁপন লাগলো কখন্ সাঁঝের আলো ঝলে !

বকুল ফুলের বনে,
গন্ধে ভারী দখিণ বাতাস দেয় দোলানি মনে !

মাথায়—রূপের ডালি
আড়চোখে দূর আকাশ-কোণে সরু চাঁদের ফালি !

গোলাপ-বাগিচায়,
গোলাপজলের ঝরনা-তলায় রাজকুমারী নায় !

হল্‌দে বাড়ীর ছাতে,
তুলসীতলায় ঘোমটা মাথায় বউটি প্রদীপ হাতে !

বন্ধ ঘাটের খেয়া,
ডিঙি-বাঁধা নদীর কূলে চুকলো দেওয়া-নেওয়া !

গাঁয়ের সীমানায়,
বাজিয়ে বাঁশী রাখাল-ছেলে ঘরে ফিরে যায় !

আমি চেয়ে আছি পথে—
ঐ গোধূলির উড়িয়ে ধূলি আস্‌বে সে কি রথে ?

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায় ।

---

# মাসকাবারি

## সুন্দর-দর্শন

সুন্দরকে দেখা হ'চ্ছে—Reasonএর সাহায্যে চরম ও পরম বলে' যা'র একটা সম্বিৎ মাত্র হয়, তাকে খুব ভালো করে' সমগ্রভাবে, অপরোক্ষ করে'—জানা নয়—অন্তর-গোচর করা। সবটাকে একসঙ্গে একেবারে না দেখ্‌তে পার্‌লে সুন্দর-মূর্ত্তি দেখা হয় না। মানুষের অন্তর-রহস্য যেমন, বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যও তেমনি; এই দুই রহস্যের মাঝ-খানকার ব্যবধান যখন যেখানে ঘুচে যায়, তখন সেইখানে সুন্দরের সাক্ষাৎকার হয়। সুন্দরের যথার্থ অনুভূতি যে হয়েছে তার প্রমাণ আনন্দ-আস্বাদ। সত্যের এই সমগ্র দর্শন কখনো তর্কসিদ্ধান্তের দ্বারা হ'তে পারে না—সেটা Reasonএর কাজ নয়, সেটা Soulএর কাজ। অর্থাৎ, বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরের সত্যরহস্য—সর্ব্ববৈচিত্র্য ও বিস্তারের শতদলের মধ্যে কেন্দ্রস্থলে যা' মধু হ'য়ে বিরাজ করছে—তা' বুদ্ধির অতীত, তাকে দলগুলির মত গুণে' হিসেব করলে হয় না, তা'কে ওই মধুর মত আস্বাদ করতে হয়, হৃদয় দিয়ে তাকে অনুভব করতে হয়; তাই, তা' মানুষের মধ্যে সুন্দর হ'য়ে ফুটে ওঠে, আর কিছু হয়ে' ফুটতে পারে না; যদি ফোটে—তা' সমগ্র নয়, পূর্ণসত্য নয়। এই জন্যে সাধারণ জীবন-যাত্রাতেও, যে মানুষটিকে প্রাণ দিয়ে বুঝি নি তাকে বোঝা-ই হয় নি। তার সম্বন্ধে যত খণ্ডজ্ঞান যত দিক দিয়েই গ'ড়ে তুলি না—সত্যিকার সেই মানুষটিকে কিছুতেই আমার মনের মধ্যে গড়ে' তুল্‌তে পারবো না। ব্যক্তিতে যেমন, ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে বিশ্বেও তেমনি, এই হৃদয়ের ভিতর দিয়েই আসল রহস্য প্রত্যক্ষ করা যায়। এই হৃদয়বৃত্তি ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে যেমন সহৃদয়তা, বিশ্বপ্রকৃতির পক্ষে তেমনি রসবোধ।

*　　*　　*

এই সব-দেখাটা মানুষ প্রাণ দিয়ে দেখে বলেই এই সৌন্দর্য্যজ্ঞান বিশেষ ভাবে হৃদয়েরই ধর্ম্ম। এই 'প্রাণ' কথাটা বলতে আমি যা' বোঝাতে চাই, তা' আর একটু পরিষ্কার করে বল্‌তে হবে। ইংরিজী ক'রে বল্‌তে হলে আমি বল্‌ব—Soul। এই Soulএর ধর্ম্ম হচ্ছে, মানুষের জ্ঞানবৃত্তি, চিত্তবৃত্তি, ইন্দ্রিয়বৃত্তি—perception, emotion, sensation—যতকিছু বৃত্তি আছে, সে সবের সমাহার হয়ে যে একটি আশ্চর্য্য অখণ্ড বোধ-শক্তি জন্মে, তাই। তা'কে বিশ্লেষণ করা যায় না; বিশ্বপ্রকৃতির যে রহস্য, যা' অনির্ব্বচ-নীয়তাতেই শেষ হয়, মানুষের মনের ভিতর-কার এই বৃত্তি তারই মত। বাইরের এই রহস্যকে ভিতরের এই রহস্য যেন আলিঙ্গন করে; সে জানাশোনা, সে বোঝা'—যেন সুন্দর-মিলনের নিভৃত বাসর-শয্যার স্বপ্নানন্দ। তার সন্ধান রসিক-জনই জানে। অনেক বোঝা'ই আমরা তর্ক করে' বুঝি নে, প্রাণ সাড়া দেয়, না বোঝালেও বুঝি। সৌন্দর্য্য-শাস্ত্র একটা-কিছু বিচার ও তর্কের সাহায্যে তৈরী করে তোলা যায় বটে, কিন্তু মনে

রাখতে হবে, তার দ্বারা সুন্দরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় না। পাশ্চাত্য সৌন্দর্য্যশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা জর্ম্মান পণ্ডিত Baumgarten সৌন্দর্য্য বস্তুকে Perfection of sensuous knowledge বলেছেন, সৌন্দর্য্যবোধকে Confused perception বলেছেন। কথাটা দার্শনিক তত্ত্ব হিসেবে পরিষ্কার সুসঙ্গত না হোক্, কতকটা সত্য বটে। সৌন্দর্য্য-জ্ঞানটা প্রাথমিক ভাবে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কতখানি ইন্দ্রিয়ের কাজ, কতখানি মননশক্তির কাজ, সে বিচার নিষ্ফল। কিন্তু সেটা Confused perception—সে কথা যথার্থ। মনঃশক্তি, চিন্তা, বিচার এই সৌন্দর্য্যবোধের মধ্যে যে সজ্ঞানভাবে কাজ করে না, তা' ঠিক। এ জন্যে এই বোধকে অস্পষ্ট, বা অনেকটা unconscious বলায় কারো আপত্তি নেই। আর্টিষ্ট যখন এই জিনিষটা প্রকাশ করতে যান, তখন নানারূপ বস্তুর নিপুণ সংযোজনায় প্রতিফলিত করেন মাত্র, কেবল বাক্যার্থের দ্বারা বোঝাতে পারেন না। সেই জন্যে এই সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির মধ্যে talent নয়, soulই আসল। আবার এই যে সৌন্দর্য্যবোধ, এ যে মূলে ইন্দ্রিয়-সম্পর্কযুক্ত এ কথা সহজেই বোঝা যায়—কিন্তু কেমন করে' এই ইন্দ্রিয়গোচর অনুভূতি—নিছক feeling, রসাবস্থায় চিন্ময় হয়ে ওঠে তার বিচার করতে গিয়ে অনেক কথাই হয়েছে, কিন্তু কোনো স্থির সিদ্ধান্ত হয়নি। কেবল, সেই রসাবস্থাটা কি রকম, তা'র কতক আভাস এই রকম পাওয়া যায় যে—অন্তর ও বাহির, ভাব ও রূপ, জড় ও চেতনের দ্বন্দ্ব এই রসাবস্থায় ঘুচে যায়; মানব-মনের সকল বৃত্তির ঊর্দ্ধে এই রহস্যময় Soulএর গভীরতর—জ্ঞান-পরোক্ষ নয়—ভাব-প্রত্যক্ষ যে উপলব্ধি, তাই হচ্ছে চিন্ময় রসাবেশ, বা সত্যসুন্দরের দর্শন।

## সুন্দর-চেতনা বা রস-পরিচয়

বস্তুর স্বরূপ দর্শনই সৌন্দর্য্যদর্শন। এই স্বরূপ কি? না, সমগ্রতা—অর্থাৎ, সর্ব্ববস্তুর অন্তর্গত আংশিক পরিচয়ের সমন্বয়। সবটা একসঙ্গে একই কালে যখন ধরা পড়ে,—বা যার মধ্যে ধরা পড়ে, তখন তা' আর কুৎসিত দেখায় না। ক্ষুদ্রের মধ্যে বিরাট, বস্তুর মধ্যে বিশ্ব, বহুর মধ্যে এক, বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য—যখন মানসে প্রত্যক্ষ হয়ে' ওঠে, তখন অন্তরের মধ্যে যে মধুর শান্ত আক্ষেপহীন প্রীতির উদয় হয়, সেই প্রীতিই সুন্দরের নিদর্শন। তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতদের মত এই যে, জড় বস্তুর মধ্যে, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যেখানে এই ভাবের অবকাশ আছে, সেখানেই সৌন্দর্য্য, আর এই সৌন্দর্য্য জড়াতিরিক্ত মহাচেতনারই অবাধ স্ফূর্ত্তি। এই ভাব বা চেতনা, জড় অর্থাৎ রূপের মধ্যে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করছে, যেখানে বাধা পায় না সেখানেই সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে, মানুষের হৃদয় বা Soul সেখানে আত্মীয়তার পরিচয়ে সাড়া দেয়। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য যে বাইরে থেকেই সঞ্চার হয়, তা' ত' নয়! এর মধ্যে Soulএর কাজ, হৃদয়ের ধর্ম্ম রয়েছে—তা' শুধু ইন্দ্রিয়বৃত্তি নয়; ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা রাখলেও তা' ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত বটে। রসকে চিন্ময় বা Rational বলতে হবে। এ সম্বন্ধে যেটুকু বৈজ্ঞানিক বিচার কাজে লাগতে পারে, আমি উপস্থিত তারই একটু আলোচনা করব। তবু, তার

দ্বারা রসের প্রকৃতি বিশ্লেষণ হবে না। তার সম্বন্ধে বার বার এই কথাই বল্‌তে হবে ও মনে রাখতে হবে, যে এই রসবোধ মানুষের চিত্তবিকাশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন, মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। চেতন ও জড়ের অভেদতত্ত্ব Subjective ও Objective জ্ঞানের সমন্বয়-প্রতিষ্ঠা এই রসাস্বাদন-বৃত্তিতেই সম্ভব। এই আনন্দের অবস্থায় মানুষ যে শক্তির বা চেতনার অনুভব করে, তা' স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও বাধাহীন। সেখানে, সেই রস-কল্পনার জগতে, মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতার আস্বাদ করে—সেই আত্মতৃপ্ত, আক্ষেপবিহীন, আপনাতে-আপনি-সম্পূর্ণ নির্ব্বিশেষ চেতনার নিষ্কাম ও নির্লিপ্ত সুখবোধ মানুষের মনের মধ্যে আত্ম ও অনাত্মের ভেদ-বুদ্ধি দূর করে' যে অসীমতার উপলব্ধি করায়, তাই মানুষের শ্রেষ্ঠ অধিকার। মানুষের will সেখানে বাধা না পেয়ে শান্তি লাভ করে; জ্ঞানবৃত্তি সেই নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায় বিশ্লেষণী চেষ্টায় ক্ষান্ত হয়ে, 'বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য' হয়ে একটি অখণ্ড চিন্ময়তায় পর্য্যবসিত হয়। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, যা' এই রসপরিচয়ের নিম্নতম সোপান, তা' এই অবস্থায় আনন্দ-ঘন পূর্ণ-রসতার মধ্যে পরিশুদ্ধ হ'য়ে, spiritualised হয়ে', রসাভাস নিবারণ করে', দেহধর্ম্ম না হয়ে আত্মার ধর্ম্ম হয়ে দাঁড়ায়।

## সুন্দর-জিজ্ঞাসা

সুন্দরের পূজো করা চলে, সুন্দরকে বরণ করা, আরতি করা চলে—সুন্দরকে কোন' না কোন' রূপে দর্শন সকলেই করছি, কিন্তু সুন্দরের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা এক রকম অসম্ভব বলেই বোধ হয়। মানুষের মন, যে প্রকৃতিরই হোক, স্থান-কাল-পাত্র হিসেবে যেমনই উন্নত বা অবনত হোক—তার অভিধানে সুন্দরের একটা না একটা নাম পাওয়া যাবেই। আমার কাছে যা' সুন্দর তা' তোমার কাছে হয় ত কম বা বেশী সুন্দর—একটা রকম সুন্দর বোধ যে সবারই প্রত্যেকেরই আছে, সে বিষয়ে প্রমাণের অভাব হবে না। বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য-বোধ না থাক্‌লেও একটা সাধারণ সুন্দর-অনুভূতি স্বাভাবিক ব্যক্তি মাত্রেরই আছে। কাজেই মনে হয়, সুন্দরের কথা বল্‌তে গেলে শুধু নাম করলেই যথেষ্ট হবে, লোকে আপন আপন অর্থে আপনার বিশিষ্টবোধ ও সহৃদয়তা শক্তির অনুযায়ী সুন্দরের কল্পনা করে নেবে। কিন্তু কথাটা একটু তলিয়ে দেখতে গেলেই গোল বাধে। সুন্দরের জ্ঞান যতই সার্ব্বজনীন হোক্, মানুষের কল্পনা ও কল্পকলায় (Fine Arts) সুন্দরের যে পরিচয়, যে অভিব্যক্তি যুগে যুগে দেশে দেশে হয়েছে, তার মধ্যে খুব একটা সাধারণ সাদৃশ্য থাকলেও, এই সুন্দরের প্রকাশ-রীতিতে, এই সুন্দরের কল্পনায় মূলগত অনেক বৈসাদৃশ্যও চোখে পড়ে। মানুষের মন শুধু ব্যক্তিগতভাবে নয়, জাতিগতভাবেও, এই সুন্দরকে যেন একটু ভিন্ন রকম ক'রে দেখেছে। সুন্দরের প্রাথমিক অনুভূতি এবং, বোধ হয়, আদি চর্চ্চা এক উপায়ে হ'লেও মনের বিকাশ ও প্রকৃতি-অনুযায়ী অনুশীলনের ফলে আদর্শ অনেক তফাৎ হয়ে পড়েছে। তখন মানুষের জ্ঞানবৃত্তি, বিভেদ-বিতর্কের কারণ পেয়ে এই সুন্দরের লক্ষণ নির্দ্দেশ করতে চেষ্টা পেয়েছে এবং সৌন্দর্য্যশাস্ত্র

লিখতে গিয়ে বহু মতবিরোধে বিষয়টাকে জটিল করে' ফেলেছে। তখন আর শুধু সুন্দর বললেই হবে না, সঙ্গে সঙ্গে তার আদর্শ ঠিক করতে হবে। এই জটিলতার স্পষ্ট কারণ মানুষের মনের মধ্যে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে—সুন্দর ও সুন্দরের অনুভূতি, সৌন্দর্য্য বস্তু ও মানুষের মন, এই দুইই অন্যোন্যসাপেক্ষ—কাউকে বাদ দিয়ে কেউ নয়। Object ও Subjectএর এই অন্যোন্য-পরতন্ত্রতার রহস্য ভেদ করতে পারলেই এই সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ভিতর দিয়েই পরম তত্ত্বের মীমাংসা হ'য়ে যায়। সে আলোচনা, সে মীমাংসা দার্শনিকের কাজ, সত্যসুন্দরের প্রীতিমুগ্ধ আমি, আমার সে স্পর্দ্ধা নেই। তবু, বিষয়টা সুসম্বদ্ধ করে তুলতে যেটুকু—বিচার নয়—অর্থনিরূপণ করা দরকার, সেটুকু করতে হবে।

* * *

প্রথমেই দেখা যাক্ সহজ সাধারণ অর্থে সুন্দর বলতে কি বুঝি। যে শিশু সেও সুন্দরের নাম না জানলেও, সুন্দর কি, তা' একটু বোঝে। লাল খেলনা পেলে সে নানা ভাব ভঙ্গীতে তার এই সুন্দরবোধের পরিচয় দেয়। মানুষ তেমনি আদিম অবস্থা থেকে আজকার এই শিক্ষা সভ্যতার উন্নত যুগেও, তার বস্তু-জ্ঞানের মধ্যে এই বিশিষ্ট বোধটি চিরদিন স্বীকার ও নানা উপায়ে প্রকাশ করে' আসছে। সুন্দরের ব্যাপক অর্থে—যা' কিছু আহ্লাদিত করে তাই সুন্দর। সঙ্কীর্ণ বিশেষ অর্থে আহ্লাদের বিষয়গুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। আহ্লাদ ত' ভালো আহারে, রসনা-তৃপ্তিতেও হয়—আমরা বলি, রান্নাটি বড় সুন্দর হয়েছে। এই ভোগ, ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ পরিতৃপ্তি—এর থেকে যে আহ্লাদ হয়, তা' দিব্যসুন্দরের পরিচয় নয়। সেটা দেহের প্রয়োজন-সিদ্ধি, সেটা necessity, অভাবাত্মক—বাসনা, পিপাসা, ক্ষুধা প্রভৃতি শরীরের ধর্ম্ম। মানুষের সত্যিই তা'তে তৃপ্তি হয় না; দেহের ক্ষণিক অভাব নিবৃত্তির জন্যে যে সুখ, তার চেয়ে বড় আর এক রকম সুখের আস্বাদ সে চিরকাল করে' আসছে—সহজেই এই দু'রকম ভোগের পার্থক্য সে ধরে ফেলে। এই উচ্চতর ভোগ যা'র মধ্যে কোনো প্রয়োজন-সিদ্ধি নেই—যে সুখ বা আনন্দের কোনো লৌকিক কারণ নেই, সে-আনন্দ উপভোগের সময় সে এমন একটি অবস্থার সম্বোধ পায়, যে সহজেই এই আহ্লাদকে সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়-জনিত তৃপ্তি থেকে পৃথক্ করে' দেখে। এই আহ্লাদ ভোগ-মূলক নয়—উপভোগমূলক। এই সুখ-চেতনা যে বস্তু উদ্রেক করে তাকেই বিশেষ অর্থে সুন্দর বলে। এই সৌন্দর্য্যবোধ মানুষের মধ্যে আছে, সেটা বিশেষভাবে অনুভাবাত্মক ( Emotional )। এই বোধের অনুসন্ধান ও তার প্রকৃতির স্বরূপ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে যেমন বহু মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি আর একদিকে, সুন্দর-বস্তুর স্বরূপ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে সৌন্দর্য্যশাস্ত্র তৈরী করবার চেষ্টা হয়েছে। সৌন্দর্য্যের এই Subjective ও Objective—দুই দিক, Psychology ও Metaphysics এর আলোচনার বিষয় হয়েছে—আবার এই Subjective ও Objective দুই দিকের সমন্বয় করে' বিশেষভাবে Aesthetic দর্শন সৃষ্টির চেষ্টাও দেখা যায়। এ সব ছাড়া Phy-

siological theory of Beauty, আর আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত Evolution মতানুযায়ী সৌন্দর্য্যতত্ত্বও আছে। Fichteর Subjective Idealism ও Hegelএর Absolute Idealism এবং মধ্যপন্থী Schelling এর সমন্বয়মূলক চিন্তাপ্রণালী যেমন একদিকে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের অনেকখানি অধিকার করে' আছে,তেমনি অপরদিকে Herbert Spencer, Grant Allen প্রভৃতি বিজ্ঞানবাদীরা সৌন্দর্য্য বোধরূপ চিত্তবিকাশকে মানুষের দেহধর্ম্ম ও মনোবৃত্তির মধ্যে অনুসন্ধান করে' একরকম সৌন্দর্য্যবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের কোনো একটির মধ্যে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের পূরো মীমাংসা নেই। কিন্তু এই রকম নানাদিক থেকে আলোচনার ফলে এমন অনেক কথা পাওয়া যায়, যা'তে মন সায় দেয়। সুন্দরকে যাঁরা বস্তু-নিরপেক্ষ স্বাধীন সত্ত্বা বলে কল্পনা করেছেন; যাঁরা তাকে মানুষের মনের বাইরে কোনোখানে অস্তিত্ব দেন না; এবং যাঁরা তার বিশেষ কোন অস্তিত্ব স্বীকার না করে' কেবল ইন্দ্রিয়গ্রামসম্ভব অনুভাব বিশেষ বলে' নির্দ্দেশ করেন;—তাঁদের সকলের কথার মধ্যেই সত্যের ইঙ্গিত আছে। আবার যাঁরা এই সৌন্দর্য্যবোধকে একটা বিশেষ বৃত্তি, Internal sense বলে' স্থির করেন,তাঁরাও যে কতকটা সত্যি কথা বলেন, তা' অস্বীকার করা যায় না। সৌন্দর্য্যতত্ত্বের মধ্যে জড় ও চিৎ এই দুইকে সমান ভাবে স্বীকার না করার উপায় নেই; যিনি করবেন না, তাঁর কথায় সুন্দর-জিজ্ঞাসার সম্যক্ মীমাংসা হবে না।

* * *

আমি এই দার্শনিক মতবাদের উল্লেখ করেছি মাত্র—এই মতসংঘর্ষের মধ্যে যাবার কোনো প্রয়োজন দেখিনে। ইয়ুরোপীয় Aesthetics শাস্ত্রের আলোচনা যে কতটা বিফল, তা' Tolstoy এর মত মনীষির আলোচনার ফল দেখলেই বুঝ্‌তে পারা যায়। যে দার্শনিক তার কাছেই দার্শনিক সত্যের মূল্য আছে, যে ভক্ত তার কাছে এর কোনো অর্থ নেই, যে রসিক সে আলোচনা করা দরকার মনে করে না। সৌন্দর্য্যশাস্ত্রকে পূরো দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে কেউ পারেন নি, পারা যায় বলে বোধ হয় না—তা'তে logical thoughtএর প্রতিষ্ঠা হয়, Reason তৃপ্ত হয়, রসনির্ণয় হয় না। তর্কশাস্ত্রের নিয়মে এই সুন্দর-দেবতাকে বাঁধবার চেষ্টা করা হাস্যকর বলেই বোধ হয়। বরং এই সব মত আলোচনা করলে, সুন্দর যে অজ্ঞাপ্য, অনির্ব্বচনীয়, 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিত', 'সহৃদয়হৃদয়বেদ্য'—এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। সুন্দরের প্রমাণ উপভোগে, তিনি কেবল 'সকলহৃদয়সংবাদভাজা প্রমাত্রা গোচরীকৃত।' এঁকে গোচরীকৃত করতে পারেন, কতক পরিমাণে—artist; সে কাজ দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের নয়।

## অলঙ্কার-শাস্ত্র ও রস

সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে এই সুন্দরের লক্ষণ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে, কাব্যের প্রাণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে, এক বস্তুর আবিষ্কার হয়েছে, তার নাম 'রস'। 'রস' কথাটি খুব প্রাচীন, কিন্তু কাব্য-সৌন্দর্য্যের এই রসকে তাঁরা যার পরিচয় বলে গ্রহণ করেছেন, তিনি

আর কেউ নন—আমাদের এই সুন্দর। তাঁরা বলেন, শ্রেষ্ঠসৌন্দর্য্যপ্রাণ যে রস, তা' 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর', আস্বাদ্যমানতাই তার ধর্ম্ম, তা' অলৌকিক, তার আস্বাদ সহৃদয় পুণ্যবান ব্যক্তিই করতে পারেন। এই রস অর্থাৎ সুন্দরাস্বাদ কতগুলি মানসিক স্থায়ী-ভাব ( simple emotions ) অবলম্বন করে' ফুটে ওঠে। Psychology বলতে মানুষের মনঃপ্রকৃতির সঙ্গে বহিঃবস্তুর যে সম্বন্ধতত্ত্ব—তা'র সাহায্যে এই emotion পর্য্যন্ত যাওয়া যায়, তার পর যে রসের উদ্ভব, সেখানে Psychology আর খাটে না। কারণ, এই emotion গুলি লৌকিক—এদের মধ্যে যে জাতীয় সুখের আস্বাদ আছে, তার মূলে দেহধর্ম্মগত চিত্তবিকারের সম্বন্ধ আছে। এই organic pleasures সুন্দর-রস নয়, সুন্দরাস্বাদের মধ্যে যে কিছুত পরিতৃপ্তি আছে, তার থেকে এ অনেক ভিন্ন। Physiology ও Psychologyর নিয়মগুলি একযোগে কাজ করে' এই সব ইন্দ্রিয়ঘটিত simple ও compound emotion এর সৃষ্টি করে। এ পর্য্যন্ত আমরা বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে চলতে পারে। কিন্তু তার পর এর চেয়ে ঢের উঁচু Aesthetic sentiment এর সদ্ভাব কি করে' হয়, তাই নিয়ে নানা মতবাদের মধ্যে পড়ে' হতবুদ্ধি হয়ে পড়তে হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা Intuitionist, তাঁরা এই বিশিষ্ট সুন্দরবোধকে একটি internal sense এর উপর বরাত দিয়েছেন—সে একটা অপরোক্ষ জ্ঞান, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র সাধারণ মনোবৃত্তির সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। এই মতের একটু সংশোধন করে' আর এক সম্প্রদায় বলেন, সৌন্দর্য্যভোগ এই বিশিষ্ট অন্তরিন্দ্রিয়ের কাজ বটে, সেখানে দেহের সম্পর্কও আছে। মন ইন্দ্রিয়বাধ্য হয়ে যে স্বাধীনতার অভাবে জ্ঞানের সম্পূর্ণতা-সাধনের নিষ্ফল চেষ্টা করে, সেই ইন্দ্রিয়পারবশ্য সত্ত্বেও, এই internal sense এর সাহায্যে, সকল বাধা উত্তীর্ণ হয়ে বস্তু সকলের পূর্ণতর সত্তা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। যা' অল্পতম সময়ের মধ্যে অধিকতম বোধ সঞ্চার করে, তাই সুন্দর। সংস্কৃত আলঙ্কারিকের রসের ধারণা এ রকম নয়। 'রস' বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য, আস্বাদ্য-মানতাই তার একমাত্র প্রকৃতি—লৌকিক জ্ঞানের সংস্পর্শ এ অবস্থায় একেবারেই নেই; সুতরাং, internal sense বা গভীরতর বোধ বৃত্তির কথাই আসে না। কিন্তু emotion গুলি অবলম্বন করেই 'রস'। রস, emotion থেকে স্বতন্ত্র বস্তু হ'লেও তার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ আছে—রসের আদি উপক্রম বা starting point যেন এই রত্যাদি ভাবের মধ্যে রয়েছে; কাজেই গোড়ায় মনোবিজ্ঞান রয়েছে—শৃঙ্গারাদি নিম্নরসের উৎপত্তি বিচার প্রথমে করা দরকার। এইখানে ইংরেজ Psychologist দের aesthetic theoryর সঙ্গে গোড়ার দিকে মতের মিল রয়েছে। এই emotion এর খুব প্রাথমিক ( elementary ) প্রকৃতি থেকে জটিলতর মনোবৃত্তি মূলক emotion পর্য্যন্ত, তাঁরা অনেক সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন; তারপর উচ্চতর aesthetic growth বা রসোৎপত্তির সম্বন্ধে তাঁরা যে মীমাংসায় এসে দাঁড়িয়েছেন, সেখানে তাঁরা association-নামক মানস-ক্রিয়াকেই

এ ব্যাপারের মূল বলে নির্দ্দেশ করেছেন। পূর্ব্বানুভূতির স্মৃতি, অনুমান, unconscious বা conscious reminiscence, suggestion (ব্যঞ্জনাধর্ম্ম)—association বা ভাবের সহানুবন্ধিতা নিয়মে এই সকল সরল সহজ, অপেক্ষাকৃত ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ অনুভূতি—উচ্চতর, গভীরানুভব, বহুভাব জটিল aesthetic sentiment বা রসে পরিণত হয়। Herbert Spencer প্রভৃতি Evolution-বাদীরা transmitted experience বা বহুজীবনাগত বহুবিধপরিচালনালব্ধ, ইন্দ্রিয় স্বভাবে পরিণত, সহজ বোধবৃত্তিকেও কারণ অনুমান করেছেন। এর তা' হ'লে দাঁড়াচ্ছে এই যে—aesthetic sentiment, ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তিরই ধর্ম্মবশে আদিম emotions এর পরিণতি বিশেষ। এখানে আমাদের রসবাদের বিশেষত্ব এই যে, 'রস' জিনিষটা রত্যাদি স্থায়ীভাব অবলম্বনে উদ্রিক্ত হ'লেও তাদের সঙ্গে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নেই, একটা অপরের বিবর্ত্ত, বিকার বা পরিণাম নয়,—দুই-ই সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কারণ, রস নামক যে আস্বাদন তা' emotion নয়, সেটা—

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দ চিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ।

সত্ত্বোদ্রেক হওয়াতে অখণ্ড স্বপ্রকাশানন্দ এই 'রস', বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য ও চিণ্ময়রূপে আস্বাদিত হয়, তার মধ্যে মনোবৃত্তি বা ইন্দ্রিয় বিষয়ের লেশমাত্র থাকে না। পাশ্চাত্য Psychologistদের মতে, এ জিনিষ অসংখ্য emotionএ গঠিত; বাইরের বস্তু,—কি স্বভাবসৃষ্টি, কি আর্ট-সৃষ্টি—এই গুলিকে চিন্তাবৃত্তিরূপে উদ্রিক্ত করে। হিন্দু রসবাদ, emotionএর ব্যঞ্জকত্ব স্বীকার করে, উপাদানত্ব স্বীকার-করে না; associationএর দ্বারা কতক-গুলি বাঁধা psychological pleasures এর সম্মিলন, ও তথা রসে রূপান্তর হওয়া মানে না বটে, কিন্তু এই সকল emotion-উদ্রেককারী বস্তুবিশেষের আর একটি ধর্ম্ম—ব্যঞ্জকভাব (suggestion) মেনে নিয়ে, তারি দ্বারা রস অভিব্যক্ত হয়—এই মীমাংসায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই মতকে অভিব্যক্তি-বাদ বলে, উৎপত্তিবাদটা অ-তাত্ত্বিক বলে' স্থির হয়েছে। সংস্কৃত আলঙ্কারিক বলেন, রতি প্রভৃতি emotion, যা' একসময়ে লৌকিক কারণে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগে অনুভব ও পরে অনুমান—পরিচয়ের বস্তু হয়—তা' সংস্কার বা বাসনা রূপে হৃদয়ে সঞ্চিত থাকে; এই সংস্কার-রূপী ভাবগুলি artistic objectএর সাহায্যে suggested বা অভি-ব্যক্ত হয়। আগেকার সেই emotion আর এখনকার এই সংস্কাররূপী বাসনার বিলাসে অনেক তফাৎ। আগে যা' কারণ বিশেষে জন্মেছিল,—তার সঙ্গে ওই কারণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল; কারণ, সেটা ছিল প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-সুখের মত। আগে যা' ছিল উদ্রেক-কর্ত্তা, এখন তা' ব্যঞ্জক মাত্র; আগে যা' বস্তুগত ছিল, এখন তা' ভাবগত; আগে যার মধ্যে সঙ্কীর্ণ আত্মতৃপ্তি ছিল, এখন তা' সকলের সঙ্গে সমভাবে আস্বাদ করতে পারি—এই বোধ-যুক্ত। Object এখন আর সঙ্কীর্ণ দেশ-কাল-বদ্ধ নয়, এখন তা' Subject এর imagination (ভাবকত্ব) আশ্রয় করে' সাধারণীকৃত হয়, সর্ব্বসম্বন্ধী হ'য়ে যায়। এই ভাবকত্ব-জনিত সাধারণীকরণের ফলেই রসের বিশিষ্ট ধর্ম্ম

উপলব্ধি হয়। এই রসের অবস্থায় সঙ্কীর্ণ অহং যেন মুক্তি পায়, Individual যেন Universal এর মধ্যে ছাড়া পায়।

## মতবাদের অসম্পূর্ণতা

এই রসের ধারণা খুব বড় হ'লেও অভিব্যক্তিবাদ খুব স্পষ্ট নয়। সংস্কৃত আলঙ্কারিক ভাবের গভীরতায় ডুবে' গেছেন; ঐ ভাবের উৎপত্তি মানেন না, অভিব্যক্তি মানেন; অর্থাৎ, মনের মধ্যে সংস্কার বীজ-রূপে আগে থাকতে আছে, বস্তু বিশেষের ব্যঞ্জনাশক্তি ও ভাবকত্ব বা Imagination এর সাহায্যে অভিব্যক্ত হয় মাত্র। কিন্তু এই Suggestion এর Psychological ভিত্তির দিকে ভালো রকম দৃষ্টি না দেওয়ায়, মতটি হৃদয়গ্রাহী হ'লেও, অচ্ছিদ্র হ'তে পারে নি। অন্যদিকে পাশ্চাত্য মতের উৎপত্তি মীমাংসা অনেকটা সমীচীন হ'লেও রসের স্বরূপ-নির্দ্দেশ সম্বন্ধে যেন খাটো হ'য়ে পড়েছে। সংস্কৃত আলঙ্কারিক যে সব লক্ষণ নির্দ্দেশ করেছেন, তার প্রমাণ রসিকজনের হৃদয়ে—এ রকম জিনিষের কোনো দার্শনিক সংজ্ঞা নির্ণয় করাও দুরূহ। রস যে অলৌকিক, তাকে যে তর্কবুদ্ধির দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত স্পষ্ট করে' ধরে' দেওয়া যায় না এ কথা মানতে হবে—কোনো মতবাদের কর্ম্ম নয় তাকে বুদ্ধির গোচর করা। তবু সে যে ইন্দ্রিয়-সম্ভূত—এ কথাও যেমন সত্য, সে যে ইন্দ্রিয়াতীত—একথাও তেমনি সত্য। তাই কোনো মতবাদের দ্বারা রস-স্বরূপের প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হোক্ এই একদেশ-দর্শিতার ফলে তার সম্যক্ আলোচনারো হানি হয়েছে। চিৎ ও জড়, অহং ও ইদং, subject ও object—এই রসানুভূতি, aesthetic activityর মধ্যে একীভূত হয়। জড় চিৎ' এর অভিমুখী, চিৎ ও জড়ের অভিমুখী—এটুকু আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু চিৎ ও জড় কোথায় এক হয়ে অদ্বৈতে অধিষ্ঠান করছে—সে অনুভূতি, সে পরা জ্ঞান—Psychology বা Metaphysics মধ্যে কোনোখানে নেই—সে ওই aesthetic activityতে, subject ও object এর মিলন-মোহানায় সহৃদয়-হৃদয়ে যোগানন্দের মত আস্বাদ হয়ে থাকে। তাই, এই সুন্দর, এই সত্যের স্বপ্রকাশানন্দরূপকে—এই সত্যসুন্দরকে বার বার প্রণাম করি।

শ্রীসত্যসুন্দর দাস।

---

# কাজরী

৩১

* * * * * *
* * *

দু'মাস হল, তপসীতে এসেচি বেশ জায়গা,—পরিষ্কার ঝরঝরে বাংলাখানি। খুব উঁচু টিলার উপরে। চারিধারে নীচু জমি—ধানক্ষেতের সার চলেছে, চারধারে আল্-ঘেরা—যেন ছেলেদের খেলাঘরগুলি থাকে-থাকে কে সাজিয়ে রেখেছে! একধারে লাল রাস্তা টিলা থেকে নেমে চলে গেছে—আবার ওধারে কোথায় সেই কতদূরে গিয়ে উঠেছে—ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড ধনুক কি নৌকা!

বাংলাটি ফ্লোরের উপর। অনেকগুলি বাঁধানো সিঁড়ির নীচে কাঁকর-ফেলা লাল রাস্তা—রাস্তার পারে ফুলগাছ, লতা-পাতার কেয়ারি-করা বাগান। ভারী চমৎকার।

শীতের বেলা। সকাল থেকে ক'পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে—আকাশ এখনো মেঘে ভরা। ভিজে গাছপালাগুলো নিথর দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাংলার সামনে ছোট একটা শালগাছ—তার ফাটা-ফাটা চেরা-চেরা পাতা-গুলো ঝির্-ঝির্ করে একটু একটু তুল্‌ছে—তারি পাশে করবী গাছ, তিন-চার থাক ঘন পাপড়ি-ভরা গোলাপী ফুলগুলি থোলো থোলো ফুটে রয়েছে,—ঠিক যেন কে করবীর তোড়া বেঁধে রেখেছে।

ভেজানো সাশির কাঁচের মধ্যে দিয়ে বাইরের পানে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌চি! আকাশের আলোর উপর মেঘের ছোপ লেগে চারিধার ঝাপসা হয়ে রয়েছে! সেই দূরে পথের উপর দিয়ে বাউরি-দের কালো-কোলো জোয়ান মেয়েরা ছেলে কাঁকালে করে এই বৃষ্টিতে মাঝে-মাঝে পথ দিয়ে চলেছে। ওরা সব খনিতে কাজ করে! এই শীতে ছেলেদের গায়ে একটা করে ময়লা কাণি জড়ানো—আহা! বেচারীরা এতে কি শীত ঘোচে কখনো? অথচ, কি হাসিমুখেই সব কাজে চলেছে। ভগবানকে গাল দিচ্ছে না, অদৃষ্টকে দুষ্‌ছে না! খনিতে গিয়ে ছেলে-গুলোকে উপরে কারো জিম্মায় রেখে নীচে নেমে যাবে কয়লা ঘাঁটতে, কয়লা কুড়িয়ে ছোট-ছোট গাড়ীতে বোঝাই দিতে।

আমার খোকাকে নিয়ে গরম কাপড়-জামায় সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে কেমন আরামে এই ঘরের মধ্যে বসে আছি! আর ওরা—আহা! মেয়েমানুষ,—আমারই জাত্ ত! একই ভগবান ঐ নারীকে গড়েছেন, আমাকেও গড়েছেন! অথচ এই ব্যবধান, এই প্রভেদ, এ কিসের জন্য!

মাঝে মাঝে ওদের ডেকে কত কথাই কই,—ওদের সুখ-দুঃখের সন্ধান নেবার চেষ্টা করি! ওরা আমার এই সাজ-সজ্জা, এই প্রাচুর্য্য দেখে আমায় ডাকে 'রাণী-মা' বলে! আমার হাসি পায়! একদিন স্পষ্টই বুঝিয়ে দিলুম,—মেয়েমানুষের সুখ যা-কিছু, তা ঐ স্বামীর আদর-যত্নেই! গয়না-গাঁটি স্বামী আদর করে দিচ্ছেন, তাই এ-সব নিয়ে মনে সুখ হয়—তাঁরই তৃপ্তির জন্যে সাজতে-গুজতে সাধ হয়! ওরা বলে, স্বামীর সুখ, তাই কি ওদের আছে! স্বামীর সংসারের দুঃখ ঘোচাবে বলেই ওরা এই খনির কাজে গতর ঢেলে দিচ্ছে—দু'পয়সা উপার্জ্জন করবে বলে! তা স্বামীর দল সেই কষ্টের রোজগার পয়সা-কড়ি দু'হাতে কেড়ে নিতেও ছাড়ে না!—সেই পয়সায় নেশা-ভাঙ করে—বারণ করতে গেলে লাথি মেরে কয়লার গাদায় মুখ ছেঁচে ঘষে দেয়! ওরা বলে, স্বামী পয়সা নেয়, নিক্ না—নেশা-ভাঙ একটু করেই যদি, পুরুষ মানুষ না হয় করলেই—তা বলে মার ধোর—মুখে একটা মিষ্টি কথাও কি থাকতে নেই!

ঠিক! তাই ভাবচি, নারীর মনটা একই ধাতুতে গড়া—একটু আদর, দুটো মিষ্টি কথার সে কাঙ্গাল শুধু! তার বদলে সে তার সর্ব্বস্ব দিতে পারে! দুটো-একটা ব্যতিক্রমও কি দেখা যায় না? যায় বৈ কি—কিন্তু সে আমার মনে হয়, ঘটনার চক্রে!



কাজ্‌রি

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

এই যে একলাটি বসে আছি—খোকা ঝীয়ের কাছে ঘুমুচ্ছে,—মনটা যেন কোথাও একটা অবলম্বন খুঁজে পাচ্ছে না! তিনি গেছেন, অফিসে কাজ-কর্ম্ম দেখতে! ওঁর নিশ্বাস ফেলবারই কি ছাই, সময় আছে! ভোরে উঠে চা আর থান-দু'চ্চার বিস্কুট মুখে ফেলে বেরিয়ে যান্, ফেরেন সেই বেলা এগারোটা কি বারোটায়। এসে স্নান-আহার সেরে ঘণ্টা খানেক জিরিয়ে আবার বেরোন্—তার পর ফেরেন্ সেই সন্ধ্যা হয়ে গেলে!

সারাদিনের খাটুনির পর রাত্রেই কি বিশ্রাম আছে! রাজ্যের লোক এসে ধর্ণা দিয়ে পড়ছে—খাতা-পত্তর্, কথাবার্ত্তা—তার আর অন্ত নেই! কাজকর্ম্মের হিসেবনিকেশ, বিলি-বন্দোবস্ত—আমি পাশের ঘরে শূন্যমন নিয়ে বসে থাকি, আর শুনি—শুনি আর বসে থাকি! প্রাণে এখন সব সয়! সয়ে সয়ে প্রাণটা ঐ পাথুরে কয়লার মতই শক্ত আর কালো হয়ে উঠছে!

"আমি কেবলি স্বপন করিনু বপন বাতাসে—"

৩২

আমার কিসের অভাব! কোলে সোনার চাঁদ ছেলে,—রাজার ঐশ্বর্য্য, দেবতা স্বামী! কিন্তু এত থেকেও আমার কিছু নেই!

ওঁর কি দোষ দিচ্ছি? না। আমায় সুখে রাখবার জন্য কি না করছেন, কি না করেছেন! দাসী-চাকর, গহনা-কাপড়—আমার কি নেই?

তিনি বলেন,—তোমার হল কি! এখানে আমার কাছে এসেও তোমার মুখে হাসি ফোটে না! আশ্চর্য্য!

সত্যই আশ্চর্য্য! আমি নিজেই আমার মনের আস্পর্দ্ধা দেখে সময়-সময় লজ্জায় কুণ্ঠিত হয়ে পড়ি। ওরে মন, তুই আরো কি চাস্? তোর আকাঙ্ক্ষার যে আর সীমা নেই, দেখচি। তোর তৃপ্তির যে আর দিশা খুঁজে পাওয়া যায় না।

তিনি বলেন,—তোমার জন্যে কি না করছি, বল ত! টাকা-কড়ি সমস্তই তোমারি হাতে এনে দিচ্ছি—তোমার যাকে যা খুসি, দাও—নিজে যা খুসি, নাও—মিছে এ খুঁতখুঁতুনি কেন?

কেন? খুঁতখুঁতনি কেন? সত্যিই ত, কি বলে বোঝাব,—এ কেন—!

তিনি বললেন,—রিক্‌শ গাড়ী পড়ে রয়েছে—শুনলুম, তুমি নাকি বেড়াতে যাওনা, মোটে?

আমি বললুম,—সময় পাই না।

—সময় পাও না! সে কি! কি এত করতে-কর্ম্মাতে হয় তোমায়? দাসী আছে, বামুন রয়েছে! এরা কি দেখতে পারে না?

আমি হেসে বললুম,—ওদের উপর ভার দিয়ে কি কখনো নিশ্চিন্ত থাকা যায়? সব দেখিয়ে-শুনিয়ে না দিলে চলবে কেন?

উনি রাগ করলেন, বললেন,—বাঃ খুব চলবে'খন। তাবলে তুমি চব্বিশ ঘণ্টা ঘরের কোণে বসে থাকবে! এখানে কেমন খোলা মাঠ-ঘাট রয়েছে,—গাড়ী রয়েছে, চড়ে বেড়াও—না হয় হেঁটেই ঘুরে এসো! সব দ্যাখো-শোনো, প্রাণে কত আনন্দ পাবে, শরীর ভালো থাকবে!

আমি বললুম,—খোকাকে নিয়ে রিক্‌শয় চড়তে ভয় হয়!

উনি বললেন,—তাকে নিয়ে চড়বে কেন? তার পারাম্বুলেটার রয়েছে কিসের জন্যে? রিক্‌শটা তোমার কথাতেই কিনলুম ত। তোমারই বেড়াবার সুবিধে হবে, ভাবলুম—

আমার দুই চোখের পিছনে জল একেবারে বন্যার স্রোতের মত ঠেলে এসে দাঁড়াল। সেটাকে বন্ধ করলেও নিশ্বাসটা চেপে রাখতে পারলুম না ত! হায় রে, এই রিক্‌শর সাধ কি আমার নিজের জন্যেই হয়েছিল! কে এ সাধ আমার প্রাণে জাগিয়ে তুলেছিল! সেই একদিন স্বপ্নের সুরের মত বেজেছিল, একটা রিক্‌শ কিনব, দু'জনে বেড়াবো,—কেমন? সেই কথা, সেই সুর আমার প্রাণের মধ্যে বসন্তের মৃদু হাওয়ার মতই ছুটে ছুটে ফিরছিল! মুখ ফুটে বলতে পারলুম না ত,—ওগো, ও রিক্‌শর সাধ আমার নয়, আমার নয়! তোমার সাধ ছিল বলেই তোমায় মনে পাড়িয়ে দিয়েছিলুম—! তুমি ভেবেছ, আমি নিজের সুখের জন্যে রিক্‌শয় চড়ে বেড়াব,—একলা? তাই তোমার কাছে আব্দার তুলেছিলুম?—লজ্জায় আমার মাথা যেন কাটা গেল!

না—পৃথিবীর কলটা কোথায় যেন বিগড়ে গেছে। এ কি হল! যেখানে যা কিছু রূপ-রস-সুর আপনাদের ফুটিয়ে তুলছিল, সেইখানটাই দেখ্‌চি আজ ফাঁকা হয়ে গেছে! কেবল কাজের গম্ভীর আওয়াজ চলেছে!

৩৩

একলাটি বসে বসে আর পারাও যায় না। খোকা আমার কবে একটু বড় হবে? কবে তার কচি মুখে আধ-আধ কথা ফুটবে? তখন তার সঙ্গে কথা কয়েই দুপুরের এই অলস নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তগুলো তবু কাটাতে পারব!

খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে গ্রামোফোন বাজাচ্ছিলুম। ভালো লাগ্‌লো না।

সেদিন দুপুর বেলা ওঁর কারখানা বন্ধ ছিল—কি একটা হুজুগের জন্য। আমার মনটায় আনন্দ হল, আজ তাহলে দুটো কথাবার্ত্তা কবার ফুরসৎ হবে! খাওয়া-দাওয়ার পরে উনি কোট-পেণ্ট্‌লেন আঁটতে লাগলেন, আমি কত বড় আশায় মনটাকে কাঁপিয়ে তুলে কাছে এসে ওঁর সাজ-সজ্জা দেখে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম,—কোথাও বেরুবে কি?

—হ্যাঁ। শীকার করতে যাচ্ছি।

আমার মনে হল, বলি, শীকার করতে, না, শীকার করে চলে যাচ্ছ! আমারই প্রাণটা গুলি-মারা পাখীর মত ছটফট্ করে উঠল—আশায়-কাঁপা মনটা ফেটে ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেল।

উনি বললেন—কি, বসে পড়লে যে!

চোখ আমার ছলছল করছিল। নিজেই তা বেশ বুঝতে পারছিলুম। বললুম,—একদিন একটু বাড়ীতে থাকো না গা!

—পাগল—বলে উনি হেসে উঠলেন। মুখে আর কোন কথা নেই—! তারপর বন্দুক-টন্দুক নিয়ে দুটো সাহেবের সঙ্গে উনি বেরিয়ে গেলেন।

বাঃ! এই-ত জীবন! তপসীর সেই কত সাধের স্বপ্নের জীবন! প্রাণের নানা সাধের নানা রঙে যে জীবনটিকে সুদূর কোণে বসে রাঙিয়ে তুলতুম! আশা! কিসের আশা! ভবিষ্যৎ...! যে পাগল, সে-ই শুধু তাকে

নানান্ বর্ণে রঙীন্ করে দেখতে চায়! আর কোন আশা করা নয়!

এই ত জীবনের আরম্ভ! এখনো কত দিন, কত দীর্ঘ দিন পড়ে আছে যে! হারে নারী, কি স্বার্থ-ভরা মন নিয়েই তোরা পৃথিবীতে এসেছিস্! তোদের জন্য পুরুষ নিজের খেয়াল, নিজের সাধ, সব বিসর্জ্জন দিয়ে পঙ্গুর মত বসে থাকবে না কি? সত্যি, ভারী স্বার্থপর আমি, তাই নিজের সুখ-দুঃখটাকেই এত-বড় করে দেখতে শিখেছি। উনি সেদিন ঠিক কথাই বলেছিলেন,—স্ত্রীলোক ঘর-সংসার নিয়ে থাকবে,—কোথাও গেরস্থালীতে কোন বিশৃঙ্খলা না থাকে, সকল দিকে সামঞ্জস্য রেখে চলা—এই সব হল তার কাজ! মিথ্যে কতকগুলো বাজে ঝোঁক নিয়ে মন গুমরে থাকলে সংসার চলে কখনো? এতে শুধু দুঃখ পাওয়াই সার! জীবনটা ত আর কবির কাব্য নয়,—সে এক মস্ত দায়িত্বের ব্যাপার যে!

ঠিক কথাই! এবার থেকে আমি আর ও-সব বাজে ভাবনায় মন খারাপ করব না। সংসারের মস্ত জাঁতা-কলটাকে ঐ বারুইদের মেয়েদের মতই ঘুরিয়ে চলবো! মনটা ছেঁচে যায় যাক্, হাত শক্ত রেখে সংসারের কলটা চালিয়ে যাব!

* * * * * *
* * *

এক হপ্তা রোগ ভোগ করে খোকা আর আমি দুজনেই আজ সেরে উঠেছি।

উনি সেদিন যখন শীকার থেকে বাড়ী ফিরলেন, তখন অনেক রাত্রি। আমি বাহিরে বারান্দায় একটা মাদুর বিছিয়ে পড়েছিলুম। কুয়াশা-ভরা আকাশ চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্নায় ভরে উঠেছিল। উনি এসে বল্‌লেন,—এই ঠাণ্ডায় বাহিরে পড়ে আছ? ওঠো, ওঠো।

অপ্রতিভ হয়ে উঠে পড়লুম। ওঁর জন্যে নিজের হাতে কাট্‌লেট্ কোর্ম্মা সব তৈরি করেছিলুম। ষ্টোভ্ জ্বেলে তাতাতে বসলুম। উনি পোষাক ছেড়ে খেতে বসলেন। বাহিরে পড়েছিলুম বলে কত বক্‌লেন—শেষে জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমার খাওয়া হয়েছে?

আমি জবাব দিলুম না। কি জবাব দেব? ওঁর আগে আমি কখনো খেয়েছি, না, খেতে পারিই কখনো?

উনি বললেন,—নিশ্চয়ই খাওনি?

আমি বললুম,—খাব'খন। তুমি আগে খেয়ে নাও দেখি।

উনি বললেন,—এইগুলো অন্যায়। আমার জন্যে মিছে বসে থাকা কেন! আমি ফিরব যখন, তখন খাব। তোমার শুধু-শুধু এই এত রাত্রি করে শুকিয়ে পিত্তি পাড়িয়ে খাওয়া কেন? তারপর যখন অসুখ হবে, তখন?

আমি হেসে বললুম,—হ্যাঁ, এইতেই অমনি অসুখ হবে! এমন ননীর শরীর আমাদের নয়।

উনি বললেন,—না, হবে না! তোমার কথায়! নাও, এখন আমার সঙ্গে বসে খাও, না হলে আমি খাব না,—সত্যি খাব না।

আমি বললুম—তুমি খেয়ে ওঠো না গো, তারপর আমি তোমার ঐ পাতেই বসব'খন।

উনি বিষম জেদ ধরলেন, না, ওঁর সঙ্গেই খেতে হবে! কি করি? খেতে হল।

তার পরদিন সকালে উনি বেরিয়ে গেলে আমি স্নান করতে গেলুম,—স্নান করার সঙ্গে সঙ্গেই কেঁপে জ্বর এল। দাঁড়াতে পারলুম

না। একটা লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম। জ্বরের ঘোরে একেবারে আচ্ছন্ন অচেতন হয়ে পড়লুম।

অনেক রাত্রে জ্ঞান হলে দেখলুম, উনি মাথার শিয়রে বসে আছেন—ঘরে একজন ডাক্তারও রয়েছেন। ডাক্তার কি কথাবার্ত্তা কয়ে চলে গেলে উনি বললেন,—কেমন বোধ হচ্ছে এখন? একটু ভালো কি?

আমি বললুম,—হ্যাঁ।

উনি বললেন,—দেখো দেখি, কাল কবিত্ব করে বাহিরে ঐ ঠাণ্ডায় পড়ে থেকে জ্বর করে বস্‌লে! বিকেল-বেলায় আমি কারখানায় মোটে বেরুতেই পারলুম না! এখন কদ্দিন লাগে, কে-ই বা এখানে দেখে, তার ঠিক নেই। উনি ভাবতে বসলেন।

আমার মাথার শিয়রে উনি বসে আছেন দেখে এই অসুখ শরীরেও কি সুখ যে পেয়েছিলুম! এই যে উদ্বেগ, এই যে ব্যাকুলতা,—এই স্বার্থপর, তবু এই সব দেখে প্রাণে বড় আনন্দ উথলে উঠছিল! কিন্তু তাঁর স্বরে বিরক্তির ঝাঁজ পেয়ে মন আমার দমে গিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লো, তুই মর্, ওলো, তুই মর্,—এ কথার পরও কি সোহাগ দেখাতে চাস্ রে তুই?

ওঁর এ আগ্রহ, ওঁর এ উদ্যোগ আমার জন্যে তত নয়, যতটা ওঁর কারখানার কাজে অবহেলা হচ্ছে সেই জন্যে! হারে দুর্ভাগিনী!

পরের দিন সকালে জ্বরটা ছেড়েছিল। চুপ করে বিছানায় পড়ে ছিলুম। তিনি একটা ওষুধ নিয়ে এসে বললেন,—এই ওষুধটা খেয়ে ফেলো দেখি।

লজ্জায় ঘৃণায় আমি এতটুকু হয়ে গেলুম। তাইত, আমার জন্যে আজ সকালেও ওঁর বেরুনো হয়নি! অত্যন্ত সভয়ে দারুণ সঙ্কোচে আমি বললুম,—তুমি বেরোও নি যে!

তিনি বললেন,—কি করে বেরুবো? ঘরে একটা রুগী ফেলে মানুষ বেরুতে পারে কখনো?

স্বরে তেমনি ঝাঁজ—চোখে-মুখে বিরক্তির হল্‌কা একেবারে ফুটে বেরুচ্ছিল।

আমি বললুল,—ঝী আছে ত! তাকে বলে গেলেই সে ওষুধ দিত। তা ছাড়া আমি ত ভালই আছি—আজ উঠতে পারব বলে মনেও হচ্ছে।

তিনি বলে উঠলেন,—না, থাক্। সে বাহাদুরি করে আর না-ই বা উঠলে!

এই যে কথাগুলো—এগুলোর মানে কি? আমায় উঠতে দিতে নারাজ—আমার পাছে অসুখ বাড়ে, তাই ওষুধ দেবার ভারও আর কারো হাতে দিতে চান্ না—অথচ এই বিরক্তি! কেন, এ বিরক্তি! ওগো, করুণাই যদি বর্ষণ করবে, তবে তার সঙ্গে কেন ঐ রাগের স্ফুলিঙ্গ মিশিয়ে দিচ্ছ!

মনে পড়ল, সেই এক অতীত দিনের কথা! আমার অসুখে ব্যাকুল অস্থির মন নিয়ে সারা রাত্রি শিয়রে জেগে বসে কাটিয়েছিলেন! আমার কুণ্ঠা দেখে বারবার মিষ্টি কথায় আমায় সে কি মধুর আশ্বাস দিয়েছিলেন! আর আজ—!

আমি কি আজ আর সে-ই নেই? আমার সেবায়, আমার পরিচর্য্যায় কোথাও কি কোন অবহেলা, কোন ত্রুটি ঘটেছে? ওগো আমার দেবতা, তাই সেই পাপের শাস্তি দিচ্ছ আজ! কৈ—জ্ঞানে ত কোন

ত্রুটি করিনি আমি। তবে এই তোমার সঙ্গ-লিপ্সা—মনের এই সর্ব্বগ্রাসী ভাব,—ওগো, আমি শক্তিহীন দুর্ব্বল লতা, তোমার আশ্রয় থেকে একটু ছাড়া হলে আমি যে মাথা তুলে থাকতেই পারি না—আমার কোন অস্তিত্বই থাকে না যে! মাটীর তলে আমি একেবারে লুটিয়ে পড়ি যে গো!

তারপর জ্বরটা আরো তেড়ে তেড়ে আসতে লাগল। আমার সঙ্গে শেষ খোকাও পড়ল। দিন-রাত সে খুঁত্‌খুঁত্‌ করত, খালি কাঁদত—ঝীয়ের কাছে স্থির থাকত না। আমারও নেবার সামর্থ্য নেই—ওঁকেই তখন খোকাকে নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা পড়ে থাকতে হত! আমাকে ওষুধ খাওয়ানো, খোকাকে দেখা—সত্যি—লজ্জায় আমি ওঁর পানে মুখ তুলে চাইতে পারতুম না! ওঁর কত কষ্ট হচ্ছে! সময়ে খাওয়া নেই, ঘুম নেই—কি যে মুখে দিচ্ছেন, তাও জানি না! যদি ওঁর অসুখ হয়? গা শিউরে উঠল। মহা-ভাবনায় পড়লুম।

একদিন বললুম,—কলকেতায় খপর দাও, দিদি কি মা যদি আসেন! নাহলে তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে!

—থাক্, আর দরদে কাজ নেই। নিজে অন্যায় করে অত্যাচার করে অসুখ করবে, আর তার ভোগ ভুগব আমি!

আমার মুখের উপর যেন শপাৎ করে চাবুকের ঘা পড়ল! মুখের উপর থেকে সমস্ত রক্তটা ছলাৎ করে ছুটে মাথার দিকে সরে গেল—সেটা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলুম!

উনি বললেন—সারো সব, তার পর ঘাড় ধরে কলকেতায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার কাজ-কর্ম্ম বন্ধ, এই মরশুমের সময় নিজে কিছু দেখতে পাচ্ছি না—হুঁঃ।

উনি গুম্ হয়ে বসে ভাবতে লাগলেন,—খোকা খ্যাঁৎ-খ্যাঁৎ করে শেষে কেঁদে উঠল। আমার ক্ষীণ কণ্ঠে যতখানি সম্ভব শক্তি সংগ্রহ করে ঝীকে ডাক্‌লুম, বললুম—ওকে ও-ঘরে নিয়ে যা। মানুষের কষ্ট দেখতে পারিসনে? এইটুকু ছেলেকে ভোলানো কি বাবুর কাজ! তুই যদি না পারিস্ ত কলকেতায় চলে যা বাপু। দে, ওকে আমার কাছে দে! ছেলে না, আপদ হয়েছে!

বলেই আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলুম। মাথার চুলগুলো গুটি পাকিয়ে মুখের উপর ঝুলে পড়ল।

উনি বললেন,—শোও, শোও। আঃ—আমি ওকে দেখচি, না হয়। আর এত ব্যস্তই বা কেন? ঝী ত ওকে নিয়েছে।

আমি বললুম,—না, খোকাকে আমি নিতে পারব'খন।

উনি ঝীকে বললেন—খোকাকে নিয়ে ও ঘরে যা। আমি একে ওষুধ খাইয়ে খোকাকে নিতে যাচ্ছি।

আমি বালিশে মুখ গুঁজে ভগবান্‌কে ডাক্‌তে লাগলুম—এত লজ্জা দিয়ে আর বাঁচিয়ে রেখো না প্রভু! আমার জন্যে আমার স্বামীর এত কষ্ট—স্ত্রী হয়ে ওঁকে সেবা করা দূরের কথা, ওঁর কাছ থেকে এই সেবা নেওয়া—এ যে মহাপাপ হচ্ছে, প্রভু! আমার চোখ দিয়ে হু-হু করে জল ঝরে পড়ল।

উনি এসে মাথায় হাত রেখে বললেন,—মুখ তুলে এই ওষুধটা খেয়ে ফেলো [illegible]!

বালিশে চোখ দুটো রগড়ে চোখের জল মুছে আমি মাথা তুললুম।

উনি বললেন—মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে যে! আবার জ্বর আসবে না কি?

—না—না, ওগো না—বলে আমি একটা আর্ত্তস্বর তুললুম।

উনি বললেন,—কাঁদছ!...কাঁদছ কেন? কি আমি বলেছি তোমায় যে তোমার চোখে জল এল! নাঃ, আর পারি না,—কাঁদো, কেঁদে আবার রোগ ডেকে আনো—নাহলে আমার সুখ চার-পো হবে কেন!

দারুণ অভিমানে আমি জ্ঞান হারালুম। বললুম—ওগো, না, না, ভয় নেই—আবার যদি জ্বর হয়, আমাকে ঐ মাঠে নামিয়ে দিয়ো—আমি বাঁচবো না গো, বাঁচতে আর চাই না আমি।

উনি কেমন অপ্রতিভ হয়ে গেলেন—তাড়াতাড়ি তাঁর বুকে আমার মাথাটা রেখে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন—ছি, ভুল বুঝো না, লক্ষ্মী আমার, মাণিক আমার! আমার মাথার ঠিক নেই—তোমাদের এই অসুখ-বিসুখ—ওদিকে টাকা লোকসান হচ্ছে, যদি কিছু শক্ত কথা মুখ দিয়ে দৈবাৎ বেরিয়ে থাকে ত তারি ছল ধরে মন খারাপ করো না! ছিঃ!

এখনো সেই টাকা আর লোকসান—টাকা আর লোকসান! এইটেই যে ছুরির ফলার মত আমার বুকে বিঁধে-বিঁধে ধরছে—না হলে দুঃখ আর আমার কি!

সমস্ত কায়-মন ঢেলে ভগবান্‌কে ডাকলুম—হয় বাঁচিয়ে তোলো, নয় মেরে ফেলো, প্রভু—পঙ্গু করে ফেলে রেখো না, রোগে আর ভুগিয়ো না! এ ভোগা ত আমার নয়—এ যে ওঁর রোগ-ভোগা। শুধু এই পাপটুকু থেকে আমায় মুক্তি দাও, ভগবান্!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

---

# ভুঁই-চাঁপা

১

হঠাৎ ধরার বক্ষ চিরি
কে গো তুমি নয়ন মেলো?
নয়ন আমার জুড়িয়ে গেলো!

কোন্ ডাকিনীর যাদুর বলে
ঘুমিয়ে ছিলে অতল তলে,
পরশে কার জীয়ন-কাঠী
রাজকুমারীর চেতন হলো!

২

সলিল থেকে উঠলো যেন
মুখটী ধুয়ে বরুণ-রাণী,
গীত থেকে আজ তুললে মাথা
কোন্ রাগিণীর মূর্ত্তিখানি!

বর্ষা-রাণীর মিষ্ট হাসি
জমাট হয়ে জম্‌লো আসি,
তুলোট পুঁথির মলাট ভাঙি
শকুন্তলা বেরিয়ে এলো!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

# ভারতী

৪৩শ বর্ষ ]　　　　চৈত্র, ১৩২৬　　　　[ ১২শ সংখ্যা

## পূর্ব্বরাগ

প্রবন্ধের শিরোনামা দেখিয়া অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে, আমি বৈষ্ণব-সাহিত্যের রসতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন-একটা ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াছি। সুতরাং আগে হইতেই সাবধান করা ভাল যে, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য পূর্ব্বরাগের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নয়। পূর্ব্বরাগের যে সামাজিক দিক—বিবাহের সঙ্গে পূর্ব্বরাগের যে সম্বন্ধ, তাহারই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বরাগ-মূলক বিবাহ আমাদের দেশে ও সমাজে মোটেই অপরিচিত নহে। গান্ধর্ব্ব বিবাহ আমাদের শাস্ত্রসম্মত ও পূর্ব্বকালে বহুলরূপে প্রচলিত ছিল এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বরপ্রথাও ঠিক পূর্ব্বরাগ-মূলক নহে ;—কিন্তু তাহারই একটা সংস্করণ বলিলেও বলা যায়। ব্যাপারটী প্রাচীন ও পরিচিত হইলেও আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় ইহা একটা সমস্যার মত দাঁড়াইয়াছে।

পূর্ব্বরাগ জিনিষটী মনুষ্য-হৃদয়ের—তথা মনুষ্য-সমাজের একেবারে গোড়ার কথা। সমাজ-বন্ধনের মূলসূত্রই এই। জীব-জগতে স্ত্রী-পুরুষের যে যৌন-নির্ব্বাচন—তাহাই মনুষ্য-সমাজে বিকশিত হইয়া পূর্ব্বরাগে পরিণত হইয়াছে। মানুষের মধ্যে যৌন-সম্মিলনের ইহাই স্বাভাবিক ব্যবস্থা।

ইহার ব্যতিক্রম যে না দেখা যায়, এমন নহে। আদিম সমাজে কোন কোন স্থানে যৌনসম্মিলন 'গায়ের জোরে' নিয়মিত হইত। তখন মানুষ ছোট ছোট দল বা সঙ্ঘ-বিভক্ত হইয়া বাস করিত। একদলের মানুষের সঙ্গে আর এক দলের লোকের বিবাদ লাগিয়াই থাকিত। স্ত্রী-প্রার্থী পুরুষেরা একদিন হঠাৎ অন্য দলের অধিকারের মধ্যে যাইয়া জোর

করিয়া ইচ্ছামত স্ত্রীলোকদিগকে ধরিয়া আনিত। বলা বাহুল্য ব্যাপারটী মধুর রস-যুক্ত না হইয়া করুণ বা বীভৎস রসের আকর হইয়া উঠিত। নায়ক হয়ত অনিচ্ছুক নায়িকার মাথায় পাথরের আঘাত দিয়া তাহাকে অচেতন করিয়া ফেলিত। তারপর সেই বিগতচেতনা রুধিরাপ্লুতা প্রণয়িনীকে টানিতে টানিতে নিজেদের সীমানার মধ্যে লইয়া আসিত। ব্যাপারটী যে অনুন্নত আদিম সমাজেই প্রচলিত ছিল, তাহা নহে, একটু উন্নততর সমাজের মধ্যেও একটু মোলায়েম রকমে ইহার প্রচলন। আমাদের প্রাচীন কালের 'আসুর বিবাহ'ই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এখনও ভারতের অনেক অনুন্নত জাতির মধ্যে প্রকারান্তরে এই আসুর বিবাহের প্রচলন আছে। এমন কি অনুসন্ধান করিলে অনেক উন্নত জাতির বিবাহ-প্রথার ভিতরেও ইহার চিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু সে সব কথা বলিবার এ স্থান নহে।

যৌনসম্মিলনের দ্বিতীয় রূপ অনুজ্ঞা-দ্বারা নিয়মিত। এখানে 'জোরে'র স্থান নাই। সমাজ বা গুরুজনের আদেশই এখানে স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ধারাকে ঠিক করিয়া দেয়। যুবক-যুবতীর হৃদয়াবেগের বা প্রণয়-সঞ্চারের স্থানও এখানে নাই। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনেরা কোন্ পুরুষের সঙ্গে কোন্ নারীর মিলন হইবে, তাহা নির্ব্বাচন করিয়া দেয়। আর নির্দ্দিষ্ট বিধি-অনুসারে ঐ নরনারী বিবাহ-বন্ধনে বাঁধা পড়ে। প্রাচীন রোম, গ্রীক প্রভৃতি সমাজে প্রধানতঃ এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন আর্য্য-সমাজে কোন কোন স্থলে এবং আধুনিক হিন্দু সমাজে সম্পূর্ণরূপে এই প্রথা প্রচলিত।

যৌনসম্মিলনের তৃতীয় রূপ পূর্ব্বরাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ব্যবস্থা। মানব-হৃদয়ের সহজ ভাবের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। যে রহস্যময়, দুর্জ্ঞেয় আকর্ষণ নরনারীর মিলনের মূল, এই ব্যবস্থা তাহাকেই অবলম্বন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। মানুষের মধ্যে যতগুলি উচ্চতর বৃত্তির বিকাশ হইয়াছে, এই পূর্ব্বরাগ বা প্রেম তাহার অন্যতম। ইহাকে ঘিরিয়া মানুষের কত যে আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। হয়ত বা আমরা যাহাকে 'কাম' বলি, সেই বৃত্তি ইহার মূলে কিয়ৎ পরিমাণে আছে। কিন্তু কমলের মূলে যেমন পঙ্ক থাকিলেও উপরে শতদল শোভায় বিকশিত হইয়া সে গন্ধে চারিদিক ভরিয়া দেয়, প্রেম বা পূর্ব্বরাগও তেমনই নরনারীর সহজ আকর্ষণ হইতে জন্মিয়া অনন্ত রহস্যের মধ্যে আপনাকে ছড়াইয়া দেয়।

সোজা কথায় নর-নারীর পরস্পরকে চিনিয়া লইয়া যে মিলন ঘটে, তাহাই মধুর ও স্বাভাবিক। সমাজের সভ্যতর অবস্থায় এই মধুর ও স্বাভাবিক মিলনের কোন বাধা না ঘটিবারই কথা। কিন্তু নানা কারণে কোন কোন সমাজে এই সহজ উৎসের পথ রুদ্ধ হইয়া পড়ে ও নানারূপ কৃত্রিম প্রথার আবর্জ্জনা দ্বারা তাহার মুখ বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু মানুষের অন্তরাত্মা ঐ-সব আবর্জ্জনাকে মানিতে চায় না। সকল বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করিয়া সে আপনাকে প্রকাশের

চেষ্টা করে। মানব-হৃদয়ের এই বাধা অতিক্রম করিবার প্রয়াস, স্বাধীনতা-লাভের বিপুল ব্যাকুলতা ইহাই সকল কাব্যের প্রাণ, সকল রসের আধার।

যেখানেই কৃত্রিম প্রথাদ্বারা সমাজ পূর্ব্বরাগের এই সহজ ভাবকে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছে, সেখানেই মানুষের মন তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে—সকল বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। সমাজপতিদের সকল শাসন অবহেলা করিয়া মানুষের মন এইদিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্য আধ্যাত্মিক দিক দিয়া যাহাই হৌক না কেন, এক হিসাবে ইহা যে সমাজের কৃত্রিম প্রথার বিরুদ্ধে মানব-হৃদয়ের বিপুল বিদ্রোহ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রবল বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া প্রাচীন সমাজ নিজের চারিপাশে নানা ব্যূহ রচনা করিয়াছিল। তাহার মধ্যে একটী হইতেছে পূর্ব্বরাগের ধারাকে একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া। পূর্ব্বরাগের একেবারে গোড়ায় যাহাতে আঘাত করা যায়, সেই উদ্দেশ্যেই বাল্যবিবাহের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল। মহাকবি কালিদাস নবযৌবনসম্পন্না, সুমধ্যমা গৌরীকেই শিবের সঙ্গে মিলাইয়াছিলেন। কিন্তু মধ্যযুগের স্মৃতিকারেরা অষ্টমবর্ষীয়া, জননীর অঞ্চলের নিধি গৌরীকেই বৃদ্ধ হরের কোলে বসাইবার ব্যবস্থা করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। ফলে বৈষ্ণব সাহিত্যে কিশোরী-প্রেমের প্রবল উচ্ছ্বাস। সকল লোকলজ্জা তুচ্ছ করিয়া কবি যখন গাহিলেন,—

চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর ;

সমাজের আপামর সাধারণ তখন তাহাকে আপন রুদ্ধহৃদয়ের অন্তরতম বাণী বলিয়াই চিনিয়া লইল। তখন আর অষ্টমবর্ষীয়া গৌরীর ধ্যানে তাহারা মন লাগাইতে পারিল না, তখন—

শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি গেল,
শ্রবণকা-পথ দুহু লোচন নেল,
বচনকা চাতুরী লহু লহু হাস,
ধরণীরে কিরে চাঁদ পরকাশ।—

ইহাই মনের আকাঙ্ক্ষার বস্তু হইয়া উঠিল। কিন্তু কোথায় সেই বাঞ্ছিত, উদ্ভিন্ন-যৌবনা কিশোরী, অথবা নবযৌবনসম্পন্না প্রেয়সী? সমাজের বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে ত তাহাকে পাইবার যো নাই, কাজেই লোকের মন বাধা পাইয়া "পরকীয়া রসে" মজিল। প্রচলিত বৈধপথে বাঞ্ছিতের দর্শন যখন মিলিল না, লোকে বাধ্য হইয়া তখন বিপথে তাহার নিরুদ্দেশ সন্ধানে যাত্রা করিল। তাহার শেষ পরিণাম "বিদ্যাসুন্দর"।

আধুনিক কালেও আমাদের সমাজের সেইরূপ দশা ঘটিয়াছে। প্রাচীন স্মৃতিকারের ব্যবস্থার বন্ধন আমরা মোটেই ভুলিতে পারি নাই। বরঞ্চ বাহির হইতে আঘাতের পর আঘাত খাইয়া, সেই বন্ধনের দাগ আরও গভীরতররূপে আমাদের মনে বসিয়া গিয়াছে। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংঘর্ষে যখন বাঙ্গলাদেশে নবজাগরণের সূত্রপাত হইল, তখন দূরদর্শী সমাজ-সংস্কারকেরা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু সমাজের সনাতন রক্ষণী-শক্তি প্রবলরূপে তাহাকে

বাধা দিতে আরম্ভ করিল। একালের সমাজের গুরু-মহাশয়েরা সহসা সচেতন হইয়া প্রাচীন মনু যাজ্ঞবল্ক্য রঘুনন্দনকে আরও জোরে আঁটিয়া ধরিলেন এবং তাঁহাদের পড়ুয়ারা ততোধিক উৎসাহে গৌরী-দানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ফলে সমাজ-হৃদয়ের রুদ্ধবেগ বাধা পাইয়া অন্য পথে প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। আধুনিক বাঙলার প্রেম-সাহিত্যের ইহাই ভিতরকার ইতিহাস। কবিরা অজানিত কোন্ সুদূরের প্রেয়সীর উদ্দেশে প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ব্যাকুল হৃদয়াবেগ বাস্তবের মধ্যে ইঙ্গিতের সন্ধান না পাইয়া রহস্যময় মিস্‌টি-সিজম্‌এ পরিণত হইল। কথা-সাহিত্যে এই প্রেম-কাহিনী স্থূলতররূপে প্রকাশ পাইল। প্রথমে সুদূর ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে কাল্পনিক নায়িকার সন্ধান চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে তৃষ্ণা মিটিল না। সাহসী গ্রন্থকারেরা আধুনিক সমাজের মধ্যে তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। হিন্দু-সমাজে গৌরীদানের মাহাত্ম্যে কিশোরী বা যুবতী নায়িকা দুর্ল্লভ। কাজেই বিলাত-ফেরত, "রিফর্মড্‌" হিন্দু বা ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্য হইতে নায়িকাকে লইয়া কল্পনার আসর জমাইতে হইল। কিন্তু বাস্তব-বাদীরা ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা হিন্দু-সমাজের মধ্যেই মন্মথের আবির্ভাবের আয়োজন করিলেন। যুবতী বিধবা শ্যালিকা ও বিধবা ভ্রাতৃবধূকে লইয়া তাঁহারা আসরে নামিলেন। কৃত্রিম প্রথার সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া মানুষের অন্তরাত্মা কিরূপে বিদ্রোহী হইয়া উঠে, তাহার নিষ্ঠুর অথচ বাস্তব মূর্ত্তি তাঁহারা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইলেন। শক্তিশালী নবীন শিল্পীরা ইহারও সীমা অতিক্রম করিলেন। সমাজের সকল বাধা লোক-নিন্দা প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়া বন্ধুপত্নীকে পর্য্যন্ত ইঁহারা প্রেম-যজ্ঞে আহুতি দিলেন! যৌন-সমস্যা সকল সমাজ-সমস্যার মূল, একেবারে তাহার অন্তরতম মূর্ত্তি ইঁহারা বিনা দ্বিধায় খুলিয়া দেখাইলেন। ইহাও পরকীয় রসের আর এক মূর্ত্তি। সমাজের রক্ষণশীল রুচিবাগীশ গুরু-মহাশয় ও তাঁহার পড়ুয়ারা শিহরিয়া উঠিলেন; দুর্নীতি ও ব্যভিচারের স্রোতে সমাজ রসাতলে গেল বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু সমাজ-হৃদয় এই সাহিত্যের রসকে উপেক্ষা করিতে পারিল না। ইহার মধ্যে সে আপন অন্তরের বিদ্রোহ-বাণীর প্রতিধ্বনি দেখিতে পাইল। সমাজপতিরা যতই চটিতে লাগিলেন, ততই সে আগ্রহের সঙ্গে ইহাকে বরণ করিয়া লইতে লাগিল। গুরুমহাশয় চোখ রাঙাইলে কি হইবে? সমাজ-হৃদয় অন্যায় শাসনের প্রতিশোধ এমনি করিয়াই নেয়, নদীর স্বাভাবিক ধারাকে কৃত্রিম বন্ধনে রোধ করিলে, দ্বিগুণবেগে সে অন্যপথ দিয়া ধাবিত হয়।

এই বিদ্রোহের মূল আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, নবীন হিন্দুসমাজ রঘুনন্দনের অষ্টমবর্ষীয়া গৌরীতে আর সন্তুষ্ট নয়—সে চায় কালিদাসের নবযৌবনসম্পন্না সুমধ্যমা গৌরী। সনাতন প্রথার অনুজ্ঞায় প্রাপ্ত খেলাঘরের পুতুলকে লইয়া তাহার প্রাণ আর তৃপ্ত হয় না, সে চায় তপস্যার দ্বারা

কিশোরীর হৃদয়কে জয় করিতে, কিন্তু কৃত্রিম সামাজিক প্রথার ভয়ে সে এমনই আচ্ছন্ন যে, এ কথা সহজভাবে জোর করিয়া বলিবার তাহার ক্ষমতা নাই! পণ্ডিত বলিবেন যে শ্রেয় ও প্রেয় এক বস্তু নহে। কিন্তু শ্রেয় ও প্রেয় কি সব সময়ে পরস্পর-বিরোধী? জোর করিয়া কৃত্রিমরূপে একটা জিনিষকে শ্রেয় করিয়া দাঁড় করাইলেই তাহা প্রকৃতপক্ষে "শ্রেয়" হয় না। বরং অনেক সময় মানব-হৃদয় সহজভাবে যাহা চায়, তাহাই মূলতঃ "শ্রেয়।"

আর সত্য সত্যই বাল্য-বিবাহ জাতীয় জীবনের পক্ষে শ্রেয় নহে—ইহা ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। বাল্য বিবাহের কুফলে সমস্ত জাতির জীবনী-শক্তি তিলে তিলে ক্ষয় হইতেছে—তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। শতবর্ষ পূর্ব্বে যে বাঙালীজাতি শক্তিশালী যোদ্ধার জাতি ছিল—কি করিয়া সেই জাতি আজ দুর্ব্বল বামনের জাতিতে পরিণত হইল? দারিদ্র্য, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কতকগুলি প্রধান কারণ আছে, সন্দেহ নাই। বাল্য মাতৃত্ব যে এই জাতি-ক্ষয়ের আর একটা প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই! কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বাঙলা দেশের বালিকা জননীরা জীবনী-শক্তিহীন সন্তানের জন্ম দিয়া সমস্ত জাতিটাকে মেরুদণ্ডবিহীন করিয়া তুলিয়াছেন। অকাল-মাতৃত্বের ফলে বাঙলা দেশের প্রসূতিরাও ক্রমাগত ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছেন। জাতির কল্যাণের জন্য সর্ব্বাগ্রে চাই সুস্থ, সবল, বুদ্ধিমান শিশু, আর তাহার জন্য চাই সুস্থ, পুষ্টদেহ, শরীর ও মনে বলশালী পিতা-মাতা। হিন্দুর নারীত্বের লক্ষ্য আদর্শ-জননীত্ব। স্মৃতিকারেরা যাহাই বলুন না কেন—এই জননীর মূর্ত্তি বালিকা-মূর্ত্তি নয়। যে চণ্ডী বিশ্বশক্তিকে সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে দেখিয়াছেন—সেই চণ্ডী মাতৃমূর্ত্তির বর্ণনা করিতেছেন—

"নবযৌবনসম্পন্নাং পীনোন্নত-পয়োধরাং"

ইহাই ত প্রকৃত মাতৃমূর্ত্তি—গণেশ-জননীর মূর্ত্তি। ইহার মধ্যে কি যে অনুপম বিমল সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বাঙলা দেশের বাল্য-মাতৃত্বের স্তাবকেরা বুঝিতে পারিবে না। আর এক কথা। সৌজাত্য বিদ্যা নামক বিজ্ঞান শাস্ত্র অবশ্য রসতত্ত্বের ব্যাখ্যা করে না। কিন্তু সে শাস্ত্রও ইহা বলে যে, দম্পতীর প্রেম বা তাহাদের মনের মিলন-মাধুর্য্য সন্তানের মন ও হৃদয়ের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। প্রেমগন্ধহীন দাম্পত্য-জীবনের মধ্যে সুসন্তানের জন্ম হওয়া কঠিন। বাল্য বিবাহের ফলে দম্পতীর মধ্যে যে প্রেম একেবারেই জন্মে না—ইহা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু বাল্য বিবাহের মধ্যে পূর্ব্বরাগের অবসর যে কম, এ-কথা বলিতেও আমি কুণ্ঠিত হইব না।

সনাতন-পন্থীরা যৌবন-বিবাহের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহাদের মধ্যে এই পূর্ব্বরাগ-ভীতিই প্রধান। তাঁহারা বলেন, যৌবন-বিবাহ প্রচলিত হইলে বিবাহের পূর্ব্বেই যুবক-যুবতীরা সব প্রেমের স্রোতে ভাসিয়া যাইবে, তাহার ফলে জাতি-ভেদের বন্ধন ভাঙ্গিয়া যাইবে ও হিন্দুর যৌথ-পরিবার-প্রথা লোপ পাইবে। তাঁহারা আরও বলেন যে পূর্ব্বরাগ অনেক স্থলেই যৌবনের মোহ মাত্র। সুতরাং তাহাকে ভিত্তি করিয়া

যে বন্ধন দম্পতীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা ক্ষণস্থায়ী। পরিণামে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে মনোমালিন্য ও বিবাহচ্ছেদ প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা পাশ্চাত্য সমাজের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখান ও সেখানে যে বিবাহ-সমস্যা ক্রমশ জটিলতর হইয়া উঠিতেছে, তাহাও বলেন। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, একটু বেশী বয়সে বিবাহ হইলেই ছেলেমেয়েরা যে দিগ্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রেমে পড়িয়া যাইবে এবং মুচি-মেথর, হাড়ি-ডোম, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ প্রভৃতি একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া জাতিভেদ-প্রথা ভাঙ্গিয়া দিবে, এরূপ মনে করিবার তো কারণ দেখি না। ছেলেমেয়েরা সুশিক্ষিত ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহিত হইলে, কোন কোন স্থলে তাহাদের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে প্রণয়-সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেটা যে সমাজের পক্ষে কল্যাণকরই হইবে এ-কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। যে মনোমালিন্য ও অশান্তির আশঙ্কা যৌবন-বিবাহে আছে, বাল্যবিবাহ-প্রথায় তাহার আশঙ্কা যে আরও বেশী, তাহা তো আমরা দেখিতেই পাইতেছি। আমাদের সমাজের বিবাহিত জীবন যে বৈচিত্র্যহীন ও নিরানন্দ, সে বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই। বাঁধা-ধরা কৃত্রিম প্রথার মধ্যে এরূপ হইবারই কথা। স্ত্রী-পুরুষের মিলনের প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট যে স্বাভাবিক ব্যবস্থা, তাহার ব্যতিক্রম ঘটাইয়া, কখনও সুফল ফলিতে পারে না। যৌথ-পরিবার ভঙ্গের যে ভয়, তাহাও অমূলক। অবশ্য উপমা-স্থলে বলা যায় যে, তরুণ লতিকাই মহীরুহের সঙ্গে মিলিয়া যাইতে পারে, একটু বড় হইলে সে সম্ভাবনা আর থাকে না ইত্যাদি। কিন্তু উপমাই সকল স্থলে যুক্তি নহে। সুশিক্ষিতা বুদ্ধিমতী মেয়েরা একটু বেশী বয়সে স্বামীর সংসারে যাইয়া কেন যে তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিবে না, তাহার তো কোন কারণ দেখা যায় না। সেজন্য ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, সংযম প্রভৃতি যে সকল গুণের প্রয়োজন, সেগুলি প্রকৃতি ও শিক্ষার উপর নির্ভর করে। বয়সের তারতম্য যে সে-বিষয়ে কিছু বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারে, তাহা কোন যুক্তিতেই বুঝা যায় না। এখনই যে বালিকা বধুরা স্বামীর ঘরে যাইয়া সব সময়ে আপনাকে তাহার মধ্যে মিলাইয়া লইতে পারিতেছে, তাহা কি কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন?

সনাতন-পন্থীদের আর এক ভয় যে, মেয়েরা বিবাহের পূর্ব্বে সুশিক্ষিত ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠিবে, আর তাহার ফলে সমাজে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। পাশ্চাত্যে যে নারী-সমস্যা লইয়া সকলে মাথা ঘামাইতেছে, আমাদিগকেও তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। আমাদের হিন্দু আদর্শ "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"। যৌবন-বিবাহ প্রচলিত হইলে এই আদর্শ টেঁকা কঠিন। এই ভয় যে কতকটা আছে, তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু যাহা সত্য, তাহাকে ভয় করিয়া অস্বীকার করিলে চলিবে না। নারীর যে বিধি-দত্ত অধিকার, তাহাকে কৃত্রিমভাবে জোর করিয়া চাপিয়া রাখিয়া নিরাপদ হইবার চেষ্টা নিতান্ত আহাম্মকী। জীবনটাই

হইতেছে অজানিত বিপদ সঙ্কুল পথে যাত্রা, বিপদকে ভয় করিয়া পথের মধ্যে যে বসিয়া থাকে, তাহার পক্ষে শীঘ্রই জড় পদার্থে পরিণত হইবার আশঙ্কা আছে। কতকগুলা লোক আছে, তাহারা অসুখ হইবার ভয়ে রাতদিন ফ্লানেলের জামা আঁটিয়া বসিয়া থাকে। ফলে ক্ষমতা থাকে না, চিররুগ্ন হইয়া তাহাদের জীবন কাটাইতে হয়। অতিরক্ষণশীলদের ব্যবস্থামত চলিলেও এই দশা ঘটে। বর্ত্তমান যুগের জীবন-সমস্যায় আমাদের নারীদিগকে গৃহকোণে ননীর পুতুলের মত লুকাইয়া রাখিলে তাঁহাদের অনিষ্টই করা হইবে। নিরাপদ জড়পদার্থ অপেক্ষা চঞ্চল প্রাণ-পদার্থই বোধ হয় বেশী বাঞ্ছনীয়। অবশ্য প্রাণের ধর্ম্মই এই যে, সে আপনাকে চিনিবার চেষ্টা করে। তাহাকে ভয় করিয়া যে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করে, সে নিজেই বঞ্চিত হয়। প্রমাণের জন্য বেশীদূর যাইবার দরকার নাই। আমাদের জাতীয় জীবনের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিলেই সেটা বেশ বুঝা যাইবে।

আমরা যৌবন-বিবাহে জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনার দিক দেখাইয়াছি। জাতিক্ষয়ে ও শিশুমৃত্যু-নিবারণের ইহা যে একটা প্রধান উপায় তাহা আমরা বলিয়াছি। কিন্তু এটা প্রয়োজনের দিক্। ইহা ছাড়া সৌন্দর্য্যেরও একটা দিক আছে। মানুষ বা সমাজ কেবল প্রয়োজন লইয়াই বাঁচিতে পারে না। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে প্রয়োজনের সঙ্গে সৌন্দর্য্য ও আনন্দ একসঙ্গে লাগিয়া আছে। সেইজন্য বিবাহ-ব্যাপার প্রজা-সৃষ্টির অবলম্বন হইলেও, মানবজীবনে এক আনন্দের অধ্যায়। যে প্রেম-মানব-জীবনকে সৌন্দর্য্যময় করিয়া তুলে, যৌনসম্মিলন বা বিবাহকে অবলম্বন করিয়াই তাহা ফুটিয়া উঠে। বাল্যবিবাহ-প্রথার কৃত্রিমতা দ্বারা সেই আনন্দের উৎসকে আমরা রোধ করিয়াছি। তাহার ফলে হিন্দুসমাজে বিবাহের মধ্যে উৎসবের আনন্দ-রাগিনী না বাজিয়া কন্যাদায়ের করুণ রাগিনীই বাজিয়া উঠে। * যুবকেরা শ্বশুরের অর্থে ক্রীত না হইয়া যদি প্রেমের তপস্যায় বাঙলার কিশোরীদের হৃদয় জয় করিবার চেষ্টা করিত, তবে এ কন্যা-দায়ের সমস্যা বাষ্পের মত উড়িয়া যাইত। কিন্তু নব্যবঙ্গের যুবক কৃত্রিমতার ভারে আচ্ছন্ন—প্রাণহীন জড়পদার্থ। বর্ত্তমান যুগের চেতনার স্পন্দন তাহার হৃদয়ে আসিয়া আঘাত করে নাই। রমণীর মন বলিয়া, হৃদয় বলিয়া যে একটা অমূল্য রত্ন আছে, তাহাকে লাভ করিবার, জয় করিবার আনন্দও যে একটা বিপুল আনন্দ, তাহা তাহাদের কল্পনাতেও আসে না বোধ হয়। গৌরীই যে কেবল হরের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা নহে, হরও গৌরীকে লাভ করিবার জন্য যুগব্যাপী কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। জাতীয় কল্যাণের জন্য নব্যবঙ্গের যুবকগণের সেই তপস্যার প্রয়োজন। কবে সেদিন আসিবে,

* পূর্ব্বে বর্ণিত আদিম সমাজে প্রচলিত, মাথায় পাথর মারিয়া বিগত-চেতনা, রুধিরাপ্লুতা নায়িকাকে টানিয়া লইবার সঙ্গে ইহার যথেষ্ট ভাবগত সাদৃশ্য আছে। লেখক—

যেদিন বাঙলার মেয়েরা এমন উপেক্ষার বস্তু হইবেন না;—যেদিন তাঁহাদিগকে বাঙলার যুবকগণ আত্মত্যাগের মূল্য দ্বারা কিনিয়া লইবে;—তাহারা বুঝিতে পারিবে—

"রমণীর মন,
সহস্র বর্ষেরি সখা, সাধনার ধন।"

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

---

# মানসিক

মনটা আমার বড় খালি ঠেকছে—যেন তার ভরা-ঘট কেউ উপুড় করে ফেলে দিয়েছে—শূন্য ঘট হাল্কা হয়ে, কাৎ হয়ে, পড়ে আছে। তবে এ শূন্যতা পূর্ণতার প্রতীক্ষা; যা ছিল তাই নিয়েই চল্‌ছিল না, তাইতো সব জল গড়িয়ে ফেলে দেওয়া হল আবার ভরবার জন্যে,—সপ্তসিন্ধুর তীর্থ-সলিলে, কূপোদকে মন তৃপ্তি মান্‌লনা বোলে। জীবনের এই ফাঁকগুলির কিন্তু সার্থকতা আছে, যেমন তালের মধ্যে ফাঁক পরের মাত্রাকে ফিরিয়ে আনে, যেমন প্রচ্ছদ-পটের একঢালা রংএর অবসর, যার উপর ছবি বিচিত্র বর্ণে ফুটে ওঠে। মনের উপর কে আমার নিবিড় নিশীথ-রাত্রির তুলিকা বুলিয়ে দিয়েছে, যেথানে শব্দ অস্ফুট, আলোক অস্পষ্ট, অথচ চারিদিক একটি গভীর সত্তার আবির্ভাবে প্রাণবান। কিছু নাই একথা কেউ বলে, তার সাধ্য কি? কিছু যে আছে আর অতি সত্য-ভাবে আছে, তা আমার মনের প্রতি অণু-পরমাণু একান্ত ভাবে অনুভব করছে। এই স্তব্ধতা, এই প্রশান্ত জনহীনতা আমার মনে যে আনন্দ সঞ্চার করছে সে ধ্যানগম্য; প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কিছুই নয়,—তার অনুভূতি। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কিছু আবশ্যক নেই, অন্ততঃ নিজের কাছে। অন্তরের গর্ভমন্দিরে দেবতার অস্তিত্ব, আনন্দ, প্রাণ, জীবনই তার প্রমাণ! তাই শূন্যতায় অভাব বোধ নেই, অন্ধকারে সংশয় বোধ হয় না, অনিশ্চিতের ভয়ও থাকে না। শূন্যতাই অন্তহীনের ভিত্তি, চিরন্তন গতির ক্ষেত্র, চির-নবীনতার আলয়।

* * *

মনটা ব্যাপ্ত হয়ে যাক, তাকে বিক্ষিপ্ত হতে দিয়ো না, তবে যে শক্তিহানি হবে। ইতস্ততঃভ্রষ্ট তার প্রতি-অংশটিকে সংহত একত্র করে নিয়ে প্রবল ধারায় প্রবাহিত করে দাও; তবে ত কূলে-কূলে কল্যাণ বর্ষণ করতে পারবে। উৎপত্তিস্থানে নদীর ধারা ত বিক্ষিপ্ত নয়, সে যে এক, গভীর, প্রবল, তার আবেগের মুখে কিছুই দাঁড়ায় না, তার গতি কিছুতেই রোধ করতে পারে না, তাইতো গোমুখীর প্রস্রবণের সম্মুখে ঐরাবত দাঁড়াতে পারেনি, পরাভূত হয়ে ভেসে চলে ছিল। যেথানে নদীর জন্ম, কাজের সূচনা, যে স্থানটি তার প্রেরণার জন্মস্থান, সেথানটির পরিসর অধিক নয়,

সঙ্কীর্ণ; কিন্তু সেখানকার স্রোতোবেগ একাগ্র, গভীর, অত্যন্ত প্রবল, সে-ধারা তখন আপনাকে শুধু সংগ্রহ করে নিয়ে অগ্রসর হয়। তার মধ্যে অন্যমনস্কতা একেবারেই নেই, লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট, এখন গন্তব্য পথ করতে হবে, সৃজন করতে হবে, কাজেই শক্তির অতি সামান্য অপচয়ও চলে না। কিন্তু সেই স্রোতোধারা যখন কল্যাণের অভিসিঞ্চনে দেশ-দেশান্তর উর্ব্বর, সুন্দর, সফল কোরে, তার সাগরের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন সে আর সংহত নয়, তখন সে উদার পরিব্যাপ্ত, অসীম আকাশের মত দশদিকে প্রসারিত, তখন সে যেন তার প্রাণ-খানি শতধা করে তার অভীষ্টকে বহুভাবে স্পর্শ করতে চায়। জীবনে সাধনার মুখে তাই অমন সংযত একাগ্র, এমন কি অল্প-পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে চলতে হয়, তারপর পথে যেমন এগিয়ে-চলা আসে, সঙ্গে সঙ্গে ধারার প্রসরও বৃদ্ধি হতে থাকে, বৈচিত্রও দেখা দেয়, তারপর সিদ্ধিলাভের দিনে, অশেষ অসীমতায় পরিসমাপ্তি।

*  *  *

শরীর যেদিন অক্ষম হয়, সাহচর্য্য দেয় না, চলা-ফেরা দেখার পথে বাধা এসে পড়ে, সেইদিন মন এসে বন্ধুতা করে, সেদিন সে বলে, চোখ তোমায় কি আলোই বা দেখাতে পারে, আমি তোমায় অচপল চপলার জ্যোতি দেখাই এস। হাঁটতে পারছ না তাই দুঃখ? এস তোমায় নিয়ে অনন্তের পথে বেড়িয়ে আনি, অগণ্য গ্রহনক্ষত্রের আলোক-অরণ্যের মধ্যে এস আমার সঙ্গে পায়চারি করবে; ঐ নীহারিকার গর্ভমন্দিরে তোমায় নিয়ে যাব, সেখানে সৃজনের স্বরূপ দেখে আসবে। অক্ষম দেহটা আপন অস্তিত্ব খারিজ কোরে ফেল্লে দেখে, মন এসে আপন সম্পূর্ণ অধিকার প্রচার করে। আজ তাই বিছানায় পড়ে-পড়ে ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী হয়েছি। চোখ বুজে-বুজে কেবলি দেখ্‌ছি,—চোখ যা দেখ্‌বার জন্যে ব্যাকুল। চোখের অধিকার আর মান্‌ছিনে, তার প্রবেশ-দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছি, নিলীনপল্লব দুটি শ্রান্ত চক্ষু, তবু আজ যা দেখছি বহুদিন, যেন কত যুগ-যুগান্ত তা দেখবার সুযোগ তো হয়নি। সেই চিরাতীত কৈশোর আজ তার সব দেখার আগ্রহ, আনন্দ, অপরিতৃপ্তি মনের মধ্যে সঞ্চার করে দিয়েছে। নিঃসঙ্গ একা ঘরে আজ আর সঙ্গীর অভাব নেই, আনন্দে আছি। লোকে বল্‌ছে বেচারার অসুখ করেছে, আমি জানি সুখে আছি। একটা দিনের জন্যে যেই আমার পক্ষে বাহিরের গতি স্থগিত হয়েছে, অম্নি আমার জীবন অখণ্ডরূপে আমার সম্মুখে এসে দেখা দিলে। অতীত এম্নি বর্ত্তমানই হল যে বর্ত্তমানটার অস্তিত্বই রইল না। কিছুই যায় নি, সবই রয়েছে যে, সেই প্রিয়মুখখানি, সেই স্নেহস্পর্শ; সেই সুধা-কণ্ঠস্বর। শরীর যখন প্রবল থাকে, তখন কত জিনিষই হারিয়ে ফেলি, আমার বিশেষ আমির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। দেহযুক্ত আত্মা তাই খণ্ডিত, আপনার মধ্যে আপনার ব্যবধান রচনা করে; ঠিক যেমন হলে মিলনটি সম্পূর্ণ হ'ত, তা আর হয় না। তাই আত্মার পরিপূর্ণতার জন্যে জীবনান্তের প্রতীক্ষা করতে হয় বুঝি?

*

আমরা বলি ত্রিকাল, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে, মানুষের জীবনে দুই কাল ভিন্ন আর কিছুই নাই, সম্পূর্ণভাবে আছে অতীত, আর অসম্পূর্ণ সীমারহিত ভাবে থাকতে পারে ভবিষ্যৎ, কিন্তু বর্ত্তমান বলে কিছুরি যেন অস্তিত্ব নেই। এই যে প্রতি-নিমেষ ও নিশ্বাসপাতের সঙ্গে সঙ্গেই ভঙ্গুর বর্ত্তমান অতীতে লীন হয়ে যাচ্ছে। তাকে ভিত্তি করে কিছু যে গড়ে তুলব, তার অবসরই পাওয়া যাচ্ছে না। কাণে-কাণে তাই অতীতকেই ভবিষ্যতের সূচনা বলে সকলেই জেনে এসেছে, অতীতকে সম্মুখে রেখে অনাগতকে আরাধনা করছে। বর্ত্তমান এই দুয়ের সন্ধিক্ষণ, অতি সঙ্কট মুহূর্ত্ত। ধ্যাননিরত হয়ে, অতীতের অর্থগ্রহণ করে ভবিষ্যৎ রচনা করে থাকি, অতীতে সমাহিত হয়ে ভবিষ্যতকে গড়ে তুলি। অতীতের কার্য্য ও কারণ একসময় আমাদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না, কিন্তু এখন যেখানে দাঁড়িয়েছি, সেখান হতে কি কারণ-সমবায়ে, কোন্ কার্য্য-পরম্পরা পরিণতি লাভ করেছে, তা আমরা স্পষ্টতঃ দেখতে পাচ্ছি। ভবিষ্যৎ আমাদের আয়ত্বাধীন নয় সত্য, কিন্তু অতীত যে একেবারে করতলগত; শুধু তাই নয়, সেযে আমি, আমার এতদ্দিনকার অস্তিত্ব, তাকে যেমন জানি, এমন করে আর কিছু জানা আমাব পক্ষে অসম্ভব। জ্ঞানই কর্ম্মের প্রেরণা, অন্তর্দৃষ্টির আলোক, আমার জীবনের চেষ্টা, উদ্যম, গতি,—আর সেই জন্যেই মুক্তি। অজ্ঞান অবস্থায় আমরা স্থবির নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারি, জেনে, তা' কখনোই সম্ভব হয় না। জ্ঞানের বিশেষ শক্তিই হচ্ছে প্রেরণা, চলতেই হয় বসে থাকার যো নেই।

*　　*　　*

এই মন জিনিষটার আয়তনের স্থিতি-স্থাপকতা গুণ আছে, সেখানে যখন মানুষ এনে বসতি করাই, তখন দেখি অনেক-খানি জায়গা খালি পড়ে হাঁ হাঁ করছে, আবার যখন সেই শূন্য ভরাবার জন্যেই প্রভু, তোমার আসন পাতি তখন দেখি ঠাঁই কুলোয় না, হায় হায় পড়ে যায়। মন কেবল কাঁদে, কেবলি বলে—দেওয়া হ'ল না, পূরল না; যে শূন্যতার জন্যে ইতিপূর্ব্বে সে অভিযোগ অনুযোগ জানিয়েছিল, সেইটিই বাড়াবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অসীম শূন্য সে আপনার মধ্যে আবাহন করে আনতে চায়, অপরিসীম পূর্ণতায় তাকে উৎসর্গ করবে বলে'! মন নিয়ে যে কারবার করে, সেই জানে দেউলে হ'বার পন্থা সে পথে নেই—খরচাটাই সঞ্চয় হয়ে ওঠে, দুহাতে ছড়িয়ে দিতে-দিতে চল্লেও লোকশানে পৌঁছয় না। কথায় বলে, যে খেলতে জানে সে কাণা কড়িতেও খেলে ভাল—মন পদার্থের এই খেলবার বিদ্যাটা খুব ভাল করেই জানা আছে, ফুটো কড়ির দানেও দশ-পঁচিশ ফেলতে পারে, আবার সবার আগে ঘরে পৌছে দিব্যি অটল হয়ে বসে, তখন তাকে কে আর মারে?

*　　*　　*

মনতো দিব্যি ছিল অন্ধকারে দুয়োর ভেজান, কেমন নিস্তব্ধ, কেমন নির্জ্জন, কেমন শান্ত পরিপূর্ণ, ঐ যে দরজা খুলে মানুষটি চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের মধ্যে দাঁড়াল,

অম্নি আলোর সঙ্গে সঙ্গে কেমনতর যেন ফাঁক দেখা দিল, সে ভরা ভাবটি আর দাঁড়াতে পারলে না। বেশ ছিল মন একলাটি আনন্দে, নিরপেক্ষ, নিরুদ্বেগ, শান্ত স্বচ্ছন্দ! যেই আলো এল, পরিপূর্ণতা গেল, দ্বিধার আবির্ভাব হ'ল, চাঞ্চল্য সঞ্চারের সূচনা দেখতে পেলাম। যে দৃষ্টি মনের মধ্যে আপনাকে নিহিত করে তৃপ্ত ছিল, তার মধ্যে নিমেষ দেখা দিয়েছে, সে বারে-বারে উদ্‌ভ্রান্ত হচ্ছে, কেননা সে উৎসুক, তাই বিব্রত। এ আমি চাইনে, অন্ধকারে সমাহিত অবস্থায় মনের মধ্যে যেন সৃজন চলছিল, সমুদ্রের গর্ভে অতলের মধ্যে যেমন করে দ্বীপগুলি বেড়ে ওঠে, বাহিরে তখনও প্রকাশ পায়নি, তবুও যে আছে, বাড়ছে, অপরে না জানলেও অন্তর তা ভাল করেই জান্‌ছিল। মা যেমন আপন জঠরের সন্তানকে সমস্ত দেহ মন দিয়ে অনুভব করে' আপন ঐশ্চর্য্যে আপনি বিস্মিত হয়ে ওঠে--তেম্নি আর কি! কিন্তু এই যে অন্ধকারকে চিরে আলো দেখা দিয়েছে, এ যেন ছুরির খোঁচা, অক্ষত মনকে ভিন্ন করছে, তাই কেবলি ব্যথা অনুভব করছি। মনের মধ্যে যে বীজ অঙ্কুরে উদ্বোধিত হয়ে, আলোক-জগতে দেখা দেবে বলে স্থির-মনে পরিপূর্ণ সন্তোষে অন্ধকারের মধ্যে সানন্দে বসবাস করছিল, হঠাৎ সেই-খানটিতে ফাটল পৌঁছেছে--এতে যে আলো আর তাপ অসময়ে, অনাহূত ভাবে সেই বীজের সূতিকা-গৃহে প্রবেশ করেছে, তাতে পরিণতির সহায়তা করবে না, বরং এ আকস্মিক উপদ্রবে সমূহ ক্ষতি হতে পারে। মূলের রস-বিন্দুটিকে না শুকিয়ে তোলে, তবেই—মৃত্যু!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

---

# ধর্ম্মশাসনতন্ত্র বা থিওক্রেসি

জগতের অসীম তরঙ্গ ইতিহাসের বিপুল অঙ্গে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। চলোর্ম্মির মত ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত নিঃশব্দে ইতিহাস-সমুদ্রের বুকে চিরন্তন স্পন্দন জাগাইয়া রাখিয়াছে। এ আন্দোলনের বিরাম নাই, অবিরত মানবের নিশ্বাস-স্রোত মহাসাগরের কক্ষে কক্ষে মহা-জীবন প্রবাহিত করিয়াছে। ইতিহাস-সমুদ্রে দুইটি সুর তরঙ্গ-ভঙ্গে জাগিয়া উঠিতেছে। এক ধর্ম্মরাগ, অপর রাজ্যরাগ। পৃথিবীর আদিম যুগ হইতে এই দুই শক্তি জগৎকে জড়াইয়া চলিতেছে। রাজ-শক্তি রাজ্য গড়িয়া তুলিল, আর ধর্ম্মশক্তি আদর্শ-রচনায় ব্যাপৃত হইল। রাজনীতি বলিল, মাটির সংসারে সোনার পাট আনিতে হইবে। ধর্ম্মনীতি বলিল মানুষের হৃদয়ে সে সোনায় রঙ ফলাইতে হইবে। এই দুই সুর ইতিহাস-সাগরে চিরদিন নবরঙ্গ লইয়া ফিরিতেছে, এই সুর-ঝঙ্কারে যে লহরীমালা নাচিয়া উঠে, তাহারা কখনো একে অপরের সহিত হাত মিলাইয়া, কখনো বা পাশ কাটাইয়া ভিন্ন

তালে নাচিয়া থাকে, রাজনীতির তরঙ্গ কখনো বা ধর্ম্ম-তরঙ্গের সঙ্গে মিশে, কখনো বা রাজনীতি এত উত্তাল আলোড়ন আরম্ভ করে যে ধর্ম্মের বীচিমালা, 'ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙ্গে দুধারে' কি করিবে, রাজদণ্ড যে বজ্রময়,—সে বজ্রচাপে ধর্ম্মের রুদ্রাক্ষ কতকাল টিঁকিবে ?

ইতিহাসের উদ্বোধন-দিন হইতে রাজ-শক্তি রাষ্ট্র-রচনায় নিয়োজিত হইয়াছে। মানুষে মানুষে পরিচয়ে ক্ষুদ্র পরিবারের সৃষ্টি, ক্ষুদ্র পরিবার সমাজে, সমাজ জাতির মহা-পারাবারে যাইয়া দাঁড়াইয়াছে—বিন্দু হইতে বিশাল জলধি পর্য্যন্ত ঠেকিয়াছে। এবং ক্ষুদ্রতম কেন্দ্র যত স্ফীত হইয়াছে, ততই রাজ-শক্তির বৃহদ্ব্যাপী শৃঙ্খল বৃহদাকারে জাতির জীবন-পরিধি বেড়িয়া ফেলিতে লাগিল। এ জগৎ-বেড়-জালে জাতির জীবন ভিন্ন ভিন্ন আবরণে গড়িয়া উঠিল। সমাজের এই জাতীয়তার দাবীর মুহূর্ত্তে, ধর্ম্মের ক্ষীণ সুর বাজিয়া উঠিল। এই ক্ষীণ আওয়াজ রাজধর্ম্মের সঙ্গে একটা রফারফি করিয়া ফেলিতে চাহিলে রাজ-নীতি ও ধর্ম্মনীতি উভয়ের প্রথম সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে আপত্তি ঘটিল না। রাজ-শক্তি আপন শাসন-তন্ত্র রচনায় ব্যাপৃত, ধর্ম্মের প্রয়োজন যাচাই করিবার ততটা সুযোগ তখনো উপস্থিত হয় নাই। কাজেই ধর্ম্ম অনাহূতের মত হইয়াই রাজ্যমধ্যে প্রথমে ঠাঁই খুঁজিয়া লইল। কিন্তু এরূপ অবস্থা বেশীদিন টিঁকিবার কারণ ছিল না। জাতির জীবনের উপর রাজশাসনতন্ত্র চাপিয়া বসিলেও ভিতরে এক অন্তঃসলিলা জাগিয়া উঠিতেছিল। সভ্যতার দীপ্তিতে যখন জাতি-জীবন একবার বিদ্যুদ্বরণে ফুটিয়া ওঠে, তখনি অমনি ধর্ম্মের শুভ্র আলিপনা অলক্ষিতে ভাসিতে থাকে। প্রাচীন ভারত যখন বেদের সভ্যতায় জাগিতেছিল, তখন বৈদিক ধর্ম্ম সে বেদ-জাতির কাণ্ডারী হইয়াছিল, কিন্তু সেই জাতির জীবনে বেদের পূর্ব্বে রাষ্ট্রতন্ত্রই প্রসার লাভ করিয়াছিল। আর্য্য উপনিবেশ-কালে রাজ্য-শাসন-তন্ত্র এই মহাজাতিকে ভারতের দিকে পরিচালিত করে, এবং স্থিতিলাভ কার্য্য-পদ্ধতিতেও শাসন-নীতির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মের মহাবীজ এই চলন্ত জাতির জীবনে নিহিত ছিল, রাজতন্ত্রে ইহার বিধান ছিল না, পরন্তু রাজ-তন্ত্রের গণ্ডীতে জাতির জীবন যতই ধরা পড়িতে থাকিল, অনুভূতির সঞ্চার-সংস্পর্শে জাতির জীবন যতই বিকাশ পাইতে লাগিল, ততই ভিতরে ভিতরে অন্তঃসলিলা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। এই ধর্ম্মের অভ্যুদয়, রাজ-শক্তির কাছে আমোল পায় নাই; অবশেষে যখন এই ধর্ম্মজাতির প্রাণে সাড়া জাগাইয়া তুলিল, তখন শাসন-তন্ত্র ইহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে পারিল না। জাতির অঙ্গে যেমন শাসন-নীতি এক তন্ত্রী জুড়িয়া দিয়াছে, জাতির প্রাণে তেমনি এখন নূতন করিয়া ধর্ম্ম-তন্ত্রী সংযোযিত হইল।

জাতীয় জীবন ক্রমে দুইটী কাঠির বন্ধনে বাঁধা পড়িল। সোনার কাঠী ও রূপার কাঠী। সোনার কাঠী রাজ-শক্তির স্বর্ণমুকুট, আর রূপার কাঠী ধর্ম্মের শুভ্র দীপ্তি! বেদ-জাতির জাগরণে হিন্দুর গৌরবময় যুগ স্থাপিত হইল। রাজশক্তি বেদধর্ম্মকে আলিঙ্গন দিল। এইরূপে জাতীয়-জীবনে ধর্ম্মযুগ আসিয়া শাসন-রাজ্যে ধর্ম্মরাজ্যের

প্রতিষ্ঠা করিল। ইতিহাস-সাগরে দুই তরঙ্গ একে অপরের সহিত হাত মিলাইয়া শুভক্ষণে নৃত্য জুড়িল! গ্রীসের অভ্যুদয়-কালেও এইরূপ ঘটিয়াছিল। হিরেক্লিডিজের প্রত্যাবর্ত্তনে এই মহা-দেশ সহসা যেন চেতনা পাইয়া জাগিতে থাকিল, কিন্তু এ জাগরণে যে শক্তি লক্ষিত হয়, উহা কি রাজশক্তি ভিন্ন অপর কিছু? রাজ-শক্তির উদ্বোধনে গ্রীস জাগিয়া উঠিল, প্রাচীন ক্ষীণ-চেতন দেশ পূর্ণপ্রাণে জাগিয়া উঠিল—সভ্যতার মুকুটমণি এথেন্স-নগরী শাসন-শক্তির রূপ লইয়া প্রথম বিকশিত হয়। স্পার্টা জনপদে লাইকারগাস রাষ্ট্রনীতির দামামা বাজাইয়া শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন; সোলনের মত রাজ-নীতিজ্ঞের হাতে এথেন্স গড়িয়া উঠিতে লাগিল। গ্রীসের খণ্ড খণ্ড দেহে খণ্ড-রাজ্য জাগিয়া উঠিল। রাজতন্ত্র-ঐন্দ্রজালিকের মায়া-দণ্ড সংস্পর্শে নিমেষের মধ্যে দেশে প্রাণের স্পন্দন দেখা গেল। রোমের ইতিহাসেও সেই একই দৃশ্য। রমিউলাসের হাতে রোম গঠিত হইল—সেই রোম নগরের প্রতিষ্ঠা হইতে প্রতিপত্তি পর্য্যন্ত এক অভিনব রাজ-তন্ত্র রোমান্ জাতি সৃষ্টি করিয়া ফেলিল। কার্থেজের অস্তিত্ব শুধু শাসন-তন্ত্রেই ছিল এবং শাসন-নীতির আকর্ষণেই পিউনিক্ (Punic) সভ্যতার তরঙ্গ রোমান জাতির অঙ্গে তর্ তর্ ঝর্ ঝর্ করিয়া ছাপাইয়া উঠিয়াছিল, সে পিউনিক যুদ্ধে কার্থেজ জাতি-সমুদ্রের যে জল কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে রোমের দম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। এ মহাযুদ্ধের অন্তরালে শুধু রাজ-তন্ত্রের মদোন্মত্ত হুঙ্কার, ধর্ম্মশক্তি তখনো পর্য্যন্ত জাতির জীবনে দেখা দেয় নাই।

রাজ-তন্ত্রের চিত্রে আমরা দেখিলাম যে, জাতির সংগঠনে রাজ-তন্ত্রেই প্রথম উপাদান, ধর্ম্মবোধ না হইতেই জাতির সৃষ্টি আরম্ভ হয়। রাজ-তন্ত্র সাহায্যে জাতির সৃষ্টি হইলেই চিন্তা-শীলতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ক্রমে জাতির জীবনে জাগিয়া উঠে। রাজ-তন্ত্র জাতির সৃষ্টি করে এবং ধর্ম্মতন্ত্র সে জাতির মধ্যে একটা গভীরতা আনিয়া দেয়। রাজতন্ত্রে জাতির অবয়ব পুষ্ট হয়, এবং ধর্ম্ম-মন্ত্রে জাতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। বেদের জাতি গড়িয়া তুলিতে রাজতন্ত্রকেই মূল বলিতে হইবে, এবং সেই মহা-জাতির আত্ম-প্রতিষ্ঠা বেদ-ধর্ম্ম হইতেই ঘটিয়াছে। গ্রীস রোম ও কার্থেজের যে কাহিনী বর্ণিত হইল, উহা শুধু জাতীয়তার সৃষ্টি-কাহিনী, পরন্তু জাতীয়তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কথা নহে। রাজশক্তির ক্ষমতায় জাতি দাঁড়াইয়া উঠিল বটে, কিন্তু ভিতরের শক্তি জন্মাইতে কিছু সময় লাগিল। যতদিন না জাতি-জীবনে সে ধর্ম্মশক্তি সুদৃঢ় হয়, ততদিন ভিত্তি-বিহীন সৌধমালার মত সে জাতির জীবন হাওয়ার উপর একটা ছায়াবাজির মতই আঁটিয়া থাকে। ইংরেজীতে যাহাকে বলে House of cards, ইহাকেও সাদা কথায় তাসের খেলা বলা চলে।

জাতির জীবনের দুইদিক অনেকটা পরিস্ফুট হইয়াছে। এই ধর্ম্ম-চৈতন্য ও রাষ্ট্র-চৈতন্য লইয়া জাতির ইতিহাস আবহমান কাল হইতে ঘটনার ভারে নুইয়া পড়িয়াছে। একটা অতি-সুন্দর কথা এই যে, ইতিহাস শুধু রাজ-নীতির লীলাক্ষেত্র, ইতিহাস বলিতেই রাজ-তন্ত্র অথবা আধুনিক ভাষায় প্রজা-তন্ত্র। এ মহা-পুস্তকে আমরা পাই শুধু জাতির জীবন-

সংগ্রামের কাহিনী। প্রজা-তন্ত্র হইলে সভামঞ্চে শাসন-শাস্ত্রের অগ্নিময় আন্দোলন, রাজ-পন্থীদের রাজার খর্ব্বতা-নির্দ্ধারণ, এবং বেশীর ভাগ রণাঙ্গনের ধূলি ও রক্তময় পথে জাতির জীবনের 'বিজয়-শঙ্খের' জন্য উন্মাদ অনুসরণ! এই ত ইতিহাস, ইহাতে জীবনের একদিক ফুটিয়াছে সত্য, কিন্তু ভিতরের দিক-ত অন্ধতমসায় আচ্ছন্ন। ধর্ম্ম জীবন যদি না সংযোগ করানো যায়, তবে জাতির পূর্ণ জীবন পাইব কোথায়?

ইতিহাসের এ পন্থা অবলম্বন করার কারণ আছে—ধর্ম্মশক্তির বিকাশ ও ইহার রাজ্যমধ্যে নূতন ধর্ম্ম-রাজ্য-গঠন করার দরুণ, রাজ-শক্তি এ অন্তর-শক্তিকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া অনেক বিবাদ আপোষে মিটমাট করিয়া ফেলিয়াছে। দেবায়তন জড়াইয়া ধর্ম্ম-স্তম্ভ স্থাপন করিল, রাজ-তন্ত্র ইহাকে সাহায্য করিল, কিন্তু ইহাকে রাখিল সিংহাসন হইতে বহুদূরে। মণিমহলে সোনার সিংহাসনে, রাজ-মুকুট অসি-বর্ম্মের গা ঘেঁষিয়া রাজ-দণ্ডের উপর বসিয়া দেবায়তনের গৈরিক ও রুদ্রাক্ষের দিকে যে কটাক্ষ-পাত করিবে, সে দৃষ্টিদানের ভিতর সম্মান ও সঙ্কোচ দুইই আছে। রাজতন্ত্রের ন্যায় ধর্ম্ম ও যে ধর্ম্ম-শাসন-তন্ত্র গড়িয়া ফেলিয়াছে, ইহাতে উভয় শাসন-শক্তির মধ্যে দূর ভবিষ্যতে সজ্বর্ষের সম্ভাবনা সূচিত হওয়ায়, এ উভয় তন্ত্র পরস্পর পরস্পর হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা যে পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রসঙ্গক্রমে দেখিতে পাইব, এই দুই তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে ইউরোপের জীবন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, এই দুই তন্ত্রের এমন রক্তময় কোন্দল আর কোন দেশের ইতিহাসে দেখা যায় না। কিন্তু ধর্ম্ম-শাসন-তন্ত্রের বিকাশ, প্রচার ও স্থিতি জাতির ইতিহাসে প্রায় একরূপ, রাজ-তন্ত্রের ইতিহাস হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই শাসন-তন্ত্রের চিত্র জাতি-ক্রমে আঁকিলে জাতীয় জীবনের নিখুঁত আদর্শটী যে ফুটিয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই।

বেদের যুগ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়-কাল পর্য্যন্ত বেদ-জাতির ধর্ম্ম-তন্ত্রের কথা আমরা কি পাইতেছি? সেই বেদ-জাতির অবয়ব হইতে হিন্দু বাহির হইল। হিন্দুর রাজশক্তি ইহাকে জাতির আকার দান করিয়া, ভারতের সর্ব্বত্র এ জাতির স্রোত ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রবাহিত করিল, জনপদ রাজ্যপাট লইয়া ধীরে ধীরে ভারত ছাইয়া ফেলিল। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্রের যে ভিন্ন ধারা পাই উহার নায়ক এক জাতি-সম্প্রদায়, এ সম্প্রদায়ের নাম ব্রাহ্মণ। অন্য দেশে এমন কি ভারতবর্ষেও বিরুদ্ধ-বাদী ধর্ম্ম-ইতিহাসের ধারা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ইহারা যাহার অধিনায়কত্বে রহিয়াছে, তাহা একটা caste বিশেষ নহে, তবে একটা পুরা-দস্তুর খাঁটি class বটে। বৌদ্ধ-শাসন তন্ত্রের নায়ক কাহারা? বৌদ্ধ সম্প্রদায় নহে, পরন্তু একটা class—ইহার নাম অর্হৎ (Arhat)। ইহাকে religious aristocracy বলা সুশোভন, ইউরোপে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের কাণ্ডারী caste না হইলেও stereotyped class বটে। এখানে aristocracy নাম তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার বদলে যে নামকরণ হইয়াছে তাহা অতিসুন্দর, religious hierarchy অর্থাৎ রাজ-তন্ত্রে যেরূপ রাজা উজীর নাজীর ইত্যাদি

এখানেও তেমনি Bishop, Arch-bishop, মুকুটমণি Pope থাক্, কিন্তু সেই class monopolyরই অন্য নাম caste monopoly এই হিন্দুধর্ম্মের পরতে পরতে পাই। বেদের যুগ হইতে এই হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মণের হাতে পড়িয়াছে, ব্রাহ্মণ ইহাকে কোলে কাঁখে করিয়া মানুষ করিয়াছে, ব্রাহ্মণের ইহা বিত্ত, ব্রাহ্মণের ইহা বড় আদরের সম্পত্তি। ব্রাহ্মণ জাতির অংশ হইতে ক্ষত্রিয়ের উদ্ভব, ক্ষত্রিয় প্রথমে জাতি-ভেদ-বিহীন আর্য্য-জীবনে সংস্থিত ছিল; ইহারই এক ভাগ লইয়া ব্রাহ্মণ হইল, অপর ভাগ ক্ষত্রিয়ত্বে পরিণত হইল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের হাতে রাজ্য-ভার ছাড়িয়া দিল, অথবা ক্ষত্রিয় রাজ্য-ভার গচ্ছিত সম্পত্তির মত গ্রহণ করিল। মোট কথা ব্রাহ্মণ রাজ-তন্ত্র হইতে দূরে রহিল। ব্রাহ্মণ এইবার বাঁচিয়া গেল, ক্ষত্রিয়ত্ব জমাইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ মূলস্তরে রাজ্য-চিন্তা যে পর্ব্বতপ্রমাণরূপে পাইয়া বসিয়াছিল, তাহা এক্ষণে নূতন সম্প্রদায়ের উপর বর্ত্তিয়া গেল। সেই রাজ্য-চিন্তা-তরঙ্গের মূলেই ক্ষত্রিয়ের উদ্ভব। তাই ক্ষত্রিয় জন্মাইল রাজদণ্ড লইয়া---রাজ-তন্ত্র ক্ষত্রিয়জাতির মাথার তাজ হইল। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মতন্ত্র লইয়া একদিকে সরিয়া গেল। ক্ষত্ররাজশক্তি দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় চৌষট্টি ব্যঞ্জনের চর্ব্ব্যচোষ্য-লেহ্যপেয়-প্রিয় হইয়া বসিল, আর ব্রাহ্মণ কঠিন মৃত্তিকায় শুইয়া নক্তন্দিব জপ লইয়া যজ্ঞে মন দিল, এবং যজ্ঞাগ্নির ভস্মে তপোবনের শাখায় শাখায় কজ্জল কষিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ আত্ম-ত্যাগের জ্বলন্ত শিখা বলার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করিল। তবু রাজ-ক্ষেত্র না মাড়াইতে দেখিয়া আমরা ব্রাহ্মণের আত্ম-প্রত্যয় ও সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-ত্যাগের পরিচয় পাই, এ কথা অস্বীকার করিবার হেতু নাই। ব্রাহ্মণ রাজা হইতে না গেলেও রাজার অভিভাবকের পদ, গুরুত্বের পদ ত্যাগ করিতে পারে নাই। এইখানে ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসে পোপের দাবী অনেকটা আসিয়া পড়ে। কিন্তু ব্রাহ্মণ আপন চরিত্র-বলে, ক্ষমতা-বলে রাজ্যের দ্বিতীয় কর্ণধার ছিল, এরূপ মনে হয়---রাজ্যের মন্ত্রীপদ ব্রাহ্মণের হস্তে ন্যস্ত থাকিত। ব্রাহ্মণ এইরূপে বুঝাইত, শুধু ধর্ম্মক্ষেত্রে কেন, রাজ-নীতির ধর্ম্মও ব্রাহ্মণের যেমন করায়ত্ত, এমন আর-কাহারও নহে। এইরূপে ব্রাহ্মণ রাজাকে রাজ্যকে মুঠার ভিতর আনিয়া এক মহা-ক্ষমতার অব্যাহত চক্র গড়িয়া তুলিল। ইহা চক্রপাণি বিষ্ণুর ন্যায় সৌরমণ্ডলের বিবর্ত্তন-বৎ রাজা ও রাজ্যমণ্ডলের বিঘূর্ণন ঘটাইত। এই শক্তির মূলে ছিল ব্রাহ্মণের আত্ম-ত্যাগ। ব্রাহ্মণ রাজাকে সিংহাসনে বসাইয়াছে, কিন্তু সিংহাসনের হিরণ্ময় কুজ্ঝটিকা ব্রাহ্মণের চক্ষু ধাঁধিতে পারে নাই। ঠিক্ এই জিনিসটী আর কোথাও নাই, ইউরোপে শার্লেম্যেন্ রাজ-পাটে বসিলেন, পোপ লিও তাঁহার মাথায় রাজ মুকুট আঁটিয়া দিল, অবশেষে সেই পোপই রাজার গরিমায় হিংসান্বিত হইয়া রাজার সিংহাসন কাড়িবার মতলব করিলেন, গ্রেগরী বন-কেশরীর মত হুঙ্কার দিয়া রাজশক্তির বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধ বাধাইলেন। সেই রাজ্য ও ধর্ম্মযুদ্ধে যে আগুণ জ্বলিল, তাহাতে রাজ্য পুড়িয়া ছারখার হইল; তারপর Reformationএর যুগে সেই

প্রতিশোধ-বহ্নি তুষারের ভিতর হইতে আত্ম-প্রকাশ করিয়া যে দাবানল জ্বালাইল, তাহাতে পোপের ক্ষমতা খাণ্ডব-বন-দাহনের মত ভস্মীভূত হইল। ভারতবর্ষে এমন জিনিস দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ রাজ-শক্তির উপর লোভ করে নাই, বিলাসের বৈরী ব্রাহ্মণ রাজার হাল দেখিয়া চক্ষে ঈর্ষার কটাক্ষ তোলে নাই। এইখানেই ভারত-ইতিহাসের অতুল সৌন্দর্য্য, অপরিসীম গরিমা। লোভ, বিলাস ও দ্বেষ ব্রাহ্মণ-চরিত্র হইতে কাঁটার মত তুলিয়া ফেলিয়াছিল। এই কণ্টক-উৎপাটনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ-শক্তির সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের বীজও সমূলে উৎখাত হইয়াছিল।

রাজ-শক্তির মূল, মন্ত্রিত্বের উপর ভর করিয়া ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাসন-তন্ত্রের নায়করূপে দাঁড়াইল। ধর্ম্ম-তন্ত্রের শক্তি মন্ত্রীত্বের ভিতর দিয়া প্রয়োগ করিয়া সমস্ত রাজ্য আপন ছন্দে বাজাইয়া তুলিত, ব্রাহ্মণ রাজ-শাসন-তন্ত্রের সহিত যোগ-দ্বারা ধর্ম্মশাসন-তন্ত্রের যোগ ঘটাইত, একের সহিত অন্যকে ছন্দে ছন্দে গাঁথিয়া ফেলিত। ধর্ম্ম-নিকেতনের দীপক রাগিনী জাতির প্রাণে এমন ভাবে ঝঙ্কার তুলিত, যে রাজ-সিংহাসন হইতে গরীবের পর্ণ-কুটীরে পর্য্যন্ত সেই একই সুরের ঢেউ খেলিয়া যাইত। এই রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্ম-নীতির মিলনের নাম মণি-কাঞ্চন-সংযোগ। এই যোগ মাহেন্দ্রক্ষণে যখনই হিন্দুর জাতীয় জীবনে আসিয়াছিল, তখনই শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীময়যুগের সৃষ্টি হয়। যুধিষ্ঠিরের মহাভারতীয় ধর্ম্মরাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থে শান্তি ও অমৃতে সুসম্বৃত হয়। ব্রাহ্মণ সমুদ্র-মন্থনের মন্থন-ভাণ্ড লইয়া দ্বারে দ্বারে অমৃতের পসরা হাকিয়া সে শান্তিজল জাতির জীবনে নব বরষার স্নিগ্ধকান্তির তলে কেতকীদল-'শ্যামায়মান'-বৎ শ্যাম-সুন্দরের ভিতর ডুবাইয়া দেয়। ইহাই শ্রীভগবানের দত্ত প্রেরণায় জাতীয় রাজ্য বা থিওক্রেসি। ইহার অর্থ ইউরোপে একটু বিভিন্ন, অন্ততঃ গ্রেগরীর মুখে ভিন্নরূপে, আর ইস্‌লাম্ রাজ্যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, আকার-ভেদে প্রকার-ভেদে সকলই বিভিন্ন। এই তিন স্থানে এক জিনিসেরই রূপ ত্রিধারা। ব্রাহ্মণ থিওক্রেসি করিল, কিন্তু নিজে রাজ-শক্তি হইতে দূরে রহিল। ইউরোপে Holy Roman Empire সৃষ্টিকারীরাও থিওক্রেসি করিল, কিন্তু সেই নায়ক অর্থাৎ পোপ রাজার উপর ক্ষমতা বাজাইতে ব্যস্ত রহিল, নিজে রাজধানী গড়িয়া রাজাকেও আপন করায়ত্ত করিবার চেষ্টা পাইল। রাজার বিলাস রাজার ব্যসন পোপের হইল, পোপ নিজে মূল সিংহাসনে বসিতে চাহে নাই বা পারে নাই সত্য, কিন্তু রাজাকে দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত নিজের হাতে রাখিতে চাহিত। ইস্‌লাম রাজ্যে জীবন্ত থিওক্রেসি। ব্রাহ্মণ সিংহাসনকে কণ্টক জ্ঞান করিত, পোপ তাহাতে বসিবার আকাঙ্ক্ষা করিত, আর ইস্‌লাম রাজ্যের Apostle মহম্মদ তাহাতে বসিয়াছেন। মূল এক, ধারণা এক, কিন্তু application কত বিভিন্ন। এই তিনের মূলেই থিওক্রেসি, কিন্তু প্রথম ব্যক্তি তাহার অধ্যাত্ম-শক্তিদ্বারা সিংহাসন-রাজ্য জয় করিয়াছিল, দ্বিতীয় অধ্যাত্ম-জীবনে সাম্রাজ্য-লালসা আনিয়া নিজেকে ও রাজ্যকে সর্ব্বনাশের পথে টানিয়া লইল, আর তৃতীয় অধ্যাত্ম-শক্তি ও রাজ-শক্তির এক-দেহে সংযোগ ঘটাইল। এরূপ

দৃশ্য ইতিহাসের পাতায় আর ত চোখে ঠেকে না।

ব্রাহ্মণের এই ধর্ম্ম-শাসন-তন্ত্র সমাজকে ভিত্তি করিয়া রাজ-নীতির সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখিয়া একটানা স্রোতের মত উপনিষদের যুগ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। এই দীর্ঘ-কালের মধ্যে ব্রাহ্মণ-রাজ্যে প্রতিভার যে চাষ হইয়াছে, উহার মূলেই ধর্ম্ম-তন্ত্র। বেদের যুগের পরে আসিল যজ্ঞ-যুগ অথবা ব্রাহ্মণ-যুগ; ইহার পরে আসিল সূত্র Epoch; এই সূত্রভাগের পরেই ষড়দর্শনের মহাযুগ আসিল; ইহাকে উপনিষদের কাল বলিলে ভাল শুনাইবে। এই যে সময়ের স্রোতের মধ্যে কয়টা land-mark, ইহা সেই ধর্ম্ম-তন্ত্রের ইতিহাসের সেরা রত্ন! এই উপনিষদের সঙ্গে সঙ্গেই অখণ্ড হিন্দু-ভারতের কাল পূর্ণ হইল, কারণ ইহার পরে যে সময় আসিবে, উহা ব্রাহ্মণ পরিপন্থী, প্রতিকূল স্রোতের দুই তরঙ্গ—এক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অপর জৈনধর্ম্ম। ডাঃ বড়ুয়া এই দুই ধর্ম্মের মূল রূপে আর এক তৃতীয় ধর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ইহা আজীবিক ধর্ম্ম। এই প্রথম ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-রূপে নবধর্ম্মের সৃষ্টি হইল। এবার ধর্ম্মের কাণ্ডারী ব্রাহ্মণ নহেন, ক্ষত্রিয়! ইহাদের উত্থানের হেতু বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। এইখানে একটা মস্ত দরকারী কথা এই, ইউরোপে যেমন আমরা রাজা ও পোপের সংগ্রাম পাই, এ সংগ্রাম তেমন নহে, কতকটা প্রটেষ্ট্যাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিকের মত, কিন্তু ঠিক তেমনও নহে, কারণ Thirty yearsএর রক্ত-নদী এখানে বহে নাই! মোট কথা, এই ব্রাহ্মণের অধিনায়কত্ব রাজ-শক্তি হইতে সজ্ঘাত পায় নাই, ব্রাহ্মণের গুরুগিরিতে চটিয়া ক্ষত্র-রাজ অসি বাহির করেন নাই। ইহাতেই স্পষ্ট দেখা যায়, ব্রাহ্মণের শতাব্দীর পর শতাব্দীর প্রভুত্বেও হেনরী যেরূপ পোপের সহিত সংগ্রাম বাধাইয়াছিলেন, সেরূপটী ভারত-বর্ষে ঘটে নাই। এইজন্য ব্রাহ্মণের চরিত্রে এমন কোন-কিছু ছিল না, যাহাতে রাজার সঙ্গে লড়াই বাধিতে পারে, এই কথাটাই মনে জাগে। বুদ্ধদেব রাজার সিংহাসনে বসিয়া যদি ধর্ম্মপ্রচার করিতেন, তবে বুঝা যাইত, রাজ-শক্তির তরফ হইতেই ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা হইল, এবং ব্রাহ্মণের পায়া নষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু তাহা ত নয়। বুদ্ধদেব রাজ্য সিংহাসন সব ছাড়িলেন, তবে ধর্ম্ম-প্রচার হইল। তিনি ত রাজকুলের প্রতিনিধি হইয়া ধর্ম্ম তৈয়ার করিতে বসেন নাই,—বা তাঁহার ধর্ম্ম রাজার ধর্ম্মও নয়! ফলকথা এই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম হইল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম-তন্ত্র ভাঙ্গিতে পারিল না; ব্রাহ্মণের অধিকার রাজার ও রাজ্যের উপর প্রায় সমান রহিল, তবে মৌর্য্যরাজ্যে অশোকের সময় ব্রাহ্মণ কতকটা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এই মাত্র। There is no Buddhist period, ভারতের ইতিহাসে এটা অতি খাটি কথা। ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম-তন্ত্র বাধা-বিপত্তি ঠেলিয়া আপনার আসন বজায় রাখিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ কেমন করিয়া ভারতব্যাপী আন্দোলন করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে স্থান-চ্যুত করাইল। বৌদ্ধ-বিদায়ের দিন হইতে ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম-তন্ত্র লইয়া ভারতের শিরোমণি হইয়া বসিল।

অদৃষ্ট তন্তুবদ্ধ হইয়া ভারতের রাজ-তন্ত্র ও ধর্ম্ম-তন্ত্র ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অনুকূল তরঙ্গের মত এতকাল হাতে হাত মিলাইয়া একতালে নাচিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এইবার সে অদৃষ্ট সূত্রটি ইস্‌লামের অসিতে কাটিয়া পড়িল। সুতা-বিহীন মালিকার মত রাজ-শক্তি, ফুলদলবৎ খসিয়া পড়িল, এবং ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া মিলাইয়া গেল। এইরূপে ভারতের রাজ-শক্তি অস্তমিত হইল, কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র রহিয়া গেল। রাজ্যহীন হইয়া জাতির জীবন, ধর্ম্মশাসন-তন্ত্রের মধ্যে ডুব দিল, এই ধর্ম্ম-তন্ত্রের দীপ্তিতে যে প্রদীপ জ্বলিতেছিল উহাতেই জাতির জীবন সঞ্জীবিত রহিল। উপকথায় রাজকুমারের প্রাণ মণি-হারের ভিতর থাকিত শুনা যায়, এখানে জাতির স্বাতন্ত্র্য, জাতির self (যাহা হইতে এ যুগে Self-Governmentএর দাবী আসিতেছে) সেই মণি-দীপের সলিতায় মিলিত হইল। এইবার বুঝা যাইবে সে ধর্ম্ম-শাসন-তন্ত্রের শক্তি কতখানি যে সে প্রদীপটিকে প্রবল বাত্যার ভিতরও প্রজ্বলিত রাখে। সেই অতীতের অগ্নি-পরীক্ষার দিনে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের শিখাটুকুকে জাতীয় জীবনে জিয়াইয়া রাখিল। মুসলমান বিজেতার ধর্ম্ম দ্বেষে হিন্দুর মন্দির ভূমিতে মিশিয়া গেল, মন্দিরের চূড়া খসিয়া গম্বুজ উঠিল। কোরাণের ভিত্তি অসিতে রাখিয়া ইস্‌লাম শক্তি, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিমথিত করিল, হিন্দুর দেবালয়ের দীপ নিভ-নিভ হইয়াও নিভিল না। ছয় শত বৎসরের বাদ-শাহী চাপ এ ধর্ম্মশাসন-তন্ত্র পিঠে করিয়া বহিয়াছে, কিন্তু পিঠ ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। দিনের পর যত দিন চলিয়া গিয়াছে, সোমনাথের সোনার বিগ্রহ স্বর্ণহীন হইয়াছে, অমৃতসর ও কাশীধামের দেব-মন্দিরে সোনার পাট, সোনার ঝালর খসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মূর্ত্তিহীন ধর্ম্মের প্রাণ আড়ষ্ট হয় নাই। আজ এই ইংরেজের যুগে সেই ধর্ম্ম-শাসন-তন্ত্র আমাদের জাতির প্রাণকে, জাতির জাতীয়তাকে, জাতির স্বাতন্ত্র্যকে অব্যাহতভাবে বহিয়া আনিয়া টিঁকিয়া আছে, এই ধর্ম্মের তরী পাহাড়-প্রমাণ ইস্‌লাম ঢেউ-এর ভিতর বাদসাহী আমলের স্বর্ণ-কুজ্ঝটিকার মধ্যে পথ না হারাইয়া জাতির ধ্রুব-তারা লক্ষ্য করিয়া এই মহা-সভ্যতার যুগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দৃশ্য বড় দেখা যায় না—তাই ইহা অনুপমেয়। কবিতায় পড়িয়াছি, "কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল?" সেই প্রাচীন জাতি, সে বেবিলন, সে কেল্ডিয়া, সে মিশর, সে কার্থেজ জল বুদ্‌বুদের মত ইতিহাস সমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে, ইহাদের কাহারও একবিন্দু রক্ত, আজ প্রাচীন বেবিলনকে বা মিশরকে আমাদের চক্ষে ধরিয়া দিতে পারিবে না, কারণ ইহারা বিশ্ব-মঞ্চ হইতে বহুদিন ঝরিয়া পড়িয়াছে। জাতির জীবন কোথায় তিষ্ঠিবে? সে 'সোনার তরী' ছিল না যে জাতি-জীবন বহন করিবে! ধর্ম্ম যদি না থাকিল, তবে কাহার উপর জাতীয় জীবনের ভিত্তি টিকিবে? তাই যেমনি মিশরের উপর রোমান সভ্যতার সঙ্ঘর্ষ বাধিল—হইল, অমনি নীলনদের জলে মিশর-রাজ-তন্ত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ডুবিয়া গেল। রাজ-তন্ত্রে যে জাতির ভিত্তি সে জাতি রাজ-তন্ত্র-অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই

অস্তমিত হয়। তাই মিশর অদৃশ্য হইল। কার্থেজের ইতিহাসেও সেই এক কথা। রোমান শক্তির ধাক্কা থাইয়া কার্থেজ সমুদ্র হইতে ব্যবসা গুটাইয়া দূরে সরিয়া গেল। কিন্তু জামার ( Zama ) যুদ্ধে রোমের সামরিক তরঙ্গে কার্থেজ ভাসিয়া গেল। ধর্ম্মতন্ত্র-হীন জাতি বিস্মৃতির অতল তলে তলাইয়া যাইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? সভ্যতার মুল্লুকে যে দুই জাতির স্থান এত উচ্চে, তাহাদের ইতিহাসে ইহার সত্যতা কি কম ফলিয়াছে! গ্রীস ও রোম ভারতবর্ষের প্রায় সম-সাময়িক দেশ। ভারতের মত অদৃষ্ট লইয়া, শুধু তাহারা কেন কেহই জন্মায় নাই—নাগপাশের এমন লৌহ-নিষ্পেষণ আর কোন জাতির ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি? তবে ঘটিবার সূত্রপাত হইয়াছে, এবং সূত্রপাতেই সে জাতির জীবন পর্য্যবসিত হইয়াছে।

গ্রীসের ধর্ম্ম-জীবন যে ছিল না, এমন নয়; ছিল, তবে রাষ্ট্রতন্ত্রেই জাতির জীবন ঠেকিয়াছিল। গ্রীস আত্মগরিমায় উদ্ভাসিত হইতে হইতে একদিন রোমের মুখোমুখি হইয়া বসিল। গ্রীস তখন সভ্যতার দীপ্তি লইয়া এসিয়া মাইনর হইতে রোমের উপকূল পর্য্যন্ত এক হেলেনিক নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে, ঠিক্ এমন সময় রণবীর রোম যোদ্ধৃ-সাজে আসিয়া গ্রীসের কর-কম্পন করিল। এই যুদ্ধেই গ্রীসের প্রাণান্ত হয়। সাহিত্য সেবী গ্রীস ললিত কলার প্রাণ লইয়া রোমের পায় লুটাইয়া পড়িল, বিলাস-বৈরী রোম, রণোন্মত্ত রোম এই প্রথম ললিত সাহিত্যের স্বাদ পাইল। ধর্ম্মহীন আচারভ্রষ্ট গ্রীক্ কাব্যের সুরার মত ফেনায়িত ফোয়ারা অসি-বর্ম্ম ছাপাইয়া রোমান হৃদয়কে কেমন নরম করিয়া দিল, এইখানেই রোম মৃত্যু শর কুড়াইয়া লইল। এই যুদ্ধের পরে গ্রীক্ জাতি সর্ব্বস্ব হারাইয়া রোমের মাঝে আত্ম-বিলোপ ঘটাইতে গেল, এবং সময়ের স্রোতে গ্রীস রোমের বিপুল কলেবরে চিরদিনের জন্য আত্ম-সমাধি লাভ করিল। এইখানেই জাতির মৃত্যু—এ মৃত্যু রোধ করিবার মৃত্যুঞ্জয়ী ধর্ম্ম বিলাসী গ্রীস কোথায় পাইবে? তারপর রোম, 'Conquerors are conqured গ্রীস মরিল, কিন্তু মরিবার ক্ষণে বিজেতার অঙ্গে বিলাসের শর ফুটাইয়া দিল। এই বিলাসের হুল জাতির জীবন উচ্ছৃঙ্খলার তরল জোয়ারে ভাসাইয়া দিল। যে রোম একদিন কলিসিয়ামের অঙ্গে প্রশস্তি রচনা করিয়াছিল, "When Rome shall perish world shall perish," সেই World-power রোম Barbarian-দের তুমুল তাণ্ডবে ঝড়ের মুখে একটা মরা গাছের মতই ভাঙ্গিয়া পড়িল। অসভ্যদের একটা সামান্য ধাক্কা বিশ্ব-বিজয়ী রোম সহিতে পারিল না। যে শক্তি পৃথিবীকে করতল-গত করিয়া বলিতে পারিয়াছিল, 'Civilised world is the prison-house of Rome. সে বিশ্ব-নায়ক রোম বর্ব্বর-সঙ্ঘর্ষে মাথা রাখিবার ঠাঁই খুজিয়া পাইল না। ইহাকেই বলে irony of fate. মানুষ যখন ভ্রষ্ট হয়, তখন এমনি করিয়াই পড়ে। Rome was not built in a day, কিন্তু সে রোম ধূলিসাৎ হইতে কতটুকু সময় লাগিয়াছিল? যে অসভ্যদল রোমের দুর্দ্দশা ঘটাইল, তাহাদেরই দূর জ্ঞাতি-গোত্র শক

হূণ প্রভৃতি জাতি ঠিক্ সেই সময়ে ভারতের বুকে চাপিয়া বসিতেছিল, বসিয়াও ছিল, কিন্তু ফলে ভারতের ধর্ম্ম-তন্ত্র ত অক্ষুণ্ণই রহিল, পরন্তু সেই আক্রমণের ফলে রাজপুত জাতি গড়িয়া উঠিল। প্রাচীন যুগের এই দুই শক্তি—গ্রীস ও রোম জল-বিম্বের মত মিলাইয়া গেল, শুধু ধর্ম্ম-তন্ত্রের অভাবে। ধর্ম্ম ঐ জাতির জীবনে Saving grace হইতে পারে নাই, তাই গ্রীস বা রোমান সভ্যতা gossamer-web এর মত অংশে-অংশে ছিন্ন হইয়া কালের যবনিকায় মিলাইয়া গিয়াছে। হিন্দুর যুগ নাই বটে, কিন্তু continuity of Hindu race আছে। রোমান বা গ্রীক্ যুগ নাই, সঙ্গে সঙ্গে Continuity of Greek and Roman races এরও অন্ত হইয়াছে।

এইখানেই দেখা গেল, যখনই দুই দেশের সঙ্ঘর্ষ হইয়াছে—Two schools of culture এর collision বাধিয়াছে, তখনই একটী জিতিয়াছে, অপরটির অস্তিত্ব-বিলোপ হইয়াছে। যেন বিজেতার অসি পরাজিতের জাতীয়তা ধ্বংশ করিবেই। ইহার কারণ ধর্ম্মের অভাব। তাই অত সহজে একটা জাতিকে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া দিতে পারা যায়। ক্লাসিক যুগের ভারতবর্ষ ও য়ুরোপীয় শক্তির আলোচনা হইল। মধ্যযুগের (Middle Ages) রণকর্ম্মী ইস্‌লাম ক্ষমতার পরিচয় একটু আবশ্যক। যে সময় আমরা বিন্-কাশিমকে সিন্ধুতীরে দেখি, সেই সময় ইস্‌লাম শক্তি ইউরোপের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মিশর, কার্থেজ, এসিয়া মাইনর জয় করিয়া ইস্‌লাম তখন স্পেনে ঢুকিয়াছে, অর্দ্ধ-পৃথিবীর ক্ষমতা তাহাদের অর্দ্ধচন্দ্রে ন্যস্ত হইল। গল বর্ত্তমান ফরাসী-জয়ে বিফল হইয়া এই ইস্‌লাম তরঙ্গ ইউরোপের নিম্নদিকে প্রবাহিত হইল। এই সময় তাহারা ভারতের মুকুট পাইয়া পৃথিবীর জগদীশ্বরো বা হইবার উপক্রম হইল। ইস্‌লাম খড়্গ যখন ইউরোপে প্রচার-কার্য্যে নিয়োজিত হইল, তখন চারিদিকে মুসলমান হইবার সাড়া পড়িয়া গেল। প্রায় সমগ্র স্পেন কোরাণ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল, বর্ত্তমান বল্‌কান কোণে ও বস্‌ফরাসের তীরে মুসলমান পতাকা উড়িল, কয়দিন পরে কন্‌স্তান্তিনোপলে St, S'ophice চার্চ্চেও Crescent, Cross ফেলিয়া উড়িবে তাহার আয়োজন চলিল, কিন্তু ভারতবর্ষে তুমুল প্লাবনের ভিতর অব্যাহত ক্ষমতার ভিতর মুসলমান কি করিল? যবনের ভয়ে রাজপুতানী অগ্নিশিখায় পুড়িল, ব্রাহ্মণ হিন্দুর সেরা রত্ন লইয়া গুহাকন্দরে লুকাইল, কোথাও ধর্ম্মের আসন ত টলিল না! ইতিহাসে লর্ড মানসিংহ কয়জন? মহাবৎ কয়জন? ভারত ইতিহাসের প্রতিচ্ছত্র প্রতাপসিংহ, রাজসিংহ, শিবাজী ও বাজীরাও দ্বারা গঠিত!

ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-ইতিহাসের ধারা এইরূপ; এই 'Divide and rule' রাজ্য ও ধর্ম্ম পৃথক করিয়া দুইজনের অধিনায়কত্বে থাকিয়া ভারতবর্ষ চলিয়া আসিয়াছে। ধর্ম্মরাজ্যে একচ্ছত্র সম্রাট একজন ছিল না—কিন্তু ব্রাহ্মণ-শক্তি উহার মুকুট-মণি ছিল। ইউরোপের পোপ এখানে ছিল না। এইবার ইস্‌লাম রাজ্যের একটা ছায়া ফুটাইয়া ধর্ম্মশাসনতন্ত্র বা থিওক্রেসি, খলিফার মস্‌নদে গড়িয়া উঠিয়াছে, দেখিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,

থিওক্রেসি এই তিন জাতির জীবনে ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। ইস্‌লাম-থিওক্রেসি 'ন ভূত ন ভবিষ্যতি' পৃথিবীর ইতিহাসে এ দৃশ্যের আর জোড়া মেলে না। মহম্মদ হইতে এই বিপুল মস্‌লেম-বাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে। মহম্মদ যখন উত্যক্ত হইয়া মেদিনায় তাঁহার প্রতিভার উদ্বোধন হইতে ইস্‌লাম ধর্ম্মের অবয়ব গড়িয়া তুলিতেছিলেন, তখন মক্কায় তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা ইহার জন্য ভ্রূক্ষেপও করে নাই। কিন্তু মহম্মদ অপরিসীম ক্ষমতায় দুইটী জিনিসের সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন, এক রাজ্য,অপর ধর্ম্ম। রাজ-তন্ত্র ও ধর্ম্মতন্ত্রের নায়ক তিনি একা। প্রতিভার বিভূতিতে এই মহা-পুরুষ একাধারে রাজা ও পোপ্ হইলেন। এতদিনে মক্কার উদ্ধার ঘনাইয়া আসিল। মহম্মদ তাঁহার অগ্নি-আঁখি মক্কার উপর ন্যস্ত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মেদিনার সেনা-বাহিনী আসিয়া সে অনলে ঘৃতাহুতি দিল, মক্কা-বিজয় হইল। ইহাকেই বলে, 'Truth has come and error has fled away. বৌদ্ধ-ইতিহাসে যেমন লঙ্কা-বিজয় দেখিয়াছি, এ মক্কা-বিজয় তার চেয়ে অনেক বেশী। এই মক্কা-পীঠে যে সোনার সিংহাসনে ইস্‌লাম-জন-গণ-নায়কের উদ্বোধন হইল, উহা ইতিহাসের পক্ষে এক মহা-মুহূর্ত্ত। মহম্মদের রাজ-পাঞ্জা ও ধর্ম্মমুকুট তাঁহার পর খলিফা আবু বকরের উপর ন্যস্ত হইল। মহম্মদ নিজের জীবনে যে জীবন্ত থিওক্রেসি গড়িয়া-ছিলেন, এইবার খলিফা-পরম্পরায় তাহারই রিহার্সেল চলিবে। ধর্ম্ম-তন্ত্র ও রাজ-তন্ত্র একের উপর স্থিত হইল। আধুনিক যুগে তুরস্কের সুলতান সেই থিওক্রেসির স্বর্ণ-সূত্র রাজ-পাঞ্জায় বাঁধিয়া মস্‌নদে বসিয়া-ছেন। থিওক্রেসির সোনার স্বপ্ন তাঁহার চতুর্দ্দিক্, রাজ্যের চতুষ্পার্শ্ব ঘেরিয়া রহিয়াছে, সেই সুদূর অতীতের স্বর্ণপিঞ্জরে বিশ্বের তরঙ্গ আঘাত করে নাই। আজ অশুভক্ষণে জর্ম্মণ-যুদ্ধের পরে য়ুরোপ যে 'দোদুল্ দোলায়' দুলিতেছে, তাহার একটা হাওয়া আসিয়া সে পিঞ্জরের গায়ে লাগিয়া গেল। Khalifat Conference করিয়া মুসলমান জাতিসঙ্ঘ য়ুরোপকে বুঝাইতে চাহিয়াছে এবং চাহিতেছে, ইস্‌লাম ধর্ম্ম-তন্ত্র সুলতানের রাজ-শক্তির সহিত বিজড়িত। যদি Peace Conference তুরস্ক-সুলতানকে প্যালেষ্টাইন, প্রভৃতি ধর্ম্ম-স্থানের অধিকার-বিমুক্ত করে, তবে ইস্‌লাম ধর্ম্ম-তন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং খসিয়া পড়িবে। ইস্‌লাম রাষ্ট্রে State and Church নাই, King ও Pope নাই, সেখানে এই দুইএর একত্র সম্মিলন—এই সম্মিলনে ইস্‌লাম শক্তির জন্ম। হিন্দু থিওক্রেসির যেভাবে অগ্নি-পরীক্ষা ( fire-ordeal ) হইয়াছে, সৌভাগ্য বশতঃ এই ইস্‌লাম থিওক্রেসির সেরূপ হয় নাই, তবে এই যুদ্ধ-সমুদ্রমন্থনে যে বিষ উদ্গীরিত হইয়াছে, তাহারই কাল-ফণা ইস্‌লাম-অঙ্গ ছাইয়া ফেলিতে বসিয়াছে। হিন্দুর পক্ষে যাহা ঘটিয়াছে, ইস্‌লাম ভাগ্যে তাহার অভিনয়ের সূত্রপাতেই আজ বিশ্বময় রাজতন্ত্রের জন্য ধর্ম্মনাশহেতু রোদনের স্বর বাজিয়াছে—য়ুরোপের প্রান্ত হইতে সুদূর ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত মোসলমান্ কণ্ঠে কি এক করুণ সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে! আমাদের প্রাণে কি সে অনুভূতি স্পর্শ করে না? কিন্তু এই বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়া অতীতের

দৃশ্যগুলি কি মুছিতে পারি? আজ এই মুহূর্ত্তেই সেই হিন্দু-মুসলমান-সঙ্ঘর্ষের চিত্রগুলি ইতিহাসের বুক হইতে সজাগ হইয়া কি এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যে আমাদের চক্ষু ধাঁধিয়া দিতেছে! সুল্‌তান্ মামুদের সোমনাথ আক্রমণ ও ঘোরীর ভারতাধিকার হইতে ঔরঙ্গ-জীবের 'জীবে-দয়া' নামক সেই প্রচণ্ড জীব-শাস্তি পর্য্যন্ত ভাবিয়া লইতে আমাদের সমস্ত শরীরে এক তড়িৎ-তরঙ্গ খেলিয়া যায়। শুধু ভাবি যখন হিন্দুর থিওক্রেসির ভিত্তি—সোমনাথ, মথুরা, কাশী, অমৃতসর, মামুদ ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজ্য-জয়ীর হাতে ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়াছিল, তখন যদি হিন্দুরা এক Conference করিয়া Deputation পাঠাইত 'ওগো আমাদের পৃথ্বিরাজকে মারিও না, আমাদের ধর্ম্ম কে রাখিবে? রাজ্য জয় করিও না, তবে আমাদের ধর্ম্ম টিঁকিবে না?' বিজয়ীর শিবিরে এ লিপির পাঠ কেমন শুনাইত? আজিকার বিংশ শতাব্দীতে ইহার দাবী-দাওয়া লইয়া প্রশ্ন উঠিতে পারে, কিন্তু তখন? তাই বলিয়াছি, অগ্নি-পরীক্ষার দিনে হিন্দুর ধর্ম্ম-শাসন-তন্ত্র আশ্চর্য্যরূপে বাঁচিয়া গেল, এই মৃত্যুঞ্জয় শক্তির কারণ জাতির জীবন রাজ-তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। হিন্দুর থিওক্রেসি, হিন্দুর রাজা নহে, রাজ্য নহে, ধর্ম্মের জয়-জয়ন্তী রাগিণী। এই পরীক্ষার এক তিল হইতেই গ্রীস্ মরিয়া গেল, রোম টিঁকিতে পারিল না, প্রাচীন যুগের প্রাচীন জাতি অতীতের বুকে স্পন্দন হারাইয়া ইতিহাসের চিত্রশালায় চিত্ররূপে পর্য্যবসিত হইল।

এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা প্রয়োজন। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বুদ্ধদেব রাজপুত্র, রাজার হালে থাকিয়া তাঁহার মনে তিনি সুখ পান্ নাই। তাই তিনি রাজ্য ছাড়িলেন, গৈরিক সাজে বিভূষিত হইয়া তাঁহার দিন বনগহনের অভ্যন্তরে কাটাইতে লাগিলেন। এই সর্ব্বত্যাগ-শীল সংসার-বৈরাগ্যের বেলাভূমে তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের রত্ন-প্রবাল কুড়াইয়া পাইলেন। ইস্‌লাম-প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ সামান্য অবস্থার লোক, আপন প্রতিভা-বলে তিনি রাজপাটে অধিষ্ঠান লাভ করিয়াছিলেন, রাজা হইয়া সেনানীর অস্ত্র বা বর্শাফলকের মুখে তিনি ধর্ম্ম রাখিয়া দেশ-বিদেশের উপর তাহার তরঙ্গ প্রবাহিত করিলেন। তরবারি-ঝঙ্কারে ধর্ম্মের নাম-গান বাজিয়া উঠিল 'রঞ্জিত করিয়া 'রক্তে রক্তে কোলাকুলি হয়' কত জাতির সহিত ইস্‌লামের কোলাকুলি হইয়াছে! আর বৌদ্ধ-ধর্ম্ম? বুদ্ধদেব রাজার ছেলে ছিলেন, ইচ্ছা করিলে তাঁহার ধর্ম্ম শাক্য-সেনানীর bayonetএর উপর ন্যস্ত করিয়া অতি অনায়াসে হিন্দুরাজ্যের ও ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম-শাসন-তন্ত্রের উপর চালাইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার মনের ধাত অন্যরূপ। তিনি সর্ব্ব-ত্যাগশীলতার বীজমন্ত্র রাজ তখ্‌ত তাউসে বসিয়া আওড়াইতে পারেন নাই—বোধিদ্রুমের নিম্নে ধূলিকঙ্কর-শয্যায়ই তাঁহার নন্দন-কানন ছিল। বড় শক্তিতে তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিতে গেলেন, এবং যে চীনদেশে হিন্দু রাষ্ট্র-শক্তি প্রবেশাধিকার পায় নাই, সেই দেশে এবং জাপানে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম একবিন্দু রক্তপাত না করিয়া, একটী তরবারির ঝঙ্কার না তুলিয়া, বিজয়ীর মত প্রবেশ করিল এবং আজ পর্য্যন্তও তথায় সগৌরবে রহিয়া গিয়াছে।

ইস্‌লাম ধর্ম্মের মূলে রাজ-শক্তির পূর্ণ-বিকাশ, মহম্মদ শুধু ধর্ম্ম গড়িতেই যান নাই; জাতি গড়িতেও প্রয়াস পাইয়াছিলেন। নানকের Sikhion-এর মত ইস্‌লাম শক্তিও এক অর্থে বলিতে গেলে, Political religion. মহম্মদের উপর শুধু ধর্ম্ম-গঠনের ভার পড়ে নাই, পরন্তু জাতি-সৃষ্টিরও ভার ছিল, এমন অতুল প্রতিভাবান্ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা যায় না। হিন্দুসভ্যতায় রাজ-তন্ত্র ও ধর্ম্মতন্ত্রের সম্মিলন দেখিয়াছি, ইস্‌লাম সভ্যতায় এই দুইএর একীকরণ প্রত্যক্ষ করিলাম, কিন্তু য়ুরোপীয় Cosmopolitan সভ্যতায় ইহাদের তালবেতাল নৃত্য যেরূপ পরিদৃষ্ট হয়, তেমনটী বুঝি জগৎ-সংসারে আর দেখা যায় না! মহাপুরুষ খ্রীষ্টের ধর্ম্ম এক মহা-ত্যাগের ধর্ম্ম, কিন্তু যে দেশে এ ধর্ম্মের প্রচার হইল, সেখানে এক কড়া-ক্রান্তি লইয়া Hundred years' war শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলিতে পারে। এমন যুদ্ধের ঝক্‌মারী লইয়া কোন্ দেশ জমিয়াছে? সে দেশ ধর্ম্ম-তন্ত্র, রাজতন্ত্র হইতে ভিন্ন হইয়া গঠিত হইল। State and Church য়ুরোপের প্রারম্ভ হইতেই ভিন্নরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে, হিন্দুর পীঠস্থান যেমন কাশী, চর্চ্চের পিঠস্থান তেমনি রোম্। এই রোম্ নগরে ধর্ম্ম-তন্ত্র-নায়ক পোপের রাজধানী, তাঁহার অধীনে বিশপ, আর্কবিশপ ইত্যাদি বহুপদের সৃষ্টি হইয়াছে—তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ জন্য Papal army পর্য্যন্ত রহিয়াছে। য়ুরোপীয় রাজ্যে তাঁহার অপ্রতিভ প্রভাব। পোপ লিও এক মহা কবিত্ব লইয়া Holy Roman Empire গড়িয়া তুলিলেন। রোম-সাম্রাজ্য যদিও চলিয়া গিয়াছে, তাহারই 'পুনরানয়ন' হইল, জার্ম্মাণীর উপর রাষ্ট্রতন্ত্র ন্যস্ত হইল, আর পোপ হইলেন, সে রাজ্যের কর্ণধার। Voltaire ঠাট্টা করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন, 'Neither holy, nor Roman, nor an Empire. প্রত্যুত তাহাই, holiness কোথায়? পোপের ইহা একটা চাল, আত্ম-সম্মানের এই এক পন্থা। তারপর রোমান্—সে রোম ত কবেই ধ্বংসের মুখে ভস্ম হইয়া গিয়াছে, এবং সে সাম্রাজ্য সে জগদ্ব্যাপী প্রভুত্বের নিশান জর্ম্মাণি কোথায় পাইবে? তবুও মধ্যযুগের ইতিহাসে পোপের প্রভুত্বের ভিতর এই অতীতের স্মৃতি-সাহায্যে পেলব কবিত্ব কি উপভোগ্য নহে! সাম্রাজ্য-সৃষ্টির (maker of Holy empire) দাবী পোপ্ গ্রেগরী বড় গলা করিয়া জানাইতে যাইয়া, রাজা হেন্‌রীর ক্রোধানল উদ্দীপ্ত করেন, কিন্তু পোপ্ যে ভগবানের প্রতিনিধি—পোপ যে Ruler of Theocracy—এ ধারণায় তিনি গ্রেগরীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে যাইয়া তিন দিন বরফের উপর অবাধ্যতার প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তার পর হেন্‌রি পোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধই Church এবং Stateকে সকল দেশে নাচাইয়া তুলিল। যে পোপ রাজার মাথায় সোনার মুকুট পরাইল, সে পোপ মুকুট কাড়িবার বিশাল আয়োজন করিল—এই ধ্বস্তাধ্বস্তিতে রাজ্য ও ধর্ম্মের কোন্দল বাধিয়া গেল, Holy Empireএর কাচের ঘর ভাঙ্গিয়া খান্ খান্ প্রায়। এক নিমেষে সোনার কবিত্ব ভস্মে পরিণত হইয়া গেল। এই ঘর-পোড়া বিবাদের অগ্নি সহজে নিভিল না; Reformationএর যুগে মার্টিন লুথার সে

আগুনে ফুঁ দিয়া দেশে দেশে সেই অগ্নিকণা ছড়াইয়া দিলেন। Thirty years' warএর ভয়াবহ রণানলে সমস্ত য়ুরোপে এক হুবহু লঙ্কা-কাণ্ড হইয়া গেল, এই দগ্ধ য়ুরোপের পরিচয় নূতন করিয়া বলায় লাভ নাই। আধুনিক ধর্ম্মতন্ত্র কি, অনেকেই তা জানেন; পোপ্ যে ধীরে ধীরে একটা ছায়ায় যাইয়া আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাও সকলে জানেন। রাজ-তরঙ্গের বজ্রময় চাপে পোপের ক্ষমতা কতটুকু টিকিবে? 'ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙ্গে দুধারে' রাজ্যতরঙ্গের উত্তাল আলোড়নে ক্ষুদ্র ধর্ম্মের বীচি-মালা কাটিয়া দুভাগ হইয়া পড়িতেছে, না হইয়া করে কি?

শ্রীভুপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

# ভারতের আশঙ্কা ও ভাবী পরিণাম

( ফরাসী হইতে )

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, ইংলণ্ডের প্রভাব বশেই ভারত একতা লাভ করিবে।

প্রথমতঃ ভারত ইংলণ্ডের অধিকার-ভুক্ত; অন্য জাতি অপেক্ষা ইংলণ্ড রাজ্য-শাসনের উপযোগী কতকগুলি গুণের পরিচয় দিয়াছে। ইংলণ্ড এরূপ ধনশালী যে একাকীই ভারতের মূলধন যোগাইতে সমর্থ; ইংলণ্ডের সামুদ্রিক প্রভুত্ব, সাম্রাজ্যের বিস্তার, এবং এই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা,—ইহাই ভারতকে একেবারে ইংরাজী করিয়া তুলিবার চেষ্টা না করিয়া, তাহাকে বজায় রাখিতে ইংলণ্ডকে সমর্থ করিয়াছে।

তাহার পর, অন্য কোন রাষ্ট্রজাতির ভারত জয় করিবার ইচ্ছা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই উচ্চাভিলাষ রুশিয়ার থাকিতে পারে। কিন্তু যদি কেহ এই প্রশ্নটি ভাল করিয়া আলোচনা করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন এই কঠিন বিজয়-সাধনে রুশিয়ার কোন লাভ নাই।

ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশ পৃথিবীর মধ্যে আর একটিও নাই, এবং রুশিয়ার কারখানায় এমন কোন জিনিস প্রস্তুত হয় না যাহা রুশিয়া ভারতে পাঠাইতে পারে। ইংলণ্ডের সহিত দুঃসাধ্য যুদ্ধে বিপদাপন্ন না হইয়া রুশিয়া, চীন-তুর্কিস্থান, মোঙ্গোলিয়া, চীনের উত্তরাংশ, আর্মিনিয়া, এসিয়া-মাইনরের অধিকাংশ, ও পারস্যের উত্তর-ভাগ আপন অধিকারভুক্ত করিয়া লইতে পারে। এই সকল দেশের যেরূপ ভৌগোলিক সংস্থান তাহাতে উহারা রুশিয়ার প্রভাব-মণ্ডলের মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং ঐ সকল দেশের লোকও রুশসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত লোকদিগের সঙ্গে অনায়াসেই মিশিয়া যাইতে পারে।

স্পেন, ইটালী ও গ্রীশ যেরূপ য়ুরোপ

হইতে পৃথক্ সেইরূপ ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান, অবশিষ্ট এসিয়া হইতে স্পষ্টরূপে পৃথক। তা ছাড়া ভারতীয় সভ্যতার এমন একটা নিজস্ব আছে যে ভারত এখনো অনেক দিন ঐ সভ্যতাকে বজায় রাখিবে; রুশের সভ্যতার সহিত কখনই মিশিয়া যাইবে না। ভারত কোন দূরদেশের উপনিবেশরাজ্য হইতে পারে কিন্তু কোন মহাদেশস্থ সাম্রাজ্যের অংশ হইতে পারে না! ভারতের সমস্ত ইতিহাসে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরিশেষে বক্তব্য, ভারত ইংরাজের নিকট হইতে এমন একটা উদারনৈতিক শাসনতন্ত্র পাইয়াছে যাহা রুশিয়ার স্বেচ্ছাশাসনতন্ত্রের বিপরীত। এই স্বেচ্ছাতন্ত্রিক পদ্ধতি যথাবর-এসিয়া ও মুসলমান-এসিয়ার বিজয়সাধনের জন্য রুশিয়ার আবশ্যক। রুশিয়া ভারতে আসিলে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ও সভা-সমিতির অধিবেশনের অধিকার রুশিয়া হরণ করিবে। ন্যাশানাল কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে জানা যায়, ভারতকে এই জনসম্মিলনের অধিকার কতটা প্রদত্ত হইয়াছে। উহারা ব্যবস্থাপক সভা হইতে ভারতবাসীকে কি বহিষ্কৃত করিবে? নব-বিজিত সাম্রাজ্যের বন্ধন তাহা হইলে অদ্ভুত ধরণের হইবে সন্দেহ নাই। অথবা, রুশ-সরকার ফিনল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ডবাসীকে যাহা দেয় নাই তাহা কি ভারতবাসীকে দিবে? ভারত এতটা ভারতভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে এবং ইহার মধ্যেই এতটা ইংরেজী-ধরণের হইয়া পড়িয়াছে যে রুশিয়া তাহাকে আত্মসাৎ করিবার কোন ঔৎসুক্য অনুভব করিবে না। তাহা ছাড়া, হিন্দুদিগকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়া—(যে স্বাধীনতা বহুকাল পর্য্যন্ত রুশেরা আশাও করে না) ব্রিটিশ-সরকার ভারত ও রুশিয়ার মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর উঠাইতে পারেন।

শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন হইলে ভারতের উন্নতির সুযোগ আবার শতাব্দী পিছাইয়া পড়িবে। ভারত-শাসিক ভারতীয় ইংরাজেরা ভারতকে ভাল করিয়া জানে; ভারতের ভাষা, ভারতের বিধি-ব্যবস্থা ও রীতিনীতি সম্যক্‌রূপে অবগত আছে। ইংলণ্ডের ইংরাজেরাও ভারতীয় সমস্যাগুলা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে শতসহস্র ভারতবাসী ইংরাজী বলিতে শিখিয়াছে, কয়েক সহস্র ভারতবাসী অবলীলাক্রমে ইংরাজী লিখিয়া থাকে, ইংরাজী সভ্যতা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ত্রিশ কোটি লোকের শাসনের জন্য রুশিয়া কত দিনে কর্ম্মচারী তৈয়ারী করিয়া তুলিতে পারিবে? রুশ ভাষা শিক্ষা করিবার পূর্ব্বেই, রুশ সভ্যতা আত্মসাৎ করিবার পূর্ব্বেই, ভারতবাসীরা কি সম্পূর্ণরূপে ইংরাজী সভ্যতা আত্মসাৎ করিবে না?

এখন কেবল রাজকোষ-সম্বন্ধীয় প্রশ্নের আলোচনা বাকী রহিয়াছে। রুশিয়া—যাহার সাম্রাজ্যভুক্ত ভূমির উৎকর্ষ সাধনের জন্য বৈদেশিক মূলধনের প্রয়োজন,—সেই রুশিয়া কেমন করিয়া ভারত-কৃত ইংলণ্ডের ধার পরিশোধ করিবে, এবং বর্ত্তমান ধনবিভ্রাট হইতে উদ্ধার হইবার জন্য এখনো ভারতের যে লক্ষ লক্ষ টাকা দরকার, সেই টাকা অগ্রিম হিসাবে ভারতকে দিয়া রুশিয়া কেমন করিয়া সাহায্য করিবে?

যদি কখন ইংলণ্ড ও রুশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ

বাধে, ভারত তাহার মূলকারণ হইবে না, পারস্যই তাহার মূলকারণ হইবে। ভারত-বিজয়ে রুশিয়ার কোন লাভ নাই কিন্তু পারস্য উপসাগর দিয়া বাণিজ্যের মুক্ত পথ রাখায় তাহার লাভ আছে।

কিন্তু, পারস্য রুশ-সাম্রাজ্যের সম্ভুক্ত হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে সমূহ বিপদ। য়ুরোপীয় বা এসিয়া সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন লইয়া এই দুই রাজশক্তির মধ্যে যুদ্ধ বাধিতে পারে :—যদি যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে, স্থায়ী জয়লাভের জন্য নহে, পরন্তু লুটপাট করিবার জন্য শান্তি স্থাপন হওয়া পর্য্যন্ত ভারতকে প্রতিভূ রাখিবার উদ্দেশে রুষিয়া ভারত আক্রমণ করিতে পারে। কিন্তু এই বিপদের আশঙ্কা বড় একটা নাই, কারণ রুশ-সৈন্য রেলপথ-যোগে মের্‌ভে আসিলেও আফগানিস্থানের গিরি-সঙ্কট লঙ্ঘন করিয়া ভারতে আসা তাহার পক্ষে সহজ হইবে না। তবে যদি রুশিয়া পারস্যদেশে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং উদ্যোগারম্ভের দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত আশ্রয়স্থান সমন্বিত উত্তরভাগের সৈন্যকে যদি দক্ষিণাংশের সৈন্য সাহায্য করে, আর যদি কামানের আড়ালে রুশীয় যুদ্ধজাহাজের বহর থাকে, তাহা হইলে একদিনের কম সময়ের মধ্যে রুষ-সৈন্য করাচি আক্রমণ কিংবা বোম্বায়ের উপর কামানের গোলা বর্ষণ করিতে পারে।

সুতরাং পারস্য-উপসাগরে রুশীয়গণ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইংরাজেরা রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার যথেষ্ট হেতু আছে বলিয়া বিবেচনা করিবে না কি ?

২২ শে জানুয়ারী ১৯০২ খৃষ্টাব্দে Lord Cranborne পারস্য-সমস্যা সম্বন্ধে পার্লেমেণ্ট সভায় জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অতীব ন্যায়সঙ্গত :—

"তথাপি একটা বড় কথা আছে, তাহা ভুলিলে চলিবে না। এসিয়ায় আমরা একমাত্র রাজশক্তি নহি। যাহাদের প্রভূত ধন সম্বল, অপরিসীম বীর্য্য, রাজ্যপরিচালনের প্রভূত শক্তি আছে—এরূপ আরও অনেক রাষ্ট্র সভ্য-জগতে বিদ্যমান; তাহারা অবিরত তাহাদের স্বার্থের উন্নতি চেষ্টা করিতেছে। এই সকল দেশের সহিত ইংলণ্ডের যেরূপ সম্বন্ধ তাহার কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক।"

এই কথাটা খুব ন্যায়সঙ্গত কিন্তু ইহাও যেন একটু কম করিয়া বলা হইয়াছে। এক্ষণে আফ্রিকায় য়ুরোপীয় রাজশক্তিগণ পরস্পরের প্রতিবেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিংশতি শতাব্দী, এই অবস্থা এশিয়াতেও অবলোকন করিবে। যুদ্ধ নিবারণ করা দূরে থাক, মধ্যবর্ত্তী রাষ্ট্রগুলা আরও শীঘ্র যুদ্ধ বাধাইয়া দিবে। কারণ যে-উভয় রাষ্ট্র পরস্পর হইতে পৃথক, তাহারা অবিরাম স্বকীয় প্রভাববিস্তারে সচেষ্ট। য়ুরোপের সকল রাজমন্ত্রীই বলিয়া থাকেন যে, এসিয়াতে তাঁহারা বর্ত্তমান অবস্থা বজায় রাখিবেন। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা বজায় রাখা অসম্ভব। চীন, পারস্য, তুর্কী, শ্যাম কেবল য়ুরোপের অনুগ্রহে বা সাহায্যে বাঁচিয়া আছে। ত্বরায় বা বিলম্বে এই সকল রাষ্ট্র হয় ছিন্নাঙ্গ হইয়া পড়িবে, নয় গৃহ-বিবাদে ছিন্নভিন্ন হইয়া বিভিন্ন সুসভ্য রাজশক্তির আশ্রয়ে আপনাদিগকে স্থাপন করিবে। এসিয়াতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কতকগুলি প্রতিবেশী হইবে এবং ভারতসমুদ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী রণতরীর বহর প্রতিষ্ঠিত হইবে। হয়ত এই

অবস্থা মানিয়া লওয়াই ইংলণ্ডের পক্ষে বিহিত এবং প্রতিবেশীদিগের রাজ্যবিস্তারে বাধা না দিয়া নিজে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করাই বুদ্ধির কাজ।

*
* *

অতএব ভারত ইংলণ্ডের হস্তচ্যুত হওয়া সম্ভব নহে, কিন্তু এরূপ হইতে পারে না কি যে, ইংলণ্ড স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভারতকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে?

যদি ভারতের এতটা উন্নতি হয় যে নিছক ভারতবাসীর দ্বারাই শাসন-কার্য্য চলিতে পারে, তুলার কারখানা-শিল্পে ল্যাঙ্কেসিয়ারের কারখানার সহিত ভারত প্রতিযোগিতা করিতে পারে, উচ্চহারের শুল্ক বসাইয়া ব্রিটিশ পণ্যকে আঘাত করিতে পারে, তাহা হইলে, ইংলণ্ড তাহার বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতিকে কি ভারতের প্রভাবাধীনে স্থাপন করিতে বাধ্য হইবে না?

উদারনৈতিকেরা অনেকবার বলিয়াছেন "ভারত ভারতবাসীর জন্য"; কিন্তু যে-প্রভূত মূলধন ভারতে খাটিতেছে, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে অপরিসীম মান-সম্ভ্রম রহিয়াছে, তাহাতে করিয়া এই উদার রাষ্ট্রনীতি কার্য্যত প্রয়োগ করা কথনই ঘটিবে না।

অতএব যতদিন না ভারতে একটা ইঙ্গ-ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে, অথবা স্বাধীন স্বরাজের হিসাবে কিংবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তরঙ্গ মিত্ররাজ্যের হিসাবে, যতদিন না ভারত আত্ম-শাসনে সমর্থ হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত সুদূর কাল পর্য্যন্ত ভারত ইংরাজেরই থাকিবে।

কিন্তু ভারতের সমুন্নতি ন্যূনাধিক দ্রুতভাবেও হইতে পারে। সম্ভবত ভারত মূলসাম্রাজ্যের অনুগত সমৃদ্ধিশালী প্রভাবান্বিত উপনিবেশরাজ্য হইবে; অথবা দরিদ্র, উৎপীড়িত, অসন্তুষ্ট অধীন রাজ্যরূপেই থাকিয়া যাইবে। ভারতের শেষোক্ত অবস্থা ইংলণ্ডের সহায় হইবে না, বরং ইংলণ্ডের পক্ষে বিপদ হইয়া দাঁড়াইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* অধুনা ভারতের সীমান্ত প্রদেশ সুরক্ষিত নহে। পেশোয়ারের গিরিসঙ্কট রক্ষা করিবার তেমন সঙ্কল্প নাই; কেবল গিরিমালায় এদিকে অবস্থিত রওয়ালপিণ্ডির দুর্গবদ্ধ ছাউনী কিয়ৎকালের জন্য আক্রমণকারীদিগের গতিরোধ করিবে। হেরাটে গিয়া শত্রুর পশ্চাৎ ও পার্শ্বভাগ আক্রমণ করিবার জন্য ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্য কান্দাহের পিছনে সমবেত হইবে। এই সৈন্যদের খাদ্য ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম যোগাইবার জন্য সিন্ধুনদীর মুখে অবস্থিত করাচীতে জাহাজের বহর ঐ সকল মাল নামাইয়া দিবে। কিন্তু রুশিয়ার ন্যায় সুবন্দোবস্ত বিশিষ্ট শত্রুর বিরুদ্ধে এইরূপ যুদ্ধযাত্রা করাও দুঃসাহসের কথা।

ইহার বিপরীতে, যদি সীমান্তপ্রদেশের গিরিমালাকে দুর্গবদ্ধ করা হয়, যদি রেলপথ আরও বিস্তৃত করা হয়, তাহা হইলে ভারতের সীমান্তপ্রদেশ রুশ সৈন্যের পক্ষে অলঙ্ঘনীয় হইবে। তিনলক্ষ ইঙ্গভারতীয় সৈন্যের প্রতিকূলে, একলক্ষ রুশীয় সৈন্যের যুদ্ধ করা কঠিন ব্যাপার; রুশ সৈন্য আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। উহারা ধনাভাবে এই সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া পিছাইয়া যাইবে। অবশ্য ইংরাজরা এই যুদ্ধের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য দরিদ্র ভারতের নিকট হইতে বেশী টাকা আদায় করিতে পারিবে না; এই ব্যয়ভার ইংলণ্ড নিজের স্কন্ধেই লইতে পারে। ভারতকে রক্ষা করিবার জন্য দুইচারি লক্ষ টাকা ব্যয় করা ইংলণ্ডের পক্ষে অপব্যয় নহে।

# কাল-বৈশাখী

## এগারো

### শ্রীর কথা

আমার কপাল পুড়েছে গো, আমার কপাল পুড়েছে! এতদিন অষ্টপ্রহর যে ভয় করতুম, তাই আজ ফলে' গেল!

কিন্তু আমার স্বামী যে এতটা এগুতে পারেন, এমন সন্দেহ ত কোনদিন আমি মনের কোণেও ঠাঁই দিই-নি! আমি ভাবতুম, মন ওঁর চঞ্চল হ'লেও আমাকে উনি ভালোবাসেন! কিন্তু ওঁর ভালোবাসা যে আমাকে ভুলিয়ে রাখ্‌বার জন্যে, এ কে জান্‌ত বল!

এত দিন, এত বছর একসঙ্গে বাস করলুম, নিজের স্বামীকে তবু চিন্‌তে পারিনি! সখীদের কাছে কতবার গর্ব্ব করে' বলেছি, 'আমার স্বামীর মত স্বামী আর কারুর হবে না!' হা রে অদৃষ্ট, আমার গর্ব্ব কি এম্‌নি করে'ই ভেঙে দিতে হয়!

কিন্তু না, স্বামী বোধহয় আমাকে ভালো বাস্‌তেন!...ঠাকুরপোর ঐ পোড়ারমুখী প্রভাই হয়ত নিজের মুখ পুড়িয়ে আবার আমার কপাল পোড়াতে বসেছে! মনে পড়ে, একদিন ওঁকে আমি বলেছিলুম, 'আগুনের কাছে থাক্‌লে ঘি না গলে' থাক্‌তে পারে না,'—সেদিন আমার কথা উনি হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন, অথচ আমার সেই কথাই আজ সত্যি হ'ল! যে-সব মেয়ে মুখে ঘোম্‌টা দেয় না, দশজনের বুকের উপর দিয়ে জুতো পরে' পথ হাঁটে, পরপুরুষের সঙ্গে অনায়াসে হাসে, গায়, গল্প করে, তারা মেয়ে নয়, তারা ডাইনি, তারা মায়া জানে—তাদের পাল্লায় পড়্‌লে পুরুষের সাধ্যি কি ঠিক থাক্‌তে পারে! পুরুষের পল্‌কা মন, একটুতেই নুয়ে পড়ে যে! রামায়ণ-মহাভারতে পড়েছি, ডাইনির মায়ায় কত বুড়ো বুড়ো মুনি-ঋষিরও আজন্ম-তপস্যা মিছে হয়ে গেছে, আর আমার স্বামী ত সামান্য মানুষ, তাঁকে ভোলানো ত খুবই সহজ!

হ্যাঁগো, বুঝেছি, বুঝেছি—এ-সব ডাইনির মায়া, নিশ্চয় ওষুধ খাইয়ে আমার স্বামীকে ও-ছুঁড়ী বশ করেছে—নইলে এত সহজে আমার ভালোবাসা ভুলে যান! আমার স্বামী যে মাটির মানুষ, মহাদেবের মত ওঁর সরল প্রাণ, ছেলেবেলায় শিব-পূজো করে' শিবকেই আমি যে স্বামীরূপে পেয়েছি—ওঁর ত কিছু দোষ নেই! ঐ প্রভাই যত নষ্টের গোড়া, আমার এমন স্বামীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ও-কিনা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়! এ কথা মনে কর্‌লেও বুক কেঁপে ওঠে,—আমি ত কিছুতেই ওঁকে ছাড়্‌ব না, ওঁর পায়ের তলায় মাটি আঁকড়ে আমি মুখ গুঁজে পড়ে থাক্‌ব, ডাইনির গ্রাস থেকে জোর করে' ওঁকে ছিনিয়ে আন্‌ব—আমার স্বামীকে আবার আমার কর্‌ব! স্বামীর যাতে অধর্ম্ম না হয়, কায়মনোবাক্যে স্ত্রীর ত তাই করা কর্ত্তব্য, স্ত্রী ত শুধু স্বামীর খেলার পুতুল নয়—স্ত্রী যে স্বামীর ধর্ম্মপথের সঙ্গী!

হে মা দুর্গা, আমার দিকে মুখ তুলে

চেয়ে দেখ, আমার মনে জোর দাও, আমি যেন স্বামীর মতি-গতি আবার ফেরাতে পারি, আমার শিব-পূজো যেন মিথ্যে হয় না, আমার স্বামী যেন কু-পথে না যান!

সাবিত্রী যমের মুখ থেকে সত্যবানকে কেড়ে এনেছিলেন, আর আমি কি এই কাজটাও করতে পার্‌ব না? কেন পারব না —স্বামী আমার ধ্যান-জ্ঞান, স্বামী আমার প্রাণ—তাঁকে বৈ আমি ত আর কারুকে জানিনা চিনিনা, আগে তাঁর নাম না নিয়ে আমি যে সন্ধ্যা-আহ্নিক পর্য্যন্ত করি না! এ আমি পার্‌ব পার্‌ব পার্‌ব—স্বামীকে আবার আমি সুপথে আন্‌তে পার্‌ব—এও যদি না পারি তবে এ মিছে জীবন আর রাখব না, আমি মর্‌ব—বিষ খেয়ে মর্‌ব!

ঠাকুরপো ঠিক কথাই বলেছেন, আমি যে সমস্ত দেখেছি জেনেছি, এ কথা ওঁকে জান্‌তে দেওয়া হবে না! ডাইনির মায়ায় এখন উনি পাগল হয়ে গেছেন, ওঁকে লজ্জা দিলে এখনি উনি বেঁকে দাঁড়াতে পারেন! তার চেয়ে কিছু না-বলাই ভালো। আগে ওঁর মনটা ঠিক ক'রে বুঝি, তারপর ঠাকুরপো কি উপায় করেন দেখি, তারপর সব দিক বুঝেসুঝে যা করা উচিত, তাই কর্‌ব।......

সেদিন ঠাকুরপো যখন চলে' গেলেন, একা বসে বসে এই-সব কথা আমি ভাবতে লাগ্‌লুম।

হঠাৎ শুন্‌লুম, নীচে থেকে স্বামী ডাক্‌ছেন, "শ্রী! শ্রী!"

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালুম। ছাদের দরজার কাছে গিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখলুম, ও-বাড়ীর নির্জ্জন ছাদে প্রভা তখনো একলা উপুড় হয়ে পড়ে আছে! ও পোড়ারমুখী অমন করে' শুয়ে আছে কেন? ঘুমুচ্ছে বুঝি?

ও ছুঁড়ী হতচ্ছাড়ীকে দেখে আমার মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠ্‌ল। ইচ্ছে হ'ল, এখনি ছাদের আল্‌সের কাছে ছুটে গিয়ে ওকে ডেকে বলি, তোর ও-কালা মুখ আর কারুকে দেখাস্‌নে লো, দেখাস্‌-নে, তুই মর্‌লে বাসুকীর মাথার ভার কমে যাবে, নরকেও তোর ঠাঁই নেই!

নীচে থেকে আবার ডাক এল, "শ্রী! শ্রী! তুমি কোথায়?"

নীচে নেমে এলুম। কিন্তু স্বামীর কাছে যেতে পা যেন উঠছিল না—যে ভয়ানক দৃশ্য দেখেছি, এখনো আমার সমস্ত প্রাণ আড়ষ্ট হয়ে আছে, কি-করে' সব লুকিয়ে সহজ মানুষের মত আবার ওঁর সঙ্গে কথা কইব! স্বামীর সঙ্গে ত এমন লুকোচুরি করা কোনদিন আমার অভ্যাস নেই। মনে এক মুখে আর, এ ত' কোনদিন শিখিনি!

—"শ্রী, এত ডাক্‌চি তবু সাড়া দিচ্চ না কেন?"

—"এই যে, যাচ্চি" বলে মনের সব ইতস্তত ঘুচিয়ে আমি ঘরে ঢুকে পড়্‌লুম।

স্বামী বিছানায় শুয়েছিলেন, আমাকে দেখে বল্‌লেন, "বড় তেষ্টা পেয়েছে, এক গেলাস জল দাও।"

কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম।

স্বামী আস্তে আস্তে উঠে আমার হাত থেকে জলের গেলাসটা নিলেন। তারপর গেলাসটা হাতে করে', জল না খেয়েই আমার

মুখের পানে একদৃষ্টিতে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। আমি কিন্তু তাঁর দিকে তাকাতে পারলুম না, চুপ করে' মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।... ... ...

হঠাৎ সেই জলসুদ্ধ গেলাসটা স্বামীর হাত খসে মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল! আমি চম্‌কে মুখ তুল্‌তে না তুল্‌তেই, আচম্বিতে স্বামী আমাকে দুহাতে টেনে-নিয়ে একেবারে তাঁর বুকের মধ্যে চেপে ধর্‌লেন!......সে কী নিবিড় আলিঙ্গন, মনে হ'ল এমন করে' আর-কখনো আমাকে তিনি তাঁর বুকে ঠাঁই দেন নি! তাঁর এই গভীর প্রেমের আবেগে আমার প্রাণের ভিতরটা যেন উথ্‌লে উঠ্‌ল, কোথা থেকে অশ্রু এসে দু-চোখ আমার ভরে দিলে, তাঁর বুকে মাথা রেখে মন আমার কৃতার্থ হয়ে বল্‌তে লাগল, "এই বুকে, অম্‌নি করে, আমি যেন এখনি মরে যাই—এখনি মরে যাই গো, এখনি মরে যাই!"

আমার মাথার উপরে তাঁর মুখখানি কাৎ করে' রেখে, নিস্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ তিনি বসে রইলেন; তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে আধ-ফোটা স্বরে বল্‌লেন, "শ্রী, আমাকে তুমি ভালোবাসো?"

—স্বামীর মুখে এমন ছেলেমানুষী প্রশ্ন আর-কখনো শুনি-নি! তাঁর স্বরও আজ যেন নতুন মানুষের মত বোধ হচ্ছিল! আমি অবাক হয়ে গেলুম!

তিনি আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "শ্রী, আমাকে তুমি ভালোবাসো?"

—"হ্যাঁগা, এ কথার কি উত্তর আছে? তুমি কি তা জান না?"

—"ভালোবাসো?"

—"তোমাকে আমি ইষ্টদেবতার মত ভক্তি করি, ভালোবাসি।"

—"হ্যাঁ, ভালোবাসো শ্রী, প্রাণপণে আমাকে ভালোবাসো—তোমার ভালোবাসা থেকে কখনো আমাকে মুক্তি দিও না, তোমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে তুমি আমাকে আচ্ছন্ন করে' থাকো, সাবধানে আমাকে আগ্‌লে রাখো!"—অধীর স্বরে এই কথাগুলি বলে' স্বামী আমাকে আরো-জোরে তাঁর বুকের ভিতরে চেপে ধর্‌লেন!

স্বামী কি তাঁর ভুল বুঝে অনুতপ্ত হয়েছেন? গোপনে চোখের জল মুছে এতক্ষণ পরে আমি মুখ তুলে তাঁর দিকে চাইলুম। তাঁর মুখ দেখে বিশেষ-কিছু বুঝতে পারলুম না—কেবল তাঁর চোখদুটি কেমন যেন ব্যথা-ভরা বলে' মনে হ'ল।

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "তুমি আজ এ-সব কথা বল্‌চ কেন? আজ তোমার কি হয়েচে গা?"

কেমন অন্যমনস্কের মত তিনি বল্‌লেন, "শ্রী, এ সংসারের পথে লুকনো কাঁটা আছে, আমি ত তা জান্‌তুম না! এ পথে চল্‌তে এখন আমার ভয় কর্‌চে, আমার মন একেবারে ভেঙে গেছে।"

স্বামীর দু-হাত চেপে ধরে আমি বল্‌লুম, "তোমার কথা আমি বুঝতে পারচি না! নিশ্চয় আজ কিছু হয়েচে! কি হয়েচে, আমাকে বল্‌বে না?"

তিনি চম্‌কে উঠ্‌লেন! তাঁর মুখ ম্লান হয়ে গেল! সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে চেয়ে গম্ভীর স্বরে তিনি বল্‌লেন, "না, কিছু হয় নি!

শরীরটা আজ ভালো নয়—তুমি খাওয়া-দাওয়া করে' নাওগে যাও, আমি আজ খাব না!"···বলেই তিনি আবার বিছানায় শুয়ে পড়্লেন!

স্বামী আমাকে কিছু বল্তে চান না! আমার মন আবার ভাবনায় ভরে উঠল। আমাকে এত অবিশ্বাস? এমন লুকোচুরি ত ভালো নয়!

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। তিনি কিন্তু একেবারে চুপচাপ।

* * * * * *
* * *

কাল শেষ-রাত থেকে হঠাৎ ওঁর জ্বর হয়েছে।

ভোর না-হ'তেই ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠালুম।

ওঁকে দেখে-শুনে ওষুধের ব্যবস্থা করে', ঠাকুরপো আমাকে ইঙ্গিতে ডেকে বাইরে নিয়ে গেলেন।

একটা নির্জ্জন ঘরে গিয়ে ঠাকুরপো চুপিচুপি বল্লেন, "বৌদি, অনেক ভেবে আমি একটা উপায় ঠাউরেচি। পুরন্দরকে আমি একেবারে তোমার বশীভূত করে' দিতে পারি!"

আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা কর্লুম, "কি করে' ঠাকুরপো?"

—"মনে পড়ে বৌদি, একদিন আমি তোমাকে বলেছিলুম, আমাদের ডাক্তারী-শাস্ত্রে এমন অনেক ওষুধ আছে যাতে মানুষের মন ফিরে যায়? পুরন্দরকে আমি সেই রকম একটা ওষুধ দিতে চাই।"

আমার স্বামীর কাল্‌কের ব্যবহার মনে হ'ল। তাঁর সে আলিঙ্গনের নিবিড়তা এখনো আমার গায়ে লেগে আছে। তিনি যে এখনো আমাকে ভালোবাসেন, সেটাও কাল জান্‌তে পেরেছি। তবে......

কিন্তু না, বলা যায় না! মানুষের মন মেঘের মত হাল্‌কা, সে যে একটু বাতাসেরও ভর সয় না! মায়াবিনী এখনো জাল পেতে বসে আছে, ছাদের উপরে কাল স্বচক্ষে যে দৃশ্য দেখেছি, তা কি এত-শীঘ্র ভোলবার? মাথার উপরে যখন খাঁড়া ঝুল্‌ছে তখন কোন্‌দিন কিসে কি হয়, কে বল্‌তে পারে? সাবধানের মার নেই,—হাতের লক্ষ্মীও পায়ে ঠেল্‌তে নেই!

ঠাকুরপো বল্লেন, "কি ভাবচ বৌদি? তুমি কি আমার কথায় রাজি নও?"

—"কিন্তু ঠাকুরপো, কেউ যদি জান্‌তে পারে?"

তাচ্ছীল্যের হাসি হেসে ঠাকুরপো বল্লেন, "জান্‌তে পার্‌বে আবার কে? জান্‌ব খালি তুমি-আমি।"

—"কিন্তু ওষুধ খাওয়াতে গেলে উনি যদি টের পান?"

—"কিছু ভেবো না, এ ওষুধ টের পাবার যো নেই। কাল্‌কে ছাদের উপরে সেই অভিনয়টা করে' এসেই উত্তেজনায় পুরন্দরের অসুখ করেছে—এ অসুখে তোমারি সুবিধা হবে, বোধহয় ভগবান তোমার সহায়। অসুখের পথ্য বলে' আমি নিজের হাতে অ্যারারুট তৈরি করে' লুকিয়ে তোমার হাতে দিয়ে যাব, সেই অ্যারারুটটা তুমি পুরন্দরকে খেতে দিও। সেই অ্যারারুটেই ওষুধ মেশানো থাক্‌বে। আমার ওষুধের কোন

রং, স্বাদ কি গন্ধ নেই, সুতরাং পুরন্দরেরও তাতে কোন সন্দেহ হবে না।"

—"কিন্তু ঠাকুরপো, আমার বড় ভয় করচে, শেষটা কি হ'তে কি হবে!"

—"হবে আবার কি? অত যদি ভয় তোমার, তাহলে যা-খুসি কর, আমি চল্লুম।"

—"রাগ কোরো না ঠাকুরপো! আমি বলচি, সে ওষুধে ওঁর আর-কিছু অনিষ্ট হবে না ত?"

—"অনিষ্ট! অনিষ্ট আবার কি? এ ওষুধে তোমার-আমার দুজনেরি লাভ। তুমিও স্বামীকে ফিরে পাবে, স্ত্রীর জন্যে আমারও কুলে কালি পড়বে না। বল, আমার কথায় তুমি রাজি আছ ত?"

—"হ্যাঁ।"

## বারো

### প্রভার কথা

চলে গেলে, তুমি চলে গেলে গো,—আমার এই হতভাগ্য জীবনের গোপন প্রান্তে আশা-প্রদীপের একটি যে শিখা জ্বল্‌ছিল, সে শিখা নিবিয়ে দিয়ে, মনকে আবার অন্ধকারে ডুবিয়ে!......হে প্রিয়তম, হে প্রিয়তম, তোমার মনের মূর্ত্তি যে এমন পাষাণে গড়া, এতদিন সে সত্য ত আমার চক্ষে পড়ে নি!

তবে কি আমি তোমার পূজার মন্ত্র জানি না? তাই কি তোমার পাষাণ-মূর্ত্তিতে আমি জীবন-প্রতিষ্ঠা কর্‌তে পার্‌লুম না? এই বিফল পূজার ব্যর্থতা নিয়ে আমি কি তাহলে চিরকাল এম্‌নি জীবন্মৃত হয়ে থাক্‌ব?...... না গো না,—সে কথা যে আমি ভাব্‌তেও পারি না—আশা দাও, আমাকে আশা দাও! নিভৃত প্রাণের গোপন দেবতা আমার,—ফিরে এস, ফিরে এস, ফিরে এস!

ওরে আমার প্রাণ, এতদিন কি ভুলে আত্মহারা হয়ে দিনের পর তুই দিন গুণছিলি? আজ তুই যে পরিণামে এসে দাঁড়িয়েছিস্‌, এর পর তোর আর কি কিছু করবার আছে? তোর সব শক্তি আজ ক্ষয় হয়ে গেছে, বিশ্বের বিষাক্ত দংশনে আজ তোর বুকের সমস্তটা রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে—তীর-বিদ্ধ আহত সর্পের মত নিজেকে নিজেই ক্ষতবিক্ষত করে,' নিষ্ফল আক্রোশে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আজ ত তোর আর ভিন্নগতি নেই!... ... ...

না! না! এ আমি কি ভাব্‌ছি!...... তাঁর শেষ কথাগুলি আবার আমার কাণে বেজে উঠল। কী ভয়ানক সে কথা,—অথচ কত করুণ, কত কোমল, কত মমতা-ভরা! সে কথায় আমি আমার ব্যর্থ-বেদনার সীমা বুঝতে পেরেছি, আমার জীবনব্যাপী নিরাশার স্বরূপ মূর্ত্তি দেখ্‌তে পেয়েছি—কিন্তু সেই সঙ্গে এও জেনেছি যে, তাঁর কাছে আমি কত ক্ষুদ্র—জগতের শত শত অমানুষের ভিতরে কত বড়, কত মহৎ মানুষ তিনি! তাঁর এই কঠোর প্রত্যাখ্যানে হৃদয় আমার দুঃখের ভারে ভেঙে গেছে বটে, কিন্তু এ দুঃখ আমারি বক্ষ নিষ্পেষিত করুক্‌—এর জন্য তাঁকে আমি আর যেন আঘাত না দি! এতদিন তাঁকে আমি মানুষের মত দেখ্‌তুম, আজ থেকে দেখ্‌ব, দেবতার মত! নিজের দুর্ব্বলতায় ভেবেছিলুম, দুর্ব্বলতা তাঁর মধ্যেও আছে—তাঁর সেই কল্পিত দুর্ব্বলতাকে অন্ধের

মত আমি ভালো বেসেছিলুম! আজ তিনি আমাকে দৃষ্টিদান করলেন, এখন দেখছি মানুষের দুর্ব্বলতাও তাঁর মধ্যে নেই, তাঁকে ভালো বাসবার অধিকারও আমার নেই! তা'বলে তাঁকে ত্যাগ করতেও আমি পারব না,—তিনি দেবতা, তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করব, ভক্তি করব, পূজা করব।

ওগো, আমার এ ভক্তি-পূজা তুমি গ্রহণ কোরো—আমার এ দুদিনের ভ্রম-প্রমাদকে তুমি চিরদিনের মনে কোরো না, আমার সমস্ত পাপ, সমস্ত হীনতা, সমস্ত প্রলোভনকে তুমি ক্ষমা কোরো! আমার মনের মাঝে পাপের সঞ্চার হয়েছে কবে কোন্‌দিন, তা আমি এখনো জানিনা, এ পাপ ত এসেছে আপনি, আমার অজ্ঞাতে, অনেক চেষ্টা ক'রেও আজ আমি একে আর চেপে রাখতে পারলুম না—ক্ষণিক অসাবধানতার সুযোগ পেয়ে তাই সে আজ আমার মুখ পুড়িয়ে দিয়ে গেছে! হে দেবতা, আমাকে দয়া কর। তোমার পবিত্র করুণায় আমার পাপের কালিমা লুপ্ত হয়ে যাক্। আমি মার্জ্জনা প্রার্থনা করছি, আমার এই দেহকে, এই রক্ত-মাংসকে, এই পঙ্কিল কামনাকে আমি আর-কখনো বড় করে' দেখ্‌ব না!

....... ... ধীরে ধীরে ধীরে দূর-পশ্চিমে চাঁদ ডুবে যাচ্ছে। আকাশ-ভরা আলোক-ধারায় ছায়ার রং ক্রমেই গাঢ় হয়ে উঠ্‌ছে—কোকিল-পাপিয়ার কণ্ঠ একেবারে নীরব হয়ে পড়েছে।

আস্তে-আস্তে উঠে বস্‌লুম। আমারি মুখের প্রতিচ্ছায়া পড়ে কি চাঁদের মুখ আজ অমন পাণ্ডু? আমারি বুকের অন্ধকার কি আজ জ্যোৎস্নাকে এমন মলিন করে' তুলেছে?... ... ...

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল! আমার মোহাচ্ছন্ন প্রাণ যখন পুরন্দরবাবুর গভীর ধিক্কারে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল, ও-বাড়ীর ছাদে আমি তখন দুটি মূর্ত্তিকে দেখেছি! আমার স্বামী আর... ... ...কিন্তু তাও কি সম্ভব? আমার সে শোচনীয় লজ্জার ইতিহাস কি তাহলে—

না, এ আমি ভাবতেও পারি না! কপালে যা আছে তাই হবে! স্বামীকে আর আমি একটুও ভয় করি না। তিনিই ত আমাকে দিনে দিনে এমনভাবে দুর্ব্বল করে' তুলেছেন,—মানুষের প্রাণ, কত সয়? আমার এই আত্মবিস্মৃতির জন্যে তিনিও কি দায়ী নন? আজ বছরের পর বছর ধরে আমার প্রতি কি তিনি ঠিক কুকুরের মতই ব্যবহার করে আস্‌ছেন না?—

কিন্তু আমার স্বামীর সঙ্গে পুরন্দরবাবুর স্ত্রী কেন? তবে কি—

না, মানুষকে আমি আর অত ছোট চোখে দেখ্‌ব না! পুরন্দরবাবুর মত স্বামী পেয়ে নিশ্চয় কেউ সে সৌভাগ্যকে কলঙ্কিত করবে না,—তা অসম্ভব!

কিন্তু আমার স্বামীকে ত বিশ্বাস নেই! তাঁকে আমি খুব চিনেছি, তিনি না করতে পারেন, এমন কাজ কি পৃথিবীতে আছে? ... ... বিশেষ, আজ মাস-কয়েক ধরে তাঁর যে ভাবান্তর দেখছি, সেটা আমার কাছে কেমন অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। আজ-কাল তিনি যেন সর্ব্বদাই কি ভাবেন, একলা ঘরে বসে নিজের সঙ্গে নিজেই কথা কন,

আর বাজার থেকে খরগোশ, ইঁদুর, গিনিপিগ্ কিনে এনে তাদের নানারকম গুঁড়ো ওষুধ খাওয়ান। অবোলা জীবজন্তুগুলো সেই সাংঘাতিক ওষুধ খেয়ে, কেউ তখনি মরে যায়, কেউ-বা ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে মর্তে থাকে!

তাদের মৃত্যু-যাতনা দেখেও আমার স্বামীর দয়া হয় না—উল্টে তাঁর মুখে হাসির আভাস ফুটে ওঠে। আমার পোষা কুকুরটা এই-সব দেখে তাঁকে যমের মত ভয় করে, মরে গেলেও আর তাঁর ছায়া মাড়ায় না, তিনি খাবার দিতে গেলেও সে ল্যাজ গুটিয়ে প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে যায়। বোধ হয় ভাবে, তাঁর-দেওয়া খাবার খেলে তাকে আর বাঁচতে হবে না!

আমি এই-সব ভয়ানক দৃশ্য দেখি, আর চুপ করে' থাকি। যেদিন বড় অসহ্য হয়, সেদিন তাঁকে যদি কিছু বল্‌তে যাই, তিনি গরম হয়ে বলে ওঠেন, "তুমি মেয়েমানুষ, বুঝবে কি? আমি ডাক্তার, এ-রকম পরীক্ষা না-করলে আমাদের চলে না!"

আমি যদি বলি, "তাহলে তুমি কি রোজ এমন করে ঐ জন্তুগুলোকে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করবে? এতে কত পাপ হয় তা জানো?"

—"পাপ হয়—কিন্তু ফাঁশী হয় না। তুমি কি বল্‌তে চাও, জন্তুদের ওপরে পরীক্ষা না-করে' এ পরীক্ষাটা করব আমি মানুষের ওপরে? এত সহজে হাতে আমি হাতকড়া পর্‌তে রাজি নই—বুঝেচ? যাও, আমাকে আর বাজে বকিও না!'... ... ...

পুরন্দরবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর ঘনিষ্ঠতা আমার ভালো লাগ্‌ছে না। আমি হিংসা করে' এ-কথা বল্‌ছি না—আমার ত হিংসার কোন কারণ নেই। স্বামীর ভালোবাসার আশা যে রাখে না—হিংসায় তার কি অধিকার?

...... ...... ......

পরদিন সকালে ভাবনা-বিভোর প্রাণ নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলুম। এখনি স্বামীর সঙ্গে দেখা হবে। তিনি নিশ্চয়ই কাল্‌কের কথা তুল্‌বেন! তিনি স্বচক্ষে সব দেখেছেন, তাঁকে আমি কি জবাব দেব?

চা তৈরি করছি—এমনসময় স্বামী এলেন। আমার দোষী মন জড়সড় হয়ে পড়ল,—মুখ ফিরিয়ে আমি অন্যদিকে চেয়ে রইলুম।

স্বামী ক্ষাণিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে যেন আমাকে লক্ষ্য করতে লাগ্‌লেন। আমার বুকটা কেমন ধড়ফড় করে' উঠল।

একটু পরে বল্‌লেন, "চা হয়েছে?"

—"হুঁ।"

—"দাও।"

চায়ের একটা পেয়ালা আস্তে আস্তে তাঁর দিকে এগিয়ে দিলুম।

তিনি আর কথা কইলেন না। আপন মনে চা খেতে লাগ্‌লেন।

চা-পান শেষ করে' তিনি আবার বল্‌লেন, "পুরন্দরের অসুখ করেচে, তা জান?"

—"অসুখ?"

—"হ্যাঁ, জ্বর। আমি এইমাত্র দেখে এলুম।"

—"হঠাৎ তাঁর এমন অসুখ করল কেন?"

—"বোধ হয় কাল্‌কের রাতের উত্তেজনায়!"

খুব সহজ স্বরেই স্বামী এই কথাগুলি বললেন। চম্‌কে উঠে চেয়ে দেখলুম, তিনি মৃদু মৃদু হাসছেন! বজ্রাহতের মত আড়ষ্ট হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম।

আমার এই ভাবটা যেন স্বামীর খুব ভালো লাগ্‌ছিল! টেবিলের উপরে দুই হাতে ভর্ দিয়ে, আমার দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন, —মুখে তেম্‌নি হাসি!

অসহ্য! অসহ্য! তীব্রস্বরে আমি বলে উঠলুম, "কী দেখচ তুমি? যা বল্‌বে বল—নৈলে—"

—"নৈলে কি?"

—"চলে যাও!"

—"হ্যাঁ, তাই যাচ্চি!"—এই বলে হাসি-মুখে উঠে, খুব যেন খুসি-মনে শিষ দিতে দিতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একখানা চেয়ারের উপরে অবশ হয়ে বসে পড়ে আমি হাঁপাতে লাগ্‌লুম।

······কতক্ষণ এম্‌নি বসে ছিলুম বলতে পারি না, হঠাৎ বারান্দায় পদশব্দ পেয়ে আমার সাড় হ'ল। মুখ তুলে দেখি, চাকরটা চলে যাচ্ছে।

তাকে ডেকে বল্‌লুম, "চায়ের কেট্‌লি আর পেয়ালাগুলো এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যা।"

সে জবাব দিলে, বাবু নাকি তাকে খুব তাড়াতাড়ি অ্যারারুট কিনে আন্‌তে বলেছেন, সুতরাং বাজার থেকে না-এসে সে এখন আর এগুলো সরাতে পার্‌বে না।

ওঁর আবার অ্যারারুটে কি দরকার? কিছু বুঝতে না পেরে আমি আমার গৃহকার্য্যে চলে গেলুম।

কিন্তু সেদিন কি আর কাজে মন বসে? কাল্‌কের রাতে, আজকের সকালে, পরে পরে যে-সব ঘটনা ঘটেছে, মনের ভিতরে সেইগুলো ক্রমাগত জেগে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। আমার একমাত্র বন্ধু ছিলেন পুরন্দরবাবু, তিনি ত ঘৃণাভরে এ পাপিনীকে ত্যাগ করে গেছেন; আর কি তিনি আস্‌বেন? আমাকে ক্ষমা-প্রার্থনার অবকাশ দেবেন? না, সে আশা আর নেই!······তারপর, আজ সকালে স্বামীর যে মূর্ত্তি দেখেছি, তাঁর সে মূর্ত্তি যদি বরাবর বজায় থাকে, তাহলে আমার পক্ষে বেঁচে-থাকা নরক-যন্ত্রণার চেয়েও ভয়ানক হয়ে উঠবে। আমি কি করব? কোথায় যাব? কে আমাকে তা বলে দেবে? আমি আর স্বামীর প্রেম চাই না, সংসারের সুখ চাই না, জীবনের আনন্দ চাই না—আমার এখন একমাত্র কাম্য,—শান্তি—শান্তি! যাদের আশা আছে, সৌভাগ্য আছে, পৃথিবীকে তারা যথেচ্ছভাবে ভোগদখল করুক্, তাদের অধিকারে আর আমি ভাগ বসাতে চাই না। আজ আমার মনে হচ্ছে, নির্জ্জন বনবাসের মত সুখের জীবন দুনিয়ায় আর-কোথাও নেই!

কাজকর্ম্ম ফেলে আবার নিজের ঘরের দিকে এলুম।

স্বামীর ঘরের সুমুখ দিয়ে আস্‌বার সময়ে হঠাৎ তাঁর গলা শুনতে পেলুম—"এইবারেই বোঝা যাবে পুরন্দর! তুমি হারো কি আমি হারি!"

বুঝলুম স্বামী এখন নিজের সঙ্গে নিজেই কথা কইছেন—কিন্তু এ কী কথা? এর অর্থ কি?

জান্‌লা দিয়ে একবার ঘরের ভিতরে চেয়ে দেখলুম।

একটা এনামেলের বাটীতে অ্যারারুটের মত কি রয়েছে, আর সেই বাটির ভিতরে—আমার স্বামী শিশি থেকে কি-একটা জিনিষ নিয়ে—মিশিয়ে দিচ্ছেন!

—তাড়াতাড়ি সরে এলুম। আজকাল স্বামীর অস্বাভাবিক ভাব-ভঙ্গি কার্য্যকলাপ দেখে, একেই ত আমি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছি, তার উপরে এই-সব দেখে-শুনে আমার সন্দেহ আরো বেড়ে গেল।

আচম্বিতে আমার মনে পড়ল, কাল্‌কের দুপুরের কথা। আমি যখন কাল দৈবগতিকে এই ঘরে ঢুকে সেই Reports of Trials for Murder By Poisoning নামে বইখানার ভিতরে স্বামীর হাতে-লেখা কাগজ-খানা পড়ছিলুম, তখন তিনি ঘরে ঢুকে যে কাণ্ডটা করেছিলেন, তা আমার খুব মনে আছে। সব-চেয়ে বেশী করে' মনে পড়ল সেই কাগজের একটা কথা,—অ্যারারুটে আর্সেনিক মেশালে আস্বাদে আকারে গন্ধে কিছুমাত্র তারতম্য ঘটে না!

ভগবান্! ভগবান্! ... ... ... আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন সচক্রিতে দুলে উঠে, একেবারে বিদীর্ণ হয়ে গেল!

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

---

# ডাকাতের গান

হারে রে রে রে রে!
ভরে মৃত্যুরে আর দ্বীপান্তরে
এমন মূর্খ কে রে!
রক্ত-নদীর টক্‌টকে জলে
মুক্তো-মাণিক সোনা-রূপো ফলে,
কব্‌জির জোরে কল্‌জের বলে
লুটপাট ক'রে নে রে!

হারে রে রে রে রে!
বিঘ্ন সতত কুকুরের মত
পিছনে-পিছনে ফেরে!
দৃক্‌পাত তিল করিনেকো তায়,
আপদ-বিপদ পথে-পথে ছায়,
মরিয়া আমরা মরিনে সে ঘায়,
মৃত্যু-বিজয়ী যে রে!

হারে রে রে রে রে!
যবে অম্বর-পথে ঘন তমিস্রা
বিশ্ব-ভুবন ঘেরে,
আলো ক'রে দেয় জমাট আঁধার,
মশালের আলো শানা তলোয়ার,
দল বেঁধে সবে চলি সারে সার
লাফ খেয়ে তুড়ি মেরে!

হারে রে রে রে রে!
এক পাও মোরা পিছপাও নই
যেতে দুনিয়ার টেরে!
যারা আমাদের তেড়ে আসে ত্রাসি
খোড়-কুচি ক'রে কেটে রেখে আসি,
গলা টিপে ধন-দৌলত-রাশি
জোর ক'রে নিই কেড়ে!

হারে রে রে রে রে!
বাজিয়ে বিজয়-বিষাণ আমরা
ফিরি ঘরে কাজ সেরে।
প্রহরী পাহারা শান্ত্রী তখন,
সুখে নিদ্রায় ঘুমে অচেতন,
রাত্তির জেগে প্রেয়সীর মন
ভাবনায় আছে ভেরে!

হারে রে রে রে রে!
রাজা-রাজড়ার মাস্তুতো ভাই
আমরা সবাই যেরে!
—মেজ সেজ ছোট মাস্তুতো ভাই—
সেকেন্দার-দাদা শুনে কথাটাই,
একেবারে চুপ, মুখে কথা নাই
জবাবে ওঠেনি পেরে!

হারে রে রে রে রে!
ধর্ম্মের মানা নীতির দোহাই—
শুনছে পাগল কে রে!
খালি পেটে যবে কেটেছিল রাত—
ছেলে-মেয়ে নিয়ে, একমুঠো ভাত—
কেউ দিয়েছিল? পেতেছিনু হাত—
লাঠি-তলোয়ার ছেড়ে!

হারে রে রে রে রে!
সোনার কেল্লা বানাবে তোমরা—
রূপোর পাহাড় ঘেরে!
আঙুর বেদানা পেস্তা মেঠাই—
আতর গোলাপ তোমাদেরি চাই!
আমাদের পেতে ছুঁতে নিতে নাই
ফাঁসি-কাঠে ফেল ফেড়ে!

হারে রে রে রে রে!
কোরবো দুনিয়া সুরকির গুঁড়ো
নতুন বনেদ গেড়ে!
ধনী-মহাজন প্রাসাদের ইটে—
গরীবের হবে অসংখ্য ভিটে—
নিঃস্বও পাবে টাকাটা-সিকিটে
সিন্দুক-ধুলো ঝেড়ে!

হারে রে রে রে রে!
সংসার-মাঝে বহ্নির শিখা—
ক্রমে জ্বলে ওঠে বেড়ে?
আমাদের মিছে দাও অপবাদ—
—এ চির স্বর্ণ-লৌহ বিবাদ,
ছাপাছাপি নদী ভাঙবেই বাঁধ,
যাও যত তাকে তেড়ে!

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

---

# ভ্রষ্ট কুসুম

(১)

ভাই অনু,

আমি আবার আমাদের দেশের বাড়ীতে ফিরে এসেছি। ছন্নছাড়ার মত এই বাড়ী ছেড়ে আমি বিদেশ যাত্রা করেছিলুম নয় বৎসর আগে। কে তখন জানত যে আবার আমি এই বাড়ীতে ফিরে আসব? কিন্তু নানান জায়গায় ঘুরে-ঘুরে আমার শরীর-মন দুইই বড়

ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই আমি যখন চাইছিলুম একটুখানি নির্জ্জনতা, একটু বিশ্রাম, তখন এই বাড়ীটাকেই আমার মনে পড়ে গেল—যেন ঠিক মায়ের মুখখানির মত—যা আমাদের সকল দুঃখকষ্টের মধ্যে আগেই জেগে ওঠে।

ট্রেন থেকে নেমে ষ্টেসানে দাঁড়ালুম। তখন রাত্রি দশটা। সেদিন কি তিথি ছিল জানি না, কিন্তু চাঁদের আলো যে অন্ধকার পথগুলিকে একটুও আলো করিতে পারেনি, তা সে পথ চল্‌তে গিয়ে খুব ভাল করে বুঝেছি। পদে-পদে পতনের আশঙ্কা নিয়ে বাড়ীর সামনে গিয়ে হাজির হলুম। বাড়ীর দিকে চেয়ে একেবারে অবাক হয়ে গেলুম। এ কি! এ ত আমাদের বাড়ী নয়! ভাবলুম বুঝি ভুল করেছি। ভাল করে দেখতে লাগলুম। না, না, ওই ত সেই সিং-দরজা, সেই বাগান, আর সেই পুকুর! হায়! কি করেই বা একে চিনব? এর এমন অবস্থা তো কখনো দেখিনি। কোনোখানে একটু সাড়া শব্দ নেই, কোথাও একটা আলো নেই। অথচ একদিন ছিল, যখন এর প্রতি ঘরে কত রঙের আলো জ্বলত; আর সে আলো শুধু এই বাড়ীটাকে নয় সমস্ত গ্রামকে আলোময় করে দিত। এই বাড়ীর স্তরে-স্তরে কত আনন্দের প্রবাহ, কত হাসিকান্নার তরঙ্গ বয়ে গেছে। আর আজ? আজ এ নীরব নিথর। মনে হোল যেন এক শ্বেতবসনা বিধবা তার সমস্ত আভরণ ত্যাগ করে অন্ধকার বিষাদ-দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। একটা বেদনায় আমার মন টন্‌টন্ করে উঠল। আমার পিতৃপিতামহের বাড়ি—কার জন্যে এ পথপানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে? আমার জন্যে কি? বন্ধু, তুমি কি আমারই অপেক্ষা করছ? আমায় ভোল নি? এই ত আমি এসেছি ভাই।

সে-রাত্রে ভাল ঘুম হোলনা। সকাল-বেলা উঠেই মালিকে সব ঘরের দরজা-জানলাগুলো খুলে দিয়ে চারিদিক ভাল করে পরিষ্কার করতে বলে দিলুম। আমিও তার সঙ্গে-সঙ্গে তাদারক করে বেড়াতে লাগলুম।

আমাদের বাড়ীটা তোর মনে আছে ত? সেই যে বাবার বৈঠকখানা? সেই ঘরে একটা ছোট্ট আলমারি ছিল না? আর তার উপরে একটা আরশী, যার কোণ একটু ভাঙ্গা, মনে আছে? সেটা ঠিক তেমনিই আছে। তবে ধুলো পড়ে কাঠটা আরো কালো হয়ে গেছে। মনে পড়ে কি এই আরশীর কোণ কেমন করে ভেঙ্গে যায়? উঃ, ছেলেবেলায় তুই কি দুষ্টুই না ছিলি! রাণু-বেচারী ভালমানুষ, তুই তাকে বুঝিয়ে দিলি যে আলমারীর উপর উঠলে ভারী একটা মজা হবে। সে আমার বারণ শুনলে না, তোর কথাতেই আলমারীর উপর উঠে থরথর করে কাঁপতে লাগল; তারপর সেই একটু নড়তে যাবে, অমনি আরশী-শুদ্ধ পড়ে গেল! সেই আলমারির পাশেই আমার দিদিমার একখানা মস্তবড় ছবি টাঙান ছিল, মনে আছে? সে ছবিখানা ঠিক যেমন ছিল, তেমনি আছে। আমি সেখানা দেখে চম্‌কে উঠেছিলুম। হঠাৎ মনে হল যেন দিদিমা আমারই মতো এ-বাড়িতে আবার ফিরে এসেছেন; তাঁর মুখের সেই হাসি, আর টানাটানা চোখের সেই স্নেহভরা দৃষ্টিটি ছবিতে যেন লেগে রয়েছে। তার দিকে চেয়ে

চোখ আর নামাতে পারি না। দেখতে-দেখতে মনে হতে লাগল আমি যেন ছোট্টটি হয়ে গেছি, দিদিমার সঙ্গে দুষ্টুমি করছি, আর অন্যায় আব্দার ধরে তাঁকে বিরক্ত করে তুল্‌ছি। তাঁর কথাগুলি যেন শুনতে পেলুম—"ছিঃ দাদা, দুষ্টুমি কি করতে আছে? তুমি যে লক্ষ্মী, তুমি যে সোনা, তুমি ত দুষ্টমি কর না!" এমন স্নেহের পরশ, এমন আদরের তিরস্কার বহুকাল যে পাইনি তার সমস্ত ক্ষোভ যেন ঐ ছবিখানি আজ মিটিয়ে দিলে।

বাবার ঘরে ঢুকে একেবারে অবাক হয়ে গেলুম। এ কি, এমন করে সব জিনিসপত্র ওলোট-পালট করলে কে! যেখানে বাবার টেবিল ছিল, সেখানে দেখছি কতকগুলো টুকরো-টুকরো কাগজ ছড়ানো; দরজা-খোলার বাতাস পেয়ে সেগুলো উড়তে লাগল। হঠাৎ আল্‌নার দিকে চোখ পড়ল; দেখলুম বাবার হাতির দাঁতে বাঁধানো ছড়িটা ঝুলছে। মনে হল যেন এই মাত্র সেটিকে তিনি রেখে গেছেন—এখনো তার দোল থামেনি। হঠাৎ [illegible] পায়ের জুতোর শব্দে চম্‌কে উঠলুম; জু[illegible]ঘরে ঢুকলে বাবা বড় রাগ ক'রে নিয়ে[illegible]ড়াতাড়ি জুতো খুলে রেখে আসতে [illegible]মনে পড়ল—বাবা কোথায়? চোখে জল এল।

পাশে মায়ের ঘর। সেই দিকে উঁকি মারলুম। ঠিক যেন একলাটি বসে মা আমার রামায়ণ পড়ছেন—যেমন রোজ নিস্তব্ধ দুপুর-বেলায় পড়তেন; আর আমি ঝড়ের মতো ছুটে এসে তাঁর গলা [illegible]ড়িয়ে ধর্‌তুম; তিনি বই বন্ধ কোরে আমায় চুমু দিয়ে কোলে নিতেন। তেমনি করে আমি ছুটে গেলুম মায়ের কাছে। দরজা খোলা পেয়ে ঘরের ভিতর দিয়ে এক-ঝট্‌কা বাতাস বহে গেল;—শালগাছের পাতা-গুলো সর্‌সর্ কোরে উঠল—আমগাছের ডাল মর্‌মর্ করতে লাগল।

মাকে দেখবার জন্যে মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে উঠল। চারিদিকের দেয়াল খুঁজতে লাগলুম, কোথাও তাঁর ছবি দেখতে পেলুম না। মনে পড়ে গেল দেরাজের মধ্যে মায়ের আর বাবার একসঙ্গে একখানা ফোটো ছিল—বিয়ের পরেই তোলা। তাতে বাবার মুখ তত গম্ভীর নয়, হাসিহাসি মুখ; মায়ের মুখখানি লজ্জায় অবনত, চোখদুটি ভাল করে খোলেনি, যেন ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে ছবি তুলেছেন। কত ছোটই তখন মা ছিল!

দেরাজের ভিতরটা অনেক-ক'রে খুঁজলুম, সে ছবি কিন্তু পেলুম না।

ক্ষুণ্ণমনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দাতে দাঁড়ালুম। তখন টিপ্-টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। একেবারে কোণের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। চোখে পড়ল তিনটে নাম, ছুরি দিয়ে কাটা ছেলেমানুষের কাঁচা হাতের তিনটে নাম। কাদের নাম জানিস? আমার, রানুর, আর তোর। কবে কি খেয়ালে এই নাম তিনটে লেখা হয়েছিল তা মনে পড়ল না; কিন্তু আমার চোখের সাম্‌নে জেগে উঠল একখানা ছবি তার সমস্ত বৈচিত্র্য নিয়ে। বাদলা দিন; আকাশ ঘন মেঘে কালো হয়ে আছে; বাইরের বাগানে গাছগুলি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে; দুই-একটা পাখী এ-গাছ থেকে ও-গাছে বৃষ্টির ভিতর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে আর সাম্‌নের

শানবাঁধানো পুকুরের জলে বৃষ্টি পড়ছে—টপ্ টপ্ টপ্; আর এই জানলার ধারটিতে দুটি ছোট-ছোট ছেলে আর-একটি তাদের চেয়ে ছোট মেয়ে, তিনটি পাখীর ছানার মতো ঘেঁসাঘেঁসি করে বসে, বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে কলরব করছে।

সমস্তদিন ঘুরে-ঘুরে বাড়ীটা দেখে বেড়াতে লাগলুম। এক-একটা জায়গা দেখি, এক-একটা জিনিষ দেখি আর কত কথা মনে পড়ে যায়। উঠোনের পাশে সেই তুলসী-তলা—যেখানে রোজ সন্ধ্যায় দিদিমা গরদের কাপড় পরে প্রদীপটি হাতে নিয়ে কি সব গুন্‌গুন্ করে বলতেন, তারপর মাথা নীচু করে প্রণাম করতেন,আমাদের ডেকে বলতেন —"ওরে, তোরা তুলসী-তলায় প্রণাম কর!" পুকুর-পাড়ের সেই কুলগাছ—দুপুর-বেলায় যেখানে আমাদের লুকনো-সভা জমে উঠত; ছাদের উপর-কার সেই ছোট ঘর—যেখানে ভাঁড়ার ঘর থেকে তেঁতুল চুরি করে এনে লুকিয়ে-লুকিয়ে খাওয়া হোত; সেই মস্ত উঠোন, ঠাকুর-দালান—যেখানে দোলদুর্গোৎ-সবে কত ধুম পড়ে যেত, পাড়ার সবাই এসে জমা হোত, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা নূতন জামাকাপড় পরে দলে-দলে বাড়ীর ছেলের মতন এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াত। সে-সব কোথায়? কোথায় এখন তারা?

স্বপ্ন—স্বপ্ন—স্বপ্ন! এ-জীবনটা একটা স্বপ্ন। সে-স্বপ্ন ঝরে যায়, কিন্তু তাকে ভোলা যায় না।

( ২ )

অনু,

আজ সকালটা পরিস্কার হয়ে গেছে। কাল্‌কে আকাশে যে অত মেঘ ভীড় করেছিল, আজ তার চিহ্নমাত্র নেই। মনে হচ্ছে যেন তারা আমার মনের মধ্যে এসে জমা হচ্ছে; ক্রমেই সমস্তটা অন্ধকার কোরে তুলছে!—একটু আলো না পেলে বাঁচব না! আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। গেটের কাছে দেখা হোল গোপালের সঙ্গে। ওঃ, গোপালটা কি মোটাই হয়েছে! সেই ত রোগা টিম্‌টিমে ছিল- আর এখন যেন একটা হাতী। গোপালকে মনে নেই? সেই যেরে, আমার কাছে পড়তে আসত—সরকারদের ছেলে। তাকে ভুলে গেছিস্? সে আমাকে দেখে কেঁদে ফেল্‌লে, বল্‌লে —"ছোটবাবু, এই সোনার অট্টালিকা ছেড়ে কোথায় ছিলে? আহা, ফিরে এসেছ, ভালই করেছ। ভগবান করুন যেন তোমার এ সুমতি চিরকাল থাকে।" আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—"হ্যাঁরে, তুই এখন কি করছিস্?" সে বল্‌লে—"তোমার দয়ায় ছোটবাবু, চৌধুরী-বাড়ীতে একটা কাজ পেয়েছি, সেইখানেই চাকরি করছি।" আমি অবাক হয়ে বল্লুম—"সে কি রে তোমার দয়ায়?"

"হ্যাঁ, তোমার দয়ায় না [illegible]। আমি তুমি দয়া করে আমায় লেখাপড়া [illegible]-ছিলে, তাই ত এখন কিছু করে খাচ্ছি; আর বুড়ো বাপ-মাকে দুটি খেতে দিতে পারছি।"

আমি হেসে বল্লুম—"আর দয়া করে সেই কান-মলে দেওয়া, চড়চাপড় মারা?—সে সব ভুলে গেছিস্ নাকি রে?"

সে শুনে হাস্‌তে লাগল।

এই গোলাপটা আর রামুর বুড়ী-দিদিমাই আমাকে সব-চেয়ে ভালবাসে। রামুর বুড়ী-দিদিকে ভুলে যাওনি ত? তাঁকে ভোলা কি সহজ? কি সরল শুভ্র মন, আর কতখানি স্নেহ দিয়ে গড়া ঐ মানুষটি! যে একবার তাঁর কাছে এসেছে, তাঁর স্নেহের পরশ পেয়েছে, সে কি কখনো তাঁকে ভুলতে পারে? আমাদের কত আব্দার, কত অত্যাচারই না তিনি হাসিমুখে সহ্য করেছেন। কোন্ এক শুভমুহূর্ত্তে তিনি আমাদের জন্মে তাঁর স্নেহের প্রদীপটি জ্বেলে-ছিলেন, তারপর কতকাল চলে গেছে, এখনো তার শিখাটি সমানভাবে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। আমি এসেছি শুনে তিনি ছুটে আমায় দেখতে এসেছিলেন। আমায় দেখে তাঁর যে কত আহ্লাদ, তা তোকে আর কি বলব? তিনি বল্লেন—"দাদা, তুই ফিরে এসেছিস, বেশ করেছিস। বুড়ো হয়েছি দাদা, কবে মরব তার ঠিক নেই, ইচ্ছে করে মরবার সময় তোদের সবাইকে দেখতে-দেখতে মরি! দেখ্ দিকিনি, তোরা না থাকলে কি গ্রাম মানায়!"

আমি বল্লুম—"সে কি দিদিমা, গ্রাম মরে' নিয়ে?"

দিদিমা বল্লেন—"বা, এখন তোরা বড় হয়েছিস, বল্‌তে গেলে তোরাই এখন গ্রামের কর্ত্তা! তোরাই সব দেখবি, শুনবি, করবি—এই ত আমি বুঝি। এই সেদিন কি কাণ্ডটাই না হোল—পুঁটির বিয়ের দিন! তোরা থাক্‌লে কি এমনটা হোতে পারত, না হোতে দিতিস? মেয়ে সম্প্রদান হবে এমন সময় বরের বাপের সঙ্গে কনের বাপের কি কথা নিয়ে ঝগড়া বেঁধে গেল। বরের বাপ ত রেগেই টং। তিনি বরকে হুকুম দিলেন—চল, ফিরে চল, এমন ছোটলোকের সঙ্গে আমি কুটুম্বিতা করতে চাইনা। বরটা বাপের ধম্‌কানিতে সুড়্‌সুড়্ করে উঠে চলে গেল। অতগুলো মদ্দ বাড়ীতে গিস্‌গিস্ করছে, কেউ তাদের আটকাতে পারলে না। ওমা? কি হবে! জাত যাবে! আমরা ত সকলে ভেবেই অস্থির, মেয়ের বাপ কাঁদছে, মা ত অজ্ঞান হোয়ে পড়েছে, কনে-বেচারা ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে গেছে, শেষে সবাই যখন তাকে হতভাগী বলে স্নেহ দেখাতে লাগল, তখন সে কেঁদে ফেল্লে। পাড়ার সবাই মিলে কেবল হট্টগোলই করতে লাগল, কি যে উপায় হবে, সে দিকে কারো খেয়াল নেই! তার পর ভাগ্যিস্ রমেশ ছুটিতে বাড়ী এসেছিল, সে খবর পেয়ে ছুটে এসে পুঁটিকে বিয়ে করতে রাজি হল। আহা, পুঁটির ভাগ্যি ভাল, তাই অমন বর পেয়েছে! আশীর্ব্বাদ করি তারা যেন চিরকাল সুখে কাটিয়ে যেতে পারে।"

দিদিমাকে বল্লুম—"দিদিমা, আমি সে-সময় থাকলেই বা কি করতুম? তোমাদের গ্রামের যত মেয়ের বর এসে ফিরে যাবে, তাদের সকলকেই ত আমি বিয়ে করতে পারি না?"

দিদিমা বল্লেন—"সকলকে কিরে? তুই একটা বিয়ে করলে যে আমি বেঁচে যাই। বিয়ে করবি দাদা?" এই কথাটা বল্‌তে-বল্‌তে, কি জানি কেন, তাঁর গলার স্বর কেমন ভেঙে এল, দেখলুম তাঁর দু-চোখে চক্‌চক্ করছে দু-ফোঁটা জল।

আমার তখন মনে পড়্‌ছিল আর-একটি

বিয়ের দিনের কথা। এই দিনটাকে আমি কতবার স্মৃতির দ্বার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু আব্দারে ছেলের মত এ কেবলই ফিরে-ফিরে ঘুরে এসেছে। একে কিছুতেই আমি ভুলতে পারলুম না।

হঠাৎ যে দিন শুনলুম রানুর বিয়ে, আমার সমস্ত বুকখানা কেমন জোরে উঠল। রানু —যে আমার চিরদিনের সঙ্গী, যাকে দিদিমা ঠাট্টা করে অনবরত বলতেন, আমার কণে, যাকে খেলায়-ধূলোয়, আমোদ-আহ্লাদে, হাসি-কান্নায়, এত কাল চোখে-চোখে কাছ-কাছে পেয়েছি, সে পর হয়ে চলে যাবে? একথা ভাবতেও আমার প্রাণ আকুল হয়ে কেঁদে উঠতে লাগল। কিছু বলতে পারলুম না— হতাশ হয়ে ভিতরে-ভিতরে শুধু কাৎরাতে লাগলুম! মনে হল জীবনটা যেন একটা খেলা!— যখন-খুসি ভেঙে যায়! এ যেন দিদিমার পরিহাসের মত! শুধু একটু হাসির ছটা দিয়ে উবে যায়। মন কেবলই কেঁদে বলতে লাগল— না, রানুকে আমি ছাড়তে পারব না! কিন্তু উপায় কি? আর এখন উপায় কি!

আমি চুপটি করে শুয়ে পড়েছিলুম, গোপালটা এসে বললে—"ছোটবাবু চল, আজ যে রানুর বিয়ে। তুমি না দেখলে-শুনলে চলবে কেন?"

ঠিক বটে! ঠিক বটে! রানুর বিয়েতে আমি না দেখলে-শুনলে চলবে কেন? আমার মতো আপনার জন তার কে আছে?

ধড়্মড়্ করে উঠে পড়লুম। সমস্ত দিন মহা উৎসাহে বিয়ে-বাড়ীর কাজে নিজেকে মাতিয়ে দিলুম—নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের শেষ-উজ্জ্বলতার মত। তারপর সন্ধ্যায় আলো জেলে বর যখন এল, তখন মনে হল যত অন্ধকার যেন আমারই বুকের ভিতরে ঠেলে এসে জমা হয়েছে। আমি শুয়ে পড়লুম। দিদিমা আমাকে দেখে বললেন—"অসুখ করেছে কি দাদা?"

কিছুক্ষণ পরে জোর করে আমি উঠে দাঁড়ালুম—নতুন করে কাজে লাগবো বলে। সেই সময় আমাকে কে যেন ডাকলে— "ওরে, কেমন কনে সাজান হয়েছে দেখবি চল্।"

রানুকে সেই শেষ দেখছি, আর দেখিনি।

ইচ্ছে হচ্ছিল রানুর কথা দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু সে-কথা জিজ্ঞাসা না করে তাঁকে বললুম—"দিদিমা, তুমি ত এখন একলা রয়েছ, চলনা আমার সঙ্গে; তোমায় তীর্থ করিয়ে নিয়ে আসি।"

দিদিমা বললেন—"সে ভাগ্যি কি আমার হবে দাদা, যে, আমি তীর্থ করতে পাব? আমি ত ভাই, এখন একলা নেই, রানু আমার কাছে রয়েছে যে।"

"ওঃ রানু তোমার কাছে আছে? আচ্ছা বেশ ত, রানু শ্বশুর-বাড়ি চলে যাক্ আর না হয় তুমি আমার সঙ্গে যেয়ো।"

"না দাদা, রানু ত আর দেশে যাবে না—তার যে সর্ব্বনাশ হয়েছে।" বলে তিনি আঁচলে চোখ মুছতে লাগলেন।

আমি চম্কে উঠে বললুম—"সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ কি?"

"রানু বিধবা হয়েছে!"

বলেই তিনি ডাক-ছেড়ে কেঁদে উঠলেন। আমি একেবারে কাঠ হয়ে গেলুম।

দিদিমা কখন্ চলে গেছেন জানতেও

পারিনি। আমার কানের কাছে কেবলই কথাটা বাজছিল—"রানু বিধবা!"

সেদিন বিকেলে বাগানে বসেছিলুম, অনেকক্ষণ ধরে বসেছিলুম, কিছুই হুঁস ছিল না, হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে চেয়ে দেখি, দিদিমা। তিনি এসেই আমার হাতটা ধরে অত্যন্ত স্নেহের স্বরে বল্লেন—"দাদা কাঁদছ?"

আমি চম্‌কে উঠলুম। তাইত আমি কাঁদছিলুম! কি আশ্চর্য্য, দিদিমার চোখেও জল!

( ৩ )

অনু,

আমি নিজের জন্যে কোন্ ঘরটা নিয়েছি জানিস? সেই যে যে-ঘরে আমরা পড়তুম, যার সামনেই বাগান—সেই ঘরটা। মনে আছে তুই, রানু আর আমি তিনজনে মিলে কত ফুলের গাছ পুঁতেছিলুম? সেই-গুলি এখন খুব বড় হয়েছে, ফুলে-ফুলে ছেয়ে গেছে। দেখলে মনে হয় তাদের জীবনের যত স্ফূর্ত্তি যেন তারা দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে! ওরা ক'টি সঙ্গীতে ঘেঁসাঘেঁসি করে বেশ সুখে আ[illegible] দেখলে হিংসে হয়।

[illegible] দিকের জানলাটা খুলে দিয়ে [illegible] নিয়ে একখানা বই পড়ছিলুম, দিদিমা আমার ঘরের মধ্যে এসে পড়লেন, আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—"দাদা, বই পড়ছিস্? যখনি আসি, তখনি দেখি যে হয় তুই গালে হাত দিয়ে বসে ভাবছিস, নয় বই-হাতে বসে আছিস। অত ভাবিস কি বল্ ত? আহা, ভেবে-ভেবে যে কালি হয়ে গেলি! অমন জোয়ান শরীর তোর ছিল, এখন দেখ্ ত কি হয়েছিস! হাড়গুলো যে গোনা যায় রে! শরীরটাকে নিয়ে কেন এমন ফেলা-ছড়া করছিস্ দাদা?"

"দিদিমা, ভাবনা আর বই এ দুটোকেই ছেড়ে, কি নিয়ে এখন থাকি বল ত?"

"না বাবু, ও কথা আমি শুনতে চাইনা। তোর আবার ভাবনা কিসের? শরীরের দিকে তোকে নজর দিতেই হবে।"

"কেন? আমার শরীর ত কিছু খারাপ নেই—বেশ ভালই রয়েছে ত।"

"কি যে বলিস্ তার ঠিক নেই!—তোর শরীর ভাল আছে? সেদিন সকালে তোদের রান্নাঘরে একবার গিয়েছিলুম, দেখি হাঁড়িতে তোর জন্যে চাল নিচ্ছে, এই এতটুকু। যে-লোক গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খেতে পারত, সে ওই অতটুকু চালের ভাত খেয়ে বেঁচে থাকবে? আমাকে না হয় হেসে উড়িয়ে দিচ্ছিস, কিন্তু আজ যদি তোর মা থাকত? না, এবার আমি নিজে হাতে তোর খাওয়ার বন্দোবস্ত করব।"

আমি বল্লুম—"বেশ ত!"

তারপর রানুর কথা উঠল; তিনি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তার জীবনের খুটিনাটিগুলি একটু-একটু কোরে বোলে যেতে লাগলেন। রানুর কথা বল্‌তে দিদিমার চোখ জলে ভরে আসে; কিন্তু ঐ বলাটাই এখন তাঁর একটা মস্ত আনন্দ! তিনি এমন তন্ময় হোয়ে বল্‌তে লাগলেন যে রানুর আগাগোড়া ছবিটি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল। ঠিক যেন দেখলুম—রানু এসে আমার সাম্‌নে দাঁড়ালো। আমি মনে-মনে চেঁচিয়ে উঠলুম—"রানু! রানু!" আমি কিছুই জিজ্ঞাসা করিনি, তবু দিদিমা আমার সমস্ত জিজ্ঞাস্য-

গুলির উত্তর যেন মন থেকে টেনে এনে দিয়ে যেতে লাগলেন। অনেক দিন পরে রানুকে আমি যেন আবার দেখলুম। সেই রানু! আমার সেই ছেলেবেলার সঙ্গী রানু! দিদিমা বল্লেন—"অনেক দিন তো রানুকে দেখিস্‌নি; —চল না দেখা করবি।" আমি কেমন থতমত খেয়ে গেলুম, বল্লুম—"না দিদিমা, এখন থাক।" দিদিমা অবাক হয়ে বল্লেন —"কেন?" তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেলেন। খানিক বাদে ঘুরে এসে বল্লেন—"রানু তোকে নেমন্তন্ন করেছে। আমার মাথা খাস্‌, যাস্‌।"

আমি বল্লুম—"দিদিমা, অমন কোরে বলছ কেন, আমি যাব।"

দিদিমা বাড়ীতে পা দিয়েই ডাকলেন—"ও রানু, তোর নরেশ-দা এসেছে রে।"

উঠোনের চাঁপাগাছ থেকে ফুলের গন্ধ আমার নাকে এসে লাগল; এই সেই চাঁপা-গাছ, যার তলায় বসে আমি প্রতি দুপুরবেলা রানুর সঙ্গে খেলা করতুম।

দিদিমা আবার ডাকলেন—"রানু।" আমিও একবার ডেকে উঠলুম—"রানু!" মনে হল এখনি রানু ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু কারো কোনো সাড়া পাওয়া গেল না; কেবল দেখলুম কার একটা ছায়া যেন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দিদিমা বল্‌লেন—"ওকি, ঘোমটা দিচ্ছিস্‌ কেন? নরেশ যে রে!"

রানু তার সেই ঢলঢলে মুখখানি, মাথায় কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, চোখে দুষ্টুমির চাহনি আর মুখে আনন্দের হাসি নিয়ে আমার চোখের সাম্‌নে দিনরাত ঘুরে-ঘুরে বেড়াত। তাকে দেখেছিলুম ফুল্ল কমলকলিটির মত; আর আজ মনে হল, সমস্ত যেন কেমন শুকিয়ে গেছে। সে রানু আর নেই!

নতমুখে রানু দূরে দাঁড়িয়ে রইল, একটা কথাও বল্‌লে না, আমার কাছে ছুটেও এলনা! আমার কেবলই মনে হতে লাগল এই কি রানু?

তিন জনেই আমরা নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতায় আমি যেন ক্রমেই হাঁপিয়ে উঠতে লাগলুম। দিদিমা বল্‌লেন—"নরেশকে বসতে কিছু পেতে দে, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বে?" রানু আসন আন্‌তে ধীরে-ধীরে চলে গেল। তার চলার ভঙ্গিটি পর্য্যন্ত বদলে গেছে।

একখানা মাদুর এনে রানু দাওয়ায় বিছিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মুখ-ফুটে বল্‌লে না যে "বস।" এ কি লজ্জা? কৈ চোখে তো লজ্জার আভাসটি দেখা গেলনা! সে যেন পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে। আমার কেমন মনে হতে লাগল, বাড়ী ফিরে যাই, কিন্তু সেটা ভাল দেখাবে না, তাই বসে পড়লুম। রানু ঠিক তেমনই দাঁড়িয়ে রইল—কাছে এসে বসলে না; গল্প শুন্‌তে চাইলে না। [illegible]

দিদিমা ঘরের মধ্যে চলে [illegible] হচ্ছিল রানুকে কাছে বসতে বলি, কিন্তু [illegible] কিছুই বলতে পারলুম না। কেবলই ম[illegible] লাগল—এ যেন কোন্‌ অপরিচিতা! আমার কত কাছে রানু দাঁড়িয়ে রয়েছে—কিন্তু তবু যেন সে কত দূরে!

বাড়ী ফিরে এলুম। রাতের অন্ধকার যতই বাড়তে লাগল ততই মনে হতে লাগল যেন তার মধ্যে আমার রানুর মূর্ত্তি মিলিয়ে যাচ্ছে! এ কোন্‌ অন্ধকার গ্রাস করলে!

( ৪ )

ভাই অনু,

দিদিমাকে নিয়ে আমি পারলুম না। কিছুতেই কি তিনি শুনবেন না? কি করি? তাঁদের বাড়ীতেই খাবার বন্দোবস্ত করেছি।

খাবার সাম্‌নেটিতে দিদিমা আমার কাছে বসে থাকেন, রানু পরিবেশন করে। থালাটি এনে আসনের সামনে রেখে যখন রানু আমায় ডাকে—"নরেশদা, খাবে এস!" তখন মনে হয়—এ কোন্ স্নেহময়ী নারী! কিন্তু এ তো আমার সেই রানু নয়।

সে আমায় আগের মতো এখনো ডাকে নরেশ-দা বোলে; কিন্তু এ তার গলার সেই-সুর নয়—যে-সুরে আমি ছেলেবেলায় স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়তুম। সে-সুর এখনো আমার কানে লেগে আছে, এ তার সঙ্গে মেলে না। এতদিন আমি জানতুম, রানু আমার না হলেও, সে আছে, কিন্তু এখন দেখছি রানু নেই—কোথাও নেই;—এক আনি[illegible] ফাঁকা। এ ঠিক আমাদের ঐ বসত-বাড়িখানার[illegible]তো,—তার সেই কাঠামোটা অক্ষরে' নিয়ে সে বাড়ী নেই;—না আছে তার সেই আলো, সেই প্রাণ, যার আনন্দে, যার রসে আমি দিনরাত ডুবে থাকতুম। গ্রামের সকলেই পীড়াপীড়ি করছে আমায় এখানে থাকতে, কিন্তু আমার মন এই চিরপরিচিত অপরিচিত স্থানে দিন-দিন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। না, না, এখানে থাকতে পারব না! মিথ্যা মায়ার টানে এখানে বৃথা এসেছিলুম!

( ৫ )

ভাই অনু,

আজ আটদিন হোল রানুদের বাড়ী যাইনি—শরীর খারাপ এই কথা দিদিমাকে বুঝিয়ে। তিনি দুবেলা আমায় দেখতে আসেন। রানুর গল্প করেন। সে-সব কথা শুনতে আমার বেশ লাগে। কিন্তু কোথায় সেই রানু? তাকে তো কোথাও খুঁজে পেলুম না! একএক-সময় মনে হয় সে যেন বাইরের আলো থেকে পালিয়ে এসে আমার এই অন্ধকার মনের মধ্যে লুকিয়েছে। তাকে যতবারই চোখে দেখি কেবলই মনে হয় যেন রূপকথার রাজকন্যার মতো রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে কোন্ বিকট রাক্ষস তাকে অচেতন করে রেখেছে;—জানিনা কোনো দিন সোনার কাঠির পরশ পেয়ে সে জাগবে কি না! কেবলই মনে হচ্ছে কি হবে এইখানে বৃথা অপেক্ষা কোরে? আবার পালাই—মনের মধ্যে যে রানু আছে, তাকে বুকের ভিতর লুকিয়ে নিয়ে। সে যে আমার মনের মধ্যে এমন কোরে লুকিয়ে আছে, তাতো এতদিন জানতুম না—বাইরে তাকে খুঁজে-খুঁজে কেবলই হতাশ হয়েছি—চোখের জল ফেলেছি। আমার বুকের ধন আমারই বুকে লুকিয়ে আছে, আর কোথাও নেই, এ খবর এইবার পেয়েছি! আর কেন?

দিদিমার কাছে বিদায় নিতে গেলুম।

রানুর সঙ্গে দেখা হল।

রানুকে বললুম—"রানু, আবার আমি চললুম!"

রানু যেন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কেন?"

রানুকে এর জবাব কি দেব? আমি চুপ করে রইলুম।

রানু আবার বল্‌লে—"কোথা যাচ্ছ?"

আমি বল্‌লুম—"তার কোনো ঠিক নেই!"

রানু খানিকক্ষণ চুপ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল—কি যেন খুঁজে দেখতে লাগল, তারপর বলে উঠল—"না, তুমি যেয়ো না!"

আমি বল্‌লুম—"কেন?"

রানু চুপ করে রইল। ঠিকই ত, এর উত্তর সে আমায় কি দেবে?

রানু বল্‌লে—"আবার কবে দেখা হবে?"

মনে হল যেন অনেক দূর থেকে—আকাশের ঐ ওপার থেকে—রানু আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলে।

আমি সেই দিকে চেয়ে চীৎকার করে বলে উঠলুম—"হবে, দেখা হবে!"

রানু অবাক হয়ে সেই নীল আকাশের দিকে চুপ করে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি চলে এলুম।

শ্রীমাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

---

# আগাছা

চৌদিকেতে শস্য-শ্যামল
হোতায় বুঝি ভুল করে',
অকেজো ওই আগাছাটা
দাঁড়িয়ে আছে ফুল ধরে'।
শিষ্ট ছেলের পাঠশালাতে
অসভ্য ওই সঙ্গীটি,
নগ্ন দেহেই মগ্ন নয়ন
হাসার দেখ ভঙ্গীটি।
জমাট হাটের মধ্যখানে
লেনা-দেনার চত্তরে,
নাচছে বাউল একতারারি
সুরের ঘোরেই মত্ত রে।
এ যেন হায় 'রোকর' খাতায়
শূন্য 'জমা'র ছত্রটি,
'মহাফেজের' দলিলখানায়
নিমন্ত্রণের পত্রটি।
'আবশ্যকে'র রাজধানীতে
'নিষ্ফলতা'র বিদ্রোহ,
পরাজিতের জয়-পতাকা
গর্ব্ব বড়ই দুঃস[illegible]প্রতীক
তুচ্ছ করে' চা[illegible]
নিন্দা ঘৃণা টিট্‌কার উদ্দেশ্য [illegible]
কর্ম্মবিহীন দিচ্ছে কে এই
দিন-দুপুরেই গিট্‌কারী।
কাজ কি উহার মূল্য কমে,
কাজ কি উহার সৌরভে,
সার্থক ওযে ব্যর্থতারি
আনন্দে ও গৌরবে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

---

# মাসকাবারী

## নিম্নাধিকারের কথা

সুন্দর-সম্বোধ বা সুন্দর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা করা গেছে তা' থেকে বিষয়টা খুব পরিষ্কার না হোক্, অন্ততঃ কথাটা কতদূর কি রকম দাঁড়াতে পারে, তার একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া গেছে। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের মতে কাব্যের উপজীব্য যে রস তার ধারণা তর্ক আলোচনার দ্বারা বেশ সরল ও সহজ করে' তোলা না গেলেও, রসবস্তুর বিচার—যেমনটি রসিকের ধারণা আছে—, তার সঙ্গে মেলে। মনে হয়, ও যেন একটা Revelation, যেন ঋষিবাক্য! এই রসের প্রমাতাই হচ্ছেন ঋষি, তাঁর সাক্ষ্য হচ্ছে শেষ মীমাংসা। কিন্তু আলোচনা করতে গেলে মন তাই নিয়েই শান্ত হয় না। অজ্ঞেয় না হ'লেও অজ্ঞাপ্য যা,' তাকে নিয়ে আলোচনাই চলে না। এ জন্যে আমি এই সুন্দর-সংবেদনা বা রসবোধকে উচ্চ-নীচ অধিকারভেদে পৃথক করে' নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

* * * *

রসের উচ্চতম অবস্থা বা আদর্শের কথা বড্ড বেশী রকমের দার্শনিকতায় দুর্বোধ হয়ে পড়ে। সেই বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য অবস্থা সাধারণ রসাস্বাদ বা রসবিচারে প্রত্যক্ষ ভাবে নেই। আমি গোড়া থেকেই বলে' আসছি, বিষয়টার সম্যক্ আলোচনা বহু বিতর্কের সৃষ্টি করে; আর শেষে, ফলও যে বেশ পাওয়া যায়, তা' নয়। কিন্তু ঐ উচ্চতম রসাবস্থার কথা বাদ দিলেও সাধারণ সুন্দর-সম্বোধ ব্যাপারটি যা' মানব-সাধারণের হৃদয়ে ঘটে—যে নিয়ম অনুসারে, যে রহস্যের আকর্ষণে আমরা সুন্দর দেখে মুগ্ধ হই—তা'র আলোচনা তর্কযুক্তি ও বিজ্ঞানের সাহায্যে যেটুকু সম্ভব, তা' করলেও যথেষ্ট লাভ আছে। তাই রসের আদর্শ থেকে একটু নেমে এসে, প্রত্যক্ষ, বাস্তব, লৌকিক রসরহস্য একটু সাধারণ ভাবে আলোচনা করব। এর থেকে যেন এ ভুল ধারণা না হয়, যে আমি রসের উচ্চাধিকারকে ত্যাগ করে' বসেছি।

* * * *

সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানের একটা বড় কথা এই যে—সুন্দরবোধ জিনিষটা বিকাশের অপেক্ষা রাখে, ওটা একেবারে পূর্ণাঙ্গ হয়ে প্রকাশ হয় না। আদিম অসভ্য মানুষের মনেও একটা অস্পষ্ট সুন্দর-চেতনা আছে, সভ্য-সমাজের অশিক্ষিত লোকের সুন্দরবোধ এক রকম, শিক্ষিত কলাবিদ্ ব্যক্তির হৃদয়ে তা' আরও প্রস্ফুট; আবার, যাঁকে ভাগ্যবান রসিক পুরুষ বলা যায়—তাঁর হৃদয়ের সুন্দর-প্রীতি পূর্ণরসতায় পরিণত হয়। তবেই দেখা যায়, ও জিনিষটা যেন সাধন-অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে। তবে, হৃদয়বৃত্তির সাধন—Soulএর Culture—ঠিক সজ্ঞান ক্রিয়া নয়। জন্মান্তর বা Heredity, জাতি বা বংশগত চেতনার ক্রমবিকাশপথে এই সুন্দর-সংবেদনাও স্ফুটতর

হ'য়ে উঠে। এবং এই ক্রমবিকাশের মধ্যে একটা এমন স্তর বা সোপান মোটামুটি নির্দ্দেশ করা যায়, যেখানে অধিকাংশ মানুষের চেতনা সমানভাবে সুন্দরের প্রভাব স্বীকার করে। এই সুন্দর সাধারণ-সুন্দর বটে, সাধারণ ভাবে সকলেই এঁর বশবর্ত্তি। কিন্তু এই সাধারণ সুন্দরকেই সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে অনুভব করে', আপনাপন বিশিষ্ট উচ্চতর সুন্দর-চেতনার সাহায্যে, বেশী করে' উপভোগ করবার শক্তিও অনেকের আছে, একথা স্বীকার করতে হবে। এই Universal Standardকে ছাড়িয়ে Individual রসবোধ অনেকটা অগ্রসর হ'য়ে যায়; এবং যে পরম আদর্শের পূজায় লোকে আত্মহারা হয়ে সকল সামাজিকতার উপরোধ অগ্রাহ্য করে, তাকে জাগতিক প্রয়োজনের বহির্ভূত ও বস্তুতন্ত্রহীন বলে' যাঁরা ধিক্কৃত করেন, তাঁদের মতের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক Psychological theory of beautyরও মিল হবে না। রসবোধ জিনিষটা গোড়ায় ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ হ'লেও কেমন করে' জটিলতর মনোবৃত্তির বশে ক্রমশঃ যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়-সম্পর্কহীন হ'য়ে, যথার্থ রসপদবীতে পৌঁছয়, তার মনস্তত্ত্ব-ঘটিত বিচার অনুসরণ করলে একটা বিষয়ে সন্দেহ থাকে না—সে ঐ কথা, যে—রসের সংজ্ঞা যাই হোক্, তার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বলে' একটা মূলগত নিয়ম আছে; ও জিনিষটা মানবীয় আর সকল সংস্কারের মতই অনুশীলনের যোগ্য। এই অনুশীলন গোড়ায় প্রকৃতির দ্বারাই হচ্ছে। সেই সূক্ষ্ম দুরবগাহ ক্রমবিকাশরহস্য ব্যক্তিবিশেষের জীবনে প্রত্যক্ষ হয় না। ব্যক্তির জীবনে যা' সৌভাগ্য বা Chance বলে' মনে হয়, তা' জাতি বা যুগ হিসাবে একটি স্পষ্ট নিয়মের অধীন বলে' বিশ্বাস হয়। মোট কথা, রসের আদর্শ যত বড়ই হোক, সাধারণ রসবোধ বলে' একটা জিনিষ মান্‌তে হবে, আর সেই সাধারণ রসের উপরেই আসল রসতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত।

* * * *

আলঙ্কারিক যা'কে ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর বলেছেন, Psychologist তাকে বিশ্লেষণ করে' দেখাতে চান, যে তা' ইন্দ্রিয় স্পর্শজনিত চিত্ত-চমৎকার। এই দুই দিকের মতই মেনে নেওয়া যায়—দুই-ই ঠিক। দুই জন দুইদিক থেকে দেখেছেন। যিনি রসকে 'স্বপ্রকাশানন্দ চিন্ময়' বলেছেন, তিনি রসের আশ্রয় বা আধার মনোদেহ, আর তার বিষয় বা বহির্গত রসোদ্দীপন বস্তু—এই দুইই বিস্মৃত হয়ে, রসচেতনাকে পৃথক্ করে' নিয়ে তার সেই উৎকৃষ্ট লক্ষণ নির্দ্দেশ করেছেন। নিছক খাঁটি রসচেতনা তাই বটে, কিন্তু সাধারণ জীবনযাত্রায়, আমরা সব সময়ে ঐ পূর্ণরসতার অবস্থায় উঠতে না পারলেও একরকম রসাস্বাদ যে করে' থাকি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাব্য, চিত্র, সঙ্গীত, দৈনন্দিন-জীবনের কত দৃশ্য কত ব্যাপারে রসোদ্রেক হচ্ছে, তার ঠিকানা নেই। এই সাধারণ রসচেতনায় সব সময়ে ঐ পূর্ণরসতার লক্ষণ যে আছে তা' ত' নয়ই, বরং অনেক ক্ষেত্রে এই ভাব নিরতিশয় প্রীতির অবস্থা না হ'য়ে, স্পষ্ট বেদনা ও আক্ষেপের—লৌকিক বাসনার —প্রতিচ্ছায়ার মত অনুভব হয়। অভিনয় দেখে চোখে জল আসে, উপন্যাস পড়ে' মমতায়, সমবেদনায় হয়ত' হৃদয় দ্রবীভূত

হ'য়ে যায়। উৎকৃষ্ট সঙ্গীত শুনলে যেন আবিষ্টের মত' হয়ে যেতে হয়; মাথার ভিতর কি জ্বলতে থাকে, আত্মা যেন অস্পষ্ট বিশাল ছায়ারাজ্যে বিচরণ করে, অদ্ভুত অসীম বস্তুকে হাত বাড়িয়ে বুকে জড়াতে যায়; কখনও বা সর্বেন্দ্রিয় অবশ হয়ে' পড়ে—অনাস্বাদিত কোন্ স্বপ্নময় সুখে, অননুভূত কোন্ পরম দুঃখে আকুল হ'তে হয়। এই যে সকল ভাব, এদের রস বলা যায়—এ রস বহুবচন; কিন্তু অখণ্ড স্বপ্রকাশানন্দ চিন্ময় অনুভূতি—বেদ্যান্তরস্পর্শ শূন্যতার যে শ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিক অবস্থা—তা' থেকে এ যেন নিম্নস্তরের। এই সাধারণ লৌকিক রসসংবেদনার মধ্যে ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ ও মানস-ক্রিয়া আছে; কেবল, তা' প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ; সাক্ষাৎ বস্তুগত নয়, সাধারণীকৃত; জটিল, বহু-ভাবমিশ্র—বস্তুসদৃশ না হলেও একেবারে অবাস্তব নয়। নিম্নতর অনুভাব বা চিত্ত-বিকার থেকে এই রসভাবের বিশেষত্ব এই যে, বাস্তবের প্রয়োজনবোধ এর মধ্যে নেই, মন ও-অবস্থায় যে বাসনা বা চিত্তবৃত্তির অধীন হয়, যে ভাব এবং অভাবের ক্রীড়নক হয়, তার চরিতার্থতার জন্যে বাস্তব জীবনে কোনো শক্তি প্রয়োগের কথা ভাবে না—আপনার মধ্যে আপনি এই রস পরিপাক করে, এবং রসাবেগ অতিরিক্ত হ'লে, কল্পনার সাহায্যে শিল্পসৃষ্টির মধ্যে এই আবেগকে মুক্তি দিয়ে সুস্থির হয়। আলঙ্কারিকের মতে এই অনু-ভাবগুলি শৃঙ্গারাদিরসপর্য্যায়ভুক্ত হয়েছে—এদের আমি বল্‌ব সুন্দরসংবেদনামূলক ভাবোচ্ছ্বাস। সামাজিকবর্গের উপজীব্য, বিশ্লেষণযোগ্য, নিত্যপ্রত্যক্ষ এই রসের ধারণাই Psychologistদের Aestheticsএর বিষয়। রসের অখণ্ড চিন্ময়তার সম্বন্ধে এই বৈজ্ঞানিক গবেষণা নাস্তিক্যবাদী হ'লেও, সুন্দর-সংবেদনার এই লৌকিক দিকটি তাঁরা নিপুণভাবে বিচার-ব্যাখ্যা করেছেন; সে বিচারে আসল রস নামক পরমানন্দকে স্বীকার না করলেও রস-তত্ত্বের একটা দিক বড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে হচ্ছে এই, সুন্দরবোধের একটা সার্ব্বজনীন Necessary নিয়ম নেই, যুগ ও জাতি ও তথা ব্যক্তিবিশেষের উন্নতাবনত অবস্থার উপর এই সুন্দরের আদর্শ নির্ভর করে। মানবীয় Culture যেমন ক্রমোন্নতিশীল, এই সুন্দর-চেতনাও তেমনি উৎকর্ষযোগ্য। এই আদর্শের পরিবর্ত্তন, বোধের সূক্ষ্মতা ও গভীরতা, সুন্দরা-স্বাদের অল্পাধিক শক্তি—সবই সম্ভব। কোনো Universal standard দিয়ে এই সুন্দরের লক্ষণ নির্দ্দেশ হয় না—একটা সাধারণ সংজ্ঞা ঠিক করা যায় মাত্র। Soulএর উচ্চাধিকারের কথা, এইরূপ রসবিচারের কালে, উপস্থিত মত ত্যাগ করে', সুন্দর-সংবেদনার মনস্তত্ত্ব-ঘটিত উৎপত্তিবাদ মেনে নিলে, বিষয়টাকে একদিকে সহজ বুদ্ধিতে আয়ত্ত করা যায়।

## মনোবিজ্ঞান ও রসতত্ত্ব

এই জন্যে আমার মনে হয়, ইংরাজ Psychologistদের বিশেষতঃ Associa-tionistদের মতের বেশ একটু মূল্য আছে। আদিম ইন্দ্রিয়-ঘটিত সুখদুঃখবোধ থেকে Emotion জিনিষটা কেমন করে' ক্রমে বিষয়-আশ্রয় ত্যাগ করে' একটি ভাব-স্থির রসবোধে পরিণত হয়; ইন্দ্রিয়-বিষয়ের উপর ক্রমপ্রবুদ্ধ মনের আধিপত্য কেমন করে'

বেড়ে যায়; Imagination বা ভাবকল্প নামে যে মানস-ক্রিয়া, তার সাহায্যে বিষয়-চেতনা প্রত্যক্ষ বিষয়কে ছাড়িয়ে স্মৃতিশক্তি ও Associationএর বলে, নানা অতীত ভাবের সংমিশ্রণে, কেমন করে' একটি মনোগত বিশুদ্ধ ভাবে পরিণত হয়, এবং ঐই ভাবগত পূর্ব্ব সংস্কার মনোবৃত্তির অনুশীলন-ফলে যার মধ্যে যত শক্তিশালী হয়ে ওঠে তার মধ্যে এই রস তত অনিবার্য্য ও গভীরভাবে উদ্রিক্ত হয়—এই সকল গবেষণা Aestheticsকে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে', লৌকিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, বিশেষ উপকার সাধন করেছে।

## সুন্দর-সংবেদনায় স্বভাব ও আর্ট

স্বভাবশোভা বা শিল্পচাতুরী মানুষের মনে যে রসের উদ্রেক করে, যাকে আমরা সুন্দর-সম্বোধ বলি তার একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, তা' ইন্দ্রিয়ভোগমূলক নয়—একটা মানসিক উপভোগ, একটা বিচিত্র সুখ, মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, সেটা যেন ঐ সকল বস্তুর দ্বারা উৎপন্ন হ'লেও তাদের সঙ্গে বাস্তবসম্বন্ধ-শূন্য। অর্থাৎ, সেটা একটা Passive চেতনা মাত্র—প্রতিক্রিয়া, প্রতিকার, প্রাপ্তিচেষ্টা বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, তার মধ্যে একেবারেই নেই। প্রাণের মধ্যে এই ভাববিলাস নিষ্ক্রিয় চিত্তবৃত্তির দ্বারা উদাসীন ভাবে উপভোগ করা হয়। এই জন্যে একে seeming activity বা Play বা চিত্তবিলাস বলা হয়। এই জন্যে এইরূপ চেতনা ভালো করে' ফুটিয়ে তোলবার পক্ষে স্বভাব বস্তুর চেয়ে স্বভাব-অনুকারী শিল্পচাতুরী বা বাস্তবের ভাণ-প্রতিকৃতিই বেশী উপযোগী। যা' বাস্তব অর্থে সত্য নয়, যার মধ্যে নিপুণ শিল্পী বাস্তবের একটি ভাণ বা মায়া প্রতিফলিত করেছে, তার থেকেই এই রসোদ্রেক সহজে ও সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয়। অভিনয় কালে পাত্র-পাত্রীর সুখদুঃখ আমাদের যে ভাবে অভিভূত করে, তা' রস; কিন্তু, বাস্তব জীবনের ঘটনায় যখন ঐ সব প্রত্যক্ষ করি তখন মন যে উল্লাস বা বেদনাবোধ করে, সেখানে বাস্তবের অধীনতাপাশ থেকে মুক্তি বা রসাস্বাদ নেই। চোখের সামনে একজনকে সত্যই হত্যা করলে আমরা এক রকম চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করি, রঙ্গমঞ্চে হত্যার অভিনয় দেখে লোম-হর্ষণ হ'লেও সে অনুভাব অন্যরূপ। সত্য বটে অভিনয়-চাতুরী খুব উচ্চ অঙ্গের হ'লে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, এবং এই ভ্রম উৎপাদনই অভিনয়ের সার্থকতার পরিচয়; কিন্তু মনে রাখতে হবে, অভিনয়ের এই দিকটা সাধারণ সামাজিকের রসোদ্রেকের জন্যে নয়, সেটা তাঁদের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়মোহ সৃষ্টি করবার কৌশল,—Imaginationএর উপর নির্ভর না করে' actual, realকে বেশী প্রত্যক্ষ করিয়ে natural affections বা primitive feelingsএর উত্তেজনাই তার উদ্দেশ্য। আর্ট স্বভাবকে হুবহু নকল করবে না, চিন্ময় কল্পসৃষ্টিতে রূপান্তরিত করবে—স্বভাবের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য ছড়ানো, তাকে কেন্দ্রীভূত করবে—তবে প্রকৃত রসসম্বোধের উপায় হবে। অভিনয়ের Illusion যদি সম্পূর্ণ হয়, তবে রসের বিষয়টি ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হ'য়ে অতি মাত্রায় বাস্তবাত্মক হ'য়ে রস-উপভোগে বাধা দেয়, মনকে কিছুক্ষণের জন্যেও বাস্তব-

মুক্তির অধিকারী না করে' বাস্তবের অধীন করে; কেবল, মনের মধ্যে বাস্তব সুখ দুঃখের অভিজ্ঞতা একটু বাড়িয়ে দেয় মাত্র। এ জন্যে এ সকলকে Pychologistরা simple natural emotions বলবেন—সংস্কৃত আলঙ্কারিক একে নিম্নপর্য্যায়ের রস ব'লে আসল রসকে পৃথক্ নির্দ্দেশ করেছেন। বৈষ্ণব-দর্শনের মধুর, বাৎসল্য প্রভৃতি রসও এই জন্যে বাস্তব লৌকিক স্বার্থ সংযোগে রস না হয়ে রসাভাস হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্যে higher aesthetic activityকে, Schiller থেকে Herbert Spencer পর্য্যন্ত এক রকম play impulse বলে' স্বীকার করেছেন। মন ঐই Activityতে একটি কল্প-জগতে বিহার করে, একটি স্বপ্নানন্দ বা রসাবেশের বিচিত্র, মধুর, ideal সৃষ্টিকে অবলম্বন করে' এই রসাবস্থা লাভ করে।

Association-বাদী Psychologistরা এই simple affectionকেও simple বলবেন না। এও নানা আদিম অবস্থার sensationএর অধুনা simple বলে' মনে-হওয়া compound অনুভাব। মনোবৃত্তির প্রসার, চিন্তা ও ভাবকত্ব গুণের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে এই শৃঙ্গারাদি simple emotionও ক্রমে Aesthetic sentiment হ'য়ে দাঁড়ায়। মনের মধ্যে বহুকালসঞ্চিত বহুজীবনাগত বহুপূর্ব্বানুভূত নানা অনুভাব, Association-নিয়মে ক্রমাগত একত্র উত্থিত বা suggested হ'য়ে ভাবকত্বের প্রতিষ্ঠা করে, তারি দ্বারা যা' বস্তুগত, তা' সাধারণীকৃত হ'য়ে ভাবগত হয়ে দাঁড়ায়। প্রাথমিক বস্তুগত বাস্তব অনুভাবগুলি মনের মধ্যে কতকগুলি permanent modes of affection প্রবর্ত্তিত করে, পরে সেই affections বস্তু বিশেষের দ্বারা উদ্রিক্ত হ'লেও Imaginationএর ক্রিয়ায় বস্তুকে অতিক্রম করে' মনের মধ্যে বহু ভাবসংস্কার জাগরিত করে, এবং তাদের উপাদানে নবভাবধারার সৃষ্টি করে। এইরূপে বস্তু, বস্তুগত শৃঙ্গারাদিরস এবং তাদের ব্যঞ্জনাশক্তিপ্রভাবে aesthetic sentimentএর উদ্ভব হয়। ঐ Sentiment নূতন কিছুর মত প্রতীয়মান হলেও Psychologist এ'র মধ্যে সেই primary sensations ছাড়া আর কিছু দেখেন না। তবে Association-নিয়মে নানা জটিল ভাবের সংমিশ্রণে একটা নূতন কিছুর যে উপলব্ধি হয়, সেটা subjective illusion, তার বস্তুগত সত্তা নেই। কিন্তু তা'তে আমাদের আসে যায় না; রসের স্বরূপ অবস্থার মীমাংসা আমরা ওঁদের কাছে চাইনে। তাঁদের কথার যেটুকু স্বীকার করা যায়, সেটুকুই স্বীকার করব—বল্‌ব যে রস জিনিষটার ক্রমোৎকর্ষ আছে। স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-বিক্ষোভের জন্যে যে natural affections মানুষের মনে permanent হয়ে দাঁড়ায়' যা'কে আমাদের শাস্ত্রে শৃঙ্গারাদিরস বলা হয়েছে—সেই রস ক্রমবিবর্দ্ধন পদ্ধতিতে Aesthetic sentiment বা বাস্তব প্রয়োজন-বহির্ভূত, স্বার্থশূন্য, প্রতিকারচেষ্টা বা প্রতিক্রিয়া-রহিত, শান্ত, passive উপভোগ বা সুন্দর-রসাস্বাদে পরিণত হয়। এই অবস্থাতেও উচ্চ-নীচ বিভাগ সম্ভব—এক, ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর স্বপ্রকাশানন্দ; এবং অপর, সাধারণ লৌকিক রস-সংবেদনা—যার মধ্যে সাক্ষাৎ

ইন্দ্রিয়সম্পর্ক বা বাস্তববোধ বর্ত্তমান না থাকলেও, পূর্ব্বানুভূতি, সংস্কার, ভাবজটিলতার বশে বাস্তবকে আশ্রয় করেই একটা ভাবকত্ব জনিত কিম্ভূত-চেতনার উদ্রেক হয়।

## রসতত্ত্বের পুনর্বিচার ও অধিকারভেদ

কথাটা আমি পরিষ্কার করে' বলতে পেরেছি বলে' বোধ হচ্ছে না; বিষয়টার স্পষ্ট নির্দ্দেশ না হ'য়ে ইঙ্গিতমাত্র হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। কথাটা জটিল, কিন্তু সে-কৈফিয়ৎ দিলে ত' চলবে না। বরং, জটিল বিষয়কে সরল করবার জন্যেই প্রসঙ্গের অবতারণা। কথাটা আর একবার বলে' দেখা যাক। রস অখণ্ড, অনির্ব্বচনীয়, এ কথা অনেকবার বলা হয়েছে; রসাস্বাদনের মধ্যে কেবল আস্বাদ-চেতনাই বর্ত্তমান—বস্তু বিশেষের দ্বারা উদ্রিক্ত হ'লেও সহৃদয় সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির অন্তরে এমন একটি বিচিত্র অনুভাবের উদয় হয়, যা'তে স্বপ্রকাশা-নন্দ-ভিন্ন আর কিছুরই পরিচয় থাকে না। এই উচ্চাবস্থার অধিকার সকলের, নয়, অথচ সুন্দরসংবেদনা বহুলোকের মধ্যে নানা-ভাবে অল্পাধিক মাত্রায় আছে, তা' না হ'লে সাহিত্য বা শিল্পসৃষ্টি সার্থক হ'ত না। রসের ঐ উচ্চতম প্রকৃতির কথাও যেমন সত্য, তেমনি সুন্দর-পরিচয়ের সাধারণ আবেশ বশে এক রকম মানসিক উপভোগের কথাও সত্য। রস জিনিষটা Culture-এর অপেক্ষা রাখে। এই Culture কথাটার ব্যাখ্যা করাও দরকার। মানুষের বুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তি উভয়ের উৎকর্ষ হ'য়ে সমস্ত প্রকৃতিতে একটি সহজ নমনীয়তা ও সত্যসুন্দরের দিকে অনায়াস-প্রবণতা, অনন্য-সুলভ ভাববত্তার উদয় হয়। বেহালা প্রভৃতি যন্ত্রের তন্ত্রীগুলি যেমন, পুনঃ পুনঃ নানা রাগরাগিণীর উদ্বোধনে—বহু সাধকের বহুবিধ আলাপে, আশ্চর্য্য রকম সুরময় হ'য়ে ওঠে বলে' শোনা যায়—মানুষের হৃদয়ও সেইরকম, জন্মান্তর সাধনা ( বৈজ্ঞানিক মতে জাতি বা বংশগত প্রভাব ) এবং শিক্ষা-সাহচর্য্যগুণে একটি মার্জ্জিত বোধশক্তি বা ভাবস্বচ্ছতার অধিকারী হয়। অন্তরের এই বিশিষ্ট ধর্ম্মকে Culture বলা যায়। আমি রসজ্ঞতার তিনটি প্রধান অধিকার অনুমান করেছি। সর্ব্বোচ্চ অধি-কার হচ্ছে, রসকে ব্রহ্মাস্বাদের মত আস্বাদন করা। আর, সর্ব্বনিম্ন অধিকার হচ্ছে, শৃঙ্গারাদি-রস-প্রবণতা। এই নিম্ন অধিকারে বাহ্যবস্তুর সাক্ষাতে, নিছক emotion যা', তাই প্রবল হ'য়ে উঠে। কোনো নাটকের অভিনয় দেখার সময় বা কাব্য উপন্যাস পড়তে পড়তে, কল্পনা-সৃষ্টি অতিরিক্ত বাস্তব বা সত্য ঘটনা বলে' বোধ হওয়ায় স্বাভাবিক জীবধর্ম্মগত যে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়—অসত্যে সত্যের অভিমানবশে যে real অনুভাবের উদ্রেক হয়, সেই passions এর জাগরণকে একরকম রসসঞ্চারই বলতে হবে। কারণ, এই অবাস্তবে বাস্তবের মোহ কতকটা সহৃদয়তার অপেক্ষা রাখে, কল্পনাকে বাস্তবের মত বোধ করার মধ্যে দর্শক বা পাঠকের কল্পনা ( receptivity ) যথেষ্ট আছে। তাই তা'কে রস বলতে হবে বটে, কিন্তু এই রসোদ্রেক ব্যাপারে অভিনেতা বা গ্রন্থকর্ত্তারই কলা-চাতুরী—বাহাদুরী বেশী। আর তা' ছাড়া, এই রকম emotion এর মধ্যে ভাবকত্বের যে বিশিষ্ট গুণ—সাধারণীকরণ, যা' থেকে

একটি নির্লিপ্ত ভাবাবস্থা আসে—Indivi dual, Universal এর সঙ্গে এক হ'য়ে যায়, বিশেষ নির্ব্বিশেষে পরিণত হয়—মন বস্তুপরতন্ত্র না হ'য়ে ভাবপরতন্ত্র হয়—সে লক্ষণ একেবারেই নেই। এই অবাস্তবে বাস্তবের মোহজনিত emotion সময়ে সময়ে এত স্বাভাবিকতায় এসে দাঁড়ায়, অর্থাৎ দেহ-মনের জাগতিক necessityর বন্ধনে এত ধরা দেয়, যে তা'কে নিছক হৃদয়বৃত্তি ছাড়া কোনোরকম রসাবস্থা বলা চলে না; রস-কল্পনা এ রকম অবস্থায় নেই বললেই হয়। আমেরিকার কোনো রঙ্গমঞ্চে এক প্রসিদ্ধ অভিনেতা ওথেলোর ভূমিকা নিয়ে এমন চমৎকার অভিনয় করছিলেন, সমগ্র অভিনয় ব্যাপারটি এত বাস্তব বলে বোধ হচ্ছিল যে, যখন তিনি ডেস্‌ডিমোনাকে হত্যা করার ভাণ করছিলেন, সে সময় দর্শকদের মধ্যে এক সৈনিক হঠাৎ তার বন্দুক তুলে' তাঁকে লক্ষ্য করে' গুলি করে' বস্‌ল। তা'র এই উত্তেজনার কারণ, একজন 'নিগ্রো' একটি শ্বেতাঙ্গীকে সকলের সামনে হত্যা করবে এত বড় স্পর্দ্ধা! আঘাত সাংঘাতিক হয় নি, তাই সে যাত্রা তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন; নইলে সৈনিকের অতিরিক্ত রসজ্ঞতার ফলে সেইখানেই তাঁর অভিনয়লীলা শেষ হয়ে যেত। কল্পনার বিষয়ে এই রকম বাস্তব অনুভূতির দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

## মধ্যম রসবোধ

এই দুই অধিকার ছাড়া আমি একটি মধ্যম অধিকার নির্দ্দেশ করতে চাই। সেই অধিকারই Psychologist এর Aesthetic growth এর সমদেশবর্ত্তি। এই অধিকারের কথা আমি আগেও বলেছি, এবারকার প্রসঙ্গে সেই কথাটাই বিশেষ করে বলতে চাই। এ রকম আলোচনায় পুনরুক্তি-দোষ বোধ হয় তেমন দোষের নয়। Psychologistরা, বিশেষ ইংরাজী associationist school বলেন যে, আমাদের সর্ব্ববিধ জ্ঞান, ধারণা বা চেতনা সম্পূর্ণ subjective বা মনোগত। অর্থাৎ, বাহ্যবস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের মনে কোনো বস্তুগত ধারণা নেই, association বা suggestion নামক নিয়মে নানা খণ্ড চেতনার সমষ্টি, কতকগুলি জটিল সংস্কারই আমাদের জ্ঞানের বস্তু; তার সঙ্গে বহির্গত সত্তার কোনো সম্বন্ধ নেই—এমনি, অহং-জ্ঞানটাও একটা সংস্কার। এই রকম বিচারে aesthetic অনুভূতিও সূক্ষ্মতর ও জটিলতর সংস্কারমাত্র। মানুষের মনের মধ্যে মনো-ধর্ম্মের অধীন সংস্কারপরম্পরার সহযোগে, বহু অনুশীলনের ফলে, সম্পূর্ণ বিশ্লেষণীয় অথচ অখণ্ড বলে' প্রতীয়মান একটা ভাবগত অভ্যাসই হচ্ছে সুন্দর-সম্বোধ বা রসচেতনা। যা' আদিম অবস্থায় কতকগুলি খণ্ড খণ্ড প্রাথমিক ইন্দ্রিয়বিকার ছিল, তাই association এর নিয়মে ক্রমশঃ জটিল হ'য়ে এমন সকল সংস্কারের সৃষ্টি করে, যা' বস্তুবিশেষের দ্বারা suggested হ'য়ে মনের মধ্যে একটা মানসিক রসবস্তুর ভাণ জন্মায়। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর ধারণার কোনো সত্য জ্ঞান-সম্বন্ধ নেই, এই রসচেতনার মধ্যে বস্তুবিশেষের সাক্ষাৎ বাস্তব অনুভূতির মাত্রা খুব কম। বস্তুবিশেষ মনোতন্ত্রীর কোনো একটি স্থান স্পর্শ করে মাত্র, তারপর নানা পরোক্ষ অতীত স্মৃতি-

গত ভাবপরম্পরা প্রবাহিত হ'য়ে একটা অভিনব সুর বাজিয়ে তোলে—একটা রঙীন মোহ, একটা subjective illusion এর সৃষ্টি করে। প্রাণের এই রসে, এই রঙে রঞ্জিত হয়ে বাহ্যবস্তু প্রীতিকর হয়। সৌন্দর্য্য-বোধ association-জাত সংস্কারের বিশেষ বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশেষ রূপান্তর মাত্র। তা' হ'লে এটা মনোগত, বস্তুগত নয়। মানসিক উৎকর্ষের (culture) অনুপাতে সুন্দর-সম্বোধ পূর্ণতর হয়ে উঠে; যত বেশী বিষয়কে ছাড়িয়ে আশ্রয়কে অবলম্বন করবে—সেইখানে ঘনীভূত হয়ে চিদ্বিলাসের সহায়তা করবে—রসাবস্থা তত উচ্চ হ'য়ে উঠবে; যত বস্তুনিরপেক্ষ হ'য়ে ইন্দ্রিয় পারবশ্যের অতীত হ'য়ে আপনার-মধ্যে-আপনি বিহার বা আত্মরতির অবকাশ হবে, সুন্দরচেতনা তত গভীর হ'য়ে উঠবে। মনোবিজ্ঞানের আবিস্কৃত এই তত্ত্ব আমি আমার রসতত্ত্বের অন্তর্গত করে' নিয়েছি—ওটা আমি মানি, না মানলে রসতত্ত্বের একটা দেশ অনালোকিত থেকে যায়। Objective reality ও soul বলে' কোনো সত্তা অস্বীকার করার যে নাস্তিকতা—তা আমি মানি নে। কিন্তু একদিকে অহং, আর একদিকে জগৎ—এই দুইকে মেনে নিয়ে, তাদের মাঝখানকার এই যে সম্বন্ধ, তার বিচার Psychologist এর কাছে যতটুকু পাই, তাই দিয়ে নিজের আস্তিক্য-বুদ্ধির অনুযায়ী মীমাংসা করে' নেওয়ার কোনো দোষ দেখি নে। এই দুইকে মেনে নিয়ে তার অভেদতত্ত্ব উপলব্ধি করাই অদ্বৈতবুদ্ধির সাধন-পন্থা।

## সুন্দর-রহস্য

তা' হ'লে aesthetic sentiment বলে' যে উচ্চতর মানস-অবস্থা, তার একটা লক্ষণ হচ্ছে এই যে, তা Association বা Suggestionমূলক। এ কথাটা লৌকিক অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে বেশ প্রমাণ করা যায়। এজন্য Psychologistদের ঐ বিচার বড় সঙ্গত বলে বোধ হয়। সুন্দর বস্তুর পরিচয়ে আমরা মনের মধ্যে যে অবস্থা অনুভব করি তাকে একটু বিচার করে' দেখলে বোঝা যায় যে, সে অবস্থায় বস্তুগত সৌন্দর্য্য-বোধ ছাড়িয়ে একটা বৃহত্তর, অসীম, অবাস্তব অনুভূতিবশে চঞ্চল হই। একটা মধুর শব্দ মাত্র শুনে', বা একটা কোন বিশেষ বর্ণচ্ছটা দেখে আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ সুখানুভূতি হয় সত্য—কিন্তু মন ডুবে যায়, এমন গভীর সৌন্দর্য্যই আমরা বিশেষ করে' উপভোগ করি এবং করতে চাই। এই ডুবে-যাওয়া ব্যাপারটা কি? না, কোনো সুন্দর বিষয়ে প্রত্যক্ষের চেয়ে অপ্রত্যক্ষ, স্পষ্টের চেয়ে অস্পষ্ট—একটা subconscious অনুভাব বা অনুভাব-সমষ্টি জেগে' ওঠে, মনে যে রসের সঞ্চার হয় তা বস্তুর সীমা ছাড়িয়ে যায়; এমন কি, প্রত্যক্ষগোচর সুন্দরের সঙ্গে আমার মনের মধ্যেকার সেই কিম্ভূত দুঃখ বা সুখ-চেতনার যে কি সম্বন্ধ, তা' যেন বুঝতে না পেরেই সেই বস্তুতে আরও বেশী করে' আকৃষ্ট হই। বস্তুর মধ্যে যেন অসীম, দুরবগাহ কোন্ রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে; অথবা, তার দর্শনে যতই প্রীতি অনুভব করি না কেন, সে যেন তার symbol মাত্র, তার

সঙ্গে আর কোনো সম্বন্ধ নেই। রসিক ভাবুকের এই অবস্থা, এই অপূর্ব্ব রসচেতনা —যার মধ্যে বস্তুবিজ্ঞান আছে, অথচ যেন নেই, অথবা বস্তুকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গিয়েই যেন তা'কে রসকল্পনার মধ্যে বেশী করে' ফিরে' পাই—এই যে সুন্দরপ্রভাব, একে রসতত্ত্বের সর্ব্বোচ্চ অধিকার থেকে একটু নামিয়ে এনে, সুন্দর-সংবেদনা—এই বিশেষ নামে অভিহিত করা যায়। এই জাতীয় Suggestion-মূলক প্রীতিকে উচ্চ ও নিম্নাধিকারের মধ্যবর্ত্তি অধিকার বলে' আমি নির্দ্দেশ করেছি। সাধারণ রসবোধ এই পর্য্যন্ত পৌঁছলেই যথেষ্ট—এর চেয়ে বেশী সহৃদয়তা বা ভাবুকতা লৌকিক রস-বিচারে দরকার হয় না। এর মধ্যে কামনা আছে, সুখদুঃখের বস্তুগত জ্ঞান না থাকলেও এক রকম সাধারণীকৃত, ভাবগত সংবেদনা আছে; স্বার্থ-বোধ নেই, বিষয় থেকে মুক্তি আছে। কিন্তু, এক মধুর আক্ষেপ, আকুলতা, উদ্বেগ এই সুন্দর-সংবেদনার মধ্যে থাকার দরুণ, যেন পরোক্ষভাবে বেদ্যান্তরস্পর্শ আছে। বাহিরের মুখাপেক্ষিতা নেই, কিন্তু অন্তরের মধ্যে যে অভাব বিস্তৃততর কল্পরাজ্যে নানা রকমে, নানা উপায়ে পরিতৃপ্তি খুঁজছে—তা' আছে। এক মহান্ অপরিতৃপ্তির আভাস এই মধ্যম অধিকারে সব সুন্দরবস্তুতে থাকে। এই ভাবাবস্থা, এই aesthetic sentiment এর বশবর্ত্তি হয়েই কবি বলেন, 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought'; প্রণয়ী বলেন, If I love you, what is that to you?—তাঁর ভালোবাসায় যত অপরিতৃপ্তি, তা' ততই মধুর; তাই, All other pleasures are not worth half its pains. এই রসাবস্থা থেকেই সৃষ্টি হয়। এই উন্নততর সম্ভোগকল্পনা, যা' বস্তুসকলের সীমার মধ্যে বাধা পায়, যার উপভোগের জন্য মনঃকল্পিত, নিয়তিকৃতনিয়ম-রহিত, ইন্দ্রিয়পারবশ্যমুক্ত, অবাধ অসীম দেশ-কালের প্রয়োজন—তারই উদ্বোধন করে যে বস্তু, তা'কে খুঁজে নেওয়া, চিনতে পারা, তা'র সমস্ত suggestion, সন্ধান, বুঝে নেওয়ার যে রসিকতা—তাই হচ্ছে আসল সুন্দর-সংবেদনা। বাস্তবের মধ্যে অবাস্তবের ইঙ্গিত, সীমার মধ্যে অসীমের আভাস, বাক্যের মধ্যে অর্থাতীত ভাবের ব্যঞ্জনা, প্রত্যক্ষের চারিপাশে অপ্রত্যক্ষের মহিমজ্যোতি, ক্ষুদ্রের মধ্যে বিরাট, অংশের দ্বারাই সমগ্রতার উপলব্ধি, স্পষ্টের চেয়ে অস্পষ্টের গৌরব, অসংশয়ের চেয়ে সংশয়ের মোহ-মাধুরী—সুন্দর-সংবেদনার এই যে সব-চেয়ে বড় রহস্য তারই নানা রকম লীলাকে Aesthetic activity বলে। এর ভিত্তি-নিরূপণ Psychology যা' করেছে, তা' সম্পূর্ণ ও সুসঙ্গত বলে' বোধ হয়। তবে, Psychology একে পুরো Subjective বলবে; আমি বলি, এটা sensation spiritualised হওয়ার পূর্ব্বাবস্থা। এখনও এর মধ্যে ইন্দ্রিয়-বিষয় idealised হ'য়ে কল্পজগতের সৃষ্টি করছে; সেখানে মনের সব ক্রিয়া বিশুদ্ধ সুপরিষ্কৃত হ'য়ে, স্থূলকে বর্জ্জন করে', সূক্ষ্মতাকে আশ্রয় করে' কাজ করছে। রূপ ভাবের আকারে পরিণত হয়েছে—'অহং' ও 'ইদং' এর দ্বৈত এখনও আছে, বেদ্যান্তরস্পর্শ রয়ে গেছে। তবে, জড়ের বিরোধ আর নেই, জড় ও

চৈতন্যের কতকটা যেন সাম্যভাব (indifference) এসেছে। এর পর উচ্চতর অধিকারে এই ভেদ একেবারে লোপ হয়—পরম রস, Subject ও Object এর identityর যে মুক্তি, তাই ব্রহ্মাস্বাদের মত আত্মাকে চরিতার্থ করে। এই অবস্থাই সেই blessed mood—

"In which the affections gently lead us on, until, the breath of this corporeal frame and even the motion of our human blood almost suspended, we are laid asleep in body, and become a living soul; while with an eye made quiet by the power of harmony, and the deep power of joy, we see into the life of things.—এই power of harmony, deep power of joyই হচ্ছে, যা'কে বলে সমাধি-রস।

## রসোৎপত্তি-নির্ণয়ে কবিদের সাক্ষ্য

কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ উচ্চতম রসাবস্থার কথাও যেমন বলেছেন, তেমনি অনেক জায়গায় ঐ Association-বাদকে পুরোপুরি স্বীকার করেছেন। প্রকৃতির যে sublime aspect, তার মধ্যে যে sense of awe and mystery কবিপ্রাণকে অদ্ভুত সুন্দর-রসে অভিষিক্ত করত, তার সঙ্গে স্মৃতিসুখকে এবং মনের আরও গভীরতর গহনের unremembered pleasuresকে, তিনি বার বার স্পষ্ট করে' উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত Odeএ তিনি এই সুন্দর-স্মৃতির রহস্য ভেদ করতে গিয়ে যে Immortalityর কথা বলেছেন তা'ও একরকম জন্মান্তরবাদ বলে' বোধ হয়। মনের মধ্যেকার পূর্ব্ব সংস্কার, যা' থেকে ভাবুকের চোখে জগতের উপর এক নতুন আলো এসে পড়ে—"The light that never was on sea or land"—তার কথা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ স্বীকার করেন। জন্মজন্মান্তরের association বা ভাবস্মৃতিকল্পনা—কেবল জীব-জীবন নয়, উদ্ভিদ-জীবনের মধ্যে দিয়েও ক্রমবিকাশপথে আত্মার ভ্রমণকথা, অর্থাৎ Evolution-বাদ, রসের উচ্চতর তত্ত্বে রূপান্তরিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' কবিতাটিতে। সেটি এমন অনিবার্য্য সুন্দররসে মনকে অধিকার করে, যে তাকে সত্য ব'লে স্বীকার করতে দ্বিধা হয় না। জগতকে যে এত সুন্দর দেখি, কল্পনায় সর্ব্ববস্তুরই রস যে আস্বাদ করতে পারি,—এই আস্বাদ করার মধ্যে যে একটি গভীর আত্মীয়তা প্রচ্ছন্ন রয়েছে, সে যেন ওই সুদীর্ঘ Evolution-যাত্রার পথস্মৃতিগত পরিচয়ের জন্যেই। সকল সৌন্দর্য্যের সঙ্গেই যেন unremembered pleasures জড়িয়ে' আছে। কেবল আধুনিক কবি নয়; এই ভাবের Association-ধর্ম্ম ও তার থেকে রসের উদ্ভব, মধ্যযুগের কবিরও অগোচর ছিল না। কালিদাস তাঁর দুষ্মন্তের মুখে 'রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্' প্রভৃতি যে শ্লোকটি দিয়েছেন, তা' পড়ে' সত্যিই আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হয়। যে রকম রসজ্ঞতা উনবিংশ শতাব্দীর cultureএর অপেক্ষা রাখে, যে অন্তর্দৃষ্টি ও ভাবুকতা—অন্ততঃ কবিতায়—প্রাচীন সাহিত্যে বিরল,

যা' এখনো এদেশে conservative সাহিত্য সমাজে অচল,—দুর্ব্বোধ, অস্পষ্ট, অর্থহীন বলে' একান্ত অনাদৃত—সেই রসকল্পনার একটি মূলতত্ত্ব প্রায় দেড় হাজার বছরের আগেকার কবির শ্লোকে ফুটে উঠেছে! রাজা দুষ্যন্ত বলছেন—'রম্য বস্তু দর্শন করে' আর মধুর শব্দ শ্রবণ করে', সুখের মধ্যেও প্রাণটা আকুল হয়ে উঠে কেন? নিশ্চয় এ সকল মুহূর্ত্তে হৃদয়ের মধ্যে ভাবস্থির জননান্তর সৌহৃদস্মৃতির উদয় হয়।'

Psychologistদের বিচার-বিশ্লেষণের ফল আর তার সঙ্গে এই সকল কবিদের, রসপ্রমাতাদের সাক্ষ্য একত্র করে' নিলে, আমি এই aesthetic sentiment বা মধ্যম অধিকারের যে সুন্দর সংবেদনার কথা বলেছি, তার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

শ্রীসত্যসুন্দর দাস।

---

# পূর্ণিমা-স্বপ্ন

মন্দ পবন বহিছে হেথায়,
সন্ধ্যা-তপন ওই ডুবে' যায়
সোণালি মাখা'য়ে মেঘে,
ফুলেরা উঠেছে জেগে।
রজনীগন্ধা-হেনার সুবাস
বিবাহের স্মৃতি—সুখ-অধিবাস
জাগাইছে আজ মনে,
পরশিছে মুখে বাতাসের শ্বাস
বহুবিধ চুম্বনে।

পশ্চিমে ওই বরণ-বিথার—
যেন নহবত-গীতি-উৎসার
অস্তাচলের বুকে!
নয়ন আমার করে তাহা পান
মধুর স্বপন-আসব সমান,
সেই গানে টুটে বকুলের প্রাণ,
সেই সুরে ছোটে আবীরের বান
সন্ধ্যামণির মুখে,
লাল হয়ে উঠে গোলাপ-আনন,
ফুটি'-ফুটি' করে শেফালির মন
সোণার বোঁটায় সুখে।

চলে' গেছি আমি স্বপনের পুরে
জাগর-জীবন হ'তে বহুদূরে,
জগত-সীমার শেষে,
নীল-ফুলে-ভরা কুঞ্জ-বিতানে
চেয়ে আছি আমি কার মুখপানে—
হ'য়ে গেছি ভোর রূপসুধাপানে,
চেয়ে আছি অনিমেষে।

থির-বিজুরীর জ্যোতির বিভাস—
মাণিক চিকরে অনুপম হাস,
আকাশের মত নয়ন উদাস,
কথা নাহি কিছু তা'য়—
নিখিল-মর্ম্ম-নীরব-আভাস
ভাসে আর ডুবে' যায়!

যে কথা বলিতে কথা না জুয়ায়,
মুখর কণ্ঠ মূক হয়ে যায়,
নাহি শ্রবণের অধিকার যা'য়,
নয়ন শুনায়, নয়ন বুঝায়—
সুন্দর সেই বাণী,
তাহারি আভাস খানি
ও-রূপ মাঝারে যেন চমকায়,
স্বপন ধন্য মানি।

রূপের প্রভায় ঝলসে নয়ন,
সীমা নাই, সীমা নাই!
এক এক করে' করিয়া চয়ন
দেখাবার নহে তাই।
সে ত' নহে শুধু দেহ-বিভঙ্গ,
কালো আঁখি আর কেশ-তরঙ্গ,
বিম্ব-অধরে মুকুতা-সঙ্গ,
সে যে সবই রূপ! সে যে অনঙ্গ
দিব্য আলোক-বিভা—
শেষ দিগন্তে পূর্ণ-প্রকাশ দিবা!

স্বপন মিলা'য়ে যায়,
জাগিতেছি পুনরায়,—
ধূমময় যেন দেবতা-আকার
বাহিরিল ভেদি' কপাল আমার
ধীরে ধীরে যেন হ'ল অপসার,
ফিরাইল চেতনায়!
নীলফুলে-ভরা কুঞ্জ-বিতানে
চেয়ে নাই আর রূপসীর পানে,
ধীরে উদিয়াছে ওই যে ওখানে,
আলোকিয়া নীলিমায়—
পূর্ণিমা চাঁদ, স্বপন মিলা'য়ে যায়!

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

---

# মেস্ট্রোভিক্

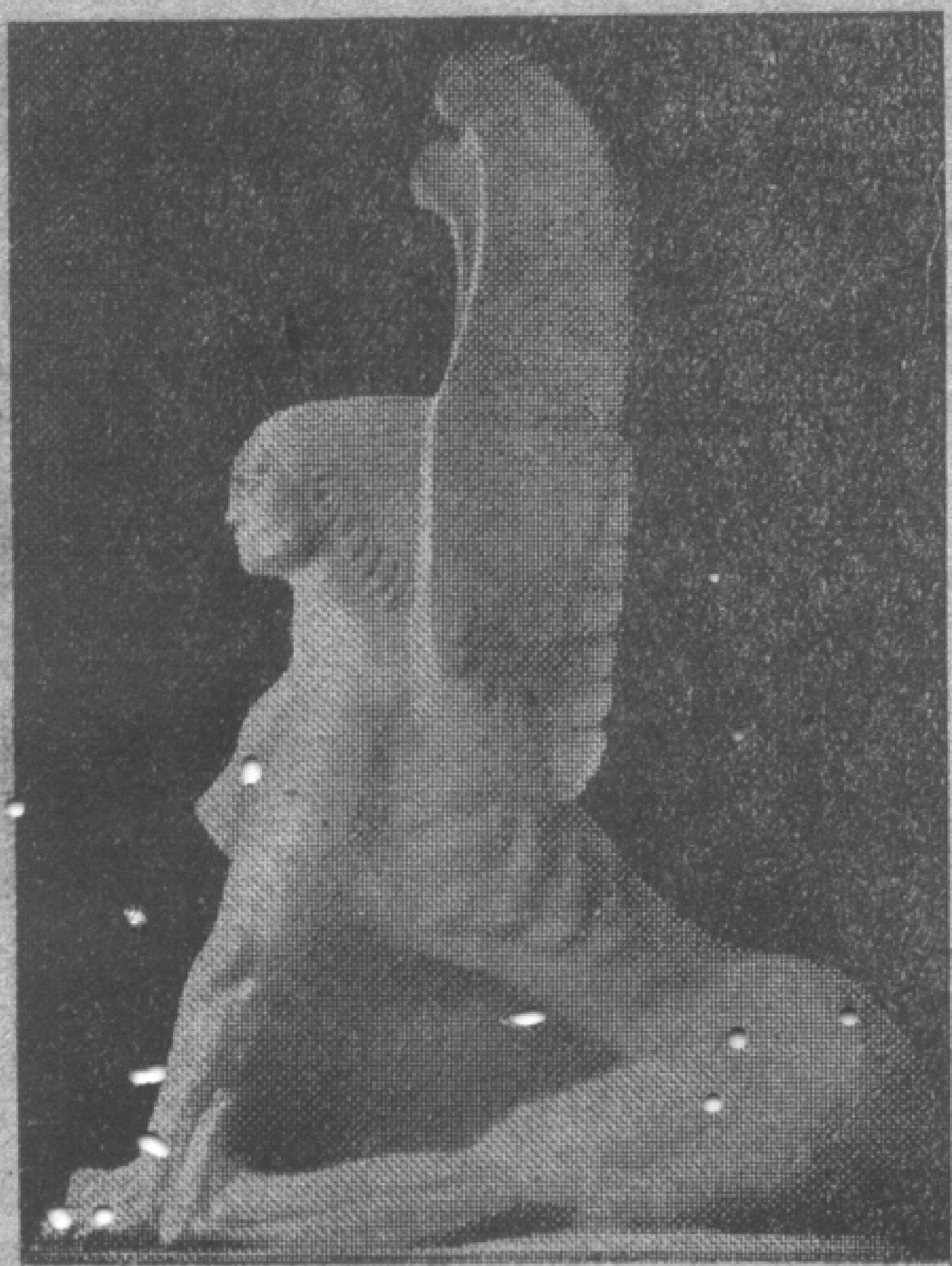
ওগস্ত্ রোদাঁ এখন পরলোকে। কিন্তু তাঁহার আসন আজ খালি পড়িয়া নাই। য়ুরোপীয় শিল্প-সমালোচকদের মতে, মেস্ট্রোভিক্ই এখন জীবিত ভাস্করদের মধ্যে সব-চেয়ে বড় শিল্পী। মেস্ট্রোভিক্ স্লাভ ভাস্কর।

স্লাভোনিয়ার Vrpolge নামক স্থানে ১৮৮৩ কিংবা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। স্লাভোনিয়া জায়গাটি একেবারে পাথরে গড়া, উঁচু-নীচু, এবড়ো-খেবড়ো, নিরেট কঠিন। শীতে যেমন হাড়ভাঙা শীত, গ্রীষ্মে তেমনি কাঠফাটা গরম। তাহার দুইদিকে দুই ভাবের রাজত্ব—একদিকে প্রাচ্য, আর-একদিকে পাশ্চাত্য। মেস্ট্রোভিকের কলা-পদ্ধতিতেও স্লাভোনিয়ার এই ভাব-মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শিল্পীর পরিবারেও দুই ধর্ম্মের আধিপত্য। তাঁহার পিতা খ্রীষ্টান, কিন্তু খুড়া মুসলমান।

মেস্ট্রোভিক্ চাষার ছেলে। কিন্তু চাষ-বাসের চেয়ে স্থাপত্য-কলার দিকেই তাঁহার বাপের মনের ঝোঁক ছিল বেশী। বাপের সেই শিল্পানুরাগ ছেলের মনের উপরে যথেষ্ট কাজ করিয়াছে।

ছেলে-বেলায় মেস্ট্রোভিক্ মাঠে মাঠে রাখালের কাজ করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার



মেষ্ট্রোভিকের গড়া মূর্ত্তি ১নং

চারিদিকে তখন অবিকল আদিম কালের মত নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, গম্ভীর, প্রাকৃতিক দৃশ্যের অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য জাগিয়া থাকিত! তাঁহার তখনকার সঙ্গের সাথী ছিল সুধু অবোলা জীবজন্তু। সেই শিলা-বন্ধুর নতোন্নত ক্ষেত্রে রাখাল-বালকের নিরালা জীবন সরল হইলেও, কষ্টকর ছিল অত্যন্ত।

মাঠ হইতে সাঁঝের বেলায় গাঁয়ে ফিরিয়া মেষ্ট্রোভিক্, পল্লীর বয়স্ক লোকেদের আসরের একটি কোণে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। সারাদিনের খাটুনির পর গ্রামের সকলে তখন এক জায়গায় জড়ো হইয়া দুর্লভ অবসরের মধুর আনন্দটুকু উপভোগ করিতেছেন। গ্রাম্য কবিরা বীরত্বের বিচিত্র গাথা গাহিতেছেন,—কখনো সুদূর অতীতের জাতীয় সেই মহাবীরগণের বিজয়-ধ্রুপদ, কখনো স্বদেশী ধর্ম্মের উপরে বিদেশী তুর্কীর অত্যাচারের বিবরণ, কখনো বা কোসোভো-ক্ষেত্রে সেই স্মরণীয় দিনের করুণ কাহিনী—সার্ভিয়ার স্বাধীনতা-সূর্য্য যেদিন বীরের বুকের রক্তে রাঙা হইয়া ডুবিয়া যায়! বালক মেষ্ট্রোভিকের প্রাণের পরতে পরতে অতীতের সেই জয়-পরাজয়ের, অশ্রুহাস্যের কাহিনী আগুন-আখরে ফুটিয়া উঠিত, বয়স-কালেও সে পুরাণো দিনের চির-নূতন কথা তিনি আর-কখনো ভুলিতে পারেন নাই। শিল্পীর মানস-ভাব এখানেও শিলা-পটের উপরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

দশবৎসর বয়সে মেষ্ট্রোভিক্ ঘরে বসিয়া কাঠ কাটিয়া কারুকার্য্য করিতে এবং মাটির তাল পাকাইয়া মূর্ত্তি গড়িতে সুরু করিয়া দিলেন। তাঁহার এই অশিক্ষিতপটুত্বের কথা লোকের মুখে মুখে অনেকদূর রটিয়া



মেষ্ট্রোভিকের গড়া মূর্ত্তি ২নং

গেল। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি সমাধি-শিলা-ক্ষোদনের কাজ পাইয়া দেশান্তরে গমন করিলেন। সেই সময়ে যীশু খৃষ্টের একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি গড়িয়া তিনি সকলকে অবাক করিয়া দিলেন। স্থানীয় মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষরা তাঁহার মধ্যে প্রতিভার অঙ্কুর দেখিয়া, চাঁদা তুলিয়া তাঁহাকে জ্যাগ্রেব নামক স্থানের শিল্প-বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন। সেখান হইতে তিনি শিক্ষালাভের জন্য ভিয়েনায় গিয়া হাজির হইলেন। এই ভিয়েনা-সহরে থাকিতে থাকিতেই তিনি রসিক-সমাজে প্রথম খ্যাতিলাভ করিলেন। ভিয়েনা হইতে তিনি প্যারি সহরে যান। সেখানে তাঁহার হাতের কাজ দেখিয়া অদ্বিতীয় শিল্পী রোদাঁ এবং বুর্দেল প্রভৃতি অন্যান্য অনেক নামজাদা কলাবিদ তাঁহার সঙ্গে বন্ধুতা-সূত্রে



মেষ্ট্রোভিকের গড়া মূর্ত্তি ৩নং



মেষ্ট্রোভিকের গড়া মূর্ত্তি ৪নং

আবদ্ধ হন। প্যারি হইতে ফিরিয়া ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভিয়েনায় আবার যে শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন করেন, তাহার ফলেই সকলে তাঁহার বিশদ পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে একজনপ্রথম-শ্রেণীর ওস্তাদ-শিল্পী বলিয়াজানিতে পারে।

ডোষ্টোএভ্স্কির উপন্যাসে যেমন রুশিয়ার জাতীয়তা, দান্তের কাব্যে যেমন ইতালীর জাতীয়তা এবং বাল্মীকি-ব্যাসের মহাকাব্যে যেমন ভারতের জাতীয়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে, আইভ্যান মেষ্ট্রোভিকের শিলামূর্ত্তির ভিতরেও তেমনি দক্ষিণ স্লাভগণের গোপন আত্মা আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে।

প্রাচীন প্রাচ্য শিল্পীর মত, তিনিও ললিত কলার উপরে একটা বিপুল-গম্ভীর, ধারণাতীত রহস্যের আবরণ দান করিয়াছেন। সে মূর্ত্তিগুলিতে ভিতরের আত্মা ফুটাইতে যতটা চেষ্টা করা হইয়াছে, বাহিরের দেহকে বা অ্যানাটমিকে ফুটাইতে একেবারেই ততটা করা হয় নাই। তাঁহার গঠিত অনেক মূর্ত্তিতে অতীতের দেহে বর্ত্তমানের ভাব সাকার হইয়া উঠিয়াছে—যেন আধুনিক মানবের আত্মা, সযত্নরক্ষিত মিসরের 'মমি'র মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া, পিরামিডের গভীর আঁধার হইতে তাহাকে টানিয়া আনিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রমুক্ত আলোকের মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

# বেতালের প্রশ্ন*

পরিচয় দিয়ে যাও গো চলিয়ে,
হিঁদুয়ানী-অবতার আমার!
সন্দীপ-কৃত সীতার গ্লানিতে
বোতাম বিদরে যার জামার?
"ঘরে-বাইরে"টা ঘরের বাহির,
করিতে তো তুড়ে-ফয়তা দাও,
হিন্দুয়ানীর পুঁচ্‌কে ছুয়ানী!
এদিকে বারেক চোখ্ তাকাও।
"জানকী মালিনী মাসী" ব'লে হেথা
হল্লা করে কে হাঁকডাকে,

আমি বলি বুঝি নিমে দত্তটা,
তুমি বল দেখি, লোকটা কে?
সীতারে খেম্‌টাউলী বানায়ে কে
নাচালে বানর-বৈঠকে,
আমি বলি ওটা গেঁজেল জামাই,
যে হোক্, চাবুক দাও ও'কে।
ব'কে ধম্‌কিয়ে 'থ' বানিয়ে দাও,
ক'সে ওরে তুমি দাও গালি,
রেয়াৎ কোরো না,—হিঁদুর শত্রু
কই?—কোথা গেল?—চুনকালি?

শ্রীত্রিবিক্রম বর্ম্মণ।

---

# কাজরী

৩৪

বহু কাল পরে আজ ন-বৌদির চিঠি পেলুম। ছেলে-পিলেরা সব অসুখে ভুগছে—পুরীতে কি আর কোথাও হাওয়া বদলাতে যাবে, লিখেছে।

শুনে উনি বললেন, এ'খানে ক'দিন বেড়িয়ে যেতে বলো না। দু'জনে তোমরা বেশ থাক্‌বে'খন!

কথাটা শুনে হাসি পেসে। বেশ থাকা—সে আশা আমার ঘুচে গেছে! এই ন-বৌদিকে একদিন চিঠি দিতে দেরী হলে, কিম্বা ন-বৌদির চিঠি সময়ে না পেলে প্রাণটা আগে কি-রকম অধীর হত! আর এখন সেই ন-বৌদির খোঁজ-খবরই মোটে নিই না। ন-বৌদি তার জন্মে কত অনুযোগ করে! চিঠিতেও তাই নিয়ে কত দুঃখ করেছে!

এই যে পুরোনো সাথী-সখীদের একে-একে ছেঁটে ফেলেছি, প্রাণ থেকে তাদের চিহ্ন অবধি মুছে ফেলে বসে আছি আজ, এ কেন, এ কেন—এ কার জন্মে? এইটুকু

---

* গত মাসের অর্চ্চনায় "ঘরে বাইরে" কবিতা দ্রষ্টব্য।

উনি বুঝতে পারেন না? হায় রে, ন-বৌদির চিঠিটা দেখে উনি একটু বিরক্ত হয়েই বললেন,—সত্যিই ত, ন-বৌদিকে চিঠি লেখবার তোমার অবসর হয় না মোটে—এত কি তোমার কাজ, বাবু!

কাজ—কাজ—এই কাজের কথাটাই বাজের মত আমার প্রাণটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিলে যে!

মুখ ফুটে বলতে পারলুম না ত,—ওগো, তুমি যে আমার এ প্রাণের অলি-গলি, ছোট্ট কোণটুকু অবধি, সব জায়গা জুড়ে বসে আজ আধিপত্য করছ! তোমার চোখের কোণে একটু হাসি ফুটলে প্রাণ আমার সে যে কি আনন্দের ঢেউ তুলে নেচে ওঠে!

উনি বললেন,—যখনই কাজ-কর্ম্ম সেরে বাড়ী ফিরি, তখনই দেখি, জুজুবুড়ীর মত ঘরের কোণটিতে বিরস বদনে তুমি বসে আছ! মনে সুখ নেই,—কেন, কি কষ্টে রেখেচি তোমায় আমি?

ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ঐ দেনা-পাওনার কথা বার বার এমন করে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আর তুলোনা গো! সাধে এমন থাকি! কোথায় গেল আজ, তোমার সেই অকারণ গল্পের অজস্র ঢেউ? কোথায় গেল, তোমার সেই সোহাগ-আদরের প্রাণ-মাতানো মন-ভরানো সে উত্তাল উচ্ছ্বাস, আমার প্রাণের সমস্ত মধুর-রস কি নিঃশেষে পান করেছ—পান করে' তোমার সকল তৃষ্ণা কি মিটে গেছে? সব সাধ পূর্ণ হয়েছে? কিন্তু আমার প্রাণের কুঞ্জে এখনো তেমনি ফুল ফুটছে ত—আরো বিপুল হয়ে, আরো অজস্র হয়ে! সাধ-আশার ফুলে-ফুলে প্রাণের কুঞ্জ ছেয়ে আছে যে—এ কুঞ্জে একবারটি আর তেমনি করে এসে বসবে না কি?

ন-বৌদিকে চিঠির জবাব দিলুম। লিখলুম, তোমার ঠাকুর-জামাই বলছেন, এখানে কিছু-দিন ছেলে-পিলেদের নিয়ে এসে থেকে যাও না, ভাই! এখানকার হাওয়া এখন বেশ ভালো।

ন-বৌদি আসুক—তাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখব—পৃথিবীর গতিকই এই,—না, এ শুধু আমারই দুর্ভাগ্য! মনের সঙ্গে তাহলে একবার শেষ বোঝা-পড়া করে নি।

৩৫

খোকার আবার কাল শেষ-রাত্রি থেকে জ্বর হয়েছে—নাঃ, আমি পাগল হব। ভয়ে ত আমি কাঁটা হয়ে আছি। শুনলে কত বিরক্ত হবেন উনি! এই সেদিন অসুখ গেল, আবার আজ—! এমন বরাত নিয়েও ভাঙতে এসেছিলুম! উনি সকালে যখন বেরুলেন, তখন জানতে পারেন নি, না জেনেই বেরিয়েছেন। কাল সারা রাত্রিটাই খোকা খালি থেকে-থেকে কেঁদেছে—ওঁর ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছিল। বিরক্ত হয়ে উনি বললেন, —সারাদিনের মেহনতের পর নিশ্চিন্ত হয়ে একটু যে ঘুমুবো—তা'ও অদৃষ্টে নেই! একটু দয়াও কি হয় না গা? শুনে আমার দুই চোখ জলে ভরে এল। খোকাকে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে বিছানা পেড়ে তাকে শোয়ালুম—নিজে মেঝেয় আঁচল পেতে পড়ে রইলুম। উনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে লাগলেন। একবার খোঁজও নিলেন না ত,—খোকা কেন এত কাঁদছে—আর তাকে নিয়ে কোথায়ই বা আমি গেলুম! দুঃখ কি সাধে হয়? অবশ্য

এ কথাও মনে হল,—এর আর ভাবাভাবি কি! আমি ত আর বাড়ী ছেড়ে কোথাও চলে যেতে পারি না! আর খোকার অসুখ হলে আমি কি ওঁকে কোন খপরও দেব না! তা-ছাড়া সারাদিনের পরিশ্রমের পর ঘুমটা ওঁর বেশী পাওয়াই স্বাভাবিক! সত্যিই ত, আমার জন্ত আহার-নিদ্রা ত্যাগ করতে পারেন না কিছু!

তবু এর আর-একটা দিকও আছে কি না! খোকা কি আমারই শুধু? তার উপর ওঁর কি এতটুকু মমতা নেই! ভালো জামা-কাপড়-জুতো, গাড়ী, খেল্‌না, আর দাস-দাসীতে ঘিরে রাখলেই মন শান্ত হতে পারে? ওগুলো ত বাইরের জিনিষ, লোক-দেখানো—ভড়ং মাত্র। আসল প্রাণের টান ত এইখানেই—তার এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য দেখলে প্রাণ অমনি অস্থির হয়ে উঠবে না?

এ'ও মানি, অস্থির হলেই কি সব-সময় অস্বাচ্ছন্দ্য সেরে যায়? তা যায় না। হাঁকু-পাকু করে কেউ কি কখনো কাকেও এতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে, না, তার অস্বস্তি কি অস্বাচ্ছন্দ্য উড়িয়ে দিতে পারে? তবে—!

এ তবে'র মানে বাইরে খুঁজ্‌লে মেলে না—এর মানে পাওয়া যায় মনের মধ্যে! যাক্—কি কতকগুলো পাগলের মত ভাবচি! আসল ভাবনা এই—সেদিন আমাদের তুজনের অসুখে ওঁর অত কষ্ট গেল! সময়ে আহার নেই, অফিসে বেরুতে পারলেন না, কাজ-কর্ম্ম দেখ্‌তে পেলেন্ না—কত লোকসান হয়ে গেল। তার উপর আজ বাড়ী ফিরে যেই শুন্‌বেন, খোকার আবার অসুখ করেছে—! সেদিন ত স্পষ্টই বল্‌লেন,—এর চেয়ে তোমরা সেখানে গিয়ে থাকোগে বাবু—এ-সব ঝঞ্ঝাট পোহানো আমার কর্ম্ম নয়! যাব, তাই যাব। এ রকম করে ওঁর সুখের পথে, স্বাচ্ছন্দ্যের পথে, রোজগারের পথে কাঁটা হয়ে পড়ে থেকে ওঁকে আর জ্বালাতন করব না! ওঁকে সুখ যদি না দিতে পারি, অন্ততঃ আরামটুকু কেড়ে নেব কোন্ প্রাণে?

* * *

বাঙ্‌লা বই দেখে খোকাকে একটু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিলুম! গাটা তার একটু নরম পড়েছে—এখন সে ঘুমুচ্ছে। ভাবচি, খোকার অসুখের কথা ওঁকে বলবো না। নারায়ণকে প্রাণপণে ডাকি। তিনি একদিন দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছিলেন —আমার লজ্জাও কি আজ তিনি রাখবেন না!

নারায়ণ খুব মুখ রক্ষা করছেন! উঃ! উনি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে এলেন, এসেই স্নান করে খেতে বসলেন—খেয়েই আবার বেরুলেন। কোথায় কাজের জন্ত এখনই যেতে হবে, বললেন—ফিরতে নাকি রাত হবে।

বাঃ—চমৎকার! খোকা রাত্রে কেন অত কাঁদছিল, তার একটু খোঁজও নিলেন না ত! দরকার নেই, দরকার নেই!

পলে-পলে এ উপেক্ষা, এই অবহেলা, —এ যে আর সহ্য হয় না, ভগবান! কিন্তু এ কথা মুখ ফুটে বলতেও পারি না যে! ওঁর ঐ এক জবাব—কি তোমায় না দিচ্ছি! টাকা-কড়ি, গহনা, কাপড়!

পুরুষ নারীকে কি ছোটই ভেবে রেখেচে! যুগ-যুগ ধরে নারী তার পায়ের

কাছটিতে পড়ে আছে—আশ্রিতা লতার মত! কোথায় পুরুষের স্নেহ-ভালবাসার রস পেয়ে আপনাকে সে বাঁচিয়ে রাখবে, বাড়িয়ে তুলবে—পুরুষ চোখে দেখেও তা দেখে না! নারীকে সে শুধু ঐ তুচ্ছ গহনা-কাপড়-চোপড়ের কাঙাল বলেই জেনে রেখেচে! ওরে নারী, এ অপমানের বোঝা মাথায় বয়ে বেড়ানোর চেয়ে মৃত্যু যে তোর লক্ষগুণে ভালো রে! 'রাজা-রাণী'র ইলার কথাটা মনে পড়েছে। নারীর সমস্ত অন্তরটুকু ইলাতে কবি কি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন! সত্যি, ইলার কথাগুলো পড়লে মনে হয়, জগতের নারীজাতি ক্রন্দনের ব্যাকুল সুর তুলে বলছে—

"যাও তুমি—আমি একা কেমনে পারিব
তোমারে রাখিতে ধরে! হায়, কত ক্ষুদ্র,
কত ক্ষুদ্র আমি! কি বৃহৎ এ সংসার,—
কি উদার তোমার হৃদয়! কে জানিবে
আমার বিরহ? কে গণিবে অশ্রু মোর?"

* * * *
* *

৩৬

আজ নবৌদির চিঠি পেলুম। কাল তারা আসবে,—দিন আষ্টেক-দশ এখানে এসে থাকবে! ন'দা আসতে পারবেন না—তাঁর কাজের ক্ষতি হবে।

ঐ রে আবার সেই কাজ! পুরুষের খালি এক সুর,—কাজ, কাজ, কাজ! আমরা নারী—আমাদের একটু সঙ্গ দেওয়া—সেটা কি কাজের মধ্যে নয় গো!

উনি শুনে বললেন—বেশ হ'য়েছে। তুমি একলাটি থাকো বলে দুঃখ কর। নবৌদি এলে তোমার সে দুঃখ ঘুচবে'খন। উনি আরো বললেন, এক কাজ কর। ঐ ঘরে তোমরা সকলে মিলে শুয়ো। আমি বরং পাশের ঘরে ঐ ছোট খাটটায় শোব'খন!

উনি যেন কথাটা বলে আরাম পেলেন! যেটুকু বন্ধন ছিল, তা থেকেও ওঁর মুক্তি হল! মুক্তির নিশ্বাস ফেলে উনি বাঁচলেন? আমি কি এমনি শৃঙ্খল হয়ে ওঁর পায়ে এঁটে বসেছি! নিজের উপর ধিক্কার হল! হা ভগবান, কি ধাতু দিয়েই তুমি পুরুষের চোখ তৈরী করেছ!

... ... ...

আজ নবৌদিরা আসবে! সে সুর প্রাণে আর বইছে না ত! সেই উদ্দাম আনন্দ, তীব্র অধীরতা! আমার কি সব বদ্‌লে গেছে! মন আমার সত্যিই কি নতুন ছাঁচে গড়ে উঠেছে! সত্যিই কি আমি পুরাণো-যা-কিছু, মায়া-প্রেম—মন থেকে সব ঝেড়ে বার করে দিছি! এই নবৌদিকে কাছে পেলে একদিন কি উচ্ছ্বসিত হয়েই না উঠতুম! আর আজ—কৈ, মনের সে উচ্ছ্বাস ত আজ আর নেই!

* * * *
* *

রাত্রে নবৌদি বল্‌ছিল,—খুব আরামে আছিস্ এখন, না?—"নিভৃত নীড়েতে দুই কপোত-কপোতী"—! বল্‌তে কি, শুনে আমার দুই চোখ জলে ভরে এল! মুখে প্রথমটা কোন কথাই ফুটল না!

নবৌদিকে শেষে সমস্ত কথাই খুলে বল্‌লুম। নবৌদি বকলে,—বললে,—তুই বদ্ধ পাগল! এখন বড় হয়েছিস্—ঘর-সংসার

নিয়ে থাকতে হবে এখন। এখনো যদি বেশীর প্রত্যাশা করিস্—তাহলে দুঃখ পাওয়াই সার হবে। নবৌদি বল্লে,—পুরুষ মানুষের ভালোবাসাটা দু'দিন পরেই তার উচ্ছ্বাসের ফেনা মেরে একেবারে জমাট হয়ে সমস্ত সংসারকে জুড়ে বসে! বুঝলি ? মেয়েমানুষের মনের ছোট-খাট আবেদন-নিবেদনগুলো সে জমাট ভালোবাসার ধারে অনর্থক ঘুরে বেড়াতে চায় যদি, ত তার কঠিন ধাক্কা খাওয়াই সার হবে।

আমি বললুম,—তুমি নিজের দিকে চেয়ে একবার বল ত ভাই, এই যে ন'দা তোমার সঙ্গে এখানে এলেন না, এতে কি তুমি সুখ পাচ্ছ ? এতে কি তোমার প্রাণে ব্যথা লাগে নি ?

নবৌদি বললে,—কিন্তু আরো একটা দিক যে আছে, ভাই! তোর ন'দা যদি এখানে এসে আমার সঙ্গে বসে থাকত, তাহলে যে-জিনিসটা সংসারে নিত্য-প্রয়োজনীয়—পয়সা-কড়ি, সেটার বিষম অনটন ঘটে যেত!

আমি বললুম,—এ অন্যায়! মনের সুখের মধ্যে পয়সা-কড়ির কথা এলো না। পয়সা-কড়ি থাকলেই কি মনের সুখ হয়! গরিবের ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দিন-রাত তাহলে তুমুল যুদ্ধ বেধে থাকত! আমি যদি পুরুষমানুষ হতুম, তাহলে স্ত্রীর মনটাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে এ-ভাবে চলতে পারতুম না।

নবৌদি বললে,—তুই পাগল! এ-সব নেহাৎ ছেলেমানুষী কথা!

আমি বললুম—মানলুম না হয় ভাই, তোমার পয়সা-কড়ির প্রাধান্য! কিন্তু তার ফাঁকেও কি স্ত্রীর সঙ্গে প্রাণ খুলে দুটো কথা কবার ফুরসৎ মেলে না! কেবলই কি সংসারের তুচ্ছ হিসেব নিয়ে মত্ত থাকতে হবে! ঐ তুচ্ছ হিসেবটা যেমন ফেলবার নয়, বলছ, তেমনি যাদের জন্যে সংসার, তাদের পেটের খোরাকের মত মনের খোরাকটারও সমান প্রয়োজনীয়তা আছে ত!

নবৌদি বললে,—তোর সঙ্গে অত সূক্ষ্ম হিসেব করতে পারি না, আমি। যখন দেখছি, রাত পোহালে ছেলেপিলের বিস্কুট, ওষুধ যোগাতে হবে, তখন দিন-রাত্তির তোর ঐ প্রেম আর সোহাগ নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে কি করে? বিস্কুট-ওষুধ এ-সবের জোগান তা হলে কে দেয়?

আমি বললুম,—সংসারটা যদি শুধু ঐ প্রয়োজনীয় ব্যাপার নিয়েই চলত, তাহলে ঐ নীল আকাশ, এই শ্যামল প্রকৃতি, ঐ গিরি-নির্ঝর এ-সব দিয়ে এ পৃথিবীকে ভগবান কখনই সাজিয়ে রাখতেন না! মানুষের চোখের সামনে শুধু দুধের সমুদ্র, আর খাবারের আকাশ পাহাড়, এই সবই তিনি ধরে দিতেন!

নবৌদি বললে,—এও কি একটা কথা হল! আসল ব্যাপার কি জানিস্—পুরুষ-মানুষের দোষ দিস্ নে! আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ও-বেচারারা দিনা-রাত্র কি পরিশ্রমটাই না কচ্ছে, বল্ দেখি। আমাদের ভালবাসে বলেই না তারা টাকা আনছে, আর ঐ টাকায় কাপড়-চোপড় গহনা-পত্তর, যা-কিছু দরকার কিনে আমাদেরই দরকারে সে পয়সা খরচ করছে। নিজের সুখ পুরুষ খুঁজচে না ত! তাদের নিজেদের কোন সখ নেই, সাধও নেই। যদি দেখতুম, ঐ পয়সায় নিজে-

দেরই সুখ-সাধ ওরা মেটাচ্ছে, আমরা শুধু ছেঁড়া কাণি পরে রান্নাঘরের ধোঁয়ায় পড়েই খুন হচ্ছি,—আর কেবল ওদের সুখেরই জোগান্ দিচ্ছি, নিজেদের পানে চাইবার অবসর নেই—ওরাও মোটে আমোল দিচ্ছে না, তাহলে বলতুম বটে, ওরা স্বার্থপর। কিন্তু তা ত নয়—যে পয়সার জন্য একদণ্ড ওদের আরাম নেই, বিশ্রাম নেই, সে পয়সা এনে আমাদেরি হাতে ওরা তুলে দিচ্ছে ত—নিজেরা পাগল-ভোলা হয়েই ঘুরে মরছে! এমন উদার ভালবাসার ছবি আর কোথায় পাবি, ভাই!

না, হার মানলুম! নবৌদির ঐ সাংসারিক তর্কের মুখে কথা জোগানো অসম্ভব। আজ-কাল ভারী একটা ভুল পথ দিয়ে নবৌদির এই যুক্তি-তর্কগুলো চলতে থাকে!

বেশ, মানচি, এ আমারই মনের দোষ! এই খুঁৎখুঁতুনি, এ আমারি পীড়িত মনের একটা উপসর্গ মাত্র।

* * *

নবৌদি আর আমি আজ দুপুরবেলা ওর সঙ্গে কয়লার খনিতে নেমেছিলুম। কালি-ঝুল অন্ধকারে-ভরা ভীষণ গহ্বর—তারার মত মাঝে মাঝে একটা-একটা টিম্‌টিমে আলো চিক্-চিক্ করে ওঠে, আর তারি সঙ্গে কালি-মাখা মানুষ একজন করে দেখা দেয়, ঠিক যেন সেই গল্পের দৈত্য-পুরী!

এই একটানা জীবনে একটু তবু বৈচিত্র্য! মন্দ লাগল না।

এখন ত ওঁর বেশ সময় আছে! বসে দুটো গল্প করবারও অবসর হয়! একসঙ্গে বেড়াতে যাবারও ফুরসৎ মেলে! আর আমি যখন একলা ছিলুম, তখন নিশ্বাস ফেলবারও সময় হত না! মানে কি, এর মানে কি!

এখন একবার মনে হচ্ছে, ভালোই ত! ন-বৌদি এসেছে, উনি যদি আগেকার মতই এখনো দূরে-দূরে থাকতেন, মোটেই আমাকে আমোল না দিতেন, তাহলে ন-বৌদি ভাব্‌ত, উনি ভারী দেমাকে! ন-বৌদি ত আমাদেরি এখানে অতিথি! তার দিকে বিশেষভাবে একটু মন দেওয়া—এ ত খুব উচিত, না'হলে ন-বৌদি ওঁকে বড় খারাপ লোক মনে কর্‌ত! ওঁর নিন্দে যে কেউ কর্‌বে, তা আমার সহ্য হবে না! সে চিন্তা মনে হলে মন আমার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে! উনি যদি এখনও আগেকার মত সেই নিভাজ কাজ নিয়েই মত্ত থাক্‌তেন, তাহলে আমিই দারুণ অনুযোগের কঠিন সুর তুলে বলতুম,—এ কি করছ তুমি! আমার যত হেনস্তাই কর তুমি—তোমার বাড়ীতে ন-বৌদি না অতিথি আজ? অতিথির মর্য্যাদা রাখো! হয়ত রাগ করে ওর সাম্‌নে ন-বৌদিকে স্পষ্টই বলতুম,—তুমি এখান থেকে যাও ভাই,—তোমার কষ্ট হচ্ছে।

তবু মনে হচ্ছে, এইত ওঁর অবসর মেলে! তবে, তবে? নাঃ—আমার মনের মধ্যেই কলটা কোথায় কেমন বিগড়ে গেছে! এ যে কিছুতেই আমার সুখ নেই, সোয়াস্তি নেই! দোষ আমার, আমারি দোষ বটে!

৩৭

* * * * * *

রিক্‌শ চড়ে রাণীগঞ্জে কাল খানিকটা বেড়িয়ে এসেছি,—অবশ্য নবৌদির সঙ্গে। দামোদরের শুক্নো দেহটা খড়্‌খড়্ করছে—তার বুকের

হাড়-পাঁজ্‌রাগুলো বেরিয়ে পড়েছে, যক্ষ্মা-রোগীর মতই শীর্ণ দেহ, একেবারে বেচারীর, বেচারী। শুনেচি, বর্ষায় এই দামোদরেরই বিশাল দেহ ভয়ঙ্কর স্ফীত হয়ে ওঠে, এই দামোদরই বিপুল গর্জ্জনে চারিধার গ্রাস করে ফেলে, জীব-জন্তু, গাছ-প্যালা, পথ-মাঠ ঐ-সবের চিহ্নও রবারে ঘষা পেন্সিলের দাগের মতই সে মুছে সাফ্‌ করে দেয়! তখন কোথায় থাকে ঐ চাষাভুষোর ছোট-ছোট কুঁড়ে ঘরগুলি, কোথায়ই বা তাদের ছেলে-মেয়েদের ঐ আনন্দের মেলা! জল, জল, চারিধারে তখন শুধু জল অজগরের নিশ্বাসের মতই ফুঁসে ফুঁসে, গর্জ্জে গর্জ্জে দিগ্বন্তকে সন্ত্রস্ত উদ্ভ্রান্ত করে তোলে!

বাড়ী ফিরে নবৌদি বললে,—তোর একটা শক্ত ব্যায়রাম হয়েছে, নিশ্চয়। এমন সব জায়গাতেও একদিনের জন্য বেড়াতে বেরুস্‌ নি! আজ যদিই বা এলি, তা একেবারে মন-মরা! কেন, তোর কি হয়েছে?

আমি হেসে বল্‌লুম,—কি আবার হবে?

নবৌদি বললে,—তবে তোর সে স্ফুর্ত্তি দেখচি না কেন! এমন সোনার সংসার, এমন স্বামী, এমন সোনার চাঁদ ছেলে কোলে, তবু তুই যেন কেমন মুষড়ে পড়ে আছিস্‌! দু'জনের ভালবাসারও ত কম্‌তি দেখচি না।

আমি বললুম,—আচ্ছা নবৌদি, একটা কথা আছে,—সত্যি জবাব দেবে?

নবৌদি বল্‌লে,—কি?

আমি বল্‌লুম,—এই যে তুমি এখানে বেড়াতে এলে, ন'দা সঙ্গে এলেন না,—এতে তোমার একটুও কষ্ট হয় নি কি? একটু অভিমান—?

নবৌদি বল্‌লে,—ওঃ, আবার সেই কথা পাড়ছিস্‌। তা' এতে কষ্টই বা কি, অভিমানই বা কেন হবে! তিনি এখানে এলে চলবে কেন? শোন্‌, স্ত্রী আর পুরুষ এই দুজনকে নিয়েই না সংসার! তিনি বাইরেটা নিয়ে থাকবেন, আমি ভিতর! সংসারকে গুছিয়ে তুলতে হলে বাইরে থেকে আহরণ করা দর্‌কার ত! এই আহরণ করার কাজ হল পুরুষের। আর আমার কাজ, সেই আহরণের জিনিষগুলিকে—তা সে আসবাবই বল, আর টাকাকড়িই বল—সেই সব জিনিষ নিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে সংসারটিকে সুন্দর করে তোলা! তারপর দিনান্তে দুজনে বসে দুজনের সুখ-দুঃখের কথা পাড়্‌বো! এর চেয়ে সুখ আর কিসে আছে, তা ত আমি জানিনা, ভাই!

আমি বল্‌লুম,—বেশ, আমিও ত তা অস্বীকার করচি না। কিন্তু স্ত্রী কি স্বামীর সব-চেয়ে বড় বন্ধু নয়? তার সঙ্গে বাইরের কাজ-কর্ম্মের আলোচনা চালাতে পুরুষ নারাজ হবে কেন! পুরুষের যেমন নিজের সখ আছে, তাতে ঘা দিতে গেলে আমরা যেমন ব্যর্থ মনে বেদনা পেয়ে ফিরে আসি, আমাদেরো তেমনি ছোট-খাট সখও ত আছে; সেটার পানে পুরুষের একটু মমতার টান যদি দেখতে না পাই,—সেটাকে যদি তিনি নিতান্তই তাচ্ছল্য করেন, তাহলে নারীর প্রাণটায় কি হয়, বল ত! অথচ এই নারীই তার নিজের কোন স্বতন্ত্র অবলম্বন রাখেনি, আশ্রিতা লতার মতই সে পুরুষের পানে দুই চোখের সাগ্রহ দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে!

নবৌদি বললে,—তুই যত বাজে খুঁটি-

নাটি নিয়ে মাপ করতে বসেছিস্, দেখ্‌চি! অত সূক্ষ্ম হিসেব নিয়ে প্রাণের কারবার চলে না ভাই, এ কিন্তু জেনে রাখিস্! ও ছোট-খাট খোঁচ্‌গুলোকে বাঁচিয়ে চলতেই হবে—না হলে জীবনটা মিছে ক্ষতবিক্ষত হবে।

আমি বললুম—যাই বল, নবৌদি—এই যে ন'দা সেখানে বসে আছেন—তোমাকে ছেড়ে অনায়াসে তাঁর দিন কাটছে—আসতে পারলেন না—এ কেন? না, তাহলে পয়সা হবে না। এইটি আমার ভারী খারাপ লাগে। আমার দুঃখ কোন্‌খানে, জানো? কৈ, আমি ত এঁকে ছেড়ে একদিনের জন্যেও নিজের মা-বাপের কোলে গিয়েও জুড়্‌তে পারি না, আরাম পাই না, শান্তি পাই না—অথচ উনি আমায় ছেড়ে অমন একমাস, দু'মাস দশমাস, পাঁচ-বচ্ছর বেশ আরামে কাটিয়ে দিতে পারেন। আমার অভাব এতটুকুও বোধ করেন না! এইটেই বা কেমন, বল দেখি!...আর তুমি বল,—পয়সা, পয়সা! এটা খারাপ কথা—ভারী খারাপ কথা! আমরা কি ঐ পয়সার জন্যেই ওঁদের পায়ে সর্ব্বস্ব সঁপে এমনভাবে পড়ে আছি! ছিঃ—পয়সার নাম করো না, ভাই! ঐ জিনিষটাই পৃথিবীর পনেরো-আনা সহজ সুখকে মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে তাড়িয়ে রেখেছে!

নবৌদি বল্‌লে,—তোর সঙ্গে কথায় পারবো না। তুই কি চাস্, সোজা করে তার মানেটা ভেঙ্গে বল্ দেখি! মেয়ে-মদ্দ সমান-চালে চলবে,—এঁ্যা? স্বামী স্ত্রীকে ডাকবে—এইয়ো বাঁদী—স্ত্রীও বলবে—আয়রে বান্দা! অর্থাৎ দুজনেরই তুল্য মূল্য, কেমন—এই না? স্বামী যদি বলে, আমি আজ চার টাকার খাবার খাব,—স্ত্রীও অমনি ঘাড় তুলে রুখে উঠে বলবে, আমিও তাই!

হায়, হায়—আমার হাসি পেলে। নবৌদি ক'বছরে কতক-গুলো ছেলে-পিলের মা হয়ে একেবারে বুদ্ধি-সুদ্ধি খুইয়ে বসেছে! এই রকম যাদের ধারণার গোড়ায় গলদ, তাদের সঙ্গেও আবার তর্ক করে! আমি হার মেনে নিরস্ত হলুম।

নবৌদি কিন্তু বেশ পাকা-গিন্নী হয়ে উঠেছে, দেখ্‌চি! উনিও সেই কথা বলছিলেন,—তোমার নবৌদি কেমন হিসেবী, কেমন গুছুনে, দেখো দেখি!

এইটুকু বলেই উনি চুপ করলেন। আমি কি আর বাকীটুকু বুঝলুম না? অর্থাৎ নবৌদির তুলনায় আমি একেবারেই নিরেট!

মনে বড় দুঃখ হল। এইটুকুই তুমি বুঝলে, আজ! ও আমার দেবতা—!

৩৮

* * * * * *
* * *

জীবনের উপর দিয়ে এর মধ্যে কি-এক প্রলয় বয়ে গেল! আমি ত গিয়েই ছিলুম! ওঃ, ভগবান, ভগবান্, আজ এই আমার ডায়েরিখানি খুল্‌তে এসে প্রথমেই তোমায় প্রণাম না করে থাকতে পারচি না, প্রভু! কোটি কোটি প্রণাম, তোমার পায়! আমায় বাঁচিয়েছ বলে নয়—আমার সব দিক দিয়ে আজ নূতন জীবন দিয়েছ! আমার মনের সব আঁধার আজ ঘুচে গেছে।

নবৌদিরা চলে যাবার দু'দিন পরে—সেও আজ প্রায় ষোল-সতেরো দিন হয়ে

গেল—ওঃ, সে দিনের কথা মনে হলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!

বেলা তখন চারটে হবে,—উনি শশব্যস্তে এসে বললেন, চট্‌ঃ করে খানকতক লুচি আর ভাজা তোয়ের করে দাও দেখি। আমরা ক'জনে শীকারে যাচ্ছি।

শীকার! ভাবলুম, ধাপে-ধাপে আমার অদৃষ্ট-চক্রটা ত বেশ চলেছে।

খেয়ে-দেয়ে তৈরী হয়ে উনি খোকাকে আদর করলেন—সে কি আদর! এমন ত কোনদিন দেখিনি আগে! তারপর এই বয়সে আমাকেও—সেই আগেকার মতই আদর হল! আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল—এ কি সত্য, না স্বপ্ন! আজ এত আদর কেন? আমার গা-টা কি-এক অজানা ভয়ে ছম্‌ ছম্‌ করে উঠল! আমি সে আদরের বেগ সহ্য করতে পারলুম না—আমার সমস্ত বুকের মধ্য দিয়ে ঝড় ছুটিয়ে একটা বড় রকমের নিশ্বাস ফুটে বেরুল! উনি খোকাকে ঝীয়ের কোলে দিয়ে বললেন,—বেড়িয়ে নিয়ে এসো গে। তারপর নিজে সোফায় বসে পড়লেন; আমাকে দুই হাতে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ডাকলেন,—অনু—

আমি গদ্‌গদ কণ্ঠে শুধু বললুম—উঁ!

উনি বললেন—যদি আর না ফিরি? তাহলে বোধ হয়, এই শেষ! আজ বল অনু, তুমি কি চাও—

কেন এ-সব কথা? হঠাৎ—অত-আদরের পর—? এ আদরের সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলুম যে! আজ আবার যখন উচ্ছ্বাসে প্রাণ থই পাচ্ছে না, একটু শিউরে-শিউরে উঠছে, তখন এই ভয়ঙ্কর কথা! আমি কেঁদে মেজেয় লুটিয়ে পড়লুম। উনি অপ্রতিভ হয়ে দুই হাতে ধরে আমায় তুলে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন; বললেন,—ছিঃ, ছেলেমানুষের মত কাঁদে এমন করে! একটা ছোট্ট তামাসা করেছি মাত্র—

আমি বেশ অভিমানের সুরেই বললুম—একে তামাসা বলে! জীবন-মরণের কথা নিয়ে তামাসা!

উনি বললেন,—বেশ, বেশ, আর তামাসা করব না। তারপর বহু—বহু কালের পর সেই আগেকার সুরে আদর-সোহাগের গানে আমার প্রাণটাকে ভরিয়ে দিয়ে ওঁর বন্ধু সেই দু'জন সাহেবের সঙ্গেই সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময় বাংলার সামনে ঘোড়ায় চড়লেন।

ঘোড়া ওঁকে পিঠে করে নিয়ে চলে গেল। আমি প্রথমে বাংলার ঘর থেকে ওদের যাত্রার আরম্ভটুকু দেখলুম। পরে ওঁদেরই দেখতে দেখতে বাংলার বারান্দা থেকে সিঁড়ি, সিঁড়ি থেকে ক্রমে লাল কাঁকর-ফেলা পথে—পথ ছেড়ে বাগানে—তারপর বাগান ছেড়ে একেবারে সদর-রাস্তায় ফটকের সামনে এসে পড়লুম! ফটক থেকে দেখি, ঐ যে, ঐ দেখা যাচ্ছে, ঐ, এখনো—ঐ বাঁকের মুখে! আমি বাড়ীতে ফিরতে পারলুম না। খোকা বাংলার বারান্দায় দাসীর কোলে ছিল—একবার মুহূর্ত্তের জন্য তার পানে চোখ পড়ল! তখনই চোখ আবার সেই ঘোড়ার পিছনে তার দৃষ্টিটাকে ছুটিয়ে দিলে—ঐ যে! পথটা বেঁকে আবার এইদিকে ঘুরেছে—ঠিক সামনেই ওঁরা চলেছেন সব—মাঝে একটা পুকুর, তাই পথটা অমন ঘুরে গেছে! ঘোড়ার দিকে নজর রেখে এক-পা এক-পা করে

এগুতে লাগলুম। মনে হল, চোখের সামনে যদি উনি থাকেন, তাহলে জগতের সেই শেষ সীমা পর্য্যন্ত বুঝি সমস্ত জগৎ ভুলে সব ভুলে এম্‌নি চলে যেতে পারি! সত্যি, কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কিছুই খেয়াল ছিল না, পথ কি বিপথ কোন হুঁস ছিল না। ঘোড়ার পিঠের উপর থেকেই উনি মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে আমার পানে চাইছিলেন! সে কি মিষ্টি চাওয়া! সেই গানটা মনে পড়ছিল,

"ও কেন চুরি করে চায়!
লুকোতে গিয়ে হাসি হেসে পালায়।"

আর এই গানের সুরে আমার পাগল মনও নেচে নেচে আমায় টেনে নিয়ে চলেছিল! কোথায় যে চলেছিল, ঐ ঘোড়াটাকে লক্ষ্য করে, তার কিছুই বুঝতে পারিনি!

হঠাৎ মনে হল, আমার পা'টাকে ছুরি দিয়ে কে যেন বিঁধে দিলে! সমস্ত শরীর ঝন্ ঝন্ করে উঠল! গা ভয়ানক দুলে উঠল। দাঁড়াতে পারলুম না—মাথা ঘুরে আমি পড়ে গেলুম। চোখের সামনে থেকে উনি, ঘোড়া, সাহেব দুটি, আকাশ, পথ, গাছ-পালা—ঠিক সেই বায়োস্কোপের অতি-দ্রুত ছুটন্ত ছবির মতই ফস্ করে সরে কোথায় মিলিয়ে গেল! চারিধারে কে যেন আঁধারের তুলি বুলিয়ে দিলে—জমাট আঁধার!

কি যে হল, কিছুই তখন বুঝতে পারিনি।

যখন চোখ চাইলুম, তখন দেখি, আমি বিছানায় শুয়ে! চোখে আলোর একটা খুব ঝাঁঝালো হল্কা এসে লাগল, সহ্য হল না,—আমি চোখ বুজলুম্। আকুল-করা সুর কাণে বাজল,—অনু!

কি মিঠে সুর! সঞ্জীবনী মন্ত্র যেন সে সুরে ভরা ছিল! চোখ আপনি খুলে গেল—যেন সেই মন্ত্রের-স্পর্শেই!

ঘরে এক-ঘর লোক,—সেই সাহেবদুটি আছে,—একজন মেমও, আর উনি; উনি আমার মাথার শিয়রে বসে,—দৃষ্টি কি সে আকুলতায় ভরা! চারিধার কেমন যেন আবার তখনি ঝাপসা হয়ে এলো! সব যেন একটা স্বপ্নের ছায়ায় ঘেরা,—এমনি মনে হতে লাগল। আবার আমি চোখ বুজলুম!

আরো একদিন এমনিভাবেই কাটল—একটা নিঝুম-নিঝুম ভাব! সেই ভাবে আমি যেন কেমন আচ্ছন্ন রইলুম। যেদিন ভালো করে চোখ চাইলুম, চোখ চেয়েই দেখি, উনি সামনে বসে। উঠে বস্‌তে গেলুম,—পারলুম না। পায়ে অসহ্য ব্যথা—পা নাড়তে পারছিলুম না।

আমি বললুম,—আমার কি হয়েছিল?

উনি তখন আদর করে আমার মুখের কাছে মুখ নিয়ে এলেন—দুই হাতে ভরে সোহাগের পরশ আমার মুখের উপর বুলিয়ে দিলেন;—আদর-ভরা সুরে বললেন—হয়েছিল ভালো। তোমায় সাপে কামড়েছিল।

আমি শিউরে উঠলুম, এঁ্যা! বললুম, সাপ?

উনি বললেন, হ্যাঁ! আমরা যাচ্ছিলুম ঘোড়ায় চড়ে—তোমাকেও দেখছিলুম—বিষাদের একটি শীর্ণ মলিন্ ছায়ার মত দাঁড়িয়ে ছিলে! সাহেবরা দেখে বলছিল, যেন

একখানি ছবি! তোমাকে তেমনি দেখতে-দেখতেই এগিয়ে চলেছিলুম! হঠাৎ তোমার চীৎকার শুনলুম—ফিরে চেয়ে দেখি, তুমি পড়ে গেছ। তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে আমরা চলে এলুম। এসে দেখি—তোমার পায়ে রক্ত পড়চে। দেখে স্মিথ সাহেব বললে, সাপে কামড়েছে। আমি তখন কি হয়ে গেলুম। মাথা ঝিম্-ঝিম্ করে উঠল—গা এলিয়ে এল। জোর করে নিজেকে খাড়া করলুম—আমার সর্ব্বস্ব যেতে বসেছে যে! এখন ত কাতর হবার সময় নয়—এখন চাই শক্তি! কেমন-একটা বল এল—বুদ্ধিও এল! বইয়ে পড়ে ছিলুম, তাই তাড়াতাড়ি সেই কাটা জায়গাটায় মুখ দিয়ে প্রাণপণে ঘা চুষতে লাগলুম। খানিকক্ষণ পরে যখন চোষা রক্তটা কুল্‌কুচি করে ফেলে দিলুম, তখন দেখি, হার্ডি সাহেব চলে গেছে। স্মিথ দাঁড়িয়ে ছিল,—সে বললে, এখানে একটা লোক আছে, সাপে কামড়ানোর ওষুধ জানে সে; হার্ডি তাকে ডাক্‌তে গেছে। স্মিথ সাহেব আর আমি রুমাল দিয়ে ফিতে দিয়ে তোমার পা-টা কষে বাঁধলুম—তারপর দুজনে ধরে তোমায় বাড়ী নিয়ে এলুম। হার্ডি সাহেবও সেই লোকটাকে নিয়ে এলো। সে তার শিকড়-পাতি তুক-ফুক নিয়ে কত মন্ত্র আওড়াতে লাগল! সবাই বললে, সদ্য-সদ্য বিষটা চুষে নেওয়া হয়েছে বলে এ-যাত্রা রক্ষা পাবার আশা আছে!...মনটা চম্‌কে চম্‌কে উঠছিল—কি হবে—কি হবে? ভালো হবে ত! তারপর এই তুমি চোখ চেয়ে দেখেছ। আঃ, এ যে কি আরাম!

আমার সমস্ত অসাড় প্রাণের মধ্য দিয়ে বসন্তের কি বিমল স্নিগ্ধ বাতাস বয়ে গেল! কি আরাম যে পেলুম! মনে ভাবলুম, মরতে যদি হয় ত এমনি আদরের অজস্রতার মধ্যেই যেন মরণ হয়! কিন্তু আবার ভাবলুম,—মরব? না। ভয় হল! ওঁকে ছেড়ে—ওঁর এত সোহাগ, এত আদর ছেড়ে—না, না, মরতে আমি চাই না ত! পারব না। খোকাকে দেখতে পাচ্ছিলুম না—দেখতে সাধ হল। বললুম,—খোকা কোথায়?

উনি বললেন—দাসীর কাছে আছে। সে ভালোই আছে। তার জন্যে এখন চঞ্চল হতে হবে না।

আমি ওঁর পানে চেয়ে রইলুম—শুধু চেয়েই রইলুম! উনিও চেয়ে রইলেন, তেমনি-ভাবে, অনেকক্ষণ—স্থির দৃষ্টিতে, আমারই পানে। কারো মুখে কোন কথা নেই! কি দেখছিলুম দু'জনে দুজনের পানে চেয়ে যে! ওঁর চোখ এত ভাষাও জানে—ঐ চোখের দৃষ্টিতে বিশ্বের আরাম, বিশ্বের সুধা জড়ো হয়ে রয়েছে! আমি বললুম,—যদি আর না চোখ চাইতুম—বেশ হত, না? আমি ত তোমার আপদ বই না!

উনি কিছু বললেন না—আমার পানে তেমনি অধীর দৃষ্টিতেই চেয়ে রইলেন। টপ্ করে দু'ফোঁটা গরম জল আমার ঠোঁটে পড়ল। আঃ, সে যেন নবজীবনের স্নিগ্ধ-শীতল প্রবাহ গো! আমি সেই চোখের জলটুকু প্রাণ ভরে পান করলুম! প্রাণ আমার জুড়িয়ে গেল, কৃতার্থ হল!

আমি বললুম,—কাঁদছ! ছি, কেঁদো না।

উনি আমার বুকের উপর মাথা রাখলেন—পাগলের মতই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে

উঠলেন,—কবে আমি বলেছি, অনু, তুমি আমার আপদ হয়েছ! তুমি আমার ধ্রুব-তারা, তা তুমি জানো না? পয়সার ভিড়ে তোমাকে একটু পাশে সরিয়ে রেখেছিলুম—তাই অভিমান হয়েছে! এ পয়সার পিছনে যে ছুটেছিলুম, সে তোমাকে সুখে রাখব বলে! তুমি আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে রয়েছ যে, অন্তরময়ী আমার!

আমি বললুম—আমায় মাপ কর তুমি। তোমার প্রেমে সত্যই সন্দেহ করেছিলুম, আমি এমনি পোড়ারমুখী হয়েছি!

উনি বললেন,—যাক্ ও-সব কথা! ডাক্তার বলেছে, আর ক'দিন যাক্—তোমায় নিয়ে কোন-একটা জায়গায় বেড়িয়ে আসব।

আমার প্রাণের মধ্যে কি-এক ঢেউ আতালি-পাতালি করছিল। আমি বললুম—তোমার দেওয়া এই নতুন জীবন তোমারি সেবায় উৎসর্গ করলুম। আর কোন ত্রুটি পাবে না—কোনদিন অনুযোগের এতটুকু সুরও আর উঠবে না। এক মুহূর্ত্তের জন্যও আর বিষণ্ণ ম্লান মুখ দেখতে হবে না।

বাধা দিয়ে উনি বললেন—কবে আমার সেবায় নিজেকে তুমি উৎসর্গ করনি, অনু—?

আমার মনের মধ্যে তখনো একটা কৃতজ্ঞতার ঢেউ ছুটেছিল, পূর্ণ আবেগে,—পূর্ণ উচ্ছ্বাসে। আমি বললুম—এখন বুঝেচি, তুমি কত উঁচুতে, আর আমি কত নীচে! দেবতা আমার, তোমায় চিনিনি—ইদানীং ভুলও বুঝছিলুম—তাই নিজে এত কষ্ট পেয়েছি। নিজের হাতে ভুল করে মনকেও অনর্থক ক্ষত-বিক্ষত করেছি। আজ তোমার এই আদরের স্পর্শে আমার মনের সে কালি মুছে গেছে—সে ক্ষত সেরে গেছে। দাও, তোমার পায়ের ধূলো দাও, আজ। আশীর্ব্বাদ কর, তোমার সব কাজে ছায়ার মত যেন আজীবন থাকতে পারি! কোনদিন যেন আর তোমায় ছাড়িয়ে নিজেকে উঁচুতে ধরবার চেষ্টা না করি! সত্যই তোমার পায়ের ধূলো দাও। এই নব-জীবনের প্রভাতে অতীতের সব কালি তোমার পায়ের ধূলোয় মুছে নি।

উনি পা সরিয়ে নিয়ে বললেন,—কি পাগলের মত বকছ, অনু? ছিঃ!

আমি বললুম—না গো, আমি পাগল নই। দাও, পায়ের ধূলো একটু দাও গো!

উনি বললেন—পায়ের ধূলো কেন! এসো, মুখ-ভরা সোহাগ আর বুক-ভরা ভালবাসা দিচ্ছি, তাতে যদি তোমার তৃপ্তি হয়! বলে আমার মুখের উপর মুখ এনে দুই ঠোঁটে অজস্র সুধা বর্ষণ করলেন। উচ্ছ্বসিত আনন্দে আমি দুই চোখ বুজে রইলুম! কি আনন্দ, এ কি আনন্দ গো,—একেই বলে, বুঝি, অসহ্য আনন্দ! আমার বুক সেই অসহ্য আনন্দে ভরে উঠছিল!

তারপর থেকে সত্যই এই নব-নির্ম্মল জীবনের প্রভাতে আমার পুনর্জন্ম হয়েছে! দেবতা আমার, সেজন্য তোমার পায়ে কোটি কোটি প্রণাম!

শেষ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

# বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ *

কে ক'রেছে ঠাট্টা তোমায় দিয়ে কবির তক্ত ?
বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ চেনা তোমায় শক্ত !
বাংলা ভাষার ওজন তুমি বোঝ তো ছাই ঘণ্টা,
মিথ্যে কেন মাথা বকাও গরম কর মনটা ?
রবি-রথের ঘোড়ার খুরেও জন্মে যে সব ছন্দ
নাই ক্ষমতা বুঝতে তোমার, তাই করো গালমন্দ।
ব্যাকরণের চচ্চড়িতে বুদ্ধি-জাতা পণ্ডা,
উল্টে শ্লোক বানাও নীরস সাত বুড়ি সাত গণ্ডা।
সংস্কৃতের গণ্ডোপরি বিরাজ কর বিস্ফোটক,
বাংলা ভাষার কেউ তুমি নও, হংস, সারস কিম্বা বক।
ভাব-সাধনার ধার ধারনা, ঠাট্টা জান বৃদ্ধ হে !
ধ্যান-রসিকের তপোবনে নাড়ছ গ্রীবা গৃধ্র হে !
শাস্ত্র পুঁথি ফুঁড়ে ফুঁড়ে করলে শুধু কীটপনা
কথার আঁচে টের পেয়েছি পাওনি সুধা এক কণা।
একটা কথা একুশো-বারি বুঝিয়ে কত বলব ?
অবোধ মোষের ঘাড় নোয়াতে কত বা ঘি ডলব ?
চতুর্মুখের মুখ ব্যথা হয় ঢেঁকীর সঙ্গে তর্কে
এক মুখে কি বলব আমি বলদ-ধুরন্ধরকে !
নিমেষে কেউ বোঝে, আবার কেউ বা বছর চল্লিশে
আরও দ্বিগুণ কাটল বয়েস, আর বোধোদয় হয় কিসে ?

———

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন।

# সাল্-তামামী

কলম হাতে ভাবছি কেবল লিখতে ব'সে সঠিক সালতামামী,
এই দুনিয়ার অশ্রুকণার নিখুঁৎ হিসাব কোথায় পাব আমি !
নিঃস্ব যারা সকল-হারা নিশাস তাদের কুড়িয়ে কি কেউ রাখে,
নিঃসহায়ের প্রাণের হাহা সংখ্যা তাহার সুধাই বল কাকে ?
দুর্ব্বলেদের দাবীর প্রদীপগুলি
প্রবল হাওয়ায় যায় যে নিবে গোণার আগেই ধোঁয়ার ধ্বজা তুলি।

---

* মাঘের 'নারায়ণে' মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন লিখিত "রবীন্দ্রনাথের ছন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

*　　*　　*　　*

খতিয়ে এদের কেউ রাখে না, মিছে খোঁজা রোকড়-বহির পিঠে,
আছে খ'তেন্‌ ডঙ্কা-রবের, অভ্রভেদী মুণ্ড-পিরামিডে !
পন্টনেরি আনা-গোনায় গেল যে-প্রাণ হয়নি তাদের গণা,
প্রসাদ-লোভীর পক্ষে শুধু প্রশংসা পায় পরম-দস্যুপণা ।
আসল ফসল যায় মিশে জঞ্জালে,
অহঙ্কারের বিপুল অঙ্ক লেখা থাকে অজস্র কঙ্কালে ।

*　　*　　*　　*

লোকসানে লোক ডুব্‌ছে যতই খাতা ততই অঙ্কে ওঠে ভ'রে,
বেসাত্‌ ক'রে ফ্যাসাদ ক'রে মর্‌ছে মানুষ অঙ্ক বুকে ক'রে ।
আলোয় প'ড়ে আস্‌ছে ভাঁটা, মসী-ঘটায় আকাশ পাংশু ছবি,
ক্লান্ত দেহের ডেল্‌কো-টাতে লোভের প্রদীপ উস্কে নিয়ে, লোভী !
জমা-খরচ দেখবি রে আর কত ?
তামাম্‌-সালের সাল্‌-তামামী হয়নি রে তোর মোটেই মনের মত !

*　　*　　*

বড় আশার ধন-ঘড়া তোর যায় তলিয়ে ঘাটের কাছে এসে,
স্বস্ত্যয়নের সাত পুরুতে চুলোচুলি ঘট্‌ছে অবশেষে !
মুষল-পর্ব্ব লিখ্‌ছে গণেশ বাঁ হাত দিয়ে ব্যাসের অসাক্ষাতে
শেষ না হ'তে শান্তি-পর্ব্ব,—ইঁদুরে তার কাট্‌ছে পাতে পাতে !
চিল্‌-শকুনে চল্‌ছে কানাকানি,
বিষিয়ে তোলে বিশ্ব-বাতাস সর্পজিহ্ব সুসভ্য শয়তানী !

*　　*　　*

"সবাই হবে স্বয়ম্প্রভু"—এম্‌নি ধারা গেছ্‌ল শোনা বুলি,
"ছোটো-বড় নির্ব্বিশেষে"; না যেতে সন দেখি নয়ন তুলি,
দল পেকেছে, প্রবল বেগে নিজের পাতে চলেছে ঝোল টানা,
দরবার-ক্ষেতের বর্ব্বরতা যে ধন পাবে রুমের তাহে মানা !
সান্‌টঙে টং বেঁধে উঁচু ক'রে
রইল জাপান, চীন হতমান, ভারত মিশর রইল চাপা গোরে ।

*　　*　　*

বিস্মিত কে যুদ্ধকালে দুষ্‌মনেদের দুষ্ট আচার দেখে ?
শান্তি-কালে প্রজার ভালে বোম্‌ ছাড়ে সেই চিড়িয়া-গাড়ী থেকে !
রক্তে কাদা খুনী-বাগে হুণ-হাসানো হ'ল আইন জারী

আদর্শ সে রইল বইয়ে আঁকা,
দুনিয়াদারী কারবারে হায়, চাই নেহাৎই দু'সেট খাতা রাখা।

* * * *

মন ভেঙে যায়, মোহ ফুরায়, মুহুর্মুহু ধাক্কা যত লাগে,
রামধনুকের রঙীন স্বপন গুঁড়ো হয়ে যায় উড়ে কোন্‌বাগে।
পায়ের তলে পৃথ্বী টলে, ভয় পেয়ে ধাই দেউল-আঙিনাতে,
ভেঙে পড়ে দেউল-চূড়া প্রার্থনাশীল লক্ষ লোকের মাথে!
লক্ষ জীবন ধূলার পরে লোটে,
ভুয়ো হ'য়ে যায় দুনিয়া, হাহা ক'রে হুতাশ-হাওয়া ওঠে!

* * * *

পাঁজরাগুলো ফোঁপরা ঠেকে, আগুন জ্বলে সারা মগজ জুড়ে,
ভাঙনে সব পড়ছে ভেঙে, আশার বাসা যাচ্ছে উড়ে পুড়ে,
বিশ্বাসে ঘুণ ধরছে যেন, দিনের বেলা রাত আসে ঘনিয়ে,
"সভ্য-বর্ব্বরতার তরে 'বল্‌সী' আসে কল্‌সী দড়ি নিয়ে।"—
কালপেঁচা ওই বসেছে বিকট ডেকে;
কেঁপে কেঁপে উঠছে আতঙ্ক, কলজে চেপে ধরছে থেকে-থেকে!

* * * *

ভুবন-ভরা হাহাকারে ওগো প্রভু! ওগো ভুবন-স্বামী!
শুকিয়ে ওঠে হৃদয় আমার, শুকিয়ে ওঠে চির-তোমার আমি;
সকল আলো সঙ্কুচিত সূর্য্যে হেরি কলঙ্ক-নিশানা,
জাগো তুমি সত্য-সূর্য্য! জগৎ-ভরা সংশয়ে দাও হানা।
বিশ্বে জাগো বিশ্ব-হিয়ার প্রীতে,
দাও হে অভয়, হোক পরিচয়, হোক পরিণয় মঙ্গলে শক্তিতে।

* * * *

রুদ্ররূপে রোদন তুমি, সান্ত্বনা সে শান্ত-শিবের রূপে,
জ্যোতিষ্ক হয় ফুৎকারে ছাই, পরম জ্যোতি জাগাও ধূলির স্তূপে;
মৃত্যু-তালের নৃত্যে হৃদয় পড়ছে ট'লে চল্‌তে তোমার সনে,
জাগাও প্রভু মুহ্যমানে, গতি-ক্রমের ক্রান্তি-সংক্রমণে;
রোদন মাঝে বাজুক বোধন-বাঁশী,
তারার আখর রাখুক লিখে হিসাব-হারা হিয়ার কান্না-হাসি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

# কৃষি পুস্তকাবলী।

কৃষিক্ষেত্র—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে F. R. H. S. (London) প্রণীত। (১ম ২য় খণ্ড একত্র) দ্বিতীয় সংস্করণ। ইহাতে যাবতীয় কৃষিজাত ফসলের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ১৲।

সব্জী বাগ—(সেন্ট্রাল টেকষ্ট বুক কমিটীর অনুমোদিত)। ঐ গ্রন্থকর্ত্তা প্রণীত। দেশী ও বিলাতী বিবিধপ্রকার সবজী চাষের প্রণালী ইহাতে বর্ণিত আছে। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

মালঞ্চ—ঐ গ্রন্থকর্ত্তা প্রণীত। দেশী ও বিলাতী নানাবিধ ফুলের আবাদ প্রণালী, উদ্যান রচনা প্রভৃতি বিষয় এই পুস্তকে বর্ণিত আছে। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

গোলাপ বাড়ী—ঐ গ্রন্থকার প্রণীত। গোলাপ বাগান সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য ইহাতে আছে। মূল্য ৸৹।

ফলকর—ঐ গ্রন্থকার প্রণীত। দেশী ও বিলাতী ফল বৃক্ষ রোপণের নিয়ম, কলম করিবার প্রণালী প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় বর্ণিত আছে। মূল্য ১৲ টাকা।

মৃত্তিকাতত্ত্ব—ঐ গ্রন্থকর্ত্তা প্রণীত। উদ্ভিদের মূলতত্ত্ব মৃত্তিকা। মৃত্তিকার সহিত পরিচয় কৃষির প্রথম সোপান। মূল্য ১৲ টাকা।

পশুখাদ্য—ঐ গ্রন্থকর্ত্তা প্রণীত। গোচারণের মাঠ, গবাদি পশুর খাদ্য— ঘাষ তৃণাদি সম্বন্ধীয় পুস্তিকা। মূল্য সামান্য।৹ আনা।

কার্পাস প্রসঙ্গ—(সচিত্র) শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত M. R. A. S. প্রণীত। ভারবর্ষে কার্পাস চাষ সম্বন্ধে জানিবার ও শিখিবার যাবতীয় বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করা হইয়াছে। মূল্য।৹।

কার্পাস চাষ—(সচিত্র) শিবপুর কলেজ হইতে উচ্চশ্রেণীর কৃষি পরীক্ষোত্তীর্ণ বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারী শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। তুলা-চাষ সম্বন্ধে এই পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। মূল্য ৸৹ বার আনা স্থলে।৹ আনা।

ভূমি কর্ষণ—জমি চাষ, কারকিৎ করিবার ও সার প্রয়োগের প্রণালী লিখিত আছে মূল্য।৴৹।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ময়সীম—প্রতি পাউণ্ড ।৴৹, [illegible] টাকা, প্রতি ৴২॥৹ আড়াই সের বীজের আবশ্যক।

ধঞ্চে বীজ—প্রতি পাউণ্ড ৵৹ আনা, মণ ৮৲ বিঘা প্রতি ৴৩ তিন সের বীজের আবশ্যক।

সবুজ সারের জন্য ক্ষেতে বীজ ছড়াইয়া গাছ জন্মি... চষিয়া দিতে হয়। ইহাতে জমীর উর্ব্বরতা বা... জমির প্রাকৃতিক গঠনের পরিবর্ত্তন হয়। অতি... সহজ প্রাপ্য, সুলভ সার। চায়ের ক্ষেতে... ফলপ্রদ।

## সব্জী সার

এই মিশ্রসার সযত্নে প্রস্তুত, ইহা ব্যবহারে ক... সালগম, বীট, মটর, বেগুন প্রভৃতি সকল সব্জী... এবং সুস্বাদু হয়। ৫ পাউণ্ড ব্যাগ ৸৹; ১০ পা... ব্যাগ ১৷৹।

## গোলাপ গাছের রাসায়নিক...

ইহাতে নাইট্রেট অব পটাস্ ও সুপার...ফস্ফেট অব-লাইম্ উপযুক্ত মাত্রায় আছে। সিকি পা... অর্দ্ধ পোয়া, এক গ্যালন অর্থাৎ প্রায় ৴৫ সের... গুলিয়া ৪।৫ টা গাছে দেওয়া চলে। দাম... ॥৹ আনা, দুই পাউণ্ড টিন ৸৹ আনা, ...ক মাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে।

## গুয়ানো সার

অত্যুৎকৃষ্ট সার। অল্প পরিমাণে ব্য... হয়। ফুল, ফল, সব্জীর চাষে ব্যবহৃত হয়... ফলপ্রদ। অনেক প্রশংসা পত্র আছে। ছোট... মায় মাশুল ॥৵৹ বড় টিন ১৷৹ আনা।

## সার।

হাড়ের গুঁড়া (ধানের পক্ষে বিশেষ ফল...) প্রতি মণ ৫৲ টাকা। রেড়ীর খোল (আলু ও... পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক) প্রতি মণ ৪ টা... সকল সময় সমান থাকে না। সোনা সার প্র... ৬৲ হইতে ১০৲ টাকা।

কে, এল, ঘোষ, এফ, আর, এইচ, এস (লণ্ডন) ম...

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়ে...

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকা...




### কেশরঞ্জন আপনারই জন্য।

যদি আপনার শিরোবেদনা, শিরোঘূর্ণন, মস্তিষ্কের তা ও মনের অস্থিরতা কোন তৈল ব্যবহারে নিবা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে জানিবেন—"কেশ ই" তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

যদি দেখেন—চুল উঠিয়া যাইতেছে, মাথায় টাক াছে, অকালে চুল পাকিতেছে, অথবা চুলগুলি বিকৃত ও বিবর্ণ হইয়াছে, তাহা হইলে "কেশরঞ্জন" বহার করিবেন, চুলের সব দোষ নষ্ট হইবে।

ধিক অধ্যয়ন, বক্তৃতা বা সর্ব্বদা বিচার তেতে মস্তিষ্কের বিশ্রাম দিবার অবসর ত্যাধিক মানসিক পরিশ্রমে সর্ব্বদা ক্লান্ত ড়েন, তাহা হইলে "কেশরঞ্জন" নিত্য ব্যবহার , মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ থাকিবে।

শির মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র, মাশুলাদি।/০ আনা।
শিশি ২॥০ টাকা। ডাঃ মাঃ ॥৵০ আনা।

### বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়।

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বি সংক্রামিত হইয়া থাকে,—গায়ে হাতে ও পায়ে চাকা চাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমাদিগকে লিখুন,—আমরা আপনাকে "বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়" পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নির্দ্দোষভাবে ও অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন উপদংশ ও পারদ-বিকৃতিতে **বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়** মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে।

প্রতি শিশির মূল্য ... ২৲ দুই।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ॥৵০ এগার আনা।

## সচিত্র ডাক্তারি-শিক্ষা।

( চতুর্থ সংস্করণ—পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত। )

### শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত।

ডাক্তারি-শিক্ষা চিকিৎসা-জগতে এক অভাবনীয় নূতন ব্যাপার। সমস্ত বড় বড় ডাক্তারি-গ্রন্থের জ্ঞাতব্য সারাংশ ইহাতে সন্নিবেশিত। কম্পাউণ্ডারি শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া মেটিরিয়া-মেডিকা, থিরাপিউটিক্স, এনাটমি, ফিজিওলজি, প্রাক্‌টিস্ অব মেডিসিন্ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগসমূহের একত্র সার-সমাবেশ। শতাধিক বিলাতীর অনুরূপ চিত্র দ্বারা পরিশোভিত। ইহার উপর দুই হাজারের অধিক —বড় বড় ডাক্তারদের বাছা বাছা প্রেস্‌ক্রিপসন্। ভাষা সহজ ও সরল সাধারণের বোধগম্য। সুন্দর ছাপা, আড়াই হাজার পৃষ্ঠার অধিক, বিলাতী বাঁধন —উত্তম কাগজে প্রস্তুত।

ডাক্তারি-শিক্ষার মূল্য ... ৪৲ চারি টাকা।
ডাকমাশুল ও প্যাকিং ... ৸০ বার আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, প্যারিস কেমিক্যাল সোসাইটি
লণ্ডন সার্জ্জিক্যাল এড সোসাইটি ও লণ্ডন সোসাইটি অব
কেমিক্যাল ইণ্ডষ্ট্রীর সভ্য,

## শ্রীনগেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ

### আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮।১,১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।